মহিমা তব উদ্ভাসিত



মহিমা তব উদ্ভাসিত

ধর্মমহাসভা • শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদনা : প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা



শ্রীসারদা মঠ
দক্ষিণেশ্বর

প্রকাশিকা
প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা
শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৯৪

মুদ্রক
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলিকাতা ৭০০ ০০৯

নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শ্রীসারদা মঠ থেকে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হল। এ বছর পৃথিবীর নানা প্রান্তে স্বামীজীর বহুমুখী অবদান নিয়ে নতুনভাবে আলোচনা শুরু হয়েছে। শুধু বিবেকানন্দ-অনুরাগীরাই নন, বিদগ্ধ, চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেই আজ অনুভব করছেন বর্তমান বিশ্বে তাঁর বাণীর প্রয়োজন কত বেশি! তাই শতবর্ষ অতিবাহিত হবার পরেও পঠন-পাঠন, গবেষণা ও চর্চায় বিবেকানন্দকে নিয়ে চলেছে মূল্যায়ন, পুনর্মূল্যায়ন। তিনি যেন ক্রমাগতই প্রসারিত হয়ে চলেছেন। তাঁর মহান সত্তা আজ দুই গোলার্ধকেই স্পর্শ করেছে। অসাধারণ সাড়া জাগিয়েছে মানুষের চেতনায়। আগামী একুশ শতকে তাঁর বাণী কি আলোড়ন তুলবে—চিন্তাজগতে কত রূপান্তর ঘটাবে তারই হয়তো একটু আভাস আমরা পেলাম।

তাঁর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের আশ্চর্য মিলন ঘটেছিল। বিবেকানন্দ ছিলেন সেই মহান আচার্য যাঁর দৃষ্টিতে দেশ ও কালের সংকীর্ণ ভেদরেখাই লুপ্ত। অথচ ভারতবর্ষকে তিনি ভালবেসেছিলেন গভীরভাবে। নিবেদিতা লিখেছেন—'The queen of his adoration was his motherland.' এ ভালবাসা শুধু জন্মভূমি বলেই নয়, ভারত তাঁর কাছে মহান ভাবের জন্মদাত্রী। তিনি জানতেন ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ আজও মানবসভ্যতাকে সঞ্জীবিত করার শক্তি রাখে। পাশ্চাত্যে তিনি ধর্মের গ্লানি ও অধ্যাত্মভাবের বিস্মরণ দেখে মর্মাহত হয়েছিলেন। মানুষের প্রতি করুণায় সেখানে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন বেদান্তের সারসম্পদ। আমেরিকায় সেদিনের বেদান্তপ্রচারে নারীর ভূমিকা ছিল সত্যই বিস্ময়কর। সে গৌরব আজ সমগ্র নারীসমাজের।

স্বদেশ ও বিদেশে বিবেকানন্দের সেই বিপুল মহিমার অতি সামান্য অংশ তুলে ধরার প্রয়াস এই গ্রন্থ। আমরা আশা করি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমণ্ডলে এবং সর্বসাধারণের কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে।

প্রকাশিকা

সম্পাদকীয়

শিকাগো ধর্মমহাসভার শতবর্ষ পূর্ণ হল। গত শতাব্দীর সেই যুগান্তকারী ঘটনা—ধর্মমহাসভায় অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের মহান আবির্ভাব নতুন করে আমরা উদ্‌যাপন করছি। এই বৎসরটিকে 'বিবেকানন্দ-স্মরণবর্ষ' বলে উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর মহা অভিভাষণের কথা স্মরণ করে দেশ জুড়ে আলাপ-আলোচনা, পঠন-পাঠন ও গবেষণায় নতুন চিন্তাভাবনার সূচনা হয়েছে। স্বামীজীর অনিঃশেষ অবদান সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছি আমরা। অগ্রপশ্চাৎ সমীক্ষায় মনে হচ্ছে বর্তমান যুগেও তিনি কত প্রাসঙ্গিক। এই বিপুল স্মরণ-মননের প্রবাহে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের প্রয়াস এই গ্রন্থ।

'জ্যোতির তনয়' স্বামী বিবেকানন্দের স্বল্পায়ত জীবনে প্রথমপর্ব আত্মজিজ্ঞাসা ও শ্রীরামকৃষ্ণ, গুরুভাই ও অন্তরঙ্গদের কেন্দ্র করেই আবর্তিত। পরিব্রাজক বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমাও ছিল কোনও মহাব্রত উদ্‌যাপনের অন্তিম প্রস্তুতিপর্ব। কারণ আসল নাটকের পর্দা উঠল ১৮৯৩ সালে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে। তখনই দেখলাম সেই যুগনায়ক মহান আচার্যকে শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে স্বয়ং চাপরাশ দিয়েছিলেন—'নরেন শিক্ষে দিবে'। তাঁর প্রতিভাদীপ্ত বহুমুখী ব্যক্তিত্ব সেদিন যেন নতুন মাত্রা পেল। জগতের ইতিহাসে ভারতের চিরন্তন অধ্যাত্মভূমিকার প্রতিভূ তিনি। সেদিনকার পাশ্চাত্য পটভূমি প্রস্তুত ছিল এই আচার্যকে বরণ করতে। তাই বিবেকানন্দ আলোড়ন তুলেছিলেন সভ্যতার অন্তঃপ্রবাহে, চিন্তার জগতে। সেই বিস্মৃত ইতিহাসকে বহু বছর পরিশ্রম করে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন মেরী লুইস বার্ক তাঁর ছয় খণ্ড গ্রন্থে। বহু তথ্য ও সংবাদ সংগৃহীত হলেও কিন্তু সম্পূর্ণ বিবেকানন্দ অজানাই রয়ে গেছেন। সেই দিব্যপুরুষের মহিমার ইতি করা যায়নি। এই গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিত্বের নানাদিক নিয়ে আলোচনার সঙ্গে মূল গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে পাশ্চাত্যে তাঁর অসামান্য ও অভিনব আত্মপ্রকাশের ওপর। প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিচারণার মধ্যেই মূলত তাঁর আলোকিত সান্নিধ্যের কথা ধরা আছে। তৎকালীন আমেরিকার চিত্র, ধর্মমহাসভা ও বিভিন্ন বক্তব্যের মূল সুর, কয়েকটি পাশ্চাত্য পরিবার এবং অনেক শিক্ষিতা নারীর ওপরেই বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে।

১৮৯৪-এ প্রকাশিত ডাঃ ব্যারোজের 'History of the Parliament of Religions' গ্রন্থ থেকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বক্তাদের কারও কারও ভাষণের সারসংক্ষেপ

অথবা কারও ছবি দেওয়া হল একটি রূপরেখা রচনার জন্য। নয়টি ধর্মের প্রতীক থাকলেও কনফুশিয়াস ধর্মের প্রতীকচিহ্ন বলে কিছু নেই।

জগন্মাতা-নির্বাচিত আমেরিকান নারীদের বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত বেদান্তপ্রচার আন্দোলনে সেদিন বিশেষ ভূমিকা ছিল। আজ একশ বছর ধরে আমরা শুধু স্বামীজীর পুণ্যস্মৃতিই নয়, অন্তরে বহন করছি সেইসব নারীদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা, যাঁরা বিবেকানন্দকে আশ্রয়, স্নেহ, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা দিয়ে তাঁর প্রবাসজীবনকে করেছিলেন সহজ ও স্বচ্ছন্দ। জানি না অধ্যাত্মজগতের ইতিহাসে অন্য কোনও আচার্য নারীসমাজের ওপর এত শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সম্মান অর্পণ করেছেন কি না! স্বামীজীর প্রত্যাশা ছিল মেয়েরা আত্মবোধে জাগ্রত হবে। উচ্চারণ করেছিলেন সেই অপূর্ব প্রতিশ্রুতি "মেয়ে পুরুষের ভেদটার জড় মেরে তবে ছাড়ব। আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি?... শরীরাভিমান ছেড়ে দাঁড়া।" (বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৮৯)। নবযুগের প্রফেটের এই বাণী কোন রূপান্তর এনেছিল পাশ্চাত্য নারীর জীবনে তারই আভাস মিলবে তাঁদের জীবনচর্যায়।

গত এপ্রিল মাসে যখন এই গ্রন্থটি প্রকাশের প্রস্তাব আনা হয় তখন শ্রীসারদা মঠের প্রথম সম্পাদিকা পূজনীয়া মুক্তিপ্রাণা মাতাজী সম্ভাব্য লেখক-লেখিকার নাম সাগ্রহে শোনেন ও প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির বিপুল আয়তনের কথা ভেবে চিন্তিতও হন। গ্রন্থ প্রকাশনার একটি বাস্তব দিকও আছে। লেখাসংগ্রহ, আর্থিক ব্যবস্থা এবং সময়োচিত সকল যোগাযোগ সেক্ষেত্রে অপরিহার্য। তিনি এই গ্রন্থের সুষ্ঠু প্রকাশনের জন্য সকল দিকই চিন্তা করে গেছেন—এই কথা পরে জেনে আমরা বিস্মিত হই। স্বামীজীর অনুধ্যানে তিনি সর্বদাই সচেতন ও সজীব থাকতেন। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁর প্রেরণা ও আশীর্বাদ এই কাজে পদে পদেই আমাদের শক্তি দিয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরম পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজের একটি প্রকাশিত রচনার অনুবাদ আমরা তাঁর সস্নেহ আশীর্বাদরূপেই গ্রহণ করেছি।

শ্রীসারদা মঠের পরম পূজনীয়া অধ্যক্ষা মাতাজী তাঁর রচনাটি নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন—এটি আমাদের পরম প্রাপ্তি। মঠ মিশনের বহু কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও পূজনীয়া শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজী অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি সাগ্রহে পড়েছেন এবং গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর আন্তরিক সহায়তা সাহস যুগিয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় স্বামীজীর এই কাজে প্রাথমিক পর্যায়ে পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে আমাদের দিগ্‌দর্শন করিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থের কাজে আমাদের সঙ্গে নিরন্তর প্রুফ দেখে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয়া আনন্দপ্রাণামাতাজী। এই বিপুলায়তন গ্রন্থে বহু প্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকা, গবেষক, শিল্পী, অধ্যাপিকা, বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসিগণ ও সারদা মঠের বহু সন্ন্যাসিনী যথাসময়ে লেখা দিয়েছেন স্বামীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায়। তাঁদের সকলের প্রতিই আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। এই সূত্রে স্মরণ করি প্রয়াত নিশীথরঞ্জন রায়কে যিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও অনুরোধ করা মাত্র তাঁর মূল্যবান লেখাটি পাঠিয়েছিলেন সাগ্রহে। চিত্রের বিন্যাসে প্রখ্যাত শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামীর পরামর্শ ও আন্তরিক সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। রামকৃষ্ণ মন্দিরের আলোকচিত্রগুলি তাঁরই সৌজন্যে প্রকাশিত হল।

প্রকাশনায় প্রতিটি বিভাগেই দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর অভিজ্ঞ এবং সক্রিয় ব্যবস্থাপনা আমাদের চির কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছে। গ্রন্থটির দ্রুত মুদ্রণের ব্যাপারে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে আমরা ঋণী। বহু বিশিষ্ট ভক্ত এবং মহিলার নীরব ও স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তায় ও স্বামীজীর কৃপায় এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হল।

এই গ্রন্থের সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য পেয়েছি প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণার।

যাঁর মহিমার কথা গ্রন্থের বিষয়—সেই স্বামীজীর আশীর্বাদ সকলের ওপর বর্ষিত হোক এই আন্তরিক প্রার্থনা। তাঁর মহিমার উদ্ভাস লেখনীর দ্বারা সম্ভব নয়—তাঁর স্মরণ-মননে আমরাই ধন্য ও কৃতকৃতার্থ।

২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা

যাঁরা সহায়তা করেছেন

সহ সম্পাদনা ঃ	প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণা।
প্রুফ সংশোধন ঃ	প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণা, প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণা, মণিকুন্তলা দে, দোলন ভট্টাচার্য, গীতা চৌধুরী, অপর্ণা ধর, হাসি ঘোষাল।
অনুবাদ ঃ	স্বরাজ মজুমদার, শোভন বসু, গীতা চৌধুরী, মিতা মজুমদার, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণা।
নির্ঘণ্ট প্রস্তুতি ঃ	প্রব্রাজিকা প্রভাপ্রাণা, বর্ষা মুখার্জী, অপর্ণা ধর, হাসি ঘোষাল, দোলন ভট্টাচার্য ও ব্রহ্মচারিণী মৈত্রেয়ী।
চিত্রবিন্যাস ঃ	রঘুনাথ গোস্বামী।
পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতি ঃ	হাসি ঘোষাল, অপর্ণা ধর।

সূচীপত্র

চিত্র সারণি

পৃষ্ঠা ৭২-৭৩ এবং ৮০-৮১-এর মধ্যে

জো (মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড)
জো—পঞ্চাশ বছর বয়সে

পৃষ্ঠা ৩৩৬-৩৩৭-এর মধ্যে

স্বামী বিজ্ঞানানন্দকৃত রামকৃষ্ণ মন্দিরের নকশা
মন্দিরের মডেল
গর্ভমন্দির : প্রদক্ষিণ-বীথি
প্রবেশপথ : রাজপুত-স্থাপত্য রীতির নহবৎ (উপরে)
বিশাল উন্মুক্ত খিলান
বৌদ্ধগুহা স্থাপত্য রীতির খিলান ও কেন্দ্রে প্রতীক
খিলানের ভারবাহী স্তম্ভ
গর্ভমন্দিরের বিমান-মণ্ডলী
গর্ভমন্দিরের পার্শ্বদৃশ্য
পার্শ্বদৃশ্য : উপরের অংশ
চতুরস্র ব্রহ্মকাণ্ড স্তম্ভের উপর সরদল
চিতোরের কীর্তি-স্তম্ভের আদলে স্তম্ভ সমন্বিত গবাক্ষ
নাটমন্দিরের প্রবেশ পথ
মন্দিরের ওপরে জালিকাজ করা ঝুলবারান্দা
পশ্চিমদিকের প্রবেশ পথের শীর্ষে হনুমান মূর্তি
গর্ভমন্দির বেষ্টন করে নবগ্রহ মূর্তি
ডমরু আকৃতির মর্মরবেদী : উৎকীর্ণ ব্রাহ্মীহংস

পৃষ্ঠা ৪৩২-৪৩৩-এর মধ্যে

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী
ভগিনী নিবেদিতা
ভগিনী কৃস্টিন
জে. জে. গুডউইন
মহেন্দ্রনাথ দত্ত
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
গুরুভাই ও স্বামীজীর শিষ্যবৃন্দ
মাদার সেভিয়ার
ক্যাপ্টেন সেভিয়ার

পৃষ্ঠা ৫৫২-৫৫৩-এর মধ্যে

মিস্টার টমাস জে অ্যালেন
মিসেস এডিথ বি অ্যালেন
মিস আইডা অ্যানসেল (উজ্জ্বলা)
এমা কালভে
এমা—কারমেনের ভূমিকায়
ফ্রাঙ্ক লেগেট
বেসি লেগেট
হলিস্টার
ফ্রান্সেস ও অ্যালবার্টা

মহিমা তব উদ্ভাসিত

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে দেখি সাধারণভাবে আমরা স্বামীজীর তিনটি চিত্রের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। চিত্রগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়—বরং তাঁর মহান জীবন, আদর্শ ও বাণীর দ্যোতক। একটি চিত্র অন্যটির পরিপূরক।

প্রথম চিত্রে তাঁকে দেখতে পাই দণ্ডহাতে পরিব্রাজক সন্ন্যাসিরূপে। ভারতের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে বিচরণ করে চলেছেন, পূর্বে তাঁর জন্মভূমি বঙ্গদেশ থেকে পশ্চিমে দ্বারকা, উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা। তিনি আতিথ্যগ্রহণ করেছেন রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুটীরে, প্রত্যক্ষ করেছেন দুঃখ, দারিদ্র্য, বন্ধন ও অজ্ঞতার গভীর অন্ধকার, নৈরাশ্য-নিপীড়িত লক্ষ লক্ষ নরনারীর আকুল আর্তনাদ।

দ্বিতীয় চিত্রে তিনি কন্যাকুমারীর অদূরে ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট—অনন্তের ধ্যানে সমাহিত নয়, গভীর বেদনায় উদ্বেলিত হৃদয়ে ভারতচিন্তায় মগ্ন। তাঁর ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল অখণ্ড ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। এই দর্শন তাঁকে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত করেছিল যে, দেশের ঘোর অবনতির জন্য ধর্ম দায়ী নয়। এর জন্য দায়ী ধর্মের নামে প্রচলিত প্রাণহীন অনুষ্ঠান, প্রবঞ্চনা ও কুসংস্কার। প্রকৃত ধর্মসংস্থাপনের উপরেই নির্ভর করছে ভারতের জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণ। ধর্মকে কেন্দ্র করেই ভারত পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন মানবের অন্তর্নিহিত প্রসুপ্ত দেবত্বের উদ্বোধন, প্রয়োজন আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

স্বামীজীর যে চিত্র অতঃপর আমাদের মানসচক্ষে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাতে দেখতে পাই তিনি শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের পাদপীঠে সমুন্নতশিরে দণ্ডায়মান। ধর্মের প্রবক্তারূপে গভীর উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করছেন ভারতের শাশ্বত সনাতন হিন্দুধর্ম বা বেদান্ত—যে ধর্মের বিকাশ হতে পারে জীবনের সকল স্তরে, কর্মে, চিন্তায় ও আচরণে। কোনও গণ্ডিবদ্ধ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্মের ব্যাখ্যা স্বামীজী করেননি। সর্বপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে বিশাল, উদার, বিশ্বজনীন ধর্মই তিনি প্রচার করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কর্মজীবনে বেদান্তপ্রয়োগ দ্বারাই ভারতের সব সমস্যার সমাধান হবে—এক কথায় কার্যকরী (practical) বেদান্তের দ্বারাই জীবনের সকল দিক পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করবে।

পূর্বোক্ত ত্রিবিধ চিত্রের মধ্যে স্বামীজীর সমগ্র জীবনাদর্শ বিধৃত। বস্তুত এই চিত্রগুলি তাঁর যে পরিচয় বহন করে তা হল, ভারতের সঙ্গে তিনি একাত্ম। প্রথম জীবনে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াতকালে স্বামীজীর লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরলাভ। আত্মজ্ঞানলাভের প্রচণ্ড ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট জানান, শুকদেবের মতো অহরহ সমাধিস্থ হয়ে থাকাই তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তাঁর গুরু সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেননি। 'যোগিভির্ধ্যানগম্যম্' সেই অনন্ত জীবনের আস্বাদ তিনি লাভ করলেও, তাঁকে মগ্ন হয়ে যেতে দেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তার চাবি রেখে দিয়েছিলেন নিজের কাছে। অতঃপর স্বামী বিবেকানন্দের আর স্বতন্ত্র জীবন বলতে কিছু ছিল না। তাঁর চেতনসমুদ্রে রইল ভারত, তার বিশাল জনসমাজ এবং ক্রমশ সমগ্র জগতের কল্যাণকামনায় তা পরিণত হল।

স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে ভাবা যায় না। ভারতে সন্ন্যাসিসম্প্রদায় চিরকাল 'আত্মনো মোক্ষার্থং' জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের সংসারবিমুখ করেছে গভীর বৈরাগ্য, অনন্তের অন্বেষণ—'আত্মার মুক্তিসাধন'ই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। স্বামী বিবেকানন্দ যে সন্ন্যাসি-সংঘ সংগঠন করলেন, তার আদর্শ দ্বিবিধ। তিনি বললেন কেবল নিজের মুক্তি নয়, 'জগদ্ধিতায়' অর্থাৎ জগতের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে কারণ অপরের কল্যাণসাধনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নিজের কল্যাণ। স্বামী বিবেকানন্দের এ আদর্শ একেবারে নতুন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

তাই দেখা যায়, সন্ন্যাসী হয়েও অতি সচেতনভাবে তিনি জাতি ও সমাজ গঠনে অংশগ্রহণ করেছেন। নিজেকে সমাজ-সংস্কারক বলে ঘোষণা করতে ইতস্তত করেননি—যদিও অন্যান্য সংস্কারকগণের সঙ্গে তাঁর মূলগত পার্থক্য ছিল। তিনি বলতেন, "আমার প্রণালী সংগঠন, আমি আদেশতন্ত্র সংস্কারে বিশ্বাসী নই, স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমার উদ্দেশ্য জাতীয় পথে উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিণতি।" বর্তমানে ভারতে আমরা যে ধরনের রাজনীতিক অধিকারলাভের জন্য সচেষ্ট, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে তা বিভিন্নভাবে বর্তমান এবং বহু শতাব্দী ধরে পরীক্ষিত। স্বামীজী প্রশ্ন তুলেছেন, সামাজিক প্রয়োজনসাধনে ঐসব ব্যবস্থা কি ত্রুটিশূন্য? পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কি শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার অত্যাচার কি সেখানে প্রবল হয়ে ওঠেনি?

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা বা মাহাত্ম্য অস্বীকার করা অবশ্যই মূর্খতা বা ধৃষ্টতা। কিন্তু নিরঙ্কুশ বিজ্ঞানসাধনা তথা প্রকৃতির অনুশীলনের মধ্যে প্রেয়োলাভের সঙ্গে বিনাশের সম্ভাবনা আজ সর্বত্র উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। ভারত কি শেষ পর্যন্ত আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে জড় বিজ্ঞানের হাতেই আত্মসমর্পণ করবে? চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আজ এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করছেন।

রাজনীতিক উচ্চাভিলাষ ও নতুনভাবে সমাজগঠনের প্রচেষ্টায় অর্ধমৃত, হীনদশাপন্ন না হয়ে ভারত যেন নিজের উপর বিশ্বাসসম্পন্ন হয়—এই ছিল স্বামীজীর প্রত্যাশা। অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির পরিচায়ক নয়।

প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী ভারতে যে গণতন্ত্রমূলক নেশন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তার উপায় ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধন। ভারতের সনাতন ঐতিহ্য মানবাত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন তার ভাষা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি,

পোশাক-পরিচ্ছদ কিন্তু তার মনপ্রাণ কখনই বিচ্ছিন্ন নয়। সমগ্র ভারত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে অভিন্ন। "বেদ ও উপনিষদের বাণীতে, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সংগঠনে, মহাপুরুষদের ধ্যানের গভীরে ভারত এক এবং অখণ্ড।"

স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতের আদর্শ কি? তিনি বলেছেনঃ 'আমার মতে যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয় যুগের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ ক্ষমতা ও শূদ্রের সাম্যবাদের আদর্শ বজায় থাকবে অথচ তাদের দোষগুলি থাকবে না—তাহলে সেটি হবে আদর্শ রাষ্ট্র।' কিন্তু বাস্তবে তা কি সম্ভব?

স্বামীজীর আদর্শ যথার্থভাবে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতা বলেনঃ 'অন্যেরা যে যাই ভুল করুক, স্বামীজীর কাছে এ দেশ নবীন।...ভারতের প্রাণশক্তি অব্যবহৃত। তাঁর স্বপ্নের ভারত ভবিষ্যতের গর্ভে। যন্ত্রণা ও সহনের মধ্য দিয়ে আজ যে নবচেতনার সূত্রপাত আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভাবী পরিবর্তনের তা প্রথম স্তর মাত্র। তাঁর মতে, ভারতের আশার উৎস তার নিজের মধ্যে, বিদেশ নয় কখনও। একথা সত্য, তাঁর বিশাল হৃদয় বিদেশীর প্রয়োজন উপলব্ধি করে সর্ব মানুষের পক্ষেই আশার বাণী উচ্চারণ করেছে।'

স্বামীজীর এই আদর্শের মর্ম হয়তো বর্তমানে আমরা সঠিক উপলব্ধি করতে পারব। কেবল ভারতভ্রমণ করে যদি তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন অথবা বলতেনঃ 'হিন্দু যেন কখনই তার ধর্ম ত্যাগ না করে', অথবা 'ভাবত যেন পরানুকরণ না করে', তাহলে মনে সংশয় জাগত, হয়তো বৃহত্তর জগতের পরিচয়ের অভাব তাঁকে একান্তভাবেই স্বদেশের প্রতি আদর্শনিষ্ঠ করেছে। কিন্তু স্বামীজী যে কেবল পাশ্চাত্য জগৎ ভ্রমণ করেছিলেন তা নয়, গভীর আগ্রহ সহকারে পাশ্চাত্য জীবনদর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন, পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তাঁকে অভিভূত করেছিল। পাশ্চাত্যের কর্মকুশলতা, তৎপরতা, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি ভারতের উত্থানের জন্য অপরিহার্য মনে করেছিলেন কিন্তু তা কখনও ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে নয়, অপরের অনুসরণ করে নয়, অপরের সাহায্যের প্রত্যাশা করেও নয়।

ভারতের সর্ববিধ সমস্যার প্রতি তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, শূদ্রজাতির উত্থানের সময় আসন্ন, শীঘ্রই তাদের কণ্ঠ অধিকার ও সুযোগের দাবি ঘোষণা করবে। সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীর কর্তব্য জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা, সমাজে সাম্যের আদর্শ প্রচার ও সর্বপ্রকার অত্যাচার থেকে মানবাত্মার মুক্তিসাধন। স্মরণ রাখতে হবে, স্বামীজী যখন একথা বলেছিলেন, তখনও পর্যন্ত রাশিয়ার বিপ্লববাদ ও শ্রমজীবীর উত্থান সংগঠিত হয়নি।

ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেই তিনি যেন বলেছিলেনঃ 'শূদ্রজাতির সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর সংক্ষোভ, ভীষণ আলোড়নের মধ্য দিয়ে তা ঘটবে।'

কয়েক বছর ধরেই সে সংক্ষোভ ও আলোড়ন চলছে। বলা যায়, এ শতাব্দীর গোড়া থেকেই তা চলেছে নানারূপে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে। স্বাধীনতাসংগ্রাম পর্ব শেষ হয়ে গেছে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে কিন্তু শেষ হয়নি মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হবার সংগ্রাম। ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার মর্মান্তিক যন্ত্রণা ও সহনের মধ্য দিয়ে কি

জাতির উত্তরণ ঘটছে আলোর দিকে? অথবা আরও গভীর তমিস্রা, প্রচণ্ডতম আলোড়ন অপেক্ষা করে আছে? এর উত্তর মানুষকে নিজের মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে। মানুষই তো ইতিহাসের স্রষ্টা!

স্বামীজী দিব্যদৃষ্টিসহায়ে ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করে বলেছিলেনঃ 'এদেশ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু আবার উঠবে। এমন উঠবে যে জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে। দেখিসনি? নদী বা সমুদ্রে তরঙ্গ যত নামে ঢেউটা তারপর তত জোরে ওঠে—এখানেও সেইরূপ হবে। দেখছিস না পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য ওঠবার আর বিলম্ব নাই।'

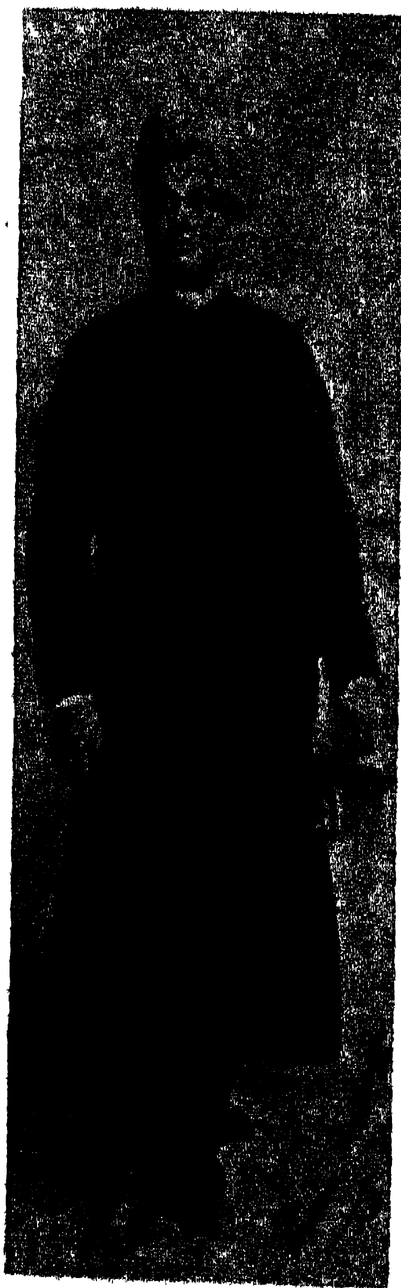
ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, 'যে নিজেকে দুর্বল ভাবে, সে দুর্বল হয়ে যায়। নিজেকে যে শক্তিমান মনে করেছে, সে দুর্ভেদ্য হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।' জাতির জন্য, প্রত্যেকটি মানুষের জন্য স্বামীজীর কণ্ঠে যে বাণী বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হয়েছিল—তাই যেন আমাদের কাছে মন্ত্রস্বরূপ হয়ঃ

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

৩.৪.৯৪

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা



বিবেকানন্দকে চাপরাশ
দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ,
পরিচয়পত্র দিল পাশ্চাত্য। রচিত
হল এক মহাভাষণের পটভূমি।
বিশাল মঞ্চ। বর্ণাঢ্য সভা।
নানাধর্মের প্রতিনিধি। তাঁরা
সকলেই উচ্চারণ করলেন প্রেম
ও করুণার শাশ্বত বাণী। তাঁদের
মধ্যে একমাত্র বিবেকানন্দই খুলে
দিলেন শ্রোতাদের মনের দিগন্ত।
সেদিনের অমৃতবার্তায় সঞ্জীবিত
শিক্ষিতা পাশ্চাত্য নারীসমাজ
সেই প্রফেটকে মুহূর্তে চিনে
নিলেন। তাঁরা বললেন, ইনি হয়
বুদ্ধ, নয় যিশু! সংগ্রামদীর্ণ সেই
দৃপ্ত আলোর তনয়কে স্বাগত
জানিয়ে তাঁরাই দিয়েছিলেন
স্নেহ-মমতা-সহমর্মিতা।
অন্যদিকে তাঁদের জীবনে এল
বেদান্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবমূর্তি

স্বামী ভূতেশানন্দ

ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, একদল ত্যাগী যুবক তাঁর চরণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। এদেশের অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদেরই সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং জগৎকল্যাণে তাঁর অভিনব ভাবপ্রচারের এঁরাই ছিলেন উপযুক্ত যন্ত্রস্বরূপ। সেইসময় অধ্যাত্মশক্তির যে তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছিল তার শীর্ষদেশে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবের যোগ্যতম বার্তাবহ, তাঁর সন্তানদের অগ্রগণ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের মহান ব্যক্তিত্ব বিশ্বের সংস্কৃতিকে বিশিষ্টভাবে সমৃদ্ধ করেছে। জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাঁর অবদান অতুলনীয় বিশেষত মানুষের আধ্যাত্মিক নবজাগরণের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় মনোযোগ। অবশ্য সেই অধ্যাত্ম আদর্শ জীবনের কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না—তা ছিল সমগ্র মানুষকে পরিবর্তিত করার সাধনা।

স্বামীজী ভারতে জন্মেছেন, আমরা তাই সঙ্গত কারণেই গর্ব করতে পারি যে তিনি আমাদেরই ছিলেন। ভারতবাসী মাত্রেই তাঁকে জানে দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ বলে। শুধু অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধার নয়, ভারতকে তিনি এমনভাবে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন যাতে ভাবী ভারত তার অতীত মহিমাকেও অতিক্রম করে যায়। তবে তাঁর কর্মক্ষেত্র শুধু ভারতেই সীমিত ছিল না। তিনি বলেছিলেন, ভারতে যে তিনি জন্মেছেন—এ এক আকস্মিক ঘটনামাত্র। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর ভালবাসা স্বতঃস্ফূর্ত হলেও তাঁর পক্ষে কোনও রকম বিশেষ দেশকালের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকা অসম্ভব ছিল। সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্যই তাঁর আবির্ভাব।

তরুণ শিক্ষার্থিরূপে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্বামীজী উপস্থিত হন, তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী—'নরেন শিক্ষে দিবে।' অনেকেই সেই সময়ে ঐ কথার গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেননি। নরেন্দ্রনাথ তখন কলকাতার ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের অন্যতমমাত্র। তাঁর মধ্যে যে বিশ্বাচার্যের মহান সম্ভাবনা নিহিত সেকথা কেই বা বুঝবে! শ্রীরামকৃষ্ণের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে কিন্তু নরেন্দ্রনাথের ভাবী জীবন উদ্ভাসিত হয়েছিল। সুতরাং

তাঁর অপরিসীম ভালবাসার পাত্র নরেন্দ্রের মহত্ত্বের যথার্থ পরিচয় তাঁর অবিদিত ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের অব্যবহিত পরেই যে অধ্যাত্ম-ভাবান্দোলনের প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত হবে তারই পরিচালনার জন্য যুবক শিষ্যদের মধ্যে বিশেষ করে নরেন্দ্রনাথকে তিনি নেতৃপদে নির্বাচন করেন। শ্রীগুরুর অভিপ্রেত ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য নরেন্দ্রনাথও নিজের জীবন উৎসর্গ করতে কৃতসংকল্প হলেন।

তাঁর অন্তঃকরণ এত মহৎ ছিল যে পরবর্তী কালে তিনি নিজের মুক্তি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির চিন্তাও আর মনে স্থান দেননি। একসময় তিনি বলেছিলেন, যতক্ষণ না জগতের প্রতিটি মানুষ মুক্ত হয়, ততক্ষণ তিনি নিজের মুক্তিও কামনা করেন না।

স্বামীজীর জীবৎকাল ছিল সীমিত। স্থূলশরীরে তিনি পূর্ণ চল্লিশ বছরও ছিলেন না। ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যে শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য যা দিয়ে গেছেন—আমরা তা ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছি। তাঁর মহত্ত্বের কোনও প্রান্তই এখনও স্পর্শ করতে পারিনি। তাঁর অভিনব বার্তা কীভাবে বর্তমান পরিস্থিতিকে সমুন্নত এবং মানুষের জীবনকে অর্থবহ করতে চলেছে—সে সম্বন্ধেও আমরা এখনও সম্পূর্ণ অবহিত নই। বিশ্বের দিগন্তে সেই জ্যোতিষ্মান্ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করবে আগামী শতক।

জীবনের প্রথমপর্বে স্বামীজী ছিলেন ব্যাকুল জিজ্ঞাসু—চারপাশে সবকিছু সম্পর্কেই তিনি আগ্রহী ছিলেন। জগতকে গভীরভাবে জানতে ও বুঝতে চাইতেন। সেই তীব্র সত্যানুসন্ধিৎসা কখনও কখনও তাঁকে অন্যের অপ্রিয় করে তুলত। আবার অনেকেই এই যুবককে উদ্ধত ভেবে পছন্দ করতেন না। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই বুঝেছিলেন, তেজস্বী নরেন্দ্রনাথের আপাত অহঙ্কারের অন্তরালে কোন গভীর জিজ্ঞাসা আছে। জ্ঞানস্পৃহা ছিল স্বামীজীর সহজাত। শ্রীরামকৃষ্ণকেও তিনি নানা বিষয়ে বারবার প্রশ্ন করতেন। বিরক্ত না হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বরং তাঁকে ঐ ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন যাতে তিনি কোনও বস্তুকে সত্য বলে গ্রহণ করার আগে যাচাই করে নেন।

স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম পর্যায়ে বিশদভাবে শিক্ষাদানে অগ্রসর হননি। কারণ তিনি জানতেন, তাঁর প্রিয়শিষ্যের অন্তরে সঞ্চিত আছে অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার—তিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানঘনমূর্তি। স্বামীজীও ধীরে ধীরে নিজের শক্তি এবং ভাবী কালে তাঁর যে বিরাট ভূমিকা সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছিলেন। তবে একথাও বলতে হবে—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যকে দিয়ে নানাপ্রকার কঠোর তপশ্চর্যা ও গভীর অধ্যাত্মসাধনা করিয়ে নিয়েছিলেন। এই সাধনার বিষয়ে তিনি শিষ্যের প্রতি উত্তম বৈদ্যের মতই কঠোর ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ চাইতেন যে মহান আদর্শ তিনি জগতের কল্যাণের জন্য রেখে যাবেন, নরেন্দ্রনাথ তা জগদ্ধিতায় বিতরণ করার আগে নিজে যোগ্যতা অর্জন করুক। যতদিন গুরু স্থূলদেহে ছিলেন, শিষ্য প্রতিপদেই তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছেন। ক্রমে শ্রীগুরুপ্রদত্ত মহান কর্তব্য সম্পাদনকেই নরেন্দ্র জীবনের ব্রতরূপে অঙ্গীকার করেন। শুধু নিজেই নয়, গুরুভাইদেরও তিনি ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত ও একত্রিত করতে অগ্রসর হন। এইভাবে আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে ভিত্তি করে তিনি গড়ে তুললেন এক বিরাট সংঘ।

জগতে জানবার বিষয় অসংখ্য। সেই বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পথে শিক্ষকতাকে অন্যতম সহায়রূপে গণ্য করা যায়। স্বামীজী শিক্ষার এক অভিনব ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর

মতে শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতা সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে দেওয়া। তাই শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করে বললেনঃ 'শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।' প্রতিটি মানুষ পূর্ণ; কিন্তু সেই পূর্ণতা সম্বন্ধে সে সচেতন নয়। শিক্ষকের কাজ ছাত্রকে তার অন্তর্নিহিত পূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। সাধারণ শিক্ষকের ধারণা, ছাত্রের মনটি যেন সাদা কাগজের মতো—যার ওপর শিক্ষক যা উপযুক্ত মনে করেন, লিখে দেবেন। অথবা ভাবেন, ছাত্রেরা মাটির তাল যাদের তিনি মনের মতন আকার দিতে পারেন। এটাই অধিকাংশ মানুষের ধারণা। স্বামীজী কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত আছে। শিক্ষকের কাজ হল শিশুটি যাতে আপন অন্তরের সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে তার পথ সুগম করে দেওয়া। স্বামীজী-সমর্থিত বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গির এটাই মূলকথা। তিনি বলেছেনঃ 'যাতে চরিত্রগঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে—এইরকম শিক্ষা চাই।' তিনি আরও বলেছেনঃ 'মাথায় কতগুলি তথ্য ভরে দেওয়ার নাম শিক্ষা নয় যা আয়ত্ত না হয়ে সারাজীবন অসম্বদ্ধভাবে মাথার মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে।' শিক্ষকই ছাত্রকে সব শিখিয়ে দেবে—এই গতানুগতিক চিন্তাধারা থেকে স্বামীজীর ভাবনা কত পৃথক ছিল, উপরি-উক্ত আলোচনা থেকেই তা সুস্পষ্ট হয়। স্বামীজী যে সমগ্র মানবজাতির আচার্য—এ বিষয়ে তিনি নিজেও হয়তো সর্বদা সচেতন থাকতেন না। কিন্তু যেখানেই তিনি গিয়েছেন, মানুষ তাঁকে আচার্যরূপেই বরণ করে নিয়েছে। মানুষ তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে অসীম জ্ঞানের ঐশ্বর্য, ভগবদুপলব্ধি-সঞ্জাত প্রজ্ঞার দিব্য প্রকাশ। তাঁর সারাজীবন সেই পরম সত্যের প্রচারেই উৎসর্গীকৃত, যে সত্যকে জানলে সবই জানা হয়, সকল সমস্যার সমাধান ঘটে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের মতো স্বামীজীও সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণকালে তিনি যেমন রাজপ্রাসাদে রাজারাজড়াদের সংস্পর্শে আসেন, তেমনি পরিচিত হন কুটিরবাসী দীনদরিদ্রের সঙ্গে। ভারতের জনজীবনকে তিনি গভীরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছিলেন, কয়েকটি বিচিত্র প্রথা, বদ্ধমূল কতকগুলি ধারণা কীভাবে তাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছে। এদেশের দুর্দশার কারণগুলি নিয়েও তিনি চিন্তাভাবনা করেন। তাঁর ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হয় জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির চিত্র। সুদূর দাক্ষিণাত্যের শেষপ্রান্তে কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডে বসে তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিলেন। তখন ধীরে ধীরে তাঁর সম্মুখে ভেসে উঠেছিল ভারতবর্ষের অতীত মহিমা, বর্তমান অবনতি ও আগামী দিনের গৌরবোজ্জ্বল দৃশ্য। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, ভারতের পুনর্গঠনের কাজটি সম্পন্ন করবেন ত্যাগব্রতধারী সন্ন্যাসীরা এবং আরও দেখলেন, ভবিষ্যৎ ভারত তার অতীত মহিমাকে অতিক্রম করে যাবে। কিন্তু কেবলমাত্র সেই পুনরুজ্জীবনের কথা চিন্তা করে এবং পথনির্দেশ দিয়েই তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি কারণ তাঁর গুরু চেয়েছিলেন, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করবেন। তাঁর মহান হৃদয়বত্তা ও গভীর সহানুভূতি তাঁকে কোনও ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে দেয়নি। সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতাকে তা অতিক্রম করে গিয়েছিল। দেশপ্রেমও তাঁর দৃষ্টিকে সঙ্কুচিত করেনি। ভারতের দুঃখ যেমন তাঁকে বিচলিত করেছে, তেমনি পীড়িত

করেছে জগতের অন্যত্র মানুষের দুঃখ। তাই সমগ্র জগৎই হয়েছিল তাঁর সেবার ক্ষেত্র।

সেইজন্যই সাগর পেরিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন অপর এক মহাদেশে। শিকাগো ধর্মমহাসভায় সমগ্র জগতের সামনে হিন্দুধর্মের যথার্থ পরিচয় উপস্থাপিত করার অভিপ্রায়ে তাঁর আমেরিকা যাত্রা। সেদেশে কাউকে তিনি চিনতেন না। প্রথমদিকে আহার ও আশ্রয়ের কোনও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় নিঃসম্বল সাধুর মতনই তাঁকে দিন কাটাতে হয়। পরে তিনি বহু মানুষের সান্নিধ্যে এলেন, দেখলেন আমেরিকার জনসংঘকে। ওদেশের বিখ্যাত বহু মনীষী ও বিদ্বৎসমাজের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল। ধর্মবিষয়ে তাঁদের ধারণা ও মতামত সম্বন্ধেও তিনি অবহিত হলেন। এইভাবে তাঁর চোখের সামনে উন্মোচিত হল সমগ্র মানবজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র, একটি সমন্বিত রূপ।

ইতিহাসের মনোযোগী ছাত্র হিসাবে নরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং আমেরিকায় যাবার পর, সেদেশের অগাধ অর্থ ও প্রাচুর্যের পাশাপাশি নিজের দেশের শোচনীয় দারিদ্র্যের তুলনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে গরিব দেশ কিন্তু তার দারিদ্র্য আর্থিক। অপরদিকে পাশ্চাত্য দেশ ঐহিক উন্নতির শীর্ষে অবস্থিত হলেও, সেখানে আধ্যাত্মিকতার একান্ত অভাব। তিনি অনুভব করলেন শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎই তাঁর সেবাধর্মের ক্ষেত্র। ঐ সময় নিখিল মানবসমাজের জন্য এক বিশেষ বাণী তাঁর মনে নির্দিষ্ট রূপ নিতে শুরু করে। তিনি বুঝলেন, জগতের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য সেই বিশেষ বাণী বিতরণই তাঁর ব্রত এবং ঐ মহাব্রত সাধনের উদ্দেশ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে রেখে গেছেন। এরপর প্রবল আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি উচ্চারণ করলেনঃ 'বুদ্ধের যেমন প্রাচ্যের জন্য, তেমনি আমার পাশ্চাত্যের জন্য একটি বিশেষ বাণী আছে।' বাস্তবিক তাঁর একটি বাণী জগতের জন্য ছিল। কিন্তু তার প্রচারের জন্য তাঁর সময় ছিল খুবই অল্প।

এভাবেই তাঁর ভাবী কার্যক্রমের সূত্রপাত হল। যেখানেই তিনি গেছেন, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের ঘোষণা করেছেন। নিজেই লিখেছেনঃ 'বস্তুত আমার আদর্শকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা চলে যে মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণীপ্রচার এবং প্রতিকার্যে সেই দেবত্ববিকাশের পন্থানির্ধারণ।' শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। স্বামীজীর মতো আর কেউ সে শিক্ষার তাৎপর্য এত গভীরভাবে তলিয়ে দেখেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ ভগবানকে মাটির প্রতিমা, কাঠের প্রতিমায় পূজা করা যায়, আর মানুষের মধ্যে করা যায় না? মানুষেই তো তাঁর সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রকাশ। এই অভিনব বার্তা স্বামীজী তাঁর অন্তরে দীর্ঘদিন পোষণ করেছিলেন এবং পরবর্তী কালে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সেই বাণী ছড়িয়ে দেন।

তাঁর দৃষ্টিতে মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে কোনও সত্যকার বৈষম্য নেই। সকলেই সমান। সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়—সেই এক ঐশী সত্তাই সর্বত্র ওতপ্রোত। তবে বিভিন্ন স্থানে মানবদেবতার পুজোপচার ভিন্নপ্রকার। ভারত দরিদ্র সুতরাং তার শিক্ষা এবং জাগতিক অভ্যুদয় প্রয়োজন। সর্বত্র শিক্ষার বিস্তার কাম্য। তিনি দেখেছিলেন ঐতিহ্যময় প্রাচীন ভারত তখন গভীর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। কুসংস্কার ও অজ্ঞতার নিগড় থেকে মানুষের মনগুলিকে অবিলম্বে মুক্ত করা প্রয়োজন। পাশ্চাত্যে ঐহিক সমৃদ্ধি আছে কিন্তু আধ্যাত্মিকতার

একান্ত অভাব। সেখানে কায়িক শ্রমের মূল্য আছে কিন্তু অন্তর্নিহিত দেবত্বের কোনও মূল্য নেই। সামাজিক আইনকানুনের প্রতি তাদের তীক্ষ্ণ নজর—আমেরিকা প্রথম থেকেই মানুষের জাগতিক সুখসুবিধার প্রতি সচেতন সমাজহিতৈষী রাষ্ট্র। কিন্তু সেদেশ মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখতে শেখেনি। তাই অজ্ঞান থেকে মুক্তির জন্য মানুষের যে সাহায্য প্রয়োজন—এ তত্ত্বও তাদের অজ্ঞাত।

স্বামীজী চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যভাবের মিলনে একটা নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠুক। দুটি সংস্কৃতির মিলনই শুধু কাম্য নয়, পরস্পর সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার সৃষ্টি হোক যাতে উভয়ে ঐক্যবদ্ধ শক্তিপ্রয়োগে জাগতিক অভ্যুদয়ের সঙ্গে সর্বত্র আধ্যাত্মিক উন্নতি আনতে পারে। স্বামীজীর এই প্রজ্ঞাদৃষ্টিই তাঁকে বিশ্বাচার্যে পরিণত করেছে। স্বামীজী বেদান্তের শিক্ষার উপরেই তাই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন কারণ বেদান্তশাস্ত্র মানুষের দেবত্বের কথা, জীবে-জীবে একাত্মতার কথাই ঘোষণা করে।

বেদান্ত বলতে স্বামীজী পণ্ডিতদের কূটতর্কযুক্তির বিষয়কে বোঝাননি। মানবসমাজের সামগ্রিক গঠনে সেই বেদান্তের কোনও ভূমিকা নেই। স্বামীজী প্রচার করেছিলেন, কার্যে পরিণত বেদান্তের বাণী। আত্মা যদি সর্বব্যাপী এবং সকলেই যদি স্বরূপত ব্রহ্ম তাহলে ব্যবহারিক জগতেও সে ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে যাতে মানুষের মন ক্রমে সেই একাত্মানুভূতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্বামীজী বলেছেন, বেদান্ত প্রচারের দ্বারা এদেশে ও অন্যান্য দেশে যথেষ্ট লোকহিতকর কাজের প্রবর্তন করা যায়। এদেশে এবং অন্যত্র সমগ্র মানবজাতির দুঃখমোচন ও উন্নতিবিধানের জন্য পরমাত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বত্র সমভাবে অবস্থিতিরূপ অপূর্ব তত্ত্ব প্রচার করতে হবে। এই তত্ত্ব বেদেই সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয় কিন্তু স্বামীজীর মতন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়নের উপর আর কেউ এমনভাবে গুরুত্ব দেননি। এই আদর্শে যদি আমরা যথার্থই উদ্বুদ্ধ হই তবে সমগ্র বিশ্বেই বিরাট পরিবর্তন আসবে।

বাস্তবিক আমরা যতদিন আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকব, ততদিনই নিজেদের দৈবী সত্তাকে অনুভব করতে পারব না এবং মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, দেশে-দেশে বিভেদের প্রাচীরকে দৃঢ়তর করে তুলব। এই বৈষম্যবোধ থেকেই পরস্পরের মধ্যে যত দ্বেষদ্বন্দ্ব ও বিবাদের সূত্রপাত—আর এই কারণেই সুস্থ মানুষের পক্ষে এই পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। স্বামীজী এসেছিলেন এই বিভেদ-বৈষম্যের অবসান ঘটাতে। কেবলমাত্র বুদ্ধি বা তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা তা সম্ভব হবে না। স্বামীজী কার্যে-পরিণত বেদান্তের মাধ্যমে এই ভেদবুদ্ধি দূর করতে চেয়েছিলেন।

পরস্পরের এই বৈরিভাব বুদ্ধির মারপ্যাঁচ, উচ্চ দার্শনিক আলোচনা এবং আইনসম্মত সমিতি গড়েও দূর করা যাবে না। রোগটা মনের ; মনটাই অজ্ঞান ও দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে নিজেদের আমরা ভুলিয়ে রাখলেও কোনদিনই পরস্পরের প্রতি বৈরিভাব থেকে নিষ্কৃতি পাব না। মনরূপ যন্ত্রটিকেই প্রথমে আমাদের পরিমার্জিত করতে হবে। স্বামীজী তাই সাময়িক ভাসাভাসা সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি চাইতেন—'আমূল সংস্কার'। কার্যে-পরিণত বেদান্তের ভাবনাই মনের ঐপ্রকার আমূল

পরিবর্তন আনতে পারে।

এই ছিল স্বামীজীর ভাবাদর্শ। স্বামীজীকে আজ আমাদের লোকশিক্ষক বা আচার্যরূপেই গ্রহণ করতে হবে। কোনও বিশেষ ধর্ম বা গোষ্ঠী তাঁকে নিজের বলে দাবি করতে পারে না। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের চাপরাশ প্রাপ্ত যিনি সমস্ত মানুষেরই আমূল রূপান্তর ঘটাতে এসেছিলেন।

তাঁর স্বপ্নের মানবসমাজে মানুষ হবে ভালবাসায় পরিপূর্ণ, সকলের প্রতি ক্ষমাশীল এবং সহানুভূতিতে আর্দ্র। প্রতিবেশির প্রতি ভালবাসা বা পরস্পরকে মেনে নেওয়াই নয়, অনুভব করতে হবে—সকলের সঙ্গে একাত্মতা।

এই মহান ভাব প্রচারের জন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশকে স্থায়ী করতে তিনি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন, তার আদর্শরূপে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—আত্মার মুক্তি ও জগতের কল্যাণকেই মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করলেন। তাঁর নিজের শিষ্যদের এবং সংঘের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সকলকেই তিনি পরার্থে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁকে আমরা সাধারণ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ্ বা সমাজসেবী—এসবের কোনরূপেই সীমিত করতে পারি না। তিনি ছিলেন এসবের বহু ঊর্ধ্বে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে ঐক্য বিদ্যমান—মানবজাতির আচার্যরূপে তিনি সেই সত্যই ঘোষণা করেন। জগতের ভিতরে সেই সর্বময় রয়েছেন, তাঁকে সর্বত্র দেখে সেবা করাই মূলকথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার তাঁর প্রিয়শিষ্যকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ তুই কি চাস? স্বামীজী বললেনঃ আমি সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলেনঃ বলিস কি রে? এই তুই সবচেয়ে বড় মনে করলি? আমি ভেবেছিলাম তুই একটা বড় মহীরুহ হবি যার তলায় শ্রান্ত পথিকেরা এসে শান্তি পাবে, আশ্রয় ও বিশ্রাম লাভ করবে! তা না হয়ে তুইও নিজের মুক্তি কামনা করছিস?

স্বামীজী এই ভর্ৎসনা জীবনে ভোলেননি। একথার গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে তিনি তিলে-তিলে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন জগতের কল্যাণে। দেশবিদেশে আচার্যের ভূমিকা পালন করে আক্ষরিকভাবে সত্য করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণীকে। বলেছিলেনঃ যতদিন জগতে একজনও বদ্ধ থাকবে, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকবে, আমি নিজের মুক্তি চাই না। আমি বারবার জন্মগ্রহণ করে তাদের কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব।

এই ভাবকেই তিনি শিষ্যপরম্পরায় সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। সনাতন ধর্মের যে আলোকবর্তিকা এবার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রোজ্জ্বল করেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষের মুক্তির পথ দেখাতে তা চির অম্লান হয়ে থাকবে। স্বামীজী তো নিজেই বলেছেনঃ তাঁর কাজ আগামী দেড় হাজার বছর ধরে চলতেই থাকবে।

স্বামীজীর বাণীর এই দিব্য জ্যোতি আমাদের গতিপথকে যুগ-যুগ ধরে আলোকিত করুক, এই প্রার্থনা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজীর 'The Thoughts on Spiritual Life' পুস্তকের অন্তর্গত 'The Ideal of Swami Vivekananda' প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ অদ্বৈত আশ্রমের (কলকাতা) সৌজন্যে মুদ্রিত।

যুগযুগান্তরের মহান ঋষি

প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা

সুপ্রাচীন কাল থেকে সত্যবস্তুর সন্ধান দিয়েছেন সাধক ঋষিকুল। স্বামী বিবেকানন্দের মতেঃ "ঋষিগণই চিরকাল আমাদের সমাজের নেতা। তিনিই ঋষি যিনি ধর্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, যাঁহার নিকট ধর্ম কেবল পুঁথিগত বিদ্যা, বাগ্‌বিতণ্ডা বা তর্কযুক্তি নয়, সাক্ষাৎ উপলব্ধি—অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার। উপনিষদ বলিয়াছেন—এইরূপ ব্যক্তি সাধারণ মানবতুল্য নহেন, তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা। ইহাই ঋষিত্ব। আর এই ঋষিত্বলাভ কোনরূপ দেশ কাল জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে না।"

ভারতের ঋষি-মহর্ষিগণ যে পন্থা অনুসরণ করেছেন তার একমাত্র লক্ষ্য আত্মদর্শন, পরমানন্দপ্রাপ্তি বা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার। মনুষ্যজীবনের এই উচ্চতম তত্ত্বসমূহের অনুসন্ধানে রত থাকায় ভারতবাসীর জীবনদর্শন স্থূল হতে সূক্ষ্মতর বস্তুতে মগ্ন হয়ে যেত সহজেই। ঐসকল বস্তুর চর্চা ও উপলব্ধিসমূহ এদেশের মানুষ নিজ জীবন তথা জাতিগত জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে ধারণা করায় পার্থিব ভোগাকাঙ্ক্ষাকেও অতিক্রম করতে পারত, ভগবৎ-তত্ত্বানুসন্ধান এবং তার উদ্দেশ্যে জীবনধারণ সাধারণ মানুষের বিচারেও পরম লক্ষ্য ও আদর্শ হয়ে দাঁড়াত। এই কারণেই লীলাপ্রসঙ্গকার মন্তব্য করেছেনঃ "ঈশ্বর, আত্মা পরকাল প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুসকলকে ধ্রুব সত্যজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করতে অতি প্রাচীনকাল হতে ভারত নিজ সর্বস্ব নিয়োজিত করেছে।" এই সকল বস্তুতে একান্ত অনুরাগ কোথা থেকে এল ভাবলে দেখা যায় দিব্যগুণ এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষসকলের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে নিয়ত আবির্ভাবের কারণেই এমনটি সম্ভব। প্রত্যেক দেশের সভ্যতা, তার মানসিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক আদর্শ, সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জাতীয় ইতিহাস প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল, ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়।

ভারতবর্ষে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তার মূলমন্ত্র তিনটি—সমন্বয়, সত্যানুসন্ধিৎসা এবং অহিংসা। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের অগণিত তপোবনে, কলকোলাহলপূর্ণ নগরপত্তনে শ্রীভগবানের অপূর্ব মহিমা ছন্দে-গানে, সুললিত স্তবস্তোত্রে কীর্তিত হয়েছে। দিব্যশক্তিসম্পন্ন সাধকগণের সাধনপ্রচেষ্টায় 'সহস্রার পঙ্কজ' এই দেশেই প্রথম বিকশিত হয়। সুদূর অতীতের ছায়াশীতল তপোবনবাসী ঋষিকুল সাধনার গভীরতম রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়ে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' সর্বত্র বিরাজিত চৈতন্যসত্তাকে অনুভব করেছিলেন।

এই নির্গুণ নিরুপাধিক চৈতন্যই চরম ও পরম তত্ত্ব, ঋষিরা যাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ব্রহ্ম'। সেই চরম তত্ত্ব থেকেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়—জীবজগদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম—সগুণ, সোপাধিক, সবিশেষ। সেই কারণেই উপনিষদের কোথাও তাঁকে 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্' 'প্রজ্ঞানমানন্দম্' অথবা 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' বলা হয়েছে আবার কোথাও ব্রহ্মের সগুণ-সর্বব্যাপী ভাবের প্রাধান্য দিয়ে বলা হয়েছে 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্' ইত্যাদি। পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে কখনও এক বৃক্ষস্থ দুটি পাখির সঙ্গে তুলনা করে উভয়েরই সাযুজ্য প্রার্থনা করা হয়েছে, কখনও আবার আত্মা ও ব্রহ্মের অদ্বয় সত্তার উপর প্রাধান্য আরোপ করে বলা হয়েছেঃ 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'সোঽহম্' ইত্যাদি।

বেদ-উপনিষদ যে সকল তত্ত্বকে নির্দেশ করেছে সেগুলি অগণিত হিন্দু দার্শনিকের চিন্তার ফলাফল। দর্শনশাস্ত্র হল তত্ত্ববিজ্ঞান। জাগতিক পদার্থসকলের উৎপত্তি-স্থিতি-ধ্বংস দেখে মনে প্রশ্ন জাগে কোথা হতে এসকলের উদ্ভব হয়, কোথায় বা বিলীন হয়? বিশ্বজগৎসৃষ্টির কারণ কি, ধ্বংসেরই বা হেতু কি? স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে—এই জগতের নিয়ন্তা কে, সৃষ্টিকর্তাই বা কে! নিজেকে—এই দেহ, মন প্রভৃতিকে আশ্রয় করেও মানুষের নানা প্রশ্ন। সেগুলিকে বিশ্লেষণ করতে করতে অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সাক্ষাৎ হয়—এরই নাম তত্ত্ববিজ্ঞান বা দর্শন। মানুষ চায় পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎকার। অথচ তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না ঘটলে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বকে সে কেমন করে ধারণা করবে? আবহমান কাল থেকে মানুষের দার্শনিক জিজ্ঞাসা তাকে উচ্চ থেকে উচ্চতর পথে আকর্ষণ করেছে। ভারতবর্ষে দার্শনিক গবেষণাকে কোনদিন জীবনসাধনা থেকে পৃথক করা হয়নি। জীবনের সকল বিভাগকে সুনিয়ন্ত্রিত ও হৃদয়কে উন্নত আদর্শে অনুপ্রাণিত করে, দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির মলিনতা দূর করে পরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই ভারতীয় দর্শনের উদ্দেশ্য। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, পরম শান্তি অথবা মোক্ষলাভ ভারতবাসীর বিচারে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।

প্রাচীনতা ও বিচারনৈপুণ্যের দিক থেকে সাংখ্যদর্শন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করে সাংখ্যদার্শনিকগণ দুইজাতীয় তত্ত্বকে মেনে নিয়েছেন। জড় প্রকৃতি ও চেতন পুরুষ। জড়ের স্বভাব বিকার, পরিণাম ও ক্রিয়া। চেতনের কোনও বিকার, পরিণাম বা কার্য হয় না। নির্বিকার 'পুরুষে'র সান্নিধ্যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে বিকার-পরিণামাদি হতে থাকে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে রাগদ্বেষমোহরূপ দোষ বিনষ্ট হয়। জড় প্রকৃতিসম্ভূত শরীর-ইন্দ্রিয়-মন প্রভৃতিতে অহং মমত্বাভিমান দূর হয় এবং জন্মের হেতু কর্ম ও কর্মফল নষ্ট হয়। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ জ্ঞানেই মুক্তি।

বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। বেদান্ত বেদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত—বেদেরই মননশাস্ত্র। বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য, সনাতন সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে হিন্দুধর্মও সনাতন। বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদে জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্পর্কে ঋষিদের অনুভূতির কথা ধরা আছে। অদ্বৈত বেদান্ত মতে জীব, জগৎ ব্রহ্ম হতে পৃথক নয় অথচ এক অনন্যসাধারণ শক্তি তাঁতে নিত্য বিদ্যমান থাকার দরুন তিনি জটিলতাময় বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে নিজেকে প্রকট করেন। এই অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিই মায়া। জীব যেহেতু ব্রহ্ম থেকে স্বরূপত অভিন্ন সেজন্য এই স্বরূপ জ্ঞান হলেই জীবের মুক্তি। স্বরূপের অজ্ঞানতা থেকেই জীবের অজ্ঞান ও বন্ধন।

কালক্রমে এই বেদ-বেদান্তকে কেন্দ্র করে ভারতের মহর্ষিগণ অন্তর্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অন্বেষণে অগ্রসর হয়েছেন এবং জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা সাধারণ মানুষের অনুসরণযোগ্য এক-একটি সহজ সরল পথের নির্দেশ করেছেন। জীবকে শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে সেগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ পন্থা। রুচির বিচিত্রতাহেতু বিভিন্ন পথে চললেও সকলেই শেষ পর্যন্ত সরিতের সাগরে মিলনের মতো পরমেশ্বরে মিলিত হবে। বেদ জাতীয় সংগঠনকে ধর্মের অঙ্গ করে নেয়নি কিন্তু সামাজিকক্ষেত্রে সংগঠনকে অনিবার্যরূপেই দেখেছে। তাই বৈদিক ঋষিকণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছে ঐক্য ও পরস্পর সম্প্রীতির প্রার্থনাঃ ‘সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।’

ধর্মসংস্থাপক আচার্যগণ যুগে যুগে ঋষি, আপ্ত, অধিকারিরূপে চিহ্নিত। অতীন্দ্রিয় বস্তুর সাক্ষাৎকারহেতু তাঁদের মধ্যে অসাধারণ শক্তির স্ফুরণ দেখা যায়। আমাদের শাস্ত্রকারগণ এইসকল অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষদের ‘প্রকৃতিলীন’ বা ‘আধিকাবিক পুরুষ’ নামে অভিহিত করেছেন। পবিত্রতা, পরম জ্ঞান, সংযমাদিগুণে ভূষিত এই মহান পুরুষে লোককল্যাণবাসনা তীব্ররূপে জাগরূক থাকে। ঐ বাসনা সর্বশক্তিময়ী প্রকৃতির অঙ্গে লীন হয়ে প্রকৃতির শক্তিকে নিজ শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করে। লোককল্যাণরূপ বাসনা সমাপনান্তে তাঁরা স্বস্বরূপে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন।

দার্শনিকযুগের অন্তে ভারতে ভক্তিযুগের আবির্ভাব। সকল ব্যক্তির সমষ্টিভূত এক বিরাট ব্যক্তিত্ববান ঈশ্বর সম্বন্ধে এই সময়েই মানুষের ধারণা দৃঢ় হয়। এই ভাব থেকেই ক্রমে অবতারবাদের সৃষ্টি।

ভারতে গুরুর উপাসনা, গুরুর ভজনাও এক বিশেষ ধারা। জ্ঞানদাতা আচার্য গুরুই মানুষের পথপ্রদর্শক। বিশেষ করে যাঁরা ঐশী শক্তির আকর্ষণকে পরম করুণাময় ঐশ্বরিক শক্তির ইচ্ছা বলে মনে করেন তাঁরা যথার্থ আচার্য বা গুরুর অহেতুক করুণায় গভীর বিশ্বাসবান হন। স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতিতে অবতার পুরুষসকলের যে দিব্যকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে সেখানেও দেখি, পরম কারুণিক আচার্যরূপেই তিনি জীবজগতের মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত আবির্ভূত।

ভারতবর্ষের পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতে উল্লিখিত ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখা যায় এদেশে মহৎ ব্যক্তির পরিচয় তাঁর মানসিক ও আত্মিক সম্প্রসারণে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনা ছিল বিবর্তন ও সমন্বয়ের ইতিহাস—সে ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণও বটে। একাধিক মহান ব্যক্তিত্বের এই সময় আবির্ভাব হয়—সহসা এমন জ্যোতির্ময় সমাবেশ ইতিহাসেও দুর্লভ। এ সময় ভারতীয় ধর্মচিন্তা বহু বিপরীতমুখী স্রোতে আবর্তসঙ্কুল হয়ে ওঠে আবার এই কালেই উদার সমন্বয়-ভাবনার প্রসার ঘটে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনা থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত ভারতবর্ষে চরম অরাজক অবস্থা। দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দু শাসনের অবসান ঘটিয়ে দিল্লীর মসনদ অধিকার করেছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুঘল বাদশাহ, ক্রমে সেই মুসলমান রাজত্ব বংশপরম্পরায় প্রায় সমগ্র ভারতে প্রসারলাভ করে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়লে দেশ জুড়ে ঈর্ষা-দ্বেষ, রাজ্যে রাজ্যে অন্তঃকলহ, নানা দ্বন্দ্ব ও সমস্যা দেখা দিল। ভারতবর্ষের এই আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার

পূর্ণ সুযোগ নিল সদ্য আগত বিদেশী বণিকগোষ্ঠী এবং ধর্মপ্রচারকেরা। এদেশে ইংরেজ শাসনের অব্যবহিত প্রাক্ ও পরবর্তী যুগে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রকে একপ্রকার জড়তা যেন নিশ্চল করে রেখেছিল। শুধু নগরজীবন নয়, পল্লীসমাজও এর প্রভাবমুক্ত ছিল না। মানুষের জীবন ও মতামতের স্বাধীন মূল্য না থাকায় পল্লীবাসীরাও কুসংস্কার ও প্রাচীন বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রসার মানুষের স্বাধীনচেতনার উন্মেষ ঘটায়। সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভূমিকাও স্পষ্ট হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ভাবপ্রবণ বাঙালীর চিত্তে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাব উগ্ররূপে প্রকাশিত হয়। একশ্রেণীর শিক্ষিত নব্য যুবকদের দৃষ্টিতে হিন্দুর শাস্ত্রসাধনা, অধ্যাত্মদর্শন তখন উপেক্ষিত। স্বদেশের ঐশ্বর্য—তার মহান সংস্কৃতি সম্পর্কে এরা সন্দিহান। সংকীর্ণতা, কপটতা, ধর্মের নামে বহু অশুভ আচরণ সমাজজীবনকে তখন আচ্ছন্ন করে। শিক্ষিত যুবকেরা এই গ্লানিযুক্ত ধর্মকে গ্রহণ করতে না পেরে নাস্তিক হয়ে উঠল। ভ্রান্ত সমাজদর্শনের প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে বহু যুবক খ্রীস্টান ধর্ম ও আচার-ব্যবহারকে মুক্তির দিশারী জ্ঞান করল।

এই প্রচণ্ড অবক্ষয়ের যুগে প্রতিবাদ এসেছিল রাজা রামমোহনের মতো কিছু উন্নতমনা মানুষের পক্ষ থেকে। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজ নামে খ্যাতিলাভ করে। দেশ ও সমাজে মানুষের কর্তব্যপরায়ণতার ধারা প্রবর্তনে ব্রাহ্মসমাজের অবদান অল্প নয়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষাদীক্ষাও পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত ছিল না। একইসময় দয়ানন্দ সরস্বতী বিশুদ্ধ ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে জাতি ও সমাজকে সুগঠিত করতে সচেষ্ট হন এবং বৈদিক ধর্মাচরণের পুনঃপ্রবর্তনেরও উদ্যোগ করেন। দেশের সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে আর্যসমাজ বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। শিক্ষা, ধর্মনীতি ইত্যাদি ব্যাপারে আর্যসমাজের অবদানও প্রভূত। কিন্তু সমগ্র জাতির সার্বিক জাগরণ কয়েকটি সংস্কার আন্দোলন, কয়েকজন মনস্বীর ইতস্তত ভ্রমশোধনের চেষ্টায় ঘটতে পারে না—নতুন আলোকসম্পাত বিনা ঋষিপ্রবর্তিত সনাতন ধর্মের শৌর্য, বীর্য, সত্য, প্রেম, পবিত্রতার পুনর্জাগরণ অসম্ভব। শতাব্দীর বিষবাষ্পে মানুষ যখন মুহ্যমান তখনই অমৃতপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য আবির্ভাব। আপন ত্যাগে প্রেমে, আপন সাধনায় অধর্মের প্লাবন তিনি রোধ করলেন। আপন আদর্শে মৃত সমাজের বুকে প্রাণের স্পন্দন জাগালেন, পতিত দুঃস্থ অসহায়কে করুণায় আশ্রয় দিলেন। বাংলায় আবার নতুন ভাবের, নতুন চিন্তার ধারা বইল, যে ধারা প্রসারিত হল ভারত তথা বিশ্বে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর কিছুই ছিল না। তবুও তাঁর অলৌকিক মেধা, অসামান্য ধারণাশক্তি থাকায় তিনি শ্রুতিধর। গৃহস্থ হয়েও তিনি সন্ন্যাসী, এক বিবাহিত ব্রহ্মচারী, নিরক্ষর মহাজ্ঞানী, দরিদ্র ব্রাহ্মণ পূজারী অথচ রানী রাসমণি ও তাঁর জামাতা প্রবলপ্রতাপ মথুরানাথের পরম আশ্রয়। তাঁর অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে বিশেষ ছিল নির্ভীক ভাব, অচল সত্যনিষ্ঠা, অকপট সরলতা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি। সকলের প্রতি সেই উদারহৃদয় প্রেমে পূর্ণ। দরিদ্রসন্তান ছিলেন কিন্তু কারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তাঁর এই আদর্শ ও সহজাত শিক্ষা সঙ্গীদের প্রভাবিত করত। উত্তরকালে এই লোকোত্তর মহাপুরুষের মধ্যে বিষয়ের

প্রতি তীব্র অনাসক্তি দেখা দেয়। ঘটনাক্রমে কলকাতার সমাজজীবনে ধর্মকে আশ্রয় করে যখন বিরোধী বিচিত্র মতবাদের প্রচার ও প্রসার ঘটছিল, সেই সময় শহরের উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির নবনির্মিত মন্দিরে তিনি নিষ্ঠাবান পূজক। মন্দির-সংলগ্ন তপোবন সদৃশ পঞ্চবটী, বেলতলা, গঙ্গাতীরবর্তী গভীর জঙ্গল তাঁর সাধনভূমি। আত্মানুসন্ধান ও কঠোর ভগবৎসাধনায় একাগ্র তাঁর মন। মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননীর দিব্যদর্শনলাভের পর ঐশী প্রেরণায় পরম নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে প্রচলিত প্রতিটি ধর্মপথ আশ্রয়ে সাধন করে তিনি এক অভিন্ন পরম সত্যকেই প্রাপ্ত হন। তাঁর আগমনের পূর্বে দেশজুড়ে ধর্ম ও ধর্মাচরণের প্রতি যে অবজ্ঞা ও অনাস্থা জেগেছিল, এখন নিজে সাধন করে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে সে সমস্ত ধর্মপথই সত্য। নানা মত ও পথ হলেও সকলকে পৌঁছতে হবে একই জায়গায়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্মের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয় অথবা দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈতের মধ্যে কোন দর্শন আশ্রয় করা কর্তব্য ইত্যাদি নানা প্রশ্ন বা সংশয়ের তিনি অবসান ঘটালেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন জীবন্ত গীতা, নিষ্কাম কর্মসন্ন্যাসের পথপ্রদর্শক—জ্ঞান, ভক্তি, কর্মের ত্রিবেণীসঙ্গম।

ঋষি প্রবর্তিত সনাতন ধর্মের সারসত্য সমাধিবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনে স্বতঃপ্রকাশ লাভ করায় চারপাশের মানুষ তাঁর অনুভূতি ও জীবনদর্শনকে অস্বীকার করতে পারল না। ধীরে ধীরে তাঁর খ্যাতি কেশবচন্দ্র সেনের মতো ধর্মনেতা ও প্রবক্তাদেরও আকৃষ্ট করতে লাগল। দক্ষিণেশ্বরের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তখন অবিরাম লোকসমাগম, উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ, ভাব-ভক্তি-সমাধির সে এক দিব্য বাতাবরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাগত ভক্ত ও জিজ্ঞাসুদের কাছে স্বভাবসিদ্ধ সহজভঙ্গিতে সরল ভাষায় জটিল ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যেতেন—তাঁর উপলব্ধ সত্যসকল এমনই অনুভবসিদ্ধ যে তিনি যেভাবেই তা ব্যক্ত করুন না কেন, সকলের মনকেই তা অল্পবিস্তর নাড়া দিয়ে যেত। ময়ূরকে নিত্য আফিম খাওয়ার অভ্যাস করানোর মতো তাঁর আলোচনাকালে শিক্ষিত যুবক ও ধর্মপিপাসুরা নিয়মিত কী এক দিব্য আকর্ষণে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতেন। সময়ে সময়ে ভক্তদের আকর্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণ তখনকার উত্তর কলকাতার বনেদী শিক্ষিত পরিবারেও একধিকবার আগমন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই অবারিত দ্বার। নিঃসঙ্কোচে তাঁর সান্নিধ্যে আসা যেত, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ থেকে শুরু করে সামাজিক আলোচনা—হাস্য-পরিহাস কিছুরই সেখানে অপ্রতুলতা ছিল না। কিন্তু সকল আলাপ-আলোচনা ও উচ্চ অধ্যাত্মপ্রসঙ্গের মূল সুরটি ছিল, 'ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। ঈশ্বরদর্শনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুরুত্ব ও প্রভাব ক্রমে ভারতবর্ষের সামগ্রিক জীবনদর্শনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হল, ভারত তথা বিশ্বের মহা মহা পণ্ডিতজনেরাও তাঁর উদার ও গভীর অনুভূতিকে এযুগের পক্ষে পরম মহৌষধ, সঞ্জীবনী শক্তিরূপে গ্রহণ করল। তাঁর উক্তি 'জীবই শিব' তৎকালীন সংসারবিরাগী সাধুদের সাধন-ধারায় নিয়ে এল বিরাট এক পরিবর্তন। শুধু নিজের মুক্তি নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শও সাধুসমাজে আদৃত হল, বর্তমানে এই আদর্শ ভারতবর্ষের প্রায় সকল আধ্যাত্মিক সংঘ গ্রহণ করেছে। এভাবেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর নবজাগরণের প্রধান ধারাই ছিল তার ধর্মান্দোলন। বাংলার তথা

ভারতের ধর্মাকাশে তখন উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি উদিত হয় যার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বরেণ্য সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ যেন জ্যোতির্ময় সূর্য। ঐসময় সদ্বংশজাত বেশ কিছু যুবক কলকাতা ও দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে তখন বিদ্যালয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ভবিষ্যতে তাঁরাই চিহ্নিত ত্যাগিসন্তানরূপে দেশ ও বিদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের উন্নত ও লোকহিতকর ভাব প্রচার করেন। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই যুবক ভক্তদের মধ্যে প্রধান।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে কোন অসাধারণ পুরুষকে অবলম্বন করে তাঁর যুগধর্ম প্রচার করেছিলেন সে-ও এক নজিরবিহীন ইতিহাস।

নরেন্দ্রনাথ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অসাধারণ তাঁর প্রতিভা, নেতৃত্বশক্তি, আত্মনির্ভরশীলতা, সাহস, ধৈর্য এবং প্রচ্ছন্ন অধ্যাত্মপ্রবণতা। নরেন্দ্রের সর্বতোমুখী শক্তি যুগপৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশিত হত। ব্রাহ্মসমাজেও তাঁর যাতায়াত ছিল। সুগায়ক হওয়াতে সেখানে সকলেই তাঁকে চিনতেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁর বিশেষ অধিকার কিন্তু প্রচলিত ভজন, ব্রহ্মসঙ্গীতও তাঁর ভাবগম্ভীর কণ্ঠে আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। এছাড়া অনন্যসাধারণ ছিল তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে স্বচ্ছন্দে বিচরণকারী এই উন্নতমনা যুবক বন্ধুমহলেও সকলের প্রিয় ছিলেন। নিজে আনন্দে মেতে উঠতেন, অন্যকেও আনন্দ দিতেন। সেই অনাবিল হাস্যপরিহাসের মধ্যে নরেন্দ্র কোনও অবস্থাতেই স্বীয় পবিত্রতা থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর সমবয়সী যুবক বন্ধুরা এই আধ্যাত্মিক তেজস্বিতাকে সমীহ করে চলতেন।

বাল্যকাল হতেই তিনি ধ্যানপ্রবণ ছিলেন। এ বিষয়ে তীব্র আকর্ষণহেতু ছাত্রাবস্থায় মাতামহীর গৃহসংলগ্ন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ তাঁর মনোমত ছিল। সেখানে দিনের বেলায় প্রাণ খুলে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দর্শনচর্চা, গল্পগুজব এবং গানবাজনা করার সুযোগ ছিল। নিশীথে তন্ময় হতেন ঈশ্বরচিন্তায়। ঐ প্রকোষ্ঠের নাম দিয়েছিলেন 'টঙ'। নরেন্দ্রের প্রতি গভীর প্রেমের টানে শ্রীরামকৃষ্ণও কখনও কখনও এই টঙে উপস্থিত হয়েছেন।

ধর্ম নরেন্দ্রের কাছে অপরোক্ষ অনুভূতি ছিল, কেবল কথার কথা নয়। তাই ধনীর সন্তান হয়েও ধর্মভাবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে তিনি কঠোর ব্রহ্মচারীর মতো ভূশয্যায় শয়ন করতেন, বেশভূষার পারিপাট্য বা বিলাসিতা পরিহার করে চলতেন। তাঁর যুক্তিবাদী মনে তখন একটিই প্রশ্ন—ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়! এমন কোনও ব্যক্তি কি আছেন যিনি স্বয়ং ঈশ্বরদর্শন করেছেন! সেকালের কলকাতায় যত ধর্মনেতা ও প্রবক্তা ছিলেন একে একে তাঁদের সকলের কাছেই উপস্থিত হয়ে সরল আন্তরিক প্রশ্ন জানাতেন, ঐ ব্যক্তি স্বয়ং ঈশ্বরদর্শন করেছেন কিনা। একসময় তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করে ঐ একই প্রশ্ন জানান। মহর্ষি উত্তরে নরেন্দ্রনাথের কমলাক্ষের প্রশংসা করে বলেনঃ 'তোমার যোগীর চক্ষু—তুমি ধ্যান কর।' এভাবে ধর্মশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকেও আপন প্রশ্নের উত্তর না পাওয়ায় নরেন্দ্রের হৃদয় ব্যাথাতুর হয়ে উঠত কিন্তু তিনি ঐ একই প্রশ্ন থেকে নিবৃত্ত হতেন না।

কলেজে অধ্যাপনা কালে অধ্যক্ষ হেস্টি সাহেব ঈশ্বরীয় ভাবাবেশ সম্বন্ধে বলেছিলেন যে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পুরোহিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের এইরূপ আবেশ হতে দেখা যায়।

কথাটি কানে শোনা ছিল মাত্র।

ইতিমধ্যে বিবাহ-উপযোগী বয়স হওয়ায় এবং নানা জায়গা হতে পাত্রীপক্ষ সন্ধান করায় পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ঐ বিষয় উত্থাপন করলে নরেন্দ্রনাথ পূর্ণ অসম্মতি জানান। সম্পর্কে আত্মীয় রামচন্দ্র দত্ত তখন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট সদ্য যাতায়াত শুরু করেছেন। তিনি একসময় নরেন্দ্রকে একান্তে নিয়ে গিয়ে বলেনঃ 'যথার্থ ধর্মলাভ করতে সত্যি বাসনা জেগে থাকলে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি জায়গায় না ঘুরে ঠাকুরের নিকট চল।'

প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথও তাঁর গাড়িতে দক্ষিণেশ্বর যাবার আহ্বান জানালেন। অবশেষে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া হল।

পশ্চিমদিকের দরজা দিয়ে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করেন। ঠাকুরের কথাঃ "দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাথার চুল, বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই। বাহিরের কোন পদার্থেই ইতরসাধারণের মতো একটা আঁট নাই সবই যেন তার আলগা এবং দেখিয়া মনে হইল, তাহার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্বদা জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে! দেখিয়া মনে হইল বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভবে!

"মেজেতে মাদুর পাতা ছিল, বসিতে বলিলাম। যেখানে গঙ্গাজলের জালাটি রহিয়াছে তাহার নিকটেই বসিল। তাহার সঙ্গে সেদিন দুই চারিজন আলাপী ছোকরাও আসিয়াছিল। বুঝিলাম, তাহাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত—সাধারণ বিষয়ী লোকের যেমন হয়, ভোগের দিকেই দৃষ্টি।

"গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাঙ্গালা গান সে দুই চারিটি মাত্র তখন শিখিয়াছে।...সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিকেতনে' গানটি ধরিল ও ষোল আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন উহা গাহিতে লাগিল—শুনিয়া আর সামলাইতে পারিলাম না, ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।"

উপরিউক্ত বর্ণনা 'লীলাপ্রসঙ্গ' অনুসারে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের কথা হতে সংগ্রহ করে লেখা। এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথের বর্ণনা আরও সুন্দর আরও মনোগ্রাহী। অন্যদের চোখের অন্তরালে আরও কত প্রেমের বাণী, কত ভালবাসার কথা, কত প্রাণ-মন নিঙড়ানো অপূর্ব অলৌকিক বাণী ঐদিন ঠাকুর গদগদস্বরে তাঁর প্রেমের পাত্রকে শুনিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ তারও আভাস দিয়েছেন। সম্মুখে দণ্ডায়মান অপার্থিব পরম প্রেম, ভক্তি, সরলতা, পবিত্রতা ভগবত্তার মূর্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ। ভালবাসায় যেন উথাল-পাথাল—দরদরধারে অশ্রুবিসর্জন করেছেন—তাঁর বিরহে এতকাল কীভাবে তিনি অপেক্ষা করেছেন, কত আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন, কত দিন-রাত তাঁর জন্য বৃথাই কাটিয়েছেন—বিরহবিধুর প্রাণের বেদনাহত আকুলতা সব বলে চলেছেন। অথচ যাঁকে ঘিরে এই লীলা অভিনয়, সেই যুক্তিবাদী শিক্ষিত যুবক নরেন্দ্র তখনও বুঝতেই পারছেন না কেন তাঁকে এইভাবে সকলের অলক্ষ্যে এত কথা বলা হচ্ছে। এই প্রেমের লীলা সম্বন্ধে নরেন্দ্র তখনও ভাবছেন—এ ব্যক্তি নিশ্চিত উন্মাদ, না হলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র তাঁকে এই ব্যক্তি শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে করজোড়ে প্রার্থনা

করছেন কেন—বার বার কেন বলছেন, জানি আমি প্রভু, তুমি সেই নরোত্তম, নরঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে পুনরায় শরীর ধারণ করেছ! প্রেমিক পাগল কতগুলি প্রসাদ এনে প্রেমাস্পদকে স্বহস্তে খাইয়ে তবে নিরস্ত হলেন। শেষে পুনরায় হাত ধরে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন—আবার একাকী তাঁর কাছে আসতে। তাঁর একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে নরেন্দ্র পুনরাগমনের স্বীকৃতি দিলেন।

এরপর উত্তরের ঢাকা দেওয়া বারান্দা হতে নিজের ঘরে ফিরে শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের সঙ্গে আবার স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে লাগলেন। আর ঐ এক ঘর লোকের সামনেই আহ্লাদে নরেন্দ্রের প্রশংসা করে বললেনঃ 'দেখ দেবী সরস্বতীর জ্ঞানালোকে নরেন কেমন জ্বল জ্বল করছে।' নরেনের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের এসব উক্তি সেদিন অভিনব। ঠাকুর সাগ্রহে আরও জানতে চাইলেনঃ 'তুই কি ঘুমোবার আগে একটা জ্যোতি দেখিস?' নরেন্দ্রের ইতিবাচক প্রত্যুত্তরে আনন্দে বলে উঠলেনঃ 'বাঃ, সব মিলে যাচ্ছে। এ ধ্যানসিদ্ধ—জন্ম থেকেই ধ্যানসিদ্ধ।'

অতঃপর নরেন্দ্র বসে বসে সব লক্ষ্য করছিলেন ঠাকুরের মধ্যে উন্মাদের মতো অস্বাভাবিক কিছুই পেলেন না। বরং তাঁর সদালাপ এবং ভাবসমাধি দেখে বিশ্বাস হল ইনি সত্য সত্যই ঈশ্বরার্থে সর্বস্বত্যাগী, মুখে যা বলছেন—স্বয়ং সবই অনুষ্ঠান করেছেন। শেষে যে প্রশ্ন দিনরাত তাঁকে ব্যাকুল করে ছুটিয়ে বেড়ায় সেই প্রশ্নই করলেনঃ 'আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?' ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেনঃ 'হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরদর্শন করেছি, ঠিক যেমন তোমাদের দেখছি, তবে এর চেয়েও আরো ঘনিষ্ঠরূপে।' তিনি আরও বলতে লাগলেনঃ "ঈশ্বরদর্শন হয়, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা চলে, ঠিক যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু কে তা চায়? লোকে মাগ-ছেলের শোকে বিষয়-আশয়ের দুঃখে ঘটি ঘটি কাঁদে। কিন্তু ভগবানের জন্য কে তা করে? সরলভাবে ভগবানের জন্য কাঁদলে তিনি নিশ্চয়ই দেখা দেন।" প্রথমবারের সাক্ষাৎ এইভাবে সমাপ্ত হল।

দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনের দিনটিতেই এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ব্রতসহায় নরেন্দ্রকে চিনে নিলেন। যুগপ্রয়োজনসাধনের জন্যই অবতারপুরুষের আবির্ভাব ঘটে—ঋষিপ্রবর্তিত সনাতন ধর্মের গতি অধর্ম-অনাচারে যখন অবরুদ্ধপ্রায়, সেই চরম সংশয় ও হতাশার দিনে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, মানবচেতনার নবজাগরণ সাধনই তাঁর ব্রত। সেই মহাব্রতপালনের উপযুক্ত যন্ত্রকেও সপ্রেমে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছেন সপ্তর্ষিমণ্ডলের সমাধিলীন অবস্থা থেকে। এখন শুধু প্রয়োজন নরেন্দ্রকে স্বকার্যসাধনের উপযোগী করে গড়ে তোলা—পৃথিবীতে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করা। মহানুভব গুরু উপযুক্ত শিষ্যকে দেখে আপন জীবনের সাধনাপ্রসূত প্রত্যক্ষ অনুভূতিসকল পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করাবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। প্রথম দিন থেকে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ ঐ প্রেমের আকর্ষণে এক মাসের মধ্যেই ঘটেছিল। এবার একাই এসেছেন। শ্রীঠাকুরও ঘরে একাই ছোট খাটটিতে আনমনে বসেছিলেন—কে জানে হয়তো বা সেই প্রেমের বালকটিকে মনে মনে আকর্ষণ করেছিলেন।

ঐদিন নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সতর্ক থাকা সত্ত্বেও নিকটে এসে নরেন্দ্রের জানুতে দক্ষিণ

পদ স্পর্শ করালেন। তৎক্ষণাৎ ঘর দ্বার যাবতীয় বস্তু নিমেষে ঘুরতে ঘুরতে বিলীন হতে লাগল। নরেন্দ্রনাথ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেনঃ 'ওগো এ তুমি কি করলে গো আমার যে বাপ মা আছে।' উন্মাদ খলখল করে হেসে বুকে হাত বুলিয়ে বললেনঃ 'থাক তবে এখন পরে হবে।' নরেন্দ্রনাথ ঘোর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন—শ্রীঠাকুর বুকে হাত বুলিয়ে একথা বলা মাত্র—পরিস্থিতি পুনরায় আগের মতো হয়ে গেল। নরেন্দ্রনাথ এ অবস্থার কথা বিচার করতে লাগলেন মনে মনে। তাঁর মতো প্রবল মনঃশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে মুহূর্তে এই ব্যক্তি কাদার তালের মতো ভাঙছেন গড়ছেন—কে ইনি?

নরেন্দ্রনাথ ভেবে-চিন্তে কিছুই স্থির করতে না পেরে একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়লেন। তবে দৃঢ়সংকল্প করলেন অদ্ভুত পাগল নিজ প্রভাব যেন তাঁর ওপর আর বিস্তার করতে না পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় দর্শনকালীন এই ঘটনাবলী মনে মনে অহরহ গভীরভাবে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করতে লাগলেন। ঠাকুরের ভালবাসা ও আদরযত্নের যেন আর শেষ নেই। নরেনকে বিদায় দিতে হবে ভেবে ক্ষুণ্ণ মনে 'আবার শীঘ্র আসবে বল' বলে ঠাকুর ধরে বসলেন। সুতরাং এইবারও একপ্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েই নরেন্দ্রকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হল।

তৃতীয়বারের দর্শন কবে হয়েছিল তা স্থির জানা নেই। তবে নরেন্দ্রনাথের নানা প্রশ্ন-আকুল মন যে কিছু স্থিরনিশ্চয় করতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠেছিল তা বোঝা যায়। কাজেই সপ্তাহখানেক পরেই তিনি চলে এসেছিলেন মনে হয়। ঠাকুর সেদিন কালীবাড়ির পাশে যদু মল্লিকের বাগান বাড়িতে বেড়াতে আসেন নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে। গঙ্গার ধারে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছুক্ষণ পাদচারণ ও কথাবার্তার পর বৈঠকখানা ঘরে এসে বসলেন এবং অল্পসময়ের মধ্যেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। নরেন্দ্রনাথ কিছু দূরে বসে আছেন, এমন সময় সহসা ঠাকুর নিকটে এসে স্পর্শ করামাত্র তাঁর সংজ্ঞালোপ হল। এ সময় কি ঘটনা ঘটল তার কিছুমাত্র নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলেন ঠাকুর তাঁর বক্ষে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর মৃদু মধুর হাস্য করছেন।

বাহ্যসংজ্ঞা লোপের পর ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে তাঁর নিজস্ব জিজ্ঞাস্য নানা প্রশ্ন করে যথাযথ উত্তর পাওয়ায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের আসার প্রয়োজন কি, ভবিষ্যতেই বা তাঁর কর্মপ্রবাহ কেমনভাবে চলবে ইত্যাদি সবকিছুর সংবাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন—এমনকি, নরেন্দ্রনাথ যেদিন জানতে পারবে সে কে সেদিন দেহত্যাগ করে চলে যাবে—স্বেচ্ছায়—যোগমার্গে।

'নরেন্দ্রনাথ ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ'—শ্রীঠাকুরের এটি নিজস্ব মত। প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং অবতার এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সীমিত। যুগে যুগে জগতে অজ্ঞান ও আত্মবিস্মৃত মানুষকে জ্ঞান, প্রেম, মনুষ্যত্ব অর্থাৎ পূর্ণ চৈতন্য দান করতেই তো অবতারের আবির্ভাব।

সে কাজ তিনি কেমনভাবে করবেন, কোন পথে সহজে মানুষ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করবে, বর্তমান জগৎ এবং তার ভবিষ্যৎ কেমন হবে, সব তাঁর জ্ঞানের মধ্যে। সেজন্য কেমনভাবে তাঁর ভাবী জগৎ চলবে—কেমন করে মনুষ্যত্ববোধ মানুষকে জাগ্রত করে তুলবে, পরম কারুণিক অবতার পুরুষ অশেষ কষ্ট সহ্য করেও মানুষকে কীভাবে

উজ্জীবিত করবেন—চৈতন্য জাগ্রত করে দেবেন, সেটি তাঁরই নিজস্ব ব্যাপার—নিজস্ব কার্যধারা। অর্থাৎ সত্যবস্তুর অনুসন্ধানে এবং পরমবস্তুর প্রাপ্তিতে বিভোর হওয়ায় মানুষের যে আনন্দ, জীবের শিবত্বলাভে ভগবানের তেমন পরমানন্দ। যেমন সন্তানের নিজ জীবনে শ্রেষ্ঠত্বলাভে আত্মতৃপ্তিতে পিতার মন ভরপুর হয়ে যায়। দুর্বল সন্তানদের ভগবদ্‌লাভের পথে অগ্রসর হতে দেখলে জগৎপিতার কত পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ হয়, তা আমরা অবতারজীবনেই প্রত্যক্ষ করি।

এযুগের মানুষ ধন্য যে পরমপিতা শত কষ্ট সহ্য করেও আমাদের হস্তধারণপূর্বক চরম ও পরম সত্যলাভে অগ্রসর করিয়ে দিতে এসেছিলেন। তাঁর সেই চৈতন্য-উদ্বোধনকারী কর্মযজ্ঞের প্রধান হোতাকে দিয়েই তিনি পরম কর্মসাধনা সম্পন্ন করলেন। ঠাকুর ও স্বামীজীর এই অদ্ভুত লীলার মর্মার্থ অনুধাবন করা সাধারণবুদ্ধিগম্য নয়—তা তাঁদেরই কৃপাসাধ্য—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥'

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণসমূহে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিপ্রসঙ্গ

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

আমেরিকায় শিকাগো শহরে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বিশ্বধর্মমহাসভা আহূত হয়েছিল—বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ একত্রিত হয়ে ধর্ম আলোচনা করবেন এই উদ্দেশ্যে। অবশ্য এই ধর্মমহাসভা যে বিশ্ব কলম্বীয় প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল মানুষের ঐহিক অগ্রগতির একটি সার্বিক চিত্র বিশ্বসমক্ষে উপস্থিত করা। উপলক্ষ ছিল কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চতুঃশতবার্ষিকী পালন। নীলি (Neely) রচিত 'বিশ্বধর্ম সম্মেলনের ইতিহাস' থেকে জানা যায় যে "মানব-সমাজ যে মহৎ বিষয়গুলিতে আগ্রহান্বিত সেগুলি সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপিত করবার জন্য জগতের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিনিধিদের যোগদানের ভাবনাটা প্রথম আসে চার্লস ক্যারল বনির মাথায় ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে।"[১] বনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী এবং বহু সাংবিধানিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের রূপকার। তাঁর কথার সারবত্তা অনুভব করে ১৮৯০ সালে তাঁরই নেতৃত্বে স্থাপিত হয় 'ওয়ার্লডস্ কংগ্রেস অ্যাক্সিলিয়ারী অব কলাম্বিয়ান এক্সপোজিসন।' মোট কুড়িটি বিভিন্ন বিষয়ে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিষয়গুলির মধ্যে ছিল 'নারী প্রগতি', 'সাধারণ সংবাদপত্র', 'বাণিজ্য ও অর্থনীতি', 'সঙ্গীত', 'সরকার ও আইন-সংস্কার' প্রভৃতি। আর "দৈবীবিশ্বাস যেহেতু বৌদ্ধিক ও নৈতিক উন্নতিতে সূর্যালোক বিকিরণকারী,"[২] সেই কারণে ধর্মও এই কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু ধর্মমহাসভায় আর্থিক উন্নতি, দারিদ্র্য ও তার প্রতিকার প্রভৃতি ঐহিক প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই মুখ্য আলোচকের ভূমিকা নিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকের এতে আশ্চর্য বোধ হবে। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে তিনি পাশ্চাত্য থেকে পত্রে জানিয়েছিলেন, স্বদেশের দরিদ্র জনগণের উন্নতির জন্য কিছু করতেই তাঁর ওদেশে যাওয়া।[৩]

একথা সকলেরই জানা যে তাঁর প্রথম ভাষণেই তিনি ধর্মমহাসভাকে জয় করে নিয়েছিলেন তাঁর উদার বিশ্বজনীন ভাবধারার দ্বারা, প্রকৃতপক্ষে সে ভাষণ ছিল চিরন্তন সত্যসমূহের অগ্নিময় উদ্গিরণ। যে সত্য সবকিছুকে আবৃত করে বিরাজমান, তাঁর সেই অগ্নিময় সত্য উদ্গিরণ শ্রোতাদের হৃদয়কেও অগ্নিময় করে তুলেছিল। হ্যারিয়েট মনরো ছিলেন তদানীন্তন আমেরিকার একজন প্রখ্যাত কবি, তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'এ পোয়েটস্

লাইফ'-এ তাঁর ধর্মমহাসভায় যোগদানের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে স্বামীজীর এই ভাষণ-প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "সে যেন মানবেতিহাসের এক পরম মুহূর্ত, সহনশীলতা ও শান্তির প্রতিশ্রুতিময় নবযুগের দিগন্ত উন্মোচন।"[৪] হ্যারিয়েট আরও লিখেছেন ঃ "এঁদের প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে একপ্রান্তে বসেছিলেন মহান বিবেকানন্দ—যিনি ধর্মসম্মেলনের সমগ্র প্রেক্ষাপটই অধিকার করেছিলেন এবং গোটা শহরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আপন প্রভুত্ব।"[৫]

স্বামীজীর এই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাই তাঁর একাধিক শত্রু তৈরি করেছিল। স্বামীজী ইতিহাসের বা দৈবী শক্তির ক্রীড়নক হিসাবে ধর্মমহাসভার যে প্রকৃত উদ্দেশ্য—নূতন পৃথিবীর ভিত্তিস্তম্ভস্বরূপ এক বিশ্বজনীন মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা—তা সম্পন্ন করেছিলেন। দৈবী উদ্দেশ্য যাই থাক খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকদের দ্বারা অধ্যুষিত সংগঠক সমিতির সদস্যদের অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম। তাঁরা চেয়েছিলেন এই ধর্মমহাসভায় খ্রীস্টধর্ম অন্য সকল ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হোক। স্বামীজীর উদার বিশ্বজনীন ধর্মমত যখন শ্রোতৃবৃন্দের নিকট বিপুল অভিনন্দন লাভ করল, তখন তারা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এঁরা স্বামীজীকে নানাভাবে আক্রমণ করে তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন। এমনকি ভদ্রতা বা শালীনতাও তাঁরা এই আক্রমণ কালে বজায় রাখেননি।

ধর্মমহাসভার তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে রেভারেণ্ড স্লেটার যিনি তাঁর একটি গ্রন্থে (গ্রন্থটি ছিল উপনিষদের উপর) মন্তব্য করেন ঃ 'ভারতীয় চিন্তার সর্বোচ্চ পরিণতি বেদান্ত একটি ভ্রান্ত ও জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।' তিনি হিন্দুদের মহান ধর্মগ্রন্থ বেদকে সমালোচনা করে বলেন ঃ "...এমন একটি সূক্তও পাই না যাতে আকৃতি পূরণের দৈব অঙ্গীকার মেলে, ঐশ্বরিক ক্ষমার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি মেলে এবং প্রতিশ্রুতি ক্ষমা ও মিলনের ফলশ্রুতি হিসাবে শান্তি ও পরমার্থলাভের আনন্দময় অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি আছে।" তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত ঃ "বাইবেলই একমাত্র গ্রন্থ যেখানে ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতির সন্ধান পাওয়া যায়। ঈশ্বরকৃপায়, এই গ্রন্থে আছে অগাধ ঐশ্বর্যের অভিব্যক্তি—তাই এই গ্রন্থ অতুলনীয়।"[৬]

চতুর্থ দিবসে রেভারেণ্ড কুক, যিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় বক্তা, তাঁর ভাষণে হিন্দুধর্মসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি এমন বিষোদ্গার করেন যে 'শিকাগো ট্রিবিউন' নামক পত্রিকা তার প্রতিবেদনে লেখে ঃ 'রেভারেণ্ড কুকের তিনশ পাউণ্ড ওজনের ধর্মান্ধতার দাপটে মঞ্চ কেঁপে ওঠে।'[৭] এই রেভারেণ্ড কুকই দশ বৎসর পূর্বে ভারতে এসেছিলেন এবং কেশব সেনের সঙ্গে জাহাজে করে গঙ্গাবক্ষে বেড়াবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, কেশব দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুরকে জাহাজে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার তাঁর ধর্মীয় মতবাদের উপর কোনও ছায়াপাত করেনি। দেখা যাচ্ছে, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতায় তিনি ভুলনারহিত রূপে নিজেকে ধর্মমহাসভায় প্রমাণিত করলেন।

বিবেকানন্দ এ ধরনের আক্রমণের উত্তর দিয়েছিলেন ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে যেদিন তিনি হিন্দুধর্মের উপর তাঁর অসাধারণ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সেদিন ঠিক প্রাক্‌মুহূর্তে কয়েকজন খ্রীস্টীয় প্রতিনিধি খোলাখুলিভাবেই হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ চালালে স্বামীজী উঠে বললেন ঃ "আমরা যারা পূর্বদেশ থেকে এখানে এসেছি তাদের দিনের পর দিন এখানে বেশ মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে শেখানো হচ্ছে যে আমাদের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করা উচিত

কারণ বিশ্বে খ্রীস্টান জাতিগুলিই সমৃদ্ধ। আমরা নিজেদের দিকে তাকাই এবং তাকাই বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ ইংরেজদের দিকে—যারা দুশ পঞ্চাশ কোটি এশিয়াবাসীর গলায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিহাসের দিকে পিছিয়ে তাকালে দেখি, খ্রীস্টীয় ইউরোপের সমৃদ্ধি শুরু হয়েছে স্পেন থেকে, স্পেনের সেই সমৃদ্ধির কারণ মেক্সিকো অভিযান। খ্রীস্টানরা তাদের সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তাদের প্রতিবেশীদের গলা কেটে। এই দাম দিয়ে হিন্দুরা সমৃদ্ধি চায় না।"[৮]

স্বামীজী এখানে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধিলাভ হয়েছে প্রাচ্যের দেশগুলিকে শোষণ করে। অন্য দেশকে শোষণ করে এই যে সমৃদ্ধিলাভ—এ পন্থাকে তিনি অনুমোদন করেননি। ধনতান্ত্রিক উন্নতির কিন্তু এইটাই মূলপন্থা। অন্যদেশকে শোষণ করে তাদের সম্পদ হরণ করে সমৃদ্ধিলাভ। এই সমৃদ্ধিলাভ করেছে পাশ্চাত্যের মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশ আর শোষিত প্রাচ্য দেশগুলি রয়ে গেছে অনুন্নত এবং তারই ফলে তারা নিমজ্জিত হয়েছে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে।

সেদিন ধর্মমহাসভায় একমাত্র বিবেকানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল এই অন্যায়ের, এই শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। শোষিত অনুন্নত দেশগুলির পক্ষ থেকে তাদের কথা সেদিন বলেছিলেন একমাত্র তিনিই। এও ইতিহাসের অভীষ্টপূরণের জন্যই হয়েছিল। আগামী যে যুগ সাধারণ মানুষের অধিকারলাভের, সে যুগে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটবে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ সমান অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ পাবে, সেই নূতন যুগের আগমন বার্তা ধ্বনিত হয়েছিল সেদিন তাঁরই কণ্ঠে। সেদিক দিয়ে তিনি ছিলেন বিশ্বের সমস্ত অনুন্নত মানবজাতির প্রতিনিধি, শুধু ভারতবর্ষের নয়, কেবল হিন্দুধর্মেরও নয়।

সেখানে দাঁড়িয়ে তাই তিনি বিশ্ববাসীকে আরও শুনিয়েছিলেন এই কথা যে যারা এতকাল ধরে শোষণ করে এসেছে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত দেশগুলিকে দারিদ্র্যমুক্ত করা তাদেরই বিশেষ দায়, এই দেশগুলির কোটি কোটি নরনারীকে দারিদ্র্য হতে মুক্তি দেওয়ার কাজে প্রত্যক্ষ সহায়তা করা তাদের কর্তব্য।

মেরী লুইস বার্ক এ সম্পর্কে লিখছেন ঃ "দশম দিনে সান্ধ্য অধিবেশন সমাপ্তির পূর্বে শ্রোতারা আকস্মিকভাবে তাদের প্রিয় ব্যক্তিটির কাছ থেকে বিদ্যুৎ শিহরণ জাগানো একটি আলোচনা শুনতে পেলেন।" সেদিনের অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন দুজন ধর্মযাজক। একটির শিরোনামা 'দি রেস্টোরেশন অব সীনফুল ম্যান থ্রু ক্রাইস্ট' (খ্রীস্টের মাধ্যমে পাপীর পরিত্রাণ) এবং অপরটির শিরোনামা 'রিলিজিয়ন ইন পিকিং' (পিকিংয়ে ধর্ম)। এই দ্বিতীয় প্রবন্ধের লেখক মন্তব্য করেন ঃ "চীনারা যে প্রতি বৎসর তাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে কাগজের টাকা আর ধূপ পুড়িয়ে কয়েক শত মিলিয়ন ডলার নষ্ট করে, সে টাকা তারা খ্রীস্টধর্মের জন্য সদ্ব্যয় করতে পারে।"[৯] এইরকম কয়েকটি মন্তব্য সম্বলিত প্রবন্ধটি শুনে স্বামীজী কিছু বলতে রাজি হন, তিনি বলবেন শুনে শ্রোতাগণ হর্ষধ্বনি করে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। স্বামীজীর এই বক্তৃতাটির অংশবিশেষ সভাপতি ব্যারোজের লেখা 'ওয়ার্লর্ডস পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ন' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়, স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীতে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীটিই[১০] প্রকাশিত হয়। কিন্তু মেরী লুইস বার্ক তাঁর গ্রন্থে এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করে সন্নিবেশিত করেছেন। তাতে আমরা দেখি ঃ

"চীন দেশের দারিদ্র্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মিশনারিরা খাদ্যের বিনিময়ে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রচলিত ধর্ম থেকে খ্রীস্টধর্মান্তরিত করার চেয়ে শুধু ক্ষুধানিবৃত্তির প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেই যথার্থ কাজ করতেন।"[১১] বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে ভারতের দারিদ্র্য ও মিশনারিদের কার্যকলাপের বিষয়টিও উত্থাপন করলেন, কারণ ভারতের দারিদ্র্যপীড়িত নরনারীদের কথা একটি মুহূর্তের জন্যও কখনও তিনি ভোলেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ "আমেরিকান খ্রীস্টান ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা পৌত্তলিকদের আত্মার ত্রাণের জন্য বিদেশে মিশনারি প্রেরণ এত পছন্দ কর কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, অনাহার থেকে তাদের শরীরটাকে বাঁচাবার জন্য তোমরা কি করেছ বা করছ? (হর্ষধ্বনি)। ভারতে ত্রিশ কোটি নরনারী মাসে গড় ত্রিশ সেন্টের মতো আয়ের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে, আমি তাদের বছরের পর বছর বুনো ফুল খেয়ে থাকতে দেখেছি। কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হাজার হাজার লোক অনাহারে মরে। খ্রীস্টান মিশনারিরা তাদের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে একটা শর্তে, হিন্দুদের পিতৃপুরুষ আচরিত ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীস্টান হতে হবে। এটা কি ন্যায়সঙ্গত? শত শত অনাথ আশ্রম আছে কিন্তু সেখানে হিন্দু বা মুসলমানরা গেলে বিতাড়িত হয়।...

"আমেরিকার ভ্রাতৃমণ্ডলী! ভারতের সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন ধর্ম নয়। প্রাচ্যে ধর্ম যথেষ্ট আছে। তাদের প্রয়োজন অন্নের কিন্তু তাদের দেওয়া হচ্ছে প্রস্তর খণ্ড (হর্ষধ্বনি)। ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে ধর্ম বা দর্শনের কথা বলা তাদের অপমান করা মাত্র। সুতরাং যদি তোমরা ভ্রাতৃত্ববোধের প্রকৃত তাৎপর্য দেখাতে চাও তা হলে হিন্দু হলেও তাদের প্রতি করুণার্দ্র হও, যাতে তারা ভালভাবে দুটি অন্নসংস্থান করতে পারে তার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে মিশনারি পাঠাও, দর্শনের আবোল-তাবোল শিক্ষা দেবার জন্য নয় (বিপুল হর্ষধ্বনি)।"[১২] দেখা যাচ্ছে তাঁর স্পষ্ট ভাষণের জন্য শ্রোতৃবৃন্দ তাঁকে সেদিন বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেছিলেন।

এখানে স্পষ্টত স্বামীজী দারিদ্র্য ও ক্ষুধানিবৃত্তিকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন, ধর্মের স্থান তার পরে। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণও বলতেন ঃ 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' বিবেকানন্দ কথা বলেছেন বিশ্বের সকল দেশের দারিদ্র্য-নিপীড়িত মানুষদের পক্ষ নিয়ে। প্রসঙ্গটি আমরা দেখেছি উত্থাপিত হয়েছিল চীনের সম্পর্কে আলোচনা কালে। তিনি চীনের দারিদ্র্য-নিপীড়িত মানুষদের পক্ষ সমর্থনের জন্যই সেদিন শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও[১৩] ভাষণ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন—একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

এই ভাষণে তিনি ভারতে জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য তাঁর প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন এবং আমেরিকাবাসীদের নিকট তার জন্য সাহায্যের আবেদন রাখেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ "যদি চীন ও ভারতের পুরোহিতকুলকে একত্রিত করা যায় তাহলে তাদের মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি ও সম্ভাবনা রয়েছে তার দ্বারা সমাজ ও মানবের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা লাভ হয়। আমি ভারতে এজন্য প্রচেষ্টা করেছি কিন্তু অর্থের অভাবে তা সংগঠিত করতে পারিনি। হয়তো আমি আমেরিকা থেকে সে সাহায্য পেতে পারি।"[১৪] এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ আরও বলেন যে ঃ "তবে আমরা জানি, খ্রীস্টানদের কাছ থেকে পৌত্তলিকদের জন্য সাহায্য পাওয়া কত কঠিন (বিপুল হর্ষধ্বনি)। স্বাধীনতার ভূমিক্ষেত্র, মুক্তির ভূমিক্ষেত্র

এবং অবাধ চিন্তার অধিকারের ভূমিক্ষেত্র বলে এই দেশের কথা শুনেছি। তাই নিরাশ হইনি।"[১৫] অবশ্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশই হতে হয়েছিল এবং আমেরিকা থেকে তাঁর প্রকল্পের জন্য অর্থসংগ্রহের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। তাঁর এ ব্যাপারে আবেদন ধর্মান্ধ খ্রীস্টানদের নিকট ছিল না, ছিল সেখানকার মুক্তমনা মানুষদের নিকটেই। কিন্তু তাঁরাও তাঁর আশা পূর্ণ করেননি। সুদূর প্রাচ্যদেশ সম্পর্কে তাদের ধারণা খুব ধূসর ছিল। সেজন্য সেখানকার মানুষদের দারিদ্র্য-নিরসনের জন্য প্রকল্প খুব একটা উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হয়নি। এর পিছনে আরও অনেক কারণ ছিল, একটি কারণ মিশনারিগণ এবং তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ কতিপয় স্বদেশবাসী কর্তৃক তাঁর সম্বন্ধে প্রবল অপপ্রচার। সে অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ একমাত্র ব্যক্তি যিনি সেই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে বিশ্বের সকল দেশের দারিদ্র্যপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষদের পক্ষ নিয়ে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি জোরের সঙ্গে উপস্থাপিত করেন। এতে কোনও সন্দেহ নেই। আশ্চর্য দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলি থেকে সমাগত প্রতিনিধিদের মধ্যে আর কেউ এ বিষয়ে এমনভাবে মুখ খোলেননি। ধর্মপাল প্রভৃতি আপত্তি জানিয়েছিলেন খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরকরণের মিশনারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। একমাত্র বিবেকানন্দই অর্থনৈতিক শোষণ ও মিশনারিদের কার্যধারা সম্পর্কে বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দিতে চেয়েছিলেন, সচেতনতা এনে দিতে চেয়েছিলেন, যদিও তিনি প্রধানত ছিলেন ধর্মাচার্য, জগতের প্রাচীনতম ধর্মের প্রতিনিধি। তার কারণ তাঁর ধর্মের মূল কথা মানবিকতা, মানুষের উত্তরণ, যে উত্তরণের প্রাথমিক ধাপ দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি। সেজন্যেই তাঁর কণ্ঠে এই ধর্মমহাসভায় শোনা গিয়েছে দরিদ্র দেশগুলির আর্থিক উন্নয়নের প্রকল্পের কথা, এদেশগুলির কোটি কোটি মানুষের দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির কথা, শোনা গিয়েছে তাদের কর্মসংস্থান ও অন্নসংস্থানের জন্য সাহায্যের আবেদন।

শুধু তাই নয়, তাদের পক্ষ থেকে তিনি বারবার এই সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিও অত্যন্ত জোরালো ভাবে পেশ করেছিলেন—কেন ক্ষুধিত মানুষদের ক্ষুধার অন্নের বিনিময়ে বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করা হবে, কেন দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করা হবে? এ বিষয়ে তাঁর কণ্ঠ যে কত জোরালো ছিল তা আমরা জানতে পারি এ্যাঙ্গলিকান চার্চের উদারমনা প্রতিনিধি রেভারেণ্ড আর হয়েসের লেখা 'ট্রাভ্‌ল এ্যাণ্ড টক' গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থে রেভারেণ্ড হয়েস ধর্মমহাসভার স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে লিখছেনঃ "জনপ্রিয় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, বহিঃসাদৃশ্যের দিক দিয়ে বুদ্ধের ক্লাসিক মুখমণ্ডলের সঙ্গে যাঁর সাদৃশ্য, আমাদের বাণিজ্যিক ঐশ্বর্য, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং সামঞ্জস্যহীন ধর্মবোধের নিন্দা করে ঘোষণা করেন যে, এই মূল্য দিয়ে কোনও নমনীয় হিন্দুও আমাদের বড়াই করা সভ্যতার কোনও কিছু গ্রহণ করতে চাইবে না।... তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেন, তোমরা এক হাতে বাইবেল, অন্য হাতে তরবারি নিয়ে আস, তোমাদের কালকের ধর্ম শেখাতে আস তাদের যারা হাজার হাজার বছর আগেই (ঋষিদের কাছ থেকে) সব শিখেছে। সেই আচার্যরা শিক্ষায় ও জীবনচর্যায় তোমাদের খ্রীস্টের মতই মহান। তোমরা আমাদের পদদলিত করেছ এবং পায়ের তলার ধূলিকণার মতই ব্যবহার করছ। (তোমরা পশুদের অমূল্যজীবন নষ্ট কর, কারণ তোমরা মাংসভোজী)। আমাদের মানুষদের মদ খাইয়ে তোমরা নীতিভ্রষ্ট কর।

আমাদের নারীদের অসম্মান কর। আমাদের ধর্মকে তোমরা পরিহাস কর। অনেক ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের সঙ্গে সমান বরং কিছু উন্নত কারণ আমরা মানবিক। এরপরও তোমরা অবাক হও যে ভারতে খ্রীস্টধর্ম প্রচার এত শ্লথগতি কেন। আমি বলছি, এর কারণ তোমরা খ্রীস্টের মতো নও—খ্রীস্টকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। তোমরা কি মনে কর, যদি তোমরা খ্রীস্টের মতো বিনীত ও নম্র হয়ে প্রেমের বাণী নিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াতে এবং তাঁর মতো জীবন ধারণ করতে কর্ম ও দুঃখভোগ করতে, আমরা তাহলে তোমাদের কথায় কর্ণপাত করতাম না ? কখনই তা নয়। আমরা খ্রীস্টকে অভ্যর্থনা জানাতাম, তাঁর কথা শুনতাম যেমন শুনেছি আমরা আমাদের দেবতুল্য আচার্যদের (ঋষিদের) কথা।" হয়েস শেষ মন্তব্য লিখছেন ঃ "আমি মনে করি প্রবল আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিবেকানন্দ অন্যতম। পার্লামেন্টে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলির মধ্যে আছে বিবেকানন্দের বক্তৃতা।"[১৬]

এখানে সুস্পষ্ট যে বিবেকানন্দ অত্যন্ত জোরালো কণ্ঠে ধর্মধ্বজীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত মানুষের বিবেকের উপর পীড়নের প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদ করেছেন 'বাণিজ্যিক ঐশ্বর্য এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রবণতাপূর্ণ পাশ্চাত্যের উদ্ধত ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রভুত্ববিস্তার-প্রয়াসের। কারণ এর মধ্যে যীশুর ধর্মের চিহ্নমাত্র নেই। প্রকৃত প্রেমধর্মের প্রচারক যীশুর প্রতি তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন।

হয়েস স্বামীজীর মুখমণ্ডল বুদ্ধসদৃশ বলেছেন, তাঁর হৃদয়ও ছিল বুদ্ধের মতো। বুদ্ধের মতোই তিনি নিপীড়িত অত্যাচারিত মানুষদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তিনি সেদিক দিয়ে বুদ্ধেরই মতো মানুষের মহান মুক্তিদাতা, মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির উদ্গাতা (Prophet of human emancipation)। সেজন্যই বিশ্বধর্মসভায় মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গ বারেবারে শোনা গিয়েছে তাঁর কণ্ঠে।

তাঁর হিন্দুধর্মের উপর বক্তৃতায় তিনি মানুষকে অভিহিত করেছিলেন 'Ye divinities on earth' অর্থাৎ 'অমৃতের পুত্র' বলে। মানুষের এই দেবত্ব ঘোষণা মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যদি একই দেবত্ব নিহিত থাকে, তাহলে সকলেরই বড় হওয়ার ও মহৎ হওয়ার অনন্ত সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সকলকেই সমান সুযোগ দিতে হবে তাদের অন্তর্নিহিত সুপ্তসম্ভাবনাসমূহ বিকাশের জন্য, কাউকে কোনও বিশেষ সুবিধা দেওয়া যাবে না, কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। সকলপ্রকার ভেদ-বৈষম্য ও বিশেষ সুবিধার মূলে আঘাত করে বেদান্তোক্ত এই তত্ত্ব যা স্বামীজী মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ প্রদত্ত ভাষণসমূহের মধ্যে সমাজের এক আমূল রূপান্তরের ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে, রয়েছে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, আত্মিক তথা সর্বাঙ্গীণ মুক্তির প্রতিশ্রুতিময় এক নূতন কালের অভ্যুদয়ের পথনির্দেশ। সেজন্য এ ভাষণসমূহ ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং আজকের দিনেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যখন চলেছে ভাঙ্গাগড়া, পুরাতন জীর্ণ সভ্যতা ভেঙ্গে পড়ছে, গড়ে উঠছে সেই নূতন সভ্যতা স্বামীজী যার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যার কথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন ১৮৯৩-এ শিকাগো ধর্মমহাসভায়।

এ বিষয়ে তাঁর রাষ্ট্রীয় আদর্শের কথা উল্লেখ করে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করা সঙ্গত

হবে। এই আদর্শের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক বক্তৃতার প্রায় শেষে। তাঁর মতে যে রাষ্ট্রের ভিত্তিতে আছে বিশ্বজনীন ধর্ম সেই রাষ্ট্রই আদর্শ রাষ্ট্র। তাঁর ভাষায়ঃ "সেই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে কারো প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকবে না; তাতে প্রত্যেক নরনারীর দেবস্বভাব স্বীকৃত হবে এবং তার সমগ্র শক্তি মানুষকে তার দেবস্বভাব উপলব্ধি করতে সহায়তা করার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকবে।" (C. W. Vol. I, Paper on Hinduism, ভাষান্তর—লেখিকা)।

তাঁর এই মহান স্বপ্ন একদিন না একদিন সফল হতে হবেই—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কারণ যেকথা মেরী লুইস বার্ক বলেছেন—বিবেকানন্দের মতো প্রফেট যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁর প্রভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে পরিবর্তন শুরু হয় তা একসময় রূপান্তর ঘটায় সমগ্র জগতের।

শিকাগো ধর্মমহাসভার পটভূমি

তারকনাথ তরফদার

রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি

সে এক কাল ছিল, সে এক দিন ছিল, একশ বছর আগে। কালো-ধলোয় ভাগ করা পৃথিবীতে বাজতে চেয়েছিল এক ঐকতানের সাম্য ধর্মের হাত ধরে, যার নাম ধর্মমহাসভা—Parliament of Religions.

ফরাসী বিপ্লবের পর শ'খানেক বছর কেটে গেছে, শিল্পবিপ্লব হল প্রায় শতকের বেশি, কলম্বাস আমেরিকার মাটির খবর ইউরোপে বয়ে নিয়ে গেছেন—তাও তো হল চারশ বছর।

এশিয়ার বড় বড় দেশগুলো তখন ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি বাড়িয়ে চলেছে, বুকের রক্ত দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রম দিয়ে। চীন তো তখন লুটের মাল, ভারতবর্ষ তথৈবচ—ভারতে চাষ করা আফিং, ইউরোপীয় বাণিজ্যের স্বার্থে, খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে চীনের আমজনতা, ইন্দোচীন ফরাসী-ওলন্দাজদের কবলে, আরব তুর্কী-অধীনে গোষ্ঠিদ্বন্দ্বে দীর্ণ—এককথায় বিবেকানন্দীয় ভাষায়ঃ "আশিয়ায় বড় বড় বাঘা-ভাল্‌কো—ইংরেজ, রুশ, ফ্রেঞ্চ, ডচ—এরা আর কি কিছু রেখেছে?" সাম্রাজ্যবাদ ফুলে ফেঁপে উঠেছে নবীন ধনতন্ত্রী ব্যবসায়ী রাষ্ট্রগুলোয়—ক্ষয়িষ্ণু পুরোনো সাম্রাজ্যগুলো।

তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা, সেখানে খ্রীস্টান আর্মেনীয় প্রজাদের ওপর চলে অত্যাচার আর সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে খলিফা চেষ্টা করেন বিশ্বব্যাপী ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ঢেউ তুলতে।

আফ্রিকা উপনিবেশের শিকার, তার গল্প শাশ্বত হয়ে রইল রবি ঠাকুরের 'আফ্রিকা' কবিতার পঙ্‌ক্তিতে, নিরেট গদ্যে বলি, ১৮৭৬ সালে তার মাটির ১১% থেকে ১৯০০ সালে ৯০% চলে গেছে উপনিবেশের কবলে।

এই সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরেই উত্থান ঘটতে চাইছিল ধর্মের, নাকি উল্টোটা? যাই হোক না কেন, তাদের সম্বন্ধ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ, তার কথা পরে হবে—এখন একটা ছোট্ট গল্প বলি এই আফ্রিকা নিয়েই—

আফ্রিকার এক স্থানীয় সর্দার বলেছিলঃ "পাদরীবাবারা যখন প্রথম আমাদের দেশে আসেন, তখন তাঁদের হাতে ছিল বাইবেল, আর আমাদের কাছে জমি, এখন আমাদের হাতে হাতে বাইবেল, আর তাঁদের পকেটে সব জমি।" লাতিন আমেরিকা স্বাধীনতা পেয়েছে

উপনিবেশ থেকে কিন্তু সেখানে বিদেশী শোষণ অব্যাহত।

ইউরোপ দুধে-ভাতে বাড়ছে বটে—ইংলণ্ড সমৃদ্ধ হলেও আয়ারল্যাণ্ডে শুরু হয়েছে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের ঢেউ, অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ক্ষয়িষ্ণু, বলকান রাষ্ট্রগুলো তুরস্কের কবল থেকে স্বাধীন হয়েও অস্থিরতায় কাঁপছে, ফ্রান্স-জার্মান যুদ্ধে হতমান হয়ে সম্মান উদ্ধারে সচেষ্ট—প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্থান ঘটছে জার্মানীর (যদিও তার কাণ্ডারী বিসমার্ক পদচ্যুত ১৮৯০ সালে) আর টুকরো টুকরো ইতালী এক হয়ে সাম্রাজ্যবিস্তারের চিন্তায় মশগুল, রাশিয়ায় সাধারণ মানুষদের অবস্থা অবর্ণনীয়।

তারই পাশাপাশি এশিয়ার জাপানে শুরু হয়েছে মেই-জি বা নবযুগ—দ্রুত শিল্পোন্নয়নে সে ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সুয়েজ খাল জুড়েছে এশিয়া-ইউরোপ, বাণিজ্যের প্রগতি চলছে দ্রুতহারে। আর স্বাধীনতার মাতৃভূমি কলম্বিয়ায়? গৃহযুদ্ধের পর সেখানে তখন শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ মন্দা, যার পরিচয় ধরা আছে সেযুগের ইতিহাসে, এমনকি বিবেকানন্দের চিঠিতেও। (২০·৮·৯৩ তারিখে আলাসিঙ্গাকে লেখা) তাই কি পণ্যসম্ভারে জমজমাট একাদশ বিশ্বমেলার আয়োজন হয়েছিল শিকাগোতে? তাই কি ধর্মমহাসভার অন্যতম উদ্দেশ্য 'বিবিধ সামাজিক সমস্যা, যেমন শ্রম, দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য...ইত্যাদি প্রসঙ্গে ধর্ম কি আলোকপাত করতে পারে?' ভুললে চলবে না, এই শিকাগো শহরেই বিখ্যাত মে মাসের শ্রমিক আন্দোলনের কথা, যা ঘটেছে মাত্র কয়েক বছর আগেই (১৮৮৬)।

ধনতন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে বেড়েছে এযুগে তারই খুব সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন লেনিন তাঁর সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রের চরমরূপ তত্ত্বে। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধেও এখানে দু'চার কথা বলে নেওয়া ভাল—ইউটোপীয়ান সমাজতন্ত্রের চেয়ে বেশি দৃঢ় হয়েছে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'। মার্ক্স যদিও প্রয়াত (১৮৮৩) তবুও তার প্রতিষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক বা শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের 'পারী কমিউনে'-র মতো ঘটনাগুলো ঘটছিল ইতালীর ঐক্যবদ্ধতা, জার্মানীর উত্থান, ফ্রান্স-জার্মান যুদ্ধের সমকালেই।

খোদ আমেরিকাতেই মন্দার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দ্রুত বর্ধমান বেকারসমস্যা আর প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষ হয়ে উঠছিল প্রতিবাদী—সৃষ্টি হচ্ছিল এমনই প্রতিবাদী গোষ্ঠী শিল্পসেনা—যেমন কোক্সির 'খ্রীস্টের শাসন', ইত্যাদি সেইসঙ্গে কলকারখানা, রেল ও খনির ধর্মঘটে যোগ দিল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক।

এইসব অর্থনৈতিক-সমাজনৈতিক-রাজনৈতিক কথাগুলো কি শিকাগো ধর্মমহাসভার পটভূমিকায় অপ্রাসঙ্গিক? তা নয়; সেযুগের বিশ্বব্যাপী ধর্মভাবনায় এর প্রভাব ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, রেনেসাঁসের ধারায় ধর্মের ঈশ্বরকেন্দ্রিকতা রূপ নিচ্ছিল মানব কেন্দ্রিকতায়। দেখা দিল উনিশ শতকে খ্রীস্টের প্রেম ও সেবার বাণীকে আশ্রয় করে Christian Socialism, Social Gospel Movement প্রভৃতি। ধর্মমহাসভায় সেই প্রসঙ্গে প্রবন্ধ পাঠও হয়।

আবার অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থায় সবদেশেই ধর্মের প্রাধান্য, মাহাত্ম্য আর গুরুত্বের পৃষ্ঠপোষকতা বেড়ে ওঠে। ব্যতিক্রম হয়নি আমেরিকাতেও। স্বয়ং ডাঃ ব্যারোজের মতে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মের ছোট বড় নানা অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা

হয়েছিল।

সংস্কৃতির জগৎ আর ধর্মভাবনা

সমাজজীবনের আর একটা দিক আছে ধর্মজীবনের সামাজিক সত্তার সঙ্গে যার যোগ সুনিবিড়, তা হল সংস্কৃতির জগৎ। উনবিংশ শতকে পলায়নপর রোমান্টিক অনুভাবনার চেয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ বেশি করে আঁকড়ে ধরতে চাইছে চারপাশের বাস্তবতাকে; ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগলালসায় ক্লেদাক্ত সমাজজীবন, তার থেকে মন্থন করা আরও উচ্চতর কিছু, এরই সন্ধান চলছে পাশ্চাত্যের সাহিত্য জগতে। সাহিত্যে নতুন জন্ম নিয়েছে এক নবীনধারা ছোটগল্প, যার নিটোলতা, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সুর মিলিয়ে চলছে সেযুগের দ্রুত ধাবমান জীবনযাত্রার সঙ্গে। রহস্য ও গোয়েন্দাগল্প হয়ে উঠছে জনপ্রিয়, সায়েন্স-ফিকসন নামক বিজ্ঞানে-বাস্তবতায়-কল্পনায় মেশানো এক জগৎ প্রবেশ করেছে সাহিত্যের আঙিনায় জুল ভার্নের হাত ধরে (১৮২৮-১৯০৫)।

ফরাসী সাহিত্যে মহৎ স্রষ্টা বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০), ফ্লব্যার (১৮২১-৮০), ভিক্তর য়্যুগো (১৮০২-৮৫), আলেকজাঁন্দ্রে দ্যুমা (১৮০২-৭০), তোয়েফিল গতিয়ে (১৮১১-৭২)। ঠিক পরবর্তী যুগেই পাচ্ছি জীবনযন্ত্রণায় অস্থির এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২), আলফাঁস দদে (১৮৪০-৯৭) বা গী দ্য মপাসাঁ (১৮৫০-৯৩)-এর মতো বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিকদের। কাব্যজগতে দ্যমুসে (১৮১০-৫৭) বা শার্ল বোদলেয়ার (১৮২১-৬৭)-এর যুগ পেরিয়ে দেখা দিচ্ছেন নবীন প্রতিভা ম্যালার্মে (১৮৪২-৯৮) বা র‍্যাঁবো (১৮৫৪-৯১)।

ইংরেজী সাহিত্যে খোদ ইংলণ্ডে রোমান্টিক যুগাবসানে ভিক্টোরীয় যুগের সূত্রপাত— উপন্যাসে থ্যাকারে (১৮১১-৬৩) বা চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-৭০); পরবর্তী কালে টমাস হার্ডি বা রবার্ট লুই স্টিভেনসন; ম্যাথু আর্নল্ডও (১৮২২-৮৮) সমসাময়িক প্রতিভা; আর শার্লক হোমস চরিত্রের জনক স্যর আর্থার কোনান ডয়েল শুধু গোয়েন্দা গল্পেই নয়, কল্পবিজ্ঞানেও সমান দক্ষতার অধিকারী। নাট্যজগতে নবীন প্রতিভা আইরিশ বার্নাড শ— মানুষের জীবনের সব ভণ্ডামি উন্মোচন করেছেন তিনি।

আমেরিকাতেও প্রসিদ্ধ গল্পকার ওয়াশিংটন আর্ভিং (১৭৮৩-১৮৫৯), এডগার এ্যালান পো (১৮০৯-৪৯), নাথানিয়েল হথর্ন (১৮০৪-৬৪)—এঁদের পাশাপাশিই মহান কবি লংফেলো (১৮০৭-৮২); ওয়াল্ট হুইটম্যান (১৮১৯-৯২); দার্শনিক এমার্সন (১৮০৩-৮২) বা থোরো (১৮১৭-৬২); অল্প কনিষ্ঠ মার্ক টোয়েন (১৮৩৫-১৯১৩) উন্মোচন করে চলেছেন মানবজীবনের নব নব দিগন্ত। হ্যারিয়েট বীচার স্টো (১৮১১-৯৬) লিখেছেন অশ্রু-হাসি, অত্যাচার-ভালবাসা মাখানো জীবনের গল্প 'টম কাকার কুটীর'।

রাশিয়ান সাহিত্যেও এসেছে স্বর্ণযুগ—পুস্কিন (১৭৯৯-১৮৩৭), গোগোল (১৮০৯-৫২), তুর্গেনিয়েভ (১৮১৮-৮৩), দস্তয়েভস্কি (১৮২১-৮১) কত নাম করব! আছেন ঋষিপ্রতিম লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০); আর পরবর্তী কালের দুই মহৎ স্রষ্টা চেকভ (১৮৬০-১৯০৪) আর গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬)।

বেলজিয়ান সাহিত্যিক মেটারলিঙ্ক বা নরওয়ের ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬) এঁদের কথাও না বলে থাকা যায় কি? শিশুদের কাছে এক নবীন স্বপ্নলোকের দুয়ার খুলে দিয়েছেন রূপকথার যাদুকর, দিনেমার হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এ্যাণ্ডরসন (১৮০৫-৭৫), জার্মানীর গ্রিম ভাইরা, আর অ্যালিস স্রষ্টা লুইস ক্যারল। জার্মানীর দুই দার্শনিক হেগেল আর কান্টের প্রভাব তখনও সারা ইউরোপ জুড়ে।

এ তো গেল সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য জাতিগুলোর কথা। উপনিবেশগুলোতে? ভারতবর্ষের কথাই ধরি না কেন? আঞ্চলিক সাহিত্যের আধুনিক যুগের জন্মলগ্ন এটা। বাংলা আধুনিক গদ্য বিদ্যাসাগরের হাত ধরে বঙ্কিমচন্দ্রের দেখানো পথে যাত্রা করেছে, উড়িষ্যায় ফকিরমোহন সেনাপতি, অসমে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, পাঞ্জাবী সাহিত্যে ভাই বীর সিং আনছেন নবযুগের পদক্ষেপ। এখানেও ধর্মাশ্রয়ী চিন্তাব সঙ্গে সাহিত্যের যোগ থাকছে।

সংস্কৃতির অন্যান্য জগতেও এসেছে জোয়ার। চিত্রশিল্পে ইম্প্রেশনিজম্-এর পথ পেরিয়ে ভ্যানগঘ বা গগাঁর কাজে ধরা দিচ্ছে পোস্ট-ইম্প্রেশানিজম্; ভাস্কর্যে রদাঁ বা দালুর কাছে জীবনমুখীনতা। এঁদেব কাজ সামগ্রিকভাবে জীবনচেতনাকে মন্থন করে তাকে প্রভাবিত করে চলেছিল, যার প্রভাব পড়েছে ধর্মভাবনার ক্ষেত্রেও। ভিক্টোরীয় যুগের নীতিবাগীশতার সঙ্গে প্রোটেস্টান্ট নীতিবাগীশতাব যোগ যে কত ঘনিষ্ঠ সেকথা বলাই বাহুল্য। ঠিক তেমনি রদাঁর কাজে দেখি ক্লাসিকাল ইভ অনুভাবনাব নব রূপায়ণ (বিস্তৃত আলোচনার জন্য নারায়ণ সান্যালের রোদাঁ দ্রষ্টব্য) কিংবা সমকালীন ইন্দ্রিয়লোলুপ অবক্ষয়ের যুগে সাঁ জঁ ব্যাপতিস্ত (সেন্ট জন ব্যাপটিস্ট) সর্বত্যাগীর রূপায়ণ বা মহৎ সৃষ্টি Gateway of Hell বুঝিয়ে দেয কেমনভাবে সংস্কৃতির জগতেব সঙ্গেই বিবর্তিত হযে চলছিল সাধারণ মানুষ বা স্রষ্টাদের ধর্মচিন্তা।

সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ

সংস্কৃতির জগতের কথা বলতেই মনে পড়ছে, সেযুগে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পরস্পরের কত অপরিচিত ছিল। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার হলেও পৃথিবী তখনও অত ছোট হয়ে আসেনি, ফলে একে অপরকে না চেনার, না বোঝার অবকাশ ছিল প্রচুর। আমি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের কথা বলছি না—উপনিবেশগুলিতে পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাভাবনা শিক্ষিত লোকের কাছে যেমন পৌঁছত; তেমনি ভারতবর্ষের উপনিষদের প্রভাব পড়েছিল ইউরোপের শোপেনহাওয়ার ম্যাক্সমূলর প্রমুখ মনীষীদের ওপর কিন্তু তারা কতজন? প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যেব সাধারণ মানুষ একে অপরের সম্বন্ধে কিরকম অজ্ঞ ছিলেন, তা তো স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র সূচনাতে বিবৃত; আর এর ফলে গড়ে উঠেছে 'কূপমণ্ডূকতা' যার কথা শিকাগো ধর্মসভায় উল্লেখ করেছিলেন স্বামীজী। অবশ্যই এমন মানুষ ছিলেন যাঁরা অন্যদের চিনতে বুঝতে চাইতেন, যেমন ভারততত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম কেরী, উইলিয়াম জোন্‌স বা জেমস্ প্রিন্সেপ; তবু সাধারণ মানুষের কাছে ভারতবর্ষ ছিল সাপ-সাপুড়ে-বাদ্য-সন্ন্যাসী-জলা-জঙ্গল-ভরা এক রহস্যময় দেশ, যার আকর্ষণও কিছু কম ছিল না। জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের লেখায় ভারতবর্ষ এসেছে বারে বারে—শার্লক হোমসের বন্ধু ডাঃ ওয়াটসন

ভারতে ছিলেন ; Sign of Four নামক বৃহৎ উপন্যাসেরও এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে ভারতে ; জুল ভার্নের লেখায়ও এসেছে ভারতবর্ষের মানুষ—কিন্তু কী তাদের অদ্ভুত পরিচয়—বেশ বোঝা যায় লেখক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আকর্ষণ বোধ করলেও অপরিচয়ের বাঁধন কাটাতে পারেননি—যেমন ক্যাপ্টেন নিমোর (20,000 Leagues Under the Sea ; Mysterious Island) আসল পরিচয় মধ্য ভারতের প্রিন্স ডাক্কার (ভারতীয় নাম এমন হয় কি !), 'Around the World in Eighty Days'-এ সতীদাহ (?) থেকে উদ্ধার করা পারসিক রমণী ; বা 'A Begum's Fortune'-এ উল্লিখিত অষ্টাদশ শতকে বাংলার 'রাজা লক্ষ্মীসূবে'র বিধবা পত্নী হলেন 'বেগম (!) গোকুল', তিনি বিয়ে করছেন এক ফরাসী সৈনিককে (অষ্টাদশ শতকে বাংলায় সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরে বিধবাবিবাহ ! তাও আবার খ্রীস্টানকে !)

আর এই অপরিচয়ের সুযোগে উপনিবেশগুলোয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ; ধর্ম ছিল তারই দোসর। বিজিত জাতি, হোক না কেন তার ইতিহাস বহু প্রাচীন, আবশ্যিকভাবেই চিত্রিত হল বর্বর এবং অসভ্যরূপে, তার সামাজিক প্রথাসমূহ মূল্যহীন, অবাস্তব এমনকি ক্ষতিকরও, এ প্রচার দেশে বিদেশে গেঁথে দেবার প্রচেষ্টা চলল প্রচুর। বিজয়ী জাতের সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার এমনকি ধর্মকেও শ্রেষ্ঠ বলে বিজিত জাতিগুলির ওপর চাপানো হতে লাগল ; তার পিছনে যে ক্লেশ স্বীকার তার নাম হল 'White men's burden'. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর প্রথম ধ্বজাধারী, সৈয়দ মুজতবা সাহেবের অনবদ্য ভাষায় : "এই 'মোট' নিয়ে প্রথম কাড়াকাড়ি লাগায় ধর্মপ্রাণ মিশনারিরা।" এঁদের অনেকেই কিন্তু যে দেশকে কর্মভূমি রূপে বেছে নেন, সেখানকার মানুষ আর তাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে শুধু যে অজ্ঞ তাই নন, তাঁদের ন্যূনতম সম্মানটুকুও দিতেন না। (শিকাগো ধর্মসভায় প্রাচ্য প্রতিনিধিরা সমস্বরে এ অভিযোগ তুলেছিলেন) এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের জন্য অর্থসংগ্রহের মিশনারি-পন্থা অনেকক্ষেত্রেই সাধুতার সীমা লঙ্ঘন করত। ভারতবর্ষের গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন বা সতীদাহকে সার্বজনীন করে দেখিয়ে, (মাকে কৃষ্ণাঙ্গী ও শিশুকে শ্বেতাঙ্গ এঁকে, যাতে সহানুভূতির ঢেউ বয়) তার অতিরঞ্জিত কল্পকথা শুনিয়ে সাধারণ মানুষ, এমনকি শিশুদেরও ঐ কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'ভ্রাতা'দের আত্মাকে অনন্ত নরকের হাত থেকে পরিত্রাণ করবার জন্যে খ্রীস্টধর্মের আলোক-প্রচার পবিত্র, মহৎ এবং খ্রীস্টজনোচিত কাজ বলে শেখানো হত। সেইসঙ্গে এই প্রচারের মাধ্যমে মিশনারি তহবিলে অর্থসংগ্রহও করা হত, যার অধিকাংশই আসত নিম্নবিত্ত, স্বল্পবিত্ত এবং খেটে খাওয়া মহিলাদের কাছ থেকে—স্বদেশেও এই প্রচার স্বল্পবিত্তদের শোষণের (?) পথ নিয়েছিল।

সাহিত্যিকদের রচনাতেও এই মনোভাবের স্বরূপ ধরা পড়েছে। জুল ভার্নের 'Across the Niger Bend'-এ আফ্রিকার এক ফরাসী উপনিবেশের অধিবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত কিনা তার জন্য যে কমিশন গঠিত হয়, তাতে ঠাঁই হয় না সেই উপনিবেশের কোনও প্রতিনিধিরই। এর সঙ্গে তুলনা করুন ১৯২৭ সালে ভারতবর্ষের জন্য গঠিত সাইমন কমিশনের কথা। শিকাগো ধর্মসভার মঞ্চেও আক্ষেপের সুরে মিশনারি কণ্ঠে ধ্বনিত হয় (১০ম দিনের অধিবেশন, 'Religion in Peking' বক্তৃতায়)—চীনারা যদি তাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে কাগজের টাকা আর ধূপের জন্য বছরে মিলিয়ান ডলার

'নষ্ট' না করে মিশনারি কাজে সদ্‌ব্যয় করত! এই আগ্রাসী সংস্কৃতির ফল প্রাচ্য জাতির পক্ষে কেমন? পুনশ্চ মুজতবা আলীর ভাষায় বলিঃ "না খেয়ে মরতে পারা তামাম প্রাচ্যভূমির অনবদ্য প্রতিষ্ঠান। একে অজরামর করে রাখার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার নাম 'White men's burden'." সাম্রাজ্যবাদের এই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণ, সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় আগ্রাসন পরাধীন জাতিগুলোর মেরুদণ্ড যেভাবে নুইয়ে দিয়েছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে শিকাগো-ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সাফল্য যে কতটা হিমালয়ান্তিক, তা বোধহয় এই ব্যাপারটার বিস্তৃত বিশ্লেষণ ছাড়া বোঝা যেত না।

বিজ্ঞানের জগৎঃ বিজ্ঞান ও ধর্মভাবনা

ধর্ম আর বিজ্ঞান এক আশ্চর্য সম্বন্ধে জড়িয়ে। প্রাচীন যুগে ধর্ম তার দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্য সাহায্য নিয়েছিল বিজ্ঞানের কিন্তু মধ্যযুগে ধর্মীয় স্থাণুত্ব বিজ্ঞানের পায়ে শিকল বাঁধতে চাইলে বাধল সংঘাত। রেনেসাঁস যুগ থেকেই বিজ্ঞান ধর্মবিরোধী বলে খ্যাতি পেয়েছে, ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বহু 'কেন' আজ বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে ধর্মীয় বহু সমাধানকে ছিন্নভিন্ন করেছে। তাতে ধর্মের প্রাণে কতটা আঘাত লেগেছে তা বোঝা যায় না কিন্তু তার বহিরঙ্গ ক্ষতবিক্ষত; তার মেরামতের চেষ্টায় ধর্ম হতে চাইছে যুক্তিবাদী, আশ্রয় করতে চাইছে বিজ্ঞানের প্রমাণকে। আজ থেকে একশ বছর পিছনের সেযুগে আজকের বিজ্ঞানের প্রতিদিনের চলতি কথাগুলোও ছিল কল্পনার বাইরে—টি.ভি., রেডিও দূরের কথা, বিমান, এক্সরে, ভিটামিন, হর্মোন, এমনকি ম্যালেরিয়ার কারণও অজানা, আজকের পদার্থবিদ্যার বিবাট শাখা কোয়াণ্টামতত্ত্ব তখনও অনাবিষ্কৃত। সবে দেখা দিয়েছে মোটরগাড়ি, ইলেকট্রিসিটি, টেলিফোন। অবশ্য সেযুগে ধর্মভাবনাকে নাড়া দেবার মতো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও ঘটেছিল প্রচুর। তারই একটি সংক্ষিপ্ত তালিকায় চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক—(এটি প্রস্তুত করেছি ধীমান দাশগুপ্তের 'বিজ্ঞানের ইতিহাস ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' এবং নারায়ণ সান্যালের 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'তে দেওয়া তালিকা থেকে)ঃ—

সময়ঃ ১৭০০-১৮০০; পদার্থবিদ্যা / গণিতঃ বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত আবিষ্কারঃ জীববিজ্ঞানঃ প্রাকৃতিক ইতিহাস, রসায়নঃ ভৌত ও তড়িৎ রসায়ন, পারমাণবিক তত্ত্ব, ভূবিদ্যার সূচনা; যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ বাষ্পচালিত ইঞ্জিন; অন্যান্য প্রযুক্তিঃ যন্ত্রবিপ্লবের সূচনা, লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্রশিল্প।

সময়ঃ ১৮০০-১৮৫০; পদার্থবিদ্যা / গণিতঃ তড়িৎচুম্বকতা স্পেকট্রোস্কোপ; জীববিজ্ঞানঃ অঙ্গসংস্থান কলা, কোষ, স্নায়ুতন্ত্র, ভ্রূণতত্ত্ব প্রত্নজীববিদ্যার উদ্ভব; রসায়নঃ জৈব রসায়নেব প্রতিষ্ঠা, অজৈব রসায়নের উন্নতি; যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ রেলগাড়ি, বাষ্পীয় জলযান, টেলিগ্রাফ, ক্যামেরা;অন্যান্য প্রযুক্তিঃ উচ্চচাপ ইঞ্জিন, রিভাবসিবিলিটির সূত্র।

সময়ঃ ১৮৫০-১৯০০; পদার্থবিদ্যা / গণিতঃ আলোর তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব, ইলেকট্রন, X-ray, পদার্থের গঠন, রীম্যানের জ্যামিতি; জীববিজ্ঞানঃ ডারউইনঃ অভিব্যক্তি; মেণ্ডেলঃ বংশগতি, জীবাণুতত্ত্ব, কৃত্রিম নিষেক, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব; রসায়নঃ কৃষি ও প্রাণ রসায়ন, রাসায়নিক সংশ্লেষণ পলিমার ঔষধশিল্প, পর্যায় সারণী, যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ

গ্যাস ইঞ্জিন, আদি বেতার, টেলিফোন, ফোনোগ্রাফ; অন্যান্য প্রযুক্তিঃ শক্তি সংবক্ষণ, তাপ-গতিবিদ্যা, ঢালাই ইস্পাত, বৈদ্যুতিক আলো, মোটর গাড়ি, রঞ্জক ও বিস্ফোরক, স্থাপত্যে ইস্পাত ও কংক্রীট, ECG।

এ প্রসঙ্গে দুটি তৎকালীন প্রযুক্তির কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। একটি ১৮৮৯ সালে প্যারিস বিশ্বমেলায় (১০ম) ইফেল টাওয়ার—ইস্পাতের বিস্ময় আর ১৮৯৩ সালে শিকাগোর ১১শ বিশ্বমেলায় (যার অন্তর্গত ধর্মমহাসম্মেলন) ইলেকট্রিক রেল ইঞ্জিন।

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের মধ্যে ডারউইনের Evolution মতবাদের মতো সামাজিক আলোড়ন বোধ হয় আর কিছু সৃষ্টি করতে পারেনি। একে তো প্রত্নজীববিদ্যার ফসিলের আবিষ্কার হওয়ায় ঈশ্বর ছ-দিনে বিশ্বসৃষ্টি করেছেন—এই খ্রীস্টীয় বিশ্বাস এবং বিশপ Ussher-এর মত, যা সমগ্র খ্রীস্টান জগতেব শিরোধার্য ছিল, যে তা হয়েছে চাব হাজার চার খ্রীস্টপূর্বাব্দে—তার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল, এবার ডারউইন দিলেন ধাক্কা আদম আর তার আদি পাপেব মূলে—যে আদি পাপের উত্তরাধিকার বহন কবা পাপের বোঝা ছিল সেযুগে খ্রীস্টান মিশনারিদের ধর্মভাবনার এক প্রধান খুঁটি।

ফলে ধর্মচিন্তায় পরিবর্তনের ঢেউ আসবেই; তারই এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িযে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন—যা কিনা 'মরে হেজে যাওয়া জাতিগুলির অসত্য অসভ্য ধর্মের প্রবক্তা' এবং সেইসব ধর্মভাবনার মধ্যেও উচ্চ আধ্যাত্মিকতাব প্রকাশে বিশ্বকে বিস্মযে হতবাক করে দিচ্ছিল। বিজ্ঞানকে ধর্ম বোঝবার সূত্র হিসেবে অচিরেই ব্যবহাব করা হল, আর প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে ছোট হয়ে আসা পৃথিবীতে পারস্পরিক বোঝাপডায ঘটল যে সুবিধা, তার ফল হল সুদূরপ্রসারী।

ধর্মের জগৎ

এই পটভূমিকাব পর আসা যাক ধর্মেব জগতের কথায়। সে সময়টা বড আশ্চর্য! ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, গোঁড়ামি আর ধর্মান্ধতার পাশাপাশিই আছে উদারতা, নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ-তপস্যার জীবন আর সাধারণ মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে ধর্মচিন্তাব আসর। এর সব ক'টিরই ছায়াপাত ঘটেছে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলেনব সাংগঠনিক ইতিহাসে। একদিকে যেমন তার ঘোষিত উদ্দেশ্যের উদারতা আর তার সমর্থনে প্রচুর শুভেচ্ছা বার্তা আবার অন্যদিকে ইংলণ্ডেব প্রধান যাজক ক্যান্টারবেরীব আর্চবিশপেব বযকট "জগতের একমাত্র সত্যধর্মেব সঙ্গে অন্যান্য মিথ্যা ধর্ম একাসনে বসার প্রতিবাদে" আবার কেউ বা উল্লসিত "বিশ্বসভায় খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ একমাত্র সত্যধর্ম প্রমাণের আশায়"—তারই প্রমাণ ছড়িয়ে আছে মেরী লুইস বার্কের Swami Vivekananda in America : New Discoveries-এর এই অধ্যায়ের পাতায় পাতায়। আর হ্যাঁ, খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বা মহত্ত্বের কারণ যা দেখানো হচ্ছিল, তা যীশু নন, তাঁর বাণী নয়, এসব ছাপিয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছিলঃ এক, খ্রীস্টধর্ম বিজয়ী জাতের ধর্ম, আর দুই, পাশ্চাত্যের ঐহিক সমৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত ধর্মের নাম খ্রীস্টধর্ম।

ধর্মীয় গোঁড়ামিও কম ছিল না কিছু। খ্রীস্টানদের চোখে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের স্থান

নিশ্চিত নরকে, আর তাই তাদের কাছে খ্রীস্টের বাণী বহন তাদের আত্মার কল্যাণের জন্য একান্তই জরুরি ছিল। এই সঙ্গেই হাত মেলাত বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের শক্তি—বাজার সমধর্মাবলম্বী প্রজার 'রাজ-অনুরাগী হওয়া স্বাভাবিক'—এই বিশ্বাসেও ধর্মান্তরকরণকে সমর্থন যুগিয়েছে। আবার রেভারেণ্ড কুক প্রমুখ যাজকরা মনে করতেন পাপবাদের কথা না থাকলে ধর্ম পরিত্রাণ করবে কি করে? এই নানা চিন্তাতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করে এগিয়ে চলেছে বিজিত জাতির সংস্কৃতি ও ধর্মের 'শোধন' প্রক্রিয়া, তার পরিচয় মিলবে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষে'র ১ম খণ্ডে (পৃঃ ২৮৯-৩০৫)।

সেযুগের গোঁড়ামির আর এক নমুনা তুলে ধরি—প্রবুদ্ধ ভারত (Nov. 1989)-এ প্রকাশিত Houston Smith এর 'Harmony of Religions' থেকে। ভদ্রলোক তাঁর দিদিশাশুড়ীর পুরোনো কাগজপত্রে পেলেন পৃথিবীর একটি গোলাকার ছবি। পুরো গোলার্ধটি পাঁচটি ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে অর্ধেকটি ঘন কালো রং—সেটি হিদেনদের বোঝায়, পরের অংশটি অপেক্ষাকৃত ফিকে—ফিকে কালো ইহুদী আর মুসলমানেরা। হাজার হোক, তারা একেশ্বরবাদী তো বটে! অপর ভাগ তুলনায় আরও ফিকে—এই অংশ হলেন রোমান ক্যাথলিক—তাঁরা অন্তত যীশুকে মানে বলে আলোর দিকে আর একটু এগিয়ে। আর সবচেয়ে উজ্জ্বল সাদা অংশটি হলেন প্রোটেস্টান্টরা।

গোঁড়ামিতে হিন্দুরাই বা কম কী যেতেন? বৈষ্ণব-শাক্ত বিবাদ তো ছিল সর্বজনবিদিত। তার নানা কৌতুকজনক খবর পাবেন মহেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যানে। ধর্ম যেখানে সামাজিক বিধান আর ছুঁৎমার্গে আবদ্ধ সেখানে এর চেয়ে বেশি কিই বা আশা করা যায়? ইসলামীয় শিয়া-সুন্নী বিরোধও তো কম ছিল না কিছু।

এই গোঁড়ামির কবল থেকে মুক্তি পেতে কেউ বা ধর্মকেই ফুঁ দিয়ে ওড়াতে চাইলেন, সমাজতান্ত্রিকরা সামাজিক শক্তির বাইরে তার অন্য কোন সদর্থই খুঁজে পেলেন না; কেউ হলেন অজ্ঞেয়বাদী, কেউ বা কান্ট, হেগেল, শোপেনহাওয়ার, মার্ক্স-এর দর্শনের গলি ঘুঁজিতে রস না পেয়ে ধর্মের নতুন মানে খুঁজতে হলেন আগ্রহী।

এরই ফলে গড়ে উঠল Higher Criticism বা Christian Science। কেউ বা উদ্ভট অলৌকিকতার সন্ধান করতে লাগলেন ধর্মের মধ্যে, যেন সেগুলিই তার সারবস্তু। কেউ বা ঝুঁকলেন প্রটেস্টান্ট-নীতিবাগীশতার দিকে, যা ধর্মের অধ্যাত্মদিক—এমনকি যীশুরও কিছু উপদেশ বাস্তবতাহীন বলে বাতিল করে দিচ্ছিল; জন্ম নিয়েছিল সংশ্লেষধর্মী থিওজফি। তা-ও কম মানুষকে আকৃষ্ট করেনি।

চার্চের মধ্যেও প্রাধান্য পেতে লাগল খ্রীস্টের প্রেম-মৈত্রী আর সেবার বাণীর গুরুত্ব। 'জড়বাদী সভ্যতার দেশ' আমেরিকাতেও বইতে শুরু করেছিল আধ্যাত্মিকতার উদার ধারা। রামমোহন রায়ের প্রভাব তাতে কম ছিল না। এছাড়াও Ralph Waldo Emerson-এর চিন্তা, Maxmuller-এর 'Sacred Books of the East' (১৮৭৩-১৯০০), জেমস ফ্রীম্যান ক্লার্কের বহুল প্রচারিত 'Ten Great Religions' যাতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত অধ্যায় ছিল, Oriental Religions and their Relation to Universal Religion' প্রভৃতি বইয়ের সমাদর, এডুইন আর্নল্ড এর 'Light of Asia'

কিংবা ১৮৬৭ সালে নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত উইলকিনের গীতার অনুবাদ—এই সমস্তই রচনা করেছিল শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের উদার আবহাওয়া আর গোঁড়ামি পরিমণ্ডলে দৃঢ়, নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিল ধর্মের এই রূপটির বিজয়নিশান।

তাই বলছিলাম সাদায় কালোয় মেশা সে যুগটা—Age of Darkness and of Light, একদিকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ জড়বাদী ভোগমানসিকতার হাত ধরে সাম্রাজ্যবাদী মুখোশ পরছে ধর্মের, অন্যদিকে ত্যাগ-তিতিক্ষা-তপস্যার জগৎ। সেই ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বা ইরানে বাহাউল্লাহ্ যখন ঘোষণা করছেন সর্বধর্ম স্বীকৃতির বাণী, তখন ধর্মীয় গোঁড়ামির অন্ধকার জন্ম দিচ্ছে জাতিহিংসার। বিবেকানন্দের ভাষায় বলতে গেলেঃ "মানুষ তার অসীমতাকে স্পর্শ করতে চেয়ে ছুঁয়ে দেখতে চাইছে সবকিছু, কখনও ইন্দ্রিয়লোলুপতায়, কখনও মহৎ সৃষ্টিতে, কখনও যুক্তিবাদ আশ্রিত বিজ্ঞানে, আর শেষে ধর্মের দুয়ারে, যখন তার সীমাবদ্ধতায় অসীমকে ছুঁতে পারে না অন্য কিছুতেই।"

শিকাগো ধর্মমহাসভা এই দ্বন্দ্ব, এই বৈপরীত্যের এক আশ্চর্য প্রতীক হয়ে ফুটে উঠেছিল—ইতিহাস সেকথাই বলে।

মানবমুক্তির সন্ধানে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

"আমার জীবনে একটা মস্ত বড় ব্রত আছে।... এ ব্রত পরিপূর্ণ করবার আদেশ আমি গুরুর কাছে পেয়েছি—আর সেটা হচ্ছে মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা। দেশে আধ্যাত্মিকতা অতিশয় ম্লান হয়ে গেছে। আর সর্বত্র রয়েছে বুভুক্ষা। ভারতকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে এবং আধ্যাত্মিকতার বলে জগৎ জয় করতে হবে।"[১]

কথাগুলি পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের। কাল—সেপ্টেম্বর ১৮৮৮। পঁচিশ বছরের কপর্দকহীন অজ্ঞাতপরিচয় এক সন্ন্যাসীর মুখে হাতরাস স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত কথাগুলি শুনেছিলেন। সন্ন্যাসীর চেহারা, পাণ্ডিত্য, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, সঙ্গীতনৈপুণ্য এবং ত্যাগ-বৈরাগ্যে শরৎচন্দ্র ইতিপূর্বেই মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে সন্ন্যাসী সত্যই প্রতিভাবান কিন্তু গোটা ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণ, ভারতবর্ষের মানুষকে দেহের বুভুক্ষা থেকে মুক্তির পথ দেখানো এবং দেশের নিষ্ক্রিয় আধ্যাত্মিকতাকে সক্রিয় করে তার সাহায্যে মানুষের আত্মার বুভুক্ষা দূরীকরণ এবং সেই শক্তিতে বিশ্বজয় এবং এই সমস্ত ব্যাপারটার জন্য তিনি দায়বদ্ধ—এতটা মেনে নেওয়া বিবেকানন্দের সদ্য-অনুরাগী এই শিক্ষিত যুবকের পক্ষে বোধ হয় সম্ভব ছিল না।

ভারত-পরিক্রমান্তে ১৮৯৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগোর বিশ্বধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের আবির্ভাব এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলী ও তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া বর্ণে বর্ণে প্রমাণ করে দিয়েছিল বিবেকানন্দের ঐ কথাগুলি কত সত্য ছিল।

বিবেকানন্দের শিকাগো-ভাষণের বিরাট প্রতিক্রিয়ার সংবাদ-তরঙ্গ যখন ভারতবর্ষের বুকে আছড়ে পড়ল তখন তাতে বিপুলভাবে আলোড়িত হল গোটা ভারতবর্ষের মানুষ। এক ধাক্কায় একটি ঘুমন্ত দেশ জাগ্রত হয়ে উঠল, একটি মানুষের আবির্ভাবে একটি জড়তাগ্রস্ত জাতি উজ্জীবিত হয়ে উঠল। ইতিহাসে সেই আবির্ভাব সূচনা করেছিল ভারতের প্রথম বিশ্ববিজয়েরও। পাশ্চাত্যের মন ও মনীষার এক উল্লেখযোগ্য অংশ সেই প্রথম প্রকাশ্যে স্বীকার করল সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে, চিন্তা ও ভাবনায়, আদর্শ ও সাধনায় ভারতের অবস্থান পাশ্চাত্যের চেয়ে অনেক উঁচুতে। পরাধীন ভারতবর্ষের সে ছিল বস্তুতই এক মহা গৌরবের লগ্ন। যা ছিল অভাবনীয়, যা ছিল অকল্পনীয় বিবেকানন্দ তা-ই ঘটালেন। তিনি সম্পন্ন করলেন তাঁর গুরুদেবের ব্রত। উত্তোলন করলেন ভারতবর্ষকে, সক্রিয় করলেন

ভারতের প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিকতাকে, 'আক্রমণ' করলেন জড়বাদী পাশ্চাত্যকে এবং অবশেষে 'জয়'ও করলেন তাকে।

॥ দুই ॥

আঠারো-উনিশ বছরের নরেন্দ্রনাথ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দক্ষিণেশ্বরে আসছেন তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখে বলতেন, তাঁর মধ্যে রয়েছে জগৎ-আলোড়নকারী বিপুল শক্তি। রোগযন্ত্রণার দুঃসহ মুহূর্তে কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "নরেন শিক্ষে দিবে। যখন ঘুরে (ঘরে ?) বাহিরে হাঁক দিবে।..." শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণাপত্র দিলেন—নরেন্দ্রনাথকে ভারত-পরিক্রমা করতে হবে এবং তারপর করতে হবে বহির্ভারত-পরিক্রমা বা বিশ্ব-পরিক্রমা। উভয় পরিক্রমা শেষ করে জগতের আচার্যরূপে দাঁড়াবেন নরেন্দ্রনাথ। নিখিল মানুষের কাছে তিনি 'হাঁক' দেবেন অর্থাৎ আহ্বান জানাবেন—যে আহ্বান মানুষের জীবনে নতুন আলোকবর্ষণ করবে, মানুষকে দেবে বাঁচার নতুন মন্ত্র, যে আহ্বানে ঘোষিত হবে মানবতার জয়গান, জীবের শিবত্বে উত্তরণের সুসমাচার, মানবের অমরতার অঙ্গীকার।

বিদ্রোহীর কণ্ঠে নরেন্দ্রনাথ বললেন: 'আমি ওসব পারব না।' স্মিতহাস্যে দুর্বলকণ্ঠে সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: 'তোর হাড় (ঘাড় ?) করবে!'[২] গুরু ও শিষ্যের এই 'সংঘর্ষ' মনে হয় গুরুর দেহান্ত পর্যন্তই চলেছিল। শিষ্য তার ভাবী ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত না থাকলেও গুরু জানতেন বিরাট এবং যুগান্তকারী এক 'মিশন' সম্পাদন করার জন্য তিনি দৈবনির্দিষ্ট। বিবেকানন্দের অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলতেন: 'মা তোকে তাঁর কাজ করবার জন্য সংসারে টেনে এনেছেন,' বলতেন: 'আমার পিছনে তোকে ফিরতেই হবে, তুই যাবি কোথায় ?'[৩]

বরানগর মঠে শ্রীম-কে নরেন্দ্রনাথ পুরোনো কথার রোমন্থন করে বলেছেন: "পাগলের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: 'তুই কি চাস ?' আমি বললাম: 'আমি সমাধিস্থ হয়ে থাকব।' তিনি বললেন: তুই তো বড় হীনবুদ্ধি। সমাধির পারে যা! সমাধি তো তুচ্ছ কথা।' "

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিক্রিয়ায় নরেন্দ্রনাথ কি অবাক হয়েছিলেন ? একদিক থেকে ভাবলে অবাক হওয়ারই কথা। কারণ ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার এতাবৎকালের যে ঐতিহ্য ও চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল তাতে তিনি বুঝেছিলেন যে, ঈশ্বরদর্শন, আত্মমুক্তি, নির্বিকল্প সমাধিপ্রাপ্তি সাধকের জীবনের পরম প্রাপ্তি। কিন্তু এখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি শুনলেন যে, শুধু ঈশ্বরদর্শন, আত্মমুক্তি এবং নির্বিকল্প সমাধিলাভ অথবা নিজ মুক্তির জন্য লালায়িত হওয়াও এক ধরনের স্বার্থপরতা, হীনবুদ্ধির পরিচায়ক। আবার অন্যদিক থেকে দেখলে এতে নরেন্দ্রনাথের অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। কারণ নরেন্দ্রনাথ তো শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুধু কাশীপুরেই নয়, দক্ষিণেশ্বরেও কতবার শুনেছেন: 'চোখ বুজলে ভগবান আছেন আর চোখ খুললে কি তিনি নেই ?' 'প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয়, আর জীবন্ত মানুষে কি হয় না ?' 'যত্র জীব তত্র শিব' ইত্যাদি! শুনেছেন দেওঘর ও কলাইঘাটায় শ্রীরামকৃষ্ণের শিবজ্ঞানে দরিদ্রনারায়ণ-সেবার কাহিনী। শুনেছেন সেই বৈপ্লবিক

ঘোষণা ঃ 'এখন দেখছি তিনিই এক-একরূপে বেড়াচ্ছেন। কখনো সাধুরূপে, কখনো ছলরূপে, কোথাও বা খলরূপে। তাই বলি সাধুরূপ নারায়ণ, ছলরূপ নারায়ণ, খলরূপ নারায়ণ, লুচ্চরূপ নারায়ণ।' দক্ষিণেশ্বরেই ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি শুনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ঃ 'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' সে সময় এই কথা শুনে তাঁর মনে হয়েছিল একটি অসাধারণ সত্য তাঁর সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে। সেদিনই তিনি সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন ভবিষ্যতে 'এই অদ্ভুত সত্য'কে তিনি জগতে প্রচার করবেন, 'বনের বেদান্ত'কে 'ঘরে' পৌঁছে দেবেন।

শুধু শোনাই নয়, নরেন্দ্রনাথ নিত্যে স্বচক্ষে দেখছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যতই অন্তিম লগ্নের নিকটবর্তী হচ্ছিলেন ততই আর্ত মানুষের নিকট 'অবিরাম আত্মদান' করতে করতে তাঁর দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বলতেন ঃ

'একটি আত্মাকেও সাহায্য করার জন্য যদি আমাকে জন্ম-জন্ম আসতে হয়,... তবু তাতে আমার কষ্ট নাই।'

'আমি একটি মানুষকেও সাহায্য করার জন্য এমন বিশ হাজার (বার) দেহত্যাগ করতে পারি। একটা মানুষকে সাহায্য করতে পারাও কি কম গৌরবের কথা।'[৪]

তখনও আগেরই মতো যে কোনও ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। কিন্তু তখন তা ছিল তাঁর একান্তই অনভিপ্রেত। "এখন তিনি সমাধিস্থ হইবার জন্য নিজেকে তিরস্কার করিতেন। কারণ তাহাতে অনেকখানি সময় নষ্ট হইত ; ঐ সময়টাতে তিনি অপর কাহাকেও সাহায্য করিতে পারিতেন। রামকৃষ্ণ বলিতেন ঃ 'মাগো! আমাকে ঐ সুখের হাত থেকে রেহাই দে মা! আমাকে স্বাভাবিকভাবে থাকতে দে ; তাতে আমি জগতেব আরো উপকার করতে পারব'।"

"তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলিতে তিনি বলিতেন, 'আমার অর্ধেকটা মরে গেছে'।"

"তাঁহার বাকি অর্ধেক অংশ...ছিল দীন-দুঃখী জনসাধারণ। ... তিনি এই দীন-দুঃখী জনসাধারণকে তাঁহার প্রিয় শিষ্যদের মতই অন্তরঙ্গ মনে করিতেন।"[৫] শুধু মনে করতেন না, তাঁর দুর্বল রুগ্ন শরীরের জন্য তিনি দীন-দুঃখী মানুষের যন্ত্রণায় তাদের পাশে দাঁড়াতে পারছেন না বলে রক্তবমন করতে করতে ক্রন্দন করতেন। বলতেন ঃ 'একি কম কষ্ট রে!' তাদের উত্তোলনকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজেব 'দায়' বলে গ্রহণ করেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ এ সমস্তই জানতেন। তিনি বুঝেও ছিলেন, এসবের প্রেরণা বেদান্ত, 'বনের বেদান্ত'কে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আনয়নের আকৃতি। একসময় তিনি অঙ্গীকারও করেছিলেন, এই ভাব ও আদর্শকে তিনি 'সংসারে সর্বত্র' প্রচার করবেন। তিনি বুঝেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ চাইছেন, হিন্দুর সহস্র সহস্র বছরের যে অধ্যাত্ম-আকাঙ্ক্ষা মানুষ ও সমাজকে অস্বীকার করে প্রধানত আত্মমুক্তির সাধনায় পরিপূর্তি লাভ করতে চেয়েছে, তার মধ্যে তিনি মানবিক ও সামাজিক মাত্রা সংযুক্ত করতে চাইছেন। তিনি চাইছেন সন্ন্যাসের ও ধর্মের এবং যাবতীয় আধ্যাত্মিক প্রয়াসের মানবিকীকরণ ও সামাজিকীকরণ (humanisation and socialisation of monasticism, of religion, of all spiritual endeavours)। তিনি বলছেন, সমষ্টি-মানুষ যদি ক্ষুধা, পীড়া ও অজ্ঞানের দ্বারা কবলিত থাকে, সেক্ষেত্রে একজন বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি মানুষের ঊর্ধ্বায়ত জীবনের

আকাঙ্ক্ষা এবং উর্ধ্বায়ত জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ শুধু চূড়ান্ত স্বার্থপরতাই নয়, চূড়ান্ত পাপও। সাম্যের মূল শর্ত বিশেষ অধিকারের বিলোপসাধন, সমৃদ্ধি ও কল্যাণকে সার্বিক লক্ষ্যের অভিমুখিন করা। এই 'মিশন'ই শ্রীরামকৃষ্ণের মিশন। সেই লক্ষ্যের দিকেই তিনি তাঁর প্রধান শিষ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

॥ তিন ॥

গুরুর মহাপ্রয়াণের পর ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বরানগর মঠে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণের পর থেকে তপস্যা ও বৈরাগ্যের দুর্বার প্রেরণায় মাঝে মাঝেই নরেন্দ্রনাথ মঠ থেকে প্রব্রজ্যায় বেরিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরস্কার সত্ত্বেও অন্তরের সেই সুতীব্র ব্যাকুলতা তাঁকে অস্থির করে তুলত। নির্বিকল্প সমাধির সেই আস্বাদ পুনরায় লাভ করতে হবে—এই ছিল তাঁর মনোগত বাসনা। প্রতিবারেই যাবার সময় গুরুভাইদের তিনি বলতেনঃ 'এই শেষ, আর ফিরছি না।' কিন্তু প্রতিবারেই তাঁকে কোনও না কোনও কারণে মঠে ফিরে আসতে হয়েছে। এইভাবে ১৮৮৭-তে তিনি কাশী যান। কাশীতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে ফিরে আসতে হয় বরানগর মঠে। আনুষ্ঠানিক অর্থে এবারের যাত্রাটিই ছিল স্বামীজীর 'ভাবত পরিক্রমা'ব প্রথম পর্যায়। মঠে ফিরে তিনি ডুবে যান ধ্যান ও স্বাধ্যায়ে। কতদিন সন্ধ্যায় ধ্যানে বসেছেন, সমস্ত রাত্রি ধ্যানেই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই নির্জনে তপস্যার আকূতি নিয়ে আবাব তিনি বেরিয়ে পড়লেন তাঁর দ্বিতীয়বারের ভারত পরিক্রমায় ১৮৮৮-র মাঝামাঝি। কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার ও হৃষীকেশ তিনি এবারে পরিক্রমা করেন। হৃষীকেশে থাকাকালে তিনি প্রবল জ্বরাক্রান্ত হয়ে মঠে ফিরে আসেন ১৮৮৮-র শেষাশেষি।

এবারের পরিক্রমায় কিছু বিশেষত্ব ছিল। এবার স্বামীজী শুধু তীর্থ-পরিক্রমাই করেননি, অযোধ্যা, লখনউ এবং আগ্রায় মুসলমান স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি খুব আগ্রহেব সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেনঃ "এই পর্যটনকালেই বিবেকানন্দের সম্মুখে প্রাচীন ভারত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সেই সনাতন শাশ্বত ভারত, সেই বৈদেশিক ভারত, সেই ইতিবৃত্ত ও কিংবদন্তীর গৌরবে মণ্ডিত অসংখ্য বীর ও অগণিত দেবতার ভারত, সেই দ্রাবিড়, আর্য ও মোগলের ভারত, মিলিত ভারত।"[৬] পুরাণ, ইতিহাস ও কিংবদন্তীর ভারতবর্ষের কথা তিনি অবগত ছিলেন অধ্যয়ন ও শ্রুতির মাধ্যমে, এখন সেই ভারতবর্ষের বাস্তব রূপ কিছুটা তাঁর নয়নসমক্ষে উন্মোচিত হল। প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ভারত-আবিষ্কার তথা ভারত-সত্য আবিষ্কারের সেই ছিল সূচনা। পরবর্তী কালে বিবেকানন্দের পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত ভারতচিন্তার গঠনে তথা বিবেকানন্দের সামগ্রিক গঠনে এই অভিজ্ঞতার সুদূরপ্রসারী অবদান থাকবে।

প্রথমবারের (১৮৮৭-র) ভ্রমণও—কাশীতে এক সপ্তাহ বাস—তাৎপর্যহীন ছিল না। সেবারেই প্রথম তিনি সচেতনভাবে প্রাচীন ভারতের মুখোমুখি হয়েছিলেন ত্রৈলঙ্গস্বামী, স্বামী ভাস্করানন্দ প্রমুখ সন্তপুরুষের মাধ্যমে। দেখেছিলেন ভারতের এই সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্রের পথে-পথে, ঘাটে-ঘাটে ভারতের হাজার হাজার বছরের আধ্যাত্মিক সাধনা ও আকাঙ্ক্ষা

যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। দেখেছিলেন ভারতের প্রতিটি প্রান্তের অগণিত হিন্দু নরনারী কী গভীর ভক্তি ও আর্তি নিয়ে নিত্য সেখানে এসে সমবেত হচ্ছেন। বুদ্ধ ও শঙ্করের পদধূলিধন্য এই পবিত্রভূমি 'নবযুগের বুদ্ধ ও শঙ্কর'কে এক নতুন চেতনার ভূমিতে স্থাপন করেছিল।

স্বামী গম্ভীরানন্দের মতে, এবাবের পরিক্রমায় স্বামীজীর মধ্যে অস্ফুটে তাঁর ভাবী কর্মজীবনের উন্মেষলাভ শুরু হয়েছিল, যে কর্মজীবনে 'বিবেকানন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে নামাইয়া দিয়াছিলেন।'[৭] স্বামীজীর চিন্তার এই অস্ফুট পরিবর্তন সম্পর্কে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ 'কাশী হইতে বরানগরে ফিরিয়া স্বামীজী অভ্যাসানুরূপ ধ্যান-ধারণা, আলাপ-আলোচনা ও শাস্ত্রপাঠাদিতে ডুবিয়া গেলেন। পার্থক্যের মধ্যে কেবল এই যে, এই তীর্থদর্শনকালে তিনি ভারতাত্মার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছিলেন ও বহু বিচিত্র মতবাদেরও সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি পূর্বাপেক্ষা প্রসারিত হওয়ায় এখন তিনি চাহিতেন যে, গুরুভ্রাতাদের চিন্তারাজ্যও অনুরূপ বিস্তারলাভ করুক।' চকিতে তাঁর মনে ধর্মপ্রচারের সংকল্প উঠত এবং দুঃস্থ ও নিপীড়িতদের দুঃখমোচনার্থ কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে অভিলাষ জাগত, বেদান্ততত্ত্বকে কার্যে পরিণত করার চিন্তায় তাঁর মন উদ্বেলিত হত। তবে স্বামীজীর চিন্তায় এই যে পরিবর্তন তা তখনও নিছকই প্রাথমিক স্তরে। প্রাথমিক স্তরে হলেও ভাবী বিবেকানন্দের গঠন ও আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে তার প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য।

১৮৮৮-র নভেম্বরে দ্বিতীয় পর্বের পরিক্রমার পর বরানগর মঠে ফিরে এসে প্রায় পুরো একটি বছর (১৮৮৯) তিনি বরানগর মঠেই ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের (১৬ আগস্ট, ১৮৮৬) পর থেকে ১৮৮৯-এর শেষ পর্যন্ত তিন বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে দুবারে পর্যটনের জন্য মাস ছয়েক বাদ দিলে বাকি সময়ের অধিকাংশ (প্রায় আড়াই বছর) স্বামীজী কাটিয়েছেন বরানগর মঠে (বরানগর মঠের সূচনা হয় ১৯ অক্টোবর, ১৮৮৬)। ধ্যানধারণা ছাড়া এই সময়ের উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর কেটেছিল গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়নে এবং গুরুভাইদের সঙ্গে বিতর্ক, আলাপ ও আলোচনায়। বলা বাহুল্য, সকল বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনায় 'সভাপতি'র ভূমিকাটি ছিল তাঁর। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত—হিন্দুর এই ষড়দর্শন ভিন্ন বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক প্রভৃতি ভারতীয় নাস্তিক দর্শন, কান্ট, হেগেল, মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের গ্রন্থ, পাশ্চাত্য জড়বাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদের দর্শন অধ্যয়ন এবং আলোচনা তিনি করতেন। ভাষ্যটীকা সহ গীতা ও উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈবগ্রন্থাদি যেমন খুব ভালভাবে তিনি ঐ সময় পড়লেন, তেমনি প্রজ্ঞাপারমিতা, ললিতবিস্তর সহ মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের নানা গ্রন্থ, বাইবেল, টমাস আ কেম্পিসের 'ইমিটেশন অফ ক্রাইস্ট,' সেন্ট ফ্রান্সিস, ইগনেসিয়াস লায়লা প্রভৃতি খ্রীস্টীয় সন্তদের জীবনী, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ ও সন্তদের জীবনী, নানক, কবীর প্রমুখের জীবনীও তিনি আয়ত্ত করলেন। শুধু যে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়ক গ্রন্থই তিনি পড়েছিলেন তাই নয়, গিবনের বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থ, কার্লাইলের ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসও তিনি কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন। আবার শকুন্তলা, মেঘদূত থেকে শুরু করে সংস্কৃত, ইংরেজী, বাংলা ভাষার বিখ্যাত কাব্য, নাটকাদি তিনি ঐ সময় পড়েছেন, পড়েছেন বিজ্ঞানের নানা বিষয়ও। বস্তুত ধর্ম, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান,

ইতিহাস, সঙ্গীত, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি জ্ঞানের বিচিত্র বিভাগে তিনি ঐ সময় পরিক্রমা করেছেন। তাঁর পরিক্রমার পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যখন যেখানে থেকেছেন যথা শ্রীনগর, হৃষীকেশ, মীরাট, জয়পুর, খেতড়ি, পোরবন্দর, বরোদা, বোম্বাই, গোয়া ইত্যাদি সর্বত্রই তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে গভীরতর অধ্যয়নে নিরত থাকতে দেখা গিয়েছে। পরবর্তী কালে শিকাগোর ধর্মমহাসভায় ও অন্যত্র বিদগ্ধজনের সভায় তাঁর জ্ঞানের বিস্তৃতি ও গভীরতা দেখে মানুষ বিস্মিত হয়েছে, আমেরিকা ও ইউরোপের সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানীরা বিমুগ্ধ হয়েছেন।

বস্তুত, বরানগর মঠে যে তাঁর নেতৃত্বে অসাধারণ শিক্ষালয়টি গড়ে উঠেছিল সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূলদেহে উপস্থিত না থাকলেও তিনিই অপ্রত্যক্ষে নরেন্দ্রনাথকে প্রেরণাদান করেছিলেন জাতি ও সম্প্রদায়ের সীমা অতিক্রম করে সীমাহীন মহাসত্যের অনন্ত দিগন্তের দিকে অক্লান্তভাবে অগ্রসর হতে, যেখানে সকল বিশেষ ও খণ্ডিত সত্য গিয়ে মিলিত হয়েছে।

১৮৮৯-এর ডিসেম্বরের শেষে আবার তপস্যার উদ্দেশে তিনি বরানগর মঠ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। শরীরপাত যদি হয় তো হোক কিন্তু সাধন-সিদ্ধি এবার চাই-ই—এই সংকল্প করে তিনি এবার বেরিয়েছিলেন। প্রথমে বৈদ্যনাথ এবং পরে এলাহাবাদ হয়ে তিনি ১৮৯০-এর ২২ জানুয়ারি এসে উপস্থিত হলেন গাজিপুরে। সমকালের বিখ্যাত সিদ্ধযোগী পওহারী বাবা গাজিপুরে তাঁর নির্জন গুহায় বাস করতেন। পওহারী বাবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে স্বামীজী এতই মুগ্ধ হন যে, স্থির করেন তাঁর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে যোগসাধনার পথে তিনি আত্মানুসন্ধানে নিরত হবেন। সেইকালে শ্রীরামকৃষ্ণের চকিত আবির্ভাব ও অকথিত বাণীতে ছিল তাঁর ব্রতসাধনে আত্মোৎসর্গের আহ্বান।

গাজিপুর-পর্ব নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এখানেই কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী তাঁর পাণ্ডিত্য, চিন্তার স্বচ্ছতা ও যুক্তিঋদ্ধ বিচার পটুতায় অভিভূত হয়ে তাঁর অনুরাগীতে পরিণত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম স্থানীয় জেলা-জজ মিঃ পেনিংটন হিন্দু সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁকে ইংলণ্ডে গিয়ে প্রচার করতে অনুরোধ করেন।

॥ চার ॥

১৮৯০-এর এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে স্বামীজী বরানগর মঠে ফিরে এলেও ১৮৯০-এর জুলাই মাসের মাঝামাঝি আবার প্রব্রজ্যায় বের হলেন। বললেন এবার লক্ষ্য, 'সোজা হিমালয়।' যাবার আগে শ্রীমা সারদাদেবীকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে এলেন। এবারে তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর সঙ্গী হলেন গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ। সেবার তাঁর প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল কেদারনাথ এবং বদরীনাথে তপস্যা করার। সেজন্য তাঁরা আলমোড়ার পথ ধরলেন। বলা বাহুল্য নরেন্দ্রনাথের এই যাত্রায় অসাধারণত্ব কিছু ছিল না। অন্যান্য পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর মতই তাঁর এই যাত্রা সূচনায় ছিল একান্তই তীর্থযাত্রা—ভগবানের উদ্দেশে যাত্রা। রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন: 'নরেন ভগবানের সন্ধানেই চলিলেন।'[৮]

আলমোড়ার পথে কাঁকড়িঘাটে স্বামীজীর একটি অসাধারণ আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়। সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের (Macrocosm and Microcosm) পারস্পরিক

সম্পর্ক সেদিন তাঁর ধ্যানে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। পরবর্তী কালে শিকাগো ধর্মমহাসভায় এবং অন্যত্র উদ্‌ঘোষিত তাঁর বক্তব্যের সর্বাংশে ধ্বনিত যে প্রধান বার্তা—মানবের দেবত্ব এবং জীবে জীবে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা—তার নির্মাণে এই উপলব্ধির একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকবে। আলমোড়া থেকে তাঁরা কেদারনাথ ও বদরীনাথের পথে যাত্রা করলেন। কিন্তু কর্ণপ্রয়াগে এসে শুনলেন সরকার কেদারনাথ ও বদরীনাথের পথ হঠাৎ বন্ধ করে দিয়েছেন এবং অল্প দিনের মধ্যে ঐ পথ খোলার আশাও নেই। আলমোড়ার আগে নৈনিতালেই স্বামী অখণ্ডানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কর্ণপ্রয়াগ ছাড়ার পর স্বামীজীও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দের অসুস্থতা আরও বেড়েছে কিন্তু সেসব অগ্রাহ্য করেই তাঁরা এগিয়ে চললেন। হিমালয়ের নির্জন-সাধনায় মগ্ন হয়ে থাকার আকূতিতে ব্যগ্র স্বামীজী স্বামী অখণ্ডানন্দকে নিয়ে শ্রীনগর হয়ে চলে যান টিহিরি। সেখানে সাধনার উপযুক্ত স্থানও পাওয়া গেল। কিন্তু স্বামী অখণ্ডানন্দ এমনই অসুস্থ হয়ে পড়লেন তাঁদের নেমে আসতে হল দেরাদুনে। দেরাদুনে গুরুভ্রাতার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে স্বামীজী নেমে এলেন হৃষীকেশে নির্জনবাসের জন্য। সেখানে একটি পর্ণকুটিরে ডুবে গেলেন তপস্যায়। এতদিনে বুঝি তাঁর সুতীব্র তপস্যা-বাসনা পরিতৃপ্তির পথ খুঁজে পেল। একদিন সেখানে পুনরায় নির্বিকল্প সমাধিভূমিতে আরোহণও করলেন তিনি। কিন্তু নির্বিকল্প ভূমি থেকে নেমে আসার সময় তিনি শুনলেন বিধাতার নির্দেশঃ তাঁকে একটি বিশেষ ব্রত সম্পন্ন করতে হবে। তার আগে তাঁর বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই। জানলেন, না, আর ধ্যানের গুহা নয় আর ঈশ্বরের সন্ধান নয়—এবার সমাজ-সংসার, এবার লোকালয়, এবার মানুষ—এবার মানুষের সন্ধান। এবার মাতৃভূমির পুনর্জাগরণে আত্মদান, এবার দেশে দেশান্তরে অমর ভারতের শাশ্বত সনাতন বাণী প্রচার, এবার মানবমুক্তির পথসন্ধান।

১৮৯০-এর নভেম্বরের মাঝামাঝি (মতান্তরে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ) স্বামীজী এলেন মীরাটে। তীর্থ পরিক্রমা করতে করতে স্বামীজীর বেশ কয়েকজন গুরুভ্রাতাও ঐ সময় মীরাটে একত্র হয়েছিলেন। একদিন অকস্মাৎ সকল গুরুভ্রাতাকে ডেকে স্বামীজী বললেনঃ 'আমার জীবনব্রত স্থির হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে আমি একাকী অবস্থান করব। তোমরা আমায় ত্যাগ কর।'

॥ পাঁচ ॥

মীরাট থেকে শুরু হল বিবেকানন্দের নতুন পরিক্রমা। এই নিঃসঙ্গ যাত্রায় কখনও বিবিদিষানন্দ, কখনও সচ্চিদানন্দ, কখনও বিবেকানন্দ নামের আড়ালে নিজের পরিচয় গোপন রেখে এগিয়ে চললেন তিনি। মীরাট থেকে তিনি প্রথমে যান দিল্লি। দিল্লির পথে পথে পুরোনো ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করতে লাগলেন তিনি।

দণ্ড কমণ্ডলু হাতে অজ্ঞাতপরিচয় পরিব্রাজক দিল্লি থেকে বেরিয়ে রাজপুতানার পথ ধরলেন। বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমার শেষ ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পর্বের এবং যথার্থ অর্থে ভারত পরিক্রমার সূচনা হল তখনই। বছর দুয়েকের জন্য 'ভারতের মহানিঃসীমতায়' তিনি 'নিমজ্জিত' হয়ে গেলেন।[৯] আর হিমালয় নয়, 'নির্জনতার আনন্দলোক' আর নয়। তাঁর এই পরিক্রমা সাধারণ অর্থে কোনও আধ্যাত্মিক পরিক্রমা ছিল না। কারণ,

তথাকথিত ঈশ্বরের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল না। হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এই প্রথম একজন সন্ন্যাসী ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে মানুষের সন্ধানে পরিক্রমা করলেন। দিল্লি থেকে তাঁর যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার সমাপ্তি হয়েছিল প্রথম পর্বে কন্যাকুমারীতে এবং পরবর্তী পর্বে শিকাগোয়। রোমাঁ রোলাঁ অপূর্ব ভাষায় লিখছেন ঃ "হিমালয়ের নৈঃশব্দ হইতে তিনি মানবতার ধূলিধূসর কোলাহলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন।... তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল।... তিনি যদি মরিতেন—তবে পথেই মবিতেন, তাঁহার নিজের পথে—যে পথ তাঁহাকে তাঁহার ভগবান দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

"এ ছিল এক মহানিষ্ক্রমণ। তিনি ডুবুরির মতো ভারতের মহাসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ভারতের মহাসমুদ্রই তাঁহার পথরেখাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল।"...[১০]

রাজপুতানা থেকে গুজরাট, গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র থেকে মধ্যপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ থেকে পুনরায় মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র থেকে গোয়া, গোয়া থেকে কর্নাটক, কর্নাটক থেকে তামিলনাদের দক্ষিণ অংশ ছুঁয়ে ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত কন্যাকুমারী। একেবারে আক্ষরিক অর্থেই হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ। শত শত যোজনব্যাপী এই বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করে বিবেকানন্দ কন্যাকুমারীতে এসে পৌঁছেছিলেন ১৮৯২-এর ২৪ ডিসেম্বর। এই দীর্ঘ পরিক্রমায় তিনি প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন ভারতের মাটি ও মানুষের সঙ্গে, ভারতের গৌরব ও ঐতিহ্যের সঙ্গে, ভারতের দৈন্য ও অবক্ষয়ের সঙ্গে। দেখেছিলেন ধর্মের বিকৃতি, গণমানুষের দুর্দশা, নারীজাতির প্রতি সমাজের উপেক্ষা। বেদনায় পীড়িত হয়ে কন্যাকুমারীতে ভারতেব সর্বশেষ সমুদ্রশিলায় সাঁতার কেটে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি বসেছিলেন ধ্যানে। ২৪ থেকে ২৬ ডিসেম্বর—তিন দিন, তিন রাত্রি তিনি ঐ শিলাদ্বীপে ধ্যান করেছিলেন। তাঁর সেই ধ্যান ঈশ্বরের ধ্যান ছিল না, ছিল আসমুদ্রহিমাচল ভারতের ধ্যান। সেই ধ্যানে তিনি আবিষ্কার করলেন ভারতবর্ষকে—ভারত-সত্যকে। আত্মমুক্তিকামী সন্ন্যাসী তখন রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছেন দেশপ্রেমিকে, দেশপ্রেমিক সন্তে, সন্ত ঋষিতে, ঋষি সংস্কারক ও সংগঠক দেশনায়কে এবং দেশনায়ক প্রত্যাদিষ্ট বিশ্বাচার্যে। গ্রন্থের এক-একটি পৃষ্ঠার মতো তাঁর নয়নসমক্ষে উন্মোচিত হয়ে গেল ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ধ্যানের স্বচ্ছ আলোকে কালের প্রস্তরফলকে তিনি পাঠ করলেন কোন পথে ভারত তার অতীতের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বর্তমানে কেন তার এই চূড়ান্ত অধঃপতন, কোন পথে আবার ভারত ফিরে পাবে তার হৃতগৌরব, কিভাবে সেই গৌরব হবে উজ্জ্বলতর। ভারত পরিক্রমাকালে জুনাগড়, পোরবন্দর, মহাবালেশ্বর, খাণ্ডোয়া এবং মহীশূরে তাঁকে অনেকেই আমেরিকার শিকাগোয় আসন্ন ধর্মমহাসভায় যোগদান করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর মনেও কখনও কখনও সে ইচ্ছা জেগেছে। কিন্তু তা কখনও সংকল্পে রূপ নেয়নি। তা রূপ নিল কন্যাকুমারীতে।

ধ্যান থেকে উঠে তিনি তাকালেন সমুদ্রের দিকে, তাকালেন সমুদ্রপারের দেশগুলির দিকে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন. তিনি যাবেন সমুদ্রপারে। তিনি যাবেন আমেরিকার ধর্মমহাসভায়। পৃথিবীর নবীনতম সভ্যতার লীলাভূমিতে পৌঁছে দেবেন পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার পীঠভূমির বাণী, যে বাণী আমেরিকা তথা ভোগবাদী সমগ্র পাশ্চাত্যের স্থায়িত্বের জন্যই প্রয়োজন। বিনিময়ে তিনি আমেরিকা থেকে জেনে আসবেন তার ঐহিক সমৃদ্ধির

কৌশল, তার গণ-জাগরণের ও নারী-জাগরণের রহস্য। সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের কাছে তিনি তুলে ধরবেন ভারতের গৌরবের খতিয়ান, উন্মোচন করবেন ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে 'একটি সহিষ্ণু জাতের ওপর কঠিনতম নিষ্ঠুরতা ও উৎপীড়ন' চালিয়েছে তার ইতিহাস। এতে দুটি কাজ হবেঃ পাশ্চাত্য আবিষ্কার করবে ভারতবর্ষকে আর ভারতবর্ষ করবে নিজেকে, যে আবিষ্কার সূচনা করবে তার পুনর্জাগরণের, তার দিগ্বিজয়ের।

ধ্যানোত্থিত সন্ন্যাসী সমুদ্রশিলা থেকে নেমে আবার যাত্রা শুরু করলেন। তামিলনাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ পরিক্রমা করে মানুষকে বোঝালেন তাঁর পাশ্চাত্য গমনের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের কথা। এদিকে চলতে থাকল তাঁর শিকাগো ধর্মমহাসভায় যাত্রার আয়োজন ও প্রস্তুতি। অবশেষে ৩১ মে ১৮৯৩ বোম্বাই বন্দর থেকে 'পেনিনসুলার' জাহাজে শুরু হল তাঁর শিকাগোর বিশ্বধর্মসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে অভিযাত্রা। তাঁর কাছে ধর্মমহাসভার কোনও আমন্ত্রণ ছিল না, রবাহূত হয়েই যাত্রা করলেন তিনি। তখনও কেউ বুঝতে পারেনি কলম্বাস আবিষ্কৃত নবীন মহাদেশের বুকে অজ্ঞাতপরিচয় অনাহূত কপর্দকহীন যে সন্ন্যাসী পদার্পণ করতে চলেছেন তিনিই ধর্মমহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব—আগামী দিনের নতুন কলম্বাস যিনি নিখিল মানবের জন্য আবিষ্কার করতে চলেছেন নতুন পৃথিবী।

কেউ বুঝতে না পারলেও বিবেকানন্দের মন কিন্তু বলেছিল যে, ধর্মমহাসভার নায়ক হতে চলেছেন তিনিই। জাহাজে ওঠার কয়েকদিন আগে মাউন্ট আবু থেকে বোম্বাইয়ের পথে ট্রেনে তিনি গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দকে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেনঃ 'আমেরিকায় যেসব প্রস্তুতি-আয়োজন চলছে সেসব কিছু (নিজের বুকে আঙুল দেখিয়ে) এর জন্যই। আমার মন আমাকে তা-ই বলছে। শীঘ্রই তার প্রমাণ পাবে।'[১১]

১৮৯০-এর আগস্ট মাসে বারাণসীতে তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে বলেছিলেনঃ "আবার যখন এখানে ফিরব, তখন আমি সমাজের ওপর একটা বোমার মতো ফেটে পড়ব, আর সমাজ আমাকে কুকুরের মতো অনুসরণ করবে।"[১২] যত দিন গিয়েছে ততই তিনি উত্তরোত্তর অধিকতর সচেতন হয়েছেন সেই শক্তির প্রচণ্ডতা এবং অপ্রতিরোধ্যতা সম্পর্কে। পোরবন্দরে ১৮৯১-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে গুরুভ্রাতা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ "ঠাকুর যেসব কথা বলতেন, যা আমি চপলতাবশত তখন হেসে উড়িয়ে দিতাম, এখন সেগুলির সত্যতা ক্রমে ক্রমে অনুভব করছি। আমার মনে হয়, আমার ভিতর যে শক্তি আছে, তা দিয়ে আমি জগৎ ওলট-পালট করে দিতে পারি।"[১৩] ১৮৯২-এর এপ্রিলের শেষে মহাবালেশ্বরে স্বামীজীর সঙ্গে গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দের সাক্ষাৎ হয়। সে সময় স্বামীজী স্বামী অভেদানন্দকে বলেনঃ "আমি এক দুর্বার শক্তি অনুভব করি, মনে হয়, আমি বিস্ফোরণের মতো ফাটিয়া পড়িব। আমার মধ্যে এত শক্তি আছে যে, আমার মনে হয় আমি সমগ্র পৃথিবীকে আমূল বদলাইতে পারিব।"[১৪] এই বিরাট শক্তির দ্বারা যে একটি বিরাট 'ব্রত' উদ্‌যাপন করতে তিনি দৈবনির্দিষ্ট তাও তিনি অবহিত ছিলেন। মহাবালেশ্বরে অবস্থানকালেই লিমডির ঠাকুরসাহেবকে তিনি বলেছিলেনঃ "একটা অদ্ভুত শক্তি আমাকে জোর করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর আমার কাঁধে এক মহান কর্মভার অর্পণ করে গিয়েছেন। যে পর্যন্ত না তা শেষ হয়, ততদিন আমার বিশ্রাম নেই।"[১৫]

বস্তুত পরিক্রমাকালে স্বামীজী যেখানেই গিয়েছেন, সে রাজদরবারই হোক অথবা বিদগ্ধ সমাজই হোক, সর্বত্রই সকলে অনিবার্যভাবে অনুভব করেছেন, তিনি এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তি, জগতে কোনও অসাধারণ কার্যসাধনের জন্য তাঁর জন্ম হয়েছে। হিমালয় থেকে নেমে যতই তিনি অগ্রসর হয়েছেন ততই মানসিকভাবে, বৌদ্ধিকভাবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে ক্রমেই পূর্ণতর হয়ে উঠেছেন এবং যখন তিনি কন্যাকুমারীর পর বোম্বাইয়ে জাহাজে উঠেছেন তখন তাঁর গঠন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, তিনি হয়ে উঠেছেন পূর্ণমানব বিবেকানন্দ। তাঁর সকল অপূর্ণতা, সকল সংস্কার খসে পড়েছে। খোলস ছেড়ে যিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন তিনি যেন এক নতুন মানুষ, যেন এক নতুন ব্যক্তি। তাঁর দ্বিজত্বলাভ ঘটেছে, যে দ্বিজত্বলাভ ছিল তাঁর আচার্যদেবের আকাঙ্ক্ষিত। বিবেকানন্দের নবজন্ম লাভ হয়েছে তখন। তাঁর মধ্যে তখন সাকার হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষ, স্বয়ং ভারতাত্মা। রোমাঁ রোলাঁ সেকথাই বলছেন : 'তিনি (পরিক্রমাকালে) কেবলই শিখিতেছিলেন, শিখাইতেও ছিলেন, (আর) নিজেকে ধীরে ধীরে করিয়া তুলিতেছিলেন সমগ্র ভারতের বিবেক, ভারতের ঐক্য, ভারতের নিয়তি। এগুলি (অবশেষে) সমস্তই তাঁহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিশ্ব এগুলিকে বিবেকানন্দ রূপেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।'[১২]

শিকাগোর উদ্দেশে জাহাজে যে-বিবেকানন্দ উঠতে যাচ্ছেন তাঁকে দেখে স্বামী তুরীয়ানন্দের মনে হয়েছিল, তিনি এখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত—ভারত-পরিক্রমা শেষ করে এখন বহির্ভারতে মানুষকে আহ্বান জানাবেন জগতের আচার্য বিবেকানন্দ। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলছেন : "স্বামীজীর ভাস্বর মুখমণ্ডল দেখে মনে হল তিনি সাধনা শেষ করেছেন এবং জগতের নিকট গুরুর বাণী প্রচার করার জন্য যাচ্ছেন।"[১৩]

এবার জগৎ শুনবে রামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর, ভারতবর্ষের কণ্ঠস্বর, যে ভারত মরেনি, যে ভারত মরবে না। যে ভারত পুরোনো হয় কিন্তু কখনও স্থবির হয় না জরাগ্রস্ত হয় না। যে ভারত নবীন—চিরনবীন। সেই সনাতন অথচ চিরনবীন, চিরযৌবনসম্পন্ন ভারতের পুনর্জাগরণের জন্য তার বিশ্ববিজয় অভিযানের জন্য রামকৃষ্ণ তাঁর সেনাপতিকে ধ্যানের গুহা থেকে টেনে বের করে 'যুদ্ধক্ষেত্রে' নিক্ষেপ করেছিলেন। বিবেকানন্দের এই যাত্রা ছিল রামকৃষ্ণের সেই ব্রতসাধনের জন্য যাত্রা। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অপূর্ব ভাষায় লিখলেন এই যাত্রার তাৎপর্য : "The going forth of Vivekananda, marked out by the Master as the heroic soul destined to take the world between his two hands and change it, was the first visible sign to the world that India was awake not only to survive but to conquer."[১৪]—বিবেকানন্দের যাত্রা, যে-বিবেকানন্দকে তাঁর গুরু চিহ্নিত করেছিলেন সেই বিরাট শক্তিধর পুরুষ হিসেবে যিনি গোটা পৃথিবীটাকে দু'হাতে ধরে পালটে দিতে সমর্থ, ছিল পৃথিবীর সম্মুখে প্রথম সুস্পষ্ট লক্ষণ যে ভারতবর্ষ জাগ্রত হয়েছে, শুধু নিজে বাঁচার জন্য নয়, (পৃথিবীকে) জয় করার জন্যও।

মঞ্চ প্রস্তুত। প্রস্তুত মঞ্চ পুরুষও। এখন শুধু অপেক্ষা তাঁর আবির্ভাবের। অপেক্ষা মানবমুক্তির নতুন সুসমাচার উদ্‌ঘোষণের। [দেশ পত্রিকার সৌজন্যে]

জন হেনরি রাইট

প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা

'আপনার কাছে পবিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তার কিরণদানের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা একই কথা' স্বামী বিবেকানন্দের পাণ্ডিত্যের মূল্যায়নসূচক এই মন্তব্যটি করেছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালযেব গ্রীক ভাষার অধ্যাপক জন হেনরি রাইট। এই বিচক্ষণ মহানুভব মানুষটির জন্য স্বামীজীব শিকাগো ধর্মসভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। ঐ সভায় ঐতিহাসিক ভাষণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের কাছে যেমন আমরা ঋণী, তেমনই মিঃ রাইটেব কাছেও আমাদের ঋণস্বীকার অবশ্যকর্তব্য। স্বামীজীব হাতে সেদিন কোনও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচযপত্র ছিল না, যা ঐ সভায় যোগদানের অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল। তাছাড়া প্রতিনিধিদেব নাম তালিকাভুক্ত করার নির্দিষ্ট সময়সীমাও পূর্বেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ডঃ রাইট যেন অন্তর্দৃষ্টিবলে বুঝেছিলেন জ্ঞানসিন্ধু ভারতীয় সন্ন্যাসীব উদাব ধর্মভাব জগৎসমক্ষে প্রকাশিত করার এইটিই সুবর্ণসুযোগ। স্বামীজীকে ধর্মসভায় প্রেরণের সমস্ত দাযভার স্বীকার করে ঐ কর্মব্যস্ত মানুষটি মহাসভার জেনারেল কমিটিব চেয়ারম্যান রেভারেণ্ড জন হেনবি ব্যারোজকে একটি চিঠি দেন। তাতে রাইট লিখেছিলেনঃ "ইনি এমনই একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে আমাদের সকল অধ্যাপককে একত্র করলেও এঁর সমকক্ষ হবেন না।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানিত অধ্যাপকেব পরিচিতি-পত্রকে মহাসভার কর্তারা গুরুত্ব না দিয়ে পারেননি। বলা বাহুল্য, ডঃ রাইট নিজেই তৎকালীন আমেরিকায় এক স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষা তখনই বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট সমাদৃত। Dictionary of American Biography-তে অধ্যাপক রাইটের জ্ঞানভাণ্ডারকে encyclopaedic (জ্ঞানকোষ সদৃশ) বলা হয়েছে। যদিও রাইটেব পঠন-পাঠনের ক্ষেত্র ছিল প্রধানত Philology, Classical Archaeology এবং Greek History তবু আরও অনেক বিষয়েই শিক্ষাদানেব যোগ্যতা তাঁর ছিল। সুতরাং স্বামীজীর অসাধারণ ধীশক্তি ও জ্ঞানের মূল্যায়নে তিনি যথেষ্টই সক্ষম ছিলেন। যথার্থ জহুরীর দৃষ্টিতেই তিনি বিবেকানন্দরূপ মহার্ঘ রত্নটিকে চিনে নিতে পেরেছিলেন এবং মানবজাতির সম্পদসদৃশ এই ব্যক্তিকে জগৎসভায় পরিচিত করার কাজটিকে তিনি মহান কর্তব্য বলে স্বীকার করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাঁরা কোনও

মহৎকার্যে সহৃদয় সহায়তা ক'রে, মূলনায়কের পার্শ্বচরিত্রে থেকে, ইতিহাসে অমর স্থান অধিকার করে থাকেন। এঁরা নিজেরা পাদপ্রদীপের আলোয় কোনদিন এসে দাঁড়ান না, অন্যকে আলোকিত হ'তেই সাহায্য করেন। মানুষের জাগরণের ইতিহাসে এঁদেরও অবদান অপরিসীম। জন হেনরি রাইট এমনই একজন মহানুভব ব্যক্তি। বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

স্বামীজীর ধর্মমহাসভায় যোগদান একটি দৈবনির্দিষ্ট ঘটনা। আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে মাদ্রাজের কিছু অনুগত ভক্ত, খেতড়ির রাজা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা ও উৎসাহে তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর ব্যক্তিগত অনুভব—এই ভ্রমণেব পিছনে তাঁর গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইচ্ছাই কার্যকরী। আর রয়েছে জগন্মাতা শ্রীসারদাদেবীর প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে সামান্য অর্থ ও পরিচ্ছদ সম্বল করে তিনি বিদেশের মাটিতে পদার্পণ করলেন। এর পিছনে তাঁর আপন বজ্রদৃঢ় মনোবল ও ঐকান্তিক ঈশ্বরনির্ভরতাই প্রমাণিত হয়। ভগিনী নিবেদিতা এই প্রসঙ্গেই কৌতুক করে বলেছেনঃ "হিন্দুধর্ম যেমন অপরিকল্পিত ও অসংগঠিতভাবে ধীরে ধীরে পূর্ণরূপ পেয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মসভায় যোগদানের অপরিকল্পিত অব্যবস্থাও যেন তারই প্রতিরূপ।" বাস্তবিক স্বামীজী এই সভার সময় বা তারিখ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। জানতেন না যোগদানের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মকানুনও। তিনি ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন ৩১ মে, ১৮৯৩। সভা শুরু হওয়ার কথা ১১ সেপ্টেম্বর। সুতরাং নির্ধারিত দিনের অনেক আগেই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন। অর্থের আনুকূল্য একেবারেই ছিল না। আমেরিকার মতো বিলাসবহুল দেশে আর্থিক অসচ্ছলতা যে কি প্রকার কষ্টদায়ক, তা স্বামীজী মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। সুতরাং মহাসভায় যোগদানের পূর্বে তাঁকে অনেক শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে। এইসময় স্থানীয় কয়েকজন শুভার্থীর পরামর্শে অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ের জায়গা বস্টনে আসা স্থির করেন।

স্বামীজী যখন ভ্যাঙ্কুবর থেকে শিকাগো যাচ্ছিলেন, তখন ট্রেনে কেট স্যানবর্ন নামে এক প্রৌঢ়া বিদুষী মহিলার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তিনি স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে ও বেশভূষায় আকৃষ্ট হয়ে ঠিকানা দিয়ে তাঁকে ম্যাসাচুসেট্সে নিজের খামার বাড়ি ব্রিজি মেডোজে আমন্ত্রণ জানান। এই ভদ্রমহিলার curio বা নানান অদ্ভুত, কৌতূহলোদ্দীপক জিনিস সংগ্রহের নেশা ছিল। উনি হয়তো তেমনই কিছু আজব বস্তু ভেবে স্বামীজীকে স্বগৃহে আহ্বান জানান। যাই হোক স্বামীজী ব্যয়সংকোচনের অভিপ্রায়ে কেট স্যানবর্নের অতিথি হয়েই ম্যাসাচুসেট্সে চলে এলেন। এঁর বাড়ি থেকেই আলাসিঙ্গাকে স্বামীজী লিখেছেনঃ "এখানে (স্যানবর্নের বাড়িতে) থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে।"

তবে শ্রীভগবানের লীলা বোঝা দায়। দুঃখের মধ্য দিয়েই তিনি শরণাগতের দিকে সাহায্যের হাতখানি বাড়িয়ে দেন। এই স্যানবর্নের মাধ্যমেই স্বামীজী এবং ডঃ রাইট পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান। শ্রীযুক্ত রাইট যেমন অসাধারণ মেধা ও প্রজ্ঞাসমন্বিত একজন যথার্থ প্রাচ্য পুরুষকে দেখলেন, স্বামীজীও এই প্রথম একজন যথার্থ

পাশ্চাত্য মনীষী ও সুধী ব্যক্তিকে দর্শন করে আশ্বস্ত ও প্রীত হলেন।

ডঃ রাইট তাঁর কর্মক্ষেত্র হার্ভার্ডে থাকতেন। স্বামীজী যখন স্যানবর্নের বাড়িতে অবস্থান করছেন, তখন ওখানে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হয়েছে। ডঃ রাইট গ্রীষ্মাবকাশে আটলান্টিকের পূর্ব উপকূলে অ্যানেস্কোয়াম নামে একটি নির্জন স্থানে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

মেরী লুইস বার্ক লিখছেন অ্যানেস্কোয়াম ছিল "a popular and picturesque little sea side resort village on Cape Ann some 40 miles North east of Boston where the Wright family was spending the summer." পূর্বপরিচিত কেট স্যানবর্নের কাছ থেকে সংবাদ পেয়েই তিনি এই ঝঞ্ঝাসদৃশ অদ্ভুত ভারতীয় সন্ন্যাসীকে দেখতে আসেন। কিন্তু কোনও বিশেষ কারণে স্বামীজীর সঙ্গে সেদিন তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। বিধাতার অভিপ্রায় বোধহয় অন্যরূপ ছিল। কারণ অল্পসময়ের জন্য পরস্পরের সাক্ষাৎ না হয়ে সেদিন ভালই হয়েছিল। ঐদিন দেখা না হওয়ায় ডঃ রাইট স্বামীজীকে অ্যানেস্কোয়ামে তাঁর বাড়িতে দুদিন কাটিয়ে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আসেন। স্বামীজী সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। স্বামীজী দুটি দিন ওঁদের সঙ্গে ছিলেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা অক্লান্তভাবে উভয়ে নানান প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। এই দীর্ঘ সময়ের আলাপচারিতায় ডঃ রাইট স্বামীজীর অত্যাশ্চর্য মেধা, স্মৃতিশক্তি ও গভীর পাণ্ডিত্যে, সর্বোপরি তাঁর সুমহান ব্যক্তিত্বে এতটাই মুগ্ধ হন যে তখনই স্থির করেন আসন্ন বিশ্বধর্মসম্মেলনে প্রাচ্যধর্মের যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে স্বামীজীকে তিনি পাঠাবেন।

এসব তথ্য আমরা জানতে পারি শ্রীযুক্ত রাইটের সুযোগ্যা সহধর্মিণী মেরী টাপ্পান রাইটের নিজের মাকে লেখা চিঠি থেকে। মিসেস রাইটেরও অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ছিল। স্বামীজীকে প্রথম দর্শনের যে বিবরণ তিনি তাঁর মাকে চিঠিতে দিয়েছেন, তা তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। ২৯ আগস্ট, অ্যানেস্কোয়াম থেকে মিসেস রাইট লিখছেনঃ "তিনি (স্বামীজী) শুক্রবার এসেছিলেন। লম্বা গেরুয়া আলখাল্লা ছিল পরনে। সকলেই অবাক হল দেখে। প্রাচ্যদেশীয় একজন খুব সুন্দর চেহারার মানুষ... বয়সে তিরিশ কিন্তু সভ্যতায় সুপ্রাচীন। তিনি সোমবার পর্যন্ত ছিলেন। আমি এ পর্যন্ত যত বিশেষ উল্লেখযোগ্য মানুষ দেখেছি, ইনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আমরা সারাদিন, সারারাত কথা বলেছি, পরদিন সকালে আবার সাগ্রহে আলাপ শুরু করেছি। সারা শহর তাঁকে দেখবার জন্য একেবারে যেন মেতে উঠেছিল।" তিনি লিখেছেনঃ "Chiefly we talked religion. It was a kind of revival, I have not felt so wrought up for a long time myself. ...He is wonderfully clever and clear in putting his arguments and laying his trains of thought to a conclusion. You can't trip him up, nor get ahead of him." তাঁকে ফাঁদে ফেলা যায় না আবার কেউই তাঁকে অতিক্রম করতে সমর্থ নয়—কি সুন্দর ও যথার্থই না এই মন্তব্য! চিঠিখানি একইসঙ্গে যেন মিসেস রাইটের মনেরও প্রতিলিপি।

বাস্তবিক, ডঃ রাইট ও তাঁর পরিবারের ওপর স্বামীজীর এমনই প্রভাব পড়েছিল যে ওঁরা প্রায়শই উল্লেখ করতেন 'Our Swami' বা আমাদের স্বামীজী বলে। অ্যানেস্কোয়াম থেকেই ডঃ রাইট স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মসভায় যোগদানের জন্য সুপারিশ করে ডঃ

ব্যারোজকে চিঠি লিখে দেন এবং শিকাগো যাওয়ার জন্য ট্রেনের একটি টিকিটও কেটে দেন। স্বামীজীর চিঠি থেকেও জানতে পারি তিনি মিঃ ও মিসেস রাইটের স্বতঃস্ফূর্ত হৃদ্যতায় মুগ্ধ। ৩০ আগস্ট, ১৮৯৩ সালেম থেকে স্বামীজী অধ্যাপক রাইটকে লিখছেন ঃ "My respects to your wife and my love to Austine and all other children, you are a real Mahatma (a great soul) and Mrs Wright is nonpareil" আবাব ২ সেপ্টেম্বর, সালেম থেকেই লিখছেন ঃ "আপনি আপনার মহীয়সী পত্নী ও শিশু সন্তানগুলি আমার মনে এমন ছাপ রেখেছেন যা কিছুতেই মুছে যাবার নয়। আমি যখন আপনাদের সঙ্গে থাকি তখন সত্যি মনে হয় যেন স্বর্গের কাছাকাছি আছি।" এই চিঠিতেই তিনি রাইটের জন্য একটি দীর্ঘ কবিতা লিখে পাঠান (স্বামীজীর মতে ঃ 'few lines written as an attempt at poetry') আত্মা বা পবমেশ্বর সম্বন্ধে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে। এটিই তাঁর প্রথম ইংরেজীতে লেখা কবিতা যার সার হল—

এ বিশ্বের সর্বত্রই ঈশ্বর ওতপ্রোত। আবার তিনিই সদা জাগ্রত আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে আত্মারূপে, তাঁকে সেই স্থানেই অন্বেষণ করতে হবে।

২ অক্টোবর শিকাগো থেকে স্বামীজী আবার ডঃ রাইটকে ধর্মসভার বিস্তৃত বিবরণ সহ চিঠি লিখেছেন। বিলম্বের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন ঃ "আমাব দীর্ঘ নীরবতার বিষয়ে আপনি কি ভাবছেন জানি না। প্রথমতঃ মহাসভায় আমি একেবারে শেষ মুহূর্তে বিনা প্রস্তুতিতে হাজিব হয়েছিলাম। কিছু সময় তাব জন্য আমাকে নিদারুণ ভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, মহাসভায় প্রায় প্রতিদিনই আমাকে বক্তৃতা কবতে হ'য়েছে, ফলে চিঠি লেখবার কোন সময়ই করে উঠতে পারিনি। শেষ কথা এবং সবচেয়ে বড় কথা, হে হৃদয়বান বন্ধু, আপনার কাছে আমি এমনই ঋণী যে তাড়াহুড়ো করে চিঠির উত্তর দেবার জন্যই শুধু কিছু একটা লিখে পাঠালে, তাতে আপনাব অহেতুক সৌহার্দ্যের অমর্যাদাই হতো।" আবও লিখেছেন ঃ "আহা, আমি কিভাবেই না চেয়েছি, আপনি এসে ভাবতের কয়েকজন মধুর চবিত্রেব মানুষকে দেখে যান—কোমলপ্রাণ বৌদ্ধ ধর্মপালকে, বাগ্মী মজুমদাবকে ; অনুভব করবেন সেই সুদূর দরিদ্র ভাবতেও এমন মানুষ আছেন, যাঁদের হৃদয় এই বিশাল শক্তিশালী দেশের মানুষেব হৃদয়েব সঙ্গে সমতালে স্পন্দিত হয়।"

শিকাগোর ধর্মসভা স্বামীজীর গৌরববৃদ্ধির সঙ্গে কিছু শত্রুবৃদ্ধিও করেছিল। তাঁর আপোসহীন সত্যপ্রচার স্বাভাবিকভাবেই কিছু অনুদার খ্রীস্টান ধর্মযাজকদেব অহমিকায় আঘাত করে। তাদের মধ্যে অনেকেই স্বামীজীর পবিত্র চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করতেও কুণ্ঠিত হননি। এমনকি একজন বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিও তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বামীজীর আমেরিকান হিতৈষী বন্ধুদেব মনোভাব বিরূপ করার প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু এমন দুর্দিনেও যে মিঃ রাইট তাঁকে সমান সহৃদয়তায় সর্বদা সমর্থন করে গেছেন, সেকথা স্বামীজী নিজেই আলাসিঙ্গাকে একটি চিঠিতে জানিয়েছেন— মিঃ রাইটই 'first man in America who stood as my friend.'

১৮৯৪ সালে মে মাসে মিঃ বাইটকে স্বামীজী লিখছেন ঃ "যদি আপনি চান, তাহলে শিকাগো থেকে ভারতীয় রাজা ও রাজমন্ত্রীদের কয়েকখানি চিঠি পাঠাতে পারি।... আমি যে প্রতারক নই, তা আপনাকে বিশ্বাস করানোর জন্য তাঁদের আপনাকে লিখতে বলবো

যদি আপনি এটা পছন্দ করেন।" ঐ একই পত্রে লিখছেন..."হে সহৃদয় বন্ধু, সর্বপ্রকারে আপনার সন্তোষবিধান করতে ন্যায়তঃ আমি বাধ্য। আর বাকি পৃথিবীকে, তাদের কচকচিকে আমি গ্রাহ্য করি না। আত্মসমর্থন সন্ন্যাসীর কাজ নয়।" মনে হয়, স্বামীজীর চরিত্র ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিদের মিথ্যা অপবাদে মিঃ রাইটের মনে যদি কোনও সংশয় জেগে থাকে, তারই অপনোদনের জন্য স্বামীজী তাঁর পক্ষ সমর্থন করে ভারত থেকে বিশিষ্ট পরিচিত ব্যক্তিদের লিখিত স্বীকৃতি পাঠানোর কথা ভেবেছেন। পরের চিঠিখানিতেও একই কথা লিখেছেনঃ "আমি যে যথার্থ সন্ন্যাসী, এ বিষয়ে সর্বপ্রকারে আপনাকে আশ্বস্ত করতে আমি দায়বদ্ধ। কিন্তু সে কেবল আপনাকেই।"

১৮৯৫ সালে শ্রীযুক্ত রাইট হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন-এর পদে উন্নীত হয়েছেন এবং মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁব চিঠিপত্রের আদানপ্রদানও হয়েছে মনে হয়।

১৮৯৪ সালে ২ ফেব্রুয়ারি ল্যাণ্ডসবার্গ একটি চিঠিতে মিসেস ওলি বুলকে জানাচ্ছেন, স্বামীজী একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখছেন অবতার তত্ত্বের ওপর। এটিই পরে ১৮৯৫ সালের মার্চে Metaphysical Journal-এ প্রকাশিত হয়। লুইস বার্কের বই থেকে জানতে পারি যে স্বামীজী ১ ফেব্রুয়ারি মিঃ রাইটকে ঐ প্রসঙ্গে একটি চিঠি লিখেছেনঃ "প্রিয় অধ্যাপকজী, আপনি হয়তো ব্যস্ত আছেন। আপনার বদান্যতার সুযোগ নিয়ে আমি আপনাকে কিছু বিরক্ত করছি।" এই পত্রেই জানতে চেয়েছেন ওঁর কাছেঃ "What was the original Greek idea of the soul both philosophical and popular ? What books can I consult, (translation of course) to get it ?" শ্রীযুক্ত রাইটের কাছে এ বিষয়ে ইজিপসিয়ান, ব্যাবিলোনীয়ান ও ইহুদীদেব মতও জানতে চেয়েছেন। ঐ একই সময়ে মিস মেরী হেলকে স্বামীজী লিখছেনঃ "আমি একটু সময় পেলেই লাইব্রেরীতে যাই ও পড়াশোনা করি।" মিঃ রাইট যথাসময়ে পত্রোত্তরে স্বামীজীর জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্বন্ধে নানা তথ্য ও বইয়ের তালিকা পাঠিয়েছিলেন।

ডঃ রাইটের তিনটি সন্তান ছিল। বড়টি মেয়ে, নাম এলিজাবেথ বা বেসি। স্বামীজী ওকে যখন দেখেন তখন বয়স তেরো। ঐ মেয়েব পর দুটি ছেলে—অস্টিনের দশ বছর ও জকি বা জনের দুই বছর। জকির স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না। স্বামীজী রাইটের ছেলেমেয়ের সঙ্গে খুবই মিশতেন, ওদের সঙ্গে এক হয়ে শিশুর মতন খেলাধূলা করতেন। শ্রীমতী রাইট নিজের মাকে এ বিষয়ে লিখেছেনঃ "He (Swami) was wonderfully unspoiled and simple, claiming nothing for himself...playing with the children." স্বামীজী অবশ্য বড় ছেলে অস্টিনের সঙ্গেই বেশি কথাবার্তা বলতেন, তার সম্বন্ধেই বেশি আগ্রহ দেখা যেত। অস্টিনকেই স্বামীজী এড্উইন আর্নল্ডের 'Light of Asia' উপহার দিয়েছিলেন; তাতে নিজহাতে লিখেছিলেন—'Presented to Austin Wright, with love and blessings of Vivekananda.' অস্টিনেরও স্বামীজীর সম্বন্ধে গভীর বিস্ময় ছিল। স্বামীজীকে যেন কোনও এক রহস্যময় ব্যক্তি বলে তার মনে হত। ১৯৩১ সালে অল্পবয়সে অস্টিনের মৃত্যু হয়। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছিলঃ "there seems to have been no rough angles in his character, no bitterness in him." অস্টিন 'Islandia' নামে একটি বই লেখেন। সেটি তার মৃত্যুর

পরে প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি 'Islandia' নামে একটি কাল্পনিক দেশের কথা লিখেছেন যেখানে মানুষরা "ancient agricultural people with an inner life of their own...with massive heads, black hair, black eyebrows, dark eyes and ruddy skins," লিখেছেন ঃ "The Islandian God is called 'Om', 'Om' cannot be seen with eyes, nor heard with ears" ইত্যাদি। এই লেখা প্রমাণ করে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর চেহারা, তাঁর ধর্ম, দর্শন সহ কিশোর অস্টিনের মনে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অস্টিন তাঁর বইয়ে ঝাঁসির রানীর মতো চরিত্রও এঁকেছিলেন, মনে হয় ঐ গল্প তাঁর স্বামীজীর কাছে কোনও সময় শোনা।

১৮৯৫ সালে লণ্ডন ঘুরে স্বামীজী যখন বস্টনে এলেন, সেই সময় মিসেস রাইট তাঁর তিনটি সন্তানকে নিয়ে আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলে আলাবামা প্রদেশের মেরিয়ন নামক স্থানে গিয়েছিলেন। কারণ বস্টনের নিউ ইংলণ্ডে প্রবল শীত পড়ে। তার হাত থেকে অব্যাহতির জন্য মিসেস রাইটের মেরিয়নে যাত্রা। কিন্তু সেখানে শীতের হাত থেকে রক্ষা পেলেও সেখানে তিনি আরেক বিপদে পড়ে যান। তখন আলাবামায় টাইফয়েড জ্বর সংক্রামক রূপে ছড়িয়ে পড়েছিল। একথা রাইট পরিবারের জানা ছিল না। ওঁদের দুটি পুত্র অস্টিন ও জন সেই জ্বরে পড়ে। মিঃ রাইট তখন একাই ছিলেন হার্ভার্ডের ডরমেটারিতে। উনি মিসেস রাইটের চিঠিতে পুত্রদ্বয়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে খুবই উদ্বিগ্ন হন। এই সময়ই স্বামীজী বস্টনে আসেন ও মিসেস ওলি বুলের বাড়িতে অতিথিরূপে কয়েকদিন বাস করেন। অধ্যাপক রাইট যদিও ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খুবই চিন্তাকুল, (মিসেস রাইটকে লিখেছেন, 'the tension is not easy to bear) তবুও দেখি প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই স্ত্রীকে স্বামীজী সম্পর্কে, তাঁর জ্ঞানের গভীরতা বিষয়ে নানা প্রশংসাসূচক কথা লিখছেন। তাঁর স্ত্রীও সেই পত্রগুলি আগ্রহসহকারে পড়েছেন ও উত্তর দিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায় উভয়েই স্বামীজীকে কতখানি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী এবং রাইট পরিবারের পরস্পরকে লেখা চিঠিগুলি মিঃ রাইটের ছোট ছেলে মিঃ জন. কে. রাইট রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দেন একথা লুইস বার্ক লিখেছেন।

ঐ পত্রের সূত্রেই অনুমান করা যায় ২৪ মার্চ, মঙ্গলবার ১৮৯৬ ওলি বুলের বাড়িতে ডঃ রাইট এসেছিলেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু ওলি বুলের বাড়িতে সেদিন এত অতিথিসমাগম হয়েছিল যে মিঃ রাইট একান্তে স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাননি। উনি রাত্রি দশটার সময় নিজের ঘরে ফিরে আসেন। মাত্র এক ঘন্টার ব্যবধানে শিক্ষকতা সংক্রান্ত জরুরি কাজে মিঃ রাইটের New Bedford-এ যাওয়ার কথা— এগারোটার সময় ট্রেন ধরতে হবে অথচ ঐ একঘন্টার অবকাশেই তিনি বসে পড়েছেন স্ত্রীকে চিঠি লিখতে এবং তার বিষয়বস্তু স্বামীজী। ডঃ রাইট লিখেছেন ঃ "... He (Swamiji) is going to lunch with me on Friday. He looks good and happy and is making a great success at lecturing." এই চিঠিতেই তিনি স্ত্রীকে জানাচ্ছেন যে J. J. Goodwin নামে একটি ছেলে স্বামীজীর আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় তাঁর স্টেনোগ্রাফারের কাজ করছে ও স্বামীজীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে। Bedford-এ পৌঁছেও মিঃ রাইট স্বামীজীকে স্মরণ করেছেন। সেদিনই স্বামীজীর

কেমব্রিজে বক্তৃতা দেবার কথা। সেকথা মনে করে লিখেছেনঃ "Swami gives a lecture tonight in Cambridge, before the philosophical club, all the big wigs in philosophy are going to see him." ২৭ মার্চ, শুক্রবার স্বামীজী রাইটের কাছে গিয়েছেন। দুজনে মধ্যাহ্নভোজনের পব একটি ক্লাবে বসে কয়েকঘন্টা একসঙ্গে কথা বলেছেন। স্বামীজীও গত দুবছরেব মধ্যে যা যা উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে সবই রাইটের কাছে গল্প করেছেন—তাঁব লণ্ডনে যাওযা, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা, তাঁর জয়লাভ, তাঁর অ্যাডভেঞ্চার—সব প্রসঙ্গই করেছেন প্রাণ খুলে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে। ডঃ রাইট স্ত্রীকে লিখেছেনঃ "He (Swami) is becoming so much gentler, and wiser and sweeter. Indeed he is most charming." অধ্যাপক রাইট যেন দেখছেন—লুইস বার্ক মন্তব্য করেছেন—স্বামীজীব সেই পূর্বের 'ঝঞ্ঝাসদৃশ' বা যোদ্ধসদৃশ মনোভাব অন্তর্হিত হয়েছে, যাকে আশ্রয় করে তিনি এতদিন বিদ্বেষীদেব বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করেছেন। এখন তিনি ধীর স্থির, পাশ্চাত্যে তাঁর মহান ব্রত সম্বন্ধে সচেতন। মিঃ রাইট আরও লিখেছেনঃ "স্বামীজীব সঙ্গে এখন কত বিখ্যাত ব্যক্তিরা আলাপ করতে আসছেন। প্রত্যেকেই প্রায মুগ্ধ হচ্ছেন তাঁর ব্যক্তিত্বে ও জ্ঞানে। যেমন "the chief secretary for India, Sir F. Arbuthnot, Swami succeeded in winning and they became fast friends." লিখেই আবার বোঝাচ্ছেন যে স্ত্রী মেরী যেন মনে না করেন স্বামীজী খুব অহংকার করে এসব গল্প তাঁব কাছে করেছেন। তিনি লিখছেনঃ "My account of what Swami said, may sound as if he was boasting, but it was not so. He was so modest." ডঃ রাইট যথার্থই স্বামীজীকে বুঝেছিলেন এবং যেন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ভাবে।

এই সময় অধ্যাপক সংবাদ পান যে তাঁর দুটি পুত্রই আরোগ্যলাভ কবেছে কিন্তু বড় মেয়ে বেসি, যে এতদিন সুস্থ ছিল সে শয্যাগত। প্রথম সন্তান বলে ডঃ রাইটের বেসির প্রতি অধিক স্নেহ ছিল। মেয়ের অসুস্থতার সংবাদে তিনি খুবই বিষণ্ণ বোধ করেন কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামীজীর দিব্য সান্নিধ্য তাঁকে বিশেষ আনন্দ দিত। সেই আনন্দের অংশগ্রহণ করাতেন স্ত্রীকে চিঠির মাধ্যমে এবং মেবীও যেন ঐ দুর্দিনে তাতে অনেকই সান্ত্বনা পেতেন। মিসেস রাইটও উত্তরে লিখেছেনঃ "Your letter about Swami came to me. Dear old Swami, I do love him." কিন্তু মহাকাল বড় নির্মম। বস্টন থেকে স্বামীজী চলে যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই মিঃ রাইট সেই চরম দুঃসংবাদ পেলেন যে তাঁর প্রিয়তমা কন্যা বেসি আর ইহলোকে নেই। স্বামীজী তখন লণ্ডনে। দুঃসংবাদ এসে তাঁর কাছেও পৌঁছাল। শোকগ্রস্ত পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে দরদী বন্ধু যে পত্রখানি লেখেন সেটিই এ যাবৎ প্রকাশিত রাইটকে লেখা স্বামীজীর শেষ চিঠিঃ

১৬ মে, ১৮৯৬
৬৩, সেন্টজর্জেস রোড,
লণ্ডন, এস ডব্লিউ

প্রিয় অধ্যাপকজী,

শেষ ডাকে আপনার মর্মান্তিক দুঃখের সংবাদটি পেলাম। এই তো জগৎ ভাই। মায়ার খেলা। প্রভুই একমাত্র সত্য। নামরূপের জগৎ চিরপরিবর্তনশীল। কিন্তু আত্মা ঈশ্বরে স্থিত ও তাঁরই সত্তা—সুতরাং অনন্ত, বিভু। যা আমাদের চিরদিনের সঙ্গী, তা এই মুহূর্তেও আছে, কারণ আত্মার জন্মমৃত্যু নেই, প্রকাশের স্তর পরিবর্তন হয় মাত্র। আপনি দৃঢ়চেতা, পবিত্র মিসেসও তাই। আমি নিশ্চিত জানি, আপনাদের মধ্যে দিব্যশক্তি জেগেছে এবং 'কারুর মৃত্যু হয়', এই মিথ্যা ভ্রমাত্মক বচনটি আপনি অচিরেই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। 'যিনি বহুর মধ্যে এককে, অচেতনের মধ্যে চেতনকে, পবিবর্তনেব মধ্যে চিরন্তন, শাশ্বতসত্তাকে দেখেন, তিনিই পরম শান্তির অধিকাবী হন'। প্রভু আপনাকে শান্তি দিন। অনন্ত কল্যাণ কামনা করে—

আপনাব প্রিয বন্ধু বিবেকানন্দ

ঘটনাপরম্পরা বিশ্লেষণ কবলে আমাদের স্বতই মনে হয—শিকাগো বিশ্বধর্মসভায় স্বামীজীকে উপস্থিত করার জন্যই যেন দৈবনির্দেশে অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই প্রয়োজনটুকু মিটে যাবার পর কয়েকমাস মাত্র উভয়ের চিঠিপত্র আদানপ্রদান হয়েছে। স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর পাশ্চাত্যে বেদান্তভাবনার ক্রমপ্রসার সম্পর্কে তাঁকে আশ্বস্ত করে কেমব্রিজ কনফারেন্সের সভ্যগণ একটি যুক্তপত্র প্রেরণ করেন। পত্রে স্বামীজীর সুহৃদ্‌বর্গ তাঁকে পুনর্বার পাশ্চাত্যে আগমনের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। পত্রে স্বাক্ষরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন অধ্যাপক জন হেনরি রাইট। কিন্তু দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণকালে স্বামীজীর রাইট পরিবারের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা, সে ইতিহাস আমাদের জানা নেই। আজ শিকাগো ধর্মমহাসভার শতবর্ষ উদ্‌যাপনে স্বামী বিবেকানন্দের চিরবিশ্বস্ত বন্ধু অধ্যাপক জন হেনরি রাইটকে আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি।

হেলপরিবারে স্বামীজী

প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণা

নয় সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩। আমেরিকার শিকাগো শহরে পরিচয়হীন রিক্ত, শ্রান্ত, ক্ষুধায় অবসন্ন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অদ্ভুত পোশাক ও কালো রঙের জন্য সর্বত্র উপেক্ষিত ও অনাদৃত। এক অভিজাত পল্লীর পথপ্রান্তে বসে ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করছেন শ্রীভগবানের পরবর্তী নির্দেশের জন্য। হঠাৎ রাস্তার বিপরীত দিকের একটি বাড়ি থেকে এক ধনী, সম্ভ্রান্ত মহিলা বেরিয়ে এসে সৌজন্যপূর্ণকণ্ঠে তাঁকে প্রশ্ন করেন ঃ 'মহাশয়, আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি ?' স্বামীজী জানালেন তাঁর অনুমান নির্ভুল। তবে ধর্মমহাসভার জেনারেল কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ ব্যারোজের ঠিকানা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। ভদ্রমহিলা সসম্ভ্রমে তখনই স্বামীজীকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

পরবর্তী ঘটনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগীদের অল্পবিস্তর জানা। সেই সম্ভ্রান্ত মহিলাই স্বামীজীকে ধর্মমহাসভার কার্যালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ গৃহীত হয়েছিলেন মহাসভার প্রতিনিধিরূপে। ঠিক তার দুইদিন পরেই 'হল অব কলম্বাসে' মহাসভার প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি আমেরিকাবাসীর চিত্ত জয় করে নেন—ভারতের বিবেকানন্দ রূপান্তরিত হন বিশ্ব বিবেকানন্দে।

ঐতিহাসিক ঘটনাটির পর শতবর্ষ অতিক্রান্ত। মহাকালপঞ্জীতে 'শতবর্ষ' কালের ব্যবধান বাস্তবিক মূল্যহীন। কিন্তু সনাতন ভারতীয় ধর্মের মূল সুরটি অবিচ্ছিন্ন রেখে স্বদেশের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের মহান দায় যিনি স্বেচ্ছায় আপন স্কন্ধে বহন করেছেন, আপামর সকল মানুষকে যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বমহিমায়, সেই মহিমময় পুরুষের স্বল্প-পরিসর জীবনের প্রতিটি ঘটনাই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপই শতবর্ষপূর্তি-উৎসব-যোগ্য। স্বামীজীর ধর্মমহাসভায় সাফল্যের শতবর্ষপূর্তিকালে কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য আমেরিকার উদার হেল পরিবারটিকে যাঁরা পথের ধুলো থেকে হাত ধরে বিবেকানন্দকে তুলে এনে তাঁদেরই একজন বলে গ্রহণ করেছিলেন, প্রতিকূল পরিবেশে দিয়েছিলেন নিশ্চিন্ত গৃহকোণের আশ্বাস। তাঁদের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয়ের পটভূমি ছিল নাটকীয় কিন্তু ভগবৎ-নির্দিষ্ট। এই 'আধ্যাত্মিক পরিবারে' তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর 'মাদার চার্চ' ও 'ফাদার পোপ'কে। উল্লেখ্য, ফাদার পোপের ভগিনী শ্রীমতী জেমস্ ম্যাথিউসকে তিনি পরবর্তী কালে সম্বোধন করতেন 'মাদার টেম্পল' বলে। আমেরিকা

বাসের প্রথমপর্বে এই গৃহই ছিল তাঁর স্থায়ী ঠিকানা।

গৃহস্বামী শ্রী জর্জ ডবল্যু হেলের জন্ম ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে একটি অত্যন্ত সফল লৌহনির্মাণ সংস্থার প্রবীণ অংশীদাররূপে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রীই আমাদের পূর্ব-পরিচিত মহিলা শ্রীমতী এলেন অথবা বেল হেল। শ্রীমতী হেলের জন্ম ১৮৩৭-এ। এঁদের তিনটি সন্তান। জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরী বার্নার্ড হেল (জন্ম ১৬ ডিসেম্বর, ১৮৬৫), দ্বিতীয় পুত্র স্যামুয়েল (জন্ম ৬ আগস্ট, ১৮৬৯), যাঁকে পত্রে স্বামীজী স্যাম বলে উল্লেখ কবেছেন এবং কনিষ্ঠা কন্যা হ্যারিয়েট (জন্ম ৭ জুন, ১৮৭২)। এঁদের সঙ্গেই বাস করতেন আরও দুটি কন্যা, যাঁরা ছিলেন সম্ভবত জর্জ হেলের ভাগনী। বড় হ্যারিয়েট, ছোট ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলি। ম্যাক্‌কিণ্ডলি ভগিনীদ্বয়ের বাবা তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা না রেখে মারা যান। মা মারা গিয়েছিলেন ওঁরা খুব ছোট থাকতেই। অবস্থাপন্ন মামার গৃহে, প্রায় সমবয়সী বোনেদেব সাহচর্যে এঁরা সুখে ছিলেন। হেল ভগিনীদ্বয় ছিলেন ম্যাক্‌কিণ্ডলিদের চেয়ে ছোট। স্বামীজীকে হেল পরিবারের কন্যাচতুষ্টয় গ্রহণ করেছিলেন আন্তরিকতার সঙ্গে। স্বামী বিবেকানন্দ অতি সহজেই হয়েছিলেন এঁদের একান্ত প্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সে সম্পর্কে ছিল না কোনও লৌকিকতার আবরণ অথবা সামাজিকতার অনুশাসন। স্নেহে স্বামীজী বোনেদের সম্বোধন কবতেন 'Babies' বলে। বিবেকানন্দ-সাহিত্যে এঁরা সুপরিচিত 'হেল সিস্টারস' নামে। হেল পরিবারের নিখুঁত চিত্র দিয়েছেন স্বামীজী স্বয়ং—স্বামী বামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একটি পত্রেঃ "ঐ যে G. W. Hale-এর ঠিকানায় চিঠি দাও, তাদেব কথা কিছু বলি। হেল ও তার স্ত্রী, বুড়ো-বুড়ী। আর দুই মেয়ে, দুই ভাইঝি [ভাগনী], এক ছেলে। ছেলে রোজগাব কবতে দোসবা জায়গায় থাকে। ...চার জনই যুবতী, বে থা করেনি। ...মেয়ে দুটিব চুল সোনালী অর্থাৎ ব্লণ্ড আর ভাইঝি [ভাগনী] দুটি brunett অর্থাৎ কালো চুল। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ এরা সব জানে।" (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪) বাস্তবিক আমেরিকায় মেয়েদেব সাবলীল স্বচ্ছন্দ ব্যবহার, মুক্ত মানসিকতা, আত্মবিশ্বাস ও কর্মদক্ষতা স্বামীজীর চিন্তার জগতে নূতন তরঙ্গ তোলে।

হেল-গৃহের চারটি কন্যার মধ্যে মেবী ও ইসাবেল ছিলেন শান্ত, সংযত, ধীর, অপূর্ব সুন্দরী। ইসাবেলের তুলনা চলত প্যারিসের ভেনাস ডি মেলোর সঙ্গে। স্বামীজী তাঁব প্যারিস ভ্রমণকালে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন ইসাবেলের সৌন্দর্য তার উপমানকে অতিক্রম করে গেছে। মেরীও ছিলেন অপরূপা। অপার সৌন্দর্যের সঙ্গে চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছিল। স্বামীজীর দৃষ্টিতে এঁরা ছিলেন 'তেজী আরবী ঘোড়া'র মতো, যাঁরা অক্লেশে একাকী জয় করতে পারেন ঊষর মরুপ্রান্তর, নিশ্চিন্ত গৃহকোণ যাঁদের আবদ্ধ করতে পারে না। মেরী ও ইসাবেল ছিলেন রানী হবার উপযুক্ত, গৃহিণী নয়। স্বামী বিবেকানন্দের স্নেহদৃষ্টি কন্যা দুটিকে অহরহ অভিষিঞ্চিত করেছে। এঁদের ভিতর অনন্ত সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে নারী জাগরণের স্বপ্ন দেখেছেন। ভারতীয় নারীকে উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতার মহামন্ত্রে। দুই হ্যারিয়েটকে তিনি মনে করতেন বাস্তববাদী, 'কল্পনা বিলাস ও ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে চলার মত নির্বোধ তাঁরা ছিলেন না।' আপন সংসারে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেই তাঁদের অন্তরের সৌন্দর্য অধিক প্রকাশিত হতে পারবে, এই ছিল স্বামীজীর বিশ্বাস।

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকটি আমেরিকায় আরও একটি বিশেষ কারণে চিহ্নিত ছিল। সময়টি ছিল নারী আন্দোলনের সূচনাকাল। সমাজের সর্বত্রই মেয়েরা আপন শক্তিতে তখন দীপ্যমান। হেল পরিবারেও একই চিত্রের প্রতিফলন দেখা যায়। ধনাঢ্য পিতার কন্যা হয়েও মেরী ও হ্যারিয়েট নিশ্চিন্তে গৃহসুখ উপভোগ করেননি। তাঁরা সারাটি দিন ব্যাপৃত থাকতেন নানাপ্রকার সমাজসংস্কারমূলক কর্মে। তাঁদের সান্ধ্য আসরগুলিকে ভরিয়ে তুলত পিয়ানোর মধুর সুরমূর্ছনা—সে সুর হয়তো ঝঙ্কার তুলে হারিয়ে যেত মিশিগান হ্রদের কালো নিস্তরঙ্গ জলরাশিতে বিরাটের সন্ধানে। ম্যাক্‌কিণ্ডলি ভগিনীদ্বয়, হ্যারিয়েট ও ইসাবেল ব্যাপকতর কর্মে নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন। তাঁরা সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল পরিচালনায়। শিশু-মনের সীমাহীন জিজ্ঞাসার সামনে তাঁরা ছিলেন ভালবাসা ও সহানুভূতির প্রতিমূর্তি। জ্যেষ্ঠা হ্যারিয়েট অবশ্য কনিষ্ঠা ইসাবেলের বুদ্ধিমত্তার উপর কিছুটা নির্ভব করতেন। তাঁদেব নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতাব সংবাদ প্রচারিত হয সমসাময়িক পত্রিকায : 'কুমাবী (ইসাবেল) ম্যাক্‌কিণ্ডলি কাজ খুব ভাল বোঝেন এবং শিশুদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ও ভালবাসা প্রজ্ঞাপ্রসূত। তাঁব মনটি চমৎকার—আলাপচারিতেও তিনি দক্ষ।'[১]

ভাবতেব তৎকালীন সামাজিক পবিস্থিতি, বিশেষত মেয়েদের নিপীড়িত পদদলিত অবস্থা—আত্মবিশ্বাসহীন পরনির্ভর ভীরু গতানুগতিক জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করে স্বামীজীর কোমলহৃদয ব্যথিত হত। পুরুষের অকাবণ আস্ফালনের সম্মুখে অবগুণ্ঠিতা শক্তিরূপা মাতৃজাতিব চূড়ান্ত অবমাননা বিবেকানন্দের বিবেকী মনে গভীব ক্ষতের সৃষ্টি করত। সাগর পারে উন্মুক্ত অঙ্গনে নাবীর স্বচ্ছন্দ অবাধ আত্মবিস্তার দেখে মুগ্ধ বিবেকানন্দ পত্রে লেখেন :

...এদেব মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা! আমাকে যেন বাচ্চাটির মতো ঘাটে-মাঠে-দোকানে হাটে নিয়ে যায়। সব কাজ করে—আমি তার সিকিব সিকিও করতে পাবিনি। এবা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।" (২৫।৯।১৮৯৪) এর কিছুদিন পূর্বের পত্রে (১৯।৩।১৮৯৪) পাই : "এদেশের মেয়েব মতো মেয়ে জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ আর দযাবতী—মেয়েবাই এদেশের সব। বিদ্যেবুদ্ধি সব তাদের ভিতর। ...এদেশের বরফ যেমনি সাদা, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন পবিত্র।"

আমেবিকান মেয়েদের সম্মুখে নারী প্রগতি সম্পর্কে তাঁর অভিনব চিন্তা রূপ পরিগ্রহ করেছে ধর্মমহাসভার অব্যবহিত পবে। শ্রীমতী পটার পামারের উদ্যোগে আর্ট ইন্‌স্টিটিউটের সাত নম্বর হলে স্বামী বিবেকানন্দকে দ্বিতীয়বার মহিলা সদনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয় ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩। বিবেকানন্দ-কণ্ঠেব তন্ত্রীতে যে সুর মৃদুলয়ে গুঞ্জরিত ছিল, তা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হল আকস্মিকভাবে সেই সভায—'পূর্ণ নারীত্বের আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা।' বাধা নিষেধের বেষ্টনীর মধ্যে আত্মার পবিপূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। নারীকে যথাযথ মর্যাদা দান করে স্বামী বিবেকানন্দ এক নব যুগের সূচনা করলেন। সব আপাতবিরোধের অবসান ঘটিযে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেব নারীকে তিনি একই সূত্রে গ্রথিত কবতে সচেষ্ট হন। অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় গুণসম্পন্ন হিন্দু নারী যদি তার পবিত্রতা বজায় রেখে বুদ্ধিবৃত্তির অধিকতব বিকাশ ঘটাতে পারে, তবে তারাই হবে জগতের আদর্শ নারী। স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসংস্কারক ছিলেন না, ছিলেন নারী প্রগতির উদ্‌গাতা।

হেল পরিবারে ভগিনী চতুষ্টয়কে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল স্বামী

বিবেকানন্দের। তাঁদের উদার নিঃশঙ্কভাব স্বামীজীর মনোজগতে শুধু রেখাপাতই করেনি, আমেরিকার সমগ্র নারীসমাজ তাঁর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল এঁদের মধ্য দিয়ে। কার্যোপলক্ষে আগামী বছরগুলিতে তিনি বহু মনস্বিনী মহিলার সঙ্গে পরিচিত হন—তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডলেও এসেছেন অনেকে। কিন্তু তাঁর বিশাল কর্মপরিধির বহির্ভূত একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্পর্ক তিনি রাখতেন এই পরিবারটির সঙ্গে। তাঁদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আপন গৃহে উন্মুক্ত, স্বাধীন বালকমাত্র। উত্তুঙ্গ তরঙ্গরাশি পরম নির্ভরতায় বেলাভূমির বুকে নিজেকে সমর্পণ কবে। ক্লান্তি-অপনোদনের পব পুনরায় ফিরে যায় সামুদ্রিক বিক্ষুব্ধতায়। স্বামী বিবেকানন্দও নির্দ্বিধায় বাব বার ফিরে এসেছেন মাদার চার্চের স্নেহময় ক্রোড়ে। শান্ত নিরুদ্বেগ কয়েকটি দিন কাটিয়ে ফিবে গেছেন, আবার নিজেকে সমর্পণ করেছেন কর্মপ্রবাহে। পরিবারের প্রতিটি সদস্য সেই দিনগুলিতে স্বামীজীর পোশাকের তদাবকি বা সিগারেব ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত থেকেছেন। চূড়ান্ত অভাবের দিনে স্বামীজীব পাশে দাঁড়িয়েছেন অর্থ নিয়ে, সামর্থ্য নিয়ে। বক্তৃতা কোম্পানিব সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায 'সাইক্লোনিক মঙ্ক', শিকাগোব শান্ত পল্লীব নির্জন গৃহকোণে তখন শ্রীমতী হেলের মাতৃহৃদয় উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করেছে তাঁব পত্রের ; সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য থেকেছেন প্রার্থনারত।

আমেরিকা বাসের প্রথম বছরটিতে স্বামী বিবেকানন্দের স্থায়ী ঠিকানা ছিল ৫৪১ ডিয়ারবর্ন এভিনিউ। অন্য কোথাও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে তিনি আলাসিঙ্গাকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেন। স্বামীজীব ভাবতাগত চিঠিপত্র বা পার্শেল সঠিক স্থানে স্বামীজীকে পৌঁছে দিতে হেলেবা কোনদিন ক্লান্ত হননি। বিস্ময জাগে ভেবে, শুধুমাত্র কর্মবিরতি যাপনেব নিশ্চিন্ত নীড় নয, এ গৃহটি ছিল স্বামী বিবেকানন্দেব মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে কর্মকাণ্ডের প্রধান কার্যালয়ও। হেল পরিবাবের সকলে স্বামীজীর সাফল্য-অসাফল্যের সংবাদ রাখতেন। তাঁব মূল্যবান কাগজপত্র সংরক্ষণের দায়ও গ্রহণ কবেছিলেন এঁবাই। যেখানে প্রতিযোগিতা থাকে না, থাকে না দোকানদারি, প্রকৃত ভালবাসা সেখানেই জেগে ওঠে। জ্যোতির তনয় বিবেকানন্দ যখন যেখানে গেছেন, আলোক বিকীর্ণ করেছেন। সেই অপার্থিব আলোয় সকল তমসা বিদূরিত হয়ে প্রাণে প্রাণে জাগ্রত হয়েছে অনন্ত প্রেমের উদ্ভাস।

ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বাহ্যিক মিল থাকলেও আন্তর জগতে থাকে দুস্তর ব্যবধান। মানবিকতার রূপকার স্বামী বিবেকানন্দের লোকোত্তর রূপটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য কবেছেন স্বামীজীর আচরণে অধ্যাত্ম ভাবসমৃদ্ধি ও শিশুসুলভ চপলতা একই সঙ্গে অবস্থান করত। বাহ্যত এই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। যাঁরা এই পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন দর্শনের দুর্লভ অধিকারী, তাঁরা আজীবন সে স্মৃতি একান্তে রক্ষা করেছেন। মেরী তাঁর সঞ্চয়ের মণিকুট্টিম থেকে তেমন একটি রত্ন উপহার দিয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দকে। স্বামীজী একদিন রোলার স্কেটিং-এর তীব্র বাসনা অনুভব করেন। মনে উদিত হওয়ামাত্র তিনি স্কেইট বেঁধে নিলেন জুতোর সঙ্গে। তারপর দু-তিনদিন অবাধে উচ্ছল বালকের মতো স্কী অভ্যাস করলেন হেলগৃহের সুসজ্জিত কক্ষে, দামী কার্পেটের উপর। সে এক দিব্য দৃশ্য ! আয়তনয়নে কৌতূহল, পবিত্র আননে অপার্থিব সারল্য। হঠাৎ এক সময় খেলা ফেলে ফিরে গেলেন ফায়ার প্লেসের ধারে, আত্মমগ্ন

বিবেকানন্দ তখন বহু দূরের মানুষ!

ম্যাক্‌কিণ্ডলিদের বড় বোন মেরীর একটি সাত বছরের মেয়ে মাঝেমধ্যে এসে থাকত হেল পরিবারে। সেই মেয়েটি পরবর্তী কালে মিসেস হার্বার্ট ই হাইড। বার্ধক্যে পৌঁছে শৈশবে দেখা উজ্জ্বল গৈরিক-ভূষিত স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি স্মরণ করেছেন। স্বামীজী তার দিকে হাত তুলে আঙুল দেখিয়ে বলতেনঃ 'এই শিশুটি অগ্নি-উপাসক।' মিসেস হাইড জানিয়েছেন, বাস্তবিক তিনি আগুন ভালবাসেন, সূর্যকেও ভালবাসেন। শুধু মিসেস হাইড কেন, যে কোনও বয়সের মানুষ, যে একবার তেজোদীপ্ত পুরুষসিংহের সংস্পর্শে এসেছে, ক্ষণিকের জন্যও যার ওপর পড়েছে তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, মুহূর্তের জন্যেও যে শুনেছে ঘন্টাধ্বনির মতো সেই গম্ভীর অথচ মধুর কণ্ঠস্বর, সে চেষ্টা করেও তাঁকে ভুলতে পারেনি।

সপ্তর্ষির ঋষিটিকে তাঁদের উপাসনাঘরে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতে দেখেছেন হেল পরিবার। বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছেন কত সহজে, নিঃশব্দে তিনি জড় থেকে চৈতন্যময় ভূমিতে আরোহণ করেছেন, আবার অবলীলায় নেমে এসেছেন ধূলিময় পৃথিবীতে। তাঁদেব অতিপ্রিয় উপাসনাঘরটি তাঁরা স্বামীজীকে দিতে চেয়েছিলেন। স্বামীজীর কত একান্ত চিন্তার সাক্ষী এই কক্ষ! কত নিভৃত সময় অতিবাহিত কবেছেন এখানে। এখানে বসেই ফাদার পোপের চিঠির কাগজে যুক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমের ওপর কতগুলো সূত্র তিনি রচনা করেছিলেন, যা ওঁদের পুরোনো কাগজপত্র থেকে পববর্তী কালে সংগৃহীত হয়।

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, স্বামীজীর বেদান্তধর্মকে কিন্তু এ হেন হেল পরিবার গ্রহণ করেননি। শ্রীমতী হেল ও তাঁর কন্যা মেবী ছিলেন 'ক্রিশ্চান সায়েন্স'-এর ভক্ত যা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে আমেরিকায় সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বামীজী 'ক্রিশ্চান সায়েন্স'কে তুলনা করেছেন আমাদের দেশের কর্তাভজাদের সঙ্গে। অদ্বৈতবাদের কিছু মত বাইবেলের মধ্যে ঢুকিয়ে এঁরা মনের জোরে অলৌকিক উপায়ে রোগ নিরাময় করতেন। গোঁড়া ক্রিশ্চানদের সঙ্গে তাই ছিল এঁদের তীব্র মতবিরোধ। তবে চিন্তাধারার বৈষম্য স্বামীজীর সঙ্গে সম্পর্করক্ষায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। উপরন্তু উত্তর কালে চিঠিপত্রে মাদার চার্চকে, মেরীকে এ প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে আনন্দ পেতেন বিবেকানন্দ। 'ক্রিশ্চান সায়েন্স'-এর প্রবক্তা শ্রীমতী এড্ডি (Eddy) ছিলেন স্বামীজীর ভাষায় শ্রীমতী হোয়ার্লপুল (Whirlpool)।

পৃথিবীর প্রধান ধর্মমতগুলির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খ্রীস্টধর্মের উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যই মূলত বিগত শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে মহাসম্মেলন আয়োজিত হয়। ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার নামে অন্ধ গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় ও অন্যান্য ধর্মমতগুলির অপব্যাখ্যা খ্রীস্টধর্মের মূল ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। এই পটভূমিতে পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে বালার্কের একাকী যাত্রা পশ্চিম দিগন্তের উদ্দেশ্যে—হাতে তাঁর মৃতসঞ্জীবনী সুধার ভাণ্ড, কণ্ঠে চরৈবেতি মন্ত্র। সে উদাত্ত আহ্বানে, প্রাণস্পর্শী আবহসঙ্গীতে মানুষ সাড়া না দিয়ে পারেনি। তাঁর দীপ্তিতে নিষ্প্রভ খ্রীস্টান পাদরী-সমাজ ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানা কুৎসা রটনায় প্রবৃত্ত হন। এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অন্যান্য ভারতীয় ধর্মপ্রবক্তারা এবং আমেরিকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই বিরুদ্ধ পরিবেশে হেলগৃহের কল্যাণস্পর্শ বিবেকানন্দকে প্রবাসে যুগিয়েছে শান্তি ও শক্তি। একদিকে অর্থাভাব অন্যদিকে

কঠোর পরিশ্রমে বিপর্যস্ত বিবেকানন্দ হেলভগিনীদের সাহচর্যে অতিক্রম করতে পেরেছেন অপমানের দুস্তর বারিধি। ডেট্রয়েট থেকে ১৭।৩।৯৪-তে ইসাবেলকে লেখেনঃ "তোমাদের পবিত্র ও আনন্দময় মুখগুলিকে যে মাঝে মাঝে দেখতে পাই, সেই হল আমার এই ভয়াবহ পরিশ্রম ও দুঃখের জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।" স্মরণ হয় যে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসজী নিজেই শ্রীহেলকে বিবেকানন্দের যথাযথ পরিচয় দিয়ে একটি পত্র দেন। স্বামীজীর প্রতি বিশ্বস্ততার অভাব হেল পরিবারেব ছিল না। কিন্তু নিজেব অস্বাচ্ছন্দ্যের এতখানি দায় হেল পরিবারের উপর চাপিয়ে দিতে স্বামীজীই কুণ্ঠিত হচ্ছিলেন। দেওয়ানজীর স্বতঃপ্রণোদিত পত্র তাঁকে গভীর স্বস্তি ও তৃপ্তি এনে দেয়। এব বহু বছর পরে জোসেফিন ম্যাকলাউড অ্যালবার্টা স্টার্জিসকে লেখেনঃ "...তাঁবা যদি ঐ দীর্ঘ একবছব তাঁকে (স্বামীজীকে) প্রতিপালন না করতেন, আমরা হয়তো কোনদিনই স্বামীজীকে আমাদেব মধ্যে পেতাম না। এটা সত্যিই আশ্চর্য লাগে দেখতে যে কিভাবে একেকজন তাঁদেব নিজেদের ভূমিকা পালন করেছেন স্বামীজীর কাজে..." (২৪।৪।২২)[১]

দার্শনিক বিবেকানন্দ, তাত্ত্বিক বিবেকানন্দ, কর্মী বিবেকানন্দ-চরিত্রের প্রচ্ছন্ন প্রেমের দিকটি উন্মোচিত হয়েছে হেল ভগিনীদের নিকটে। তাঁরা বাস্তবিক ভাগ্যবতী। কিন্তু স্থিতধী বিবেকানন্দের অটল ধৈর্যেও বারেকের জন্য কম্পন অনুভূত হয়েছিল। তাঁব আমেরিকার জীবনযাত্রা সম্পর্কিত অপপ্রচার ভারতে বিশেষত কলকাতায় পৌঁছলে উৎকণ্ঠিত বিবেকানন্দ ইসাবেলকে লেখেনঃ "এখন আমি লোকেব কথা আর গ্রাহ্য কবি না...কেবল একটি কথা। আমার বুড়ী মা এখনও বেঁচে আছেন, সাবা জীবন তিনি অসীম কষ্ট পেয়েছেন, সেসব সত্ত্বেও মানুষ আর ভগবানের সেবায় আমাকে উৎসর্গ কববাব বেদনা তিনি সহ্য করেছেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ আশার, তাঁর সবচেয়ে ভালবাসার যে ছেলেটিকে তিনি দান করেছেন, সে দূরদেশে গিয়ে—কলকাতায় মজুমদার যেমন বটাচ্ছে তেমনিভাবে—জঘন্য নোংরা জীবনযাপন করছে, এ সংবাদ তাঁকে একেবারে শেষ করে দেবে।" (২৫।৪।১৮৯৪) বৈদান্তিক বিবেকানন্দের জাগতিক অনিত্যতার বিষয়ে কোনও সংশয় ছিল না। কিন্তু ভারতীয় জীবনাদর্শে জননীর সঙ্গে সন্তানেব সম্পর্ক মায়িক নয়, পারমার্থিক। অবতারের অকৃপণ সান্নিধ্য, নির্বিকল্প সমাধির আনন্দ অথবা বিশ্বাচার্যের প্রভূত সম্মান তাঁকে ভারতীয় জীবনের মূল ভিত্তিটি থেকে উৎপাটিত করতে পারেনি।

মেরীর মতো ইসাবেলও ছিলেন স্বামীজীর বিশেষ স্নেহের পাত্রী। সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হলেও ইসাবেলের একটি সূক্ষ্ম, অনুভূতিপ্রবণ হৃদয় ছিল। বুদ্ধির প্রখরতা, অন্তরের সৌন্দর্য সম্ভবত ইসাবেলের বাহ্যিক সৌন্দর্যকেও অতিক্রম কবে তাঁকে উপনীত করেছিল স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য সান্নিধ্যে। বেদনার দিনে স্বামীজী ইসাবেলকে পেয়েছেন তাঁর পাশে ছায়ার মতো। তাঁর কাছে প্রকাশ করেছেন নিজের ভাবাবেগ।

উত্তরকালে শিকাগোকে কেন্দ্র করে স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে সঞ্চরমাণ, তখন হেল গৃহে ইসাবেল স্বামীজীর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণে ব্যাপৃত থেকেছেন অথবা স্বামীজীর নির্দেশমত অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর বিচক্ষণতার উপর স্বামীজী নির্ভব করতেন, পছন্দ করতেন তাঁর চরিত্রের আড়ম্বরহীনতা। ইসাবেলের 'এরকম একাধিক নিঃশব্দ, সহানুভূতিপূর্ণ সাহায্যে'র

ফলে বিবেকানন্দের পক্ষে একটি সুবিন্যস্ত কর্মপন্থা নির্ধারণ সম্ভব হয়েছিল।

অনন্যোপায় স্বামী বিবেকানন্দ সামান্য অর্থের বিনিময়ে এক চূড়ান্ত ব্যবসায়িক বক্তৃতা কোম্পানির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেন। বিরামহীন, ক্লান্তিকর কর্মের অবসানে স্বামীজী হেলগৃহে অবসরযাপন করতে উৎসুক হয়েছেন, তাঁর প্রিয় পাইপটি হাতে নিয়ে ভগিনীদের নির্মল সাহচর্যে অতিবাহিত করতে চেয়েছেন কিছু দুর্লভ মুহূর্ত। ইসাবেলের নিকট তিনি নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন তাঁর ব্যাকুলতা। যখন অর্থোপার্জনে সমর্থ হয়েছেন, গোপনে ফাদার পোপের জন্য তেরো ডলার দিয়ে পাইপ কিনেছেন। ইসাবেলকে বড় সুন্দর করে লিখেছেন: "আমার এখন পকেট ভর্তি ডলার। যা তুমি চাইবে এক মুহূর্তে পাঠিয়ে দেব। এতে অশোভন কিছু হবে, কখনো মনে কোরো না। আমার কাছে বুজরুকি নেই। আমি যদি তোমার ভাই হই তো ভাই-ই।" (১ মে, ১৮৯৪) বিবেকানন্দ-চরিত্রের এই সূক্ষ্ম কোমল মানবিক চিন্তাগুলিই তাঁকে অসাধারণ করেছে।

আমাদের স্মরণ রাখা ভাল, বয়সে মেরী ছিলেন স্বামীজীর থেকে মাত্র বছর তিনেকের ছোট। আর তাঁর চেয়ে কিছু বড় ইসাবেল সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দের সমবয়সী ছিলেন। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের অব্যবহিত পরেই কুমারী সারা ফার্মার গ্রীনএকারে এক ধর্মসম্মেলনের আয়োজন করেন। সেখানে আমন্ত্রিত হন স্বামী বিবেকানন্দ। গ্রীনএকারের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ, কুমারী ফার্মারের আন্তরিক আতিথ্যে স্বামীজী নিভৃতে তাঁর হৃদয়দেবতার সান্নিধ্য-উপলব্ধির সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই অপার্থিব আনন্দের সাক্ষিস্বরূপ ঋজু পাইন বৃক্ষগুলি আজও সমুন্নত শিরে দণ্ডায়মান। পাইনের নীচে স্বামীজীর দুটি দুর্লভ ছবির একটি উপহারস্বরূপ পেয়েছিলেন—ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলি।

স্বামী বিবেকানন্দের ফ্যানাটিসিজম ছিল না। স্বচ্ছ ছিল তাঁর চিন্তা, অকাট্য ছিল তাঁর যুক্তি, সর্বোপরি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণী শক্তি। যে কোনও পরিস্থিতিতে স্বচ্ছন্দ থাকবার কৌশলটি স্বাভাবিকভাবেই ছিল তাঁর করায়ত্ত। গ্রীনএকারের ধ্যান-নিবিষ্টতার অবসরে ক্রিশ্চান-সায়েন্টিস্টদের বিচিত্র আচরণ ও বক্তৃতাবলী তিনি উপভোগ করতেন। স্বামীজীর অনুভূত সেই আনন্দের অংশীদার ছিলেন হেল ভগিনীগণ। অসামান্য রসবোধসম্পন্ন বিবেকানন্দ পত্রে একটি সাইক্লোনের তাণ্ডবকে কৌতুকভবে আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণতার সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সজীব বর্ণনা: "যে বড় তাঁবুটির নীচে তাঁদের (ক্রিশ্চান সায়ন্টিস্ট) এইসব বক্তৃতা চলছিল... সেটির আধ্যাত্মিকতা এত বেড়ে উঠেছিল যে সেটি মর্তলোকের দৃষ্টি হতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে, আর প্রায় দুশ চেয়ার আধ্যাত্মিকভাবে গদগদ হয়ে জমির চারিদিকে নৃত্য আরম্ভ করেছিল।" (৩১।৭।১৮৯৪) এই পত্র স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরণ করেছেন হেল পরিবারে যাঁরা তাঁর (স্বামীজীর) ঈশ্বরপ্রেমে পরিপূর্ণ মুখমণ্ডলে 'স্বর্গীয় জ্যোতির বিচ্ছুরণ' দেখেছিলেন, 'তাঁর কথায় আগ্নেয় সত্তা ও তাঁর উপস্থিতিতে সমন্বয় ও শুচিতার' আকর্ষণকারী শক্তিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের আস্থা ছিল ক্রিশ্চান সায়েন্সের প্রতি। বিস্ময় জাগে, যখন দেখি ম্যাক্‌কিণ্ডলি ভগিনীদ্বয় উত্তর কালে শ্রীমতী সারা ফার্মারের 'Greenacre School of Comparative Religions'-এ যোগ দেন। স্বামীজীও তাঁর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে ভ্রমণকালে এ সংবাদে কম বিস্মিত হননি। একান্ত প্রিয় ইসাবেলকে লেখেন: "So you are in Greenacre

at last ? Is this the first year you have been in ? How do you like the place ?"...[৩]

স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সম্পদ ছিল তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা যা আপাতগাম্ভীর্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকত। সেই অমৃতরসের ফল্গুধারার স্বাদ যাঁরা গ্রহণ করতে পেরেছেন, ধন্য তাঁদের জীবন। স্বামীজীর নির্মল মনের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিতে কোনও কৃত্রিমতা ছিল না। অন্তরঙ্গ মহলে তাঁর অসামান্য রসবোধ আনন্দ বর্ষণ করত। সোয়ামস্কট থেকে হেল ভগিনীদের লেখাঃ "আঃ এখানে কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা! যখন দেখি তোমরা চারজন গরমে ভাজা, পোড়া, সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছ, আর আমি এখানে তোফা ঠাণ্ডা উপভোগ করছি, তখন আমার আনন্দ শতগুণ বেড়ে যায়। আ হা হা হা!" (২৬।৭।১৮৯৪) অথবা শ্রীনগর, কাশ্মীর থেকে ২৮।৮।১৮৯৮-তে লেখাঃ "আমি খুশী যে দিন দিন আমার চুল পাকছে। তোমার সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাতের পূর্বেই আমার মাথাটি পূর্ণ বিকশিত একটি শ্বেতপদ্মের মতো হবে"—আমাদের আনন্দ দেয়। হেল ভগিনীদের সঙ্গে স্বামীজীর অত্যন্ত সহজ সম্পর্কেব একটি নিদর্শনঃ "সপ্তাহ কয়েক আগে মাদার চার্চের কাছে পত্র লিখেছিলাম, আজ পর্যন্ত এক ছত্র জবাব আদায় করতে পারিনি। ভয় হয় তিনি দলবল সহ সন্ন্যাস গ্রহণ করে কোন ক্যাথলিক মঠে ঢুকে পড়েছেন, ঘরে চার চারটি অবিবাহিত (আইবুড়ো) মেয়ে থাকলে বুড়ী মায়ের পক্ষে সন্ন্যাস না নিয়ে আর উপায় কি?" (৩০।৫।৯৬) এরও দু'বছর পর স্বামীজীর অসুস্থতার জন্য উদ্বিগ্ন মেরী হেলকে বেলুড় মঠ থেকে কৌতুক করে লিখেছেনঃ "তোমারও কোটিপতি জুটছে না, আর আমারও তাই টাকা মিলছে না; সেজন্য আমাকে অনেক দুর্ভাবনায় পড়তে হয়েছে এবং নিষ্ফল কঠোর পরিশ্রম কবতে হয়েছে, তাই রোগে আক্রান্ত।" (২।৩।৯৮)

প্রকৃতপক্ষে 'মহীয়সী ও দীপ্তিময়ী,' সদা 'লড়াই'-এর জন্য প্রস্তুত মেরী এবং ইসাবেলের গতানুগতিক জীবনযাপন স্বামীজীকে ব্যথিত করেছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের উদাসীনতা ও সংশয়কে উচ্চচিন্তা দিয়ে সচেতন করতে প্রয়াসী হয়েছেন বিবেকানন্দ। 'মেরুদণ্ডবিহীন' 'বোর্ডিং স্কুলের মেয়েদের' মতো দ্বিধান্বিত মেরীকে লিখিত পত্রে তাঁর অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে। "হয় 'ভোগ' নয় 'যোগ'—হয় এই জীবনটাকে উপভোগ কর, অথবা সব ছেড়ে ছুড়ে যোগী হও,...তোমার ও ইসাবেলের প্রতি আমার এতটুকু সহানুভূতি নেই, তোমরা না এটায় না ওটায়।" (১৭।৯।৯৬)

ভগিনী চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা হ্যারিয়েট হেল প্রথম ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তখন লণ্ডনে। 'Old Maids' Home'-এর 'সুচরিত্রা, বুদ্ধিমতী, স্নেহময়ী, সুন্দরী' কন্যাটিকে তিনি অজস্র আশীর্বাদ করেছিলেন! ইউরোপ ভ্রমণান্তে স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। ভারতে স্বামীজী যে অকল্পনীয় সংবর্ধনা লাভ করেন তার সংবাদ শ্রী গুডউইন দিয়েছিলেন সারা বুলকে। শ্রীমতী বুল সেই পত্রটি প্রেরণ করেছিলেন জোসেফিন ম্যাকলাউডকে। ৭ মার্চ, ১৮৯৭ জোসেফিন সারা বুলকে লিখছেনঃ

"Your letter and Mr. Goodwin's have warmed our hearts. I will return Mr. Goodwin's to you on Tuesday, as I am asked to

luncheon tomorrow at the Hales' and want to read to them the truimphal home coming."[৪]

এর ঠিক দুইদিন পরে জোসেফিন শ্রীমতী বুলকে পুনরায় যে পত্র লিখেছেন তাতে অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে এক অশ্রুতপূর্ব তথ্যও উদঘাটিত হয়েছেঃ

"I enclose your Mr. Goodwin's letter which I read to the Hale girls yesterday, after a never to-be-forgotten day with them. They indeed do belong to our Inner Circle of love and devotion to the Prophet. Did you know that Swami had chanted and told some of his most eloquent stories and thoughts into a phonograph at the Hales ? We heard the same deep penetrating tones and inspiring thoughts as if the Swami were in our very midst. Afterwards Harriet read us Swami's congratulatory letter on her engagement with his blessings upon her, thereat every heart was moved...

"Harriet Hale is to be married on April 21... I can quite see Swami's love for these four girls. Mary has had a line from him from India."

ভারতে চলে যাওয়ায় স্বামী বিবেকানন্দ হ্যারিয়েটের বিবাহে উপস্থিত থাকতে পারেননি। হ্যারিয়েটের স্বামী শ্রী ক্ল্যারেন্স উলীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণকালে শিকাগোয় তিনি পরিচিত হন। মানুষটিকে স্বামীজীর ভাল লেগেছিল। শিকাগো থেকে লস এঞ্জেলেস পৌঁছে ৬ ডিসেম্বর ১৮৯৯ স্বামী বিবেকানন্দ মাদার চার্চকে লিখেছিলেনঃ '...Harriet has scored a triumph really—I am charmed with Mr. Wooly—only hope Mary will be equally fortunate.'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হেল ভগিনীদ্বয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও ম্যাক্‌কিণ্ডলি ভগিনীদ্বয় কিন্তু কুমারী থেকে গিয়েছিলেন।

শুধু ভগিনীগণ নয়, তাঁদের ভ্রাতা স্যামুয়েলও স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিসীমার অভ্যন্তরে ছিলেন। আমরা পূর্বে জেনেছি, স্বামীজী যখন প্রথম হেল পরিবারে আশ্রয়লাভ করেন, স্যাম তখন কার্যোপলক্ষে অন্য স্থানে। পরে কোনও সময় তাঁদের সাক্ষাৎ নিশ্চয় হয়েছিল। স্যামুয়েলের অসুস্থতা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে। অপরক্ষেত্রে স্যামের বাস্তববোধসম্পন্ন সিদ্ধান্ত স্বামী বিবেকানন্দকে স্বস্তি এনে দেয়। চিঠি-পত্রে তিনি সর্বদাই স্যামের খবর জানতে চেয়েছেন।

লণ্ডন থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের অন্তিম দিনগুলি স্বামীজী ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। ইটালির ফ্লোরেন্স শহরে একটি পার্কে অশ্বযানে ভ্রমণকালে অপ্রত্যাশিতভাবে মিঃ ও মিসেস হেলের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। ওঁরাও তখন ইউরোপ ভ্রমণ করছিলেন। তাঁদের সেই মিলন বাস্তবিক আনন্দের হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবাসে যে পরিবারটির সঙ্গে নিজেকে স্বেচ্ছায় সংযুক্ত করেছিলেন, সেই পরিবারেব কোনও সদস্যই কিন্তু স্বামীজীর স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁদের সমপর্যায়ের এক মানুষ। বিবেকানন্দকে হেল পরিবার প্রতিভাসম্পন্ন, সুদর্শন, ঈশ্বরপ্রেমিক বলে স্বীকৃতি দিলেও, তার বেশি কিছু ধারণা করতে পারেননি। আচার্যের মহান অধিকার নিয়ে যাঁরা আসেন জাগতিক মাপকাঠির বিচার তাঁদের ওপর প্রযোজ্য নয়। বিরাটের সঙ্গে একীভূত মুক্ত আত্মাকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না।

বিবেকানন্দ জীবনের পরবর্তী কর্মব্যস্ত দিনগুলিতে হেল পরিবার থেকে গেছেন বিবেকানন্দকেন্দ্রিক আবর্তের বাইরে, আপন অধিকারেব অহমিকা নিয়ে। অজ্ঞতার অভিমান এবং ভাবনার সীমাবদ্ধতা নিয়ে মেরী আঘাত করেছেন স্বামী বিবেকানন্দকে। "প্রিয় ভ্রাতা, আমি স্বীকার করছি আমার মনে এক সুতীব্র নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। এক বছর আগে তোমার কলম থেকে এমন চিঠি নিতান্তই অসম্ভব ছিল। আমার ভাবতে ভাল লাগে যে আমার পিছনে ফিরে তাকানোর সময় আছে। কোথায় গেলেন সেই মানুষটি যিনি ধর্মমহাসভায় এসেছিলেন ঈশ্বর প্রেমে পূর্ণ হয়ে—যাঁর উপস্থিতিই সৃষ্টি কবত একতানতা ও পবিত্রতাপূর্ণ পরিবেশ—ফলে সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন? এখন আমাদের আর্তনাদ করাব পালা' কোথায় গেল তোমার সেই উজ্জ্বল বর্ণনা? কোথায় গেল সেই ঐশ্বরিক শক্তি যা প্রতিবিম্বিত হত প্রতিটি বস্তুতে?"[৬]

স্নেহের দাবি পর্যবসিত হয়েছে সমালোচনায়। বিদ্যুতেব মতো ঝলসে উঠেছেন স্বামীজী। আহত হয়ে গর্জন কবে উঠেছে তাঁর নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা। তীব্র প্রতিবাদে মেবীকে বুঝিযে দিয়েছেন যে জ্যোতিব তনয় ও সাধারণ মানুষের চিন্তাধারায় দুস্তর প্রভেদ।

১ ফেব্রুয়াবি, ১৮৯৫ স্বামীজীব লেখা পত্রটি শাণিত তরবারির মতো মেরীর সব অভিযোগকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়—এর ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে এক নবীন বৈদিক সন্ন্যাসীর জীবনাদর্শ। মেরী হেল স্তব্ধ, বিমূঢ়। স্বামীজী অনুভব করেছেন তাঁর কঠোরতার মাত্রা কিছু বেশি হয়েছে। সান্ত্বনাস্বরূপ ১৫ ফেব্রুয়ারি পুনরায় পত্র দেন কবিতাকারে। বিবেকানন্দের প্রেরিত জ্বলন্ত অঙ্গার পূর্বেই মেরীর অনুতাপাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল। মেরী লিখলেন ঃ

"ভর্ৎসনা ভরা পত্রের তরে
দুঃখের সীমা নাই,
বাব বাব বলি, ক্ষমা চাই আমি
চাই চাই ক্ষমা চাই।"...

অপরূপ পত্রালাপ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এর মাধ্যমেই মেরী ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর সহজাবস্থা। 'দুর্বোধ্য হিন্দুটি'র অনন্ত উদার আহ্বান উপেক্ষা করবার সাধ্য মেরীর ছিল না।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে ২৮ আগস্ট স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার আমেরিকায় এসেছিলেন। সেইবাব তিনি আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন লেগেট গৃহ রিজলি ম্যানরে। শ্রীমতী সারা ফার্মারের আমন্ত্রণে স্বামী অভেদানন্দ সেই বছর গ্রীনএকারে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। ইসাবেল ও

হ্যারিয়েট ম্যাক্‌কিণ্ডলিও তখন গ্রীনএকারে। সম্ভবত স্বামী অভেদানন্দের কাছে এঁরা স্বামীজীর পুনরায় আমেরিকা আগমনের সংবাদ পেয়ে থাকবেন। রিজলি ম্যানরের কর্ত্রী জোসেফিন ইসাবেলকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। "Your letter this morning was a great pleasure to our household. We should be so pleased if you and your sister will stop over with us a day and night on your way home"...[৭]

ইসাবেল ও হ্যারিয়েট রিজলি ম্যানরে এসেছিলেন ২২ সেপ্টেম্বর। লেগেট-গৃহে স্বামীজীর পবিত্র সান্নিধ্যে তাঁরা একটি দিন অতিবাহিত করেন। "The two McKindley girls came yesterday since which time Swamiji has been bubbling over with boyishness"[৮] ...প্রত্যক্ষদর্শী জোসেফিনের বর্ণনা। ভাবতে ভাল লাগে বিশ্ববিশ্রুত বিবেকানন্দকে তাঁর শৈশবাবস্থা ফিরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল তাঁর বিদেশিনী ভগিনীদের সাহচর্য। রিজলি ম্যানরের স্বর্গীয় পরিবেশে স্বামীজীর মন সবসময় উঁচু সুরে বাঁধা থাকত। মাদার চার্চকে রিজলি থেকে লেখা দুটি পত্রে জগতের অন্ধকারময় দিকটাব কথা, আত্মার অনন্ত মহিমা এবং জ্বলন্ত বৈরাগ্যই যে মায়াময় সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির উপায়—এই প্রসঙ্গে গভীর আলোকপাত করেন। ক্রিশ্চান সায়েন্সের ভক্ত মাদার চার্চের কাছে স্বামীজী যথার্থ ক্রিশ্চান হওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর উদার নির্মল মনে অপ্রসন্নতার ছায়ামাত্র ছিল না—পত্রশেষে তাঁর নিবেদনঃ "All love as usual to my Christian relatives—scientific or quacks." (২৩।১০।১৮৯৯)

২২ নভেম্বর শিকাগোর উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করেন। শিকাগোতে তাঁর আগমনের মূল অভিপ্রায় হেল পরিবার ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। স্বামীজী প্রায় সপ্তাহখানেক শিকাগোয় ছিলেন কিন্তু কোথায় উঠেছিলেন তা আজও অজ্ঞাত থেকে গিয়েছে। ইতিমধ্যে হেল পরিবারের অবস্থা অনেকটাই পরিবর্তিত। শ্রী ও শ্রীমতী হেল তাঁদের ডিয়ারবর্ন এভিনিউ-র বাড়ি লিজ দিয়ে মেরীসহ একটি হোটেল অ্যাপার্টমেন্টে বাস করছেন। ম্যাক্‌কিণ্ডলি ভগিনীদ্বয় ভাড়া নিয়েছেন একটি পৃথক ফ্ল্যাট। স্যামুয়েল সোনার খোঁজে পাড়ি দিয়েছেন অন্যান্য অনেকের সঙ্গে দেশের উত্তরাংশ আলাস্কায়। হেল পরিবারে স্বামী বিবেকানন্দ আর পুরাতন প্রাণস্পন্দন খুঁজে পাননি, হেল গৃহের কোথাও সেদিন তাঁর জন্য কোনও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল না। তবে তিনি হেল ও ম্যাক্‌কিণ্ডলিদের সঙ্গে আনন্দে বহু সময় অতিবাহিত করেছিলেন। শিকাগোয় স্বামীজীর আবির্ভাবের পরবর্তী দিন মেরী হেল তাঁর সম্মানার্থে একটি ভোজের আয়োজন করেন। এ ব্যতীত অনেকেই স্বামীজীকে আপ্যায়িত করেছিলেন। মেরী সদা সর্বদা তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। সম্ভবত এই সময়ে ম্যাক্‌কিণ্ডলিদের ফ্ল্যাটে স্বামী বিবেকানন্দ কিছু রেকর্ডিং করেন, অপরাহ্নে স্বল্পসংখ্যক শ্রোতার সম্মুখে তিনি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই আলোচনায় সমস্ত তথ্যই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যভ্রমণকালে সঙ্গী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতার আমেরিকায় আগমনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য স্বামীজীর পরিচিত মহল থেকে অর্থসংগ্রহ। শিকাগোয় নিবেদিতা খুব সহজেই মেরী তথা হেল পরিবারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। মেরী হেল কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের

মানসকন্যাটিকে সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি। প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী নিবেদিতা মেরীকে সম্ভ্রম জানিয়েছেন কারণ তিনি সচেতন ছিলেন যে মেরী হেল স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত স্নেহভাজন। অপরদিকে স্বামীজীর এই স্বল্পকাল শিকাগো অবস্থানকালে মেরী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন (guarding his privacy)। সেক্ষেত্রে নিবেদিতার পক্ষেও স্বামীজীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হওয়া সহজ ছিল না।

নিবেদিতার বিশেষ ব্রহ্মচারিণীর পোশাক মেরী পছন্দ করেননি। তাঁর ধারণা ছিল এটি নিবেদিতার কাজের প্রতিবন্ধক হবে। নিবেদিতা জানিয়েছিলেন যে তাঁর পোশাকটি স্বামীজী-অনুমোদিত। স্বামীজীর এই সিদ্ধান্ত মেরীর দৃষ্টিতে ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে অতীতেও তিনি স্বামী বিবেকানন্দের এই জাতীয় ত্রুটির সংশোধন করে তাঁকে উপকৃত করেছেন। ব্যথিত নিবেদিতা জোসেফিনকে লিখছেন : "I said that was her relationship and privilege to be part of his life in that way—but I was only a disciple—and to me Swami made no mistakes."[৯]

সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি নিবেদিতাব একান্ত আনুগত্য ও নিষ্ঠা, তাঁব hero worship হেল ভগিনীগণের মনে বিশেষত মেরীব মনে এক বিরূপভাবের সঞ্চার করেছিল। ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিও নিবেদিতা ও তাঁর কর্মোদ্যমকে সহজদৃষ্টিতে গ্রহণ কবতে পারেননি। নিবেদিতা ১৮৯৯-এর ডিসেম্বরে লিখছেন : "Isabel McKindley of all the people I ever met has the greatest power of listening, smiling and then quietly showing you that you were perfectly wrong. She is absolutely unmovable in her opinions ; she speaks loudly and talks one down..."[১০] সেই কারণে স্বামীজীর ইচ্ছা-সত্ত্বেও নিবেদিতার ভাবতীয় কর্মযজ্ঞে হেল পরিবার যুক্ত হতে পারেননি। ভগিনী নিবেদিতা ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের শেষাংশে আমেবিকাব পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণকালে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর আলোচনায় নিয়োজিত ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ভারতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে অর্থসংগ্রহ। নিবেদিতাব আন্তরিক ইচ্ছা ছিল ঐ কাজের জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করবেন এবং মেরী হেল অলঙ্কৃত করবেন সম্পাদিকার ভূমিকা। কিন্তু মেরী নিবেদিতাব প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে লেখেন তিনি ও তাঁর পরিবারের কোনও সদস্যই নিবেদিতাব কর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক নন। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ও বিকশিত নিবেদিতার কর্মোদ্যমকে স্বামী বিবেকানন্দেব কার্যাবলী থেকে পৃথক দৃষ্টিতে যে দেখা যায়, সেকথা নিবেদিতা কল্পনাও করতে পারেননি। ৯ জানুয়ারি, ১৯০০ তারিখে জো-র কাছে তাঁর অন্তরের আর্তি প্রকাশিত হয়েছে : 'It seems to me that I have just received the last and worst blow of all."[১১]

পত্রোত্তরে ১৪ জানুয়ারি জোসেফিন লিখলেন : "The Hales adore Swami in their own way and not ours. They give him all they can but the perception that our Indian life gave us of him, they are incapable of understanding and none of his friends will ever understand that. And so you must go into a fresh new element where he may never be known."...[১২]

জোসেফিনের পত্র নিবেদিতাকে সান্ত্বনা ও সাহস জুগিয়েছিল। নিবেদিতাও উপলব্ধি করেছিলেন ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনে স্বামীজীর উপর নির্ভর করলেও কর্মক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান নিজেকেই করতে হবে।

মেরী ও তাঁর সম্পর্কের মধ্যে সাবলীলতা অসম্ভব কারণ মেরীর বাস এমন এক বৌদ্ধিক স্তরে যেখানে আবেগের স্থান কম। সম্ভবত সেই কারণে হেল পরিবারের বেষ্টনীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে সুহৃদ্‌মণ্ডলীর কেউই প্রবিষ্ট হতে পারেননি। স্বামীজী আমেরিকায় রাইট পরিবারের অতিথি হয়েছেন, অতিথি হয়েছেন ডেট্রয়েটে ব্যাগলি পরিবারে, নিউ ইয়র্কে গার্নসি অথবা ফিলিপস পরিবারে। লায়ন বা লেগেট পরিবারেও তিনি আশ্রয় পেয়েছেন কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সম্পর্ক তাঁর ছিল হেল পরিবারের সঙ্গে। তবু এই পরিবার ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলনের মূল ধারাটি থেকে।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দেব ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে স্বামী বিবেকানন্দের 'ফাদার পোপ' ইহলোক ত্যাগ করেন। প্যাসাডেনায় থাকাকালীন স্বামীজী সংবাদটি পেয়েছিলেন। এই ধার্মিক মানুষটিব মৃত্যু তাঁকে শুধু ব্যথিত করেনি তিনি অন্তর থেকে সমগ্র হেল পরিবারটির দুঃখের অংশীদার হয়েছেন। পিতৃবিয়োগের যন্ত্রণা স্বামীজীর অজানা ছিল না। মেরীকে লিখেছেন ঃ "মনে হয় ঠিক এখন থেকেই তোমার যথার্থ জীবন শুরু।...জীবনে এতদিন তুমি নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছ...." (২০।২।১৯০০)

ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কালে স্বামী বিবেকানন্দ জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিন চারেকের জন্য শিকাগোয় এসেছিলেন। শোক-সন্তপ্ত হেল পরিবারটিতে অতিবাহিত করেছেন বেশ কিছু সময়। ম্যাক্‌কিণ্ডলি ভগিনীদ্বয়ও পেয়েছিল তাঁর পবিত্র সাহচর্য। এই সংক্ষিপ্ত শিকাগো অবস্থানের অধিকাংশ তথ্যই অনাবিষ্কৃত থেকে গিয়েছে। স্বামী নিখিলানন্দ তাঁর Vivekananda : A Biography পুস্তকটি প্রণয়নকালে জোসেফিনের কাছ থেকে এ সময়ের একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা শুনেছিলেন। এক্ষেত্রে আমরা শ্রীমতী লুইস বার্কের লেখাটি অনুসরণ করব। "On the morning of his departure, ...Mary came to the Swami's room (in her mother's apartment) and found him sad. His bed appeared to have been untouched and on being asked the reason, he confessed that he had spent the whole night without sleep. 'Oh',he said, almost in a whisper, 'it is so difficult to break human bonds !' As he knew, this was the last time he was to see the family he loved above all others of the Western friends."[১৩]

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বামী বিবেকানন্দের অকস্মাৎ লীলাসংবরণ হেল পরিবারকে যেন আরও দূরে নিক্ষেপ করেছে। ১০ জুলাই, ১৯০২ নিবেদিতা স্বামীজীর শেষ দিনটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে মেরীকে লিখছেন ঃ "আমার আর কিছু লিখতে ভয় করছে—কারণ জানি তুমি তাঁকে কি ভালই না বাসতে। আমার কোন কথায় যদি তুমি কষ্ট পাও, এটাই চিন্তা।"[১৪] স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের সংবাদে হেল পরিবারের কার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছে। তবে অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে (৫ নভেম্বর, ১৯০২) মেরী সদ্য

বিপত্নীক এক ইটালিয়ান সিনরকে বিবাহ করেন। গিয়েসেপি মাতিনির বয়স তখন বাহাত্তর। মেরীর সাঁইত্রিশ। মেরীর প্রাক্ বিবাহ পর্বের কথা স্বামী বিবেকানন্দের অজানা ছিল না। মেরীর মতন অমন বিরল প্রতিভার অধিকারিণীর এমন গতানুগতিক পরিণতিতে স্বামীজী বাস্তবিক হতাশ হয়েছিলেন, ব্যর্থ হয়েছিল তাঁর দীর্ঘ প্রচেষ্টা। ব্যথিত বিবেকানন্দ লিখেছেন ঃ "জীবনভোর এই শিশু হাঁটানোর প্রচেষ্টা। কথাটা খুবই রূঢ়, খুবই নির্দয়, কিন্তু উপায় নেই।" (২৭।৮।১৯০১)

আমেরিকা থেকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে শ্রীমতী হেল ও মেরী তাঁদের শিকাগোর বাড়ি ত্যাগ করে ইটালির ফ্লোরেন্সে একটি অ্যাংলো আমেরিকান হোটেলে বসবাস শুরু করেন। সেখানে স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর পরিচয় হয় কোনও অর্থশালী ব্যক্তির সঙ্গে, যিনি তুলনায় অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কারণ ৫ জুলাই, ১৯০১ স্বামীজী লিখছেন ঃ "So you are enjoying Venice. The old man must be delicious ; Venice was the home of old Shylock, was it not ?" কিছু পরে একই পত্রে সেকেন্দ্রাবাদে আকবরের সমাধিক্ষেত্রের উচ্চ গম্বুজ থেকে পড়ে গিয়ে ক্ষেত্রী-রাজের মৃত্যুর বর্ণনা করে লিখছেন ঃ "Thus we sometimes come to grief on account of our zeal for antiquity. Take care Mary, don't be too zealous for your piece of Italian antiquity." মেরী হেল স্বামীজীর এই সতর্কবাণীর তাৎপর্য অনুধাবন কবতে পারেননি অথবা সে সময় তা গ্রহণ করবার ক্ষমতা মেরীর ছিল না।

গিয়েসেপি মাতিনির বিশাল এস্টেটের রাজকীয় প্রাসাদে সুন্দরী মেরী হারিয়ে গিয়েছিলেন। যাঁকে স্বামীজী রানী হবার উপযুক্ত মনে করতেন, সেই মেরী রাজেন্দ্রাণীর মতো ছোট ঘোড়ার গাড়িতে আকর্ষণীয় পোশাকে ঘুরে বেড়াতেন বাগানে, আঙুর ক্ষেতের আশেপাশে। পরম যত্নে বৃদ্ধ স্বামীটি তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে সংরক্ষণ করেছেন, সে সময় মেরীকে কখনও অসুখী মনে হয়নি। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চে নিবেদিতাকে লেখা পত্রে তাঁর প্রিয়জনদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে। কারণ গিয়েসেপি মাতিনির বয়স তখন সাতাত্তর, শ্রীমতী হেলের বাহাত্তর এবং হ্যারিয়েট প্রায়ই অসুস্থ। সব ভুলে মেরী সুখী হতে চেষ্টা করেছেন। শুধু কোথাও ছন্দপতন হয়েছিল। একই বছর জুলাইতে নিবেদিতা জোকে লিখছেন ঃ "I had a hug from Mary at Onchy landing stage. It was pouring with rain and she was too far from strong to venture on with us. So I have not seen her again ! How strange this seems ! Faded and worn, the brilliant Mary !"[১৫]

জোসেফিন ম্যাকলাউড তাঁর স্বভাবসুলভ ঔদার্য নিয়ে ভালবেসেছেন হেল পরিবারকে, মেরীকে। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর জোসেফিন সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন স্বামীজীর আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে। স্বামীজীর প্রিয় সকলের সঙ্গে স্বামীজীর স্মৃতিচারণ ছিল তাঁর নেশা, স্বামীজীকে সকলের স্মৃতিতে জীবন্ত রাখাকে তিনি তাঁর কর্তব্য মনে করতেন। মেরী হেলের (মাতিনি) সঙ্গে জোসেফিনের যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি, যেমন ক্ষীণসূত্রটি অক্ষুণ্ণ ছিল নিবেদিতার সঙ্গে। তিনটি সন্তানের জননী হ্যারিয়েটের সঙ্গে

শ্রীক্ল্যারেন্স উলীর বিবাহ-বিচ্ছেদ জোকে বেদনা দিয়েছিল। সন্তান-সহ হ্যারিয়েট অবশিষ্ট জীবনযাপন করেন শ্রীমতী হেলের সঙ্গে ফ্লোরেন্সে। হ্যারিয়েটের বিশাল জীবনের শূন্যতা জোকে স্পর্শ করেছে। জোসেফিন হ্যারিয়েটকে ভারতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। নিবেদিতা ও কৃস্টিনের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করে জানিয়েছেন সবকিছুর অন্তরালে স্বামীজীর শক্তিই প্রকাশিত। বিবেকানন্দময় জোসেফিন সকলের মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। 'Himalayan Edition of Swamiji's Works'-এর প্রথম তিনটি খণ্ড ও সদ্যপ্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী জোসেফিন উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছেন মেরীকে। সেইসঙ্গে আশা করেছেন স্বামীজীর বাণী ও রচনার অপর চারটি খণ্ড মেরী স্বেচ্ছায় স্বয়ং সংগ্রহ করবেন।

মেরীর জীবনের করুণতম পরিণতিতে জোসেফিন বিচলিত হয়েছিলেন। প্রায় সতেরো বছরের বিবাহিত জীবনের শেষ পাঁচ বছর মেরী অতিবাহিত করেছেন মানসিক ভারসাম্যহীন স্বামীর সেবায়। ২০ এপ্রিল, ১৯১৯ সিনর মাতিনি দেহত্যাগ করেন। জীবনের দুর্গম পথ অতিক্রম কালে তাঁর ভুল তিনি বুঝেছিলেন। সেকথা জানিয়েছিলেন জোসেফিনকে। কিন্তু বারেকের জন্যও মেরী স্থৈর্য হারাননি। জোসেফিন মনে করেছেন—মানসিক প্রস্তুতির পর্ব শেষ হওয়ায় এরপর মেরী যথার্থ জীবন শুরু করবেন।

ইসাবেলের প্রতি স্বামীজীর অপার স্নেহ তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি আমাদের কৌতূহলী করে। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের দু'বছরের মধ্যে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে নিবেদিতা মেরীকে লিখছেন, "ইসাবেলের মৃত্যু সংবাদে আমি কতই না দুঃখিত হয়েছিলাম। আমি ইংলণ্ডে পৌছানোর আগে কিছুই জানতে পারিনি। আর শুনেও কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এত অপ্রত্যাশিত।"[১৬]

ইসাবেলের জীবনাবসান অল্পবয়সে হলেও হ্যারিয়েট ম্যাক্‌কিণ্ডলি কিন্তু ১৯৫৫ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। হ্যারিয়েট হেল মারা যান ১৯২৯-এ সাতান্ন বছর বয়সে। শ্রীমতী হেল, স্বামীজীর মাদার চার্চ কিন্তু দীর্ঘজীবনের অধিকারী। তিনি ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে শরীর ত্যাগ করেন।

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে জোসেফিনের সঙ্গে মেরীর শেষ সাক্ষাৎ হয়। মেরী তখন তাঁর স্বামীর সম্পত্তি বিক্রি করে শ্রীমতী হেলের সঙ্গে ফ্লোরেন্সে বসবাস করছেন। জোসেফিন স্থির, গম্ভীর, কর্তব্যবোধসম্পন্ন মেরীকেই দেখেছেন। প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনযাপন করলেও মেরী স্বামীজীকে মনে রেখেছিলেন তাঁর নিজের মতো করে। জোসেফিনের হাতে পাঁচ পাউণ্ড দিয়েছিলেন মঠের জন্য এবং পাঁচ পাউণ্ড স্বামীজীর বই কেনার জন্য। এরপর জীবিত অবস্থায় বেলুড় মঠে স্বামীজীর পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবার জন্য মেরী কোনদিন কিছু পাঠিয়েছেন বলে জানা যায় না। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি মেরীর নিস্তরঙ্গ, শান্ত জীবনের অবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর উইল অনুযায়ী স্বামীজীর কাজের জন্য বেলুড় মঠ কর্তৃক আটচল্লিশ হাজার পাঁচশ টাকা গৃহীত হয়। কোনও এক অজ্ঞাত অভিমান জীবিতাবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযজ্ঞে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি। কিন্তু আজীবন তিনি স্বামীজীর বাণী ও কর্মকে বহন করেছেন অন্তরে, সংগোপনে। জোসেফিন, সারা বুলের মতে ভারতে তিনি ছুটে যাননি, নিবেদিতা বা কৃস্টিনের মতো আত্মাহুতিও তিনি দেননি কিন্তু দূর থেকে নীরবে যুক্ত থেকেছেন আচার্যের চিন্তার সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে।

তারা বলে গেল

গীতা চৌধুরী

যুগে যুগেই তাঁরা এসেছেন, তাঁরা বলে গেছেন—'ক্ষমা কর', 'ভালবাস'। সকল ধর্মের এ-ই সারাৎসার—নিখিল বিশ্বমানবের আচরণীয় মানবধর্ম।

শতবর্ষ আগে প্রতীচীর আহ্বানে বিশ্বের নানা প্রান্তের সন্ত-সজ্জন, ধর্মপ্রচারক, ধর্ম-প্রতিনিধি এক মহৎ উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিলেন শিকাগো ধর্মমহাসভায়। পরস্পরের ধর্মীয় ভাববিনিময় ও আলোচনার দ্বার সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হল। পৃথিবীব বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত, ধার্মিক, দার্শনিক সেদিন বিস্তর বাগ্‌বিস্তাব করে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। তাঁদের বাক্যের জাল ছিন্ন করে, গূঢ় তত্ত্বের গ্রন্থি মোচন করে সেদিন বেজে উঠেছিল মূল সুর—'ভালবাস'। সুচিন্তিত ভাষণের মধ্যে চারবর্ণবিশিষ্ট এই শব্দটিই সেদিন নানাকণ্ঠে নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছিল। কেউ বলেছেনঃ 'আত্মজ্ঞানে প্রতিবেশীকে ভালবাস,' কেউ বা বলেছেনঃ 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা কর, জীবে প্রেম কর।' আবার কোনও কণ্ঠে শুনিঃ 'তোমার ক্রীতদাসও তোমার ভাই; ভাই জেনে তাকে ভালবাস' কিন্তু সর্বত্রই সেই একই সুর—'ভালবাস'।

সেদিন প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে এই 'ভালবাসা' শব্দের উচ্চারণে মতভেদ না থাকলেও ইতিহাস বলে নিছক ধর্ম আলোচনাই সকলের উদ্দেশ্য ছিল না। নেপথ্যে ছিল একটি প্রত্যাশা যে, অবশেষে জয় হবে খ্রীস্টধর্মের। মহাসভা সেই ধর্মেরই প্রচারের সহায়ক হয়ে উঠবে। স্বামী বিবেকানন্দ এই অভিপ্রায়ের কথা সংক্ষিপ্ত দুটি বাক্যে প্রকাশ করে লিখেছিলেনঃ 'খ্রীস্টধর্ম অপর ধর্মাপেক্ষা মহত্তর এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই ধর্মমহাসভার আয়োজন হইয়াছিল।' 'আমার মনে হয়, জগতের কাছে বিধর্মীদের বিদ্রূপচ্ছলে দেখানোই ছিল ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য।'

উদ্দেশ্য যাই হোক, নিঃসন্দেহে ধর্মমহাসভা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সেযুগের বৈষম্যপূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় একই মঞ্চ থেকে বিশ্বের সকল ধর্ম সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস নিঃসন্দেহে রূপকথার মতই ছিল অবিশ্বাস্য। 'Neely's History of the Parliament of Religions'-এ তাই মন্তব্য করা হয়েছেঃ "It is the story of a meeting such as the world never knew before.'

কিন্তু অসহিষ্ণু পুরোহিত-মণ্ডলীর বাইরে শিক্ষিত আমেরিকান নরনারী এক উদার মন নিয়েই এই ধর্মমহাসভার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন যাঁদের যোগ্যতম প্রতিনিধি ছিলেন ধর্মমহাসভার প্রেসিডেন্ট চার্লস ক্যারল বনি।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে Columbian Exposition নামে এক বিরাট আকার মেলার আয়োজন হয় শিকাগো শহরে—লেক মিশিগানের তীরে। এই মেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমেরিকার অসামান্য উন্নতি। শুধু বস্তুজগতে নয়, চিন্তাজগতেও মানুষের উন্নতির নিদর্শন তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। এটি প্রথম শিকাগোর ব্যবহারজীবী বনির পরিকল্পনায় আসে। এই উদ্দেশ্যেই World's Congress Auxiliary of the Columbian Exposition নামে কমিটি গঠিত হয় ১৮৯১ সালে। মিঃ বনি ছিলেন মেলা কমিটির প্রেসিডেন্ট, সাধারণ সমিতির সভাপতি ও কর্মকর্তা ছিলেন শিকাগোর ফার্স্ট প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের রেভাঃ হেনরি ব্যারোজ। কংগ্রেসগুলির সংখ্যা কুড়ি। আলোচ্য বিষয়—সমাজের উন্নতি, সাধারণ সংবাদপত্র, চিকিৎসা, শল্যবিদ্যা ইত্যাদি। ধর্মসংক্রান্ত আলোচনাও ঐ কংগ্রেসগুলির অন্যতম বিষয়রূপে নির্ধারিত হয়। কিন্তু সব আলোচনার মধ্যে ধর্মমহাসভাটিই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ইতিহাসের এক দিকপরিবর্তন ঘটাবে তা কে জানত!

দেশে দেশে বার্তা পৌঁছে গেল। আমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হল প্রায় দশ সহস্রাধিক। ১৮৮৯ থেকে সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর ধরে চলল তার প্রস্তুতি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সেদিন পরম উৎসাহভরে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে সোমবার শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে ধর্মমহাসম্মেলনের সূচনা। বেলা দশটায় ইনস্টিটিউটের 'হল অব কলম্বাস'-এ সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন হল। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী দশটি ধর্মের সম্মানার্থে দশবার ঘন্টাধ্বনি হয়েছিল। বিশাল ঘন্টাটির গায়ে খোদিত ছিল—'তোমাদের কাছে আমার নব নির্দেশ—পরস্পরকে ভালবাস।'

চার হাজার শ্রোতা হলে এবং গ্যালারিতে নিঃশব্দে অপেক্ষমাণ। মঞ্চটি লম্বায় আনুমানিক পঞ্চাশ ফুট ও গভীরতায় দশ ফুট। সভার মধ্যস্থলে সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত একটি লোহার সিংহাসন আমেরিকার চার্চের সর্বোচ্চ ধর্মযাজক কার্ডিন্যাল গিবনসের জন্য সংরক্ষিত। তার দুইপাশে তিন সারিতে তিরিশটি করে চেয়ার। নির্ধারিত সময়ে রাজকীয় সমারোহে এক বর্ণোজ্জ্বল মিছিল শ্রোতাদের মধ্য দিয়ে মঞ্চের অভিমুখে অগ্রসর হল। মিছিলের পুরোভাগে পরস্পরের হাত ধরে সভাপতি বনি ও কার্ডিন্যাল গিবনস্। এঁদের ঠিক পিছনেই বিশ্বমেলার 'বোর্ড অব লেডি ম্যানেজার্স'-এর সভানেত্রী শ্রীমতী পটার পামার ও সহসভাপতি শ্রীমতী চার্লস এইচ হেনরোটিন। তারপরেই বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত বিশ্বের নানাধর্মের প্রতিনিধিবৃন্দ। শ্রোতাদের প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে সকলে মঞ্চে আরোহণ করে নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন।

অকস্মাৎ গ্যালারিতে প্রার্থনাসঙ্গীত ঝঙ্কৃত হল। তারপর কার্ডিন্যালের কণ্ঠে শোনা গেল খ্রীস্টীয় প্রার্থনা—'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ' ইত্যাদি। সমবেত প্রতিটি শ্রোতাই প্রার্থনায় যোগ দিলেন। সভার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করলেন প্রেসিডেন্ট চার্লস ক্যারল

বনি। তাঁর ভাষণের মর্মার্থ ঃ

পরম আনন্দের বিষয় যে আজ আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি বিশ্বধর্ম-মহাসভার মতো মহাবিস্ময়কর ঘটনা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—এ সভায় আমাদের যোগদান সম্ভব হল তাঁরই অপার করুণায়। ভাবী কালে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, সুসম্পর্ক স্থাপনায় এই ঘটনাব প্রভাব হবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

যে মহৎ উদ্দেশ্যে এই ধর্মসভার (World's Congress of Religions) আয়োজন তা যদি সার্থক হয়, তাহলে মানব ইতিহাসে ঘটনাটি চিহ্নিত হবে এক নবযুগের সূচনাপর্ব হিসাবে। এই নবযুগ হবে শান্তি সংস্থাপনার যুগ, সৌভ্রাতৃত্ব উন্মেষের যুগ।

বিশ্বের বহু সুযোগ্য মানুষ এই ধর্মসভাকে স্বাগত জানিয়েছেন জেনে আমরা উৎসাহিত বোধ করছি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যাঁরা আজ এই সভার সাফল্য কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, তাঁদের প্রার্থনার সঙ্গে যুক্ত হোক আমাদের প্রার্থনা।

সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে, অনন্ত অসীমের ধারণা করা যায় না—যেটুকু করা যায় তাও সম্পূর্ণ প্রকাশ করা অসম্ভব। সুতরাং বুদ্ধিবিকাশের মাত্রা ও চেতনার স্তরভেদ অনুযায়ী, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, ধর্মসম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ঈশ্বরীয় ধারণার তারতম্য হবে—এ তো খুবই স্বাভাবিক।

সঠিকভাবে বুঝতে পারলে ধারণার এই স্তরভেদ—দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য, বিবাদ-বিসংবাদের কারণ না হয়ে গভীর কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। ঈশ্বর আপনাকে ব্যক্ত করেন বিচিত্ররূপে। বিভিন্ন মানসে নানাভাবে তাঁর প্রতিফলন ঘটে। সেইসব ধর্মের মুকুরে তাঁর বিচিত্র রূপের প্রতিফলনকে বিরোধের সঙ্কেত ভেবে আতঙ্কিত হবার কোনও কারণ নেই; বরং তাঁর অনেকান্ত রূপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগকে স্বাগত জানানোই সমীচীন। যেদিন আমরা একে অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শিখব সেদিনই সম্ভব হবে ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘ গঠন।

বিভিন্ন ধর্মীয় মানুষের মধ্যে আচার-অনুষ্ঠানের তারতম্য রয়েছে—রয়েছে ভাষা, প্রতীক ইত্যাদির পার্থক্য। এই ভিন্নতা অনেকসময় পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির কারণ হয়ে উঠেছে। আমরা আশা করব, এই ধর্মমহাসম্মেলন নানাধর্মের মানুষের মনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও পরমতসহিষ্ণুতার সঞ্চার করবে।

আজ প্রভাত-সূর্যের উদয়ে যে নবযুগ সূচিত হল তা অবসান ঘটাক সকল সাম্প্রদায়িকতার—এই প্রার্থনা।

* * *

উদ্বোধনী ভাষণগুলি সমাপ্ত হলে সভার কার্যক্রম শুরু হল। বক্তাদের মধ্যে উত্তর



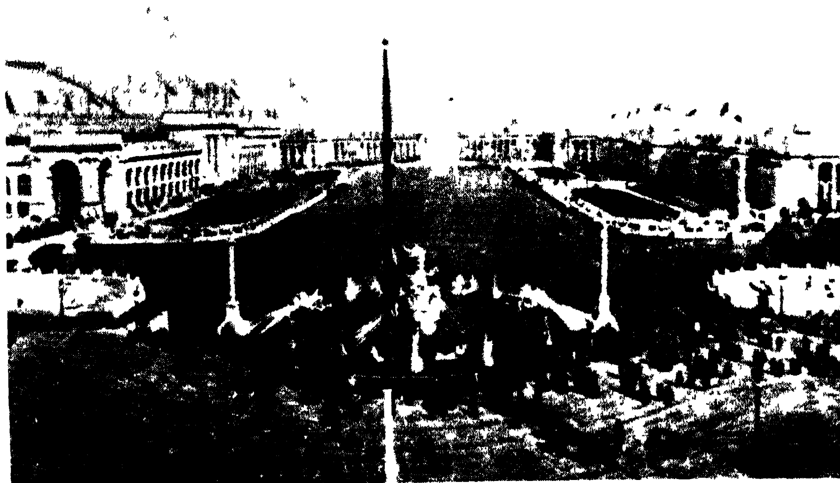
শ্রীরামকৃষ্ণদেব (১৮৩৬-১৮৮৬)



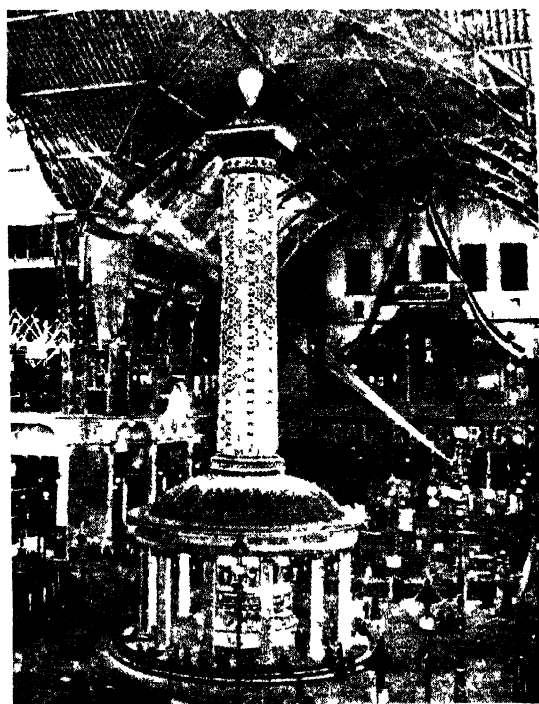
ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিরূপে স্বামী বিবেকানন্দ



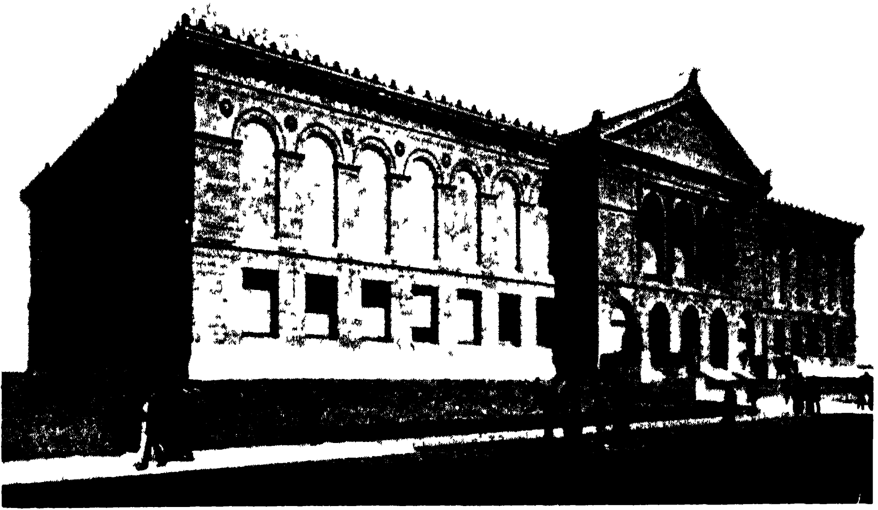
স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম মুদ্রিত চিত্র,
অক্টোবর ১৮৯৩



লেক মিশিগানের তীরে বিশ্বমেলা প্রাঙ্গণ



বিশ্বমেলায় বিদ্যুৎপ্রদর্শনীস্থল



শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউট (১৮৯৩)



ধর্মমহাসভা চলাকালীন দৃশ্য

ধর্মমহাসভার মঞ্চে স্বামীজী





এইচ এন হিগিনবোথাম—বিশ্বমেলার প্রেসিডেন্ট



কার্ডিন্যাল গিবনস—যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ক্যাথলিক ধর্মযাজক



চার্লস ক্যারল বনি—বিশ্বমেলার অন্তর্গত কংগ্রেসগুলির প্রেসিডেন্ট



ডাঃ জন হেনরি ব্যারোজ—ফার্স্ট প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের ধর্মনেতা, কার্যকরী সমিতির সভাপতি



মিসেস পটার পামার—বিশ্বমেলার 'বোর্ড অব লেডি ম্যানেজার্স'-এর প্রেসিডেন্ট



মিসেস চার্লস এইচ হেনরোটিন—'বোর্ড অব লেডি ম্যানেজার্স'-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট



হোবিন টকি—বৌদ্ধধর্মেব প্রতিনিধি (জাপান)



আব শিবাটা—শিন্টো ধর্মেব প্রতিনিধি



অনাগারিক ধর্মপাল—বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধি (সিংহল)



দাদাভাই ভারুচি—বোম্বাইয়ের পার্শী প্রতিনিধি

আমেরিকার প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রতিনিধিরাই ছিলেন সংখ্যায় সর্বাধিক। রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যাও কম ছিল না। ধর্মসম্মেলনে আহূত হয়ে এলেন—ব্রাহ্ম, ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, তাও, কনফুশিয়াস, শিন্টো, জরথুস্ত্র, ক্যাথলিক, গ্রীকচার্চ ও প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রতিনিধিবৃন্দ, এলেন আরও অনেকে। একই ধর্ম সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন একাধিক ব্যক্তি। তাঁদের সকলের সব বক্তব্য পরিবেশন করার মতো পর্যাপ্ত পরিসরের অভাবে বর্তমান প্রবন্ধে শুধুমাত্র স্বল্পসংখ্যক বক্তার বক্তব্যের নির্বাচিত অংশের মর্মার্থ ও অনুবাদ দেওয়া হল। ১১ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা আজ সকলেই জানি। ১১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বামীজী মোট ছয়বার 'হল অব কলম্বাসে' ভাষণ দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও বিজ্ঞানসভা ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সভাতে তিনি বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হন। স্বামীজী ব্যতীত অন্যান্য বক্তাদের ভাষণগুলি পাঠকসমাজে এখনও বিশেষ আলোচিত হয়নি। সেই সামগ্রিক চিত্রটি তুলে ধরার জন্যই এই প্রচেষ্টা।

* * *

ধর্মমহাসভায় প্রথম দিনের (অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বর তারিখের) অধিবেশনে বক্তাদের অন্যতম ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি মাননীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়। পরে পুনরায় তিনি ভাষণ দেন সভার তৃতীয় দিনে (অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর)। প্রথম দিনের ভাষণে তিনি বলেন ভারতবাসীর জীবনে ধর্মের ভূমিকা, ধর্মের সর্বব্যাপী প্রভাব ও ভারতভূমিতে প্রবহমান সনাতন ধর্মধারার চির-অবিচ্ছিন্নতার কথা। দ্বিতীয় দিনে তিনি বলেনঃ

ধর্মমহাসভায় ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। ব্রাহ্মধর্ম একটি নূতন ধর্মমত, অবশ্য এর মূল প্রোথিত সনাতন ভারতের মর্মের গভীরে।

কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বে ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলায় যখন ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রবল হয়ে ওঠে ও ধর্মের নামে চলতে থাকে অনেক অন্যায়, অবিচার তখন, সেই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন যুগে, এই বাংলার বুকে জন্ম নিলেন আমার আচার্যদেব—রাজা রামমোহন রায়। বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রচর্চা করে, যুক্তিপ্রমাণের উপর ভিত্তি করে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর নব ব্রাহ্ম ধর্মমত। ব্রাহ্মধর্ম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী।

প্রাচীন ধর্মের নানাবিধ যুক্তি-বিরোধিতায় বিভ্রান্ত বহু ব্যক্তি এসে যোগ দিলেন এই নবধর্মগোষ্ঠীতে। নবধর্মে দীক্ষিতদের জন্য রচিত হল নূতন ধর্মপুস্তক—এতে আছে বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জেন্দ্ আবেস্তা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত অংশ।

ধর্মসংস্কারের পর আমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের পরবর্তী পদক্ষেপ হল সমাজসংস্কার। সতীদাহ প্রথা নিবারণে ও অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলনে উদ্যোগী হলাম আমরা। আমাদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়। আমাদের এই ধরনের সংস্কারমূলক কাজে রুষ্ট হলেন সমাজপতিরা, তবু রুদ্ধ হল না সংস্কারের ধারা।

আমাদের সর্বশেষ কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার-প্রয়াস হল আত্মসংস্কারের প্রয়াস।

ব্যক্তিগত জীবনে সততা ও শুচিতা বিনা সংস্কার-প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই সমাজের দলভুক্তদের জন্য কতক আচরণবিধির প্রবর্তন করা হল। ধর্মপুস্তক পাঠ, ধ্যান, উপাসনা ও লোকহিতসাধনের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধির পথ নির্দেশ করা হল। শুদ্ধ জীবনযাপন, ঈশ্বর সাক্ষাৎকার, ঈশ্বরানুভূতিই হল ব্রাহ্মধর্মের চরম লক্ষ্য। সবশেষে উল্লেখ করি ব্রাহ্মধর্মের প্রাগ্রসরতার কথা।

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীস্টান, মুসলমান ও আর আর ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই একই ঈশ্বরের আরাধনা করে চলেছেন বহু বিচিত্র পদ্ধতিতে। এই বিরাট বিশ্বে বিচিত্ররূপে যিনি বিরাজমান তাঁকে আমরা কোনও একটি বিশেষরূপে সীমাবদ্ধ করে দেখি না। সর্ব ধর্মমতকে এক্‌সূত্রে গ্রথিত করে আমরা গ্রন্থনা করেছি এই নব ধর্মমত। তাই কোনও ধর্মমতের সঙ্গেই আমাদের কোনও বিরোধ নেই। এই অবিরোধী ধর্মমতের প্রতিভূ আমি এসেছি আপনাদের দেশে ভ্রাতার বেশে, অনুগামী শিষ্যরূপে (আমি নিজ ধর্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে আসিনি এখানে)। ভ্রাতা বলে, শিষ্য জেনে আপনারা গ্রহণ করুন আমাকে।

* * *

Judaism-এর তত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কে মহাসভার দ্বিতীয় দিনে Rabbi Isaac M. Wise বলেন ঃ Judaism-হল প্রধানত আচার-অনুষ্ঠান নির্ভর (আচার-সর্বস্ব), এতে ধর্মমত বা ধর্মবিশ্বাস বলে কিছু নেই।

ধর্ম-সমন্বয়বাদী এবং ধর্মীয় ব্যাপারে স্বাধীন মত ও পথাবলম্বী নবীনের দল বলেন ঃ তত্ত্বজ্ঞান অধিগত করার চেয়ে অধিক প্রয়োজন ধর্মাচরণ। ধর্মতত্ত্ব নয়, ধর্মকর্মই আমরা চাই।

ধর্মীয় গবেষণা ও গভীর চিন্তা-ভাবনার ফলে জানা যায় এসব বাদপ্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। ঐক্য ও শান্তি সদাই আসে সত্যের পথ ধরে, ভ্রান্তি থেকেই জন্ম নেয় বিরোধ-বিসম্বাদ ও ধর্মান্ধতা। সুতরাং মনে হয়, বিশ্বের মানবগোষ্ঠীকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার শ্রেষ্ঠ উপায় সুনীতিনির্ভর, সুযুক্তিপূর্ণ এমন এক অভ্রান্ত তত্ত্ববিদ্যা প্রণয়ন যা হবে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের বিবেক ও বুদ্ধিগ্রাহ্য।

মানবমনে ধর্মচেতনা উন্মেষের ধারা অনুসরণ করে জানা যায় সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই মানুষের মনে চারটি ধারণা দৃঢ়প্রোথিত। এই ধারণাগুলি হল ঃ

(১) ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস—একরূপে বা বহুরূপে বিশ্বে বিরাজমান এক বিরাট পুরুষের (পরম পুরুষের) বা অতি জাগতিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস।

(২) এই বিরাটের বা পরম সত্তার সঙ্গে মানবসত্তার (পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার) অবিচ্ছিন্ন যোগে বিশ্বাস—ঈশ্বর ধ্যান-গোচর, আরাধনালভ্য, এই ধারণায় বিশ্বাস।

(৩) যা-কিছু শুভ ও সুন্দর তা মানুষ ও ঈশ্বর উভয়েরই প্রীতি সম্পাদন করে এবং অশুভ ও অসুন্দর উভয়েরই অনাকাঙ্ক্ষিত।

(৪) পার্থিব জীবনের পরপারে স্বর্গসুখ লাভ বা নরকজ্বালা ভোগের ধারণায় বিশ্বাস।

এই চারটি ধারণার ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় ধর্মতত্ত্ব। তাত্ত্বিকে তাত্ত্বিকে যখন মতানৈক্য দেখা দেয় তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের লিখিত বা অলিখিত চিরাচরিত প্রথাকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে থাকেন—Judaism-ও এর ব্যতিক্রম নয়।

Judaism হল ইস্রায়েলের যাবতীয় ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার ও ভাবাবেগের সমষ্টি—এগুলি Jehova সংক্রান্ত অর্থাৎ ঈশ্বরীয় ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ইহুদীদের মর্মের গভীরে স্থায়িভাবে অঙ্কিত এই ধারণাগুলিই Judaism-এর ভিত্তিমূল রচনা করেছে। Thorah (ইহুদীদের ধর্মীয় অনুশাসন সম্বলিত গ্রন্থ) দাবি করে যে এই গ্রন্থে বিধৃত শিক্ষা ও অনুশাসন দৈব নির্ধারিত, বিবেকবান ও যুক্তিবাদী মহাপুরুষদের দৈবপ্রেরণালব্ধ। ঈশ্বরীয় মহিমা দর্শনে বা ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের ফলে স্বল্প সংখ্যক মহামানবের মানসপটে এগুলি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। যুগে যুগে এই জাতীয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপলব্ধি যাঁদের ঘটেছে, তাঁদেরই বাণী Thorah-তে বিধৃত। ইস্রায়েলের কোনও দার্শনিক বা ধর্মপ্রবক্তা এর একটি বর্ণও পরিবর্তিত করতে পারেন না।

ঈশ্বরীয় ধারণার সঙ্গে সামান্যতম অসঙ্গতিপূর্ণ কোনও প্রথার বা নীতির স্থান নেই এই Judaism ধর্মে।

Judaism-এর অন্তর্গত নীতিগুলি হলঃ ভাগ্য, নিয়তি বা অদৃষ্টবাদ, ও ব্যক্তি, জাতি তথা বিশ্বমানবের সঙ্গে এই অদৃষ্টবাদের সম্পর্ক, প্রায়শ্চিত্ত সংক্রান্ত মতবাদ—পাপ-ক্ষালনের পথ কি? মানুষ কি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন অথবা দৈবাধীন? এসব প্রশ্ন নিয়ে নানা মতবাদ।

মানুষের কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা—নিজের, অপরের ও ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা, অমরত্ব লাভ ও তার উপায়—পাপপুণ্য, স্বর্গ-নরক সংক্রান্ত ধারণা মতবাদ—এ সবই Judaism-এর অন্তর্গত। Judaism-এর সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের গভীরে রয়েছে ঈশ্বর চেতনা। ঈশ্বর-প্রদত্ত যুক্তি ও বুদ্ধি বলেই মানুষ যাবতীয় তাত্ত্বিক প্রশ্নের মীমাংসা করে থাকে।

* * *

ধর্মমহাসভায় বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রতিনিধি Horin Toki এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। (Buddhism in Japan) 'জাপানে বৌদ্ধধর্ম' শীর্ষক তাঁর সেই বক্তৃতার চুম্বক ও ভাষান্তর প্রদত্ত হলঃ

ইষ্টলাভের তিনটি পথ বা যান নির্দেশ করেছেন ভগবান বুদ্ধ। এই ত্রিবিধ যান হল প্রাথমিক যান ও পরবর্তী দুটি যান—হীনযান (বা সঙ্কীর্ণ পথ) এবং মহাযান (বা প্রশস্ত পথ)। গভীর মানবিকবোধ ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির বলে তথাগত উপলব্ধি করেছিলেন যে অধ্যাত্ম ভাবগ্রহণের ক্ষমতা সবার সমান নয়। তাই আধ্যাত্মিক মানসিকতার তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য তিনি তিনটি পথ বা যানের নির্দেশ দেন।

এই ত্রিবিধ যান হল আধ্যাত্মিকতার ত্রিধারা—বুদ্ধবারিধি হতে উৎসারিত তিনটি ধারাই অবশেষে মেশে সেই একই বারিধিতে; সুতরাং ধারাগুলির গভীরতা ও গতি পথের দৈর্ঘ্য পরিমাপ নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

প্রাথমিক যানটি হল বৌদ্ধদের আচরণীয় পাঁচটি নৈতিক বিধি—এগুলি বিধৃত আছে 'দেবসূত্রে'। বিধানগুলি হলঃ 'হত্যা ও পরস্বাপহরণ থেকে নিবৃত্ত হও; ব্যভিচার, মাদকাসক্তি ও অমার্জিত ভাষা ব্যবহার বর্জন কর।' 'আগমসূত্রে' বিধৃত হীনযানের মতবাদ এবং 'সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীকসূত্র' ও 'সুরঙ্গমসূত্র' ইত্যাদিতে বিধৃত মহাযানের মতবাদ। জাপানে এই মহাযান পন্থার বিশেষ প্রসার।

এই ধারাগুলি পরস্পর-বহির্ভূত নয়—বস্তুত হীনযান মহাযানেরই অন্তর্ভুক্ত। উভয়

ধারার সমন্বিত রূপ 'একযান' নামে অভিহিত। আশা করা যায় ভাবী কালে বিজ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবিকাশের ফলে ধারা দুটি মিশে এক হয়ে যাবে।

বৌদ্ধ ধর্মমতানুসারে, নিখিল বিশ্বের যাবতীয় বস্তু আদি-অন্তহীন এবং যেহেতু বস্তু স্বরূপত অনাদি, অনন্ত, তাই বিশ্বস্রষ্টা অনাদি, অনন্ত পুরুষের কল্পনা এই ধর্মে নিষ্প্রয়োজন বলে গণ্য করা হয়।

বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন, জড়-চেতন-নির্বিশেষে অস্তিত্বের সকল স্তরই বোধিসম্পন্ন অর্থাৎ পূর্ণতার সম্ভাবনাসম্পন্ন—মানুষ, ইতর প্রাণী, উদ্ভিদ, সবই বোধিসত্ত্ব; প্রকাশের প্রতীক্ষারত প্রসুপ্ত বুদ্ধ। বাহ্যত পৃথক হলেও এরা স্বরূপত এক, অভিন্ন।

বৌদ্ধধর্ম বোধিসঞ্চার করে সকলকে বুদ্ধত্বে উন্নীত করে। 'বুদ্ধত্ব' লাভের অর্থ হল পূর্ণতাপ্রাপ্তি। বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য হল ধৈর্য, তিতিক্ষা ও মানবিকতার অনুশীলন। মানুষের অন্তরে প্রেম, করুণা ও সহমর্মিতার সঞ্চার করে, বুদ্ধত্বলাভে তাকে সহায়তা করা হল এই ধর্মের লক্ষ্য।

বৌদ্ধধর্ম কার্যকারণ নীতির অমোঘতায় বিশ্বাসী—বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন সুখ ও দুঃখ হল সৎ ও অসৎ কর্মের অনিবার্য ফল। সুতরাং সৎ কর্মের আচরণই শ্রেয়, এই হল তাঁদের ধর্মের শিক্ষা।

বৌদ্ধধর্ম ধ্যানের শক্তিতে বিশ্বাসী। বিশ্বের মর্মের গভীরে আছে সুস্নিগ্ধ শান্তি—অপার, অতল পরমা প্রশান্তি; আর 'ধ্যান' হল সেই শান্তি মন্থন করে আনার কৌশল।

বিশ্বে পরিব্যাপ্ত বুদ্ধশক্তির জাগরণ ঘটে পূজা ও প্রার্থনায়। তাই বৌদ্ধধর্মে পূজা ও প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্বীকৃত। রক্ষণশীল বৌদ্ধধর্ম পৌত্তলিকতা-বিরোধী। তবে প্রাথমিক স্তরে (আধার ভেদে) প্রতীক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে না। বৌদ্ধধর্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।

মোক্ষ বা 'নির্বাণ'লাভ হল বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য। 'নির্বাণ' হল আত্মার গূঢ় রহস্য ছেদন বা পরম সত্যের উদ্‌ঘাটন।

* * *

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সুদীর্ঘ এক ভাষণ দেন Mohammed Webb। ইনি ছিলেন জন্মসূত্রে রাশিয়ান কিন্তু ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ভাষণের নির্বাচিত অংশ ও তার ভাষান্তর হল ঃ

(এই ধর্মমহাসভায়) আজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছি বলে যে পরিতৃপ্তি বোধ করছি তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। ভারত, তুরস্ক ও মিশরের সহস্র, সহস্র মুসলমানের মনে এই মহাসভা যে সাড়া জাগিয়েছে, সে উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে, তাও আমি প্রকাশ করতে অক্ষম।

আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে ইসলাম ধর্মের মূল নীতিগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে। এখন দেখা যাক 'ইসলাম' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি। 'ইসলাম' হল গভীর ব্যঞ্জনাময়

এমন একটি শব্দ যার মাধ্যমে মানুষের মনের ধর্মচেতনা প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত হয়। শব্দটির সরল, আক্ষরিক অর্থ হল 'ঈশ্বর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ'—ঈশ্বরলাভের আকৃতি। যা কিছু মহৎ-উদার, যা কিছু পূতপবিত্র মুশ্লিম ধর্ম তারই অনুশীলনের নির্দেশ দেয়।

ইসলাম ধর্ম ঈশ্বরেব কাছে মানুষের দায়বদ্ধতা স্বীকার করে। মানুষ তার প্রতিটি চিন্তা ও আচরণের জন্য স্বয়ং ঈশ্বরের কাছে দায়ী—তুমি, আমি, সে অথবা অপর কোনও মানুষের কাছে নয়। প্রত্যেক কাজে তাঁকে স্মরণ ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে এবং প্রতিটি সচ্চিন্তা ও সদাচরণেব জন্য তাঁর কাছে মিলবে পুরস্কার। মুশ্লিম ধর্মে (ভক্ত ও ভগবানের মধ্যস্থ কেউ নেই) যাজক শ্রেণী বা পুবোহিত কুলের কোনও ভূমিকা নেই।

ঈশ্বর আমাদের পিতা ও সেইসূত্রে বিশ্বমানব আমাদের ভ্রাতা। পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ মুসলমানে মুসলমানে কোনও ভেদ নেই, সবাই ভাই ভাই—এই সাম্যনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মুশ্লিম ধর্ম। আমির (Emir) নামাজ পরিচালনা কবেন বটে কিন্তু তিনি কোনও ধর্মোপদেশ দেন না। প্রতিদিন বেলা দ্বিপ্রহরে তিনি মস্‌জিদে উপস্থিত হন ও পবিত্র কোরাণ থেকে দুটি অধ্যায় পাঠ করেন। পাঠের পর তিনি নেমে এসে দাঁড়ান (নামাজের জন্য সমবেত) মুশ্লিম ভাইদের পাশে এক-সমতলে—নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেন (আল্লাহ্) ঈশ্বরের কাছে। প্রার্থনা চলতে থাকে—আমির শুধু পরিচালনা করেন। প্রকৃত ভ্রাতৃভাব উন্মেষেব জন্যই এই প্রার্থনা-পদ্ধতিব প্রবর্তন।

এই প্রার্থনারীতি প্রবর্তনের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে মোহম্মদের প্রজ্ঞা। তিনি বলেননিঃ 'প্রার্থনা কর যখন খুশি' ;— বলেছেনঃ 'প্রার্থনা করবে প্রতিদিন পাঁচবার, নিয়মিত সময়ে।' (খাঁটি) মুসলমানকে দিনের প্রথম প্রার্থনাটি সারতে হবে পূবের আকাশে ভোরের আলো ফোটার আগে। উষালগ্নে, নতজানু হয়ে সে নিবেদন করবে ঈশ্বরের চরণে তার প্রভাতের প্রথম প্রার্থনা। এই তার প্রভাতী প্রার্থনার প্রকৃষ্ট লগ্ন। (ভক্ত) মুসলমানকে জাগতে হয় ভোরে, যার ফলে ভোরে ওঠার সু-অভ্যাসটি (আপনি) গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয় প্রার্থনাটি তাকে সাবতে হয় বেলা বারোটা থেকে একটার মধ্যে অর্থাৎ সূর্য যখন মধ্যগগনে। আর তার তৃতীয়বারের প্রার্থনার সময় হল অপরাহ্ণ বেলা চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে। চতুর্থবার সে প্রার্থনায় বসবে সন্ধ্যালগ্নে, সূর্য যখন অস্তাচলে। আর দিন শেষের প্রার্থনাটির লগ্ন হল শয্যাগ্রহণের প্রাক্‌মুহূর্ত।

এবার আসি (অজু বা) প্রক্ষালনের প্রসঙ্গে। প্রতিটি প্রার্থনার আগে (অর্থাৎ প্রতিবার নামাজ পড়ার আগে) প্রক্ষালনের বিধান রয়েছে। (এই বিধানটিও সুবিবেচনা প্রসূত) এর ফলে শুচিতার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

মুশ্লিমধর্মে জাতিভেদ নেই, এই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভেদরেখা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। এই ধর্ম বলেঃ 'যে তোমার ক্রীতদাস সেও তোমার ভাই। অবস্থাবিপাকে ভাগ্যের বিপর্যয়ে সে আজ তোমার ক্রীতদাস, তা সত্ত্বেও সে তোমার ভাই।' এই ধারণা গড়ে দিয়ে, মুশ্লিমধর্ম ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে তোলে।

পরিশেষে বলি, আজ অবধি পৃথিবীতে মুশ্লিমধর্মমতের যত অপব্যাখ্যা হয়েছে তত অপর কোনও ধর্মমতেরই হয়নি।...আমার ধারণা, আমেরিকাবাসী পল্লবগ্রাহী নন এবং

তাঁরা পয়গম্বরের স্বরূপনির্ণয়ে ও তাঁর অবদানের প্রকৃত মূল্যায়নে উদ্যোগী হবেন—যদি হন তাহলে আমাদের এই সার্বজনীন সমাজ-ব্যবস্থার স্বীকৃতি মিলবে, অন্তত এই ব্যবস্থার যথাযোগ্য মূল্যায়ন হবে।

* * *

জাপানের P. Goro Kaburagi বলেন শিন্টোধর্মের কথা—এ ধর্ম আজ অবলুপ্তির পথে। তবু সুপ্রাচীন এই ধর্মের নৈতিক উৎকর্ষের জন্য আজও তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

'শিন্টো' শব্দের অর্থ হল ইষ্ট বা ঈশ্বরলাভের পথ। মহাশান্তির দেশে (জাপানে) এই ধর্মের অভ্যুদয়। এই ধর্ম মতানুসারে ঈশ্বর এক, শাশ্বত মহামহিমময় সত্তা—অধস্তন দেবতাদের মধ্যস্থতা বিনা তাঁর সমীপস্থ হওয়া যায় না। এই দেবতাদের মাধ্যমেই শিন্টোরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। শিন্টোদের মন্দিরে কোনও বিগ্রহ বা প্রতিকৃতি নেই। শিন্টো মন্দির সাধারণত কোনও নির্জন স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয় ও মন্দিরগুলির গঠন অত্যন্ত সাধারণ। শিন্টোদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'কিকোজি' ((Kikoji), 'নিহোঙ্গি' (Nihongi) ও 'মান্যশিন' (Manyoshin)। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি প্রণীত হয় খ্রীস্টপূর্ব ৭১২ অব্দে, পরবর্তী গ্রন্থ দু'খানিও প্রায় সমকালীন ও সমমর্যাদাসম্পন্ন (সমমূল্যবহ)। প্রাচীন জাপানী ভাষায় লিখিত এই ধর্মগ্রন্থগুলি সাধারণ মানুষের বোধের অগম্য। শিন্টোরা যাগ-যজ্ঞ আচরণ করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের দেবতারা যজ্ঞে বলি দেওয়া মাংসের ভোগ গ্রহণ করেন না। 'য়ু-কাগুরা' (Yu-Kagura) নামে একটি উৎসব তাঁরা পালন করেন—এটি হল 'উষ্ণ জলে দেবতার তুষ্টিবিধান' উৎসব। তাঁদের বিশ্বাস, এ যজ্ঞ সুভগ—এতে দেবতারা তুষ্ট হন ও যজ্ঞকারীর পাপ স্খালন হয়।

শিন্টোধর্মে প্রথাগত প্রার্থনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না—তবে (প্রার্থনার শক্তিতে) বিশ্বাসীরা প্রার্থনার অনুষ্ঠান করে থাকেন। 'দোষস্বীকার' (Confession) অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে, এঁরা বিশ্বাস করেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঈশ্বরের রোষ এড়ানো যায়। সম্রাটকে এঁরা ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে মনে করেন, সম্রাট হলেন এঁদের দৃষ্টিতে আদর্শ পুরুষ। আমাদের (অর্থাৎ শিন্টোদের) সম্রাট স্বয়ং প্রজাদের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে পূজার্চনা করেন। ষান্মাসিক ও বাৎসরিক একটি উৎসব শিন্টোদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই উৎসব উপলক্ষে জনসাধারণ নদীতীরে সমবেত হয়ে পুণ্যস্নান সমাপনান্তে (মিলিত) প্রার্থনা জানান কোনও দোষ বা কলুষ যেন তাঁদের জাতিকে না স্পর্শ করে।

শিন্টো সমাজ কঠোর হস্তে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে থাকেন। তবে কতক কুসংস্কারও এঁদের মধ্যে রয়েছে। কোনও ধর্মমত যদি এঁদের থেকে থাকে তবে তা হল শুচিতা (বা শুচিতাই হল শিন্টোদের একমাত্র ধর্মমত)। শিন্টো ধর্মে অসি, আরশি ও শীলমোহর ঈশ্বরীয় রাজশক্তির প্রতীক বলে গণ্য।

নিখিল বিশ্বের মানুষ দেবী অদিতির সন্তান—এই হল শিন্টোদের ধর্মীয় শিক্ষা। এঁরা স্বর্গ মানেন কিন্তু নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। এঁদের মতে, আত্মাতে কোনও দোষ

অর্শায় না তবে দেহ কল্মষাধীন এবং স্বয়ং ঈশ্বর এই কলুষ-কল্মষের জন্য দণ্ডবিধান করেন। চরম দণ্ড হল মৃত্যু, তবে আত্মা মৃত্যুর তোরণ অতিক্রম করে দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। শিন্টোধর্মে কোনও তাত্ত্বিক শিক্ষাও দেওয়া হয় না। এর যা কিছু তত্ত্ব সবই ব্যক্তিসাপেক্ষ। অধুনা শিন্টোধর্ম লুপ্তপ্রায়। ধর্মটির নিজস্ব কোনও ত্রুটি এই অবলুপ্তির কারণ নয়, কারণ হল (এদেশে) উৎকৃষ্ট মানের এক নবধর্মের অভ্যুদয়। যীশুর ধর্ম বা খ্রীস্টধর্মই হল আজ জাপানের ভাগ্যাকাশের নবোদিত সূর্য।

* * *

বোম্বাইয়ের পার্শী সম্প্রদায় 'A sketch of Zoroastrianism' নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করে যার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলঃ

Zoroastrianism ধর্মের প্রসার ঘটে প্রথমে আফগানিস্তান, পূর্ব পারস্য ও নিকটবর্তী অঞ্চলে; পরে পশ্চিম পারস্যে। কালে এই ধর্ম প্রভাবিত করে মিশর ও এশিয়া মাইনর। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা Zarathushtra spitama খ্রীস্টপূর্ব ১২০০ অব্দের প্রাক্‌কালিক এক প্রামাণিক কবি, দার্শনিক ও ধর্ম-প্রবক্তা। সংস্কারমূলক কাজের জন্য তিনি নির্যাতিত হয়েছেন।

পারসিক ভাষায় ঈশ্বরকে বলে 'মাজদা' (Mazda), Zarathushtra তাঁর ধর্মকে 'মাজদা উপাসনা' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী অর্থাৎ ঈশ্বরের একরূপতায় বিশ্বাসী। তাঁর এই একেশ্বরবাদ হল এক প্রতিবাদ—আদি হিন্দুসমাজের ইরানীদের 'দেবপূজা'র (বহু দেবদেবী পূজাব) বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ। এমনতরো প্রতিবাদ এর আগেও হয়েছে, বহু সংস্কারকের উদ্যোগে; তবে শেষ অবধি এই পূজার্চনা বন্ধ করতে সক্ষম হন একমাত্র Zarathushtra। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের শিক্ষাঃ ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; এই এক ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য। প্রতিটি Zoroastrian শপথ গ্রহণ করে বলেনঃ 'আমি মাজদার পূজারী; Zoroaster-এর অনুগামী; ভ্রমাত্মক (কাল্পনিক) দেবদেবীর বৈরী (বিরুদ্ধাচারী) এবং ঈশ্বরের বিধিবিধানে বিশ্বাসী।' মাজদার পূজা অর্চনা 'আবেস্তা'তে সদ্ধর্ম বলে বিশেষভাবে বর্ণিত, সমগ্র আবেস্তাতে কেবলমাত্র মাজদাকেই উপাস্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এ মর্যাদা শুধু দেবতাত্মাদেরই প্রাপ্য।

Zoroastrianism-এর ধর্মগ্রন্থ Zend Avesta। Zend-এর অর্থ ভাষ্য আর Avesta হল মূলগ্রন্থ (কোষ গ্রন্থ)। এটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের লেখার একটি সংকলন মাত্র। গ্রন্থটির দুটি অংশ; প্রথমাংশ Yasna হল স্বয়ং Zoroaster প্রণীত পাঁচটি গাথা বা পবিত্র স্তোত্র সম্বলিত। অপরাংশ Visparad, Vendidad ও Korden Avesta। এগুলি Zoroaster-এর মৃত্যুর পরে, তবে খ্রীস্টপূর্ব ৫৫৯ অব্দ, কালের মধ্যে রচিত। রচয়িতা পুরোহিতকুল। গাথাগুলিতে একেশ্বরবাদের উদ্‌গাতা Zoroaster-এর জীবন্ত অস্তিত্ব অনুভব করা যায় ও তাঁর উচ্চ নৈতিক আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায়

প্রতিটি ছত্রে উদ্‌গীত হয়েছে ভগবানের পুণ্য নাম 'আহুরা মাজদা'। গাথার পরবর্তী কালে রচিত Yasna-তে আছে প্রার্থনা সঙ্গীত, এগুলি গাওয়া হয় বিশেষ উৎসবের সময়। Visparad হল স্রষ্টার আবাহন-গীতি। উৎসবের লগ্নে, Yasna-র অংশবিশেষ সহযোগে সমবেত কণ্ঠে, এগুলি গাওয়ার রীতি। Vendidad হল অশুভ ও অমঙ্গলবোধের বিধিবিধান। Khorden Avesta হল বিভিন্ন ধরনেব রচনাসংগ্রহ। এটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন।

* * *

'তাও'-ধর্ম সম্পর্কেও প্রবন্ধ পাঠ (Prize Essay) করা হয়ঃ

চীনদেশের প্রাচীনতম ধর্ম Taoism ও Confucianism, Taoism ধর্মের প্রবর্তক সর্ব ধর্মের আদি স্রষ্টা স্বয়ং। চাও বংশোদ্ভব Laotsze হলেন ঈশ্বরের আদিষ্ট পুরুষ। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৬০৪ অব্দে তাঁর জন্ম, তিনি ছিলেন Confucius-এর সমসাময়িক। তাঁর রচিত 'Tao Teh King' পুস্তকের বিষযবস্তু বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টি ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের রহস্য। অজ্ঞ জনকে জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি বচিত।

কালে এই ধর্ম চারটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে, দীর্ঘকাল পবে আবার এক হয়। তবে বর্তমান Taoist সম্প্রদায বাম ও দক্ষিণপন্থী এই দুটি ভাগে বিভক্ত। তুচ্ছ বাসনা বর্জন করে, Taoist সম্প্রদায় যদি ধর্মের নিগূঢ় অর্থ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন তবে জীবনের চরম লক্ষ্য লাভ সুদূর পরাহত নয়। কিন্তু পরবর্তী কালে ভোগের বাসনায় অন্ধ হয়ে তাঁবা জীবনের শুভপথ থেকে বিচ্যুত হন। সরল, পবিত্র জীবনাদর্শ তাঁরা যেদিন হারালেন সেদিন থেকেই তাঁদের অবনতির সূত্রপাত। ক্রমে Tao ধর্মে যাদুবিদ্যা ও ইন্দ্রজাল ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটল—এই অবক্ষয় সত্ত্বেও আজও তা Tao ধর্ম বলেই খ্যাত। অবশেষে চেং লুর আমলে যাদুবিদ্যা Tao ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে Taoist গোষ্ঠী দৈব দুর্বিপাকের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ও দৈবানুগ্রহ লাভের আশায় উপবাস, প্রার্থনা, স্তোত্র পাঠ ও মন্ত্রশক্তি চর্চা ইত্যাদির আচরণ করে থাকেন।

Taoist ধর্মে স্বর্গই আরাধ্য এবং স্বর্গ বা ঈশ্বরলাভের পথই তাঁরা অনুসন্ধান করেন। যাঁরা ঈশ্বরের আজ্ঞানুবর্তী তারা সুষ্ঠুভাবে জাগতিক কর্তব্য পালনে সক্ষম। নিষ্ঠা সহকারে ধর্মশাস্ত্র পাঠ করার ফলে তাঁদের আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটে, আত্মিক শক্তি সঞ্চার হয় ও অন্তর শুচি থাকে। তাঁরা মনে করেন, আত্মিক সম্পদ সুরক্ষার প্রয়াস না নিলে দিনে দিনে তা ক্ষয় হতে থাকে, আত্মিক শক্তির চর্চা না করলে ধীরে ধীরে তা লোপ পায় আর অন্তর যদি শুচি না হয়, তবে তো সবই গেল। Taoism-এ শুচিতার স্থান সর্বপ্রধান, সেইসঙ্গে ধৈর্য, তিতিক্ষা ও অধ্যবসায়। কোমলতা দিয়ে রূঢ়তাকে জয় করা যায়, এই শিক্ষা দেয় Taoism। দৃঢ়তার সঙ্গে নমনীয়তার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটায় এই ধর্ম। ফলে Tao পন্থীরা আপনার অগোচরে হয়ে ওঠেন সত্যনিষ্ঠ ও সততায় প্রতিষ্ঠিত।

অতীন্দ্রিয় চর্চার ক্ষেত্রে অন্য কোনও ধর্ম Taoism-এর সমকক্ষ নয়। (তাও পন্থীদের


মুনি আত্মারামজী—জৈনধর্মের প্রতিনিধি


প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি


বীরচাঁদ গান্ধী—জৈনধর্মের প্রতিনিধি


মিস জিনি সোরাবজি—সমাজসেবিকা
(বোম্বাই—বিষয়, ভারতীয় নারী)



পুঙ্ কুয়াঙ্ ইউ—কনফুশিয়াস ধর্মের প্রতিনিধি



মহম্মদ ওয়েব—ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধি

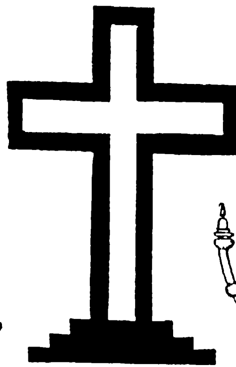


ডঃ এইচ অ্যাডলার—বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান ইহুদী যাজক



ডি. লাটাস—আর্চ বিশপ অব জান্তে

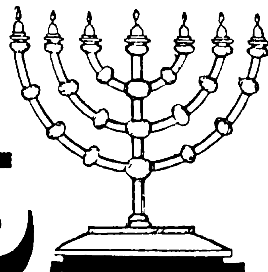
বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলির প্রতীক



খ্রীস্ট ধর্ম



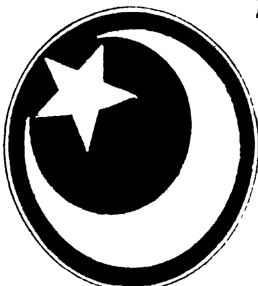
পারসিক ধর্ম



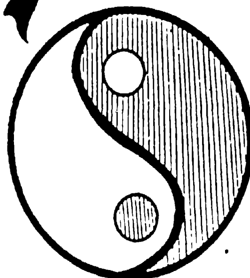
ইহুদী ধর্ম



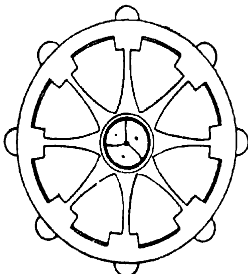
হিন্দু ধর্ম



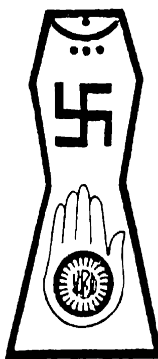
ইসলাম ধর্ম



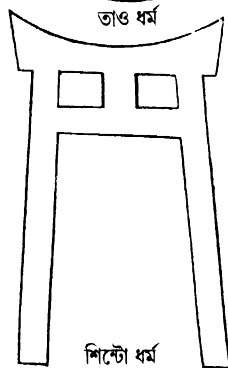
তাও ধর্ম



বৌদ্ধ ধর্ম



জৈন ধর্ম



শিন্টো ধর্ম



মিস ক্যাথারিন অ্যাবট স্যানবর্ন



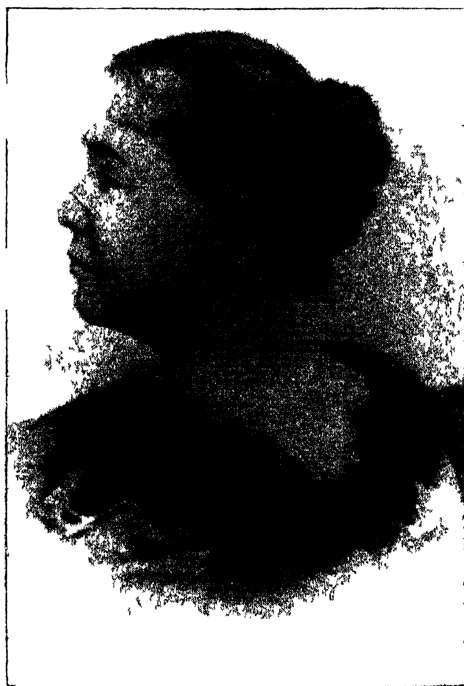
মিসেস কেট ট্যানাট উড্‌স



মিস্টাব বাইট



অ্যানেস্কোয়ামে স্বামীজী



মিসেস রাইট



মিসেস জর্জ ডবল্যু হেল



হেল ভগিনীগণ



গ্রীনএকাবে অন্যান্যদেব সঙ্গে স্বামীজী



'Swamı's Pıne'-এব তলায়



সারা ফার্মার



ধীরামাতা (মিসেস সারা চ্যাপম্যান বুল)



জো (মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড)



'জো'—পঞ্চাশ বছর বয়সে

মতে) নিজ দেহাভ্যন্তরে যে শক্তি বিরাজমান, সেই শক্তিতেই বিশ্বভুবন পরিপূরিত, সৃষ্টির মূলেও এই শক্তি ; অন্তর্নিহিত এই শক্তি জাগ্রত হলে, বিশ্বের যাবতীয় গূঢ় তত্ত্ব হয় করতলগত।

বর্তমানে তাও ধর্মের শোচনীয় অবনতি ঘটেছে। যাদুবলে ক্ষমতালাভে উৎসুক, ভোগবিলাসী তাও গোষ্ঠী আজ 'তাও' নামের অযোগ্য। ভাগ্যবলে যেন এমন ব্যক্তির দেখা মেলে যিনি তাও ধর্ম পুনরুদ্ধারে সক্ষম।

* * *

Dr. Ernest Faber (Shanghai) কনফুশিয়াস ধর্মের উৎস ও বিস্তারপ্রসঙ্গে বলেন ঃ

Confucius-এর শ্রেষ্ঠ অনুগামিবৃন্দ কর্তৃক স্বীকৃত যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান ও মতবাদ Confucianism-এর অন্তর্গত। ২৪০০ অব্দে চীনদেশে ও চীনের জনজীবনে এই ধর্মমতের প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। বস্তুত এই ধর্মমত চীনদেশ ও চৈনিক জীবন সম্পর্কে জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। Confucius নিজেকে ধর্মের বার্তাবাহক বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর যত ধ্যানধারণা সবই প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে সংগৃহীত। আপন উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী বিষয় নির্বাচন করে নিয়ে তিনি পাঁচখানি পবিত্র (ধর্ম) গ্রন্থ রচনা করেন।

Confucianism-এর মূল প্রোথিত সুপ্রাচীন অতীতে, এর উৎস হল প্রাচীনতর Taoism। এই ধর্মের মূল উপাদান বহুশতাব্দীর পুরাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত। এই উপাদানগুলি হলঃ স্বর্গ বা ঈশ্বর মানুষের চেয়ে প্রবলতর শক্তি বিশিষ্ট। Shang-Ti বা পরম ঈশ্বর সর্বশক্তিধর, তাঁর আজ্ঞাধীন হলেন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শক্তি বিশিষ্ট দেবতাবৃন্দ। দেবতা ও অপদেবতারা (good and evil spirits) পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করেন। অপদেবতাদের প্রভাবেই যাবতীয় অপকর্ম বা অশুভ কর্ম সংঘটিত হয়। দেবতাদের তুষ্টি কামনায় অনুষ্ঠিত হয় যাগ-যজ্ঞ, ভোগারতি। চাও (Chow) বংশের প্রতিপত্তি কালে পূর্বপুরুষদের পূজার্চনা প্রথার প্রচলন হয় ও এটিই হয়ে দাঁড়ায় চৈনিকদের প্রধান উৎসব।

Confucius মানুষের রাজনৈতিক সত্তাকেই সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষ প্রধানত সামাজিক সম্পর্ক বিশিষ্ট একটি রাজনৈতিক জীব। চীনের সাম্রাজ্য মর্তলোকে স্বর্গের প্রতিচ্ছবি। সম্রাট হলেন ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, পৃথিবীতে তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব অবিসংবাদিত। সম্রাট-প্রবর্তিত বিধিবিধান ঈশ্বরের বিধানের মতই অলঙ্ঘ্য। এই বিধিবিধান লঙ্ঘনের ফল হয় অশুভ এবং অশুভ রোধের উপায় হল বিধানের অনুবর্তী হয়ে চলা। Confucian-দের মতে ধর্ম রাজশক্তির অধীন।

Confucian-রা আশাবাদী—এঁদের মৌল ধারণাগুলি (নারী সম্পর্কিত ধারণা বাদে) আশাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এঁদের মতে মানুষের স্বভাব মূলত এক—প্রতিটি মানুষের আত্মোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে, সন্তসুলভ গুণাবলী অর্জন সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। আত্মোন্নতি সাধনে অক্ষম ব্যক্তি ক্ষমার অযোগ্য। Confucius যে (কঠোর) Lex Talionis-এর

ব্যবস্থা দেন তার কুফল আজও সুস্পষ্ট। তবু চীনদেশে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু বলে স্বীকৃত।

Confucian ধর্মে আজ ভাঙ্গন ধরেছে। সমাজে দেখা দিয়েছে ঘোরতর অবক্ষয়, মানুষ হারিয়েছে তার মানবমহিমা; অথচ সর্বত্র মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মন্দির বা ধর্মস্থান। আজ যদি Confucius বেঁচে থাকতেন, তিনি অবশ্যই স্বাগত জানাতেন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে, পাশ্চাত্যের কাছ থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার নির্দেশ দিতেন আর পারস্পরিক আদান-প্রদানের শিক্ষাও দিতেন।

* * *

ধর্মমহাসম্মেলনের প্রথম দশদিনে খ্রীস্টধর্মমতের সামগ্রিক আলোচনা হয়েছিল। কয়েকজন প্রতিনিধির ভাষণে পার্লামেন্টের সর্বোচ্চ আদর্শের কথা তথা বিশ্বসহনশীলতার নীতি নিষ্ঠাসহকারে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হলেও অন্য বক্তাদের কথায় বিশ্বধর্মের অর্থ যে খ্রীস্টীয় ধর্মমতেরই আনুগত্য—এই মনোভাব পরোক্ষভাবেই শুধু নয় কারও কারও ভাষণে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল।

লণ্ডন Missionary Society-র Rev. E.L. Slater (ভারতে কর্মরত) তাঁর ভাষণে তদানীন্তন ভারতের যে চিত্রটি তুলে ধরেন তার সত্যাসত্য বিচারসাপেক্ষ। তিনি বলেনঃ ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা (আজ আর) হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থাশীল নন, তাঁরা যীশুতে আস্থাস্থাপন করেছেন।

পাপের ভারে যাঁরা ভারাক্রান্ত এবং যাঁরা এমন কিছুর সন্ধান করছেন হিন্দুধর্ম যা দিতে অসমর্থ, তাঁরা অনিবার্যভাবে যীশুর প্রতি আকৃষ্ট হবেন—যীশুর চৌম্বক আকর্ষণ তাঁদের কাছে অপ্রতিরোধ্য।

লণ্ডনের Rev. George F. Pentecost বলেনঃ বহু প্রাচীন দার্শনিক মতবাদের ও বহু প্রাচীন ধর্মমতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের অপূর্ব সুযোগ এনে দিল এই বিশ্বধর্মমহাসভা। এখানে সুযোগ মিলল আমাদের আশা ও বিশ্বাসের কথা তাঁদের জানাবার—আমাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে খ্রীস্টধর্মই হবে বিশ্বজনীন ধর্ম। যে যুক্তির উপরে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি তাও উপস্থাপনার সুযোগ এখানে রয়েছে।

Rev. B. Fay Mills বলেনঃ আদর্শ মানবের তথা ঈশ্বরের স্বরূপ মূর্ত হয়েছে যীশুর মধ্যে। যে প্রেমের বশে ঈশ্বর পাপী-তাপী মানুষের ত্রাণের জন্য ক্লেশবরণ করেন সেই ঐশী প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে যীশুর জীবনে।

তিনি বিশ্বত্রাতা; কোনও ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের প্রতি তাঁর পক্ষপাত নেই—তাঁর দিব্যপ্রেম প্রসারিত সবার প্রতি। মানুষের মুক্তির কারণে ঈশ্বরের ক্লেশবরণের নবীন ও নিখুঁত চিত্র যীশুর জীবন। ঈশ্বরপুত্র হয়েও তিনি জন্ম নিলেন মানুষের ঘরে। একাধারে তিনি মানুষ ও দেবতা; এই দ্বিকায় (মর্তকায়া ও দিব্যকায়া) বস্তুত অভেদ।

দিব্যজীবনের আস্পৃহা ও দিব্যজীবনে উত্তরণের জন্য শক্তিসঞ্চয়ের মাধ্যমেই মানুষের মুক্তি ঘটে। দিব্যজীবন হতে ভ্রষ্ট মানুষকে রক্ষা করতে হলে চাই তার দেহে নবশোণিত

সঞ্চার—চাই নব জাগরণ। যীশুর ভাবাদর্শই হল সেই পূতশোণিত; কলুষকালিমার স্পর্শ হতে মানুষকে ত্রাণ করার প্রয়োজনেই তাঁর মর্তে অবতরণ।

যীশু দেখালেন ঈশ্বরে লীন হওয়াই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য।

গ্রীক চার্চ সম্পর্কে বলেন Zante-র Archbishop Rev. Dionysios Latas. তাঁর ভাষণে তিনি প্রধানত গ্রীক চার্চের প্রাচীনত্বের দাবি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। তিনি বলেনঃ যীশু ও তাঁর শিষ্যবৃন্দকে আদি গ্রীক চার্চের প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করা হয়। পুরাকালে গ্রীস ছিল গৌরবের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। সঙ্গত কারণেই তখন বলা হতঃ 'গ্রীক ভিন্ন অন্য সকলেই অসভ্য, বর্বর।'

Plato, Aristotle-এর আমলে গ্রীক দর্শন উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেছিল কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে গ্রীসের পতন শুরু হয়ে গেছে। প্রাচীন দেবদেবীতে বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা লুপ্তপ্রায় এবং অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আদর্শ অপস্রিয়মান। ম্যাসিডনীয় বিজয় রাজনৈতিক দিক দিয়েও পতন সূচিত করল।

গ্রীস দেশবাসী তখন আশ্রয় খুঁজল দর্শনের দ্বারে। কিন্তু হতাশা আর নিস্পৃহতা ছাড়া আর কিছুই মিলল না Stoic দর্শন থেকে। আবার Epicurean মতবাদ ভোগ বাসনায় ইন্ধন জোগাল; এঁদের মতবাদ হলঃ 'কে জানে কখন মরণ এসে হানা দেবে দ্বারে! যতক্ষণ বেঁচে আছ, খাও-দাও, ভোগ করে নাও।'

মানুষের দুঃখক্লেশ চরমে পৌঁছুলে তারা দিব্যশক্তির শরণ নিল। প্রাচীন দেবদেবীতে তাদের বিশ্বাস টুটে গেছে। তাদের অন্তরের আকূতি থেকে জন্ম নিল নব ধর্মমত। নব ধর্মমতগুলির অন্যতম খ্রীস্টধর্ম প্রভাব বিস্তার করল সবচেয়ে বেশি। শুরু হল সংগ্রাম—মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, ভেদের প্রাচীর ভাঙার সংগ্রাম। এ সংগ্রামে জয়ী হল খ্রীস্টধর্ম, উড়ল খ্রীস্টধর্মের বিজয়কেতন। এক পরম ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করে, পারস্পরিক ভালবাসার সূত্রে বিশ্বমানবকে গ্রথিত ও এক দিব্য পরিবারভুক্ত করে খ্রীস্টধর্ম চেয়েছে জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটাতে।

মর্তধামে যীশুর আবির্ভাব Palestine-এর তোরণপথে, কিন্তু তাঁর (সু) বাণীর বীজ তিনি বপন করে গেছেন গ্রীক হৃদয়ক্ষেত্রে। নররূপী যীশু জন্মসূত্রে ইহুদী হলেও খ্রীস্টধর্ম গ্রীসীয় ধর্ম।

Rev. J. R. Slattery (Baltimore) বলেন Catholic Church ও নিগ্রো জাতি সম্পর্কে। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ততর রূপঃ নিগ্রোদের মানুষ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে Catholic Church. ঈশ্বরপুত্র যীশুর সূত্রে স্থাপিত হয়েছে মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে সৌভ্রাতৃত্ব।

খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে আমরা নবজন্মলাভ করেছি—দিব্য পরিবারভুক্ত হয়েছি ও তারই ফলে ভোগ করছি অনেক সুখসুবিধা। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হলেই মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া যায়; উচ্চকুলে জন্মালেই হয় না বা গৌরবর্ণ বিশিষ্ট হলেই হয় না।

ক্রীতদাসও মানুষ—নীতিজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। তাঁর নীতিবোধ ও বিবেকবুদ্ধিতে আঘাত হানার অধিকার নেই কোনও (মর্ত) প্রভুর। নিগ্রোও আদিমানব

Adam-এর বংশধর। শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় উভয়ই একই বিধাতার সৃষ্টি—উভয়েরই ত্রাতা সেই এক ঈশ্বরপুত্র (যীশু) এবং একই স্বর্গলোকে উভয়ের অধিকার।

জৈন ধর্মপ্রসঙ্গে বীরচাঁদ গান্ধী বলেনঃ

জৈনদের ধর্মীয় বিধান (জৈন সংহিতা?) দুটি ভাগে বিভক্ত—Shrute ধর্ম বা দর্শন ও Chatra ধর্ম বা নীতিশাস্ত্র। জৈন সংহিতায় প্রাণিজগতের বিভিন্ন স্তরের বিশদ আলোচনা রয়েছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার বহু কাল আগেই জৈন ধর্মাচার্যেরা (প্রাণীতত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানার্জন করার ফলে) জেনে গেছেন ক্ষুদ্রতম প্রাণীদেহে কটি ইন্দ্রিয় আছে। অহিংসা জৈন নীতিশাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ।

জৈন ধর্ম বর্ণিত চারটি অবস্থা হল Naraka, Tiryarch, Manushyra ও Deva। নিম্নতম অবস্থা Naraka এবং উচ্চতম অবস্থা হল Deva—এ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা 'Tiryarch ও Manushyra' উচ্চতম অবস্থার অপর নাম মোক্ষ। কর্ম-বন্ধন-বিমুক্ত বিশুদ্ধ আত্মা পার্থিব সকল মোহ পাশ ছিন্ন করে এই অবস্থায় উন্নীত হয়।

জৈনদের দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মা ও বস্তুজগৎ উভয়ই অবিনাশী। জৈনরা ঈশ্বরের সর্বময়তায় বিশ্বাসী। জগদ্ব্যাপার-বহির্ভূত (Transcendent) ঈশ্বরকে তাঁরা মানেন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন সৃষ্টির মূলে এক সর্বব্যাপী অনন্ত সত্তা যা যুগপৎ চৈতন্যময় ও চৈতন্যরহিত। তাঁকেই বলে ঈশ্বর।

জৈনরা আত্মার অবিনশ্বরতায় ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। এ দুয়ের ফলশ্রুতি কর্মফলবাদেও এঁরা বিশ্বাসী। মানুষ আপন আপন কর্মের ফল ভোগ করে, এ বিশ্বাস জগতের আপাত অন্যায়, অবিচার ও অসাম্যজনিত সমস্যার মীমাংসা ঘটায়।

ভক্তি, জ্ঞান ও সদাচরণবলে মানুষ কর্মের বন্ধন ক্ষয় করে আত্মবিকাশে সক্ষম হয়ে ওঠে। উচ্চতম এই অবস্থায় যিনি উন্নীত হন তাঁকে বলে 'জিন'। যে সকল 'জিন' যুগে যুগে ধর্মের বাণী প্রচার করে গেছেন, তাঁদের বলে 'তীর্থংকর'।

এবার আসা যাক্ জৈনদের আচরণবিধির আলোচনায়। সকল প্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান করা হল জৈন ধর্মের অনুশাসন। বিভিন্ন ধর্মে 'মোক্ষ' বা পরমানন্দ (তুরীয়ানন্দ) লাভের বিভিন্ন পন্থা নির্দেশিত হয়েছে। জৈন ধর্ম বলে, জ্ঞান ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে এই অবস্থা লাভ করা সম্ভব।

জৈন সন্ন্যাসীদের পালনীয় পাঁচটি (মহাব্রত) হলঃ প্রাণনাশ করো না; সকল প্রাণীকে রক্ষা করো; ইন্দ্রিয়সম্ভোগ থেকে বিরত হও; অপরিগ্রহ অর্থাৎ অপ্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করো না এবং পার্থিব বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করো—কোনও কিছুই 'আমার' বলে মনে করো না।

* * *

সেদিন বিশ্বমঞ্চ থেকে ধর্মের প্রতিনিধিগণ সকলেই নিজের ধর্মের আদর্শ ও প্রেমের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সকলেই এসেছিলেন প্রস্তুত হয়ে, তাঁদের হাতে ছিল সুলিখিত একেকটি প্রবন্ধ। অথচ সুপ্রাচীন হিন্দুধর্মের 'ঐশী অধিকারে বাগ্মী' ভারতাগত নবীন সন্ন্যাসী কোনও রকম প্রস্তুতি ছাড়াই পাশ্চাত্যের শক্তি ও ঐশ্বর্যের সুরক্ষিতমঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন

এবং তাঁরই আহ্বানে ঐ বিদগ্ধ সমাবেশে নরনারী কোনও এক চিরবিস্মৃত আত্মিক ঐক্যকে স্মরণ করে জাগ্রত হয়েছিলেন। 'Sisters and brothers of America'-এই কয়েকটি শব্দ বিপুল স্পন্দন তুলে করতালির শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়ে মুহূর্তেই চিনিয়ে দিয়েছিল বিশ্বাচার্যকে। উদ্যোক্তারা ভুল করলেও, শ্রোতারা ভুল করেননি তাঁকে চিনে নিতে সকলের মধ্য থেকে কারণ ধর্মান্ধ পুরোহিতকুল নয়, উদার শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত শ্রোতারাই ছিলেন 'প্রকৃত জহুরী'।

স্বামীজীর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ শ্রোতাদের অভিভূত করল। ১১ সেপ্টেম্বরের ভাষণে তিনি বললেনঃ

> "আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।...যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে কবি।... পৃথিবীতে এযাবৎ অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাসম্মেলন এই ধর্ম-মহাসভা, গীতা-প্রচারিত সেই অপূর্ব মতেরই সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে, সেই বাণীই ঘোষণা করিতেছেঃ 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।' যে যে-ভাব আশ্রয় করিয়া আসুক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেই চলিয়া থাকে।... এই ধর্ম-মহাসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘন্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতন এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।"

শুধু প্রথমদিনেই নয়, একই ভাবে ১৫ সেপ্টেম্বরের সংক্ষিপ্ত ভাষণেও 'মতুয়ার বুদ্ধি' ত্যাগ করতে বলে তিনি কুয়োর ব্যাঙেব গল্পটি তুলে ধরেছিলেন। মন্তব্য করেছিলেনঃ 'সঙ্কীর্ণভাবই আমাদের মতভেদের কারণ।' গল্পটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সমস্ত শ্রোতাদের মনকেই স্পর্শ করেছিল।

১৯ সেপ্টেম্বর স্বামীজী হিন্দুধর্মের ওপর তাঁর লিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করে পাশ্চাত্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করলেন। তাঁর এই ভাষণের কোনও নজির ধর্মীয় সাহিত্যে নেই। বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, নানা মতবাদে আকীর্ণ হিন্দুধর্মের স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপনির্মাণ এক অসাধ্য ব্যাপার ছিল—যা এই নবযুগের আচার্যই অনায়াসে সম্পন্ন করেছিলেন। স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম' বিষয়ক ভাষণপ্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেনঃ ভারতবর্ষের নিজের দিক দিয়ে এই ক্ষুদ্র ভাষণটি ছিল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এক সংক্ষিপ্ত প্রমাণপত্র। বক্তা হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন কিন্তু 'বেদ' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তার ধারণাকে তিনি পূর্ণ করে দেন অধ্যাত্ম-তাৎপর্যে। তাঁর নিকট—যা সত্য, তাই 'বেদ'।

স্বামীজী বললেনঃ "বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বেদান্তের যে মহোচ্চ

আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র, সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান হইতে নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত সবকিছুরই, এমনকি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ—এগুলিরও স্থান হিন্দুধর্মে আছে।" প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের পথে ভগবানকে আরাধনা করতে পারে। হিন্দুধর্মের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ। প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই হিন্দুধর্মের মহিমা। ভারতের বৈশিষ্ট্য এই—প্রতিটি অকপট ধর্মবিশ্বাসকেই সে মহান উত্তরণের সোপান মনে করে এবং সকল ধর্মাবলম্বীকেই জানায় সহানুভূতি ও আশ্বাস। অদ্বৈতদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেও তাই স্বামীজী দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈতভাবনাকে একই বিকাশের তিনটি ক্রমিক স্তর বলে উল্লেখ করেন।

ভগিনী নিবেদিতা তাই মন্তব্য করেছিলেনঃ "যখন তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল 'হিন্দুদের ধর্মভাবসমূহ', কিন্তু যখন তিনি শেষ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম নূতন রূপ লাভ করিয়াছে।"

ঐদিন স্বামীজী ভাষণপ্রসঙ্গে একটি নতুন কথা খ্রীস্টান জগতকে শোনালেনঃ "মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ।... তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির-আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও, জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।"

২৭ সেপ্টেম্বরের বিদায়ী ভাষণে বিশ্বজনীন ধর্ম ও মৈত্রীর পরম আদর্শ স্বামীজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলঃ

> "খ্রীস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীস্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে।
>
> "যদি এই ধর্ম-মহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তো তাহা এইঃ সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।
>
> "এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখেন যে অন্যান্য ধর্ম লোপ পাইবে এবং তাঁহার ধর্মই টিকিয়া থাকিবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র; তাঁহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তাঁহাকে আমি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছি, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির বাধাপ্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবেঃ 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'।"

* * *

ধর্মমহাসভার উদ্বোধনী ভাষণে প্রেসিডেন্ট বনি একটি সুন্দর স্বপ্নের আভাস

দিয়েছিলেন যা সেই শতকে সার্থক হয়নি। তিনি বলেছিলেনঃ "Religion means love and worship of God and the love and service of man." আজ স্বামীজীর সমন্বয়ের বাণী, তাঁর উদারভাবনা, ধর্মমহাসভার অন্যান্য প্রতিনিধিদের আবেদন শতবর্ষের ব্যবধানে গভীরতর তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। মানুষের চিন্তা এখন বিজ্ঞানাভিমুখী। গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা যে মানবসভ্যতার অন্তরায়—একথা যে কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনুভব করেন। বিশ্ব আজ বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দেশের সমষ্টি নয়, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতাদর্শের পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষে মানুষে, দেশে দেশে ভাববিনিময় এখন স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক। কিন্তু আজও শতবর্ষ পূর্বে উচ্চারিত প্রেম, সহিষ্ণুতা, ঔদার্যের শাশ্বত বাণীগুলি প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি।

সারা জে. ফার্মারের স্বপ্ন গ্রীনএকারের ধর্মশিবির

সুব্রতা সেন

যে সকল পাশ্চাত্য নারী স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রচার কার্যের সহায় হয়েছিলেন কুমারী সারা জে ফার্মারের নাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বধর্মসম্মেলনের পরে সারার আমন্ত্রণেই স্বামীজী গ্রীনএকারের ধর্মশিবিরে যোগদান করে স্বচ্ছন্দভাবে বেদান্ত ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সারা ফার্মারের নিজের জীবন কম প্রেরণাপ্রদ নয়। তাঁর পিতা ছিলেন বৈজ্ঞানিক গবেষক অধ্যাপক মোসেস পেরিশ ফার্মার যিনি নানাবিধ আবিষ্কারের মাধ্যমে এবং টমাস এডিসনের বৈদ্যুতিক বাল্‌ব আবিষ্কারের পূর্বেই গৃহসজ্জায় বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করে বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অধ্যাপকের বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল তাঁর বিনম্র ভগবদ্‌বিশ্বাস। তিনি মনে করতেন আবিষ্কার গবেষকের নিজস্ব কিছু নয়। যে সত্য জগৎস্রষ্টার চিন্তারাজিরূপে বিশ্বে অলক্ষ্যে বিরাজিত আবিষ্কারকের সংবেদনশীল হৃদয়ে তার স্ফুরণ হয় মাত্র। একজন আবিষ্কারককে অবশ্যই অনুপ্রাণিত হতে হবে। যিনি অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে শুভকর্মপথে অগ্রসর হন, সাফল্য তাঁরই আসে। সেই সাফল্য তখন মানুষের শ্রদ্ধা ও পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এই কারণেই নিজস্ব আবিষ্কারগুলিব 'পেটেন্ট' নিযে স্বার্থরক্ষার চিন্তা কখনই তাঁর মনে উদিত হয়নি।

সারার মা হানা ছিলেন মহাপ্রাণতা ও ঈশ্বরনির্ভরতার প্রতিমূর্তি। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে এলিয়ট শহরে সারার জন্ম। মাত্র দু বছর বয়সে এক কঠিন ব্যাধিতে সারার প্রাণসংশয় হয়। অনন্যোপায় মা তখন ভগবানের কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা জানান, কন্যা যদি তার জীবন ফিরে পায় তাহলে সে জীবন তাঁর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হবে। বহুজনহিতায় উৎসর্গীকৃত সারার জীবন তাঁর মায়ের প্রার্থনা ও প্রতিশ্রুতিরই বাস্তবায়ন।

সারার পিতামাতা উভয়েই ছিলেন আধ্যাত্মিক উত্তরণবাদে বিশ্বাসী (Transcendentalist)। চোদ্দ বছর বয়স থেকে সারা বিভিন্ন গীর্জায় যেতে শুরু করেন; কিন্তু খ্রীস্টীয় ধর্মশাখাগুলির মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মতবিরোধ দেখে তাঁর মন ক্রমেই পীড়িত হতে থাকে। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা এলিয়ট থেকে রোডদ্বীপের নিউপোর্টে চলে আসেন এবং সপরিবারে দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এইসময় পিতামাতার উৎসাহে তিনি বস্তিতে গিয়ে সেবাকাজ চালিয়েছিলেন। ১৮৮১-তে তাঁরা

আবার চলে এলেন মেইনের এলিয়টে। সেখানে একমাত্র শিশুপুত্রের মৃত্যু হলে হানা একটি বাড়ি কিনলেন যেখানে তিনি বস্টনের বস্তির দুঃখী, দরিদ্র ও হতভাগ্য নারী ও শিশুদের আশ্রয় দিতে পারেন। পিতামাতার ঈশ্বরনির্ভরতা, মহাপ্রাণতা ও অধ্যবসায় সম্মিলিত হয়েছিল সারার মধ্যে। সারাজীবনই তিনি মহতী অনুপ্রেরণায় নিষ্ঠার সঙ্গে সার্থকতার পথে যাত্রা করেছেন।

অক্লান্ত পরিশ্রম করে সারা এলিয়টের মতো ছোট শহরে একটি অতি উন্নত মানের পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯০-এ এলিয়ট শহরের অপর চারজন বিশিষ্ট অধিবাসীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগও গ্রহণ করলেন। মনোরম বনচ্ছায়ায় নীরবে নিভৃতে যাঁরা কিছুকাল যাপন করতে ইচ্ছুক তাঁদের জন্য গড়ে তোলা হল এলিয়ট হোটেল, পরে যার নাম হল গ্রীনএকার। ১৮৯১-এ সারার মমতাময়ী মা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে সারা বস্টনে একটি ধর্মসভায় যোগ দেন। শহরের কোলাহল ও গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ উপেক্ষা করে শ্রোতাদের বক্তৃতায় মনোনিবেশ করার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে তিনি যুগপৎ বিস্মিত ও বেদনার্ত বোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই পিসক্যাটকা নদীর তীরে শ্যামছায়াঘন শান্ত-শীতল গ্রীনএকারে গ্রীষ্মকালীন আধ্যাত্মিক শিবিরের আয়োজন করার পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এল।

শিল্পমেলায় অধ্যাপক ফার্মারের আবিষ্কারেব প্রদর্শনী উপলক্ষে পিতার সঙ্গে শিকাগো গেলেন সারা। পিতা-পুত্রী স্থির করলেন শিল্পমেলায় অর্জিত অর্থ গ্রীনএকারের গ্রীষ্মশিবিরে কাজে লাগাবেন। ১৮৯৩-এর ১৭ মে বিশ্বধর্মসভার প্রধান উদ্যোক্তা চার্লস বনির সঙ্গে সারার সাক্ষাৎ হল। উৎফুল্ল বনি সমমনোভাবাপন্ন সারাকে সকল প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ২৫ মে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মোসেস হঠাৎ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য ভগ্নহৃদয়ে সারা ফিরে এলেন এলিয়টে। শোকার্ত সারাকে পরম মমতায় নরওয়েতে নিয়ে এলেন বান্ধবী শ্রীমতী বুল। তাঁর আন্তরিক আতিথ্যে পিতৃশোকের তীব্রতার অনেকটা উপশম হল। সেপ্টেম্বর মাসে বস্টনে অসুস্থ পিসিমার শুশ্রূষা করে অক্টোবরে সারা ফিরলেন শিকাগোয়। ধর্মসম্মেলন শেষ হয়ে গেলেও শিল্পমেলা তখনও চলছে সেখানে। প্রদর্শনীতে পিতার শিল্পকর্মগুলির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর ছবির দিকে বেদনাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সারা। মনে পড়ে, কত না উৎসাহের সঙ্গে বাবা বলেছিলেন ধর্মসমন্বয় ও মানবিকতার ভিত্তিতে গ্রীষ্মকালে গ্রীনএকারে যে বিদ্যালয়টি হতে চলেছে তাতে তিনি সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করবেন। মাঝখানে কী অঘটন ঘটে গেল। ভাবতে ভাবতে সারা যেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন বাবার গলার স্বর। তিনি বলছেন : 'আমার যথেষ্ট শুভেচ্ছা থাকবে তোমার জন্য। জেনো দুর্বলতার মধ্য দিয়ে পরিশীলিত হয়েই শক্তির পরাকাষ্ঠা ঘটে।' আনন্দবিহ্বল সারা নতুন উৎসাহে সঞ্জীবিত হলেন। ধর্মসভার যেসব প্রতিনিধি তখনও শিকাগোয় ছিলেন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আগামী গ্রীষ্মে গ্রীনএকারে যাবার জন্য তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন। সারার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ, অনাগারিক ধর্মপাল ও আরও অনেকে। গ্রীষ্মের কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য সমগ্র শীতকালটি সারা কঠোর পরিশ্রম করলেন।

১৮৯৪, ৩ জুলাই বিকেল তিনটেয় একটি সুবিশাল তাঁবুতে গ্রীনএকার গ্রীষ্মশিবিরের

শুভারম্ভ হল শান্তি ও সম্প্রীতি-প্রার্থনা দিয়ে। শ্রীমতী বুল স্বাগত ভাষণ দিলেন। সঙ্গীত ও প্রতিনিধিদের বক্তব্য পাঠের মধ্য দিয়ে দিনটি কাটল। বক্তৃতার পরে বড় বড় অক্ষরে PEACE (শান্তি) লেখা ছত্রিশ ফুট দীর্ঘ পতাকাটি তোলা হল পঁচাশি ফুট উঁচু একটি মাস্তুল-দণ্ডে।

বিশাল তাঁবুটি সাধারণ সমাবেশ ও বক্তৃতার জন্য ব্যবহৃত হত। অন্তরঙ্গ ও ঘরোয়া পরিবেশে ধর্মীয় ক্লাসগুলি হত ছোট তাঁবুতে, মাঠে, পাইন বনে বা পাহাড়ের উপরে। সন্ধ্যা অতিবাহিত হত ধ্যান ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। রাত্রে কখনও কখনও ব্যবস্থা থাকত সঙ্গীত বা অন্য কোনও নির্দোষ আনন্দের।

ব্যয়সাধ্য হোটেলে যাঁদের থাকতে অসুবিধা ছিল কিংবা যাঁরা ছিলেন প্রকৃতির কোলে অনাড়ম্বর দিনচর্যার পক্ষপাতী, তাঁদের জন্য নদীতীরের সমতলে বেশ কয়েকটি তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়েছিল যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'সূর্যোদয় শিবির'। শিবিরবাসীদের জন্য কোনও দক্ষিণা ধার্য করা হয়নি। অর্থ সংগৃহীত হত হোটেল ও কটেজ-ভাড়া থেকে এবং শুভানুধ্যায়ীদের অনুদান থেকে।

সারার উদার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই গ্রীষ্মশিবিরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য ও নানা ধারণা ও বিশ্বাসের মানুষ। বাস্তবিক পক্ষেই ধর্মসমন্বয়ের ভাবনা ও ঔদার্যে সারা তাঁর সমসাময়িকদের অনেককেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। বিশ্বধর্মসম্মেলন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে সারা আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন, সকল মত ও পথের মানুষ যেন গ্রীনএকারে এসে স্বচ্ছন্দভাবে মত বিনিময়ের সুযোগ পেয়ে উপকৃত হয়। 'খোলামনে নিজের মত পরিবেশন ও সশ্রদ্ধচিত্তে অপরের মত শ্রবণ'—এই ছিল শিবিরের লক্ষ্য। প্রয়োজনে সারা নিজেই বিনয়নম্র ভালবাসায় স্মরণ করিয়ে দিতেন, কারো উর্ধ্বায়নের একটি ধাপও যেন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা না হয়। শিবিরের দৃষ্টিভঙ্গি হবে সর্বদাই সৃজনাত্মক কখনই ধ্বংসাত্মক নয়।

প্রথমপর্বেই স্বামী বিবেকানন্দের যোগদান উক্ত শিবিরের পক্ষে সুফলপ্রসূ হয়েছিল। তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার চৌম্বকশক্তি গ্রীনএকার আন্দোলনকে বেদান্তের আদর্শে সঞ্জীবিত করে প্রকৃতই উদার ও গ্রহিষ্ণু করে তুলেছিল। অপরপক্ষে গ্রীনএকারের শান্ত বনশ্রী ও অনাড়ম্বর জীবনচর্যা স্বামীজীকে স্বস্তি ও শান্তি দিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্লীনতার সুযোগ এনে দিয়েছিল। গ্রীনএকারেই স্বামীজী তাঁর ভাবগ্রহণে উন্মুখ একদল মানুষকে একত্রে পেয়েছিলেন; হয়তো গ্রীনএকারের অভিজ্ঞতাই তাঁকে উপযুক্ত পাশ্চাত্য নর-নারীর জীবনগঠনের প্রেরণা দিয়েছিল যা সার্থক হয়েছিল সহস্রদ্বীপোদ্যানের শিক্ষাকেন্দ্রে।

১৮৯৪, জুলাই মাসে স্বামীজী গ্রীনএকারে পদার্পণ করেন। প্রতিদিন যে পাইন গাছটির নীচে তিনি ধর্মশিক্ষা দিতেন সেটি উত্তরকালে তাঁর নামেই চিহ্নিত হয়েছিল। গ্রীনএকারে স্বামীজীর আচার্যের ভূমিকা কী অনবদ্যভাবেই না উল্লিখিত হয়েছে ২৮ জুলাই 'বস্টন ট্রানস্ক্রিপট'-এ—'প্রতিসকাল গৈরিক বসন ও উষ্ণীষ শোভিত স্বামীজীকে দেখা যাবে নির্দিষ্ট পাইনের তলায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট, তাঁকে ঘিরে রয়েছে উৎসুক শ্রোতার দল, যাদের কাছে তিনি উজাড় করে দিচ্ছেন প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার রত্নরাজি—যারা এ আস্বাদনের সুযোগ পেয়েছে কী দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী তারা!' গ্রীনএকারে স্বামীজী রোজ

সাত-আট ঘণ্টা করে শিক্ষা দিয়েছেন কত বিচিত্র বিষয়ে। কখনও বলেছেন বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রেরিত পুরুষগণের উপর, কখনও মনোনিবেশ করেছেন একাগ্রতার গুরুত্বের উপর, কখনও বা মেঘমন্দ্র স্বরে উচ্চারণ করছেন 'নির্বাণষট্‌কম্‌'। কখনও বা ভাবে বিভোর হয়ে বলে চলেছেন নিষ্কাম ভালবাসার কথা। ভালবাসা, কোনও কিছুর প্রতিদান না রেখে কেবল ভালবাসার জন্যই ভালবাসা। একমাত্র এই নিষ্কাম ভালবাসার মাধ্যমেই আমরা নিজের ও অপরের ব্যষ্টিসত্তার প্রকৃত প্রসার ঘটাতে পারি। এই অপূর্বভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সারা একটি পত্রে লিখেছেন ঃ "গ্রীনএকারের ঈশ্বরনির্দিষ্ট কাজ করার অধিকার ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ সে মানুষকে একটা কিছু দেবার সুযোগ করে দিতে পারবে ; সে দেওয়া সময়, সামর্থ্য, অর্থ বা চিন্তা, যাই হোক না কেন। নৈর্ব্যক্তিক দানেই দানের সার্থকতা। স্বামীজীর বাণী যে আমার কানে বাজছে ঃ 'ভালবাসা শুধু ভালবাসারই জন্য'।" তুলনামূলক ধর্মচর্চার জন্য সারা গ্রীনএকারে 'মোনসলরৎ' স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সারার প্রেমপূর্ণ হৃদয় ও গ্রীনএকারের কাজ স্বামীজীর উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল। ১৮৯৫-এর ২৯ ডিসেম্বর নিউ ইয়র্ক থেকে ভগিনী সারার উদ্দেশ্যে স্বামীজী যে অনবদ্য পত্র লিখেছিলেন তার অংশবিশেষের উদ্ধৃতিও পাঠককে গভীর আনন্দের সন্ধান দেবে।

"এই বিশ্বে যেখানে কিছুই হারায় না, যেখানে জীবনের অন্তর্বর্তী-মরণেই আমরা বাস করি, সেখানে আমাদের প্রতিটি চিন্তা, প্রকাশ্যে অথবা নিভৃতে, জনাকীর্ণ রাজপথে অথবা আদিম গভীর অরণ্যের নির্জনবাসে, যেখানেই উদ্ভূত হোক না কেন, বেঁচে থাকে। কিছুই নষ্ট হয় না। অতীতের অশুভচিন্তাও মূর্ত হবার প্রেরণায় বারে বারে প্রকাশিত হয়, পবিস্রুত হতে হতে শেষে একেবারে পরমশুভ হয়ে দাঁড়ায়।...এই চিন্তা বা ভাবরাজি শেখায় জগতটা ভাল ও মন্দের নয় কিন্তু ভাল থেকে আরও ভাল এবং তার চেয়ে আরও ভাল হওয়া ; শেখায়, কোনপ্রকার নিন্দাবাদ ছাড়াই যে কোনরকম মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করতে, সর্বোপরি শেখায়, স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে আছেই যদি তা আমরা পেতে চাই, মানুষের মধ্যে পূর্ণতা রয়েছেই, যদি তা আমরা দেখতে চাই।

"গত গ্রীষ্মে গ্রীনএকারের সভাগুলি এত চমৎকার হয়েছিল কারণ যে ভাবরাজি তোমার মধ্যে আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে পেয়েছিল তার কাছে তুমি নিজেকে সম্পূর্ণ খুলে ধরেছিলে। এই ভাব জীবনে প্রয়োগ করার জন্য তোমাকে প্রভু নির্বাচিত ও উৎসর্গ করেছেন। এই চমৎকার কাজে যে তোমাকে সাহায্য করবে সে প্রভুরই সেবা করবে।"

সম্ভবত এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বামীজী শ্রীমতী বুলকে লিখেছিলেন ঃ "আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি এ বছর আপনার সবটুকু সাহায্য গ্রীনএকারের কাজের জন্য কুমারী ফার্মারকেই দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষ অপেক্ষা করতে পারবে যেমন সে করে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। যে কাজ হাতের কাছে রয়েছে তারই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।"

১৮৯৪-এর শীতে স্বামীজী নিউ ইয়র্কে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন, সারা প্রতিটি বক্তৃতা শুনেছিলেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবস্থাপনায়ও সাহায্য করেছিলেন। গ্রীনএকারের সুনাম সহজেই ছড়িয়ে পড়েছিল। সমসাময়িক বিখ্যাত পণ্ডিত, ধর্মনেতা, সুরশিল্পী—বহুপ্রয়াসে যাঁদের শ্রোতা হবার সৌভাগ্য মেলে এমন বহু বিশিষ্ট মানুষ যেমন

সানন্দে যোগ দিলেন গ্রীনএকার শিবিরে তেমনই অন্যদিকে সেখানে ভিড় জমালেন বিচিত্র স্বভাবের অদ্ভুত কিছু মানুষ যাঁদের কেউ শুষ্ক জ্ঞানচর্চায় মেতে থাকতে চান, কেউ বা ঝাড়-ফুঁক করে রোগ সারাতে আগ্রহী ; ডাইনী বিদ্যার মতো বাজে ভুতুড়ে ব্যাপারে কারও বা অতিশয় আকর্ষণ। এই পাঁচমিশেলী সমাবেশে প্রকৃত-তত্ত্বান্বেষণে একনিষ্ঠতা ও তদনুযায়ী জীবনগঠনের সুযোগ স্বভাবতই ব্যাহত হয়।

পরের গ্রীষ্মে অর্থাৎ ১৮৯৫-এ স্বামীজী আর গ্রীনএকারে যাননি। সহস্রদ্বীপোদ্যানে তিনি যথার্থ আগ্রহী ও অধিকারী মুষ্টিমেয় নারী ও পুরুষকে চরিত্র গঠন ও আধ্যাত্মিক অনুভবের উপযোগী বেদান্ত শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হলেন কারণ তিনি বুঝেছিলেন এঁরাই ভবিষ্যতে সত্যধর্মের দীপটি জ্বালিয়ে রাখবেন।

১৮৯৬, গ্রীষ্মে অবশ্য স্বামীজী স্বামী সারদানন্দকে বেদান্ত শিক্ষা দেবার জন্য গ্রীনএকারে পাঠিয়েছিলেন। স্বামী সারদানন্দের পরে সেখানে গিয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। কাজেই বেদান্তের সঙ্গে গ্রীনএকারের সম্বন্ধ নিতান্ত অচিরস্থায়ী ছিল না।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে সারা বাহাই ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯১২-র পরে গ্রীনএকার বাহাইদের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং বর্তমানেও এটি বাহাই কেন্দ্ররূপেই পরিচিত। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে সারা দেহত্যাগ করেন।

স্বামীজীকে সাবা কখনও ভোলেননি। ১৯০২-এ স্বামীজীর মর্তত্নু-ত্যাগের খবর পেয়ে স্বামীজীর পাইন গাছে তিনি একটি স্মৃতিফলক লাগিয়ে দেন। গ্রীনএকার বাহাই কেন্দ্র হবার পরেও সেই ফলক অক্ষুণ্ণ ছিল। নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি আয়োজিত স্মবণসভায় স্বামীজীর পুণ্যস্মৃতিচারণের মাধ্যমে স্বামীজীর প্রতি তাঁর ও গ্রীনএকারের ঋণস্বীকার করে সারা এক মর্মস্পর্শী শোকলিপি পাঠিয়েছিলেন ঃ

> "To know Vivekananda was a renewed consecration ; to have him under one's roof was to feel empowered to go forth to the children of men and to help them all to a realization of their birthright as sons of God. What Greenacre owes to him cannot be put into words. A little band of people had started to prove the providing care of God for those who rely upon Him in utter faith and love. This great soul came into our midst and did more than any other to give to the work its true tone, for he lived every day the truths which his lips proclaimed, and it was to us the living evidence of the power manifested nineteen hundred years ago as he went about his Father's business in perfect joyousness and childlike trust...all promises fulfilled, all needs met. ..."

"বিবেকানন্দকে জানার অর্থ ঈশ্বরের পাদপদ্মে নিজেকে নতুন করে নিবেদন করে দেওয়া ; তাঁকে স্বগৃহে স্থান দেওয়ার অর্থ মানবসেবাব্রতে নবপ্রেরণা লাভ করা এবং প্রত্যেক মানুষই যে ঈশ্বরের সন্তান, প্রত্যেকেরই যে তাঁকে জানার জন্মগত অধিকার আছে সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠা। গ্রীনএকার যে তাঁর কাছে কতটা ঋণী তা ভাষায় প্রকাশের নয়। সরল, ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষের দলটি আজ প্রমাণ করতে চলেছে যে প্রভুর ওপর যারা সর্বতোভাবে নির্ভরশীল তিনি তাদের ভার গ্রহণ করেন। সেই দিব্যপুরুষ বিবেকানন্দ আমাদের সঙ্গে একত্রে বাস করেছিলেন আর আমাদের এই প্রচেষ্টাকে প্রকৃত লক্ষ্যের অভিমুখী করে দিতে তাঁর অবদানই ছিল সকলের চেয়ে অধিক। তার কারণ, যে সত্য তিনি প্রচার করতেন, নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে দেখাতেন। আজ থেকে উনিশ শ' বছর আগে 'পিতার কার্য' সানন্দে শিশুর মতো সারল্য নিয়ে যিনি সম্পন্ন করে গেছেন, আমাদের দৃষ্টিতে সেই ঈশ্বরপুত্র যীশুর শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ স্বামী বিবেকানন্দ।"

সারা স্বামীজীর শিষ্যা ছিলেন না। নিজেকে বৈদান্তিক বলেও কখনও দাবি করেননি তিনি। স্বামীজী তাঁর কাছে ছিলেন এক শুভার্থী ভ্রাতা ও মহান সহকর্মী যাঁর কাছ থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাসহ পরিপূর্ণ মুক্তির আদর্শে পথ চলবার। জীবনের শেষ পর্যায়ে সারা প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। ঐসময় একদিন তাঁর মনে হল তিনি যেন সম্পূর্ণ সুস্থ—শরীর আগের মতই সতেজ। মনে পড়ল স্বামীজীকে আর সেই ভাবগম্ভীর 'সন্ন্যাসীর গীতি'-র লাইনগুলি। কবিতাটি সারার কাছে পরম প্রেরণাপ্রদ, পার্থিব মালিন্যের অগম্য ধামে জ্ঞান, সত্য ও শান্তির আনন্দ-ত্রিবেণীর সঙ্গমে উৎসারিত মানবাত্মার মুক্তি সঙ্গীত—

Wake up the note ! The song that had its birth
Far off, where worldly taint could never reach ;
In mountain caves, and glades of forest deep,
Whose calm no sigh for lust or wealth or fame
Could ever dare to break ; where rolled the stream
Of knowledge, truth and bliss...

‘ধীরামাতা’ ও ‘জো’

সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে বিগত সালের সেপ্টেম্বরে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বৎসরাধিককাল দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন উৎসব ও আলোচনা সভায় নূতন নূতন আলোকে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা চলছে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যগমনের উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য। বস্তুত তদানীন্তন ভারতীয় সমাজে সমুদ্র অলঙ্ঘনের প্রচলিত নীতিকে অতিক্রম করে শিকাগোর অভিমুখে তাঁর সেদিনকার অভিযাত্রার পিছনে হয়তো অনেক কারণই ছিল, তবে সম্ভবত তাঁর হৃদয়ের সর্বপ্রধান প্রেরণা ছিল গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মহান বার্তাকে পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

মূল উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর সভায় কয়েকটি ভাষণদান সমাপ্ত করেই স্বদেশে ফিরে আসেননি, তিন বছরেরও অধিককাল আমেরিকা ও ইংলণ্ডে থেকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মহান বার্তা দিকে দিকে প্রচার করেছেন এবং সেই কাজে তাঁর সহায়করূপে পেয়েছেন বেশ কয়েকজন উদার, পবিত্র ও নিঃস্বার্থকর্মীকে, বিশেষ করে আমেরিকান নারীকে। আমরা এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে এমনি দুজন মহীয়সী বিদেশিনী নারীর প্রসঙ্গে আলোচনা করব যাঁরা স্বামীজীর আদর্শ ও ব্রত উদ্‌যাপনের অন্যতম সহায়রূপে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন স্বামীজীর মাতৃস্বরূপা শ্রীমতী সারা চ্যাপম্যান বুল, যাঁকে তিনি ধীরামাতা বা শুধু ‘মা’ বলে সম্বোধন করতেন এবং নানা ব্যাপারে যাঁর উপর একান্তভাবে নির্ভর করতেন। অন্যজন হলেন শ্রীমতী জোসেফিন ম্যাকলাউড, যাঁকে স্বামীজী দিয়েছিলেন বন্ধুত্বের মর্যাদা এবং তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন পদে পদে সহায়তা, শক্তি ও সান্ত্বনা। তাই স্বামীজীর শিকাগো ভাষণের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে গিয়ে আজকের দিনে এঁদের প্রতি ঋণস্বীকার না করলে আমাদের বিবেকানন্দ সমীক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একই আদর্শ ও একই উদ্দেশ্যের অভিমুখে জীবনপথে চলতে চলতে এই দুই নারী আবার পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন ; তাই এঁদের দুজনের সম্পর্কে একযোগে আলোচনার একটা স্বতন্ত্র তাৎপর্যও আছে।

শ্রীমতী বুলের পূর্বনাম ছিল সারা চ্যাপম্যান থর্প। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৪৮ সালে

এবং তাঁর শৈশবকাল কেটেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে ম্যাডিসন শহরে। তাঁর পিতা জোসেফ জি. থর্প ছিলেন সেখানকার একজন ধনী আমেরিকান ব্যবসায়ী এবং স্টেট সেনেটর। ১৮৭০ সালে সারা একদা-বিবাহিত ও তাঁর চাইতে চল্লিশ বছরের বড় পৃথিবী-বিখ্যাত নরওয়েজিয়ান বেহালাবাদক ও জাতীয়তাবাদী নেতা ওলি বুলকে বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্বেই তিনি সমগ্র ইউরোপ পরিভ্রমণ করে নিজের রুচিকে করেছিলেন পরিশীলিত। সঙ্গীতের সঙ্গে তিনি ভালবেসেছিলেন সুবিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ওলি বুলকে। স্বামীর সঙ্গে বয়স ও অন্যান্য নানা বিষয়ে দুস্তর ব্যবধান থাকলেও শ্রীমতী বুল নিজেকে ওলি বুলের যোগ্য পত্নীরূপেই তৈরি করে নিয়েছিলেন। বিবাহের অল্পকাল পরে সারাকেই তাঁর বাস্তববোধহীন বয়স্ক স্বামীর যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনার ভার গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং তাঁর কনসার্ট-ট্যুরগুলি কার্যত তিনিই পরিচালনা করতেন। কিন্তু তাঁর বিবাহিত জীবন দশ বৎসরের বেশি স্থায়ী হয়নি ; স্বামীর মৃত্যুর পর বস্টনের অদূরে কেমব্রিজ শহরে এসে তিনি তাঁর নয় বৎসরের কন্যা ওলিয়াকে নিয়ে ব্রাট্‌ল স্ট্রীটে একটি স্বতন্ত্র বাড়িতে বাস করতে থাকেন। কিন্তু নিছক একজন গৃহস্থের মতো বৈচিত্র্যহীন, অর্থহীন ও অলক্ষিত জীবন তিনি যাপন করেননি। তাঁর ছিল এক দুর্দম কর্মোদ্যম, গভীর মনস্বিতা ও এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, যার ফলে তাঁর গৃহটি বুদ্ধিজীবী, গুণী ও আদর্শবাদী মানুষদের একটি চমৎকার মিলনকেন্দ্র হয়ে ওঠে। শালীন, সংযত ও কিছুটা বিষণ্ণ—শ্রীমতী বুল স্বীয় প্রতিভাগুণে অভিজাত সমাবেশের মধ্যমণি হয়ে উঠেছিলেন।

১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত ভাষণের পর আমেরিকার নানা প্রান্তে তাঁর বক্তৃতাসফরের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমাজে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই তরঙ্গের অভিঘাত নিশ্চয়ই অচিরে শ্রীমতী বুলকেও স্পর্শ করে। তবে ঠিক কবে তিনি স্বামীজীর প্রথম দর্শন পেয়েছিলেন বা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তা আজ সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। হয়তো ১৮৯৪ সালে এপ্রিল-মে মাসে নিউ ইয়র্কে কিংবা বস্টনে তাঁদের পরস্পরের সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটে থাকতে পারে। তবে ঐ বছর জুলাই মাসে মিস ফার্মারের আমন্ত্রণে মিসেস বুল গ্রীনএকার ধর্মসম্মেলনে তিন সপ্তাহ ছিলেন। সেখানেই স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় হয় এবং তিনি স্বামীজীর বেদান্ত ক্লাসগুলির আগ্রহী শ্রোতা হয়ে উঠেছিলেন। ঐ বছরেই সারা বুলের আমন্ত্রণে ২ অক্টোবর তিনি কেমব্রিজে আসেন ও সারার আতিথ্যগ্রহণ করেন। এই গৃহে বাসকালেই তিনি আমেরিকার বিদগ্ধ সমাজের এক প্রধান অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালের মার্চ মাসে তিনি পুনরায় মিসেস বুলের গৃহে আসেন এবং সেখানেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে একটি বক্তৃতা দেন। সারা বুলের আন্তরিকতা, বিপুল অভিজ্ঞতা ও বহুল পরিচিতি তাঁকে অতঃপর স্বামীজীর আমেরিকার কাজের অন্যতম প্রধান সহায়িকা করে তুলেছিল। আমেরিকায় স্বামীজীর ধর্মপ্রচারের বিরাট সাফল্য সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে তিনি ছিলেন আমেরিকান সমাজ ও তার রীতিনীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং প্রায়ই তাঁকে মিশনারিদের আক্রমণ ও একশ্রেণীর ঈর্ষাপরায়ণ মানুষের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ধীরামাতা সর্বদা চেষ্টা করেছেন তাঁর 'পবিত্র শিশুটি'কে মাতৃস্নেহে এই সকল ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে আড়াল করে রাখতে, আবার কখনও

চেয়েছেন ক্ষণে ক্ষণে অগ্নিময় এই সন্ন্যাসীকে কিছুটা সংযত করে লোকজীবনের পক্ষে স্নিগ্ধকররূপে উপস্থিত করতে। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে এবং তাঁর কাজে অকাতরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য ধীরামাতার প্রতি স্বামীজী অশেষ কৃতজ্ঞতাবোধ করেছেন কিন্তু এই শুভার্থিনী মানুষটির পরামর্শ মানতে গিয়ে যখনই তাঁকে সত্যের সঙ্গে উৎকট রকমের আপসের মুখোমুখি হতে হয়েছে তখনই তিনি ঝলসে উঠেছেন। তবে এই সকল সংঘাত সত্ত্বেও স্বামীজী তাঁর ধীরামাতার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। ১৮৯৯ সালের ৩ আগস্ট ভগিনী নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেনঃ সেন্ট সারাকে বল, স্বামীজী তাঁর বিষয়ে বললেনঃ "ঐ মহিলাকে বোধহয় আমি নিজের মায়ের চেয়েও ভালবাসি। ওঁর কেশাগ্রের জন্য আমি শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত--উনি এতই ভাল আর সাহসী।" পুনশ্চ ১৯০০ সালের ৬ জুন নিবেদিতা আবার লিখেছিলেনঃ স্বামীজী জানাচ্ছেন 'তাঁর মতে মিসেস বুল সর্বোচ্চ ধরনের মহিলা।' ১৮৯৯-এর ২৭ ডিসেম্বর স্বামীজী কৃস্টিন গ্রীনস্টাইডেলকে লিখেছিলেনঃ "তিনি (মিসেস বুল) একজন মহীয়সী মহিলা, এমনই মহীয়সী যাঁকে দেখা তীর্থদর্শনের সমতুল্য।" শ্রীমতী বুলের প্রসঙ্গে আরও কিছু আলোচনা করার আগে আমরা একবার মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের বিষয়ে প্রাথমিক আলোকপাত করতে চেষ্টা করব।

জোসেফিন ম্যাকলাউড জন্মগতভাবে আমেরিকান হলেও তাঁর পিতৃপুরুষ ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। অন্যান্য অনেক ইংরেজ, স্কচ ও আইরিশদের মতো তাঁর পিতামহও ভাগ্যান্বেষণে আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। জোসেফিনের পিতা জন ডেভিড ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে আলাবামার মেরী অ্যান লোন নামে এক মহিলাকে বিবাহ করে সেখানে বাস করতে থাকেন। জন ও মেরীর তিন কন্যা ও দুই পুত্র জন্মেছিল এবং জোসেফিন ছিলেন কন্যাদের মধ্যে কনিষ্ঠা। ইলিনয়েস-এর এলগিন শহরে ১৮৫৮ সালে তাঁর জন্ম হয় এবং তাঁর বাল্যজীবনের অধিকাংশ দিনগুলি কাটে ডেট্রয়েট ও শিকাগো শহরে। ১৮৭০ সালে মাত্র বার বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হলেন এবং দুবছর পরে মাতৃসমা জ্যেষ্ঠা ভগিনী মার্থাকেও হারালেন। তখন জোসেফিন ও তাঁর মধ্যম ভগিনী বেসিকে তাঁদের এক কাকিমার কাছে ব্রুকলিনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ১৮৯০ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়; জোসেফিন তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে যখন তাঁকে বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থপাঠ করে শোনাতেন তখন একদিন তিনি বলেছিলেনঃ 'আমি যত উপদেশবাণী শুনেছি তার মধ্যে এগুলি হল মহত্তম।'

জোসেফিনের বয়স যখন ত্রিশের কোঠার প্রথম দিকে তখন তাঁর অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে বিশেষত ভারতীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে রীতিমত আগ্রহের সঞ্চার হয়। এই সময়েই ডোরা রোথলেস বার্জার নামে একজন অধ্যাত্মপিপাসু মহিলার সঙ্গে ১৮৯৫ সালের ২৯ জানুয়ারি দুই ভগিনী বেসি ও জোসেফিন স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মালোচনার একটি ক্লাস শুনতে যান। এই শুভলগ্নটি ভগিনীদ্বয়ের বিশেষ করে জোসেফিনের জীবনে নবজন্মের সূচনা করেছিল। বাস্তবিকই মিস ম্যাকলাউড স্বামীজীর সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাতের দিনটি থেকেই পরবর্তী কালে তাঁর বয়স গণনা করতেন। সেদিনের সেই বক্তৃতাটি শোনার পর থেকে জীবন তাঁর কাছে অন্য এক গুরুত্ব নিয়ে আবির্ভূত হল। তিনি উপলব্ধি করলেন

যে তিনি যেন চিরন্তনের রাজ্যে বিরাজ করছেন। তখন থেকে ভগিনীদ্বয় তাঁদের ডব্‌স্ মেরী গ্রামের গৃহ থেকে প্রত্যহ ত্রিশ মাইল দূরবর্তী নিউ ইয়র্কে এসে বিবেকানন্দের বক্তৃতার ক্লাসগুলিতে হাজির হতে লাগলেন। একদিন স্বামীজী যখন ভগবদ্গীতা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন তখন জোসেফিন স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যেন সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেই গীতা প্রচার করছেন এবং বাকি সবকিছু তাঁর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভগিনীদ্বয় এরপর বহুদিন ধরে স্বামীজীর সঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয় না করে ক্লাসগুলি শুনে যেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা অবিলম্বে স্বামীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। একদিন তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা দুজনে বোন কিনা। পরে যখন শুনলেন যে ত্রিশ মাইল দূর থেকে তাঁরা নিয়মিতভাবে তাঁর ক্লাসে উপস্থিত হচ্ছেন তখন তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হন। পরিচয়ের পর স্বামীজী একদিন মিস ম্যাকলাউডকে বলেছিলেনঃ "সর্বদা মনে রেখ ঘটনাক্রমে তুমি একজন আমেরিকান ও একজন নারী কিন্তু তুমি সর্বসময় ঈশ্বরের সন্তান। তুমি যে কে তা নিজেকে দিনরাত বলতে থাক। একথা কখনও ভুলে যেও না।" আর একদিন স্বামীজী জোসেফিন ও ডোরাকে 'ওম্' শব্দটির উপর ধ্যান করতে শিখিয়ে দিলেন এবং এক সপ্তাহ সেটি করতে বললেন। এক সপ্তাহ পরে ডোরা বললেনঃ 'আমি একটি আলোক দেখছি।' কিন্তু জোসেফিন বললেনঃ 'না, এটি হৃদয়মধ্যে অনেকটা জ্যোতির মত।' স্বামীজী উভয়কে বললেনঃ 'উত্তম, অভ্যাস ছেড়ো না।' স্বামীজী জোসেফিনকে সম্ভবত একটি মন্ত্রও দিয়েছিলেন কাবণ পরে একবার তিনি তাঁর কাছে গিয়ে অনুযোগ করেছিলেনঃ 'স্বামীজী, আমি এটা করতে পারছি না।' তাঁকে অভয় দিয়ে স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'বেশ, দুর্ভাবনা ক'রো না।' অনেক বছর পরে তিনি শুনতে পেতেন মন্ত্রটি তাঁর ভিতর থেকে আপনিই ধ্বনিত হচ্ছে এবং তখন তিনি অনায়াসে সেটি জপ কবতে পারতেন।

ভগিনীদ্বয়ের সঙ্গে একদিন বেসির অন্তরঙ্গ বন্ধু ফ্রাঙ্ক লেগেট স্বামীজীর ক্লাস শুনতে গেলেন। সান্ধ্য বক্তৃতার শেষে মিঃ লেগেট স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করতে আগ্রহী হন। তিনি স্বামীজীকে এক সন্ধ্যায় তাঁর গৃহে নৈশাহার করতে আমন্ত্রণ জানালেন। স্বামীজী সানন্দে তাতে স্বীকৃত হলেন। এভাবেই ধীরে ধীরে এই পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মাল এবং স্বামীজীর কাছে জোসেফিন হয়ে উঠলেন 'জো জো' কিংবা শুধু 'জো'। এরপর দীর্ঘ সাত বছর তিনি স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ায় পর্যটন করেছেন এবং তাঁকে নিবিড়ভাবে জেনেছেন। স্বামীজীও এই মহীয়সী নারীর উদারতা ও অন্তরের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। একবাব তিনি মহাকবি কালিদাসের বিশ্বকর্মা-কর্তৃক উমাকে সৃষ্টির বর্ণনা উদ্ধৃত করার পরে জো-কে লিখেছিলেনঃ "সেই সৃষ্টি হলে তুমি জো জো, শুধু আমি যোগ করব যে, স্রষ্টা সকল পবিত্রতা, মহত্ত্ব ও অন্যান্য গুণাবলীর সন্নিবেশ করে কাজটি করেছিলেন এবং তারপর জো-ব সৃষ্টি হয়েছিল।" উদারচরিত্র ফ্রাঙ্ক লেগেটের আমন্ত্রণে স্বামীজী শুধু তাঁদের নিউ ইয়র্কের বাড়িতেই যাননি, গিয়ে একাধিকবার থেকেছিলেন তাঁদের ক্যাটস্কিল পর্বতাঞ্চলের গ্রামীণ বাড়ি 'রিজলি ম্যানরে' এবং পার্সি ও প্যারিসের বাড়িগুলিতে। মিঃ লেগেটের অনুরোধে ১৮৯৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর প্যারিসে মিঃ লেগেট ও মিসেস বেসি স্টার্জিসের বিবাহ-অনুষ্ঠানে স্বামীজী একজন সাক্ষিরূপে উপস্থিত

হয়েছিলেন। এছাড়াও ইংলণ্ডে, লস এঞ্জেলসে, ব্রিটানীতে, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, স্কুটারি, কায়রো প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণকালে এবং ভারতবর্ষে দুবার মিস ম্যাকলাউড স্বামী বিবেকানন্দের দীর্ঘ সঙ্গ পেয়েছিলেন। এই নিবিড় পরিচয়ের ফলে স্বামীজী বুঝেছিলেন তাঁর প্রিয় জো 'সোনার মতো খাঁটি।' ১৮৯৬ সালের ৬ জুলাই স্বামীজী মিঃ লেগেটকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "আমি জো-র বুদ্ধিমত্তা ও নীরব কার্যপ্রণালীর প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। তিনি একজন মহিলা রাজনীতিবিদ, একটা রাজ্য চালাতে পারেন। মানুষের ভেতর এমন তীক্ষ্ণ অথচ কল্যাণকর সহজ বুদ্ধি খুব অল্পই দেখেছি।"

প্রায় সাড়ে তিন বৎসর আমেরিকা ও ইউরোপে ধর্মপ্রচার করে স্বামীজী ১৮৯৭ সালের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। তখন জোসেফিনের মন ব্যাকুল হল ভারতে এসে স্বামীজীর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হওয়ার এবং গভীর আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ এই মহান দেশকে দেখার জন্য। আসার আগে তিনি স্বামীজীর অনুমতি চেয়ে পত্র লিখলেন। উত্তরে স্বামীজী তাঁকে আসতে লিখলেন, তবে ভারতীয় পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ব থেকে কিছুটা সতর্ক করেছিলেন যাতে এখানে এসে তাঁকে আশাভঙ্গ হয়ে ফিরে যেতে না হয়। ঐ চিঠিতেই তিনি তাঁকে কথা দিলেন যে, ভারতে আসার পর তিনি জো-র সঙ্গে বহু জায়গায় ভ্রমণ করবেন এবং তাঁর ভ্রমণকে সুখপ্রদ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। এরপর স্বামীজী যখন জানতে পারলেন যে মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে মিসেস বুলও ভারতে আসাব প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন তাঁকেও এক চিঠিতে অনুরূপভাবে সতর্ক করে দিয়ে স্বাগত জানালেন।

অবশেষে এই দুই আমেবিকান মহিলা স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে ১৮৯৮ সালের ১২ জানুয়ারি আমেরিকা থেকে ভাবতের উদ্দেশে সমুদ্রপথে যাত্রা করলেন। তখন মিসেস বুলের বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ এবং জোসেফিনের চল্লিশ। স্বামীজী তাঁর আমেরিকায় অনুপস্থিতিকালে সেখানকার বেদান্তপ্রচার কার্যের মূল দায়িত্ব অর্পণ করে এসেছিলেন মিসেস বুলকে কাবণ স্বামীজীর মতে তিনিই ছিলেন এই কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। আর স্বামীজীর প্রতি একান্ত বিশ্বস্ত জো-ও তাঁর সকল কর্মযজ্ঞে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, ফলে এই সকল কর্মসূত্রেই এই দুই নারীর পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল এবং ঘনিষ্ঠতাও জন্মেছিল। উভয়ে উভয়ের গৃহে আতিথ্যও গ্রহণ করেছেন। যাত্রার মাসাধিক কাল পরে বম্বে হয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রত্যুষে তাঁবা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছালে দ্বাদশ জন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী সেখানে তাঁদের স্বাগত জানালেন এবং ভক্তগণ প্রাণের আবেগে তাঁদের মালা দিয়ে প্রায় ঢেকে দিলেন। কলকাতায় এসে প্রথমে তাঁরা একটি হোটেলে উঠেছিলেন। স্বামীজী তখন থাকতেন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে— অস্থায়ী মঠে। দু-একদিনের মধ্যেই তাঁরা বেলুডে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন এবং মঠের নূতন বায়না করা নিকটবর্তী জমিতে গঙ্গাতীরে একটি ভগ্নগৃহ দেখতে পেয়ে সেটিকে তাঁদের বসবাসের উপযুক্ত করে সারিয়ে নিতে মনস্থ করলেন। তদনুযায়ী অচিরেই বাড়িটিকে মোটামুটি বাসযোগ্য কবে নিয়ে তাঁরা হোটেল ছেড়ে বেলুড়ে চলে আসেন। অল্প কিছু দিন আগে ২৮ জানুয়ারি মার্গারেট নোবল ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় এসেছেন স্বামীজীর কাজে জীবন উৎসর্গ করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। তিনিও শীঘ্রই এসে

ঐগৃহে তাঁদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। স্বামীজী সেই গৃহে প্রত্যহ দুবেলা সঙ্গী-সহ কিংবা একাকী এসে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে যেতেন ও তাঁদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

স্বামীজী জো, ধীরামাতা ও নিবেদিতাকে ৭ মার্চ বাগবাজারে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে নিয়ে গেলেন। সারদাদেবী স্বামীজীর এই বিদেশিনী শিষ্যাদের আন্তরিক স্নেহে 'আমার মেয়েরা' বলে কাছে টেনে নিলেন এবং জো-র অনুরোধে তাঁদের সঙ্গে খেলেন। শ্রীমা এই বিদেশিনীদের এত সহজ ও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করাতে স্বামীজীরও আনন্দের সীমা রইল না। এরপর ২৫ মার্চ নিকটস্থ মঠের ঠাকুরঘরে স্বামীজী নিবেদিতাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন। বেলুড়ের অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে এই বিদেশিনীগণ সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছেন দেখে স্বামীজী বিশেষ আনন্দিত হলেন। ১১ মার্চ তিনি ভগিনী কৃস্টিনকে তাঁদের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন ঃ "অকিঞ্চিৎকর ভোগোপকরণ ও ক্লেশকর ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে এঁরা যে এত সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছেন এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার। সত্যি এই ইয়াংকিগণেব অসাধ্য কিছুই নেই। বস্টন ও নিউ ইয়র্কের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার পর এই নগণ্য ক্ষুদ্র কুটীরে কেমন সুন্দর পরিতৃপ্তিতে ও সুখে আছেন।"

কিছুকাল পরে স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্যদেশীয় ভক্তবৃন্দকে নিয়ে উত্তর ভারতে, বিশেষত কাশ্মীবভ্রমণে যাওয়া স্থিব করলেন এবং তদনুযায়ী ১১ মে কলকাতা থেকে আলমোড়ার উদ্দেশে রওনা হলেন; তাঁদের নিয়ে দীর্ঘ পাঁচ মাস তিনি উত্তর প্রদেশ ও কাশ্মীরের নানা স্থান ভ্রমণ করলেন এবং নানা উপদেশ, নির্দেশ ও গল্প উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে তাঁদের অধ্যাত্মজীবনগঠনে প্রয়াসী হলেন। কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী মন্দির দ্বিতীয়বার দর্শন করে শ্রীনগরে ফিরে এসে স্বামীজী তাঁদের মাথায় ফুলের মালা স্পর্শ করিয়ে বলেছিলেন ঃ 'আমি তোমাদের মায়ের কাছে সমর্পণ করেছি।' অবশেযে ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে সকলকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী লাহোর হয়ে পরে শারীরিক অসুস্থতার জন্য বেলুড় মঠে ফিরে আসেন। লাহোর থেকে পাশ্চাত্য মহিলারা স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে কুরুক্ষেত্র, দিল্লী, আগ্রা, বারাণসী প্রভৃতি স্থান দর্শন করে নভেম্বরের মাঝামাঝি কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। এবার সারা বুল বেলুড়ের অনতিদূরে বালীতে একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন। স্বামীজী মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেন এবং কখনও কখনও তাঁরাও মঠে আসতেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে। আমরা অনুমান করতে পারি ৯ ডিসেম্বর নূতন মঠের উদ্বোধন উৎসবেও এই দুই বিদেশিনী নারী উপস্থিত থেকেছিলেন। একথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সারা বুলের মুক্ত হস্তে অর্থদানের (পনেরো হাজার ডলার) ফলেই বেলুড়ের তদানীন্তন মঠ বাড়ি ও সন্ন্যাসীদের আবাসগৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল।

জোসেফিনের নিজস্ব অর্থসংস্থান ছিল না, অনেক বৎসরের চেষ্টায় তিনি আটশত ডলার সঞ্চয় করেছিলেন এবং আমেরিকায় ফিরে যাবার আগে সেই অর্থের সবটুকুই তিনি স্বামীজীকে দেন। ঐ মহৎ হৃদয়ের দানটুকু গ্রহণ করে স্বামীজী সেটি তখনই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের হাতে তুলে দিলেন একটি প্রেস কেনার জন্য। সেই অর্থ দিয়ে প্রেস কেনা হল এবং রামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হল যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত ধারায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

১৯ ডিসেম্বর হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য স্বামীজী দেওঘরে চলে যেতে বাধ্য হন।

তাঁর অনুপস্থিতিকালে এই দুই নারী কিছুদিন বাগবাজারে নিবেদিতার গৃহে বাস করেছিলেন। ঐকালে তাঁরা একাধিকবার সারদাদেবীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে এক অপূর্ব ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সময়েই কোনও একদিন সারার সনির্বন্ধ অনুরোধে শ্রীমা নিজের ফটো তুলতে দিয়েছিলেন। ঐ সময়ে তোলা তিনটি ফটোর মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় ফটোখানিই আজ সর্বত্র পূজিত হচ্ছে। সারা ও জো-র প্রতি শ্রীমার ভালবাসার কথা উল্লেখ করে নিবেদিতা ৪।২।১৮৯৯ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেনঃ "শ্রীমা বললেন, ধ্যানের সময় তিনি সর্বদা সারাকে তাঁর বামে এবং জয়াকে (জো) সামনে দেখছেন।"

ধীরামাতার সহৃদয়তায় মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ বিবেকানন্দ ২৯ ডিসেম্বর দেওঘর থেকে তাঁকে লিখেছিলেনঃ "এযাবৎ আমি আপনাকে কেবল শ্রদ্ধাই করেছি, কিন্তু এখন ঘটনা পরম্পরায় মনে হচ্ছে যে, মহামায়া আপনাকে আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য নিযুক্ত করেছেন, সুতরাং এখন শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রগাঢ় বিশ্বাস যুক্ত হয়েছে। এখন আমি আমার নিজের জীবন এবং কর্মপ্রণালী বিষয়ে মনে করব যে, আপনি মায়ের আজ্ঞাপ্রাপ্তা: সুতরাং সকল দায়িত্ববোধ নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে আপনাব ভেতর দিয়ে মহামায়া যে নির্দেশ দেবেন. তাই মেনে চলব।" এই সকল উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় স্বামীজী তাঁর ধীরামাতার উপর কতখানি নির্ভর করতেন। স্বামীজীর কলকাতায় ফিরে আসার আগেই এই দুই আমেরিকান নারী স্বদেশের অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। যাবার সময় স্বামীজীর সঙ্গে তাঁদের দেখা না হলেও কযেক মাস পরেই তাঁরা আবার মিলিত হন। ১৮৯৯ সালের ২০ জুন স্বামীজী নিবেদিতা ও তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে পাড়ি দিলেন। প্রথমে কয়েকদিন ইংলণ্ডে কাটিয়ে স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দ ২৮ আগস্ট নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হন এবং সেদিনই লেগেটদের 'রিজলি ম্যানরে' চলে যান। সেখানে মিস ম্যাকলাউড তো উপস্থিত ছিলেনই তাছাড়া অন্য অনেকের সাহচর্যে স্বামীজী ৭ নভেম্বর পর্যন্ত মহানন্দে কাটালেন। ছ'সপ্তাহ পবে ধীরামাতাও তাঁব কন্যাকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন কিন্তু তখন অবশ্য জো-কে তাঁর ভাইয়ের কঠিন পীড়ার সংবাদ পেয়ে লস এঞ্জেলসে চলে যেতে হয়েছিল। নিবেদিতাও তখন 'রিজলি ম্যানরে' অবস্থান করছেন। এসময়কার একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা ভগিনী নিবেদিতার ফরাসী জীবনীকার লিজেল রেমঁ উল্লেখ কবেছেন। তিনি লিখেছেনঃ '৫ নভেম্বর স্বামীজী মিসেস বুলের কোমরে একটি [গেরুয়া ?] সূতী-বস্ত্র জড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে আপনি একজন সন্ন্যাসিনী।' তারপর তিনি মিসেস বুল ও নিবেদিতার মাথায় হাত রেখে বললেনঃ "পরমহংসদেব আমায় যা দিয়েছিলেন তার সবকিছু তোমাদের দান করলাম। যা এক নারীর [জগন্মাতা] কাছ থেকে পেয়েছিলাম, আমি তা তোমাদের দুই নারীকেই অর্পণ করলাম।" এখানে বলা যেতে পারে যে মিসেস বুলকে সন্ন্যাসিনী বলে উল্লেখ করলেও স্বামীজী অবশ্যই তাঁকে কোনও আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস প্রদান করেননি।

'রিজলি ম্যানর' থেকে নিউ ইয়র্ক হয়ে স্বামীজী ডিসেম্বরের প্রথমে লস এঞ্জেলসে পৌঁছান। সেখানেও জো অনেক দিন তাঁর সঙ্গে এক গৃহে বাস করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁদের পরবর্তী দীর্ঘ সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯০০ সালের আগস্ট মাসে ও পরবর্তী সময়ে

প্রথমে প্যারিসে এবং পরে ব্রিটানীতে ও দক্ষিণপূর্ব ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে সফরকালে। তখন ব্রিটানী প্রদেশের অন্তর্গত সমুদ্রতীরে অবস্থিত পেরো-গীরেতে মিসেস বুল একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করছিলেন। আমন্ত্রিত হয়ে স্বামীজী সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে দুবার সেখানে গিয়েছিলেন এবং সাকুল্যে আঠারো দিন ছিলেন। জো ও নিবেদিতাও সেখানে স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ২৪ অক্টোবর স্বামীজী ম্যাডাম কালভে, মিস ম্যাকলাউড, জুল বোয়ার সঙ্গে অষ্ট্রিয়া, কনস্টান্টিনোপল, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তারপর কায়রোতে এসে হঠাৎই ভারতযাত্রা করতে মনস্থ করলেন এবং অবশেষে সেখান থেকে একাই রওনা হয়ে বেলুড় মঠে পৌঁছেছিলেন ৯ ডিসেম্বর।

এরপর আবার মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে ভারতে এসেছিলেন ১৯০২ সালে স্বামীজীর জীবনের প্রায় শেষ লগ্নে। সারা বুল এসেছিলেন নিবেদিতা ও রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে ফেব্রুয়ারিতে। এবার কলকাতায় এসে সারা উঠেছিলেন চৌরঙ্গীর একটি জমকালো বাড়িতে। তার আগেই ৬ জানুয়ারি জো জাপান হয়ে শিল্পী ওকাকুরা ও হোরির সঙ্গে কলকাতায় এসে পৌঁছান এবং আমেরিকান কনস্যুলেটে ওঠেন। ২৭ জানুয়ারি স্বামীজী জো, ওকাকুরা প্রমুখদের সঙ্গে বুদ্ধগয়া ভ্রমণে গেলেন। সেখানে এক সপ্তাহ থেকে বারাণসীতে গিয়ে অসুস্থতার জন্য সেখানেই থেকে যান। জো কিন্তু বারাণসী না গিয়ে বুদ্ধগয়া থেকে সোজা কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। কলকাতায় সারা এবার প্রথমে আলাদা গৃহে উঠলেও পরে আমেরিকান কনস্যুলেট ভবনে চলে আসেন এবং উক্ত ভবনেই মার্চের প্রথম দিকে মিসেস বুল একদিন ওকাকুরার অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিলেন। স্বামীজী ৮ মার্চের আগে কলকাতায় ফিরতে পারেননি, তবে মিসেস বুল ও নিবেদিতার আগমন সংবাদ পেয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি বারাণসী থেকে ধীরামাতাকে লিখেছিলেনঃ 'প্রিয় মাতা ও কন্যাকে আর একবার ভারতভূমিতে স্বাগত জানাচ্ছি।' স্বামীজী মঠে ফিরে আসার পর ১১ মার্চ সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব ও ১৬ মার্চ সাধারণ উৎসব হয়। এর অল্প কিছুদিন পরে জো ও ধীরামাতা আলাদাভাবে ভারত ছেড়ে চলে যান।

এপ্রিল মাসে জো তাঁর শেষ চিঠিতে স্বামীজীকে লিখেছিলেনঃ 'আমি আপনারই সঙ্গে সাঁতার দেব, নয়তো একসঙ্গে ডুবব।' কিন্তু সেই চিঠির উত্তর পাবার সৌভাগ্য তাঁর আর হয়নি কারণ ৪ জুলাই রাত্রির প্রথম যামে স্বামীজী মর্তলোক থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছিলেন। প্রয়াণের দুদিন আগে তিনি নিবেদিতাকে জো সম্পর্কে বলেছিলেনঃ 'সে পবিত্রতার মতোই পবিত্র, ভালবাসার মতোই ভালবাসাপূর্ণ।'

৫ জুলাই স্বামীজীর মরদেহ অন্ত্যেষ্টিকালে তিন বিদেশিনীর মধ্যে একমাত্র নিবেদিতাই উপস্থিত থেকে শোকবিহ্বল চিত্তে করুণ দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং স্মরণ করছিলেন তাঁর প্রিয় যুম (জো) ও সেন্ট সারার কথা। এমনি সময় চিতাগ্নি থেকে স্বামীজীর একখণ্ড ঈষৎ অগ্নিদগ্ধ বস্ত্র নিবেদিতার কোলের কাছে উড়ে এসে পড়ল। সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হল এটি যেন জোর নিকট স্বামীজীর শেষ আশীর্বাদ, তিনি তাই পরম যত্নে সেটি গ্রহণ করলেন এবং অবিলম্বে যুমকে পাঠিয়ে দিলেন। জো এটিকে সর্বদা সঙ্গে নিয়ে বেড়াতেন এবং পরম শ্রদ্ধায় মাঝে মাঝে তাঁর স্নেহভাজনদের শিরে সেটি স্পর্শ করাতেন।

স্বামীজীর প্রয়াণের পর মিসেস বুল ১৯০৩ সালে আর একবার মাত্র ভারতবর্ষে

এসেছিলেন কিন্তু ১৯১১ সালের ১৮ জানুয়ারি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগে পর্যন্ত স্বামীজীর অভিপ্রেত ও তাঁর প্রাণপ্রিয় ভারতবর্ষের মঙ্গলকর্মে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছিলেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেও আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারের জন্য এবং ভারতবর্ষে স্বামীজীর অভিপ্রেত নানা কাজে তিনি আর্থিক দিক থেকে ও অন্যভাবে প্রচুর সহায়তা করেছেন। বিশেষত নিবেদিতা ও কৃস্টিন পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ও তাঁদের উভয়ের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানসাধনার ব্যাপারে অকাতরে অর্থসাহায্য করেছেন, এমনকি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কৃত উইলেও সেই সাহায্যব্যবস্থা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই অকুণ্ঠ সহায়তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে বিবেকানন্দের মতো অসাধারণ প্রতিভাবান এবং একই সঙ্গে অত্যন্ত উচ্চমার্গের হিন্দু সন্ন্যাসীকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবধারায় লালিত মিসেস বুল সম্পূর্ণ বুঝতে পারেননি, বুঝতে পারা সম্ভব ছিল না। তাই পরস্পরের মধ্যে প্রীতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কখনও কখনও ভুল বোঝাবুঝি ও মানসিক সংঘাতও হয়েছে, আবার সেসব কেটেও গেছে। পাশ্চাত্যদেশে স্বামীজী কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেক সময় প্রচণ্ডভাবে খেটেছেন কারণ তিনি জানতেন তাঁর স্বল্প আয়ুষ্কালের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মহান ভাবধারাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু এই কর্মোদ্যম তাঁব স্বভাবগত নয়; তিনি চেয়েছিলেন শুকদেবের মতো সমাধিতে আত্মমগ্ন হয়ে থাকতে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণই স্বয়ং সেই নির্বিকল্প সমাধির ঘরে সাময়িকভাবে চাবি লাগিয়ে তাঁর ওপর বিরাট কাজের দায় অর্পণ করেছিলেন। তাঁর এই পরাশান্তির জন্য ব্যাকুলতার কথা স্বামীজী নানাপত্রে ধীরামাতার কাছেও প্রকাশ করেছেন। আবার কখনও কখনও কর্মের উদ্‌গীর্ণ ক্লেদে বিরক্ত হয়ে আত্মসমালোচনার সুরে বলেছেনঃ 'আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নেতৃত্ব ও যশের আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিতে হবে (১৭ জানুয়ারি ১৯০০)।' বিবেকানন্দের এই সকল সবিনয় আত্মসমালোচনাকে তাঁর যথার্থ স্খলন, কর্মস্পৃহা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলে ভুল করে ধীবামাতা অনেক সময় তাঁকে অসঙ্গতভাবে শোধরাতে সচেষ্ট হয়েছেন কারণ কর্মী বিবেকানন্দের চেয়ে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দই বুলের নিকট অধিকতর কাম্য ছিল। তিনি তাঁকে মাতা মেরীর কোলের সন্তানরূপে দেখতে ভালবাসতেন। এই ভুল বোঝাবুঝি এক সময়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছিল, যার কিছুটা আভাস পাই ১৯০০-এর ২৫ আগস্ট নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর চিঠিখানিতেঃ "আমি মিসেস বুলকে মঠ থেকে টাকা তুলে নেবার সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি ও বিষয়ে কিছু বললেন না।" স্বামীজীর বহুবাঞ্ছিত মহান উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রদত্ত অর্থ শ্রীমতী বুলের পক্ষে ফিরিয়ে নেবার প্রশ্ন অবশ্যই ছিল না। অচিরেই এই সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছিল; আমরা দেখেছি স্বামীজীর প্রয়াণের কয়েক মাস আগে ধীরামাতা বেলুড় মঠে এসে তাঁর প্রিয় সন্তানকে দেখে গেছেন এবং স্বামীজীও তাঁকে লেখা শেষ পত্রে (১৪ জুন ১৯০২) এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছিলেনঃ 'ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলে মায়ামুক্ত হোক, এই আমার চির প্রার্থনা।'

ঘটনাচক্রে মিসেস বুলের জীবন সুখের বা শান্তির হয়নি। অল্প বয়স থেকেই তাঁর স্বভাবে ছিল তীব্র ভাবপ্রবণতা, প্রচণ্ড জেদ ও কঠোর আদর্শবাদ। এজন্যই তাঁর অনেকের

সঙ্গে সংঘাতও বেধেছে, এমনকি বিবেকানন্দ ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গেও। নিবেদিতার মতেঃ "উনি বেশি মননপ্রধান, যাচাই করতে, যুক্তি-বিচার করতে অতিরিক্ত ব্যস্ত। ফলে কেবল সুসংগঠিত কিছু হয়ে ওঠেন—হাত বাড়িয়ে দিয়ে হৃদয়ের উত্তাপে ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটান না।" (১৯·৭·১৯০১-এর পত্র)। এ সকল চরিত্রগত কারণ ছাড়াও মিসেস বুলের মানসিক অশান্তির অন্যতম কারণ ছিল তাঁর হিস্টিরিয়াগ্রস্ত একমাত্র কন্যা ওলিয়া। ওলিয়া তাঁকে জীবনে শান্তি দেয়নি, বিশেষ করে তাঁর জীবনসায়াহ্নে। জীবনের শেষ লগ্নে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মিসেস বুল কিছুটা স্মৃতিভ্রংশ হয়ে পড়েছিলেন এবং এক অজানা আতঙ্কে জর্জরিত থাকতেন। তাঁর শেষ দিনগুলিতে নিবেদিতা শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থেকে তাঁর বিবেকানন্দ-চেতনাকে কিছুটা জাগ্রত কবে তুলতে পেরেছিলেন। ১৯১১-এর ১৮ জানুয়ারি প্রত্যুষে তিনি ইহধাম ছেড়ে চলে গেলেন ; নিবেদিতা অনুভব করলেন—তিনি চলে গেলেন সরাসরি স্বামীজীর দিব্যসান্নিধ্যে।

অন্যদিকে মিস ম্যাকলাউড যে স্বামীজীর কাছে কতখানি ছিলেন এবং স্বামীজীও তাঁর প্রিয় জো-ব অন্তরে কী গভীর ও বিস্তৃত স্থান অধিকার করেছিলেন সেকথা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্য, ভক্ত ও গুণগ্রাহীদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোনও না কোনও সময়ে তাঁকে ভুল বুঝেছেন, যার ফলে পরস্পরের মনান্তর ও সংঘাত ঘটেছে কিন্তু এদিক থেকে মিস ম্যাকলাউডই সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম। ১৯০১-এব ১৪ জুন স্বামীজী জো-কে লিখেছিলেনঃ "আমরা একসঙ্গে কাজ করব—- এ 'মায়েব' আদেশ, এতে ইতিমধ্যেই বহু লোকের কল্যাণ হয়েছে, আরও অনেক লোকের কল্যাণ সাধিত হবে ; তাই হোক।" স্বামীজীব এই উক্তি ভবিষ্যতে অমোঘ সত্যরূপে মূর্ত হয়েছিল—কাবণ জোসেফিন তাঁব দীর্ঘ একানব্বই বছরের জীবনে সারা বিশ্ব অবিরত পর্যটন করে কত মানুষের হৃদয়ে যে বিবেকানন্দের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা কবা দুঃসাধ্য। একদা তিনি বিবেকানন্দকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ 'স্বামীজী, কিরূপে আমি সবচেয়ে ভালভাবে আপনাকে সাহায্য কবতে পারি?' উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ 'ভারতবর্ষকে ভালবাস'। মিস ম্যাকলাউড বাস্তবিকই ভারতবর্ষকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন এবং ফিরে ফিবে এই ভারতেব মাটিতে এসে বাস করেছেন এবং ভারতবাসীকে অকাতরে সাহায্য করেছেন। একদা তিনি লিখেছিলেনঃ "আমাকে স্বাধীনতা দেবাব জন্য স্বামীজী এসেছিলেন এবং তা ছিল তাঁর জীবনব্রতের একটি অঙ্গ, তেমনি নিবেদিতাকে দিয়েছিলেন আত্মত্যাগ অথবা প্রিয় মিসেস সেভিয়ারকে একত্ব—আমার কোনও আত্মত্যাগ নেই। কিন্তু আমাব আছে স্বাধীনতা, ভাবত উন্নত হচ্ছে এই দেখার ও সে উদ্দেশ্যে সাহায্য করার স্বাধীনতা। এই আমাব কাজ এবং সেটিকে আমি কী না ভালবাসি।" স্বামী শ্রদ্ধানন্দ লিখেছেনঃ একদিন মিস ম্যাকলাউড অতিথিভবন থেকে মঠে আসতে আসতে দেখলেন স্বামীজীর মন্দিরে ঘন্টা বাজিয়ে পূজা হচ্ছে। তাই দেখে তিনি বললেনঃ 'আমার পূজার রীতি ওবকম নয়, আমাব পূজা হল যে কোনও উপায়ে ভারতবর্ষের সেবা।'

স্বামীজীর দেহান্তেব পববর্তী কালে ম্যাকলাউডের অজস্র বদান্যতার মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। জোসেফিন পৈত্রিক সূত্রে বিত্তশালিনী ছিলেন না এবং

নিজেও অর্থোপার্জনের জন্য কোনও জীবিকা গ্রহণ করেননি কিন্তু তাঁর দিদি বেসির উভয় স্বামীই ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং ম্যাকলাউডের অর্থ মূলত সেই সূত্রেই আসত। অবশ্য ১৯৩২ সালে দিদির মৃত্যুর পর তিনি তাঁর বেশ কিছু ধনসম্পদ, যাব মধ্যে ছিল নগদ পনের হাজার ডলার, স্ট্যাফোর্ড-অন-অ্যাভনের বাড়িটি (পূর্বে যে বাড়িটির মালিক ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক সেক্সপীয়রের কন্যা সুসন্না এবং যেটি হল্‌স্‌ক্রফট নামে পরিচিত ছিল) এবং মোটর গাড়িটি পেয়েছিলেন। তারপরই তাঁর অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হয়েছিল কিন্তু তার আগেই এক সহজাত প্রেরণাবশে যখন যেটুকু সামর্থ্য, তাই দিয়ে তিনি অক্লেশে মানুষকে সাহায্য করে গেছেন।

ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী কৃস্টিন স্বামীজীর জীবৎকালেই ভারতবর্ষে এসে গুরুর অভিপ্রেত ভারতীয় নারীদের শিক্ষার কাজে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের আর্থিক অবস্থা কোনদিনই বিশেষ ভাল ছিল না, তাই জোসেফিন প্রথম থেকেই এঁদেব অর্থ বা পোশাক পরিচ্ছদ দিয়ে বা অন্যভাবে সাহায্য করে এসেছেন। ১৯১৭ সালে তিনি বিজ্ঞানী বশী সেনকে তাঁব বিজ্ঞানসাধনার জন্য এক হাজাব ডলার দান করেছিলেন। ১৯২২ সালে বেসি লেগেট যে বেলুড মঠকে দশ হাজাব টাকা দান করেছিলেন তার পিছনেও জোসেফিনের প্রেরণা ছিল। স্বামীজী তাঁর কাজের জন্য সুস্থ সবল যুবকদের চাইতেন, তাই মঠের তরুণ সাধুদের দুধ যোগানের জন্য গরু কেনাব অর্থ 'জো' দিয়েছিলেন; তারপব যখন দেখা গেল সেই গরুগুলি যথেষ্ট দুধ দিচ্ছে না তখন আমেরিকা থেকে বেশ কিছু দুধেল জার্সি গরু আনাবার ব্যবস্থা করলেন। 'জো' দেখলেন, চৌকির অভাবে সাধুরা মাটিতে বিছানা করে শুচ্ছেন, তাতে তাঁদের অসুখ করবে মনে করে তিনি অনেকগুলি তক্তপোশ কিনে দিলেন। বেলুড় মঠের অতিথি ভবনটিও তাঁরই উদার দানের ফলে নির্মিত হয়েছিল এবং সেখানে তিনি জীবনের অনেকগুলি দিন কাটিয়েছিলেন। বেলুড় মঠে স্বামীজীর সমাধিমন্দিরের রিলিফ মূর্তিটি জো ও তাঁর দিদি বেসিব পবিকল্পনা ও অর্থসাহায্যে তৈরি ও স্থাপিত হয়। পবে শ্রীবামকৃষ্ণেব কোনও এক জন্মোৎসবকালে ম্যাকলাউড ঐ মন্দিবের চূড়ায় নয় ফুট উঁচু সোনার পাতে মোড়া ত্রিশূলটি স্থাপনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বেসির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে মঠে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন-অধ্যাপনাব জন্য জোসেফিন দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সাত বছর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব অনুমোদনে 'বিদ্যামন্দির' মহাবিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত কালে পুনরায় প্রথম কিস্তি হিসেবে দশ হাজাব টাকা দান করেছিলেন। মঠের সাধুদের ধ্রুপদ গান শিক্ষার জন্যও তিনি সানন্দে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়েছিলেন। এমনি আরও অনেক দানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় এবং সে দান শুধু ভারতবাসীব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে তিনি দেখেছেন সঙ্গত ও মহৎ কারণে অর্থাভাব সেখানেই তাঁর সাহায্যের হস্ত নির্দ্বিধায় প্রসাবিত করেছেন।

মানুষকে শুধু অর্থসাহায্য করেই জোসেফিন পরিতৃপ্ত থাকেননি, যখনই প্রয়োজন হয়েছে তিনি তাঁর সাধ্যমতো প্রভাব-প্রতিপত্তি, দেখা-সাক্ষাৎ ও লেখনীর মাধ্যমে মুশকিল আসান করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ১৯১০-এর দশকে বাংলার কয়েকজন নামী বিপ্লবী রামকৃষ্ণ সংঘে যোগ দেওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে এই সংস্থা ইংরেজ সরকারের কোপে

পড়ে। এমনকি বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলও ১৯১৬ সালের ১১ ডিসেম্বর তাঁর দরবারভাষণে রামকৃষ্ণ মিশনকে সন্ত্রাসবাদে প্রশ্রয়দানের দায়ে অভিযুক্ত করলে সংঘের বিপদ ঘনিয়ে আসে। এই দুঃসময়ে মিস ম্যাকলাউড স্বামী সারদানন্দকে নিয়ে লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করেন এবং উভয়ের কাছ থেকে মঠের কর্মধারা ও উদ্দেশ্য জেনে গভর্নর তাঁর পূর্বোক্ত কঠোর মন্তব্যগুলি তুলে নেন এবং ধীরে ধীরে সংঘের বিপদ অনেকটা কেটে যায়। ১৯২০-এর দশকে পুনরায় ব্রিটিশ সরকার মঠের বেশ কয়েকজন তরুণ সন্ন্যাসীকে গোয়েন্দাগিরির সন্দেহে কারারুদ্ধ করলে মিস ম্যাকলাউডই ইংরেজ গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। আর একবার ব্রিটিশ সরকার বেলুড় মঠের পাশে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের একটি ইয়ার্ড তৈরি করতে উদ্যোগী হয়, যার পরিণাম হত মঠের পক্ষে ভযাবহ। এবারও মিস ম্যাকলাউড বজ্রের মতো জ্বলে উঠে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁকে এই অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানালেন। শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হল। বাংলার সুষ্ঠু সেচ পরিকল্পনা ও ম্যালেরিয়া দূরীকরণেব জন্যও জোসেফিনের ভাবনার অন্ত ছিল না।

মিস ম্যাকলাউড আজীবন বিবেকানন্দকে হৃদয়ে বহন করেই এভাবে নিজেকে সর্বমানুষের মধ্যে বিস্তারিত করে দিয়েছিলেন। তাঁব বোনঝি তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেনঃ 'তিনি বিবেকানন্দের শিষ্যা ছিলেন না, ছিলেন বিবেকানন্দময়।' জোসেফিনের নিজের উক্তিতেঃ "আমি তাঁর শিষ্যা নই। গুরুরূপে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি না। তিনি ছিলেন আমার বন্ধু।...তোমরা জান কি, আমার দীর্ঘ জীবনের এত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কেন আমি উন্মত্তের মতো বিবেকানন্দের পিছনে, কেবল বিবেকানন্দেরই পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি? কারণ আজ পর্যন্ত কোনও উৎকৃষ্টতর মানুষকে আমি দেখিনি—যেদিনই কাউকে দেখব, কাউকে পাব, সেই মুহূর্তে আমি তাঁর ভক্ত হব এবং তোমাদের বিবেকানন্দকে ত্যাগ করব। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি কাউকেই পাইনি।" (স্বামী নির্লেপানন্দের স্মৃতিকথা)।

মিস ম্যাকলাউড যেমন আজীবন বিবেকানন্দকে অন্তরের অন্তস্তলে বহন করেছেন, তেমনি করেছেন বহিরঙ্গ জীবনচর্যার মধ্যেও। স্বামীজীর চিতাগ্নি থেকে উড়ে আসা আধ-পোড়া বস্ত্রখণ্ডখানি সঙ্গে নিয়ে ম্যাকলাউডের সর্বত্র ঘুরে বেড়ানোর কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তাছাড়া ১৯০৪ সাল থেকে তাঁর কণ্ঠহারে বিখ্যাত ফরাসী মণিকার লালিক নির্মিত একটি মূল্যবান লকেট থাকত, যার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত ছিল জো-র সংগৃহীত স্বামীজীর একগুচ্ছ কেশ। স্বামীজীর কাছ থেকে তিনি একটি আঙটিও পেয়েছিলেন এবং এটিকেও তাঁর স্মৃতিচিহ্নরূপে ধারণ করতেন। 'রিজলি ম্যানরে' স্বামীজীর বাসকক্ষে তাঁরই ব্যবহৃত একটি গথিক চেয়ারের উপর তাঁর একটি বৃহৎ রঙিন শিকাগো প্রতিকৃতি স্থাপন করে, বাড়িটিকে স্মৃতিপূত করেছিলেন। তেমনি ইংলণ্ডের 'হলস্ক্রফ্‌ট্‌' নামক বাড়িটিতে জো তাঁর নিজ কক্ষটিকে 'প্রফেটের চেম্বার' নাম দিয়েছিলেন এবং স্থাপন করেছিলেন স্বামীজীর তৈলস্ফটিকের রিলিফ মূর্তি ও তাঁর গ্রন্থাবলী। এছাড়াও তিনি নিজের কাছে রাখতেন লালিক নির্মিত স্বামীজীর অনেকগুলি ছোট স্ফটিকমূর্তি, যা তিনি নির্বাচিত মানুষদের মধ্যে বিতরণ করতেন।

এবার নিবেদিতার একটি পত্রাংশ দিয়ে আমরা জোসেফিনের চরিত্রচিত্রণ শেষ করব।

১৯০০-এর ২৮ এপ্রিল তিনি তাঁর প্রিয় য়ুমকে লিখেছিলেনঃ "তুমি অনুকরণ কর না। তুমি প্রতিফলন কর না। তুমি কারুর সমকক্ষ হতে বা কাউকে অতিক্রম করে যেতে চাও না। আঃ কী সুন্দর এই শান্ত অবস্থা! ভেবে দেখ স্বামীজীর এই অনুভূতির কথা! ঠিক এই জিনিসটিই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন যে, তোমার মনোহারিত্ব হল এখানেই যে, তুমি তাঁর কাছে আসার আগে থেকেই ছিলে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ওঃ প্রিয় য়ুম, তবে সর্বোপরি, তোমার সত্যিকারের মনোহারিত্ব হল তোমার উদার হৃদয়, যা সবকিছুকে ক্ষমা করতে জানে এবং প্রত্যেককে স্বাধীনতা দান করে, আর নিজেকে অন্তরালে রেখে দেয়।"

দীর্ঘ একানব্বই বছর সার্থক জীবনযাপনের পর ১৯৪৯ সালের ১১ অক্টোবর তিনি প্রশান্তবদনে বিবেকানন্দলোকে চলে গেলেন। স্বামী শিবানন্দ একদিন তাঁকে লিখেছিলেনঃ "পাশ্চাত্যের প্রতিটি মানুষ যতদিন না স্বামীজী ও ঠাকুরের জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে ততদিন তোমার প্রিয়তম বিবেকানন্দের সঙ্গে মিলিত হবার ছুটি মিলবে না। আমি তোমার আগে সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করব তোমাকে গৌরব মূহূর্তে ভূষিত করার জন্য।" তিনি তাঁর সেই আশ্বাসবাক্য নিশ্চয় পালন করেছিলেন।

ডেট্রয়েটে স্বামী বিবেকানন্দ

সুশান ওয়ালটার্স

উত্তর আমেরিকার মানচিত্রের দিকে তাকালেই পাঁচটি বিশাল হ্রদ চোখে পড়ে, এগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিবেশী কানাডা থেকে আলাদা করে রেখেছে। একেবারে পশ্চিমদিকে যে হ্রদটি, সেটি হল লেক মিশিগান, আর তার ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিম তীরেই স্বামীজীর শহর—শিকাগো। ঐ হ্রদের পুবদিকে মিশিগান, যার সবচাইতে বড় শহর ডেট্রয়েট।

ভারতের বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের কাছে শিকাগো একটি অতি পরিচিত নাম। কিন্তু ডেট্রয়েট বোধহয় ততটা নয়—সেই ডেট্রয়েটের কথাই আলোচনার বিষয়।

ডেট্রয়েটের পত্তন হয় ১৭০১ সালে। ঐ বছর 'আতোঁয়ান দ্য লা মথ ক্যাদিলাক' নামক এক ফরাসী লেক এরি এবং লেক হিউরনের মাঝামাঝি এক ভূখণ্ডে একটি দুর্গ তৈবি করেন। ফরাসী ভাষায় 'ডেট্রয়েট' শব্দের অর্থ লম্বাগোছের জমি যাকে ইংরেজীতে 'narrows' বলি। কিছুদিনের মধ্যেই এ দুর্গকে কেন্দ্র করে এক বাণিজ্যিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। কথায় বলে, 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ'। স্থানীয় ইণ্ডিয়ান এবং ফরাসী বণিকদের উদ্যোগে অচিরেই ব্যবসার বিশেষ প্রসার হয়। বৈষয়িক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় রেষারেষি। জায়গাটির মালিকানা নিয়েও ফরাসী ও ব্রিটিশদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে ডেট্রয়েট ফ্রান্স বা ব্রিটেন কারও অধিকারে গেল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন হলে ডেট্রয়েট শহর তারই অন্তর্ভুক্ত হল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে কাঠের ব্যবসা আর খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যে মিশিগানের ভাগ্য ফিরে গেল। কাজকর্মের নতুন নতুন সুযোগ—মানুষের হাতেও এল অঢেল টাকা। ডেট্রয়েট হয়ে উঠল অভ্যুদয়ের নতুন প্রাণকেন্দ্র। 'গতিশীল শহর' বলে তার খ্যাতি রটে গেল চতুর্দিকে।

১৮৯৪ সালে স্বামীজী যখন প্রথম ডেট্রয়েটে এলেন তখন বিত্ত-বৈভব এবং শিক্ষাদীক্ষায় ডেট্রয়েট বেশ খানিকটা প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ফেলেছে। ডেট্রয়েট মোটরগাড়ির জন্যে বিখ্যাত কিন্তু গাড়ি তৈরি তখনও শুরু হয়নি। তা শুরু হয়েছিল আরও চোদ্দ বছর পর অর্থাৎ ১৯০৮ সালে। হেনরী ফোর্ড 'মডেল টি' গাড়ি বের করে পরিবহনের ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন। ১৮৯৪-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী যখন ডেট্রয়েটের মাটিতে পা দিলেন তখন এসব ছিল বৈজ্ঞানিকের কল্পনামাত্র—যে কল্পনা ক্রমে বাস্তব-রূপ নেয়।

ডেট্রয়েটে এসে স্বামীজী কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলেন যে তাঁকে ধর্মান্ধতা আর গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে? মেরী লুইস বার্ক তাঁর 'Swami Vivekananda in the West : New Discoveries' গ্রন্থে স্পষ্ট বলেছেন যে, ডেট্রয়েটে স্বামীজীর ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ মার্চ, এই কদিন বাসের গুরুত্ব 'শিকাগো ধর্মমহাসভার তুলনায় কোনও অংশে কম নয়।'[১] বহু পরিশ্রম করে, বহু সংবাদপত্র ঘেঁটে প্রায় অজানা সেই অধ্যায়টিকে বার্ক আমাদের দৃষ্টিগোচর করেছেন। নতুন পাওয়া সেই তথ্যগুলি আমরা একটু নেড়েচেড়ে দেখতে চাই।

স্বামীজীর বিরুদ্ধাচরণ

সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বধর্মসম্মেলন শেষ হলে স্বামীজী দিনকয়েক শিকাগো এবং তার আশেপাশে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর শুরু হল তাঁর মিড-ওয়েস্ট এবং আমেরিকার দক্ষিণ দিকের রাজ্যগুলিতে বক্তৃতা সফর। সেখানে বিভিন্ন ধবনের মানুষেব সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। স্বামীজীর বিশ্বজনীন প্রেম ও সমন্বয়ের বাণী মানুষকে ক্রমাগত এমন আকৃষ্ট কবতে লাগল যে খ্রীস্টান মিশনারিরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর উপস্থিতি এবং বক্তৃতা ইতিমধ্যেই তাঁদের বুকের ভিতর কাঁপন ধবিয়ে দিয়েছিল। এখন সেই ভীতি বিভীষিকার রূপ নিল। এবার শুরু হল স্বামীজীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণ। তাঁরা বলতে লাগলেন 'খ্রীস্টান ভায়েরা সাবধান। ঐ বিধর্মীব উল্টোপাল্টা কথায ভুলো না।'[২]

শিকাগোর এক খ্রীস্টান সংবাদপত্রের সম্পাদক লিখেছিলেন ঃ 'বিশ্বধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ আমাদের অতিথি ছিলেন; তখন তাঁকে অতিথির যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হয়েছে কিন্তু সে পর্ব এখন শেষ। এবার ঐ বিধর্মীর এবং যে সমস্ত কথা তিনি প্রচার করেছেন তার বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত আক্রমণ চালানো উচিত।'[৩] সম্পাদকের এই আহ্বান যেন মিশনারিদের আরও উদ্বুদ্ধ করে তুলল। বিবেকানন্দকে আঘাত করার জন্যে তাঁরা এবার মরিয়া হয়ে উঠলেন।

কিন্তু এই তিক্ত আক্রমণের কারণটা কি? আমাব মতে একটি কাবণ এই ঃ খ্রীস্টানেবা চার্চের এই সুসমাচার মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন—'প্রভু যীশুই একমাত্র মুক্তিদাতা।' আর 'মুক্তি' মানে হচ্ছে অনন্ত নরকের আগুনে পুড়ে মরার হাত থেকে মুক্তি। বাস্তবিক, এইরকম একটা অন্ধ বিশ্বাস যদি কারও থাকে এবং আমাব ধারণা তা সে সময বহু আমেরিকানেরই ছিল, তাহলে প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে কেউ যে কথাই বলুন না কেন, মনে হতে পারে তিনি শয়তানের অনুচর।

স্বামীজীকে আক্রমণ করার আরও একটি কারণ আছে। এদেশের মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল—একমাত্র খ্রীস্টধর্মই 'হিদেন' বা অখ্রীস্টানদের নরকের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে। তাঁরা এও বিশ্বাস করতেন, অখ্রীস্টানদের সুসভ্য করে তুলতে গেলে মার্কিনী জীবনযাত্রা অনুসরণের একান্ত প্রয়োজন। এই দ্বিমুখী উদ্ধারকার্যের মধ্যে একটা রোমাঞ্চ আছে। তাছাড়া ভারতবর্ষের মতো সুদূর দেশে গিয়ে সেখানকার মানুষজনের বিচিত্র, বিদঘুটে জীবনযাত্রা আর রকমসকম দেখতে পারলে একঘেয়ে আমেরিকান জীবনেও একটু

বৈচিত্র্যের হাওয়া লাগে। অতএব একদিকে চার্চের অনুশাসনে বিশ্বাস, অন্যদিকে একটু রোমাঞ্চের প্রত্যাশায়, যাঁদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ধর্মভাব ছিল তাঁরাই মিশনারি হতে চাইতেন। অল্পবয়সী প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যেত সবচেয়ে বেশি। ক্যাথলিকদের মধ্যে ততটা নয় কারণ ধর্মভাবাপন্ন ক্যাথলিকরা ইচ্ছে হলে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করতে পারতেন।

সুতরাং একদিকে দীর্ঘদিনের সযত্নলালিত ধর্মবিশ্বাসের মূলে প্রচণ্ড আঘাত, আরেকদিকে প্রাচ্যবাসের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হবার উপক্রম হওয়ায় মিশনারিরা স্বামীজীর ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। এই আগুন ধিকি ধিকি জ্বলেছিল, ছড়িয়ে পড়ল ডেট্রয়েটে।

দুটি বিরুদ্ধ শক্তি

ডেট্রয়েটের সকলেই স্বামীজীর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন ভাবলে ভুল হবে। বস্তুত অনেকেই তাঁকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছেন, বন্ধুর সম্মান দিয়েছেন। শ্রীমতী ব্যাগলি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের অন্যতম। স্বামীজী ডেট্রয়েটে পৌঁছবার দিনই যেমন উন্মত্ত হাড়কাঁপানো তুষার-ঝড় বইতে শুরু করল, ঠিক সেইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই আবার শ্রীমতী ব্যাগলির উষ্ণ অভ্যর্থনা যেন ঈশ্বরের প্রসন্নতা হয়ে স্বামীজীকে তৃপ্তির স্পর্শ দিয়ে গেল। শ্রীমতী বার্ক তাঁর গ্রন্থে এই বিপরীতমুখী শক্তির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখছেনঃ "ব্যাগলি পরিবার স্বামীজীকে যখন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন, শহরের ওপর দিয়ে সেই হিমেল রাতে তখন তুষার ঝড় বইছে। এ একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আগামী ছ-ছটি সপ্তাহে যে আক্রমণ স্বামীজীর ওপর নেমে আসবে, বরফ-ঝড় যেন তারই পূর্বাভাস। ডেট্রয়েটের প্রতিপত্তিশালী মহিলা হিসেবে শ্রীমতী ব্যাগলির যথেষ্ট সুনাম ছিল। পাঁচ মাস আগে ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। ডেট্রয়েটে এসে পৌঁছলে সেই সন্ধ্যায় তিনি স্বামীজীর সম্মানে এক বিরাট অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন।... এই ঘটনাটিও যেন ইঙ্গিত দিল আগামী দিনে ডেট্রয়েটে স্বামীজী বহু মানুষের শ্রদ্ধা, ভালবাসা পাবেন। সমালোচনা ও তিক্ততার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনগুলিতে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবেন বহু সহৃদয় মানুষ।"[৪]

ডেট্রয়েটে আসার পরদিন অর্থাৎ ১৪ ফেব্রুয়ারি, বুধবার, 'ফ্রি প্রেসে' স্বামীজীর এক সাক্ষাৎকার বেরোয়। একজন নিরপেক্ষ দর্শক স্বামীজীকে কি চোখে দেখলেন এই সাক্ষাৎকারে তার কিছুটা ছায়া পড়েছে। সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ আমি উদ্ধৃত করছিঃ "এই হিন্দু দেবমানবটি সদাই প্রসন্ন। এই প্রসন্নতা একটা দেখবার জিনিস। কোনকিছুকেই তাঁর এই দিব্য প্রসন্নতা ভঙ্গ করতে পারে না। শান্ত, সংযত, সর্বদা আত্মস্থ। এ জগতের মলিনতা যেন তাঁকে স্পর্শ করে না।...

"তাঁর ব্যক্তিত্বের এক অদ্ভুত মাধুর্য। 'ফ্রি প্রেস'-এর প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে বিশিষ্ট অতিথিটির মধ্যে মিশনারিদের ভাব বা গন্ধ একবিন্দুও নেই। ভারতীয় এই স্বামীর উচ্চতা মাঝারি, প্রাচ্যের মানুষের মতই একটু চাপা গায়ের রং, নম্র ব্যবহার, হাঁটাচলা, কথাবার্তা, তাকানো সবদিক থেকেই একটি অত্যন্ত পরিশীলিত মানুষ। কিন্তু তাঁর চেহারার মধ্যে সবচাইতে আকর্ষণীয় হল আয়ত

বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুখানি। যেন সমগ্র ব্যক্তিত্ব ঐ দুখানি চোখের মধ্যে ধরা আছে।

"স্বামীজীর সঙ্গে অনেক কথাবার্তাই হল। তার মধ্যে চমকপ্রদ যে কথাটি তিনি বললেন তা হলঃ 'ধর্ম এবং ধর্মমত এ দুটি আলাদা জিনিস। ধর্ম আকাশের মতো উদার, সমুদ্রের মতো গভীর। বিভিন্ন ধর্মমতগুলি একই লক্ষ্যে পৌঁছবার বিভিন্ন উপায় মাত্র। কিন্তু creed বা সাম্প্রদায়িক ধর্মমতগুলি একপেশে, সঙ্কীর্ণ এবং আক্রমণাত্মক।... আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী।... ধর্মের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি মিশনারিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা আমাদের ধর্মমত বা ধর্মবিশ্বাস কখনও জোর করে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিই না। তা আমাদের ধর্মীয় নীতিবিরুদ্ধ।'

কথাপ্রসঙ্গে তিনি আরও বললেনঃ আমি আশা করি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ভবিষ্যতে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করবে।... তাঁর বক্তব্যের মূল সুরটি হল—'বিদ্বেষ ও বিরোধিতা নয়, সমন্বয় ও শান্তি'।"[৫]

আমরা অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখতে চাই

'ফ্রি প্রেস'-এর সম্পাদকীয়টি স্বামীজীর প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষের অন্তরের প্রতিধ্বনি। কিন্তু ঐ একই দিনে বৈরিভাবাপন্ন প্রতিপক্ষের মুখপত্র 'ইভনিং নিউজ'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'যুদ্ধং দেহি' ভাব প্রকাশ পেল। 'আমাদের অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখান' এই শিরোনামে তৎকালীন কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ উদ্ধৃত করে উক্ত সম্পাদকীয়তে বলা হলঃ "ভারতবর্ষের কিছু যোগী ইচ্ছামাত্র পাহাড়-পর্বত অদৃশ্য করে পরক্ষণেই তাদের স্বস্থানে ফিরিয়ে আনেন, অঙ্গুলিহেলনে প্রলয় ঘটান, দর্শকের বিস্ফারিত চোখের সামনে শূন্য থেকে মহীরুহ তৈরি করেন। বিবেকানন্দ যদি এসব ভোজবাজি দেখাতে পারেন তো তাঁকে মহাত্মা বলে মানতে রাজি আছি। নচেৎ তিনি তাঁর মুখ বন্ধ করুন।"[৬]

ডেট্রয়েটে স্বামীজীর অনুরাগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মিঃ ও. পি. ডেলডক (O. P. Deldoc)। তিনি সংবাদপত্রে নিয়মিত স্বামীজীর পক্ষ নিয়ে চিঠিপত্র লিখতেন। ডেলডকই সর্বপ্রথম 'ইভনিং নিউজ'-এর ঐ তির্যক মন্তব্যের উপযুক্ত জবাব দিলেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি সেই চিঠি 'জার্নাল'-এ প্রকাশিত হল। তিনি লিখলেনঃ "স্বামী বিবেকানন্দ যদি শান্তি, মৈত্রী, পবিত্রতা, ত্যাগ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করে সঙ্কীর্ণমনা ধর্মান্ধদের চোখের ঠুলি খুলে দিয়ে থাকেন, এমন চারিত্রিক উৎকর্ষ দেখিয়ে থাকেন যা মিশনারিদের মধ্যে একান্ত দুর্লভ এবং সর্বোপরি মানুষের পাষাণ-হৃদয়ে প্রেমমাধুর্য সঞ্চার, যা তিনি করছেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহলে আমাদের দেশে তাঁর কর্মব্রত বিফলে যাবে না।"[৭]

পরদিন অর্থাৎ ১৭ ফেব্রুয়ারি 'ইভনিং নিউজ'-এ স্বামীজীর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হল। সাক্ষাৎকারে স্বামীজী কাগজের প্রতিবেদককে বললেনঃ "আমি ভোজবাজি দেখিয়ে বেড়াই না। হিন্দুধর্মের সঙ্গে অলৌকিকতার কোনও সম্পর্ক নেই। ভারতে যাদু দেখায় যাদুকরেরা, ধার্মিক ব্যক্তিরা নন। আরেকটি কথা। যাঁরা সত্যানুসন্ধানে ব্রতী, সত্যের সন্ধানই যাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, কেবল তাঁরাই সিদ্ধ মহাত্মাকে চিনতে পারেন।

এ হুজুগে লোকের কর্ম নয়।"[৮]

স্বামীজীর তীক্ষ্ণযুক্তির কাছে হার মেনে 'ইভনিং নিউজ'-এর সুর সাময়িকভাবে বদলাল। ২০ ফেব্রুয়ারি স্বামীজীর প্রশংসা করে তাঁরা ছোট একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করলেন। প্রবন্ধের শেষে বলা হলঃ "স্বামীজী জনপ্রিয় হয়েছেন বলে নিউজ তাঁর প্রশংসা করছে তা নয়। তিনি এবার স্বেচ্ছায় এমন কিছু উপহার দিয়ে আমাদের তৃপ্তি দিলেন যার নিজস্ব মূল্য অনস্বীকার্য।"[৯]

অলৌকিক ঘটনা বা মিরাকল্ প্রসঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডার এইভাবেই ইতি হল। স্বামীজীই জিতলেন। এরপর ১৪ ফেব্রুয়ারি ইউনিটেরিয়ান চার্চে স্বামীজী প্রথম বক্তৃতা দিলেন। মেথডিস্ট বিশপ W. X. Ninde শ্রোতাদের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় করিয়ে দেন। ফেব্রুয়ারির কনকনে রাতের সেই পরম লগ্নেই কৃস্টিন গ্রীনস্টিডেল ও তাঁর প্রিয় বান্ধবী মেরী ফাঙ্কি স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করলেন। প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা ভগিনী কৃস্টিন নিজেই পরে বর্ণনা করেছেনঃ "এই অনন্যসাধারণ পুরুষের ভিতর থেকে এমন মহাতেজ ক্ষরিত হচ্ছিল যে উপস্থিত সকলেই একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। সেই দুর্নিবার তেজের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ায় সাধ্য কার?... তাঁর মন আর পাঁচজনের, এমনকি যাঁরা প্রতিভাবান বলে সুখ্যাত, তাঁদের সকলের মনের চেয়েও এতটাই উচ্চভূমিতে বিরাজ করত যা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তাঁর মনের গঠনটাই ছিল একেবারে স্বতন্ত্র। সেই অনন্য মনের চিন্তাগুলি এত স্পষ্ট, এত বলিষ্ঠ এবং এতটাই অতীন্দ্রিয় যে তা কোনও মানবের মস্তিষ্কপ্রসূত বলে বিশ্বাস হয় না।"

সেই রাতে কৃস্টিন এবং ফাঙ্কি কি শুনলেন? "তৎ ত্বম্ অসি। তুমিই সেই। তুমি এখন এই মুহূর্তে সেই সত্তায় সত্তাবান হয়ে আছ। শুধু সেই সত্তাটিকে উপলব্ধি করা ছাড়া তোমার আর করণীয় কিছুই নেই।... আমরা নিজেদের অসহায়, খণ্ডিত, সীমিত ভেবে দুঃখকষ্ট পাই, অথচ জানি না আমরা অজর, অমর, অবিনাশী আনন্দের সন্তান। আমরা দেবশিশু।... তাঁর বক্তব্যের প্রতিপাদ্য একটাই—'মানুষের স্বরূপ।' আমরা আসলে নিজেদের যা ভাবি তা আমরা নই।...

"একবার যে স্বামীজীর কথার স্বাদ পেয়েছে তার পক্ষে আর গড্ডলিকায় গা ভাসানো সম্ভব নয়। তার দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ আমূল পরিবর্তিত হয়ে যেত। এইভাবে শ্রোতাদের মনে তিনি আধ্যাত্মিক বীজ বপন করে দিতেন। ধীরে ধীরে সেই বীজ অঙ্কুরে এবং কালে সেই অঙ্কুর ফুলে-ফলে সুশোভিত সার্থক এক বনস্পতিতে পরিণত হত।"[১০] কৃস্টিনের লেখা স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতা শোনার এই অনুপম অভিজ্ঞতার কথা পড়ার পর কেউ যদি 'ফ্রি প্রেস'-এ লেখা বিশপ নিনডে-র চিঠিটি পড়েন, তাহলে পাঠকের বিশ্বাসই হবে না যে ওঁরা দুজনে একই বক্তৃতা শুনেছেন।

স্বামীজীকে শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়ে বিশপ নিনডে সেদিন বলেছিলেনঃ "আশা করি হিদেনরা একদিন না একদিন আলোর সন্ধান পাবেন।" স্বামীজীর সামনে কিভাবে যে তিনি দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো ঐ কথাগুলি বলেছিলেন ভাবলে আজও বিস্মিত হই। বিশপ বোধহয় ভেবেছিলেন ভারতের কিম্ভূতকিমাকার, রসালো সব ভ্রমণবৃত্তান্ত স্বামীজীর মুখ থেকে শুনবেন। কিন্তু তাঁর সব হিসেব উল্টে গেল। ভারতের গৌরবে

গৌরবান্বিত স্বামীজী সিংহনাদে বলে উঠলেন ঃ "নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতায় ভারতবর্ষ আমেরিকার চেয়ে বহুগুণ এগিয়ে আছে।"[১১] মিশনারিদের কাছ থেকে ধর্মের পাঠ নেবাব কোনও প্রয়োজন তাদেব নেই।

স্বামীজীর ঐ কথাগুলি হজম করা বিশপের পক্ষে কষ্টদায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই। পরের দিনই তিনি 'ফ্রি প্রেস'-এ একটি চিঠি পাঠালেন। তাতে লিখলেন ঃ "আমার বিস্ময়ের কথাটা একবার ভেবে দেখুন! এমনটি যে ঘটবে তা আমি কল্পনাও করিনি। বক্তা যেভাবে হিন্দুদের জয়গান শুরু করলেন এবং খ্রীস্টান দেশগুলির নৈতিকতার মান নিয়ে কটাক্ষ করলেন তাতে বুঝতে বাকি রইল না, এসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মিশনারিদেব পাঠাবাব নাকি কোনও প্রয়োজনীয়তাই নেই!"[১২]

বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এই বক্তৃতাই কৃস্টিন ও ফাঙ্কিকে সেদিন চেতনাব কোনও উচ্চস্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। অথচ স্বামীজীর মতো এত বড় মহাপুরুষেব সংস্পর্শে এসেও বিশপ নিনডে তাঁকে বুঝতে পারলেন না। কথায বলে, কৃষ্ণ কেমন? যার মন যেমন। ধর্মান্ধ বিশপের গোঁড়ামি তাঁর দৃষ্টি এমন করে আচ্ছন্ন করে বেখেছিল যে পরমযতির জ্যোতি কাছে পেয়েও তিনি দেখতে পেলেন না। আসলে মানুষ আপন স্বভাব অনুসারে বস্তুর বা ব্যক্তির বিচার করে।

যুদ্ধের দামামা

বিশপ নিনডেব ঐ চিঠিটি যেন যুদ্ধের প্রথম গোলা। তারপর স্বামীজী যতদিন ডেট্রয়েটে ছিলেন ততদিন তো বটেই, তারপরও ঐ যুদ্ধ চলেছে। শ্রীমতী বার্ক লিখেছেন ঃ "যুদ্ধ চলতেই থাকল। এখন থেকে স্বামীজীর পক্ষে ও বিপক্ষে চিঠিপত্র ও সম্পাদকীয় লেখার ধুম লেগে গেল।"[১৩]

ঐ ইউনিটেরিয়ান চার্চেই স্বামীজী 'হিন্দু দর্শন'-এব ওপব দ্বিতীয় বক্তৃতা দিলেন। সম্ভবত বিশপ নিনডের প্রভাবপ্রতিপত্তিব জন্যেই সংবাদপত্রগুলি স্বামীজীর প্রতি আগেব মতো অতটা সহানুভূতি দেখাল না। 'ফ্রি প্রেস' ও 'জার্নাল'—দুটি কাগজেই বক্তৃতাব বিবরণ ঠিকমত ছাপা হল না। 'জার্নাল'-এ বেরোল ঃ 'গোটা বক্তৃতাটাই খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধে।' 'ফ্রি প্রেস'-এর সাংবাদিক লিখলেন ঃ 'বক্তা খুব সূক্ষ্মভাবে খ্রীস্টধর্মের ওপর আঘাত হেনেছেন।'[১৪]

পাশাপাশি কৃস্টিনের মন্তব্য পড়ুন। তিনি স্বামীজীর প্রতিটি বক্তৃতা শুনেছেন। কিন্তু কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! তিনি লিখছেন ঃ 'তাঁর কথা শোনাব কোনও সুযোগই আমরা হাতছাড়া কবতাম না। বারবাব তাঁব মুখে আত্মার অমর গীতি শুনে আমরা ধন্য হয়েছি।'[১৫]

সংবাদপত্রগুলির মধ্যে একমাত্র 'ট্রিবিউন'-ই স্বামীজীর বক্তৃতার সঠিক বিবরণ প্রকাশ করেছিল। 'ট্রিবিউন'-এ বেরোল ঃ স্বামীজী হিন্দুধর্মের মূল সত্যগুলির ওপর আলোকপাত করে বলেছেন, হিন্দুধর্ম বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে, সব ধর্মমতকেই মর্যাদা দেয়। 'হিন্দুদের গোঁড়ামি এবং কুসংস্কার আছে, কিন্তু একটি কারণে তারা স্বতন্ত্র; হিন্দুরা কখনও অন্য ধর্মাবলম্বীদের পীড়ন করে না।'[১৬]

অন্যদিকে ডেট্রয়েটের সাধারণ মানুষ ক্রমে স্বামীজীর ওপর বিশপ নিনডের আক্রমণের জবাব দিতে এগিয়ে আসতে লাগল। এ প্রসঙ্গে বিশেষত তিনজনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাঁরা জোরালো ভাষায়, যুক্তির সাহায্যে বিবেকানন্দকে সমর্থন করলেন। তিনটি চিঠির দুটি বেরোয় 'ফ্রি প্রেস'-এ, অন্যটি 'জার্নাল'-এ।

একজন লিখলেন: 'বিশপ নিনডে যদি কখনও যীশুর প্রেম ও শান্তির বাণী প্রচার করতে প্রাচ্যে যান, তাহলে তাঁকে সবার আগে এই সার কথাটি শিখতে হবে—মানুষের মধ্যেই ভগবান।'

আরেকজনের বক্তব্য: 'পরমতসহিষ্ণুতা হিন্দুধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য। অথচ পাশাপাশি একজন শিক্ষিত, রুচিবান মিশনারি হয়েও নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিশপ খুবই অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন।'

তৃতীয় জন বললেন: "আমাদের ধর্মের প্রতি বিবেকানন্দের যে শ্রদ্ধাপূর্ণ, বিনম্র দৃষ্টিভঙ্গি—অন্যান্য ধর্মগুলি, যেগুলিকে আমরা 'প্যাগান' বলে বিদ্রূপ করি, সেই ধর্মগুলির প্রতি মিশনারিরা কি সেইরকম সহানুভূতিসম্পন্ন? বিবেকানন্দ আমাদের স্বধর্মচ্যুত করতে আসেননি। শেষ বক্তৃতায় তিনি একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন।"[১৭]

শ্রীমতী বার্কের মতে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিগুলি ডেট্রয়েটের বহু মানুষের অন্তরের প্রতিধ্বনি। এই মন্তব্য যে যথার্থ তার একটা প্রমাণ এই, স্বামীজীর বক্তৃতায় শ্রোতার ভিড় ক্রমাগতই বাড়তে থাকল এবং যাঁরা আসতেন তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে স্বামীজীর কথা শুনতেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার ইউনিটেরিয়ান চার্চে স্বামীজীর তৃতীয় বক্তৃতা হল। বিষয—'মানবের দেবত্ব'। চার্চে সেদিন তিলধারণের স্থান ছিল না। স্বামীজী বললেন—মূলপ্রসঙ্গে যাবার আগে আমি তিনটি প্রশ্নেব জবাব দিতে চাই। এদেশে আসা অবধি অনেকেই এ প্রশ্নগুলি করেছেন। প্রশ্ন তিনটি এই: 'ভারতের মানুষ তাদের সন্তানকে কি কুমিরের মুখে ফেলে দেয়? জগন্নাথের রথের তলায় পড়ে ওদেশের মানুষ কি আত্মহত্যা করে? ভারতের মানুষ কি বিধবাদের পুড়িয়ে মারে?'[১৮] প্রথম প্রশ্নের কি উত্তর তিনি সেদিন দিয়েছিলেন তা জানা যায়নি; তবে অন্যত্র একবার এই অশোভন কৌতুকপূর্ণ বৃথা প্রশ্নের জবাবে স্বামীজী তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলেন: হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই শুনেছেন। তবে কিনা কুমিরের মুখে পুত্রসন্তান নয়, শুধু শিশুকন্যাদেরই বিসর্জন দেওয়া হয়। তার কারণ এই—মেয়েদের নরম মাংস কুমিরদের বেশি পছন্দ। চিবোতে সুবিধে হয় কি না!

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বললেন: রথের সময় পুরীতে যে বিশাল ভক্তসমাগম হয় তাতে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। হাজার হাজার মানুষের হুড়োহুড়ি করে রথের দড়ি টানার ফলে দু-একজন ছিটকে চাকার তলায় পড়তেই পারেন—এতে আর আশ্চর্য কি?

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বললেন: আমাদের দেশে কোনও কোনও মহিলা বিধবা হলে স্বেচ্ছায় সতী হন। পুরোহিত বা আত্মীয়স্বজনের শত অনুরোধেও তাঁরা কর্ণপাত করেন না। তবে একটি কথা, পাশ্চাত্যবাসীকে বলি: ভারতে কিন্তু ডাইনী পোড়াবার রীতি নেই।

এরপর স্বামীজী মূলপ্রসঙ্গে গিয়ে হিন্দুদের আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, আত্মা

অসীম, অনন্ত। দেহ-মন আত্মার ওপর আরোপিত জড় উপাধিমাত্র। তিনি বক্তৃতা শেষ করলেন এই বলেঃ আমি খ্রীস্টানদের ধর্মান্তরিত করতে এদেশে আসিনি। খ্রীস্টানরা খ্রীস্টানই থাকুন, হিন্দুরাও হিন্দু থাকুন।

১৮ ফেব্রুয়ারি 'ট্রিবিউন'-এ একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরোল। সুচিন্তিত সেই প্রবন্ধের শিরোনাম—'আমাদের মধ্যে একজন হিন্দু'। ডেট্রয়েটে দেওয়া স্বামীজীর তিনটি বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যকে সমর্থন করে বলা হল সব ধর্মেরই মূল্য আছে এবং সেই কারণেই একটি ধর্ম আরেকটি ধর্মের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারে।

'ট্রিবিউন' দুজন ধর্মীয় নেতাব রবিবাসরীয় ধর্ম-আলোচনাও বেশ ফলাও করে ছাপল। দুই নেতার একজন ইউনিটেরিয়ান চার্চের মিনিস্টার, আবেকজন হলেন টেম্পল বেথ এল-এর রাব্বি গ্রসম্যান। সারমন্-এ এঁরা দুজনেই স্বামীজীর কথা উদ্ধৃত করেছেন এবং সমর্থনও করেছেন। রাব্বি গ্রসম্যানের সঙ্গে পরে স্বামীজীর নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। গ্রসম্যান বললেনঃ "হিন্দু সন্ন্যাসী আমাদের জানিয়েছেন ঈশ্বর নিত্য বিরাজমান চৈতন্যময় পরম সত্তা, ঈশ্বর সনাতন, সর্বব্যাপী। প্রতিটি ফুলে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে, দেহের প্রতি রক্ত বিন্দুতে তিনি স্পন্দিত। তাঁর এই শিক্ষা আমরা যেন গ্রহণ করি।"[১৯]

তবুও লড়াই

কিন্তু মৌলবাদীদের বিষোদ্গার চলতেই থাকল। ২৩ ফেব্রুয়ারি 'ফ্রি প্রেস'-এ প্রকাশিত একটি চিঠিই তার প্রমাণ। চিঠিটি লিখেছিলেন জনৈক জাসটিসিয়া। চিঠিটি এইরকমঃ "স্বামীজীর বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন তাঁদের কেউই এ অভিযোগ করতে পারবেন না স্বামীজী খ্রীস্টধর্মকে, বিশেষত যীশুর শিক্ষাকে আক্রমণ করেছেন। বরং একথা স্বীকাব করতেই হবে শ্রদ্ধা এবং প্রেমের সঙ্গেই যীশুর জীবন এবং তাঁর কর্মের (কথা) ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ভৎর্সনা মতের সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামি এবং কুসংস্কাবের ভিতব দিয়ে তথাকথিত খ্রীস্টধর্ম যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তারই বিরুদ্ধে। যে অসাধুতা, নিষ্ঠুরতা, অসহিষ্ণুতা ও চরম স্বার্থপরতা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে কলুষিত করেছে তারই বিরুদ্ধে।... কিন্তু তবুও বলব, কানন্দ, আমরা সবাই যে সঙ্কীর্ণ ও নিষ্ঠুর একথা আপনি ভাববেন না। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, হয়তো সংখ্যায় কম কিন্তু তবুও এখনও আমরা দু-চারজন আছি যারা গোঁড়ামি, কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে জুডিয়ার সেই মহান প্রেমিক, যিনি গোটা বিশ্বকে তাঁর অপার্থিব প্রেমবন্যায় ভাসিয়েছিলেন, সেই শান্ত সুন্দর আচার্যকে ভালবাসার, তাঁকে অনুসরণ করার আন্তরিক চেষ্টা করি। কানন্দ, আমরা আপনাকে বন্ধু বলে স্বীকার করি। আপনি আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।"[২০]

এই চিঠিটি প্রকাশিত হবার পর আবার নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হল। উদাহরণস্বরূপ 'ফ্রি প্রেস'-এ প্রকাশিত একটি চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে। চিঠিটি 'Occidental' এই ছদ্মনামে লেখা। পত্রলেখক অভিযোগ করলেন স্বামীজী 'সত্যকে বিকৃত করে দেখানোয় ওস্তাদ।' তিনি আরও বললেনঃ 'খ্রীস্টধর্ম অন্য সব ধর্মের চেয়ে মানুষকে অনেক বেশি

উন্নত করেছে।'[২১]

এইভাবে দিনের পর দিন স্বামীজীকে কেন্দ্র করে তাঁর অনুরাগী এবং বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে যুদ্ধ চলতেই থাকে। এরই মধ্যে উদারমনা, সুশিক্ষিত মানুষ স্বামীজীকে প্রায়ই তাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন। সেইসব জমকালো ডিনার পার্টিতে ঘন্টার পর ঘন্টা সামাজিকতার ঝক্কি পোয়াতে স্বামীজী কখনও ক্লান্তিবোধ করলেও তাঁদের বন্ধুত্বকে তিনি সাগ্রহে স্বীকার করেছিলেন। একটি চিঠিতে স্বামীজী লিখছেন ঃ "এরা সত্যিকারের ভদ্রলোক। সবচেয়ে আশ্চর্য এই, একজন বিশিষ্ট ধর্মযাজক এবং ইহুদী ধর্মগুরু আমার খুব অনুগত হয়ে পড়েছে।"[২২]

স্বামীজী ঠিক করেছিলেন তিনি ডেট্রয়েটে এক সপ্তাহ থাকবেন। কিন্তু অনুরাগী বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে আরও দিনকয়েক থেকে যেতে হল তাঁকে। এই সময় ইউনিটেরিয়ান চার্চে তিনি চতুর্থ বক্তৃতাটি দিলেন। 'ঈশ্বরপ্রেম' সম্বন্ধে স্বামীজী কি বলেন তা শোনার জন্য সেদিন চার্চের সমস্ত আসন ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। বহু শ্রোতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

এরপর ২১ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী আরও একটি বক্তৃতা দেন। সেটি শ্রীমতী ব্যাগলির বিশাল বৈঠকখানায়। ডেট্রয়েটে থাকাকালীন স্বামীজীকে অনেক কটূক্তি শুনতে হয়েছিল, তাঁর নিজের বিরুদ্ধে এবং স্বদেশের বিরুদ্ধে। ঐদিন তিনি ধর্মান্ধ খ্রীস্টানদের সেইসব সমালোচনার জবাব দিলেন কারণ তিনি জানতেন সংবাদপত্রে তাঁব এসব মন্তব্য বেরোবে।

ঐ বক্তৃতায় স্বামীজী বললেন ঃ "তোমরা বিলাসব্যসন আর ভোগসুখের লোভ দেখিয়ে ধর্মপ্রচার কর। আহা কী দুর্দৈব! যদি বাঁচতে চাও, যদি নিজেদের কল্যাণ চাও তো এই ভাব ছাড়। এই জাতিকে যদি টিঁকে থাকতে হয়, তাহলে খ্রীস্টের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করতে হবে। ভগবানকে ভালবাসা আর কুবেরের আরাধনা—এ দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না। তোমাদের এই যে বিত্তবৈভব, এসব ক্রাইস্ট-এর কাছ থেকে এসেছে বলতে চাও? ক্রাইস্ট এসব কথা শুনলে কানে আঙ্গুল দিতেন।... যদি তোমরা এই বিস্ময়কর পার্থিব সমৃদ্ধি এবং ক্রাইস্ট-এর আদর্শ—এই দুটিকে সমন্বিত করতে পার, সে ভাল কথা। কিন্তু যদি তা না পার, তবে ভাবের ঘরে চুরি না করে তাঁরই কাছে ফিরে যাও। ক্রাইস্টকে ছেড়ে প্রাসাদে থাকার চেয়ে, ছেঁড়া কাপড় পরে ক্রাইস্ট-এর সঙ্গ করা শতগুণে ভাল।"[২৩] বক্তৃতার দুদিন পর অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী ডেট্রয়েট থেকে বিদায় নিলেন।

আবার ডেট্রয়েটে

মিশিগানের ছোটখাট শহরগুলিতে সপ্তাহ দুয়েক বক্তৃতা দেবার পর স্বামীজীকে ফের ডেট্রয়েটে আসতে হল। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে খ্রীস্টান মৌলবাদীরা প্রাণভরে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছিল এবং তাঁর বাণীর অপব্যাখ্যায় মেতে উঠেছিল। ঐ যে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ ভারতে ধর্মের অভাব নেই এবং মিশনারিদের কাছ থেকে ধর্মের পাঠ নিতে হবে এমন আতান্তরে ভারতের মানুষ এখনও পড়েনি, ওতেই ধর্মযাজকদের আঁতে দারুণ ঘা লাগে। মৌলবাদীদের গাত্রদাহের আরও কারণ ছিল। তার মধ্যে একটা হল স্বামীজীর

আমেরিকায় আগমনের পর থেকেই মিশনারিদের প্রচারের জন্য ভক্তদের দেওয়া দান বাবদ চার্চের আয় ভয়ানকভাবে কমে যেতে লাগল। স্বামীজীর ওপর চার্চের আক্রমণের তীব্রতা এমনই সুপরিকল্পিত আকার নিল যে মনে হল ডেট্রয়েটে তাঁর প্রচারকার্য বুঝি পঙ্গু হয়ে যাবে।

কেবল খ্রীস্টান যাজকেরাই যে স্বামীজীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন তা নয়, তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'The Student Volunteer Missionary Movement' নামক এক মিশনারি সংগঠনের বিদ্বেষমূলক প্রয়াস। স্বামীজী প্রথমবার ডেট্রয়েট ত্যাগ করার পর ঐ সংগঠন মহাসমারোহে এক আন্তর্জাতিক কনভেনশনের আয়োজন করে। হাজার খানেক ভাবী তরুণ মিশনারি এবং বিদেশ-প্রত্যাগত দুঁদে প্রচারকেরা তাতে অংশ নেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় শ্রেণীব বক্তারা সভায় 'হিদেন'দের ধর্ম ও রীতিনীতির আদ্যশ্রাদ্ধ করে ছাড়লেন এবং বললেন ভারতের মতো দেশগুলিতে মিশনারিরা খুবই সার্থকভাবে কাজ করছেন।

৯ মার্চ ডেট্রয়েটে ফিরে এসে স্বামীজী ঠিক আগের মতনই দুটি শক্তির অস্তিত্ব লক্ষ্য করলেন। একদিকে বন্ধুজনের উষ্ণ অভ্যর্থনা, অন্যদিকে গোঁড়াদের তীব্র আক্রমণ। এবার অপেরা হাউসে তাঁর প্রথম বক্তৃতা হয়। ডেট্রয়েটের বিশিষ্ট ব্যক্তি, Hon. T. W. Palmer বক্তার সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দেন। স্বামীজীর নিজের এই বক্তৃতাটি খুব পছন্দ হয়েছিল। 'ইভনিং নিউজ' পরের দিন খুব বড় করে সেই খবর ছাপল এবং মন্তব্য করল ঃ "ব্রাহ্মণ বক্তার সবচেয়ে বড় গুণ হল তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা। প্রচলিত খ্রীস্টধর্ম এবং খ্রীস্টধর্মের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে বক্তা পরিষ্কার বললেন কোন অর্থে তিনি খ্রীস্টান এবং কোন অর্থে নয়।... বক্তা একটি কথা বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন যা মিশনারিরা কোনমতেই অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। তাঁর মত হলঃ যাঁরা প্রাচ্য দেশগুলিতে ধর্মান্তরিতকরণের কাজে লিপ্ত, তাঁরা নিজেরা আগে যীশুর আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করুন, তারপর হিদেনদের উদ্ধার করবেন।"[২৪]

এরপর দ্বিতীয় বক্তৃতা হয় ১৯ মার্চ, ডেট্রয়েট অডিটোরিয়ামে। বিষয়—'বৌদ্ধধর্ম, এশিয়ার আলো'। বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করে তিনি বললেনঃ "বুদ্ধের আসন সবার ওপরে। তিনি এমন একজন মানুষ যাঁর সম্বন্ধে শত্রু বা মিত্র কেউই কখনও বলতে পারেননি যে, অপরের মঙ্গলের জন্য ছাড়া তিনি একটি নিঃশ্বাস নিয়েছেন বা এক টুকরো রুটি খেয়েছেন।"[২৫]

ঠিক ছিল বুদ্ধের ওপর বক্তৃতাটিই তাঁর শেষ বক্তৃতা কিন্তু সকলের সম্মিলিত অনুরোধে তিনি ডেট্রয়েট ছাড়ার আগে আরও একটি বক্তৃতা দিতে রাজি হলেন। ২৪ মার্চ ইউনিটেরিয়ান চার্চের এই প্রকাশ্য সভায় স্বামীজী 'ভারতের নারী'র বিষয়ে বললেন।

২৫ মার্চ 'ইভনিং নিউজ'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী স্বামীজী বলেছেনঃ ভারতবর্ষে মেয়েদের দেবী বলা হয়। মাতৃত্ব ও সতীত্ব—এই দুই হচ্ছে সেখানকার নারীর আদর্শ। মার্চের শেষে স্বামীজী ডেট্রয়েট ত্যাগ করলেন।

১৮৯৬-এ ডেট্রয়েটে

১৮৯৬-এর ৩ মার্চ স্বামীজী আবার ডেট্রয়েট আসেন। শহরের বিদগ্ধ মানুষ তাঁকে দু-হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন।[২৬] সঙ্গে এলেন গুরুগতপ্রাণ জে. জে. গুডউইন। সিস্টার কৃস্টিন এবং ফাঙ্কির ব্যবস্থামত তাঁরা রিশিলিউ হোটেলে এসে উঠলেন। এবার ডেট্রয়েটে স্বামীজীর বিরোধী পক্ষ একটু কমজোরি ছিল, ফলে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

স্বামীজী আসার আগের দিন অর্থাৎ বুধবার, 'ইভনিং নিউজ' কলকাতার এক প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের Pastor রেভারেণ্ড I. M. Thoburn-এর একটি সাক্ষাৎকার ছাপে। সাক্ষাৎকারে রেভারেণ্ড মন্তব্য করেন—কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দকে কেউ চেনে না। এক মাদ্রাজী সন্ন্যাসীর কাছ থেকে 'স্বামী' উপাধি নিয়ে সাধু সেজে উনি এদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি বললেনঃ "আমার সারমন্-এ পরে আমি এ ব্যাপারে আরও কিছু বলব এবং মানুষটির প্রকৃত চরিত্র জনসাধারণের কাছে মেলে ধরব।"[২৭]

স্বামীজী যেদিন ডেট্রয়েট পৌঁছলেন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ঐ একই কাগজের সম্পাদকীয়তে লেখা হলঃ "হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং ব্রহ্মতত্ত্বের বিকৃত ও অন্তঃসারশূন্য হুজুগ এখন পাশ্চাত্যের মানুষদের পেয়ে বসেছে। কিন্তু ওসবের মধ্যে আছেটা কি?... খ্রীস্টানদের দেবার মতো মূল্যবান কিছু কানন্দের ভাণ্ডে নেই।"[২৮]

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এমনই যে সেইদিন ও তার পরদিন সন্ধ্যায় 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ' নিয়ে স্বামীজী যে দুটি বক্তৃতা দিলেন তাতে এত বিপুল শ্রোতার সমাগম হল যে অনেককে জায়গা না পেয়ে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

স্বামীজীর ইচ্ছে ছিল এবার ডেট্রয়েটে এসে যাঁরা সত্যিকারের জিজ্ঞাসু এবং ধর্মজীবন যাপন করতে চান তাঁদের নিয়ে ঘরোয়াভাবে ক্লাস নেবেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না কারণ তাঁর আসার খবর পেয়ে দলে দলে মানুষ হোটেলে এসে ভিড় করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু কৌতূহলী মানুষ ছিলেন একথা ঠিক। কিন্তু প্রকৃত অধ্যাত্মপিপাসুর সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। অতএব স্বামীজীর ঘরোয়া ক্লাসের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে শাপে বরই হল বলতে হবে।

পূর্বঘোষণা অনুযায়ী ৮ মার্চ, রবিবার রেভারেণ্ড Thoburn 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব'—এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন। বিষয়টি নির্দোষ শোনালেও বক্তার অভিপ্রায় যে অন্যরকম ছিল তা 'ট্রিবিউন'-এর এই রিপোর্টটি পড়লেই বোঝা যায়।Thoburn-এর উদ্ধৃতি দিয়ে 'ট্রিবিউন' লিখছেনঃ "হিন্দুধর্ম আর পাপ এই দুটি শব্দ প্রায় সমার্থক, এই ধর্মে নৈতিকতার কোনও বালাই নেই। এই ধর্মের চোখে কোনও অন্যায় অন্যায় নয়। হিন্দুরা যাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে মনে করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের দশ হাজার মহিষী ছিল। এখানেই শেষ নয়। সেই মহিষীদের পরিচয় হল—তারা সকলেই দেহপসারিণী।... জ্যোৎস্নার মায়াবী আলোয় একটি শূয়োরের খোঁয়াড়কেও দূর থেকে সুন্দর দেখায়। কিন্তু কাছে গেলেই দুর্গন্ধ। হিন্দুধর্মও তাই। যাঁরা খুব কাছে যাননি তাঁরাই মুগ্ধ হচ্ছেন।"[২৯]

ডেট্রয়েটের মানুষ এবং পত্র-পত্রিকাগুলি এই নির্লজ্জ ও অরুচিকর মন্তব্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। Thoburn-এর অশালীন মন্তব্যে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা তাঁর সমালোচনা

শুরু করলেন। এমনকি মৌলবাদীরাও বিরক্ত হয়ে Thoburn-এর সংস্রব ত্যাগ করলেন। ফলে স্বামীজীরই জয় হল। অর্থাৎ জয় হল সহিষ্ণুতা, শুভশক্তির।

সব দেখে শুনে 'ইভনিং নিউজ'ও তার সুর পাল্টাল। ১৮৯৪ সালে যিনি স্বামীজীর পক্ষ নিয়ে তাঁকে সমর্থন করেছিলেন সেই রাব্বি গ্রসম্যান-এর কথা তাঁরা বেশ ফলাও করে ছাপলেন। গ্রসম্যান যুক্তি ও সরস মন্তব্যের দ্বারা Thoburn-এর অপপ্রচারের উপযুক্ত জবাব দিলেন।

রাব্বির অনুরোধে তাঁর মন্দিরে পরের রবিবার স্বামীজী 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ'—এই বিষয়ে বললেন। অসাধারণ সেই বক্তৃতা! শ্রোতারাও মন্ত্রমুগ্ধ। শিকাগো পার্লামেন্টের পর এত শ্রোতা একসঙ্গে আর দেখা যায়নি। ১৬ মার্চ 'ট্রিবিউন' ও 'ফ্রি প্রেস' দুটি কাগজই স্বামীজীর খুব প্রশংসা করে রিভিউ ছাপল। তবে সেই সন্ধ্যার বক্তৃতার সার্থক বর্ণনা পাই কৃস্টিন-এর লেখায়। তিনি লিখছেনঃ "তিনি উঠে দাঁড়িয়ে মেঘমন্দ্রস্বরে মহত্তম সত্যগুলি আমাদের প্রাণে এমন করে ঢেলে দিচ্ছিলেন যে কণ্ঠস্বর, বাণী এবং তাঁর চেহারা, এই তিনে মিলেমিশে এক অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রোতাদের তিনি এমনই একাগ্র চিন্তায় ডুবিয়ে দিয়েছিলেন যে তাদের মন আর তাদের বশে ছিল না।"[৩০] সেবার ১৬ মার্চ স্বামীজী ডেট্রয়েট থেকে বিদায় নিলেন।

ডেট্রয়েটে ১৯০০ সাল

শেষবারের মতো স্বামীজী ডেট্রয়েট আসেন ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে। মাত্র পাঁচ দিন ছিলেন। শ্রীমতী ব্যাগলি ততদিনে দেহ রেখেছেন। স্বামীজীর এবারের ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ না মিললেও এটুকু জানা গেছে, স্বামীজী এসেছিলেন প্রিয়শিষ্যা কৃস্টিন ও মেরী ফাঙ্কিকে দর্শন দিতে। কৃস্টিন তখন তাঁর মায়ের সঙ্গেই আছেন। ছোট্ট বাড়িতে জায়গা কম। অনেকগুলি মানুষ একসঙ্গে থাকেন। কিন্তু স্বামীজী ওসব গ্রাহ্য করলেন না। ওঁদের সঙ্গে ঐ বাড়িতেই রইলেন। ফাঙ্কি পরে লিখেছেনঃ 'এইবার দেখলাম স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গেছে। খুব রোগা হয়ে গেছেন।' তাঁদের দুজনের প্রতি স্বামীজীর স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে ফাঙ্কি লিখেছেনঃ "আমাদের জন্য কী সুস্বাদু সব রান্নাই যে তিনি করতেন! ভাবতে পারা যায়, বিবেকানন্দের মতো মহাত্মা তাঁর শিষ্যাদের ছোটখাট অভাব, আব্দার মেটাচ্ছেন? ঐ সময় তাঁর যে মধুর সারল্য দেখেছি! আহা, কীসব পবিত্র স্মৃতি তিনি আমাদের হৃদয়মঞ্জুষায় ভরে দিয়ে গেছেন!"[৩১]

ডেট্রয়েট থেকে নিউ ইয়র্ক আসার সময় স্বামীজী কৃস্টিনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। স্বামীজী ভারতের পথে ইউরোপ যাত্রা করা পর্যন্ত দুই সপ্তাহ কৃস্টিন নিউ ইয়র্কেই থাকলেন। সেবার ভারতে না আসতে পারলেও কৃস্টিন পরে গুরুর আদিষ্টকর্মে ব্রতী হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভগিনী কৃস্টিনরূপে তাঁর সেই কল্যাণী মূর্তি, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্বামীজীর আর কখনও ডেট্রয়েট বা আমেরিকায় আসা হয়নি। শেষবার ডেট্রয়েটে আসার ঠিক দুবছর পর অর্থাৎ ১৯০২ সালের ৪ জুলাই, তিনি দেহরক্ষা করলেন।

ডেট্রয়েটে স্বামীজীর কর্মের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শ্রীমতী বার্ক মন্তব্য করেছেনঃ আপন শক্তিবলে স্বামীজী সেখানকার ধর্মান্ধ গোঁড়াদের প্রভাব অনেকটা খর্ব করেছিলেন। তিনি বলেছেনঃ "এরপর থেকে মিশনারি এবং ধর্মযাজকেরা প্রকাশ্যে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো এবং অপমানজনক মন্তব্য করতে আর বড় একটা ভরসা পাননি। বছরের পর বছর ধরে পাশ্চাত্যের মানুষের মন বিষিয়ে তোলার অপচেষ্টা বহুলাংশে স্তিমিত হয়ে এল।"[৩২]

বাস্তবিক, আমরা আমেরিকানরা, এইজন্য স্বামীজীর কাছে অশেষ ঋণী। ধর্মান্ধতা এবং গোঁড়ামির প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে লড়াই করেছেন তা লিখে বোঝাবার নয়। শুধু যে তাঁকে মৌখিক সমালোচনার বিষ নীরবে সহ্য করতে হচ্ছিল তাই নয়, তাঁর জীবননাশের চেষ্টাও একবার হয়েছিল। এই কদর্য অধ্যায়টির কথা ভাবলে মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়। ডেট্রয়েটের এক ডিনার পার্টিতে তাঁর কফিতে বিষ মেশানো হয়েছিল। কফির পেয়ালায় যখন চুমুক দিতে যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি স্বামীজীকে সাবধান করে দিয়ে বললেনঃ 'ওরে খাসনি, ওতে বিষ আছে।'

স্বামীজী আমাদের জন্য যা করেছেন, এতক্ষণ তার একটি দিকের কথাই শুধু বলা হল। ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ, বিশেষ করে আত্মার বাণী আমাদের হাতে তুলে দেবার জন্যই তিনি ধর্মান্ধতা ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়াই করেছেন। কিন্তু তিনি জানতেন, ভারতেব অধ্যাত্মসমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত আমাদের উপহার দিলেন, ভারতবর্ষকে না জানলে তার যথার্থ সমাদর আমরা কোনদিনই করতে পারব না, জীবন দিয়ে গ্রহণ করা তো দূরের কথা। সেই কারণেই সর্বাগ্রে যথাশক্তি প্রয়োগ করে ভারতের বিরুদ্ধে মিশনারিদের অপপ্রচার বন্ধ করলেন।

শ্রীমতী বার্ক স্বামীজীর মিশন সম্পর্কে যথার্থই বলেছেনঃ "অসংখ্য মানুষের মনে অধ্যাত্মভাবের বীজ স্বামীজী এমনভাবে বপন করে এসেছিলেন যার প্রভাবে বহু মানুষের জীবন আমূল পাল্টে গেল।... স্বামীজী যে ঈশ্বরপ্রেরিত হয়েই আমেরিকায় এসেছিলেন এতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি যথার্থই একজন অবতারকল্প মহাপুরুষ। আধুনিক যুগের প্রয়োজন অনুসারে তিনি আমাদের তৈরি করে গেছেন যাতে বেদান্তের বাণী গ্রহণ করে বহু জটিল সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারি। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। আজ প্রয়োজন এমন সহস্র সহস্র মানুষের, যাঁদের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনা জেগেছে। বেদান্তদর্শনকে জীবনে রূপ দিয়ে তাঁরা এর অন্তর্নিহিত শক্তিকে এমনভাবে জাগ্রত করে দেবেন যা আগামী দিনের বিশ্বের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করবে।"[৩৩]

বিশ্বাচার্য বিবেকানন্দ

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আচার্যের ভূমিকা স্বামীজীর বরাবরই ছিল, এমনকি বরানগর মঠে এবং পরিব্রাজক জীবনেও। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং কাশীপুরে রোগশয্যায় শুয়ে এক টুক্‌রো কাগজের ওপর তাঁকে চাপরাশ লিখে দিয়েছিলেন—'নরেন শিক্ষে দিবে'। তাঁর সেই শিক্ষাদানের ক্ষেত্র ক্রমে ভারতবর্ষের সীমারেখা ছাড়িয়ে নিখিল বিশ্বে প্রসারিত হয়। স্বামীজী বলতেনঃ 'I will continue to inspire men wherever I go.'

শ্রীমতী মেরী লুইস বার্ক (সিস্টার গার্গী) তাঁর সুবিশাল গবেষণাগ্রন্থের (Swami Vivekananda in the West—New Discoveries) তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে স্বামীজীর এই বিশ্বাচার্যের ভূমিকা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। দুই খণ্ডের একত্রে উপনাম দেওয়া হয়েছে—'The World Teacher'. (সংক্ষেপে WT)

শিকাগো ধর্মমহাসভার অব্যবহিত পরবর্তী কালে স্বামীজী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল ও মধ্যপশ্চিমাঞ্চলে নানাসভায় বক্তৃতা দেন। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সুমহান ধর্মকে বিশ্বের সম্মুখে উপস্থিত করার প্রবল প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বিবেকানন্দ হয়ে ওঠেন 'এক দিব্যবার্তার নবী'। তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিকে প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করেছিল। প্রথম পর্যায়ের উত্তেজনা ও ঘাত-প্রতিঘাতের ঝড় কিছুটা শান্ত হলে স্বামীজী আমেরিকার স্বাধীনচেতা শিক্ষিত জিজ্ঞাসু মানুষগুলিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পেলেন। এই দ্বিতীয়পর্বে (১৮৯৫—১৮৯৬ খ্রীঃ) ধারাবাহিক ক্লাস, বক্তৃতা, বন্ধু ও শিষ্যস্থানীয়দের উদ্দেশ্যে লেখা অজস্র চিঠিপত্রে আচার্যের ভূমিকাই প্রধান। সঙ্গত কারণেই শ্রীমতী বার্ক তাঁর 'The World Teacher' পুস্তকের সূচনায় স্বামীজীর বাণীর একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ

' I have a truth to teach
I, I the child of God."

প্রথমপর্বে বেদান্তভাবনার যে বীজ রোপণ করা হয়েছে, দ্বিতীয়পর্বে তারই সংরক্ষণ ও পরিবর্ধনের আয়োজন। স্বামীজীও এই পর্বে উদার, স্নিগ্ধ, প্রসন্ন। ভগিনী গার্গীর ভাষায়ঃ 'an infinite ocean of peace, without a ripple,.a breath.' চিরদিনই তিনি শ্রোতাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা এক লহমায় বুঝে নিতেন এবং ক্লাস ও বক্তৃতার

জন্য এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করতেন যা সহজেই সকলের বোধগম্য হয়। ভগিনী গার্গী তাঁর বইয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের পরিশিষ্টে ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ সালে গৃহীত ক্লাস এবং বক্তৃতাগুলির কালানুক্রমিক দুটি সারণি দিয়েছেন। বর্তমান নিবন্ধে ঐ দুই সারণিকে অনুসরণ করে স্বামীজীর বিশ্বাচার্যের ভূমিকা ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। কী কঠোর ও অক্লান্ত পরিশ্রমে মানুষের চেতনার উদ্বোধন তিনি করেছিলেন তার সামান্য পরিচয়েও আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। স্বদেশ ও বিদেশে স্বামীজীর ক্লাস ও বক্তৃতাগুলির কালানুক্রমিক সামগ্রিক চিত্র আজও অনুদ্ঘাটিত এবং তা দীর্ঘ গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

আচার্যের ভূমিকা পালনে ধারাবাহিক ক্লাসের গুরুত্ব সর্বাধিক। এতে প্রত্যক্ষভাবে আচার্য ও শিষ্যের সম্পর্ক সৃষ্ট হয়। আমাদের আলোচনার ধারাও দুটি পর্যায়ে বিভক্ত—(১) 'The World Teacher'-এর তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের দুটি সারণি অনুসরণে ঘরোয়া ক্লাসগুলির আনুপূর্বিক আলোচনা এবং (২) ঐ দুই খণ্ডের সারণিদ্বয় অনুসরণে বক্তৃতাসমূহের পর্যালোচনা।

আমেরিকায় স্বামীজী অদ্বৈত বেদান্তপ্রসঙ্গে সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ক্লাস নিয়েছিলেন গ্রীনএকারে—সেখানেই বিশ্বাচার্য ভূমিকার প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল। ভগিনী গার্গী তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে সবিস্তারে গ্রীনএকার প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁর মতেঃ "The founding of the Greenacre Conference in 1894 was part of the same divine plan that had brought him to America."

মেইনের এলিয়টের সন্নিহিত পিসক্যাটকা নদীতীরে গ্রীষ্মাবাসে স্বামীজী জুলাই মাসের শেষের দিকে আসেন। এক বিশাল তাঁবুর নীচে বক্তৃতার আয়োজন হয়। এছাড়াও বক্তারা উন্মুক্ত আকাশের নীচে পছন্দসই একেকটা পাইন গাছের তলায় নিজ নিজ ধর্ম বিষয়ে প্রতিদিন ক্লাস নিতেন। স্বামীজীরও পছন্দমতন এক বিশাল লাইসেকলস্টার পাইন ছিল, পরবর্তী কালে ঐ গাছটি 'স্বামীজীর পাইন' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ঐ সময়ে স্বামীজীর দেওয়া ক্লাস ও বক্তৃতার কিছু নোট নিয়েছিলেন বিখ্যাত গায়িকা এমা থার্সবি—'নিউ ইয়র্ক হিস্টরিক্যাল সোসাইটি' থেকে শ্রীমতী বার্ক ঐ অনালোচিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছিলেন।

'অবধূত গীতা'র স্বচ্ছন্দ ইংরেজী অনুবাদ করে স্বামীজী শ্রোতাদের আনন্দ দিতেন। মীরাবাঈয়ের ভগবৎপ্রেম, যোগের তাৎপর্য, গুরুশিষ্য সম্পর্ক, সমগ্র বিশ্ব এক অসীম আত্মার লীলা ইত্যাদি বিষয়ে জুলাইয়ের শেষ থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত দিনের পর দিন তিনি ক্লাস নিয়েছেন।

ধারাবাহিকরূপে পরবর্তী ক্লাসগুলি হয় ঐ বছরেরই শেষদিকে ৫ থেকে ২৮ ডিসেম্বর, কেম্‌ব্রিজ (ম্যাস)-এ মিসেস ওলি বুলের বাড়িতে। ক্লাসের বিষয়বস্তু ছিল বেদান্তদর্শন। পরের বছর (১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে) নিউ ইয়র্কে নেওয়া ক্লাসগুলিকে শ্রীমতী বার্ক 'উদ্যোগ পর্ব' নামে চিহ্নিত করেছেন। পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁর মহতী বাণী যেন ঐ সময়েই একটি সুনির্দিষ্ট রূপ নিচ্ছিল। বই লেখার মতো অবকাশ তাঁর ছিল না কিন্তু প্রিয়শিষ্য আলাসিঙ্গাকে পত্রে জানিয়েছেনঃ 'I am simply jotting down my thoughts.' তাঁর বিশ্বাস—বেদান্তই একমাত্র দর্শন যা সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান দিতে পারে। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিনের বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তরকালে স্বামীজী এক চমকপ্রদ মন্তব্য

করেনঃ 'I have a message to the West just as Buddha had a message to the East.'

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি শিকাগোয় হেলদের বাড়িতে বিবেকানন্দের আকস্মিক আগমন পরিবারের সকলকে আনন্দ দেয়। ঐ সময় প্রায় তিন সপ্তাহ তিনি শিকাগোয় অবস্থান করেন এবং কিছু ক্লাসেরও আয়োজন হয়। মিস থার্সবিকে লেখা ১৭ জানুয়ারির চিঠিতে স্বামীজী মিসেস অ্যাডামসের ভবনে ক্লাস নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। মিস ফার্মার, থার্সবি প্রমুখ বন্ধুবর্গের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বামীজী নিউ ইয়র্কে ধারাবাহিক ক্লাস শুরু করেন। ১৮৯৪-এর নভেম্বর মাসে 'নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি'-রও উদ্বোধন হয়। বন্ধুবর্গের তৎপরতা সত্ত্বেও শিকাগো থেকে স্বামীজী নিউ ইয়র্কে না আসা পর্যন্ত কাজটি ফলপ্রসূ হয়নি। নিউ ইয়র্কে পৌঁছেই লিয়ঁ ল্যাণ্ডসবার্গকে (পরবর্তী কালে স্বামী কৃপানন্দ) স্বামীজী ক্লাসের জন্য ঘর ভাড়া করতে বলেন। ঐ সময় ল্যাণ্ডসবার্গ ছিলেন স্বামীজীর কাজে বিশেষ সহায়। ২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৫-এর চিঠিতে ল্যাণ্ডসবার্গ মিস ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লিখেছেন, দুটি ঘর পাওয়া গেছে। একটি নির্দিষ্ট থাকবে ক্লাসের জন্য, অপরটি হবে ল্যাণ্ডসবার্গের। ঐ ভাড়া বাড়ির ঠিকানা ছিল—৫৪ নং ওয়েস্ট, ৩৩ নং রাস্তা। ঐসময় স্বামীজী থাকতেন ডাঃ গার্নসির গৃহে। চলাফেরার স্বাধীনতা এবং ভাড়াবাড়ি থেকে গার্নসি ভবনের দূরত্বের কথা চিন্তা করে স্বামীজী ভাড়াবাড়িতেই উঠে আসেন। সম্ভবত ২৭ জানুয়ারি, রবিবার ঐ বাড়িতে স্বামীজীর পদার্পণ ঘটে। পরের দিন, সোমবার ক্লাস নেওয়া শুরু হয়। সিস্টার গার্গীর মতে পাশ্চাত্য জগতে স্বামীজীর দ্বিতীয় পর্বের কাজ ওখান থেকেই আরম্ভ। ২৯ জানুয়ারির ক্লাসে যোগদান করেন মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড ও তাঁর দিদি মিসেস বেসি স্টার্জিস (পরবর্তী কালে মিসেস লেগেট)। 'Reminiscences'-এ মিস ম্যাকলাউড ঐ প্রথম দিনের সম্পর্কে অনেক কথা জানিয়েছেন—তাঁর কাছে দিনটি ছিল অবিস্মরণীয়। বলতেন ঐদিনেই আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁর নবজন্মলাভ, নিউ ইয়র্কে ১৮৯৫-এর প্রথম ভাগে ঘরোয়া ক্লাসগুলির প্রসঙ্গে স্বামীজীর পরম বিশ্বাসভাজন মিস সারা এলেন ওয়ালডো লিখেছেন—প্রথম দিকে শ্রোতাদের সংখ্যা কম থাকলেও অতি দ্রুতগতিতে এত বৃদ্ধি পায় যে ঘরে তিলধারণের স্থানও থাকত না। সোফার হাতল, সিঁড়ি—সর্বত্র যে যেমনভাবে পারে বসে পড়ত—দরজা সকলের জন্যই খোলা থাকত। স্বামীজী মেঝেতে বসতেন। অধিকাংশ শ্রোতাও তা-ই। এমনই অনাড়ম্বরভাবে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত ক্লাসগুলির সূচনা হয়েছিল।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি থেকে ১ জুন পর্যন্ত তাঁর নিউ ইয়র্কের ক্লাসগুলির সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। এদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে WT-এর তৃতীয় খণ্ডের সারণিতে স্বামীজীর ইংরেজী Complete Works-এর (CW) উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে ঐ ক্লাসগুলিতে জ্ঞানযোগের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। এবিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় নন বলে সিস্টার গার্গী উল্লেখের পশ্চাতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়েছেন। উল্লিখিত CW-এর অষ্টম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়টির নাম—'Discources on Jnanayoga'. জ্ঞানযোগের মূল বক্তব্যসমূহ এই 'Discourses'এ আছে। এদের মোট সংখ্যা নয়টি। স্বামী সারদানন্দ আমেরিকা থাকাকালীন এগুলি তিনি মিস এস. ই. ওয়াল্‌ডোর নোটবুক থেকে টুকে নেন।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে ঐ আলোচনাগুলি স্বামীজী ১৮৯৫-এর ২৮ জানুয়ারি থেকে যে ক্লাসগুলি নিয়েছিলেন তাতেই হয়েছিল, তাহলে ঐ বছরের শেষ দিক থেকে (১১ ডিসেম্বর) ১৮৯৬ এর ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জ্ঞানযোগের উপরে যে চোদ্দটি ক্লাস তিনি নিয়েছিলেন, তা ঐ পূর্ববর্তী আলোচনাগুলিরই সম্প্রসারণমাত্র।

উল্লিখিত নয়টি আলোচনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'ওঁ তৎ সৎ' উচ্চারণপূর্বক তিনি আলোচনার সূত্রপাত করেন। ভক্তিযোগ, কর্মযোগ বা রাজযোগের যা উদ্দেশ্য, জ্ঞানযোগেরও তাই, তবে পদ্ধতিটা একেবারেই ভিন্ন। এই জ্ঞানযোগ শুধু তাঁদেরই জন্য যাঁরা পুরোপুরি যুক্তির পথে চলতে চান। মানসিক দিক থেকে এঁরা প্রচণ্ড শক্তিশালী। ভক্তির পথে, নিষ্কাম কর্মের পথে, ধ্যান বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিলাভের পথে চলতে তাঁরা নারাজ। কেবলমাত্র যুক্তি বা মনীষার সাহায্যে তাঁরা ঈশ্বরোপলব্ধি করতে চান। সর্বপ্রকার সাকার মূর্তি বা প্রতীক, প্রাচীন বিশ্বাস বা সংস্কারকে বর্জন করে তাঁরা আত্মস্বরূপকে জানতে চান। জন্ম-মৃত্যুর কথা না ভেবে সেই স্বরূপকেই জানতে হবে, যে জ্ঞান লাভ করলে মানুষ কোনও কিছুতেই বিচলিত হয় না বা ভয় পায় না। সুতরাং আত্মোপলব্ধিই চূড়ান্ত লক্ষ্য। প্রকৃত 'আমি'কে কখনও যুক্তি-বিচার দিয়ে জানা যায়নি। এটি নিত্য বস্তু, তাই 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' ('যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ')। ব্যবহারিক বা যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞান সর্বদাই আপেক্ষিক (relative) ; যা চরম বা পরম (absolute) তাকে কখনও যুক্তি দিয়ে ধরা যাবে না। যিনি সর্বজ্ঞ, তাঁকে কে জানবে? ('বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ')। যে জগতকে আমরা ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে দেখি, শুনি বা জানি, তা আসল জগতের ছায়া মাত্র। আসল স্বরূপ বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারলেই এই ছায়া জগতের সুখ-দুঃখের পারে যাওয়া যায়। নিখিল বিশ্ব মায়ার আবরণে ঢাকা। মায়ার আবরণ সরাতে না পারলে এই স্বপ্রকাশ আত্মার দর্শন মিলবে না—এ যেন মেঘে ঢাকা সূর্য। মেঘও কেটে গেল, অমনি সূর্যের দর্শনও তৎক্ষণাৎ মিলল—তখন উপলব্ধি হল, 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। তাই জ্ঞানীর প্রথম লক্ষ্যই 'অভীঃ' হওয়া। গীতার প্রথম দৈবী সম্পদ 'অভয়ম্' লাভ করা। তাঁর নিরন্তর একটিই ভাবনা—'আমি এই দেহ নই, বুদ্ধি নই, আমি আত্মস্বরূপ'। জ্ঞানযোগীর ভাবনার দুটি দিক—"আমি এই নই, ঐ নই—'নেতি নেতি' ; এবং আমি আত্মা 'অহং ব্রহ্মাস্মি বা 'সোঽহম্'।" নেতির যেখানে শেষ, সেখানেই ইতি বা অশেষ যা অনাদি, অনন্ত, অপরিবর্তনীয়। জ্ঞানযোগের মূলসূত্রই হল অভেদ বা অদ্বৈত। এই জ্ঞান লাভ হলে মানুষ পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখের পারে চলে যায়। দেহাত্মবোধরূপ দুঃস্বপ্নের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করে—সে হয় জীবন্মুক্ত পুরুষ। সত্যিকারের প্রেম ও জ্ঞানদানের অধিকার তাঁরই, যিনি সর্ববিধ কামনা-বাসনার অতীত, নিত্যতৃপ্ত।

কালানুক্রমিকতার দিক থেকে এর পর স্বামীজীকে ক্লাস নিতে দেখি সহস্রদ্বীপোদ্যানে (১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১৯ জুন থেকে ৬ আগস্ট পর্যন্ত)। এগুলি পরে (Inspired Talks) 'দেববাণী' নামে পরিচিত। শ্রীমতী বার্কের পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে সহস্রদ্বীপোদ্যানে মিস ডাচারের কুটিরে থাকাকালীন স্বামীজী ও তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের তদানীন্তন জীবনচর্যার মনোজ্ঞ বিবরণ পাই। ওখানে তিনি সকালে প্রায় প্রতিদিনই ক্লাস নিতেন। ঐ ক্লাসগুলিতে যা আলোচনা হত, মিস ওয়ালডো তার নোট রাখতেন নিজের অনুধ্যানের জন্য। নোটগুলি

অবশ্য সবই long hand-এ, short hand তাঁর জানা ছিল না মনে হয়। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের বেশ কিছুদিন পরে সিস্টার দেবমাতা ওয়ালডোর কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় ঐ নোটগুলির সন্ধান পান। ওয়ালডোর জোরালো আপত্তি (কেননা স্বামীজীর পুরো বক্তৃতাগুলি তিনি ঐ নোটে হুবহু ধরে রাখতে পারেননি) সত্ত্বেও সিস্টার দেবমাতা ঐগুলির সম্পাদনা করে 'Inspired Talks' নামে একটি ছোট পুস্তক বার করেন। ঐ নামেই স্বামীজীর Complete Works-এর সপ্তম খণ্ডে লেখাটি প্রকাশিত হয়।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে আলোচিত বিষয়গুলির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মতো। স্বামীজীর চিন্তার বিশালতাও এদের মধ্যে ধরা পড়ে। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১৯ জুন (বুধবার) থেকে ৬ আগস্ট (মঙ্গলবার) পর্যন্ত সকালবেলায় তিনি মোট তেতাল্লিশটি ক্লাস নেন। অপরাহ্নের পাঁচটি আলোচনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখও 'দেববাণী'তে আছে। মাত্র কয়েকটি বক্তৃতার শিরোনামই ওখানে দেওয়া আছে, বাকিগুলি পাওযা যায়নি। প্রধানত যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছিলেন এবং বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলঃ (ক) বাইবেলের বুক অব সেন্ট জন (২ দিন) (খ) কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগ (৩ দিন) (গ) নাবদীয় ভক্তি-সূত্র (১ দিন) (ঘ) পতঞ্জলির যোগসূত্র (১ দিন) (ঙ) ব্যাসের বেদান্তসূত্রের শংকর ভাষ্য (২ দিন) (চ) কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট ও রামকৃষ্ণ (৭ দিন) (ছ) শংকরাচার্য, রামানুজ, মধ্ব ইত্যাদি (৮ দিন) (জ) বৃহদারণ্যকোপনিষদ, কঠোপনিষদ, মুণ্ডকোপনিষদ, অবধূতগীতা—(প্রতিটির উপরে ১ দিন করে মোট ৪ দিন) (ঝ) বেদান্তদর্শন (৪/৫ দিন) (ঙ) হিন্দুদের ষড়দর্শন, সাংখ্যদর্শন, ইসলামের সুফী দর্শন (প্রতিটির উপরে ১ দিন করে মোট ৩ দিন) (ট) বিবিধ মিশ্র আলোচনা (বাদবাকি দিনগুলিতে)।

এর পরের ক্লাসগুলির স্থান-কাল-পাত্র পালটে গেছে কারণ স্বামীজী তখন উত্তর আমেরিকা মহাদেশ ছেড়ে ইউরোপ মহাদেশে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে লেগেটদের অতিথি হিসাবে কাটিয়ে তিনি তখন লণ্ডনে। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর তিনি প্যারিস থেকে লণ্ডনে পৌঁছে তাঁর ইংরেজভক্ত ই.টি স্টার্ডির ক্যাভারশামের (লণ্ডনের অনতিদূরে) 'হাইভিউ' নামক বাড়িতে নিরিবিলিতে কিছুদিন বাস করেন। ঐকালে তিনি স্টার্ডিকে সংস্কৃত শেখাচ্ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে নারদীয় ভক্তিসূত্রের ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যাও লিখেছিলেন। আটষট্টি পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা এভাবে রচিত হয়েছিল এবং লণ্ডনের প্রকাশক 'লংম্যানস্ গ্রীন অ্যাণ্ড কোম্পানির' দ্বারা এর প্রথম সংস্করণ ছাপানোর ব্যবস্থা হয়। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে স্বামীজী মিঃ চেমিয়ার (Mr. Chamier)-এর বাড়িতে প্রথম ক্লাস নিয়েছিলেন। এই চেমিয়ারের বিশদ পরিচয়, ঠিকানা অথবা স্বামীজী কি কি বিষয়ে ক্লাস নিয়েছিলেন, তার কোন হদিসই মেলেনি। বার্কের পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের (WT-I) সারণিতে আছে, লণ্ডনের ৮০ নং, ওকলে স্ট্রীটে তিনি সপ্তাহে আটটি করে ক্লাস নিয়েছিলেন। ২ থেকে ২৩ নভেম্বরের মধ্যে সকালে যেগুলি নিয়েছিলেন সেগুলি ছিল অভিজাতবংশীয়দের জন্য, সান্ধ্য ক্লাস ছিল সাধারণ নিম্নবিত্তদের জন্য। সম্ভবত মোট পঁচিশটি ক্লাস তিনি নিয়েছিলেন—তার মধ্যে মাত্র দুটির সংক্ষিপ্ত নোট মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল-এর (পরবর্তী কালে সিস্টার নিবেদিতা) কাছে পাওয়া গেছে। ১৭ অক্টোবর থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি লণ্ডনে প্রকাশ্য বক্তৃতা দিয়েছিলেন আটটি। এগুলি অবশ্য

সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল খুবই। অল্প সময় লণ্ডনে তাঁর এই অবস্থান (সব মিলিয়ে প্রায় এগারো সপ্তাহ) হলেও তিনি যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি তো করেছিলেনই, উপরন্তু উচ্চশিক্ষিত মহলে সুপরিচিত হয়ে সেখানে স্থায়ী ছাপও রেখে যেতে পেরেছিলেন। [লণ্ডনে তিনি পৌঁছে ছিলেন ১০ সেপ্টেম্বর এবং ২৭ নভেম্বর লিভারপুল থেকে জাহাজে উঠেছিলেন নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে।]

স্বামীজী সর্বাধিক ক্লাস নেন এর পরের পর্বে নিউ ইয়র্কে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর থেকে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১৮৯৫-এর ৮ এবং ১০ ডিসেম্বর তিনি কৃস্টিনা গ্রীনষ্টাইডেলকে (পরবর্তী কালে সিস্টার কৃস্টিন) পর পর দুখানা পত্রে জানান, তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতায় আর আগ্রহী নন; ধারাবাহিক ক্লাসের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতে চান। প্রকাশ্য এবং ঘরোয়া বক্তৃতা অবশ্য মাঝে মাঝে তাঁকে দিতে হচ্ছিল কিন্তু যে ক্লাসগুলি তিনি ঐকালে নিয়েছিলেন তাতে একটি পরিকল্পনা যে ছিল বেশ বোঝা যায়। মূলত, ঐ ক্লাসগুলির আলোচনাসমূহের ভিত্তিতে স্বামীজীর চারযোগের উপরে চারটি সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক রচিত হয় এবং পরবর্তী কালে CW-এর বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সিস্টার গার্গীর পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের (WT-I) সারণির হিসাবমত সর্বাধিক ক্লাস নিয়েছিলেন রাজযোগের উপরে—কুড়িটি, তারপরে (মোট সংখ্যার দিক থেকে ভক্তিযোগের উপরে ষোলটি, জ্ঞানযোগের উপরে চোদ্দটি, কর্মযোগের উপরে আটটি এবং প্রশ্নোত্তরের ক্লাস ছিল পাঁচটি) অনেকগুলি ক্লাস নিয়েছিলেন দিনে দু বার করে—সকালে কোনও এক যোগের উপরে, সন্ধ্যায় অপর এক যোগ সম্বন্ধে।

দুয়েকটি ছাড়া এই ক্লাসগুলির প্রায় সবই স্বামীজীর সমগ্র বাণী ও রচনায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য ভক্তিযোগের উপরে ১৮৯৫-এর ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৮৯৬-এর ৬ জানুয়ারির মধ্যে ছটি ক্লাস নিয়েছিলেন (প্রতি সোমবার)। এগুলি সবই ছাপানো হয়েছে ঐ CW-এ। ঐ শিক্ষার্থীদের জন্য নেওয়া সপ্তম ক্লাসটি অবশ্য ওখানে ছাপা নেই। সেটির বিররণ পাই বার্কের পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে। উন্নততর শিক্ষার্থীদের জন্য ভক্তিযোগের উপরে আরও চারটি ক্লাস তিনি নিয়েছিলেন ১৮৯৬-এর ২৭ জানুয়ারি, ৩, ১০ এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রতিদিন সকালে। এই ক্লাসগুলির আলোচিত বিষয় CW-এর অপর একটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৯৫-এর ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৮৯৬-এর ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় তিনি জ্ঞানযোগের উপর প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য মোট ৬ টি ক্লাস নেন। এদের মধ্যে প্রথমটির উল্লেখ পাই বার্কের পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এবং শেষেরটির ঐ পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে, বাদবাকি চারটি প্রকাশিত হয়েছে CW-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে। ঐ বুধবার-গুলিতেই প্রতিদিন সকালে জ্ঞানযোগের অগ্রগামী ছাত্রদের জন্য ক্লাস নেন, অধিকন্তু দুটি ক্লাস নেন ৫ এবং ১২ ফেব্রুয়ারি (বুধবার সকালে), অর্থাৎ এই ছাত্রদের জন্য আটটি জ্ঞানযোগের ক্লাস নেন। এদের চারটি প্রকাশিত হয়েছে, একটি CW, Vol-I-এ; দুটি Vol. III-তে এবং আর একটি Vol-VI-এ।

কর্মযোগের উপরে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য ধারাবাহিক ক্লাস নেন ১৮৯৫-এর ১৩ ডিসেম্বর থেকে ১৮৯৬-এর ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় এবং ঐ

দিনগুলিরই প্রতি সকালে তিনি কর্মযোগের উপরে ক্লাস নেন (৪+৪ = ৮ টি মোট)। এছাড়া ২৪ জানুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তর ক্লাসও নেন। এদের মোট সংখ্যা পাঁচ—কোনও বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়নি।

অনুরূপভাবে রাজযোগের উপরে প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাস নিতে থাকেন প্রতি শনিবার সন্ধ্যায়—১৮৯৫-এর ১৪ ডিসেম্বর থেকে ১৮৯৬-এর ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এগুলির মোট সংখ্যা দশ। এদের মধ্যে শেষের তিনটির কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। বাকি সাতটির সবই প্রকাশিত হয়েছে CW-এর প্রথম খণ্ডে। ঐ দিনগুলিরই প্রতিটি সকালে রাজযোগের অগ্রগামী ছাত্রদের ক্লাসও নেন। এদের মোট সংখ্যাও দশ—সবগুলিই প্রকাশিত হয়েছে।

উপরের তালিকার থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়, স্বামীজী তাঁর আচার্যের ভূমিকার উপরে ঐকালে কতখানি জোর দিয়েছিলেন। কত সুশৃঙ্খলভাবে তিনি এটি বিন্যস্ত করেছিলেন তাও বিশেষ লক্ষণীয়। বস্তুতপক্ষে তাঁর নিউ ইয়র্কের এই ক্লাসগুলিতেই আচার্যের ভূমিকার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিফলন। তিনি নিজেও একদা কথায় কথায় বলেছিলেন, চারটি যোগের উপরে আমি যেসব ক্লাস নিলাম এবং বক্তৃতাদি দিলাম, তা আমি চলে যাওয়ার পরেও পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা পাবে। তাঁর এই উক্তি যে কতখানি সত্য, তা প্রায় শতবর্ষ পরেও আমরা বেশ বুঝতে পারছি।

সৌভাগ্যক্রমে, এইসব ক্লাসের অধিকাংশই সংরক্ষিত হয়েছে তিন ব্যক্তির অনলস পরিশ্রমের ফলে। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় মিস ওয়াল্‌ডোর, যিনি অন্তত ১২/১৪ ঘন্টা শুধু স্বামীজীর কাজের জন্যই ব্যয় করতেন। একাধারে স্বামীজীর জন্য রান্না করা, তাঁর ক্লাসগুলির সুবন্দোবস্ত করা, তাদেব আলোচ্য বিষয়ের উপরে যথাসাধ্য নোট নেওয়া, টাকাকড়ির হিসাবপত্র রাখা, কোনও কোনও যোগের (যথা, রাজযোগের পতঞ্জলিব যোগসূত্রের অনুবাদ) সম্বন্ধে স্বামীজীর কাছে স্বতন্ত্রভাবে বসে অনুলিখন করা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ তিনি দিনের পর দিন করেন। দ্বিতীয়জন যিনি এই ক্লাসগুলি সম্পর্কে প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন, তিনি হলেন স্বামীজীর শিষ্য লির্য় ল্যাণ্ডসবার্গ (তখন তাঁর সন্ন্যাস নাম হয়েছিল স্বামী কৃপানন্দ—সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজী তাঁকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিয়েছিলেন)। ক্লাসের বিজ্ঞাপন দেওয়া, ঘন্টার পর ঘন্টা ক্লাসে আলোচিত বিষয়গুলি টাইপ করা, চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি কাজে তিনিও প্রচুর সময় ব্যয় করেছিলেন। তৃতীয় যে ব্যক্তির নাম এইপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তিনি হলেন স্বামীজীর বিশ্বস্ত ও অনুগত সেবক ও শিষ্য জোশিয়া জন গুডউইন বা সংক্ষেপে জে. জে. গুডউইন। ঐকালে স্বামীজী তাঁর ব্রিটিশ শিষ্য মিঃ স্টার্ডিকে তাঁর ক্লাস নেবার সুবিধার জন্য নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা ও ক্লাসগুলির অনুলিখন পাঠাচ্ছিলেন। স্টাডি কিন্তু ঐ অনুলিখনগুলির ভিত্তিতে স্বামীজীর বিনা অনুমতিতেই 'কর্মযোগ' ও 'ভক্তিযোগ' নাম দিয়ে দুটি ছোট বই (ভাল বাঁধাই করা) এবং 'রাজযোগ' নাম দিয়ে একটি পুস্তিকা (pamphlet) লণ্ডনে ছাপিয়ে বের করেন। এর ফলে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির (যাঁদের স্বামীজী এগুলি পুস্তক আকারে প্রকাশের ভার আগেই দিয়ে রেখেছিলেন) সঙ্গে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হয় এবং স্বামীজীও অপ্রস্তুত হন। ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু এতেও শাপে বর হয়েছিল কারণ স্বামীজী তাঁর কতকগুলি ভাষণে

তথাকথিত অলৌকিক ব্যাপার এবং কুসংস্কারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন যা ঐ অনুলিখনগুলির ভিত্তিতে প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে থেকে গেছে।

প্রতিটি যোগের আলোচনার সময়েই স্বামীজী নিয়মিত অভ্যাস ও সাধনের উপরে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কেবলমাত্র তত্ত্ব আলোচনা করলে ধর্মপথে বিশেষ অগ্রসর হওয়া যায় না একথা বারবার শিক্ষার্থীদের তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। চারযোগের লক্ষ্য একই অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ বা আত্ম-সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করা। মানবপ্রকৃতির তারতম্যের জন্যই এক একজনের অভীষ্ট পথ এক এক রকম হচ্ছে, যেমন কট্টর যুক্তিবাদী যারা, তাদের পথ হল জ্ঞানযোগ ; নিষ্কাম নিরলস কর্মীদের জন্য কর্মযোগ ; পূজা, উপাসনা এবং সাকার বিশ্বাসীদের জন্য ভক্তিযোগ এবং দেহাতীত অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির জন্য আকুল পথিকের পক্ষে রাজযোগ। এই চারযোগের মধ্যে কোনটিই ছোট বা বড় নয়। এদের যে কোনও একটিকে ধরে ঠিক ঠিক মতো এগুতে পারলে একই কেন্দ্রে বা লক্ষ্যে গিয়ে পৌছানো যাবে।

সিস্টার দেবমাতা স্বামীজীর নিউ ইয়র্কে উপরি-উক্ত ক্লাস ও বক্তৃতাগুলি সম্বন্ধে অতিরিক্ত কিছু সংবাদ ১৯৩২ সালের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় (পৃঃ ১৯২) দিয়েছিলেন। শ্রীমতী বার্ক তাঁর পুস্তকেব তৃতীয খণ্ডে তার উল্লেখ করেছেন। এই পর্বের ক্লাসগুলি শেষ হওয়ার পরে স্বামীজী 'My Master' (মদীয় আচার্যদেব) শীর্ষক বক্তৃতাটি দেন ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি। মনে করা হত এটি দিয়েই তাঁর তখনকার মতো কাজ শেষ হয় এবং নিউ ইয়র্কে মূল কাজের অবসান হয় কিন্তু দেবমাতা ঐ পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে জানিয়েছিলেন যে, 'My Master' বক্তৃতাটির দুই-এক দিন পরে মিস্ করবিন-এর গৃহে একটি ঘরোয়া বৈঠকের আলোচনা দিয়ে তাঁর কাজের সমাপ্তি ঘটে। ঐ গৃহে তিনি নাকি মোট ছটি ঘরোয়া ক্লাস নিয়েছিলেন (আলোচনার বিবরণ পাওয়া যায়নি)। ১৮৯৫ এর ৯ ডিসেম্বর থেকে ১৮৯৬ এর ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত (করবিনের গৃহের ক্লাসগুলি সহ) তিনি অন্যূন সত্তরটি ক্লাস নেন এবং দশটি প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন। এছাড়া, বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, পত্রালাপ, দীক্ষাদান ইত্যাদি তো ছিলই। তাঁর বাণীকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য তিনি মাত্র আড়াই মাসকালের মধ্যে কী কঠিন প্রয়াস ও অতিমানবিক পরিশ্রম করেছিলেন, তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

শ্রীমতী বার্কের পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের শেষে তিনি যে সারণিটি দিয়েছেন তার অন্তর্ভুক্ত ক্লাসগুলির একটা সামগ্রিক রূপ উপরের আলোচনাতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখন ঐ সারণির অন্তর্গত প্রকাশ্য ও ঘরোয়া বক্তৃতাগুলি সম্পর্কে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র আঁকার চেষ্টা করব। সারণিটির মধ্যে যেসব বক্তৃতার উল্লেখ আছে তাদের সময়সীমা ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর থেকে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতা যেগুলি দিয়েছিলেন তার মধ্যে ষোলটি CW-এর বিভিন্ন খণ্ডে (১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৮) প্রকাশিত হয়েছে। সারণিতে মোট প্রকাশ্য বক্তৃতার সংখ্যা পাচ্ছি ৩২। এগুলির মধ্যে বেশির ভাগই প্রদত্ত হয়েছিল নিউ ইয়র্ক, ব্রুকলিন ও লণ্ডনে। যেগুলি CW-এ প্রকাশিত হয়েছে তারও প্রায় সবগুলিই এই তিন স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী। সারণিটিতে ঘরোয়া বক্তৃতা যা পাচ্ছি, তার সংখ্যা খুব বেশি নয়—সর্বসাকুল্যে আটটি

মাত্র ; এদের কোনটিই CW-এ স্থান পায়নি।

এবারে আমরা আসছি সিস্টার গার্গীর পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে। এটিকে তিনি World Teacher-II বা সংক্ষেপে WT-2 আখ্যায় ভূষিত করেছেন। এই খণ্ডের শেষে যে সারণিটি দিয়েছেন তাতে দেখছি, স্বামীজীর কোনও কোনও ক্লাসের স্থান পরিবর্তন হয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ ক্লাস তিনি এই পর্বে লণ্ডনেই নিয়েছিলেন। তুলনায় আমেরিকার ক্লাস ও বক্তৃতার সংখ্যা অনেক কম। ক্লাসে আলোচনার ধরন বেশ পরিবর্তিত হলেও পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতি ও ধারাবাহিকতা অটুট আছে। প্রাথমিক ও অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের জন্য স্বতন্ত্র ক্লাসের ব্যবস্থা এই পর্বে দেখা যায় না। পতঞ্জলির যোগসূত্র, নারদীয় ভক্তিসূত্র বা বেদান্তসূত্র প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি ধরে ধরে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এই ক্লাসগুলিতে আর দেখা যায় না। ক্লাসে আলোচিত বিষয়গুলির কিছু কিছু নমুনা দিলেই এটি বোঝা যাবে। আর একটি বিষয়ও এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, তিনি কোনও কোনও বিষয় যথা 'একটি বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ' (The Ideal of a Universal Religion), 'ফলিত বা কর্মে পরিণত বেদান্ত' (Practical Vedantism) প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের উপরে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিভিন্ন যোগের (ভক্তিযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি) উপরে স্বতন্ত্র ক্লাস নিলেও তাদের সংখ্যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ের চাইতে অনেক কম। অধিকাংশ ক্লাস ও বক্তৃতাগুলি স্বতন্ত্র শিরোনামযুক্ত। এখানেও দেখতে পাই, স্বামীজীর বেশ কিছু বক্তৃতা ও ক্লাসের বিবরণ হারিয়ে গেছে। অবশ্য CW ও 'বাণী ও রচনা' তে যেগুলি উল্লিখিত হয়েছে, তাদের সংখ্যাও কম নয়।

WT-2-এব ক্লাস ও বক্তৃতা শুরু হয়েছে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ মার্চ থেকে, আর শেষ হয়েছে ১০ ডিসেম্বর। সূত্রপাত আমেরিকার চারটি শহরে যথাক্রমে ডেট্রয়েট, বস্টন, শিকাগো ও নিউ ইয়র্ক। শহরে ক্লাস অথবা বক্তৃতা দিচ্ছেন ৪ মার্চ থেকে ১৩ এপ্রিলের সময়সীমার মধ্যে। আর লণ্ডন ও তাব সন্নিহিত অঞ্চলে তিনি ক্লাস ও বক্তৃতা দেন দুটি পর্যায়ে—প্রথম ৭ মে থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ১৩ অক্টোবর (?) থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এখন কোথায় কোথায় কতগুলি ক্লাস নিয়েছিলেন এবং কোন কোন বিষয়ের উপর তিনি এই পর্বে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তাদের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করে নিবন্ধের উপসংহার টানব।

আমরা উপরি-উক্ত সারণিতে দেখি, তিনি ডেট্রয়েট শহরের রিশিলিউ হোটেলে ৪ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত ক্লাস নিয়েছিলেন কিন্তু ঐ ক্লাসগুলি সম্পর্কে কোনও বিবরণ পাওয়া যায়নি। এর পরে বস্টনে মিসেস ওলি বুলের (ধীরামাতা) ১৬৮ নং ব্র্যাটল স্ট্রীটের বাড়িতে ২২ ও ২৪ মার্চ ক্লাস নেন। ২৮ মার্চ সন্ধ্যায় উপনিষদের উপরে ক্লাস নিয়েছিলেন কেম্‌ব্রিজে। এর অতিরিক্ত সংবাদ এই ক্লাসগুলি (যথাক্রমে ২২, ২৪ ও ২৮-এর) সম্পর্কে মেলেনি। আবার ক্লাসের স্থান পরিবর্তন লক্ষ্য করি—২ এপ্রিল সকাল ৯ টা ও সন্ধ্যা ৯ টায় যথাক্রমে ফ্লোরেন্স অ্যাডামস্ এবং ডঃ এইচ. এস পার্কিনস-এর বাড়িতে। এর পরে ১৩ এপ্রিল নিউ ইয়র্কে মিসেস ফিলিপ্‌স্-এর গৃহে 'বেদান্ত ও তার আমেরিকায় প্রসারের সম্ভাবনা'—এই বিষয়ের উপর একটি ক্লাস নেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, ঐ ক্লাসগুলিতে আলোচিত বিষয়াবলীর কোনও বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়নি। তখনকার মতো আমেরিকার

ক্লাস এখানেই শেষ।

সিস্টার গার্গী WT-I-এ লিখেছেন যে, ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যে ক্লাসগুলি স্বামীজী নিয়েছিলেন তাদের ভিত্তিতেই তাঁর কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ—এই বইগুলি রচিত হয়েছে। এছাড়া 'জ্ঞানযোগ' বইটিও এদের ভিত্তিতে এবং তৎসহ সাতটি প্রকাশ্য বক্তৃতার অনুলিখন মিলে তৈরি হয়েছে। তিনি ধাপে ধাপে তাঁর বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা পাশ্চাত্য শ্রোতাদের কাছে খুব সচেতনভাবে তুলে ধরার প্রয়াস করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, যদিও তিনি মানবপ্রকৃতির চারটি প্রধান প্রবণতা অনুযায়ী চারটি যোগেরই সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করেছিলেন কিন্তু জ্ঞানযোগকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন, কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও বিজ্ঞানে উন্নত মানবকুল যুক্তি-বিচারকেই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করতেন।

স্বামীজীর সমগ্র বাণী ও রচনার গঠনের দিক থেকে ১৮৯৬-এর ৪ মার্চ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত ক্লাসগুলির কোনটিই প্রকাশিত হয়নি। এই বছরেই ৭ মে থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত তিনি লণ্ডনে অনেকগুলি ক্লাস নেন। এতেও ভক্তিযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির উপরে আলোচনা করেন কিন্তু মাত্র তিনটি ছাড়া তাদের কোনও বিবরণ পাওয়া যায়নি। WT-2-এর একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় সেকশনে ৭ মে-র (সকালে ও সন্ধ্যায়) দুটি বক্তৃতার 'History of the Aryan Race' এবং 'Influence of Vedanta on Western Thought' নাম আছে। সিস্টার গার্গী এ দুটির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছেন। ১৪ মে-র সকালের একটি মাত্র বক্তৃতা 'Methods & Purpose of Religion' প্রকাশিত হয়েছে CW-এর ষষ্ঠ খণ্ডে। সব বক্তৃতাগুলিই হয়েছিল লণ্ডনের ৬৩ নং, সেন্ট জর্জেস রোডে। এর পরে লণ্ডনে ৩৯ নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে তিনি ১৩ অক্টোবর থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত যে ক্লাসগুলি নিয়েছিলেন তার প্রতিটিই প্রায় CW-তে প্রকাশিত হয়েছে। তাদের গুরুত্ব তাই আজও অম্লান।

লণ্ডনের ৩৯ নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে স্বামীজীর এই ক্লাসগুলির অপরিসীম গুরুত্ব আমরা অনুধাবন করতে পারি তিনটি কারণে (১) মাত্র দুটি ছাড়া আর সবগুলিই স্বামীজীর CW-এর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে; (২) প্রত্যেকটি বক্তৃতার শিরোনাম ইংরেজীতে (বাংলায় অনুবাদগুলি বর্তমান আছে); দেওয়া আছে; (৩) এগুলিতে তাঁর শিক্ষার পরিপূর্ণ প্রতিফলন হয়েছে—শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ, তিনটি প্রধান উপনিষদের সাহায্যে ঈশ্বরোপলব্ধি, আত্মার স্বাধীনতা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রভৃতি তত্ত্বের স্বকীয় বিশ্লেষণ এবং বেদান্তের উপর নূতন আলোকপাত ও তাকে দৈনন্দিন জীবনে রূপায়িত করার কৌশল ['বনের বেদান্তকে ঘরের বেদান্তে রূপান্তরিত করার আদর্শ'] প্রভৃতির আলোচনায় স্বামীজী নূতন মাত্রা সংযোজন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই বক্তৃতাগুলির একটু বিশদ আলোচনা আমাদের করতেই হবে, কিন্তু তৎপূর্বে আমরা স্বামীজীর ঐ বছরের গ্রীষ্মে ইউরোপ পরিভ্রমণের দু-চারটি কথা বলে নেব কালানুক্রমিতা বজায় রাখার জন্য। এছাড়া, ঐ পরিভ্রমণের শেষে লণ্ডনে আরও যেসব ক্লাস (উপরিলিখিত সারণি বহির্ভূত) তিনি নিয়েছিলেন তারও কিছু সংবাদ দিয়ে অবশেষে ঐ বিশদ আলোচনায় আসব।

ক্রমাগত বক্তৃতা দিতে দিতে এবং বহুবিস্তৃত স্থান জুড়ে পরিভ্রমণ করতে করতে

স্বামীজী ঐ বছরের জুলাই-এর মাঝামাঝি খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই কারণে তিনি তিনজন ব্রিটিশ সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপ পরিব্রাজনে বেরিয়ে পড়েন। ঐ তিনজন সহযোগী হলেন—মিস মূলার, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও তদীয় পত্নী মিসেস সেভিয়ার। ১৯ জুলাই রবিবার অপরাহ্ণে তাঁরা ইংলণ্ডের ডোভার বন্দর ছেড়ে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ফ্রান্সের ক্যালে বন্দরে উপনীত হন। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে তাঁরা প্যারিসে যান। সেই রাত্রিটা ওখানে এক হোটেলে কাটিয়ে পরের দিন ট্রেনে সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা অভিমুখে রওনা হন। সেখানে গিয়ে লেম্যাঁ হ্রদের তীরে এক হোটেলে আশ্রয় নেন—আল্‌প্‌স্ পর্বতের নয়নাভিরাম দৃশ্য সম্মুখেই। লণ্ডনের কর্মব্যস্ততা ও বড় শহরের হৈ চৈ ছেড়ে এসে স্বামীজী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এই যাত্রায় তিনি প্রায় দু'মাস কন্টিনেন্ট সফর করেন। জেনিভা, লুসার্ণ (সুইজারল্যাণ্ড) থেকে তিনি জার্মানি পৌছান। সেখানে হাইডেলবার্গ, কোলন, কিয়েল, বার্লিন ও হামবুর্গ থেকে লণ্ডনে ফিরতি পথে হল্যাণ্ডের আমস্টার্ডাম শহর হয়ে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। লণ্ডনে তাঁর প্রত্যাবর্তনের তারিখ হল ১৭ সেপ্টেম্বর। এরপরেই শুরু হল লণ্ডনে তাঁর সর্বাধিক ফলপ্রসূ ক্লাসপর্ব।

লণ্ডনের ঐ ৩৯ নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে ১৪ অক্টোবর থেকে ১৮ নভেম্বরেব মধ্যে প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় তিনি আর চার-পাঁচটি ক্লাস নেন, তার মধ্যে তিনটি প্রকাশিত হয়েছে। দুটি CW-এ 'Reason and Religion' এবং 'Vedanta and Privilege.' এই শিরোনামে। তৃতীয় আর একটি প্রকাশিত হয়েছে 'The Absolute and Manifestation' এই নামে। 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' এই নামেও একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন—সঠিক স্থান ও তারিখেব উল্লেখ নেই। তবে এই বক্তৃতার সারাংশ 'My Master' নামক বক্তৃতাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে CW-IV-এ। WT-2 তে উল্লেখ আছে ১২ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রতি সোমবার অপরাহ্ণে তিনি মিস মূলারের 'এয়ারলি লজ' নামক বাসভবনে ক্লাস নিয়েছিলেন—এগুলি সম্পর্কে অবশ্য কোনও প্রামাণ্য তথ্য মেলেনি। ঐ ক্লাসগুলি ছাড়া ৬ অক্টোবর থেকে ১০ ডিসেম্বর এর মধ্যে উইম্বলডনে, ওয়েস্ট ক্রয়ডন ও লণ্ডনে তিনি কয়েকটি বক্তৃতাও দেন তাদের মধ্যে একটি উইম্বলডনে, তিনটি লণ্ডনে এবং ৮ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত রবিবার সকালে (কয়টি জানা নেই) ওয়েস্ট ক্রয়ডনে। লণ্ডনের বক্তৃতাগুলি হয়েছিল সিসেমি ক্লাবে (Sesame Club)। এদের মধ্যে একটিমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। উইম্বলডনের বক্তৃতাটি হয়েছিল মিস মূলারের ভবনে (Airlie lodge) ৬ অক্টোবর। এটিও ছাপানো হয়েছে "Vedanta as a Factor in Civilisation" এই শিরোনামে।

স্বামীজী ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত লণ্ডনে যে ক্লাসগুলি নিয়েছিলেন প্রতিদিন সকালে, তার মধ্যে এগারোটি ছাপানো হয়েছে তাঁর ইংরেজী CW-এর দ্বিতীয় খণ্ডে 'জ্ঞানযোগ' এই শিরোনামে। একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়—তা হল তিনি নিউ ইয়র্কের ক্লাসগুলির শুরুতে (১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি-জুন) জ্ঞানযোগের আলোচনা করেছিলেন, লণ্ডনের এই ক্লাসগুলিও কিন্তু 'জ্ঞানযোগ' দিয়েই শেষ হয়েছে। আরম্ভ ও সমাপ্তির মধ্যে অদ্ভুত এক সামঞ্জস্য রয়েছে, অবশ্য সমাপ্তিতে 'মায়াবাদ', 'ফলিত বেদান্ত' (Practical Vedantism), প্রভৃতি আলোচনাতে কিছু অতিরিক্ত মাত্রা সংযোজিত

হয়েছে। এই অতিরিক্ত মাত্রাগুলির উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করব। পাশ্চাত্য দুনিয়ার কাছে 'জ্ঞানযোগ' সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, বোধ হয় একথা তাঁর মনে ছিল। এ দুনিয়ায় শিক্ষার সমধিক বিস্তার, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও যুক্তিবিচারের উপরে, নির্ভরশীলতার উপরে মাত্রাধিক ঝোঁক বোধ হয় তাঁকে এই বিশেষ যোগটির উপরে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়েছিল। 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে' এবং 'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি' প্রভৃতি গীতার বাণীতেও অবশ্য স্বামীজীর এরূপ কার্যের সমর্থন মেলে। আমরা দেখি ১৫, ২০ এবং ২২ অক্টোবর (১৮৯৬ খ্রীঃ) স্বামীজী মায়াবাদের উপরে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই তিনটিই প্রকাশিত হয়েছে CW-2 তে।

স্বামীজী 'কর্মে পরিণত বেদান্তে'র উপরে যে চারটি বক্তৃতা লণ্ডনে দিয়েছিলেন, তার সারসংক্ষেপ দিয়ে তাঁর বিশ্বাচার্যের ভূমিকায় আলোচনা শেষ করব। এই চারটিই প্রকাশিত হয়েছে। বক্তৃতাগুলি তিনি দিয়েছিলেন যথাক্রমে ১০, ১২, ১৭, ১৮ নভেম্বর, ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে যার মমার্থ হলঃ

(ক)— তত্ত্বকে যদি বাস্তবে প্রয়োগ করা না যায় তো তার কোনও মূল্য নেই, তা একরকম মননবিলাস বা কসরৎমাত্র। বেদান্ত কেবল তত্ত্বমাত্র নয়, বাস্তবেও প্রযোজ্য।

(খ)— বেদান্ত তত্ত্বকে কী বাস্তবে প্রয়োগ করা যায়?

(গ)— স্বামীজীর নিঃসংশয় উত্তর—হাঁ, যায়; তবে সাধনসাপেক্ষ।

(ঘ)— ধর্মীয় জীবন ও বাস্তবজীবন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোঠায় পড়ে—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কারণ একই সত্য—বাস্তবে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন।

(ঙ)— সমগ্র মানবজীবনকে যা ধরে রাখতে সক্ষম, তাই হল ধর্ম। বেদান্ত এমন একটি ধর্ম যা বনের মুনিঋষিদের একচেটিয়া সম্পদ নয়। জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে এক সামগ্রিক ঐক্যানুভূতির দিক থেকে। স্বামীজীর এখানে বিশেষ অবদান তাঁরই ভাষায়ঃ 'বনের বেদান্তকে ঘরের বেদান্তে পরিণত করতে হবে।'

(চ)— প্রাচীনকালে রাজকার্যে সদাব্যস্ত সংগ্রামরত রাজন্যগণ এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন না শুধু, ঋষিপুত্রদের তাঁরা এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

(ছ)— বেদান্ত কোনও পাপ স্বীকার করে না, ভ্রম বা ভ্রান্তি স্বীকার করে। প্রত্যেক মানুষই কিছু না কিছু ভুল করে, আবার ভুল শুধরাবার ক্ষমতাও তার আছে। 'দেয়াল কখনও চুরি করে না', 'গরু কখনও মিথ্যে কথা বলে না', তাই বলে তারা মানুষের চাইতে বড় নয়। মানুষ চুরি করতে পারে, মিথ্যা বলতে পারে, আবার তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিরতও থাকতে পারে।

(জ)— বেদান্তের চরম আদর্শ হল, সর্বভূতে আত্মদর্শন। এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হবার অধিকাব প্রত্যেকের তো আছেই। শুধু-তাই নয়, জেনে হোক, না জেনে হোক, প্রত্যেকেই এই চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে— 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'।

(ঝ)— তাই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যদর্শন এবং উপলব্ধি—এই হল নিখিল মানবের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

(ঞ)— এই ঐক্যবোধ পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি (যা হল পরমপ্রেমরূপা এবং অমৃতস্বরূপা)-তে পর্যবসিত হয়।

(ট)— সুতরাং ধর্ম হল উপলব্ধি, এটি কেবল কথার কথা নয়, তত্ত্বমাত্র নয়, শুধু শোনা বা স্বীকার করে নেওয়া নয় ; বাস্তব কর্মময় জীবনে সত্যিকারের ধার্মিক হয়ে ওঠা।

স্বামীজী তাঁর ক্লাস ও বক্তৃতাবলীকে একটি নির্দিষ্ট ছকে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন যাতে সেগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়। দুটি বিষয়ে তিনি বিশেষ সতর্কতাও অবলম্বন করেছিলেন, সাংবাদিকদের বিভিন্ন সময়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বারবার একটি কথা জোর দিয়ে বলতেন। তা হল কোনও নূতন ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তন করতে তিনি আসেননি ; চিরন্তন সত্য বা সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দিক যা তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি এবং গুরুকৃপায় তাঁর নিকট উদ্ভাসিত হয়েছে, তাই তিনি প্রচার করেছেন। স্বামীজীর মতে যে কোনও মানুষ তাঁর নিজস্ব ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেই এই চারযোগের এক বা একাধিক পথে অগ্রসর হতে পারেন। ঈশ্বরোপলব্ধিই ধর্মের সারকথা। দ্বিতীয় সতর্কতা ছিল, কোনও অলৌকিকতা বা অতীন্দ্রিয়বাদের প্রশ্রয় না দেওয়া। ধর্মের নামে কোনও যাদুবিদ্যা বা চালাকিকে তিনি আলোচনায় স্থান দেননি। বহুবার 'The Science of Religion' বা 'ধর্মের বিজ্ঞান' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রতি ধর্মেরই তিনটি দিক আছে এবং থাকবেও— ১। পৌরাণিক বা mythical, ২। আচার-অনুষ্ঠানগত বা ritualistic এবং ৩। দার্শনিক বা philosophical বা metaphysical. স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী এই তিনটি দিকেই বিভিন্ন পার্থক্য ছিল, আছে এবং থাকবে। তৎসত্ত্বেও একটি মৌল ঐক্যানুভূতি এবং এক বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ যুক্তিবাদী মানুষের সম্মুখে তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন মানবসংহতি, মানবকল্যাণ ও মানবপ্রগতির জন্য। এপ্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, উদার, শিক্ষিত পাশ্চাত্যবাসী যাঁরা যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হতে চান, তাঁদের সঙ্গেই স্বামীজীর বিশেষ যোগাযোগ হয়েছিল। তাই অন্যান্য যোগের সুষ্ঠু আলোচনা করলেও তিনি সামগ্রিক বিচারে জ্ঞানযোগ বা বেদান্তের উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁর বাণীর মর্মকথা বা শেষকথা হল Practical Vedanta বা ফলিত বেদান্ত।

মেরী লুইস বার্ক (সিস্টার গার্গী) তাঁর প্রায় জীবনব্যাপী গবেষণার ফসলস্বরূপ "New Discoveries" এর দুটি খণ্ড WT-1 এবং WT-2-এ Author's Note-এর উপসংহারে লিখেছেন ঃ "Indeed, in writing these books I have often felt that I have been attempting to empty the ocean with a blade of grass ; but if only a few drops of that immense ocean have fallen upon these pages, if I have succeeded in bringing something of Swamiji into them for the delight of his devotees, then my efforts will not have been in vain." (Author's Note, vol 3. pp. XVIII).

বাস্তবিকই স্বামীজীর মতো দিব্যশক্তিতে উদ্বুদ্ধ আচার্য স্বদেশ বা বিদেশে ঘরোয়া বা আনুষ্ঠানিক—যে পরিবেশেই আলোচনা ও সৎপ্রসঙ্গ করেছেন সেখানে প্রত্যেকেই তাঁর কাছ থেকে জীবনপথের অমূল্য পাথেয় সংগ্রহ করেছে—স্বামীজীর সেই দিব্যবাণী বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীর চিন্তাস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করবে, আমরা তার সামান্য দিগ্‌দর্শনই করাতে পারি মাত্র।

ক্রুশবিদ্ধ বিবেকানন্দ

নচিকেতা ভরদ্বাজ

মানবসভ্যতার ইতিহাসকে যাঁরা নিয়ন্ত্রিত করেছেন, জীবন ও জগতকে দেখার একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দান করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনজন মহামানবের কথা আমাদের একই সঙ্গে মনে পড়ে—গৌতম বুদ্ধ, যীশুখ্রীস্ট এবং স্বামী বিবেকানন্দ। বহিরঙ্গ রূপাবয়বেও এঁদের মধ্যে রয়েছে আশ্চর্য মিল। ধ্যানী বিবেকানন্দ এবং ভগবান বুদ্ধের রূপ তো অনেক সময়ে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। কিন্তু অন্তরঙ্গ বিচারে যীশুখ্রীস্টের মহাজীবনের সঙ্গেই যেন স্বামীজীর মিল রয়েছে অনেক বেশি। 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' মানবকল্যাণের জন্য, মানুষের সর্বাত্মক বন্ধন বিমোচনের প্রয়োজনে যদিও এঁরা তিনজনেই তাঁদের জীবন-যৌবন-ধন-মান সবকিছুই উৎসর্গ করে আত্মাহুতি দিয়ে গেছেন, পুরাণের দধীচির মতই এঁদের এই নীরব নিঃশর্ত আত্মদানের কোনও তুলনা নেই, তবু জীবনের পৃষ্ঠা ওল্টালে খ্রীস্টকে এবং বিবেকানন্দকে অনেকটাই একই পথের অভিযাত্রী বলে মনে হয়। মানুষের জন্য অশেষ দুঃখযন্ত্রণার যদি কোনও শরীরী রূপ কল্পনা করা যায়—তবেই আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারব যীশুকে এবং স্বামীজীকে। অনন্ত দুঃখ বহন করার ক্ষমতারই অন্য নাম যদি প্রতিভা হয়, তাহলে এমন প্রতিভাধর পুরুষ পৃথিবীতে আর কেউ জন্মেছেন বলে আমাদের জানা নেই। স্বামীজীর নিজের রচিত কবিতার সেই অসাধারণ পঙ্ক্তি দুটির কথাই মনে পড়েঃ 'যত উচ্চ তোমার হৃদয়—তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়। হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান।' সমুদ্রের মতো, আকাশের মতো এক বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন বলেই নিখিল মানবের দুঃখ-যন্ত্রণা-আঘাতের দায়ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন তাঁর প্রেমিক গুরুর হাত থেকে। দুরূহতম দায়িত্বের ক্রুশদণ্ডভার বহন করে বিবেকানন্দকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল একই সঙ্গে ভারত ও বিশ্ব পরিক্রমায়। যথার্থ উচ্চ হৃদয়, নিঃস্বার্থ একজন প্রেমিকের হীন স্বার্থসর্বস্ব লোভলোলুপ এই জগৎ-সংসারের কাছ থেকে যতটুকু প্রাপ্য তাই এঁরা দুজনই পেয়েছেন এবং এইসব নির্যাতন ও আঘাতকে ঈশ্বরের দান বলেই মাথা পেতে সানন্দে গ্রহণ করেছেন। কবি লিখেছেনঃ 'অলৌকিক আনন্দের ভার/বিধাতা যাহারে দেন তার বক্ষে বেদনা অপার/তার নিত্য জাগরণ।' অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা এঁদের দিয়েছিলেন বলেই সারাটা জীবন ধরে অপার বেদনার ক্রুশদণ্ড বহন করে যেতে হয়েছে এঁদের এবং তা স্বেচ্ছায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় যে কথা লিখে গেছেন, মনে হয়, তা এঁদের মহাজীবনেরই জ্বলন্ত দিব্য বাণীরূপ ঃ "ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান / বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান ; / সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি / যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি / আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক। তাহারে অন্তরে রাখি / জীবন কন্টক পথে যেতে হবে নীরবে একাকী, / সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি, বিরলে মুদিয়া অশ্রু আঁখি, / প্রতি দিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি, / সুখী করি সর্বজনে।"

যদিও শাস্ত্র বলেছেন ঃ 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি', 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই' কিন্তু নিঃশেষে প্রাণ দান করার আগে যে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয় মহাজীবনের পবিত্র অভিযাত্রীকে, তা শুধু কন্টকাকীর্ণ 'ক্ষুরস্য ধারা' বললে কিছুই বলা হয় না, বড়ই দুরূহ কঠিন সে পথ-পরিক্রমা। অসাধারণ পুরুষ ছাড়া সে পথের ক্লেশ, দুঃখ-যন্ত্রণা-আঘাত অন্য কেউ সহ্য করতে পারবেন না। ইতিহাস এঁদের চিরকাল স্মরণে রাখে। এঁরা আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে যে আলোক রচনা করে যান—সেই আলোকপথ ধরেই এগিয়ে চলে সমগ্র মানবসমাজ, গোটা পৃথিবী। তবে জীবনের সমস্ত দুর্গতিকে এঁরা যেভাবে সদ্‌গতিতে রূপান্তরিত করে চলে যান—সে বড় কঠিন তপশ্চর্যা। এই ত্রয়ীর জীবনেই রয়েছে সেই আপাতবিনাশকারী মহাতপস্যার আগ্নেয় ইতিবৃত্ত। মানবমুক্তির প্রয়োজনে হৃদয়ের গভীরে শুদ্ধ প্রেমের পারিজাতটিকে সযত্নে সংরক্ষণ করে এঁরা যে শুধু স্বেচ্ছায় অনন্ত দুঃখযন্ত্রণা বরণ করে নেন তাই নয়—বুদ্ধকে যেমন মারের কাছে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, ঠিক তেমনি কিংবা ততোধিক নির্মমভাবে ঈশ্বর স্বয়ং নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেন এইসব পরিত্রাতা মহাপুরুষদের, তাঁর প্রিয় ভক্তদের। রাজার ঘরে জন্মেছিলেন গৌতম বুদ্ধ, সুখে রাজৈশ্বর্যে কেটেছে তাঁর শৈশব, কৈশোর, এমনকি যৌবনেরও অনেকটা; স্বেচ্ছায় বৃত দুঃখযন্ত্রণা শুরু হয়েছিল অনেক পরে। বিবেকানন্দের শৈশব-কৈশোরও কেটেছে ধনী পিতার আশ্রয়ে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে। কিন্তু খ্রীস্ট-প্রভুর দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতনের শুরু জন্মলগ্ন থেকেই। বনের পশুরও মাথা গোঁজবার জন্য রয়েছে গুহা, পাখির রয়েছে বৃক্ষশাখায় নীড় কিন্তু পরিত্রাতা ঈশ্বরপুত্রের কোথাও এতটুকু আশ্রয় মিলল না—তাঁকে জন্ম নিতে হল গোশালায়—অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে আস্তাবলে এবং তারপর থেকেই দুর্দিনের অশ্রুজলধারা অবিরাম ঝরে পড়েছে তাঁর শিরে। গলগাথার প্রান্তরে নিজের কাঁধে বহন করে নিয়ে গেছেন যে ক্রুশকাষ্ঠ—তাতেই বিদ্ধ করা হল তাঁকে এবং এর সাতদিন পর তাঁর পুনরভ্যুত্থান।

বিবেকানন্দের জীবনে নির্যাতন, অপমান, দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণার শুরু গুরুর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে। শিকাগো বিজয়ের পূর্বে ও পরে এই দুঃখভোগ ও আঘাত-নির্যাতনের রূপ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। গুরুর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও সর্বস্ব-ভাস্যানো ভালবাসার দায়ভাগ হৃদয়ে লালন করে স্বেচ্ছায় সানন্দে গুরুপ্রদত্ত যুগধর্মের পতাকা তুলে নিলেন নিজের হাতে, মানবকল্যাণব্রতের দুরূহ ক্রুশদণ্ডভার গ্রহণ করলেন নিজ স্কন্ধে। স্বেচ্ছা-সমর্পিত এই দুঃখের দায়গ্রহণ করার মধ্যে রয়েছে একটি পরম গৌরব ও মহিমা। 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' আমরা জানি, সে শক্তি গুরু তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং সঙ্গে দিয়ে গিয়েছিলেন অসমাপ্ত কার্যভার। প্রিয়তম গুরুদেবের

প্রদত্ত সে কর্মপ্রকল্পকে বাস্তবরূপ দিতে তিনি সারাটা জীবন ধরে চেষ্টা করে গেছেন। তিল তিল করে নিজেকে উৎসর্গ করেই তিনি সে কঠিন দায় বহন করেছেন।

মনে রাখতে হবে যে শ্রীরামকৃষ্ণ নিছক ধর্মগুরু মাত্র ছিলেন না। তিনি আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে Friend, Philosopher and Guide. রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেনঃ "বিশ্বমানবের সকল দুঃখ-যন্ত্রণার আঘাত এসে শিশুর মতো তাঁর কোমল ত্বকে অবিরাম অজস্র ক্ষত সৃষ্টি করত। মহান গুরুর মহান শিষ্য বিবেকানন্দও বিশ্বের সকল মানুষের দুঃখ-বেদনা নিজের বিশাল হৃদয়ে অনুভব করতেন।" স্বামীজী গুরুভাইকে বলেছিলেনঃ "হরি ভাই, এত তপস্যাদি করলুম। তবু ধর্ম-টর্ম তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। তবে দেখছি, ভারতভ্রমণ করে আমার heart (হৃদয়টা) খুব বেড়ে গেছে। দেশের দীন-দুঃখীদের জন্য প্রাণটা কাঁদছে। সকলের জন্য খুব feel (সমবেদনা অনুভব) করছি। তাই আমেরিকায় যাচ্ছি। দেখি, এদের জন্য সেখানে কি করতে পারি।" সমালোচক তাই যথার্থই লিখেছেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য—মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করা, মূর্খ-দরিদ্র-বঞ্চিত-শোষিত-নিপীড়িত-লাঞ্ছিত মানুষের সর্বাত্মক জাগরণ ঘটানো, নরের মধ্যে নারায়ণের প্রতিষ্ঠা করা।" বিপন্ন বিধ্বস্ত খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এই ভারতের ও বসুধার একই সঙ্গে নব-নির্মাণের দুরূহতম দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেছিলেন এবং কঠিন সেই আর্তত্রাণের ক্রুশদণ্ডভার প্রিয় শিষ্যদেব উপর, বিশেষ করে প্রিয়তম শিষ্য নরেনের বৃষস্কন্ধে তুলে দিয়েছিলেন।

স্বদেশবাসীর অপরিসীম দারিদ্র্য, দুঃখ-দুর্দশা-লাঞ্ছনা স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়লেন স্বামীজী ভারত পরিক্রমায়। এ কোনও তথাকথিত রমতা সাধুর মজাদার তীর্থভ্রমণ নয়, যথার্থ একজন দেশপ্রেমিকের, লোকমাতা নিবেদিতা-কথিত, স্বদেশের নব-নির্মাণ (nation building) এবং বিশ্বমানসের জাগরণের (world awakening) প্রয়োজনে আত্মানুসন্ধান ও অভিজ্ঞতালাভের তপশ্চর্যা। একদিন যাঁকে সমগ্র দেশ ও জাতির মুকুটবিহীন সম্রাট হতে হবে, শাসনদণ্ড পরিচালনা করে দেশের মুক্তি ঘটাতে হবে, দেশের মাটির সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে অবশ্যই লাভ করতে হবে তাঁকে অন্তরঙ্গ নিবিড় পরিচয়। আসমুদ্রহিমাচল— এই ভারত পরিব্রাজনার মধ্য দিয়েই স্বদেশের ত্রুটিবিচ্যুতি, ভালমন্দ, স্বপ্ন-সাধ-আশা-আকাঙ্ক্ষা-তপস্যা-সাধনা, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের পূর্ণায়ত চিত্রটি তুলে নিয়ে স্বামীজী অন্তরঙ্গ আলাপনে দেশজননীর সঙ্গে মধুর একটি ভালবাসার সম্পর্ক সুদৃঢ় করেছেন যথার্থ একজন প্রেমিক সন্তানের মতই এবং অতঃপর কন্যাকুমারীর শেষ শিলাখণ্ডে বসে স্বামীজীর ভারত ও বিশ্বপ্রেমের তন্ময় উপলব্ধি এবং কর্মযোগে উত্তরণ।

সঙ্কল্প স্থির। অতঃপর গুরুর স্বপ্নাদেশ এবং সংঘজননী সারদা দেবীর সানন্দ সম্মতি ও আশীর্বাদ নিয়ে শিকাগোর পথে অভিযাত্রা এবং বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগদান। স্বামীজীর নিজের ভাষায় মহাশক্তিশালী বোমার মতো ফেটে পড়লেন বিশ্বজনসমাজের উপর এবং বিশ্বধর্মসম্মেলন যে তাঁরই জন্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে—গুরুভাইদের কাছে উক্ত এই ভবিষ্যদ্বাণীও অবিলম্বে প্রমাণিত হল। খ্রীস্টান ধর্মযাজকেরা এবং সমগ্র খ্রীস্টান জগৎ এই ধর্মসভার আয়োজন করেছিলেন খ্রীস্টধর্ম এবং তাঁর অনুগত ইউরোপ-আমেরিকার সভ্যতা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য। কিন্তু স্বামীজী তাঁদের সেই পূর্বপরিকল্পিত আত্মপ্রচারের সব প্রচেষ্টা

ব্যর্থ করে দিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিষ্ঠিত করলেন ভারতবাণী, ভারত-সংস্কৃতি-সভ্যতার ও ভারতধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব। উত্তোলিত হল সমগ্র ভারতবর্ষের বিজয়-বৈজয়ন্তী—বহুকাল ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রচারিত কুৎসা ও নিন্দার অবসান ঘটিয়ে। মিথ্যা প্রমাণিত হল সাহেবদের স্বকপোলকল্পিত ভারতবর্ষের মিথ্যা ইতিবৃত্ত। বস্তুত স্বামীজী গেলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। এর ফল হল সুদূরপ্রসারী। স্বামীজী এই মহাসভা থেকেই আত্মবিশ্বাসের মৃত্যুহীন অভিজ্ঞানটি অর্জন করে নিয়ে এলেন এবং স্নেহময় পিতার মতন তুলে দিলেন জাতির বিপন্ন বিধ্বস্ত করতলে। স্বামীজীর এই বিশ্ববিজয়ের ফলেই সমগ্র জাতি বহুকালের ঘুম ভেঙে জেগে উঠল এবং নবীন এক আত্মপ্রত্যয়ের প্রাণমন্ত্রে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করল। বস্তুত তিনি ফিরিয়ে দিলেন আমাদের বিনষ্ট আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি। তাঁর কম্বুকণ্ঠে উচ্চারিত সেই দিব্য ঘোষণাঃ "স্বাধীনতা, স্বাধীনতাই আত্মার শাশ্বত সঙ্গীত।" সেই আগ্নেয় সঙ্গীতই বহুদিন পর আবার শোনালেন জাতিকে এবং অবিলম্বে সেই স্বাধীনতা বা স্বরাজ অর্জনের পথে শুরু হল জাতির দৃপ্ত শোভন মৃত্যুঞ্জয়ী রক্তরাঙা পরিক্রমা। শিকাগো ধর্মসভায় সত্যিই নতুন ভারতবর্ষের দিগ্বিজয় সম্পন্ন হল এবং জন্ম হল স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতের, ধ্যানের ভারতবর্ষের। ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ সদ্য জাগ্রত ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং তাঁর মহিমময় অস্তিত্বের স্বীকৃতি আদায় করলেন ইউরোপ-আমেরিকার সহৃদয় বিদগ্ধ সমাজ থেকে। এভাবেই শিকাগো বিশ্বজয়ের মধ্য দিয়ে গুরুপ্রদত্ত দায়িত্বভার নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন জীবনজয়ের দিকে এবং এই শিকাগো জয়ের পর চারদিক থেকে শুরু হল স্বামীজীর উপর দেশবিদেশের শত্রুদের প্রবল ও হীনতম আক্রমণ। এ প্রসঙ্গে আলোচনার আগে স্বয়ং ঈশ্বরের হাতে এবং পরমপ্রিয় শ্রীগুরুর হাতে, তাঁদের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও প্রেমের পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল স্বামীজীকে।

নরেন্দ্রনাথ তখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করছেন। সদ্য বি.এ. পাশ করেছেন। আত্মীয়স্বজন তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ দেখছেন। কলকাতারই এক ধনাঢ্য পরিবারের মেয়ের বাবা দশ হাজার টাকা যৌতুক দেবেন। যদিও স্বামীজী বিবাহে অসম্মতি জানিয়েছেন—তথাপি পিতা বিশ্বনাথ দত্ত মশাই কন্যা দেখতে যাবেন, সব ঠিকঠাক। এমন সময়ে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই পিতার হঠাৎ পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। পিতার পারলৌকিক ক্রিয়াদি শেষ হলে—অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন তাঁদের আর্থিক অবস্থা ভয়ানক। পিতৃদেব কিছুই রেখে যেতে পারেননি পরন্তু প্রচুর ঋণের দায় রেখে গেছেন পুত্রদের জন্য। সুদিনের বন্ধুবান্ধব এবং পিতার অন্নে প্রতিপালিত আশ্রিত আত্মীয়জনেরাও দুর্দিনে সরে দাঁড়ালেন। পূর্বপুরুষের ভিটার অংশীদারগণ শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত। বিশ্বনাথের পুত্রগণ দেখলেন তাঁদের ন্যায্য পৈত্রিক অংশ থেকেও তাঁরা ক্রমে বঞ্চিত হতে চলেছেন। বিষয়-সম্পত্তি বিভাগের মকদ্দমা শুরু হয়েছিল বিশ্বনাথবাবুর জীবদ্দশাকালেই। স্বগৃহচ্যুত নরেন্দ্রনাথ আরও কিছুদিন ভাড়াবাড়িতে থেকে পরে মা ও ভাইবোনদের সঙ্গে মাতামহীভবনে আশ্রয় নিলেন। বিষয়-সম্পত্তি বিভাগের মকদ্দমা মাথার উপরে।

অতঃপর স্বামীজীর স্বমুখেই তাঁর তখনকার অবস্থা শোনা যাকঃ "মৃতাশৌচের

অবসান হইবার পূর্ব হইতেই কর্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে ছিন্নবস্ত্রে নগ্নপদে চাকরির আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে অফিস হইতে অফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম—অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কেহ কেহ দুঃখে দুঃখী হইয়া কোনদিন সঙ্গে থাকিত, কোনদিন থাকিতে পারিত না, কিন্তু সর্বত্রই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্বলের দরিদ্রের এখানে স্থান নাই। দেখিতাম, দুই দিন পূর্বে যাহারা আমাকে কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করিবার অবসর পাইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, সময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছে এবং ক্ষমতা থাকিলেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া কখনও কখনও সংসারটা দানবের রচনা বলিয়া মনে হইত। মনে হয়, এই সময়ে একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মনুমেন্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম। দুই একজন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল, অথবা ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গাহিয়াছিল—বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে ইত্যাদি। শুনিয়া মনে হইয়াছিল মাথায় যেন সে গুরুতর আঘাত করিতেছে। মাতা ও ভ্রাতাগণের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে উদয় হওয়ায় ক্ষোভে, নিরাশায়, অভিমানে বলিয়া উঠিয়াছিলাম— নে নে, চুপ কর! ক্ষুধার তাড়নায় যাহাদিগের আত্মীয়বর্গকে কষ্ট পাইতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদিগকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই, টানাপাখার হাওয়া খাইতে খাইতে তাহাদিগের নিকট ঐরূপ কল্পনা মধুর লাগিতে পারে; আমারও একদিন লাগিত। কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে।"[১]

"আমার ঐরূপ কথায় উক্ত বন্ধু বোধ হয় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। দারিদ্র্যের কিরূপ কঠোর পেষণে মুখ হইতে ঐ কথা নির্গত হইয়াছিল, তাহা সে বুঝিবে কেমনে।" এই দারিদ্র্য-দুঃখ প্রসঙ্গ নিয়েই মাস্টারমশাইকে (শ্রীমকে) স্বামীজী বলেছিলেনঃ "অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে। মাস্টারমশাই, আপনি দুঃখকষ্ট পান নাই, তাই; মানি দুঃখকষ্ট না পেলে ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ হয় না।"[২] দুঃখের দহনেই ভক্তহৃদয় খাঁটি সোনা হয়ে ওঠে। দুঃখকষ্টের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর অতি প্রিয়জনকে পরখ করে নেন।

ব্যক্তিগত জীবনের অশেষ দুঃখকষ্টের আরও মর্মন্তুদ চিত্র তুলে ধরেছেন স্বামীজীঃ "প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিয়া যেদিন বুঝিতাম, গৃহে সকলের পর্যাপ্ত আহার্য নাই, সেদিন মাতাকে আমার নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া বাহির হইতাম এবং কোনদিন সামান্য কিছু খাইয়া, কোনদিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম। অভিমানে ঘরে বাহিরে কাহারও নিকটে ঐ কথা প্রকাশ করিতেও পারিতাম না। ধনী বন্ধুদিগের অনেকে পূর্বের ন্যায় আমাকে তাহাদিগের গৃহে বা উদ্যানে লইয়া যাইয়া সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহাদিগের আনন্দবর্ধনে অনুরোধ করিত। এড়াইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইতাম। কিন্তু অন্তরের কথা তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইত না...।" এখানেই শেষ নয়। মহামায়া তাঁকে আরও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। স্বামীজী নিজেই লিখেছেনঃ "সময় বুঝিয়া অবিদ্যারূপিণী মহামায়াও এইকালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন নাই। এক

সঙ্গতিসম্পন্না রমণীর পূর্ব হইতে আমার উপর নজর পড়িয়াছিল। অবসর বুঝিয়া সে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল, তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান করিতে পারি! বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা প্রদর্শনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল। অন্য এক রমণীও ঐরূপ প্রলোভিত করিতে আসিলে তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'বাছা, এই ছাইভস্ম শরীরটার জন্য এতদিন কত কি তো করিলে! মৃত্যু সম্মুখে—তখনকার সম্বল কিছু করিয়াছ কি? হীনবুদ্ধি ছাড়িয়া ভগবানকে ডাক'।"[৩] "এত দুঃখকষ্টেও নরেন্দ্রনাথের আস্তিক্যবুদ্ধির বিলোপ হয়নি, মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি সন্দিহান হননি। কিন্তু একদিন সকালবেলা ঈশ্বরের নাম করে শয্যাত্যাগ করছিলেন। শুনলেন পাশের ঘর থেকে মা বলছেন, 'চুপ কর, ছোঁড়া! ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান ভগবান! ভগবান তো সব কল্লেন।' মার মুখের এই কথাগুলিতে বড় আঘাত পেলেন স্বামীজী এবং তারপর থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে লাগল এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন বলে স্থির করলেন। সত্যি কি ভগবান আছেন? আমাদের করুণ প্রার্থনা কি তিনি শুনতে পান? মঙ্গলময়ের সংসারে এত অমঙ্গল কেন? শিবের সংসারে এত অশিব আসে কোথা থেকে? এইসব প্রশ্ন স্বামীজীর অন্তরকে উদ্বেজিত করে তুলল এবং ঈশ্বর নেই অথবা যদি থাকেন তাঁকে ডাকবার কোনও প্রয়োজন নেই—এসব কথা হাঁকডাক করে লোকের কাছে প্রমাণ করতে অগ্রসর হবেন—এতে আর বিচিত্র কি? তিনি আরও বলেছেনঃ "ফলে স্বল্পদিনেই রব উঠিল, আমি নাস্তিক হইয়াছি এবং দুশ্চরিত্র লোকের সহিত মিলিত হইয়া মদ্যপানে ও বেশ্যালয়ে গমনে পর্যন্ত কুণ্ঠিত নহি। সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবাল্য অনাশ্রয় হৃদয় অযথা নিন্দায় কঠিন হইয়া উঠিল এবং কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে নিজ দুরদৃষ্টের কথা কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য যদি কেহ মদ্যপান করে অথবা বেশ্যাগৃহে গমন করিয়া আপনাকে সুখী-জ্ঞান করে, তাহাতে আমার যে কিছুমাত্র আপত্তি নাই তাহাই নহে, কিন্তু ঐরূপ করিয়া আমিও তাহাদিগের ন্যায় ক্ষণিক সুখভাগী হইতে পারি—একথা যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিব, সেদিন আমিও ঐরূপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎপদ হইব না।" ক্রমে ক্রমে এ সকল কথা নানারূপে বিকৃত ও পল্লবিত হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এবং কলকাতায় তাঁর ভক্তদের কাছেও গিয়ে পৌঁছাল এবং কেউ কেউ এসব কথা বিশ্বাসও করলেন এবং ঠাকুরের কাছে অভিযোগও জানালেন। এইসব ঘটনা নিয়ে লীলাপ্রসঙ্গকার বহু আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে। বর্তমান প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গ নিয়ে অধিক আলোচনার সুবিধে নেই—হয়তো প্রয়োজনও নেই। উৎসাহী পাঠক স্বামী গম্ভীরানন্দজীর 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 'সাংসারিক বিপর্যয় ও নবালোক' অধ্যায় পড়ে দেখতে পারেন। আমরা এতক্ষণের আলোচনায় দেখলাম তরুণ উষার নবালোকে উত্তীর্ণ হবার আগে কি নিদারুণ বিপর্যয় ও দুর্যোগের মধ্য দিয়ে, কী অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণা ও কী ভয়ানক সব আঘাত-নির্যাতন সহ্য করে স্বামীজীকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। পুনরুত্থানের আগে এভাবেই ঘরে-বাইরে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়েছিল!

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ক্যালিফোর্ণিয়ার প্যাসাডেনা সেক্সপীয়র ক্লাবে 'আমার জীবন ও ব্রত' বক্তৃতায় পূর্বোক্ত ঐ মর্মস্পর্শী কাহিনীর উল্লেখ করে বলেছেনঃ "একদিন আমাদের

গুরুদেবের দেহান্তের দুঃখময় দিন এসে উপস্থিত হল।...আমাদের বন্ধুবান্ধব বিশেষ কেউ ছিল না। কয়েকটি অদ্ভুত ধারণা-পোষণকারী অর্বাচীন তরুণের কথা কেই বা শুনবে? অন্তত ভারতবর্ষের তরুণদের কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। মাত্র দ্বাদশজন বালক লোকের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলছে, বলছে যে, তারা সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। সেকথা শুনে সবাই উপহাস করত। উপহাস ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করল। আমাদের উপর রীতিমত অত্যাচার শুরু হল।...তারপর উপস্থিত হল আমাদের সকলের জীবনের এক চরম দুঃসময়; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবনে যেন তা নিদারুণ দুর্ভাগ্যের রূপ নিল। একদিকে আমার মা ভাইয়েরা। আমাদের পিতার সদ্য প্রয়াণের ফলে আমাদের পরিবারকে তখন চরম দারিদ্র্য এসে গ্রাস করেছে। প্রায় প্রতিদিনই আমাদের অনাহারে থাকতে হত। পরিবারে একমাত্র আমিই ছিলাম আশাভরসা—একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমার দুপাশে তখন দুটি জগৎ। একদিকে আমাকে দেখতে হচ্ছিল যে, আমার মা এবং ভাইয়েরা অনাহারে মরণাপন্ন, আর অপরদিকে আমি বিশ্বাস করতাম যে, আমার গুরুদেবের আদর্শ ভারত এবং সমগ্র জগতের পক্ষে কল্যাণকর এবং তার প্রচার এবং বাস্তব রূপায়ণ করতেই হবে। সুতরাং আমার মনের মধ্যে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই সংগ্রাম চলতে থাকল...সে যে কী হৃদয়-যন্ত্রণা! সেই যন্ত্রণার তীব্রতা ছিল দুঃসহ।...সেদিন আমাকে সহানুভূতি দেখানোর কেউ ছিল না।... শুধু একজন ছাড়া। কেবল সেই একজনের সহানুভূতিই আশীর্বাদ ও আশা বহন করে আনল। তিনি একজন নারী।... আমাদের গুরুদেবের সহধর্মিণী। কিন্তু তিনিও ছিলেন নিঃসহায়। আমাদের চেয়ে তিনি ছিলেন দরিদ্র।”[৪]

ঐ 'আমার জীবন ও ব্রত' বক্তৃতায়ই স্বামীজী আরও বললেনঃ “...এইভাবেই আমাদের সেই তরুণ-দলটির দিন কাটিতে লাগিল। চারিপাশের সকলের নিকট অপমান ও লাঞ্ছনাই পাইলাম। অবশ্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিতে হইত। এখানে ওখানে দু-এক টুকরো রুটি মিলিত। একটি অতি পুরাতন ভগ্নপ্রায় বাড়ি বাসস্থান হিসেবে জুটিল; উহার তলায় গোখুরা সাপের বাসা, তাহাদের ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনা যাইত। অল্প ভাড়ায় বাড়ি পাওয়ায় আমরা সেই গৃহে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম। ...

“...দশটি বৎসর কোন আশার আলো ছাড়াই কাটিয়া গেল। ইতোমধ্যে আমার শরীর ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। কখনো রাত্রি নয়টায় একবেলা আহার, কখনো ভোরে আটটায় একবেলা আহার, তাও আবার তিনদিন পরে এবং সর্বদাই অতি সামান্য কদর্য অন্ন। পরিণামে শরীরের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ভিখারীকে কেই বা ভালো খাবার দেয়? আবার ভালো জিনিস দিবার সামর্থ্যও ভারতবাসীর নাই। শুধু একবেলা আহারের জন্য বেশির ভাগ সময় পায়ে হাঁটিয়া, তুষার শৃঙ্গ চড়াই করিয়া, কখনো দশ মাইল পথ দুর্গম পর্বত চড়াই করিয়া চলিয়াছি। ভারতবর্ষে রুটিতে খাম্বির দেয় না। কখনো কখনো এই খাম্বির না দেওয়া রুটি বিশ ত্রিশ দিন ধরিয়া সঞ্চিত রাখা হয়, তখন ইহা ইটের চেয়েও শক্ত হয়। ভিখারীকে সেই রুটির অংশ দেওয়া হয়। একবেলা আহারের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমাকে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইত। তদুপরি এই ইটের মতো শক্ত রুটি চিবাইতে গিয়া মুখ দিয়া রক্ত পড়িত। এই রুটি চিবাইতে সত্য সত্যই দাঁত ভাঙে। নদী হইতে জল

আনিয়া একটি পাত্রে ঐ রুটি ভিজাইয়া রাখিতাম। মাসের পর মাস ঐভাবে থাকিতে হইয়াছে—ফলে শরীর অবশ্যই খারাপ হইতেছিল।”[৫] ‘আমার জীবন ও ব্রত বক্তৃতা’টির ছত্রে ছত্রে নিদারুণ নির্যাতন ও অপরিসীম দুঃখকষ্টের বেদনাময় ঘটনা ছড়িয়ে আছে। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান-আঘাতের শেষ হয়ে গিয়েছিল কয়েকটি দিনের মধ্যে। কিন্তু বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামরত স্বামীজীকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, এক কথায় বলা যায় প্রায় সারাটা জীবন ভরে দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন-নিপীড়ন, আঘাত-অপমান মাথা পেতে নিতে হয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে আসা লাঞ্ছনা-আঘাত-অপমান স্বামীজীর অঙ্গভূষণ হয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর আমরা প্রাণপ্রিয় শ্রীগুরু জগদ্‌বরেণ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রিয়শিষ্যের প্রেমের পরীক্ষার করুণ কাহিনী বর্ণনা করব। একদিন, সর্বসমর্পিত হয়েছিলেন যাঁর চরণপ্রান্তে—তাঁর কাছ থেকেই এল দুঃসহ আঘাত। বিবেকানন্দের জীবনের এই ছিল চূড়ান্ত পরীক্ষা।

গম্ভীরানন্দজীর গ্রন্থ[৬] থেকে জানতে পারি ঠাকুরের সঙ্গে নরেনের ঐকান্তিক প্রেমসম্বন্ধের নানা কথাকাহিনী। নরেনও ঠাকুরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন এবং সপ্তাহে দুই একবার দক্ষিণেশ্বরে না এসে থাকতে পারতেন না। সুযোগ পেলেই সেখানে ঠাকুরের কাছে দুই চারদিন থেকে যেতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইচ্ছাময় ঠাকুর নরেনের প্রতি অকস্মাৎ এক অদ্ভুত ঔদাসীন্য অবলম্বন করলেন। নরেন্দ্র এলেন, যথারীতি প্রণত হলেন এবং সম্মুখে বসে শ্রীমুখের বাণীর অপেক্ষা করতে লাগলেন কিন্তু ঠাকুর কুশলপ্রশ্ন করলেন না, একবার মাত্র তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে আপন মনে বসে রইলেন—যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। নরেন্দ্র ভাবলেন, ঠাকুর বুঝি ভাবাবিষ্ট, তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বাইরে গেলেন এবং হাজরা মশাইয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ ও তামাক খেতে বসে গেলেন। ঠাকুর অপরের সঙ্গে কথা বলছেন শুনে তিনি হয়তো আবার ঐ ঘরে এলেন; কিন্তু এবারেও নরেন্দ্রের সঙ্গে বাক্যালাপ না করে অপর দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইলেন। এভাবে সারাদিন কেটে গেলেও ঠাকুরের ভাবান্তর হল না দেখে সন্ধ্যাবেলা তাঁকে প্রণাম করে নরেন্দ্র বিদায় নিলেন। এরপরও নরেন্দ্র আগের মতই নিয়মিতভাবে দক্ষিণেশ্বরে আসতে লাগলেন কিন্তু ঠাকুরের ঔদাসীন্য একই রকম চলতে লাগল। এরকম করে মাসাধিক কাল কেটে গেলেও ঠাকুর যখন দেখলেন, নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে আসার কোনও ব্যতিক্রম হচ্ছে না, তাঁকে একদিন কাছে ডেকে বললেনঃ “আচ্ছা, আমি তো তোর সঙ্গে একটি কথাও কই না, তবু তুই এখানে কী করতে আসিস বল দেখি?” নরেন্দ্র বললেনঃ “আমি কি আপনার কথা শুনতে এখানে আসি? আপনাকে ভালবাসি, দেখতে ইচ্ছে করে, তাই আসি।” প্রেমের ঠাকুর এরপর আর ধরা না দিয়ে পারেননি।

শ্রীগুরুপ্রদত্ত আঘাতগুলি পরবর্তী কালে প্রেমের ক্ষত বা ভালবাসার পীড়ন (wounds of love) বলে প্রমাণিত হলেও—এইসব নির্মম আঘাত এসে যখন তাঁর কোমল হৃদয় বিদ্ধ করেছিল, তখন কী যে অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল স্বামীজীকে, তা একমাত্র তাঁর অন্তর্যামী দেবতাই জানেন। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এইসব নির্যাতন, দুঃখকষ্ট মাথা উঁচু করে গ্রহণ করার মধ্যে অবশ্যই ছিল একজাতীয়

আত্মগৌরবের তীব্র আনন্দানুভূতি বা অমৃতযন্ত্রণা—তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু শিকাগো জয়ের পরবর্তী কালে যে আঘাত-অপমান-নির্যাতন-লাঞ্ছনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল স্বামীজীকে, তার রূপ-রীতি প্রকরণ সবই আলাদা এবং সেটাই ছিল বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। সে পরীক্ষায়ও তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্য ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

শিকাগো ধর্মসম্মেলনে স্বামীজীর বিজয়-সাফল্য সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে উন্মাদনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উপর যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল তার কথা নতুন করে বলা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু স্বামীজীর এই বিশ্বজয়ের ফলে তাঁর এত শত্রু সৃষ্টি হল কী করে, কেন খ্রীস্টান মিশনারির দল, খ্রীস্টান জগৎ, ভারতের ব্রাহ্মসমাজ, থিওজফিস্টরা এবং প্রার্থনাসমাজ এমনকি রক্ষণশীল হিন্দুরাও একযোগে বিবেকানন্দ বিরোধে নামলেন তা নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন এবং তারও আগে শিকাগো ধর্মসভায় বিবেকানন্দ এমন কী বলেছিলেন যাতে খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে একযোগে সবাই মিলে বিবেকানন্দকে আক্রমণ করলেন—তা নিয়ে সামান্য আলোচনার প্রয়োজন আছে। রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন ঃ "বিবেকানন্দের দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য, মনোরম মাধুর্য ও প্রশান্ত মহিমা, সম্ভ্রম জাগানো রূপ, কাল চোখের উজ্জ্বল জ্যোতি এবং বক্তৃতাকালে তাঁর গভীর কণ্ঠস্বরের অপূর্ব সঙ্গীতময় মূর্ছনা বিপুলসংখ্যক মার্কিন অ্যাংলো শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে ফেলল—যারা তাঁর গায়ের রঙের জন্য তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব নিয়ে সভায় এসেছিল। ভারতবর্ষের এই সৈনিক-দ্রষ্টার চিন্তাধারা আমেরিকার বুকে গভীরভাবে দাগ কেটে রাখল। প্রতিপক্ষের কাছে বিবেকানন্দের এই হল সবচেয়ে বড় অপরাধ।" 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' লিখল ঃ "ধর্মসভায় বিবেকানন্দই অবিসংবাদিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।" কবি মিস হ্যারিয়েট মনরো তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ "এই সুমহান বিবেকানন্দই ধর্মসভাকে গ্রাস করেছিলেন, গোটা শহরটাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন।... কমলা রঙের পোশাকপরিহিত সুদর্শন সন্ন্যাসীর নিখুঁত ইংরেজীতে আমাদের সর্বোত্তম বস্তু দিলেন।... মানব-ভাষণের ঐ ছিল সর্বোচ্চ শিখর।" 'শিকাগো ইন্টার ওশানে'র বক্তব্য ঃ "ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের তুল্য মনোযোগ আর কেউই আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়নি।" 'আইওয়া স্টেট রেজিস্টার' ঃ "দুর্ভাগ্য তার যে এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে...লড়াই করতে চায়। তাঁর উত্তরগুলি ঝলসে ওঠে বিদ্যুতের মতো। ফলে দুঃসাহসিক প্রশ্নকর্তা নির্ঘাত ভারতীয় মানুষটির উজ্জ্বল ধারালো বুদ্ধির বর্শায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাঁর মনের ক্রিয়াশক্তি এমনই সূক্ষ্ম ও দীপ্তিমান, এমনই সমৃদ্ধ ও পরিশীলিত।" বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এরকম আরও অজস্র বক্তব্যের মধ্য থেকে অতঃপর আমরা অ্যানি বেশান্তের মন্তব্য তুলে ধরব ঃ "শিকাগোর ঘন আবহাওয়ার মধ্যে জ্বলন্ত ভারতীয় সূর্য, সিংহতুল্য গ্রীবা ও মস্তক, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, স্পন্দিত ওষ্ঠ, চকিত দ্রুতগতি, কমলা ও হলুদ রঙের পোশাকে পরমাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়ার রূপ। সন্ন্যাসী তাঁর পরিচয় নিশ্চয়ই কিন্তু সৈনিক সন্ন্যাসী তিনি, প্রথম দর্শনে বরং সন্ন্যাসীর চাইতে সৈনিকই বেশি মনে হয়। মঞ্চ থেকে নেমে এসেছেন, দেশ ও জাতির অভিমান গৌরব ফুটে আছে দেহের রেখায় রেখায়—পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মের প্রতিনিধি পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন কৌতূহলী অর্বাচীনদের

দ্বারা।

"মঞ্চের উপর অপর পক্ষও আত্মপ্রকাশ করেছিল; মর্যাদা যোগ্যতা ও শক্তির দ্যোতনা সেখানেও ছিল, কিন্তু সব কিছুই আচ্ছন্ন হয়ে গেল বিবেকানন্দের আনীত অধ্যাত্মবাণীর অপরূপ সৌন্দর্যের কাছে। নিষ্প্রভ হয়ে গেল সমস্তই যখন তাঁর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল ভারতের জীবনস্বরূপ পরমাশ্চর্য আত্মতত্ত্ব। জ্বলে উঠল প্রাচ্যের দিব্যবাণীর অতুলনীয় মহিমা। মোহিত ও অভিভূত সেই বিরাট জনমণ্ডলী উৎকর্ণ হয়ে রইল তাঁর প্রতিটি উচ্চারিত শব্দের জন্য, অপেক্ষা করে রইল উর্ধ্বশ্বাসে—যে ধ্বনিতরঙ্গ আছড়ে পড়েছিল তার কিছুই যেন হারিয়ে না যায়। ঐ মানুষটিকে আমরা পৌত্তলিক বলেছি। বিশাল সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে একজন বলে উঠলেন—আর এঁর দেশে আমরা ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছি। এদেশে এঁদেরই ধর্মপ্রচারক পাঠানো উচিত।" রাজকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল আজন্ম-সম্রাট বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে এমনি করে ধর্মসভার সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী এবং খবরের কাগজে সংবাদ প্রকাশের পরে প্রায় সমগ্র আমেরিকা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করল। পরাধীন এক দেশের প্রতিনিধি কালো হিদেনের এই সম্মানপ্রাপ্তি অসহ্য মনে হল খ্রীস্টান পাদরীদের কাছে। আর ব্যক্তিগত ঈর্ষায় ও পরশ্রীকাতরতার আগুনে জ্বলে উঠল ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ এবং থিওজফিস্ট নেতৃবৃন্দ।

স্বামীজীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার, কুৎসা রটানোর পিছনে তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন স্বামী গম্ভীরানন্দঃ (১) ঈর্ষা (২) স্বার্থে বিঘ্ন (৩) স্বমত প্রতিষ্ঠার বাধা। স্বামী গম্ভীরানন্দ আরও লিখেছেনঃ ব্রাহ্মসমাজ ও থিওজফিকাল সোসাইটির যে প্রতিপত্তি পূর্বে আমেরিকায় ছিল, স্বামীজীর অকস্মাৎ অভ্যুদয়ে তাহা অনেকটা ম্লান হইয়া গেল; আবার ভারতীয় সমাজের কাল্পনিক কুৎসিত চিত্র আমেরিকান সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া এই অবনত বিধর্মীদের কল্যাণকল্পে মিশনারিরা অতি সহজে অর্থসংগ্রহের যে হীন উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতেও বিঘ্ন উপস্থিত হইল। অধিকন্তু স্বামীজী খোলাখুলি ভাবেই মিশনারিদের প্রচারপ্রণালীর নিন্দা ও অর্থব্যয়ের তুলনায় তাহাদের সাফল্যের অকিঞ্চিৎকরতা দেখাইয়া মিশনারিদের অনেককে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। এই সমস্তের সম্মিলিত বেগ অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা যুক্তির পথে না চলিয়া ও সত্যনির্ধারণের চেষ্টায় ব্রতী না হইয়া স্বামীজীর ব্যক্তিগত সর্বনাশের সহজ পথ অবলম্বন করিলেন। তাহাদের আক্রমণ দুইটি বিশেষ ধারায় পরিচালিত হইল। প্রথমত তাহারা দেখাইতে চাহিলেন, স্বামীজী দুশ্চরিত্র, অতএব আমেরিকার সম্ভ্রান্ত পরিবারে অগ্রহণীয়। দ্বিতীয়ত তিনি স্বমত প্রকাশ করিতেছেন মাত্র; তিনি কোনও সম্প্রদায় বা সমিতির মুখপাত্র নহেন, তাঁহার প্রচারিত মতসমূহ হিন্দুদের নিকট অগ্রাহ্য। সুতরাং আমেরিকান সমাজে তিনি ভারতের প্রতিনিধি বা প্রবক্তারূপে স্বীকৃত হইতে পারেন না।[৭]

প্রতিভাস্বীকৃতির ও জীবনে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার যে এমন নিদারুণ মূল্য দিতে হয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও তার খুব বেশি উদাহরণ নেই। তবে জ্বলন্ত সন্ন্যাসীর পবিত্র বহ্নিদহনে নিন্দা-প্রশংসা সবই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। কুৎসা ও নিন্দার এইসব বীভৎস রূপ, ব্যক্তিগত আক্রমণের এই জঘন্য হীন ভয়াবহ তীব্রতা স্মরণ করেই বিবেকানন্দ বলতে বাধ্য হয়েছিলেনঃ "তোমরা একজনকে শিক্ষা দিয়ে, গড়ে-পিটে তৈরী করে, পোষাক-পরিচ্ছদে

সাজিয়ে, মাইনে সহ পাঠিয়ে দাও—কিসের জন্য? তারা আমাদের দেশে গিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষ, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমস্ত কিছুকে নিন্দা করে অভিশাপ দেবে বলে! মন্দিরের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলবে, 'তোমরা পৌত্তলিক, তোমরা নরকে যাবে।'... এই তোমরা, যারা নিন্দামন্দ করার শিক্ষা দাও, তোমাদের উদ্দেশ্যে যদি আমি অত্যন্ত সদুদ্দেশ্যেও সমালোচনার বাক্যমাত্র উচ্চারণ করি, তখনি তোমরা কুঁকড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠবে, 'কদাপি আমাদের স্পর্শ করো না, হুঁ, আমরা হলাম আমেরিকান!'...যখন তোমাদের পাদরিরা আমাদের সমালোচনা করতে অগ্রসর হন, তাঁরা যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন ঃ যদি গোটা ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে উঠে ভারত মহাসাগরের তলায় যত পাঁক আছে সমস্ত তুলে নিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলির দিকে ছুঁড়ে দেয়, তাহলেও তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যা করছ তার লক্ষাংশের একাংশও ফেরত দেওয়া হবে না।" বিবেকানন্দ-আক্রমণ এবং বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে নিন্দা-কুৎসা যে কত বিশ্রী বীভৎস রূপ নিয়েছিল শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'সমকালীন ভারতবর্ষ ও বিবেকানন্দ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তার পরিচয় পাই।[৮]

ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বিদ্বেষপ্রসূত বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে আক্রমণ কী স্তরে পৌঁছেছিল তা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা (১৮৯৪, ১৯ মার্চ) স্বামীজীর একটি চিঠিতে বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বরেই আমরা শুনব এবং শিউরে উঠব। স্বামীজী লিখেছেন ঃ "মজুমদার পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নের পাদ্রীদের কাছে আমার যথেষ্ট নিন্দা করে, ও কেউ নয়, ঠক্ জোচ্চোর, ও তোমাদের দেশে এসে বলে—'আমি ফকির' ইত্যাদি বলে আমার ওপর তাদের মন বিগড়ে দিলে ইত্যাদি...।"[৯] স্বদেশে ফিরেও প্রতাপচন্দ্র সমানভাবে বিবেক-নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। স্বামীজী মেরী হেলকে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ মার্চের চিঠিতে লিখছেন ঃ "মজুমদার কলকাতায় ফিরে গিয়ে রটাচ্ছে যে বিবেকানন্দ আমেরিকায় সব রকমের পাপ কাজ করছে।... এই তো তোমাদের আমেরিকার অপূর্ব আধ্যাত্মিক পুরুষ!... মজুমদার বেচারীর এতদূর অধঃপতনে আমি বিশেষ দুঃখিত। ভগবান ভদ্রলোককে কৃপা করুন।" ভারতে ও আমেরিকায় নিজের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ নিয়ে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকেও একটি পত্রে (১৮৯৪, ৯ এপ্রিল) লিখলেন ঃ "অবশ্য গোঁড়া পাদ্রীরা আমার বিপক্ষে, আর তাঁরা আমার সঙ্গে সোজা রাস্তায় সহজে পেরে উঠবেন না দেখে আমাকে গালমন্দ নিন্দাবাদ করতে আরম্ভ করেছেন, আর মজুমদারবাবু তাঁদের সাহায্য করছেন। তিনি নিশ্চয় হিংসায় পাগল হয়ে গেছেন। তিনি তাঁদের বলছেন, আমি একটা ভয়ানক জোচ্চোর ও বদমাশ, আবার কলকাতায় গিয়ে সেখানকার লোকদের বলছেন, আমি ঘোর পাপে মগ্ন। বিশেষতঃ আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছি!!! প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করুন।" খ্রীস্টান পাদরীরা আমেরিকায় থাকতেই স্বামীজীর চরিত্র হনন করছিলেন। স্বামীজী চরিত্রহীন, লম্পট, মদ্যপ, নীতিভ্রষ্ট—প্রভৃতি অজস্র দোষে দুষ্ট একজন বর্জনীয় ব্যক্তি বলে সর্বত্র ওঁরা প্রচার করেছিলেন। এক বাড়িতে স্বামীজীর সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। এইসব ধার্মিক খ্রীস্ট-অনুগত যাজকেরা বেনামী চিঠি পাঠিয়ে গৃহস্বামীকে সতর্ক করে দিয়ে লিখেছেন—আপনাদের বাড়িতে যুবতী মেয়েরা আছেন, আর আপনারা এই চরিত্রহীন লম্পটটাকে—নিমন্ত্রণ করেছেন বাড়িতে? খুব সাবধান! স্বামীজী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন বাড়ির সদর দরজা বন্ধ। কেউ কোথাও নেই। গৃহস্বামী ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে

পালিয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে বিবেকানন্দের যথার্থ পরিচয় পেয়ে তাঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি দিয়েছিলেন এবং আরও পরে স্বামীজীর একান্ত ভক্ত-শিষ্যে পরিবর্তিত হয়ে যান। এরকম আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী বলছেন (১৮৯৭)ঃ "কখনো কখনো এমন হয়েছে—আমায় কোনো বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেহ আমার নামে (নানা) মিথ্যা কুৎসা বাড়িওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে সে দোর বন্ধ করে কোথায় চলে গেছে। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি, সব ভো ভো, কেউ নেই। আবার কিছুদিন পরে তারাই সত্য কথা জানতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আমার চেলা হতে এসেছে।"[১০] শ্রীমতী ব্যাগলির বাড়ির একটি তরুণী ঝিকে নিয়ে প্রায় অনুরূপ কুৎসা রটনা করেছিলেন ক্ষিপ্তপ্রায় বর্বর পাদরীরা। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখছেনঃ "মিশনারীদের কর্তৃপক্ষ যখন হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে, বিবেকানন্দের প্রচারের ফলে তাহাদের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তখন ক্ষিপ্তপ্রায় মিশনারীদের কেহ কেহ বিবেকানন্দকে জব্দ করিবার অতুৎসাহ দেখাইতে গিয়া প্রচার করিলেন, 'বিবেকানন্দের অসদ্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া (মিশিগানের ভূতপূর্ব গভর্নরের স্ত্রী) শ্রীযুক্তা ব্যাগলিকে তাঁহার একটি অল্পবয়স্কা ঝিকে বিদায় দিতে হইয়াছিল; বিবেকানন্দ অসম্ভব রকম আত্মসংযমহীন।' সৌভাগ্যের বিষয়, এই জাতীয় বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারের মুখ বন্ধ করার উপযুক্ত তিনখানি পত্র ব্যাগলি পরিবারই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং উহা ইংরেজী জীবনীতে মুদ্রিত হইয়াছে।... শ্রীমতী ব্যাগলি অ্যানিস্কোয়াম থেকে ২২ জুন লিখেছিলেনঃ... বিবেকানন্দ একজন শক্তিমান সদ্‌গুণশালী পুরুষ—তিনি ভগবন্নির্দিষ্ট পথের যাত্রী।... বিবেকানন্দের সম্বন্ধে এইসব কথা আগাগোড়া সবটাই ডাহা মিথ্যা—এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যা আর হইতেই পারে না।"[১১]... দেশে বিদেশে এরকম অজস্র নিন্দা অপবাদ প্রচার করতে চেষ্টা করেছে ঈর্ষাদগ্ধ শত্রুপক্ষ। কিন্তু তিনি কখনও সামান্যতম বিচলিত হননি এইসব ঘটনায় কিংবা প্রত্যাঘাত করতেও কখনও এগিয়ে যাননি।

খ্রীস্টান মিশনারিদের প্রচলিত হীনতম পদ্ধতিতেই এই সময়েই আমেরিকায় রমাবাঈ সার্কল বা মণ্ডলী নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্বামীজীর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর চরিত্রহননে উদ্যোগী হন। এই রমাবাঈ ছিলেন মহারাষ্ট্রদেশীয় এক ব্রাহ্মণ কন্যা। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইংলণ্ডে যান। সেখানে ইংরেজী বিদ্যা অর্জন করে ভারতে ফিরে এসে হিন্দু বালবিধবাদের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের প্রয়োজনে আমেরিকা যান এবং এখানেই 'রমাবাঈ সার্কল' নামে সাধারণ্যে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ঘটে। ব্রুকলিনের প্রধান কেন্দ্রসহ আমেরিকায় মোট পঞ্চান্নটি কেন্দ্র ছিল এই রমাবাঈ সার্কলের। মিশনারিদের মতই সহজে অর্থলাভের জন্য—আমেরিকার জনসাধারণের কাছে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, বিশেষ করে ভারতীয় বৈধব্যজীবন প্রসঙ্গে অনেক মুখরোচক কাল্পনিক বীভৎস কাহিনী প্রচার করতেন। কিন্তু স্বামীজীর আমেরিকা বিজয়ের পর, বিশেষ করে ব্রুকলিন প্রভৃতি নানা জায়গায় ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা প্রভৃতি প্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তৃতাবলী শোনার পর রমাবাঈ সার্কলের সুনাম নষ্ট হয়ে যায় এবং রমাবাঈ সার্কল প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং সার্কলের সভ্যরা আরও অনেক অসুবিধের মধ্যে পড়েন। ফলে তাঁরা স্বামীজীর নামে কুৎসাপ্রচারে

মেতে ওঠেন। 'নববিধান' এবং 'ব্রাহ্মসমাজে'র মুখপত্রে স্বামীজীর নামে প্রচারিত অপবাদ ও কুৎসা পুনর্মুদ্রিত করে ওঁরা এখানেও প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু স্বামীজীর প্রতিভামুগ্ধ আমেরিকাবাসী বিশেষ করে ব্রুকলিনবাসীরা স্বামীজীর বিরুদ্ধে ওঁদের কুৎসা অপবাদের যথাযোগ্য উত্তর দেন; ফলে রমাবাঈ সার্কলের কুৎসিত কাণ্ডকারখানা চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় কিন্তু কিছুকাল এঁরাও কম বিব্রত করেননি স্বামীজীকে নানা বিরুদ্ধাচরণ ও আঘাতের মধ্য দিয়ে।

শুধু কুৎসা-অপবাদ রটনা ও পত্রপত্রিকায় নানারকম মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হয়নি বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা; দৈহিক নির্যাতন, এমন কি গুণ্ডা লাগিয়ে, বিষপ্রয়োগ করে স্বামীজীর প্রাণনাশের চেষ্টা চলেছিল বারবার। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় ব্যর্থ হয়েছে সব। স্বামীজীকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চক্রান্তমূলক একটি ঘটনার কথা স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর কাছ থেকে জানা যায়। স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখছেনঃ ডেট্রয়েটে এক নৈশভোজে স্বামীজী কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে যাইবেন, এমন সময় দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, 'খাসনি, ও বিষ'। এরকম অজস্র আঘাত, নির্যাতন, অপমান, জীবননাশে পর্যন্ত তৎপর হয়েছে শত্রুপক্ষ বারবার। স্বামীজী মৃদু হাস্যে সমস্ত উপেক্ষা করে গেছেন। কণ্টকমুকুটে শোভিত প্রভু যীশুর মতই ক্ষমা করে গেছেন সকলের সমস্ত অপরাধ। ক্রুশবিদ্ধ মেরীতনয় তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে যন্ত্রণাজর্জর হয়েও শত্রুদের দিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছিলেনঃ "এরা জানে না—কী করছে! ঈশ্বর তুমি এদের ক্ষমা করো।" শত্রুর আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়েও স্বামীজী শত্রুর উদ্দেশে সহজ কণ্ঠে বলেছেন, 'প্রভু তাকে আশীর্বাদ করুন কিংবা ভগবান ভদ্রলোককে কৃপা করুন!'

আক্রমণ ও আঘাতের বেগ ক্রমশ এত তীব্র হয়ে উঠছিল, তাঁর চারিদিকে নিন্দা ও অপবাদের ঝড় এমন প্রবলভাবে বইতে শুরু করল যে বিবেকানন্দের মতো মহাপ্রাণকেও তাঁর সমর্থনে বিখ্যাত সর্বভারতীয়দের কাছ থেকে চিঠিপত্র পাঠাতে এবং কলকাতা মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় শহরে সম্বর্ধনার আয়োজন করতে লিখতে হল তাঁর একান্ত আপনজনদের। ভারি সুন্দর করে লিখছেন এ প্রসঙ্গটি শঙ্করীপ্রসাদঃ "এখানে আমাদের দুঃখের সঙ্গে জানাতে হবেই—বিবেকানন্দের পক্ষে ধন্যবাদ প্রাপ্তি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। শুধু দুঃখ নয়, লজ্জাও বোধ করছি, কারণ কলুষিত ইতিহাসের এমন কয়েকটি পৃষ্ঠা আমাদের সামনে খোলা রয়েছে যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে—ব্যক্তিগত এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থ মানুষকে কতখানি নামাতে পারে। সেই ঈর্ষার নখদংষ্ট্রার সামনে দাঁড়িয়ে সিংহহৃদয় বিবেকানন্দকেও অপরের সাহায্য চাইতে হয়েছিল!! একই সঙ্গে মানব মহত্ত্বের কী সমুচ্চ বিকাশও দেখতে পেয়েছি। যে বিবেকানন্দ কাতরভাবে ভারতবাসীর সমর্থন চাইলেন, সে সমর্থন এসে উপস্থিত হবার পরে যখনই আশু প্রয়োজন মিটে গেল, তখনই তিনি ক্লান্ত হয়ে বললেন, আর নয়। সন্ন্যাসী বললেন, আমার আর প্রশংসার দরকার নেই। কারণ তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রশংসা চাননি। তাঁর মধ্য দিয়ে ভারত ও বিশ্বের কল্যাণের যে ব্রত উদ্‌যাপিত হচ্ছিল, সেই ব্রতের জন্য ঐ নমস্কার-নৈবেদ্যের প্রয়োজন ছিল। এই কালে বিবেকানন্দের জীবননাট্য অসাধারণ এক সৃষ্টি, তা সংঘাতে গতিতে ক্ষিপ্ত তীব্র, বেদনায় গভীর এবং উন্মোচনে মহান।"[১২]

মেরী হেলকে ১৮৯৭, ৯ জুলাই লিখেছিলেনঃ 'কেবল একটা ভাব আমার মাথায় ফুটছিল—ভারতের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র চালু করা'—যন্ত্রটা চালু করার জন্যই তিনি নিজের যন্ত্রী-ভূমিকার স্বীকৃতি চেয়েছিলেন, নচেৎ "লোকেরা কি বলে না বলে, তাতে আমার কি এসে যায়—ওরা সব খোকার দল; বেশি কি বুঝবে? কী! আমি আত্মাকে জেনেছি, পার্থিব অসার বস্তুর শূন্যতা বুঝেছি—আমি খোকাদের কথায় নিজের পথ থেকে সরে যাব—আমাকে দেখে তাই মনে হয়?"

স্বামীজী এও জানতেন, যে-যন্ত্রটা তৈরি করতে চান, তা কেবল ভারতবাসীর নয়, শেষ পর্যন্ত মানবজাতিরই কল্যাণে লাগবে, সুতরাং সেজন্য ঈশ্বরের নির্দেশেই কিনা কে জানে, তাঁকে স্বীকৃতি ভিক্ষা করে দাঁড়াতে হয়েছে দেশবাসীর সামনে। মাদ্রাজ ও কলকাতার ধন্যবাদসভার অনুষ্ঠান ও তার বিবরণ আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে যাবার পরে যখন তাঁর প্রতিনিধিত্ব (ভারতের) নিয়ে আর কোনও প্রশ্নই রইল না, তখন থেকে তিনি আর সংবাদপত্রের প্রচার চাইলেন না—কিছুদিন পরে ও বস্তুকে রীতিমত ভয় করতে আরম্ভ করলেন। ঐ প্রচারের যদি কিছু মূল্য থাকে তা ভারতেরই জন্য—ভারতবাসী তাঁর মধ্য দিয়ে নিজ দেশ ও ধর্মকে মর্যাদা দিতে শিখবে। অন্য এক চিঠিতে আবার লিখলেনঃ "আমার বন্ধুদের বলবে, আমার নিন্দুকদের জন্য আমার একমাত্র উত্তর—একদম চুপ থাকা। তাদের ঢিল খেয়ে যদি পাটকেল মারতে চাই, তাহলে তো তাদের পর্যায়ে নেমে এলুম। বন্ধুদের বলবে, সত্য নিজের প্রতিষ্ঠা নিজেই করবে—আমার জন্য কাউকে অন্যের সঙ্গে লড়তে হবে না।..."

অতঃপর মেরী হেলকে লেখা (১৮৯৫, ১ ফেব্রুয়ারি) স্বামীজীর আর একখানি চিঠির অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরব। বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে চিরসংগ্রামরত, অন্যায় ও অপরাধের সঙ্গে আজীবন আপোসহীন রামকৃষ্ণ-বিপ্লবের এই মহান সেনাপতির যথার্থ স্বরূপটি এখানে আশ্চর্যভাবে উন্মোচিত হয়ে আছে। স্বামীজী লিখছেনঃ "সাধারণ মানুষের কর্তব্য—তার সমাজ নামক ঈশ্বরের আদেশ পালন করা। কিন্তু জ্যোতির তনয়গণ কখনো সেরূপ করেন না। এই একটি চিরন্তন নিয়ম। একজন নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক মতামতের সঙ্গে মানিয়ে নেয় এবং সর্বসুখদাতা সমাজের কাছ থেকে সকল সুখ-সম্পদ লাভ করে; অপরজন একাকী খাড়া থেকে সমাজকে তার দিকে আকর্ষণ করে। আপোসকারীর পথ কুসমাস্তীর্ণ, আর তাতে অনিচ্ছুকের পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা নিমেষেই বিনাশ প্রাপ্ত হন আর চিরজীবী হন সত্যের তনয়গণ।

"...হে সন্ন্যাসি! তুমি নির্ভয়ে দোকানদারি ত্যাগ করে, শত্রু-মিত্র কাউকে গ্রাহ্য না করে, সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকো! এই মুহূর্ত থেকে ইহলোক এবং পরলোকের সকল প্রাপ্তিকে ও প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে ত্যাগ করো—ত্যাগ করো অসার সম্ভোগকে। হে সত্য! একমাত্র তুমিই পথপ্রদর্শক হও। আমার ধনের, মানের, ভোগের কামনা নেই। ভগিনি! এ সকলই ধূলিবৎ তুচ্ছ। আমি আমার ভ্রাতৃগণকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। অর্থোপার্জনের কৌশল আমার জানা নেই—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। অন্তরস্থিত সত্যের বাণী না শুনে কেন আমি বাইরের পৃথিবীর খেয়ালখুশিতে চলব? ভগিনি! আমার মন এখনো দুর্বল, তাই বাহ্য জগতের সাহায্য এলে সময় সময় অভ্যাসবশে তাকে আঁকড়ে ধরি। কিন্তু ভয় আমার নেই। ভয়ই

সবচেয়ে গুরুতর পাপ। আমার ধর্মের শিক্ষা তাই।..."[১৩]

বিভিন্ন মহল থেকে স্বামীজীর ওপর আঘাত ও আক্রমণের কিছু ঘটনার উল্লেখ করব। কলকাতার ঈর্ষাচঞ্চল খ্রীস্টান সমাজের প্রতিনিধি হয়ে কে. এস. ম্যাকডোনাল্ড নামক পাদরীরা স্বামীজীর বিরুদ্ধে ইংরেজী প্যামফ্লেট ছাপিয়ে বিতরণের কথা জানি। সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দের বৈমাত্রেয় ভাই বিহারীলাল চন্দ্র। এখানেই পাদরীরা গোপনে নিজেদের মধ্যে সভা করে গভর্নমেন্টকে দিয়ে উৎপাত করাতে চেষ্টা করেছিল। স্বামীজীর কাজের ওপর রাজনৈতিক অভিসন্ধি আরোপ করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য এবং খোদ আমেরিকায়, সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও রেভাঃ টি. ডি. ট্যালমাগের ও আরও অনেক খ্রীস্টভক্তদের কলম থেকে গদ্যেপদ্যে বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে বিরাট একটি ব্যঙ্গসাহিত্য তৈরি হয়ে গেল। তাতে নানা রসের সমাবেশ। বোম্বাইয়ের প্রার্থনাসমাজ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একযোগে বিবেকানন্দকে আক্রমণের কথাও এখানে উল্লেখ্য। এমনকি, রামকৃষ্ণমণ্ডলীর একাংশেরও সাময়িক সংশয় ছিল বিবেকানন্দের কর্মকৃতিপ্রসঙ্গে ; বিশেষ করে তাঁর বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণের নামের উল্লেখ না থাকায় গুরুভ্রাতাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব অখুশি হয়েছিলেন। স্বামীজীও তাঁর গুরুভাইদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন অনেক দুঃখ পেয়ে। বহু সুখদুঃখের সঙ্গী একান্ত আপনজন গুরুভাইদের তাঁর প্রতি অবিশ্বাস এবং তাঁদের হাতের আঘাত বড় বেশি বেজেছিল বিবেকানন্দের প্রাণে। কিন্তু পরবর্তী কালে বিদেশপ্রত্যাগত এই বিবেকানন্দের নির্দেশ গুরুভাইরা যেভাবে স্বীকার করে নিলেন এবং তাঁরা গুরুর পাশে গুরুভ্রাতাকে যেভাবে বসাতে পেরেছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে বিবেকানন্দ যে মানবসেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, বিবেকানন্দের কাছ থেকে সেই দায়িত্ব তাঁরা যে আন্তরিকতার সঙ্গে সমবেতভাবে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন—ধর্মজগতের ইতিহাসে এরও কোনও তুলনা নেই।

রক্ষণশীল সমাজের বিবেকানন্দ-বিরূপতার প্রধান তিনটি কারণ হল—সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সমুদ্রযাত্রা, খাদ্যাখাদ্যবিচারহীনতা, জাতপাত না মেনে ম্লেচ্ছের হাতে অন্নগ্রহণ এবং অব্রাহ্মণ হয়ে তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণ। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ স্বামীজীর এই তিনটি ঘোরতর অপরাধের কথা ভুলতে পারেনি। রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধিরূপে আসামের পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিবেকানন্দের সকল কর্মকীর্তিকে নস্যাৎ করে, বিবেকানন্দকে চূড়ান্ত অপমান করে একখানি গ্রন্থ রচনা করে সর্বত্র প্রচার করে বেড়ান। সবচেয়ে দুঃখের এবং লজ্জার কথা, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সর্বগুণান্বিত ব্যক্তিও এই অন্ধ কুসংস্কারের আবর্তে আবদ্ধ থেকে পূর্বোক্ত সব কারণেই কলকাতায় বিবেকানন্দ-সংবর্ধনাসভায় সভাপতিত্ব করতে অস্বীকৃত হন। কলকাতার অশিক্ষিত ব্যবসায়ী সমাজ—মাড়োয়ারীদের বিবেকানন্দ-বিরোধিতার কারণ বোঝা যায় কিন্তু স্যার গুরুদাসের মতো শিক্ষিত সুধীজনের কাছে এই ব্যবহার সত্যিই বড় পরিতাপের বিষয়। কিন্তু এই ছিল সেদিনকার সমাজের চেহারা। যাঁদের জন্য স্বামীজী তাঁর সর্বস্ব বিলিয়ে দিলেন, সেই প্রিয় স্বদেশবাসীর কাছেই তিনি সবচেয়ে বেশি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরেও ঐ রক্ষণশীলদের হীন চক্রান্তেই ম্লেচ্ছ শিষ্য-শিষ্যাসহ স্বামীজীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। যাঁর জন্য পৃথিবীর মানচিত্রে দক্ষিণেশ্বরের প্রতিষ্ঠা—সেই স্রষ্টা ও দ্রষ্টা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের

কাছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরদ্বার চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে থাকল। হিন্দুসমাজের এই কলঙ্ক কোনদিন মুছবে না। অকৃতজ্ঞ জাতি এভাবেই 'ঋষিঋণ' শোধ করল। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা অবশ্য এই যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে অপরাধের বোঝা অনেকটা লাঘব করেছিল।

শ্রীযুক্ত এন. এন. ঘোষের সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান নেশন'-এ স্বামীজীর মতের ও দর্শনের অবাধ সমালোচনা ও নিন্দা করেছিলেন স্বয়ং সম্পাদক। তবে কিছুদিন পরেই তিনি তাঁর ভুল সংশোধন করে বিবেকানন্দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। আর এক প্রতিভাবান বাঙালী মনীষীর ক্ষেত্রেও ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। প্রচণ্ড বিবেকানন্দ-বিরোধী সমালোচনা দিয়ে শুরু করে পরবর্তী কালে শুধু বিবেকানন্দ-সমর্থক নয়, একেবারে বিবেকানন্দের অনুগত শিষ্যরূপে রূপান্তরিত হয়ে যান। তিনি বিবেকানন্দের পরিচালিত হিন্দু আন্দোলনে এবং স্বামীজী-ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্মের দুটি তাত্ত্বিক মত নিয়ে বিবেকানন্দ- বিরোধিতায় নেমেছিলেন—(১) সৃষ্টির অনাদি অনন্ত রূপ (২) জন্মান্তরবাদ। তিনি লিখেছিলেনঃ 'আমাদের মতে—এই মত দুটি মানবজাতির প্রধান শত্রু। আমরা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করছি ইত্যাদি।...'

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার'-এর প্রচণ্ড বিবেকানন্দ-বিরোধী প্রচারের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই কাগজে বিবেকানন্দ-বিরোধী যেসব মুখরোচক সমালোচনা প্রকাশিত হত—আমেরিকার মিশনারি প্রভাবিত কাগজগুলিতে তা ফলাও করে প্রচারিত হত। 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান মেসেনজার'ও একদা ব্রাহ্ম, এখন দলত্যাগী বিবেকানন্দের বিরোধিতায় নেমেছিল। মিশনারিদের ও ব্রাহ্মদের গাত্রদাহের কথা ধরা পড়েছে এই কাগজের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের দার্জিলিং বক্তৃতার কথা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না; বস্তুত বিবেকানন্দ রক্ষণশীল হিন্দুর প্রতিনিধি কিনা, এই বিতর্কে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ব্রাহ্মসমাজের দুই মুখপত্র নিজেদের বিসম্বাদ সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে পরস্পর হাত মেলাল। অর্থাৎ স্বামীজী হিন্দু প্রতিনিধি নন একথাটিই প্রমাণ করতে চাইলেন।

মিশনারি কর্তৃক বিবেকানন্দের কাজের ওপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আরোপের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। মিশনারিরা আরও সক্রিয় হয়ে উঠল এই ব্যাপারে। স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে এক চিঠিতে (১৮৯৪, ২৭ সেপ্টেম্বর) তাই লিখলেনঃ "আমি খ্রীস্টান সরকারগুলির সত্য সমালোচনায় কিছু কড়া কথা সাধারণভাবে বলেছি কিন্তু তার মানে নয়, রাজনীতি আমার চর্চার বিষয় বা রাজনীতিজাতীয় বিষয়ের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক আছে।" তিনি রাজনীতির কপটতাকে, স্বার্থপরতাকে ঘৃণা করতেন। ঐ চিঠির দুদিন আগে কলকাতায় লেখা এক চিঠিতে স্বামীজী নিজ অনুগামীদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকবার নির্দেশ দেবার পরেই লিখেছেন—"তবে যদি পুলিশ-ফুলিশ পেছনে লাগে তোদের—দাঁড়িয়ে জান দে। ওরে বাপ, এমন দিন কি হবে যে, পরোপকারায় জান যাবে। ওরে হতভাগারা, এ দুনিয়া ছেলেখেলা নয়। বড়লোক তাঁরা—যাঁরা আপন বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন। এই হয়ে আসছে চিরকাল। একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার লোক তার উপর দিয়ে নদী পার হয়।"[১৪]

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা আজ আর কারও অবিদিত নেই কিন্তু স্বামীজীই প্রথম একথাটি বিশ্ববাসীকে জানান। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' অনেক দিন আগেই (১৮৯৪, ৩১ জুন) লিখেছিলঃ বহু ইংরেজ-শাসকের এবং মিশনারিদের চেষ্টায় সাম্রাজ্যের সঙ্গে খ্রীস্টানী ঘন আলিঙ্গনে জড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য ধর্মের প্রয়োজনে যদি নাও হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে যে ভারতকে ধর্মান্তরিত করা দরকার, তা মিশনারিরা খোলাখুলিই বলতে আরম্ভ করেছিল। শঙ্করীপ্রসাদ তাই লিখেছেনঃ "রাজনীতির সঙ্গে খ্রীস্টধর্মকে কিভাবে জুড়ে দিয়ে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে, তার ইতিহাসের কিছু অংশের সঙ্গে পরিচিত হবার পরে আমরা বুঝতেই পারি—ঐ পথে বাধা সৃষ্টি করে বিবেকানন্দ মিশনারিদের কাছে কোন অক্ষমণীয় অপরাধ করেছিলেন।"[১৫]

হিন্দু উত্থানে মিশনারি মহলে নৈরাশ্যের প্রধান কারণ তাঁদের স্বার্থহানি এবং এজন্য প্রধানত দায়ী বিবেকানন্দ। তাই তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও জোরদার হয়ে উঠল এবং মিশনারি পত্রিকাগুলিতে হিন্দুধর্মের কুৎসা প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়ে চলল। শঙ্করীপ্রসাদ লিখেছেনঃ "অতঃপর আসরে নেমে পড়লেন কয়েকজন নিন্দামুখর মিশনারি এবং এই বিবেকানন্দ-যুদ্ধে সৈনাপত্য গ্রহণ কবলেন স্বয়ং রেভাঃ মার্ডক। কিন্তু সম্মিলিতভাবে মিশনারিদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে অবিচল বিবেকানন্দ পূর্বসূরিনির্দিষ্ট কাজ করে চলেছেন। ক্রমশই বিবেকানন্দের স্বর্গ-মর্ত-পরিব্যাপ্ত বিশাল বিশ্বরূপ প্রকাশিত হতে লাগল বিশ্বসমাজে। নির্ভীক স্থির পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন স্বামীজী সুনিশ্চিত কুরুক্ষেত্র জয়ের তথা বিশ্বজয়ের দিকে। মার্ডকের আগে খ্রীস্টের ধ্বজাধারী খ্রীস্টান পুরুতদের অনেকেই সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত করেছেন স্বামীজীকে। এদের মধ্যে বেদ-নিন্দুক লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির রেভাঃ টি. ই. স্লেটার এবং রেভাঃ জোসেফ কুক অন্যতম। স্বামীজীর পাপবাদ-বিরোধিতাকে ধর্মদ্রোহিতা বলে আক্রমণ করেছিলেন কুক সাহেব। স্বামীজীবর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বকে হিদেন বিবেকানন্দের অক্ষমণীয় অপরাধ বলেও তিনি নির্মমভাবে আক্রমণ করলেন। সংঘবদ্ধ হয়ে রেভাঃ জি. টি. সুলিভ্যান, হিউম, পেন্টিকস্ট প্রভৃতি সহ ক্রুদ্ধ মিশনারির দল সভা করে ধর্মসভাকে 'পৃথিবীর বৃহত্তম জুয়াচুরি' আখ্যায় ভূষিত করলেন। 'একটি ধর্মান্তরের জন্য যেখানে আমেরিকানদের ২৫-৩০ হাজার ডলার খরচ করতে হয়', সেখানে আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে একজন হিদেন এসে নিজ ধর্ম প্রচার করবে, দলে দলে লোক তাঁর পিছনে ছুটবে, হাজার হাজার লোক তাঁকে খাতির করবে, অসহ্য! অসহ্য! ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তাই ভারত ও বিবেকানন্দ কুৎসা-নিন্দার জোয়ারে ভেসে গেল তাঁদের ভদ্রতা-সংস্কৃতির শেষচিহ্নটুকু পর্যন্ত।[১৬] বিবেকানন্দের অপরাধ তিনি বড় সত্য কথা বলেছেন খ্রীস্টীয় ধর্ম ও ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে। সহজ সত্যটি তুলে ধরেছেন স্বামীজী বিশ্বের জনসমাজের কাছেঃ "তোমাদের দম্ভ আর বড়াইয়ের শেষ নেই। কিন্তু বলতে পারো, অস্ত্র ছাড়া তোমাদের খ্রীস্টধর্ম কোথায় সফল হয়েছে? সমস্ত পৃথিবীতে তেমন একটি জায়গা দেখাও। একটি মাত্র জায়গা—একটি মাত্র—দুটি নয়—খ্রীস্টধর্মের ইতিহাস থেকে তার উল্লেখ খুঁজে এনে দাও। আমি জানি তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন; না হয়ে উপায় ছিল না, নচেৎ খুন হতে হত। এই ইতিহাস তোমাদের।"

বিজ্ঞানে দর্শনে সঙ্গীতে সাহিত্যে শিল্পে ভারতবর্ষ তার সম্পদ উজাড় করে দান

করেছে পৃথিবীকে। বিনিময়ে পৃথিবী কি দিয়েছে তাকে? অগণিত পাণিপথ ও পলাশীর শ্মশানপ্রান্তরের দিকে অশ্রুরক্ত আঁখি মেলে বিবেকানন্দ বললেনঃ "বিনিময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীর কাছ থেকে পেয়েছে কেবল ধিক্কার, অভিশাপ, ঘৃণা। পৃথিবী, ভারতের সন্তানদের রক্তস্রোতের উপর দিয়ে হেঁটে গেছে, তাকে হৃতসর্বস্ব নিঃস্ব করেছে, তার পুত্রকন্যাকে করেছে ক্রীতদাস। সেই ক্ষতের ওপর এখন সে অপমানের নুন ছড়াচ্ছে—তার কাছে এমন একটি ধর্মকে প্রচার করছে যা অপর ধর্মের বিনাশের দ্বারাই পুষ্ট হতে পারে। কিন্তু ভারত ভীত নয়। অন্য কোনো জাতির কাছে সে কৃপাভিখারী নয়। আমাদের একমাত্র দোষ আমরা জয় করবার জন্য লড়াই করি না। কিন্তু আমরা সত্যের নিত্যরূপে বিশ্বাস করি।... ভারতের বাণী—শান্ত মহত্ত্ব, ধৈর্য, মাধুর্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।" এইসব রূঢ় নির্মম সত্যের সুতীব্র আলোকে খ্রীস্টান পাদরীদের চোখ ঝলসে গিয়েছিল। তাই তাঁরা অন্ধ আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে, হিন্দুধর্ম যে হীনতম ধর্ম, সব অমানবিকতার ও নীতিহীনতার উৎস—তা প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। রেভাঃ পেন্টিকস্ট বাঙালীকে বলেছিলেন 'মনুমেন্টাল লায়ার্স'। এই পেন্টিকস্ট সাহেব ক্রোধে ও বিদ্বেষে মনের ভারসাম্য হারিয়ে অনেক আবোল-তাবোল বলেছিলেন। জনৈক মিঃ হাডসন বিবেকানন্দের সবকিছু নিয়েই তীব্র আক্রমণ করেন। এমনকি, শিকাগো ধর্মসভায় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে 'ভাইবোন' বলে সম্বোধন করার স্পর্ধা দেখিয়েছেন বলেও প্যাগান বিবেকানন্দকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। রেভাঃ হোয়াইট হেডের বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক আক্রমণও স্মরণযোগ্য। স্বামীজীকথিত সব তত্ত্বকেই অসার অর্থহীন প্রতিপন্ন করতে গিয়ে নিজেই তিনি হাস্যাস্পদ হন কলকাতার এক সভায়। বিবেকানন্দ-নিধনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল রেভাঃ মার্ডকের। ধর্মপ্রচারক নাম গ্রহণ করে এই ভদ্রলোক পরধর্মের গ্লানি কথনে ও কুৎসা রটনায় অর্ধশতাব্দী কাল নিয়োজিত ছিলেন। তিনটি পুস্তিকা লিখে তিনি তাঁর বিবেকানন্দ-সংহার-বাসনা চরিতার্থ করেন। এই ভদ্রলোকের হিন্দুবিদ্বেষ তুলনাহীন। এই রেভাঃ মার্ডকই What the Hindu Gentlemen did not say—লেখাটিতে ('লোন স্টার' পত্রিকায় প্রকাশিত) হিন্দুধর্মকে একেবারে নরকে নিক্ষেপ করেন।

হিন্দুধর্মের জন্যই যে হিন্দুরা অর্ধসভ্য ও মনুষ্যত্বহীন, হিন্দুর বৈদিক ঋষিরা কাঠুরে ছিলেন, হিন্দুর প্রধান দেবতা কৃষ্ণ নিষ্ঠুর, খুনী ও লম্পট, হিন্দুর অন্যান্য দেবতারাও চরিত্রহীন, ঠগ ও জোচ্চোর—এসব তথ্যই তিনি নিবেদন করে গেছেন এবং এর সঙ্গে ছিল ব্যক্তি বিবেকানন্দের চরিত্রহনন। কিন্তু সম্মিলিতভাবে মিশনারিদের এই হীন বেপরোয়া আক্রমণ, পশ্চাদ্দেশে অবিরাম আঘাত সত্ত্বেও বিবেকানন্দের অগ্রগতি কিন্তু রোধ করা গেল না। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে স্বামীজীর প্রচারসাফল্য নিয়ে মিশনারিদের প্রচুর ব্যঙ্গবিদ্রূপ সত্ত্বেও দেখা গেল পাশ্চাত্যে ক্রমশ প্রসারিত হয়ে পড়ছে স্বামীজীব্যাখ্যাত বেদান্ত ধর্ম। স্বামীজী পাশ্চাত্যের কাছে যে বেদান্তভাব দিয়েছেন তা ক্রমশই শিক্ষিত পাশ্চাত্যবাসীরা গ্রহণ করছেন। বেদান্তই যে ভবিষ্যৎ মানবসমাজের একমাত্র ধর্ম হবে বলে স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন তা সত্য হতে চলেছে। স্বামীজীর বেদান্ত ধর্ম ইতিমধ্যেই উদারনৈতিক খ্রীস্টানমহলে সত্যিই প্রভাববিস্তার করছিল। "স্বামীজীর স্বপ্নের ভারত, ধ্যানের ভারত, তাঁর

প্রিয়তম পবিত্র পুণ্যভূমি ভারত সম্পর্কে যখন এরকম সব কুৎসা-অপবাদ চারিদিকে প্রচারিত হচ্ছিল, কী যে গভীর মর্মন্তুদ মানসিক যন্ত্রণায় তিনি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর মর্মের গভীর ক্ষত থেকে যে অজস্র রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, তার উষ্ণতা আজও যেন আমরা অনুভব করতে পারি এবং তখনই আমাদের মনে পড়ে স্বীয় গুরুদেব সম্পর্কে লোকমাতা নিবেদিতার সেই অসাধারণ উক্তিঃ ভারতবর্ষ ছিল স্বামীজীর গভীরতম আবেগের কেন্দ্র। ভারতবর্ষ নিত্য স্পন্দিত হত তাঁর বুকের মধ্যে, প্রতিধ্বনি হত তাঁর ধমনীতে; ভারতবর্ষ ছিল তাঁর দিবাস্বপ্ন, ভারতবর্ষ তাঁর নিশীথের দুঃস্বপ্ন। শুধু তাই নয়। তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষ—রক্তে মাংসে গড়া তার ভবিষ্যৎ—সবকিছুর তিনি ছিলেন প্রতীকপুরুষ।...ভারতের চিন্তাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। যে মুহূর্তে আমি তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষে পদার্পণ করলাম, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে আর এক অগ্নির নিরন্তর দহনজ্বালা লক্ষ্য করেছি। সে কোনও তত্ত্ব, কোনও আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা উন্মাদনা নয়। দেশ-জাতির দুর্দশা নিবারণের প্রাণান্ত প্রয়াস ও তার নিষ্ফলতার জন্য মর্মান্তিক ভোগ।"

সুবিখ্যাত মিশনারি-শিক্ষাবিদ্ রেভাঃ হেনরি মিলারের মানসিকতার পরিবর্তনও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রথম জীবনের উৎসাহী মিশনারির ভূমিকা ত্যাগ করে তিনি বিবেকানন্দের উদার ধর্মমতের সমর্থক হয়ে ওঠেন। মেরী হেলকে লেখা চিঠি থেকে (১৮৯৫, ২৬ জুন) স্বামীজীর বক্তব্যই এখানে উদ্ধৃত করছিঃ "সেদিন মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজের প্রেসিডেন্ট মিঃ (জন হেনরি) মিলার আমার চিন্তাগুলি বহুলাংশে সন্নিবিষ্ট করে বলেছেন যে, পাশ্চাত্যের কাছে ঈশ্বর এবং মানব সম্বন্ধে হিন্দুভাবগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেগুলির প্রচারের জন্য পাশ্চাত্যে যেতে তরুণদের তিনি আহ্বান করেছেন। এর ফলে মিশনারিমহলে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হল। মিলার কি ভিতরে-ভিতরে থিয়জফিস্ট হয়ে পড়েছেন কিংবা ব্রাহ্ম কিংবা বৈদান্তিক?—কট্ সন্দেহে অস্থির হয়ে তাঁকে পাদরীরা বললেনঃ লোকটি নেকড়ের চামড়া-ঢাকা ভেড়ুয়া, নিজের নীতি ও আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি।"[১৭] মিঃ মিলার হিন্দুধর্মের যে-সব সদ্‌গুণের কথা উল্লেখ করেছিলেন তার প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেন ডঃ হাডসন এবং এভাবে চারিদিকে বিবেকানন্দের সমর্থনের সংবাদে ক্রম অসহিষ্ণু পাদরী ও খ্রীস্টানসমাজ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে প্রবলভাবে বিবেকানন্দ-অপপ্রচারে নেমে পড়লেন। পরাধীন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর সঙ্গে গাঁটছড়াবাঁধা মিশনারিদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আঘাত, আক্রমণ ও অবিশ্রান্ত কুৎসা কী যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল সেদিন, আজকে তার সঠিক রূপ ধরা পড়বে না। শতসহস্র রথিবেষ্টিত হয়ে একা সেদিন যুদ্ধ করতে হয়েছিল স্বামীজীকে অজস্র শত্রুর সঙ্গে। 'ঘরে আগুন বাইরে তুফান' নিয়ে এগোতে হয়েছিল তাঁকে। হৃতস্বাস্থ্য, বহু আঘাতে-আঘাতে জর্জরিত, রক্তাক্ত দেহ ও বিষণ্ণ মন নিয়ে সম্মুখসমরে তবু একা যুদ্ধ করে গেছেন একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ও সমগ্র খ্রীস্টানসমাজের বিরুদ্ধে। শত্রু তবু কখনও তাঁর পশ্চাদ্দেশের সন্ধান পায়নি। পবিত্র মাতৃপতাকা ঊর্ধ্বে দুই হাতে তুলে ধরে সর্বত্র এগিয়ে গিয়েছেন বিজয়ীর গৌরবে। দলে দলে পাশ্চাত্যবাসী বিবেকানন্দের অনুগত এবং হিন্দুধর্মের অনুগামী হচ্ছে বলে সংবাদ ইতিমধ্যেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। হঠাৎই একদিন মিশনারিদের

কাগজে দেখা গেল চার শতের (৪০০) অধিক খ্রীস্টানকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে বলে বিবেকানন্দকে দায়রা সোপর্দ করা হল। সাম্রাজ্যবাদী শাসককুলের সঙ্গে মিশনারিদের যোগসাজসের কথা সর্বজনবিদিত। সর্বত্র সকল দেশেই দেখা গেছে সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির পিছনে পিছনে ফেউয়ের মতো মিশনারিরা প্রবেশ করে। পরাধীন ভারতে ঐ মিশনারিদের প্ররোচনায়ই একদিন দেখা গেল লালমুখো এক সাহেব পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট-এর নেতৃত্বে গোপনে একটি সি. আই. ডি. পুলিশের দলকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে হিদেন বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে। রাত্রিদিন তারা নজর রাখত স্বামীজীর গতিবিধির উপর। চারিদিকে যখন এতসব উৎপাত আঘাত বিপর্যয়, বিভিন্ন মহল থেকে নির্দয় শত্রুর আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হচ্ছেন, তখনও দেখি স্মিত শান্ত-প্রশান্ত হৃদয় নিয়ে সবকিছু উপেক্ষা করে গভীর আত্মপ্রত্যয়ে নগাধিরাজ হিমালয়ের মতই আপন অভ্রভেদী ঐশী মহিমায় স্বামীজী দাঁড়িয়ে আছেন। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতই চূড়ান্ত আঘাত, অপমান ও লৌকিক পরাজয়ের মুহূর্তেও যথার্থ বীরের মতই একটিও সামান্য কাতরোক্তি করছেন না। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলেছিলেন: 'তুই যে বীর রে'। গুরুর মুখে এই বীর আখ্যায় ভূষিত হয়ে স্বামীজী সেদিন কি বুঝতে পেরেছিলেন কী গভীর তাৎপর্য বহন করে আনবে এই বীর শব্দটি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে। ক্রুশবিদ্ধ খ্রীস্টপ্রভুর মতই শত্রুর আক্রমণ, ভ্রূকুটি অনায়াসে উপেক্ষা করে গেছেন স্বামীজী। শত্রুর মুখের অজস্র ধিক্কার বাণী শুনে, শত্রুর দেওয়া কণ্টকমুকুট মাথায় পরে—সমস্ত রকম ব্যঙ্গ-উপহাসের মুখেও ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতই—সবকিছুকেই পরম করুণাময় ঈশ্বরের দান বলে নম্রচিত্তে শ্রদ্ধিত হৃদয়ে গ্রহণ করে গেছেন বিবেকানন্দও! Thy will be done ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক প্রভু।



শ্রীরামকৃষ্ণের অখণ্ডবিলাসী ঋষি নরেন। বহু শক্তির উজ্জ্বল আভায় দীপ্র। নববেদান্তের মহান বার্তাবহ। অপার করুণায় নবযুগের বুদ্ধ। আশ্চর্য মনীষা ও সংগঠন প্রতিভায় আচার্য শঙ্কর। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমন্বয়ী ভাবের প্রবক্তা। তাঁরই পরম আশ্বাস মানুষের জন্য—'অমৃতের তুমি অধিকারী'। সকল কর্ম, সকল সংগ্রামই আত্মবিকাশের সাধনা। ধর্ম অন্তরজগতের উন্মোচন।

এত বড় মহাপুরুষ, একাধারে এত গুণ...

স্বামী আত্মস্থানন্দ

॥ এক ॥

বাগবাজারে বলরাম মন্দির। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই। রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে শুভাগমন হয়েছে। তিনদিন আছেন তিনি। বলরাম মন্দিরের দোতলায় উঠে ডানদিকে হলঘরের পাশেই তাঁর থাকার ঘর। ভক্ত বলরামের নিত্য শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবাদিব জন্যই একমাত্র এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ রাত্রি অতিবাহিত করতেন। আর প্রতিবৎসর রথযাত্রায় তিনি ভক্তদের সঙ্গে আনন্দে নৃত্যাদি করতেন, ভাবে মাতোয়ারা হতেন। এ বছরও তাব কোনও ব্যতিক্রম হয়নি।

বলরাম মন্দিরের দোতলায় রথ টানা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং রথের রজ্জু টানতেন এবং রথাগ্রে তিনি ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও কীর্তন করতেন।

রথের পরের দিন ১৫ জুলাই। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ছোট ঘরটিতে বসে আছেন। তিনি ভক্তদের 'অতি গুহ্য' কথা বলছেন—পূর্ণ, নরেন্দ্র, নিরঞ্জন প্রভৃতির গুণ বিচার করেছেন, তাঁদের চরিত্র বিশ্লেষণ করছেন, তাঁদের মহত্ত্ব-কথা বলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলছেন নরেন্দ্রের গুণের কথা।

"নরেন্দ্র খুব উঁচু ঘর...। পুরুষের সত্তা।

"এতো ভক্ত আসছে, ওর মতো একটি নাই।

"এক একবার বসে বসে খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারু দশদল, কারু ষোড়শদল, কারু শতদল, কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।

"অন্যেরা কলসী, ঘটি, এসব হতে পারে,—নরেন্দ্র জালা।

"ডোবা পুষ্করিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি। যেমন হালদার পুকুর।

"মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ—পোনা, কাঠি, বাটা, এইসব।

"খুব আধার,—অনেক জিনিষ ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ।

"নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়-সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা। ..."নরেন্দ্র পুরুষ। গাড়িতে তাই ডানদিকে বসে।...

"নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল।"[১]

শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি মানুষের ভিতর-বাহির স্বচ্ছ কাঁচের মতে সুস্পষ্ট দেখতে পেতেন,

তিনি বসে বসে খতিয়ে দেখছেন তাঁর সংস্পর্শে আসা মানুষদের, তাঁর অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ ভক্তদের। দেখলেন—নরেন্দ্রের 'মতো একটিও নাই।' নরেন্দ্র তুলনাহীন, নবেন্দ্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি, নরেন্দ্র অন্য ধাতের যুবক।

শ্রীরামকৃষ্ণ-আঙ্গিনায় সেদিন সম্মিলিত হয়েছেন বিভিন্ন পেশার ও নানান শ্রেণীর মানুষের দল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ যুবকেরা কিংবা রুচিমান সুশিক্ষিত গৃহী শিষ্যেরা যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন; তেমনি তিনি নৈকট্য অনুভব করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার দিক্‌পালদের; দয়ানন্দ সরস্বতী, গৌরী পণ্ডিত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নারায়ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি সাধকদেব; জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কার, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতদের, অন্নদা বাগচীর মতো শিল্পী, যদুনাথ মল্লিকের মতো জমিদার, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের মতো অধ্যাপক, রাজকৃষ্ণ রায়ের মতো লেখক, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতো সাংবাদিক, প্রিয়নাথ মুখুজ্জের মতো ইঞ্জিনিয়ার, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতির মতো ডাক্তার-কবিরাজ, অতুল ঘোষের মতো উকিল, অধব সেনের মতো ডেপুটি, রাজেন দত্তের মতো উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণেব অন্তরঙ্গতা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন ব্রাহ্মভক্তদের, কীর্তনীয়াদের, আরও কত মানুষদের।

কিন্তু নরেন্দ্রর মতো কাউকে তিনি খুঁজে পেলেন না। মহত্ত্বে পরিপূর্ণ, সর্বগুণান্বিত, সর্বালঙ্কাব-ভূষিত, সর্ববিদ্যা-বিশারদ, সর্বমুখী-প্রতিভাসম্পন্ন, সর্ব-ইন্দ্রিয়জয়ী, দৃঢ় চরিত্রবান অর্থাৎ 'নরেন্দ্রনাথে'র মতো এমন নরোত্তম—একজন পূর্ণ মানব (a total man) শ্রীরামকৃষ্ণের সুতীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখে আর ধরা পড়ল না। জীবনের বিভিন্ন দিকের সর্বোচ্চ সফলতম ব্যক্তিরা, যাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে এক একজন খ্যাতিমান, এক একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র—তাঁদের মধ্য থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একজন কাউকে পেলেন না যিনি নরেন্দ্রনাথের সমকক্ষ। তাঁরা একটিমাত্র কলার অংশীদার। নরেন্দ্রনাথ যোড়শকলায় পূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—বাগ্মী-সুপণ্ডিত কেশবচন্দ্র সেন একটিমাত্র শক্তির সহায়তায় জগদ্‌বিখ্যাত হয়েছিলেন। আর নরেন্দ্রনাথের মধ্যে এমন আঠারোটি শক্তি ছিল। এসব বিচার-বিশ্লেষণে নরেন্দ্রনাথ—পরবর্তী কালের স্বামী বিবেকানন্দ একজন পূর্ণ মানুষের প্রতীক। কোনদিকে তাঁর কমতি নেই, কোনদিকে খামতি নেই—সর্বদিকে দিগ্বিজয়ী।

দার্শনিকপ্রবর ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সত্যই বলেছিলেনঃ "এই কলিকাতা নগরীতে শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় শক্তিসম্পন্ন বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ।"[২]

॥ দুই ॥

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ "...চোখ-মুখ দেখে বোধ হল ভিতরে কিছু আছে।" বলতেনঃ 'নরেনের অনেক গুণ।' নরেন্দ্রনাথের গুণপনার চিত্র অঙ্কন করেছেন নিপুণ জীবন-শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ। "নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়াশুনায়—সব তাতেই ভাল।" তর্কে তাঁর সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারে না। তিনি

হোমাপাখি। দুরন্তপনায় ভরপুর। সংসারে আবদ্ধ নন—তাঁর মধ্যে সংসার আসক্তির কণামাত্র নেই। 'ছেলেবেলা থেকে ঈশ্বরেতে মন।' "নরেন্দ্র কাহাকেও কেয়ার (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়িতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল জায়গায় বসতে বললে—তা চেয়েও দেখলে না। ...আবার যা জানে, তাও বলে না—পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান। মায়ামোহ নাই।—যেন কোন বন্ধন নাই। খুব ভাল আধার।" "তার যেমন বিদ্যে তেমনি বুদ্ধি।" "অনেকের সাধ্যসাধনা করে একটু ভক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা। যেন পাতাল ফোঁড়া শিব—বসানো শিব নয়।" নরেন্দ্রনাথের দেহবুদ্ধিই নেই। 'চোখ সুমুখঠেলা।' 'কপাল ও চোখের লক্ষণ ভাল।' নরেন্দ্রনাথকে তিরস্কার করলেও রাগ করে না। শুদ্ধ ভক্ত। বেশ সরল। নরেন্দ্রনাথ বিবেকী, বৈরাগ্যবান, সত্যবাদী।[৩] "আর সবাইকে দেখি কেউ পিদ্দিম, কেউ একটা বড় বাতি, বড়জোর এক একটা বড় (উজ্জ্বল) তারা, কিন্তু নরেন আমার সূর্য। ওর কাছে আর সবাই ম্লান হয়ে যায়।" "ওটা ওর অহংকার নয়, ওর নাম তেজ, ওর মনটা নীচে নামেই না।"[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন্দ্র-গুণ-বিচারে এক পূর্ণাঙ্গ, এক সম্পূর্ণ নরেন্দ্রনাথকে পাই। একটি মানুষের কি কি গুণ থাকলে তাঁকে পূর্ণ মানব বলা যায়—শ্রীরামকৃষ্ণের কথা থেকে তাও জানতে পারি। জগতের মানুষের মধ্যে যা কিছু বৃহৎ, যা কিছু উত্তম, যা কিছু মহৎ—সবই নরেন্দ্রনাথের মধ্যে আছে—এগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-মানসলোকে বিধৃত হয়েছিল। নরেন্দ্রের আছে পুরুষের সত্তা, ভুবন-ভুলানো রূপ, কোনও কিছুতেই তাঁর আসক্তি নেই, ইন্দ্রিয়সুখের বশ নন তিনি; পরম তার্কিক কিন্তু দাম্ভিক নন; সুগায়ক, পাখোয়াজ-বাদনে, যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শী, বিদ্বান, জ্ঞানী, সংসারে আসক্তির লেশমাত্র নেই; নিজেকে জাহির করার অভ্যাস নেই; কাউকে কেয়ার করেন না কিন্তু শ্রদ্ধাবান, বিনয়ী। তিনি মায়ামুক্ত, বন্ধনহীন, দেহবোধরহিত; একটুও রাগ করেন না। ভক্ত, সরল, বুদ্ধিমান, বিবেকবান, বৈরাগ্যবান ও সত্যাশ্রয়ী, ঈশ্বরে তাঁর আজন্ম ভালবাসা। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে তুলনা করেছেন সহস্রদল পদ্ম, জলের জালা, বড় দীঘি, রাঙা চক্ষু বড় রুই, বড় ফুটোওয়ালা বাঁশ, পাতাল ফোঁড়া শিবের সঙ্গে।

॥ তিন ॥

পূর্ণ মানুষ নরেন্দ্রনাথের কোথাও খুঁত নেই—নিখুঁত মানুষ তিনি। নিখুঁত নরেন্দ্রনাথের মর্মস্পর্শী নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ তাঁর মনীষা-ঋদ্ধ দৃষ্টি দিয়েঃ "বিবেকানন্দের দেহ ছিল মল্লযোদ্ধার মতো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী।...প্রশস্ত গ্রীবা, বিস্তৃত বক্ষ, সুদৃঢ় গঠন, কর্মিষ্ঠ পেশলবাহু, শ্যামল চিক্কণ ত্বক, পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সুবিস্তৃত ললাট, কঠিন চোয়াল আর অপূর্ব আয়ত পল্লবভারে অবনত ঘনকৃষ্ণ দুটি চক্ষু। তাঁহার চক্ষু দেখিলে প্রাচীন সাহিত্যের সেই পদ্মপলাশের উপমা মনে পড়িত। বুদ্ধিতে, ব্যঞ্জনায়, পরিহাসে, করুণায় দীপ্ত প্রখর ছিল সে চক্ষু, ভাবাবেগে ছিল তন্ময়; চেতনার গভীরে তাহা অবলীলায় অবগাহন করিত, রোষে হইয়া উঠিত অগ্নিবর্ষী; সে দৃষ্টির ইন্দ্রজাল হইতে কাহারও অব্যাহতি ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার রাজকীয়তা:

তিনি ছিলেন আজন্ম সম্রাট। কি ভারতবর্ষে, কি আমেরিকায়, কোথাও এমন কেহ তাঁহার পাশে আসেন নাই, যিনি তাঁহার নিকট নতশির না হইয়াছেন।"[৫]

এ হল জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পূর্ণ মানুষ নরেন্দ্রনাথের পরিচয়। ধর্মমহাসম্মেলনের পরেই 'বস্টন ইভনিং' ; 'ট্রান্সক্রিপ্ট' ; 'ক্রিটিক' প্রভৃতি আমেরিকান সংবাদপত্রগুলি তারস্বরে এই পরিচয়ই তুলে ধরেছিলেনঃ বিবেকানন্দের লম্বা মজবুত চেহারা, বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গি, মুখ কামানো, অঙ্গের গঠন সুসমঞ্জস. দাঁতগুলি সাদা, সুচারু ওষ্ঠদ্বয়, সুঠাম মস্তক। সহজ চালচলনের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল ব্যক্তিগত গাম্ভীর্য। তাঁর ছিল বালক-সুলভ সরলতা, চমৎকার ভাবরাশি, দেবদত্ত বাগ্মিতা, প্রতিভাদীপ্ত দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখচ্ছবি, আন্তরিকতাপূর্ণ বাণী, সুমিষ্ট সতেজ কণ্ঠস্বর। তাঁর মুখশ্রীতে কমনীয়তা, বুদ্ধিমত্তা ও জীবন্তভাব। ছিল না আত্মশ্লাঘার লেশমাত্র। "তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন এই জীবনের পরিপূর্ণতা এবং পরজীবনের ধ্যানের জন্যই সৃষ্ট।"[৬]

কি অধ্যাত্ম দৃষ্টিভঙ্গি, কি জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি—উভয় দৃষ্টিভঙ্গিব চুলচেরা বিচারে নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দ পূর্ণ মানুষরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত। কি প্রাচ্য চিন্তাধারা, কি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা—উভযের বিশ্লেষণে বিবেকানন্দ একজন পূর্ণ মানুষ—'টোটাল' মানুষ, 'পারফেক্ট' মানুষ।

॥ চার ॥

স্বামীজীর আবির্ভাবই ছিল জগৎকল্যাণের জন্য। এজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সপ্তর্ষিলোক থেকে মর্তধামে এনেছিলেন। কি ভারত, কি ভারতেতর দেশ—সর্বদেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য তাঁর চিন্তারাশি সর্বজনবিদিত। ভারতবাসীর সর্ববিধ উন্নতির জন্য যেমন তাঁর চিন্তা ছিল অহরহ, তেমনি তাঁর ছিল বিদেশীদের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির চিন্তা। স্বামীজীর জীবনদর্শনে উভয়েরই চিন্তাধারা কথিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। মাত্র সাড়ে নয় বছরের মধ্যে স্বামীজী গোটা বিশ্বকে তোলপাড় করে দিয়েছিলেন। চরকির মতো আমেরিকার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে বেদান্তের বীজ ছড়িয়েছিলেন। তৎকালীন পৃথিবীর মধ্যে শক্তিশালী, দাম্ভিক, উন্নাসিক ব্রিটিশ রাজ্যের খোদ রাজধানীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে বেদান্ত-তীর নিক্ষেপ করে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। ঘুমন্ত, পরানুকারী, কলহপ্রিয়, জেলিফিশ ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক ও জাগতিক চেতনা জাগ্রত করেছিলেন। এ পূর্ণ মানব ব্যতীত আর কার সাধ্য? স্বামীজী ছিলেন পূর্ণাঙ্গ মহাপুরুষ।

গীতোক্ত দৈবীসম্পদ—ভয়শূন্যতা, ব্যবহারকালে পরবঞ্চন ও মিথ্যাকথন-বর্জন, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, সামর্থ্যানুসারে দান, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ প্রকাশ না করা, দীনে দয়া, লোভরাহিত্য, মৃদুতা, অসৎ চিন্তা ও অসৎ কর্মে লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, অবৈরভাব, অনভিমান—এই ছাব্বিশটি গুণ থাকলে মানুষ সাত্ত্বিকী অবস্থালাভ করে।[৭] অর্থাৎ একজন মানুষ পূর্ণ মানুষরূপে পরিগণিত হয়। স্বামীজীর জীবনে এগুলির প্রত্যেকটি পূর্ণরূপে, সুষমভাবে বিকশিত হয়েছিল। মানুষ একটি বা দুটি বা

ততোধিক গুণে জগতে খ্যাতি লাভ করেন। আর স্বামীজীর জীবনে এরূপ ছাব্বিশটি গুণের একত্র সমাবেশ হয়েছিল। স্বামীজীর মধ্যে পূর্ণ মানবতা ছিল বলে তা সম্ভব হয়। আচার্য শঙ্কর বলেছেন ঃ

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্‌দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।।[৮]

অর্থাৎ মনুষ্যজন্মপ্রাপ্তি, সংসারবন্ধন হতে মুক্তিলাভের আগ্রহ এবং জ্ঞানী সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ, এই তিনটি জগতে দুর্লভ। কেবলমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহে এইগুলি পাওয়া সম্ভব। ঈশ্বরকৃপায় স্বামীজী তিনটিই পেয়েছিলেন। স্বামীজীর জন্মের মুহূর্তকালে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদর্শন হয়েছিল—কাশীধাম থেকে উজ্জ্বল তারকা খসে পড়ল সিমলার দত্ত পরিবারে। তিনি বললেন ঃ 'যে আমার কাজ করবে, সে এল।' শ্রীরামকৃষ্ণের মতো সদ্‌গুরু লাভ করেছিলেন তিনি। জগতের এই তিনটি দুর্লভ জিনিস তাঁর করায়ত্ত ছিল। খুব কম মানুষের ভাগ্যে এরূপ ঘটে। স্বামীজীর নিজেরই উক্তি ঃ "ভাবলাম আমার তো তিনটিই হয়েছে।—অনেক তপস্যার ফলে মানুষ জন্ম হয়েছে, অনেক তপস্যার ফলে মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে, আর অনেক তপস্যার ফলে এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয়েছে।"[৯] পূর্ণ মহাপুরুষে এই তিনটি একসঙ্গে থাকে। স্বামীজী এই শ্রেণীর মহাপুরুষ।

মানুষ শুধুমাত্র রক্তমাংসের শরীর নয়, জড়পদার্থও নয়। মানুষ তুচ্ছ নয়, আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত জীবও নয়। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন লিখেছেন ঃ "...মানুষ জাগতিক অবস্থা ও সম্পত্তির উপর নির্ভবশীল নয়, মানুষ সীমাবদ্ধও নয়।...মানুষের জীবনে পূর্ণতা লাভ আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে। এতে মানুষের প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বোচ্চ অবস্থায় উন্নীত হয়, সকল ইন্দ্রিয়বর্গ স্তব্ধীভূত হয়, মন অনন্তমুখী হয়। সে অবস্থায় যা অনুভূতি হয়, তা বর্ণনাতীত।"[১০]

সুতরাং মানুষের পূর্ণ পরিণতি আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে। মানুষ তখন চৈতন্যময়, 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'; 'মহতো মহীয়ান্', সে দেবত্ব লাভ করে, তার অনন্ত সুপ্তশক্তি বিকশিত হয়। মানুষের মধ্যে তখন ঈশ্বর সর্বাধিক প্রকাশিত হন। মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জবানীতে মানুষ 'মান হুঁশ' হয়। স্বামীজীরও তাই ছিল। তাঁরও সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি ছিল, তাঁর মধ্যে দেখি অনন্ত শক্তির সুষম প্রকাশ। তখন পূর্ণ মানব স্বামীজী হয়ে উঠলেন বিশ্বমানব। আবিশ্বকে আপন করে নিলেন। তিনি ছিলেন আপামর জনসাধারণের আপনজন। সর্বদেশের, সর্বশ্রেণীর, সর্বধর্মের, সর্বসম্প্রদায়ের, সর্বমানুষের প্রতি স্বামীজীর ছিল সমদৃষ্টি, সমপ্রেম, সম ভালবাসা, সমকরুণা।

॥ পাঁচ ॥

মানুষের আছে বৈশিষ্ট্যসূচক প্রকৃতি যা জীবজগতে অতুলনীয় ও অন্যান্যদের থেকে পৃথক। ইউরোপের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 'গ্রীক-দার্শনিকরা মানুষকে সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত করে এবং নিজেরই দাসত্ব করে, অন্যের নয়। সকল অমানবসুলভ নিয়ন্ত্রণ হতে এই প্রকারের মুক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবীয় মহৎ কর্মের অত্যাশ্চর্য নিদর্শন সৃষ্টি করে।' ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি মানুষ সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছেন। পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলরের উক্তি ঃ

'মানুষই আধিবিদ্যক প্রাণী।' (Man alone is a metaphysical animal).[১১] স্যার জুলিয়ান হাক্সলির বিশ্লেষণঃ "উন্নত জীব... আত্মচেতনার বেড়াজাল অতিক্রম করেছে চিন্তার নতুন স্রোতে। ফলে সে পেয়েছে চেতনা একীকরণের কিঞ্চিৎ অংশ—প্রকৃতি এবং মানুষের বহির্জগতের সঙ্গে একীকরণ, প্রত্যেকের প্রত্যেকের সঙ্গে জীবনের পৃথক উপাদানের একীকরণ। ...মানুষের অতীত ও বর্তমান ক্রমবিবর্তন সফলতায় ব্যক্তিত্বের কীর্তি প্রয়োজনীয় অংশ। সুতরাং এর সম্পূর্ণ কীর্তি তার ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অবশ্যই হবে।"[১২]

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ মানুষের লক্ষণঃ মানুষের যুগান্তকারী কর্মময় জীবন হবে, মানুষ কীর্তিমান ও দার্শনিক হবে। স্বামীজীর জীবনে এগুলি সবই পরিলক্ষিত হয়।

স্বামীজীর ভারত পরিক্রমায় ভারত-আবিষ্কার এক অভূতপূর্ব ঘটনা। একজন সন্ন্যাসী দেশীয় রাজন্যবর্গ ও দেশীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট ভারতের কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতির বিষয়ে আলোচনা করছেন—এ তো অত্যাশ্চর্য ঘটনা। আর একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী শিকাগো ধর্মমহাসভায় সকল বক্তাদের টেক্কা দিয়ে শুধু আসরে বাজিমাৎ করেননি, পাশ্চাত্যে বেদান্তের দুন্দুভি বাজিয়ে ভারতের অধ্যাত্ম-পতাকা উড্ডীন করেছিলেন—এতো যুগান্তকারী কীর্তি।

স্বামীজী ছিলেন আধিবিদ্যক মহাপুরুষ অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রবেত্তা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় দর্শনেই তাঁর ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর দার্শনিক বক্তৃতায় যেমন উইলিয়াম জেমস্ প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রজ্ঞেরা চমৎকৃত হয়েছিলেন, তেমনি পাশ্চাত্যে অন্যান্য স্থানের বক্তৃতায় টেসলার মতো বৈজ্ঞানিকরাও অভিভূত হয়েছিলেন। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 'মানুষের' সংজ্ঞানুযায়ী স্বামীজী ছিলেন মানব-শ্রেষ্ঠ।

॥ ছয় ॥

এক একটি দিকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে মানুষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একটি প্রতিভার কিরণে মানুষ জগদ্‌বিখ্যাত ব্যক্তি হন। এক একটি বিষয়ে মানুষ উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় সংসারে সমুজ্জ্বল হন। এক একটি ভাবে নিজেকে তৈরি করতে মানুষের সমগ্র জীবন ব্যয়িত হয়। কিন্তু স্বামীজীর ছিল বহুমুখী প্রতিভা। বিবেকানন্দের জীবনে প্রতিভার ছড়াছড়ি। সর্ববিষয়ে, সর্বভাবে, সর্বদিকে, সর্বক্ষেত্রে তিনি পারদর্শী। এ বিবেকানন্দের জুড়ি নেই।

সঙ্গীত-সাধনা মানুষের অন্যতম সাধনা। সঙ্গীতে মানুষ ঈশ্বরের সামীপ্য অনুভব করে। গায়কের সঙ্গীত তখনই সুমধুর হয়, যখন তাঁর সুকণ্ঠে তা ছন্দ, তাল, লয় সহযোগে গীত হয়। আবার সঙ্গীতের বিকাশ হয় রাগের অলঙ্কার বা বিস্তারের দ্বারা। তবেই সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা হয়— তালস্তলপ্রতিষ্ঠায়ামিতি ধাতো র্ঘঞ্ স্মৃতঃ।

গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম্।। (সঙ্গীত রত্নাকর)

স্বামীজী ছিলেন এই শ্রেণীর গায়ক—কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তাঁর কিন্নর কণ্ঠে সুমধুর গীত শ্রবণে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি হত। কণ্ঠসঙ্গীতের সর্বক্ষেত্রে

স্বামীজীর ছিল অসাধারণ দখল—খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, ধামার, ধ্রুপদ, ব্রাহ্মসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, হিন্দিভজনে—তিনি ছিলেন উচ্চাঙ্গের গায়ক। পাখোয়াজ, তবলা ও এসরাজে তাঁর ছিল পারঙ্গমতা। আবার স্বামীজী ছিলেন সঙ্গীতকার ও সঙ্গীততত্ত্ববেত্তা। বাংলা ও হিন্দিতে তাঁর রচিত সঙ্গীতের ভাষা ও সাহিত্য-সৌন্দর্য ছিল ভাবগম্ভীর ও অতুলনীয়।

স্বামীজীর পাণ্ডিত্য প্রশ্নাতীত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, বিভিন্ন দেশের ইতিহাস তিনি তন্ন তন্ন করে পড়েছেন। তাঁর মতো পড়ুয়া দুর্লভ। শাস্ত্রগ্রন্থে, সংস্কৃতসাহিত্যে ও ব্যাকরণে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। স্বামীজী ছিলেন দার্শনিক ও সংস্কৃতে পণ্ডিত। তিনি কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্রেরও রচয়িতা।

ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের নির্যাস সহজ সরল ইংরেজীতে স্বামীজী পাশ্চাত্যেদের কাছে পরিবেশন করেছেন। স্বামীজীর বক্তৃতা সাধারণ শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতেন। তিনি ছিলেন বাগ্মী। সর্বোপরি, শ্রোতাদের মনকে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক বলে উচ্চতানে তুলে দিতেন। স্বামীজীর কণ্ঠস্বর ছিল 'ভারলনসেলো বাদ্যযন্ত্রের' মতো, তাতে ছিল 'গাম্ভীর্য' কিন্তু ছিল না 'উত্থান-পতনের বৈপরীত্য'। তাঁর কণ্ঠস্বর সভাকক্ষে ও সকল শ্রোতার হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হত।

স্বামীজী সাহিত্যিক ও কবি। বাংলা সাহিত্যে চলতি বাংলায় পুস্তক রচনায় স্বামীজী পথিকৃৎ। তাঁর ভাষা বলিষ্ঠ ও প্রাঞ্জল। তাঁর পত্রাবলী পত্রসাহিত্যে ক্লাসিক। তাঁর ইংরেজী ভাষা ইংরেজ দ্বারা প্রশংসিত। সাহিত্যে হাস্যরস যে এত উঁচুদরের হতে পারে স্বামীজীর 'পরিব্রাজক,' 'ভাববার কথা' না পড়লে জানা যেত না।

স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা আমাদের পাথেয়। জনশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও শিশু শিক্ষা প্রসারের প্রথম প্রচারক ছিলেন স্বামীজী। কারিগরী শিক্ষায় ছাত্রদের স্বনির্ভরতা হবার একমাত্র উপায় তিনিই দিয়েছিলেন। নারীশিক্ষার উন্নতি বিনা দেশের অগ্রগতি অসম্ভব—তিনিই বলেছিলেন।

গ্রামের জনসাধারণকে শিক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সার্বিক উন্নতি—আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক, অর্থনৈতিক উন্নতির পথ-নির্দেশ তাঁরই দেওয়া। আজ দিকে দিকে স্বামীজী-কথিত গ্রাম-উন্নয়নের কর্মসূচী ছড়িয়ে পড়ছে। সন্ন্যাসী হয়ে তিনিই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের কথা প্রথম বলেন এবং কুটির ও যন্ত্রশিল্পের স্থাপনে জোর দেন।

স্বামীজীর অর্থনৈতিক চিন্তা ও রাষ্ট্র-চিন্তা অর্থনীতি ও রাজনীতিবিদ্‌দের নিকট আলোকবর্তিকা। তাঁর ইতিহাসচেতনা, বিজ্ঞানচেতনা ও সমাজচেতনা গবেষণার বিষয়। তাঁর স্বাস্থ্য-বিষয়ক মন্তব্য আধুনিক চিকিৎসকদেরও বিস্ময় জাগায়। সংঘ পরিচালনায় তাঁর চিন্তাধারায় আধুনিক ম্যানেজমেন্টরা হাবুডুবু খান। স্বামীজীর এ সকল চিন্তাধারা কত মৌলিক আজ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেবিষয়ে গবেষণা গ্রন্থ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকে তারই প্রমাণ।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিল্প ও স্থাপত্যে স্বামীজীর ঝলকিত বিক্ষিপ্ত নানা উক্তি কলারসিকরা ঐবিষয়ে নতুন আলোকপাত বলে মনে করেন। দেশ-বিদেশে তাঁর বিদগ্ধ শিল্প আলোচনা, সমালোচনা এবং চিন্তাধারা অতি উচ্চস্তরের শিল্পী ও কলাসমালোচকরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু স্বামীজীর শিল্পাদর্শ উপস্থাপিত

করেছেন এই বলেঃ "শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর আইডিয়াল শিল্পের backbone-এর মতো, যার অভাবে শিল্প নিস্তেজ ও প্রাণহীন হয়। স্বামীজীর ছিল জ্ঞানের পথে চলে aesthetics পথের সাধন ও পূর্ণতা।"[১৩] জুবিলি আর্ট একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও শিল্পী রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত তো স্বামীজীকে সবিনয়ে বলেছিলেনঃ "আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হতে পারত।"[১৪]

স্বামীজী সাংবাদিকতা ও পত্রিকা-সম্পাদনার উপর জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা কয়েকটি পত্রে স্বামীজী নির্দেশ দিচ্ছেন 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার পরিচালনের, প্রচ্ছদপট অলঙ্করণের। প্রবন্ধের ভাষা কেমন হবে, কি কি বিভাগ থাকবে, কিভাবে প্রবন্ধ সংগ্রহ করতে হবে প্রভৃতি বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্য সাংবাদিকতার দিক্‌নির্দেশ করে। স্বামীজী প্রবর্তিত বাংলা-মাসিক 'উদ্বোধন' ও ইংরেজী মাসিক 'প্রবুদ্ধ ভারত' আজ শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত।

স্বামীজীর ভারতপ্রেমের কথা অবর্ণনীয়। ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা তাঁর কাছে পবিত্র। তাঁর নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে শুধু একটিমাত্র শব্দ রণিত-ধ্বনিত হত—'ভারতবর্ষ'। পরিব্রাজন-অন্তে কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর ধ্যানের বিষয় ভারতবর্ষ; তাঁর ধ্যানের অনুভূতি—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ; তার অতীত গৌরব, পতন ও পুনরুত্থানের উপায়; ভারতের জনসাধারণের উন্নতির উপায়। স্বামীজীর ভারতপ্রেম, স্বদেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করেছিল দেশপ্রেমিকদের, স্বাধীনতাসংগ্রামীদের, দেশনায়কদের। তাঁরা একবাক্যে স্বামীজীকে তাঁদের অগ্রদূতরূপে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। স্বামীজীর রচনাবলী পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের দেশপ্রেম বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বাধীনতাসংগ্রামীরা হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে জীবনবলি দিয়েছেন।

স্বামীজীর সর্বতোমুখী প্রতিভা—দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ, সাহিত্যিক, কবি, বাগ্মী, শাস্ত্রজ্ঞ, শিল্প-সমালোচক, ইতিহাসবেত্তা, সমাজতত্ত্ববিদ, বিজ্ঞান-সচেতন, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রচিন্তক, দেশপ্রেমিক, কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন চিন্তাবীর, কুটির ও যন্ত্রশিল্পের সমর্থক—প্রায় দু'কুড়ি বিরল প্রতিভা একযোগে পূর্ণভাবে স্বামীজীর মধ্যে সমভাবে বিকশিত হয়েছিল। সর্বোপরি স্বামীজী সমাধিবান উচ্চ-অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ। মানুষ যে অনন্ত শক্তির অধিকারী, মানুষ যে অসীম শক্তির অধিকারী, মানুষ যে অফুরন্ত শক্তির অধিকারী—তার প্রতীক স্বামীজী। মরমী গায়ক দিলীপ কুমার রায় লিখেছেনঃ "স্বামীজীর মহান ব্যক্তিরূপের পটভূমিকায় এই গতিবাদ ও শক্তিবাদ আশ্চর্য দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল অধ্যাত্মশক্তির সঙ্গে অভূতপূর্ব সমন্বয়ের ফলে।...আধুনিক যুগের আর একটি অনস্বীকার্য প্রবণতা জটিলতার বৃদ্ধি—ফলে, মহত্ত্বের বিকাশ নয়—সুষম-এর (হার্মনি) মঞ্জরণ। এ মঞ্জরণের শোভা সবচেয়ে বেশী বিচিত্র হয়ে ওঠে মহাজনদের জীবন পর্যালোচনা করলে। স্বামীজী ছিলেন এযুগে মহাজনদের মধ্যেও মহাজন—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়ঃ A King among men ! তাই তাঁর চরিত্রের মহনীয় বিকাশ একটু পর্যালোচনা করলে লাভবান হব দেখতে পেয়ে একটি চিত্ত-চমৎকার দৃশ্য—কত রকম বিরুদ্ধ ভাবধারার সমুচ্চয়ে—তাঁর ব্যক্তিরূপ এমন অপরূপ হয়ে উঠেছে।"[১৫]

॥ সাত ॥

স্বামীজীর জীবনী অনুধ্যানে আমরা তাঁর অসাধারণ গুণের পরিচয় পাই। একটি মানুষের মধ্যে একসঙ্গে এতগুণের সমাবেশ হতে পারে, তা আমাদের কল্পনাতীত। শ্রীরামকৃষ্ণেরই উক্তি ঃ নরেন্দ্রের কত গুণ।

স্বামীজীর স্মৃতিশক্তি অতুলনীয়। পঠিতব্য বিষয় তাঁর স্মৃতিতে ধরা থাকে। বই-এর পুরো পৃষ্ঠাও পড়ার প্রয়োজন হয় না—এত গভীর মনসংযোগ ও বুঝবার ক্ষমতা। তাঁর ছিল অনুসন্ধিৎসু ও জিজ্ঞাসু মন। সব যাচাই করে নিতেন—এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণের কথাও। যে কোনও বিষয় সহজেই আয়ত্ত করতেন তিনি। অত্যন্ত মিশুকে—সহজেই আপনার জন, সদালাপী। তাঁর সাধারণ জ্ঞান অসীম। উপস্থিতবুদ্ধি প্রখর, অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, অমায়িক, বিনয়ী, ভদ্র ; আবার নির্ভীক, সাহসী, অপরের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। "তিনি কোন আপস না করেই সর্বোচ্চ সত্য প্রচার করেছিলেন। তিনি কেবল দিতেন, প্রতিদানে কিছু চাইতেন না।"

স্বামীজীর মতো দরদী কে ছিলেন ? সর্বদা দুর্বলকে সাহায্য করতে তৎপর। বলতেন ঃ "যে যত দুর্বল, তাকে তত সাহায্য কর।" তাঁর অন্তর মমতায় পরিপূর্ণ, মন করুণায় আর্দ্র। একটি অভুক্ত কুকুরের জন্য হাজার জন্ম নিতেও পিছপা নন। সদা আনন্দময় কিন্তু অচিরেই আন্তর রাজ্যের গম্ভীর পুরুষ। তিনি কর্মমুখর কিন্তু ধ্যানী। জ্ঞান-বিচারে নিপুণ কিন্তু ভক্তিতে আপ্লুত। তিনি তপস্বী, ত্যাগী কিন্তু জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের শিক্ষাদাতা। তিনি যোগী কিন্তু বেদান্তের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োগকর্তা। তিনি দশনামী সন্ন্যাসী কিন্তু মানবসেবাধর্মী। 'পরার্থেই ছিল তাঁর জীবনধারণ। তাঁর নিজের কোন মতলব বা স্বার্থ ছিল না।'

স্বামীজীর গুরুভাইরা তাঁর সর্বাধিক অন্তরঙ্গ। তাঁরাই স্বামীজীর আপনজন, স্বামীজীও তাঁদের আপনজন। দিনে-রেতে, উঠতে-বসতে, শয়নে-স্বপনে তাঁরা স্বামীজীর মহত্ত্বের, স্বামীজীর অসাধারণ গুণের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁদের পর্যবেক্ষণ, তাঁদের ধারণাই হবে স্বামীজীর গুণের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার।

স্বামীজীর 'হরিভাই' স্বামী তুরীয়ানন্দ বিভিন্ন সময়ে স্বামীজী-প্রসঙ্গ করেছেন। মা ভবতারিণীর কাছে বিবেকানন্দের জ্ঞান-বিবেক-ভক্তি প্রার্থনায় শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য উল্লেখ করেছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ঃ "দেখ দেখি কি অধিকারী পুরুষ। আর কিছুই চাইতে পারল না।" তারপর তিনি বলছেন ঃ "ভেতরে গলদ নেই—বাইরে গলদ কোথা হতে আসবে ?" একবার কোনও গুরুভাই স্বামীজীর নিকট তাঁরই কোনও দোষ শোধরানোর জন্য বললে স্বামীজী অতিশয় শান্তভাবে বললেন ঃ "তুই তোর কাজ কর। আমাকে defend (সমর্থন) করবার কোন আবশ্যক নাই।" স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন ঃ "স্বামীজী কেমন সুস্থ খাড়া হয়ে রয়েছেন। কারও ওপর ঠেস দেওয়া, কারও recommendation-এর (সমর্থন) ওপর আপনাকে জিইয়ে রাখা তাঁর ধাতে ছিল না।" বলতেন ঃ "দেখ কি বীরের ভাব, যেমন মনে হওয়া অমনি বদ্ধপরিকর। কি ত্যাগ স্বামীজীর। সব গুরুভাইদের দিলেন—চেলাদের নয়। প্রথম ট্রাস্টিদের ভেতর দেখবে সব গুরুভাইরা—একটিও চেলা নেই। আমায় একবার লিখেছিলেন, 'সব তোমাদের দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।' কি অদ্ভুত পুরুষ।"[১৬]

স্বামীজীর আর এক গুরুভাই স্বামী প্রেমানন্দজী বলতেন ঃ "আমরা দুজন মহাপুরুষকে দেখেছি—আমাদের ঠাকুর ও স্বামীজী। তাঁদের সঙ্গে অন্য কারো তুলনা হয় না।"[১৭]

স্বামীজীর 'প্লেটো' স্বামী অদ্ভুতানন্দ স্বামীজীর গুণ সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "বিবেকানন্দ স্বামী সব কাজেই খুব চালাক ছিল। সব কাজেই লাগতো, পেছপাও হতো না, আর সফলও হতো। ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ভিন্ন ঐ গুণ হয় না।" বলতেন ঃ "স্বামীজীর মানুষ চেনবার শক্তি হয়েছে, আর ভিতরে একটুও 'অহং' নেই।"

স্বামীজীর 'গ্যাঞ্জেস' তাঁর 'স্বামীজী' সম্বন্ধে বলতেন ঃ "স্বামীজী অনন্ত আধার। তাই তাঁর ভেতর অনন্ত ভাবের প্রকাশ। আর যে যেমনটুকু তার ভেতর তেমনি।" 'স্বামীজী অভয়ের প্রতিমূর্তি।' "Hand, head and heart (হাত, মাথা ও হৃদয়) তিনটিরই culture (অনুশীলন) করতে হবে। হাতের কাজ শারীরিক কাজকর্ম, মাথার কাজ বিদ্যাবুদ্ধির অনুশীলন আর হৃদয়ের কাজ সেবা, ভালবাসা।...স্বামীজীর ভেতর তিনটিই ফুটেছিল।" "স্বামীজী তো একটি principle-এর প্রতিমূর্তি।...তিনি রক্তমাংসে তৈরী ছিলেন না, তিনি ছিলেন idea (ভাব) দিয়ে গড়া।...ছিলেন একটা ভাবের প্রতিমূর্তি।"[১৮]

॥ আট ॥

বাল্যকালে স্বামীজী তাঁর পিতার বৈঠকখানায় বিভিন্ন জাতের মানুষের জন্য রক্ষিত হুঁকোয় টান দিয়ে পরখ করেছিলেন জাত কিভাবে যায়। জাতিভেদ সমস্যার সমাধানকৌশলে স্বামীজীর এই অদ্ভুত অনুসন্ধিৎসা আমাদের চমৎকৃত করে। কেউ কিছু বললে তিনি মেনে নিতেন না। তিনি শুনেছিলেন একটি হুঁকাতে বিভিন্ন জাতের লোক তামাক খেলে জাত নষ্ট হয়ে যায়। তাই তিনি পরখ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথাও যতদিন না তিনি নিজে অনুভব করতেন, মানতেন না। স্বামীজী বলতেন ঃ যেহেতু বই-তে লেখা আছে বলে কোনও জিনিসকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। অন্য কেউ বলেছে বলেও বিশ্বাস করা ঠিক নয়। সত্যকে নিজেকে দেখবার চেষ্টা করতে হবে। সেটিই হচ্ছে অনুভব।

বিদ্যালয়ে জনৈক শিক্ষক একদিন নরেন্দ্রের ভূগোল পাঠে ভ্রম হয়েছে মনে করে তাঁকে শাস্তি দেন। নরেন্দ্রনাথ বারবার 'আমার ভুল হয়নি' বলা সত্ত্বেও ক্রোধী শিক্ষকের হাতের বেত তাঁরই উপর পড়েছিল। তবুও তিনি সত্য হতে বিচ্যুত হননি। বাড়িতে এসে নিজ জননীকে এই ঘটনা জানালে স্নেহময়ী ভুবনেশ্বরী আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করে বিগলিতকণ্ঠে বললেন ঃ "বাছা, তোমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে এতে কি আসে যায়? ফল যাই হোক না কেন, সর্বদা যা সত্য বলে মনে করবে, তাই করে যাবে। অনেক সময় হয়তো এর জন্য অন্যায় ও অপ্রীতিকর ফল সহ্য করতে হবে কিন্তু তবু সত্য কখনও ছাড়বে না।" স্বামীজী তাঁর মায়ের এই কথা সারা জীবন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

শিষ্য শরৎচন্দ্রের (স্বামী সদানন্দ) সঙ্গে হৃষীকেশের পথে পথে ফিরেছেন পরিব্রাজক স্বামীজী। শরৎচন্দ্র ক্ষুধা-তৃষ্ণায় একেবারে কাতর, মৃতপ্রায় হয়ে পড়লেন। স্বামীজী তাঁর প্রাণ বাঁচালেন। নিজের জীবন বিপন্ন করে স্বামীজী তাঁর শিষ্যকে বহুবার বাঁচিয়েছেন।

একবার শরৎচন্দ্র এমন দুর্বল হয়ে পড়লেন যে তিনি কিছুই বহন করতে অসমর্থ হলেন। স্বামীজী তখন শিষ্যের জুতো-জোড়া নিজের কাঁধে নিয়ে চলতে লাগলেন। পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্র বলতেন ঃ "ওরে, আমি তোদের মতো বিবেকানন্দের গ্ল্যামার দেখে আসিনি, আমি এসেছি নরেন দত্তের প্রেমে পড়ে। তিনি ছিলেন প্রেমময়, প্রেমমূর্তি, প্রেমস্বরূপ।"

মীরাটে স্বামীজীর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে ওখানকার গ্রন্থাগারিক অবাক হয়েছিলেন। অখণ্ডানন্দজী ঐ গ্রন্থাগার হতে প্রতিদিন স্যার জন লাবকের গ্রন্থাবলীর বহু পৃষ্ঠার এক একটি খণ্ড নিয়ে আসতেন স্বামীজীর জন্য। স্বামীজীও প্রতিদিন পড়েই ফেরত দিতেন। এমনিভাবে অনেক খণ্ড পড়লেন। এতে গ্রন্থাগারিকের সন্দেহ হয়—এ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। স্বামীজী তা জানতে পেরে নিজেই গ্রন্থাগারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন যে সন্দেহ থাকলে বই থেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। গ্রন্থাগারিক তাই করলেন। বুঝলেন, স্বামীজী শুধু পড়েননি, অধিকাংশই তাঁর মুখস্থ হয়ে গেছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন গ্রন্থাগারিক স্বামীজীর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তিতে।

স্বামীজীর প্রতিভা কত বহুমুখী ও বিচিত্র ছিল মহীশূরে রাজসভায় কয়েকটি ঘটনা তার প্রমাণ। রাজসভায় স্বামীজীর সঙ্গে একদিন অস্ট্রিয়ার এক বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদের দেখা হয়। তাঁর সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীত বিষয়ে খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হয়। এ সম্বন্ধে স্বামীজীর গভীর জ্ঞানের পরিচয়ে সকলে আশ্চর্যান্বিত হন। আর একদিন রাজপ্রাসাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত একজন লোকের সঙ্গে স্বামীজীর হঠাৎই দেখা হয়ে গেলে স্বামীজী বিদ্যুৎপ্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। দেখা গেল, স্বামীজী ঐ বিষয়েও পারঙ্গম। আর একদিন জনৈক মুসলমান সভাসদের প্রশ্নের উত্তরে কোরাণের কয়েকটি অংশের তিনি এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেন যে, সেই মুসলমানের সকল সংশয় দূরীভূত হয়। উপস্থিত সকলেও কোরাণের গূঢ় ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হন।

স্বামীজী যখন কোনও বিষয়ে তর্ক করে পরাজিত করতেন, তখন তাঁর মধ্যে কোনও অহংকার ফুটে উঠত না। বস্তুত, তিনি যে জয়ী হয়েছেন তা তিনি মনেই করতেন না। যে সত্যটিকে তিনি যুক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তারই জয় হয়েছে বলে মনে করতেন। শুধুমাত্র পাণ্ডিত্য দেখানোর জন্য তিনি কখনও বিচার করতেন না। তিনি সব সময় চেষ্টা করতেন, বিপক্ষের ভ্রান্তধারণা ও মিথ্যা অহংকার দূর করে তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ করতে। আত্মম্ভরি কোনও লোক শুষ্ক তর্ক করতে এলে স্বামীজী মুহূর্তেই তার মনোভাব বুঝতে পারতেন এবং তারও অজ্ঞাতসারে তাকে এক উচ্চ মানসিক স্তরে নিয়ে যেতেন। ত্রিবান্দ্রামে সুন্দরম্ আয়ারের বাড়িতে একবার এরকম এক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি স্বামীজীর কাছে তর্ক করতে এলেন বুদ্ধদেবপ্রসঙ্গে। স্বামীজী কোনও প্রকার জটিল তর্কের মধ্যে না গিয়ে সরাসরি বুদ্ধের ত্যাগ, বৈরাগ্য ও করুণার কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় একঘণ্টা কাল ধরে বলতে লাগলেন। পণ্ডিতজী শুনে বিহ্বল হয়ে গেলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন, অন্তত সেই সময়ের জন্য তিনি সকল পার্থিব তুচ্ছতা ভুলে গিয়েছিলেন। স্বামীজীকে বারংবার ভক্তিভরে প্রণাম করে বললেন ঃ "আপনার মতো মানুষ আমি আর জীবনে দেখিনি। আপনার উপদেশ আমি চিরকাল মনে রাখব।"

মাদ্রাজে সমুদ্রতীরে একদিন সান্ধ্যভ্রমণের সময় স্বামীজী দেখেন, জেলেদের

কয়েকজন শিশু কোমর পর্যন্ত জলে নেমে মায়ের সঙ্গে কাজ করছে। নগ্নদেহ শিশুগুলির জীর্ণ চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তারা অধিকাংশ দিনই অনাহারে থাকে। শিশুদের দেখে করুণাঘন স্বামীজীর চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে জল পড়তে লাগল। তিনি মমতাভরা সুরে বলে উঠলেনঃ "হে ভগবান, এই হতভাগাদের সৃষ্টি করলে কেন? আমি এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছি না। হে ভগবান, আর কতদিন এ চলবে, কতদিন!"

বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ খেতড়ি যাবার পথে দিল্লী হতে ট্রেনে করে আলোয়ার স্টেশনে পৌঁছলেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পরিচিত বন্ধুবান্ধব স্টেশনে উপস্থিত স্বামীজীকে স্বাগত জানাবার জন্য। প্রচণ্ড ভিড়—সকলেই তাঁর সঙ্গে দু-চারটি কথা বলার জন্য ব্যগ্র। এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, যাতে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অন্তর কত মহত্ত্বপূর্ণ, তিনি কত বিনয়ী, স্নেহশীল—এ ঘটনা হতে জানতে পারা যায়।

স্বামীজী দেখতে পেলেন, পরিব্রাজককালের তাঁর এক পুরাতন অনুরক্ত ভক্ত দূবে দাঁড়িয়ে আছেন দীন-হীন বেশে। তাঁর চোখমুখে স্বামীজী-দর্শনে আনন্দ ফুটে উঠল, তিনি স্বামীজীর সান্নিধ্য পাবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অতিক্রম করে স্বামীজীর কাছে তাঁর পক্ষে যাওয়া অসম্ভব এবং সাহসেও কুলাচ্ছে না। স্বামীজী ব্যাপার বুঝতে পেরে অমনি স্থান-কাল, আদব-কায়দা, লোক-লজ্জা ইত্যাদিতে জলাঞ্জলি দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে উঠলেনঃ 'রামস্নেহী, রামস্নেহী।' স্বামীজীর ভুল হয়নি। তাঁর অতি পরিচিত রামস্নেহীই বটে। চারদিকের ভিড় সরিয়ে তিনি রামস্নেহীকে নিকটে এনে পূর্বের মতো প্রাণ খুলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

স্বামীজীর চরিত্রের এরূপ বহু ঘটনা তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায়।

॥ নয় ॥

জগতে প্রতিটি জিনিস মনুষ্যত্বের উপর নির্ভরশীল। মনুষ্যত্বের দ্বারাই জগৎ জয় করা যায়, জগতকে বশে আনা যায়। প্রকৃতির উপর আধিপত্য করে নিজের উপর আধিপত্য বিস্তার করে দেবত্বের প্রকাশই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। এজন্য মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানুষই সর্বাধিক মূল্যবান। মনুষ্যত্ব সম্যক্‌রূপে বিকশিত হলেই মানুষ পূর্ণ মানব হয়। তাই পূর্ণ মানবে এত বিচিত্র গুণের সন্নিবেশ। স্বামীজী ছিলেন পূর্ণ মহাপুরুষ।

মানুষের চারটি চারিত্রিক প্রবণতা সহজাত—ভাবপ্রবণতা, বিচারশীলতা, কর্মশীলতা ও ধ্যানপরায়ণতা। অর্থাৎ চারটি যোগের—ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম ও যোগের সমন্বয়ে মানুষের চরিত্র গঠিত হলেই মানুষ আদর্শ-চরিত্ররূপে পরিগণিত হয়। স্বামীজীর জীবনে এই চারটি যোগের সমন্বয় হয়েছিল। স্বামীজী তাই আদর্শ চরিত্র অর্থাৎ পূর্ণ মানবের প্রতীক।

জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—এদের স্বরূপ ও সম্বন্ধের সঠিক সহজ সরল ব্যাখ্যা পূর্ণ মানবই দিতে পারেন। সর্বশ্রেণীর মানুষের উপযোগী করে তাঁরা তাঁদের ভাব প্রকাশ করেন। স্বামীজী যে জীব-জগৎ-ঈশ্বরের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হৃদয়গ্রাহী, শ্রুতিমধুর। বেদান্তের দুরূহ জটিল তত্ত্বকে অতি সরলীকরণে স্বামীজীর অসীম পারদর্শিতা অতীব বিস্ময়ের বিষয়।

দেশ-বিদেশে স্বামীজীর দার্শনিক চিন্তাধারা সমাদৃত ও প্রশংসিত। তিনি জটিল বেদান্ত তত্ত্বকে ব্যবহারিকক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। জীবকে শিবরূপে সেবা করার অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

সত্যদ্রষ্টা হওয়ায় সত্যের সমগ্র রূপ পূর্ণ মানবের কাজে সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। তাই সাধারণের দৃষ্টিতে আপাত-বিরোধিতা পূর্ণ মানবের চরিত্রে বিধৃত। কিন্তু এ সকল একই সত্যের এপিঠ-ওপিঠ। পূর্ণ মানুষ স্বামীজী যেমন নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান প্রভৃতির দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত, তেমনি ছিল তাঁর চরিত্রে বিচিত্র বিভিন্নমুখী গুণ—তিনি নেতা হয়েও সেবক, বিশ্বপরিচালক হয়েও শিশুসুলভ সারল্যের প্রতিমূর্তি, দেশপ্রেমিক হয়েও বিশ্বপ্রেমিক, জাতীয় মানব হয়েও বিশ্বমানব, অপার জ্ঞানের অধিকারী হয়েও বিনয়ী, সকল কর্মের হোতা হয়েও কৃতিত্বের তিনি দাবি করেন না, পরম পণ্ডিত হয়েও অভিমানরহিত।

পূর্ণ মানবের আর একটি লক্ষণ দেশ-কাল-পাত্রের সীমার বাইরে যাওয়া। তিনি কোনও নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নন। তিনি সমগ্র মানবজাতির আচার্য, সকল মানুষের শিক্ষক। সর্বধর্মের মানুষের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য হন। তাঁর নিকট মানুষে মানুষে প্রভেদ থাকে না, দেশ-দেশান্তের পার্থক্য থাকে না। তাঁর দৃষ্টিতে সকল দেশ, সকল মানুষ সমান।

পূর্ণ মানব স্বামীজীর উদ্দেশ্যে স্বামী তুরীয়ানন্দের অন্তরানুভূতি দিয়ে শেষ করছিঃ "আমরা স্বামীজীর সহিত একসঙ্গে কাটালুম, একসঙ্গে খাওয়া-বসা, চলা-ফেরা, শোয়া, গল্প-গুজব, শাস্ত্রপাঠ, হাসি-ঠাট্টা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর করেছি কিন্তু স্বামীজীকে আমরা একটুও চিনতে পারিনি, তাঁর স্বরূপ আদৌ বুঝতে পারিনি। তিনি যে অতবড় মহাপুরুষ ছিলেন, তার বিন্দুবিসর্গও আমরা বুঝতে পারিনি যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, এখন আস্তে আস্তে একটু একটু যেন বুঝতে পারছি। ঠাকুর যে কত বড় মহাপুরুষকে সঙ্গে এনেছিলেন তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।...স্বামীজীর সঙ্গে আমরা কী না করেছি! কিন্তু আমরা তাঁকে ধরতে পারিনি। তখন আমরা ভাবতুম তিনি আমাদেরই মতন, তবে খুব উঁচুঘরের. সব বিষয়ে আমাদের চেয়ে expert (অভিজ্ঞ)—এই পর্যন্ত মনে হত। আমার মনে হয়, এত বড় মহাপুরুষ, একাধারে এত গুণ ইতঃপূর্বে আব জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি কী গুণের আদরই না জানতেন। এতটুকু গুণ দেখলে, তিলকে তাল করে বলবার অভ্যাস তাঁর ছিল। লোককে ঠেলে তুলে দেবাব অসীম শক্তি তাঁর ছিল। কী মহাপ্রাণ ছিলেন তিনি। সকলের জন্য কী feel (সমবেদনা অনুভব) করতেন। সকলের জন্য এত প্রীতি, এত সহানুভূতি আর কোন মানুষের মধ্যে দেখিনি। আর দেখবও না। তাঁর কথা শুনলে মরা মানুষ বেঁচে উঠত।...তাঁর কথার এতই জোর ছিল যে, ভাব ও ভাষা হৃদয়ের অন্তস্তলে তখনই গিয়ে পৌঁছত, একটুও বিলম্ব হত না। সে সময়ের জন্য সব ভুল হয়ে যেত। লোকে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যেত। সকলের মনকে এক উচ্চ ভাবভূমিতে তিনি তুলে দিতে পারতেন।"[১৯]

স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

আজকাল স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তা বা বেদান্ত ব্যাখ্যা লইয়া সার্থক আলোচনা হইতেছে। বিবেকানন্দের ধর্মদর্শন বা জীবনদর্শন যখন বেদান্তমুখী বা বেদান্ত-আশ্রিত, তখন এইরূপ আলোচনা হইতেই পারে। ভাবতের ন্যায় এক প্রবীণ দেশের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক ঐতিহ্যের একটি মূলস্রোত থাকিবেই। আমাদের আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনার সেই মূলস্রোতটিকে বৈদিক বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি। বৈদান্তিক না বলিয়া ইহাকে বৈদিক বলিলাম এই কারণে যে বেদান্তকেও বেদ বলিতে পারি। উপনিষদের তত্ত্বকে কেন আমরা বেদান্ত বলিয়া উল্লেখ করি তাহা পরে বলিতেছি। এইখানে কেবল বলিতে চাই যে বেদান্ত বেদকে অর্থাৎ সংহিতাকে (ঋগ্বেদ ইত্যাদি) অগ্রাহ্য করে না। পরন্তু বেদান্তে বেদেরই পরিণতি। এক বঙ্গীয় কবি বড় সুন্দরভাবে এই কথাটি বুঝাইয়াছেনঃ 'বেদের জ্যোৎস্না নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে'। উপনিষদ বা বেদান্তের সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাত আমাদের বেদের চন্দ্রকিরণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বেদান্তের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্বের সূচনা ঋগ্বেদেঃ 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (১·১৬৪·৪৬)।

তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, বেদান্তে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের নূতন তত্ত্ব কি পাইতেছি? বেদান্তের নূতন তত্ত্ব এই যে ঋগ্বেদে যাহাকে 'একম্' বলা হইয়াছে, উপনিষদে সেই 'একম্' জীবাত্মা হইতে অভিন্ন। ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা উদ্দালক আরুণি বলিলেনঃ স যঃ এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি...। (৬·৮·৭) সেই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা কেবল জীবাত্মা হইতেই অভিন্ন নহেন, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতেও অভিন্ন।

এখন প্রশ্ন এই যে বেদান্ত যখন প্রায় দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে, তখন আবার স্বামী বিবেকানন্দ ইহার এক নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করিলেন কেন? বেদান্তের তত্ত্ব প্রস্থানত্রয়ে অর্থাৎ শ্রুতি-গ্রন্থ উপনিষদে, স্মৃতি-গ্রন্থ ভগবদ্গীতায় এবং ন্যায়-গ্রন্থ বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে বিধৃত। এই তিন মূলগ্রন্থের আবার অসংখ্য ভাষ্য। শঙ্করাচার্যের শারীরকমীমাংসাভাষ্য রচিত হয় নবম শতাব্দীতে। তাহার পর আচার্য ভাস্কর (১০০০ খ্রীঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া আচার্য বলদেব পর্যন্ত কত মনীষী বেদান্তের তত্ত্ব উপস্থিত করিয়া কত ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

বঙ্গদেশেও বেদান্তচর্চার বড় অভাব দেখি না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দেখি রাজা রামমোহন রায় বেদান্তের এক প্রাজ্ঞ প্রবক্তা। ঈশ, কেন, কঠ, মাণ্ডূক্য এবং মুণ্ডক—এই পাঁচখানি উপনিষদের রামমোহন-কৃত বঙ্গানুবাদ ১৮১৬ হইতে ১৮১৯-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। ১৮১৫ সালে রামমোহন-কৃত 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় রামমোহন এই গ্রন্থকে 'সকল শ্রুতির সমন্বয়' বলিয়া চিহ্নিত করেন। 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থের বিষয় বা তাৎপর্য সম্বন্ধে রামমোহন বলিলেন যে ইহা 'বিশ্ব এবং ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান'। ঐ ১৮১৫ সালেই রামমোহনের 'বেদান্তসার' গ্রন্থখানি বাহির হয়।

রামমোহনের পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদান্তের এক বিশিষ্ট প্রচারক। তিনি প্রথমে উপনিষদের অদ্বৈতপ্রসঙ্গ লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন যে বেদান্ত যখন ভক্ত-ভগবানের দ্বৈত সম্পর্ক স্বীকার করেন না, তখন তাহা যথার্থ আধ্যাত্মিক শাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ক্রমে তাঁহার এই ভ্রম দূর হইল। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিলেনঃ 'এই প্রকারে আমি উপনিষদের মূলে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিভূমি আমার হৃদয় হইতে বাহির করিলাম।'

ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও বৃহত্তর হিন্দুসমাজে বিবেকানন্দের কালে বেদান্তচর্চার অভাব দেখি না। ১৮৮৭ হইতে ১৮৯২ সালের মধ্যে কালীবর বেদান্তবাগীশের ১৬৭৫ পৃষ্ঠার 'ব্রহ্মসূত্রং নাম বেদান্তদর্শনম্' গ্রন্থ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বঙ্গানুবাদ-সহ ব্রহ্মসূত্র, তাহার শাঙ্করভাষ্য এবং বাচস্পতি মিশ্রের 'ভামতী' উপস্থিত।

ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদও হাতে পাইয়াছিলেন। Roer-কৃত কয়েকখানি উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ ১৮৫০ সালেই এই কলিকাতা শহরে প্রকাশিত হয়। ম্যাক্সমূলারের প্রধান প্রধান বারোখানি উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ দুইখণ্ডে ১৮৭৯ ও ১৮৮৪ সালে বাহির হয়। আর যদি বল, উপনিষদের সারতত্ত্ব বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থে বিধৃত এবং ইহাই বেদান্তদর্শনের আদিগ্রন্থ, তাহা হইলে বলিতে পারি যে শাঙ্করভাষ্যসহ ঐ 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থের Thibaut-কৃত ইংরেজী অনুবাদও ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়।

এখন প্রশ্ন এই বেদান্ত সম্বন্ধে এত গ্রন্থ থাকিতে স্বামী বিবেকানন্দ আবার বেদান্ত ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন? ইহার উত্তরে প্রথম বলিতে হয় যে বেদান্তব্যাখ্যা বা কোনও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা আদৌ স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল না। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, সাংখ্য, যোগ—এইসকল শাস্ত্রের এক নূতন ভাষ্য উপস্থিত করিবার কোনও অভিপ্রায়ও বিবেকানন্দের ছিল না। যদি থাকিত তাহা হইলে তিনি শঙ্করাচার্য কিংবা রামানুজাচার্যের ন্যায় উপনিষদ্, গীতা, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি নির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থ হইতে ভাষ্য লিখিতেন। তাঁহার অধ্যয়ন এবং মনীষা তাঁহাকে এক নব-শঙ্করাচার্য বা নব-রামানুজ করিয়া তুলিত। কিন্তু তিনি বেদান্তের অপর এক ভাষ্যকার হইতে ইচ্ছা করেন নাই, তিনি এক নূতন জগতের এবং সেই নূতন জগতের মধ্যে নব ভারতের ভাষ্যকাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল সারা বিশ্বের মানুষের কাছে এক নূতন ধর্মাদর্শ, এক সার্বভৌম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপস্থিত করা। তিনি পৃথিবীর সকল ধর্মের সহিত পরিচিত ছিলেন। পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞানের প্রমাণ তাঁহার রচনাবলীতে ছড়াইয়া আছে। তাঁহার অপরিমিত অধীত বিদ্যা এবং অসাধারণ মননশীলতার উপর নির্ভর করিয়া তিনি

বেদান্তের এক অদ্বিতীয় ভাষ্য রচনা করিতে পারিতেন কিন্তু এমন কার্য বা কীর্তির কথা তাঁহার মনে কখনও উদিত হয় নাই।

এখানে আরও একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই। বিবেকানন্দের বাণী তাঁহার নিজস্ব বাণী। তাহা তিনি কোনও গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করেন নাই। সেই বাণী তাঁহার অধীত বিদ্যার সারবস্তু—এমন ধারণা সর্বৈব ভ্রমাত্মক। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে সেই বাণী এই শতবর্ষ ধরিয়া আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করিতে পারিত না। সারা বিশ্বের মনীষীদের মর্ম এইভাবে স্পর্শ করিত না। তাঁহার কথা তাঁহারই অন্তরের ধ্বনি। উহা অন্য কোনও কথার প্রতিধ্বনি নহে। অর্থাৎ তাঁহার কথা তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির প্রকাশ নহে, তাঁহার নিবিড় অনুভূতির উদ্ভাস। তিনি জানিতেন—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন' (কঠ, ১।২।২৩)— অর্থাৎ এই আত্মাকে বহু স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ সহায়ে, ধারণাশক্তি কিংবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও বোঝা যায় না।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এই প্রত্যয় তাঁহার কবে, কখন হইল ? সার্থক আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে গ্রন্থগত বিদ্যার অসারতা তিনি কবে, কিভাবে বুঝিলেন। তিনি এক অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার অধ্যয়ন ছিল সুবিস্তৃত। স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। পাশ্চাত্য ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান তাঁহার অধ্যাপক এবং সহপাঠীদের চমৎকৃত করিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ উপাধি লাভ করিবার পরেও তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হিসাবে বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। তাঁহার অধ্যাপক ডঃ উইলিয়ম হেস্টি (William Hastie) বলিয়াছিলেনঃ "Narendranath is really a genius. I have travelled far and wide, but I have never yet come across a lad. ever in German Universities amongst philosophical students." যদি ইহাকে শুনা কথা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার কলেজ-বন্ধু দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কথা শুনিতে পারি, তিনি লিখিয়াছেনঃ 'His faculty was to imbibe, not so much from books as from living communion and personal experiences. With him it was life kindling life and thought kindling thought.' হেস্টি সাহেব যে প্রতিভার কথা বলিয়াছেন সে প্রতিভার গতিপ্রকৃতির কথা ব্রজেন্দ্রনাথ বুঝাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে আসিবার পর দেখি এই অনুভূতি নরেন্দ্রনাথের অন্তরে সঞ্চারিত হইল। বিবেকানন্দ বহু প্রসঙ্গে বহুবার বলিয়াছেন যে তিনি বেদান্তের তত্ত্ব পরমহংসের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বলিতে পারি, স্বামী বিবেকানন্দ কেবল বেদান্ত অধ্যয়ন করেন নাই, বেদান্ত দেখিয়াছিলেন এবং এই অর্থেই তিনি একজন দ্রষ্টা। পরমহংসের কথা, তাঁহার নীরবতা, তাঁহার হাসি, তাঁহার অশ্রু, তাঁহার নৃত্য, তাঁহার গীত, তাঁহার সমাধি, আবার ঠাট্টা-তামাসা নরেন্দ্রনাথের কাছে একাকার হইয়া যেন এক মহান তত্ত্বরূপে আবির্ভূত হইত। তিনি তাঁহার চক্ষু, কর্ণ ও সমস্ত অন্তর দিয়া সেই তত্ত্ব গ্রহণ করিতেন। কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলিলেনঃ "যে জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাঁহার ছায়ায় আমি বাস করিয়াছি, যাঁহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন যেমন উজ্জ্বল এবং মহিমান্বিত,

আমার মতে আর কোন মহাপুরুষের জীবন তেমন নহে।" এইরকম উক্তি তাঁহার 'বাণী ও রচনা'র দশ খণ্ডে ছড়াইয়া আছে। আমি এই উক্তিটি বাছিয়া কেন উদ্ধৃত করিলাম তাহা বলি। এখানে দুইটি কথা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হয়। প্রথম কথা এই যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া সব শিখিয়াছেন অর্থাৎ তিনি যাহা কিছু উপলব্ধি করিয়াছেন, যাহা কিছু বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন তাহা সকলই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ হইতে পাইয়াছেন। উপনিষদ, গীতা, বেদান্তসূত্র— এই প্রস্থানত্রয়ে বিধৃত যে জ্ঞান তাহা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা, তিনি পৃথিবীর সকল ধর্মগুরু, সকল আচার্যের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন। যাঁহার কাছে তিনি সব পাইয়াছেন তাঁহাকে তিনি অবশ্যই অদ্বিতীয় বলিবেন। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতির কাছেও তিনি অনেক পাইয়াছেন। পৃথিবীর অসংখ্য ধর্মাচার্যদের বাণী তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ এবং অদ্বিতীয় আচার্যরূপে পাইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীই তাঁহার কাছে সকল তত্ত্বের সার হইয়া উঠিয়াছে।

এইরকম এক উপলব্ধি না হইলে তিনি কেবল শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া, বিদ্যা অর্জন করিয়া ধর্মপ্রচার-কার্যে অবতীর্ণ হইতেন না। পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এমন এক ধর্মবিদ্ ধর্ম-প্রচারক বিরল। বুদ্ধ, যীশু এবং মহম্মদকে আমরা প্রেরিত পুরুষ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ইঁহাদের বাণী দৈববাণী। কিন্তু ইঁহাদের কোনও পার্থিব গুরুর কথা আমরা শুনি নাই। যীশু তাঁহার পিতা অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী মানুষকে শুনাইয়াছেন। সে ঈশ্বর ইতিহাসের কর্তা হইয়াও ইতিহাসের উর্ধ্বে। বিবেকানন্দের বাণীও ঈশ্বরের বাণী কিন্তু সেই ঈশ্বর ইতিহাসে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি মানুষের ন্যায় চলিতেন, কাঁদিতেন, হাসিতেন, পূজা করিতেন, গান গাহিতেন, মানুষের ন্যায় শারীরিক কষ্ট ভোগ করিতেন। তাঁহার কথা স্বামীজী এবং আরও অনেকে শুনিয়াছেন—যে কথা তাঁহার আরেক ভক্ত ধরিয়া রাখিয়াছেন। সেই 'কথামৃত'কে আমরা শ্রুতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। উহা সংস্কৃতভাষায় বিধৃত না হইয়া বঙ্গভাষায় বিধৃত হইলেও উহা শ্রুতি। বিবেকানন্দের বাণী তাহা হইলে শ্রুতির শ্রুতি। তাঁহার রচনাবলী বা বক্তৃতাবলী রামকৃষ্ণ কথামৃতের এক বৃহৎ সংস্করণ।

স্বামীজীর বাণীকে শ্রুতি বলিয়া যেন একটু গোল বাধাইলাম। শ্রুতি বলিতে বুঝি বেদ এবং উপনিষদ। এমনকি যে গ্রন্থখানি ভারতে এবং সারা বিশ্বে হিন্দুধর্ম-দর্শনের একখানি শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক বলিয়া গণ্য, সেই 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'-ও আমাদের শাস্ত্রে 'স্মৃতিগ্রন্থ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম আমাদের বলিলেন—ঐ শুন, গীতার কথা ভগবান কৃষ্ণের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। প্রস্থানত্রয়ের তৃতীয় গ্রন্থ বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র'কে আমরা একখানি মীমাংসা অথবা ন্যায়গ্রন্থ বলিয়া চিহ্নিত করি। অথচ এই গ্রন্থখানিকে অবলম্বন করিয়া মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ আচার্য শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি বেদান্তের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, আজ আর আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থগুলিকে শ্রুতি, স্মৃতি, মীমাংসা বলিয়া চিহ্নিত করিয়া কেবল সংস্কৃতভাষায় রচিত গ্রন্থকেই শ্রুতি বলিয়া জানিব না। বেদ, উপনিষদ অবশ্যই আমাদের প্রাচীন শ্রুতি। তবে আমরা আবার নবীন শ্রুতির কথাও কান পাতিয়া শুনিব।

এযুগের মহাগ্রন্থে যাঁহার বাণী বিধৃত সেই পরমহংস রামকৃষ্ণকে আমরা ঈশ্বরাবতার

বলিয়া জানিয়াছি এবং শ্রীম এই গ্রন্থের রচয়িতা নহেন। পরমহংসের কথার তিনি বাহকমাত্র। যদি বল, এই গ্রন্থে তো আরও অনেকের কথা রহিয়াছে, তাহা হইলে বলিব, উপনিষদেও একাধিক কণ্ঠ শুনিতে পাই। গীতায়ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী অর্জুনের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়াই উপস্থাপিত হইয়াছে। ঈশ্বর ও তাঁহার কথা—তাঁহার পার্থিব লীলার মধ্য দিয়া আমাদের কাছে পৌঁছাইতেছে।

যদি কথামৃতকে শ্রুতি বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকেও শ্রুতি বলিতে হয়। ইহা শ্রুতির শ্রুতি। এখানে একটি প্রশ্ন অবশ্যই উঠিতে পারে—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী যদি শ্রুতি হয়, তাহা হইলে শঙ্করাচার্য, রামানুজের গ্রন্থগুলিও শ্রুতি বলিয়া গ্রহণ করিব না কেন? ইহার উত্তর স্পষ্ট। শঙ্করাচার্য ও রামানুজ আমাদের ধর্মচেতনার ইতিহাসে স্মরণীয় পুরুষ। হিন্দু-ধর্মদর্শনের ইতিহাসে তাঁহাদের কীর্তি—অক্ষয় কীর্তি। কিন্তু তাঁহারা বেদান্তের ভাষ্যকার এবং তাঁহাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। কোনও সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী, কোনও সম্প্রদায় অদ্বৈতবাদী, কোনও সম্প্রদায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, কোনও সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। এইসকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল বিরোধের কথা স্বামী বিবেকানন্দ বহুবার বলিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে সেইরকম কোনও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিলেন না। তিনি কোনও বিশেষ ধর্মমতের প্রবর্তক বা প্রচারক বলিয়া পরিচিত নহেন। হিমালয় যেমন সারা ভারতের হিমালয়, 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' তেমন সারা ভারতের কথামৃত। আবার চন্দ্র-সূর্য যেমন সারা বিশ্বের চন্দ্র-সূর্য—শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত তেমন সারা বিশ্বের কথামৃত। এই দ্বিতীয় কথাটি বোধহয় কাল বলিতাম না, আজ বলিতেছি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, তাহা আজ আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছাইতেছে। ষাট বছরের অধিক পূর্বে যেমন রোমাঁ রোলাঁই শ্রীরামকৃষ্ণকে পৃথিবীর এক প্রফেট বলিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। আজ শুনি এযুগের এক শ্রেষ্ঠ মনীষী আর্নল্ড টয়েনবি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিতেছেন: "His religious activity and experiences were in fact, comprehensive to a degree that has perhaps never before been attained by any other religious genius, in India or elsewhere." টয়েনবি আরও বলিলেন: "In the Atomic Age the whole human race has a utilitarian motive for following this Indian way." শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববরেণ্য প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সম্বন্ধে এই একই কথা বলিতে পারি। তাঁহার আদর্শ বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তির আদর্শ। সেই আদর্শ তিনি এক আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহাকে কেবল বেদান্তের একজন ব্যাখ্যাকার বলিয়া ধরিতে পারি না। তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতি বেদান্তমুখী বা বেদান্তমূল—ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিক চেতনার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সে বেদান্ত শঙ্করাচার্যের বেদান্ত নহে, রামানুজের বেদান্ত নহে, বল্লভের বেদান্ত নহে, নিম্বার্কের বেদান্তও নহে। সে বেদান্ত বিবেকানন্দের বেদান্ত। ইহাকেই আমরা নবযুগের নববেদান্ত বলি। এই বেদান্তই ক্রমে বর্তমান বিশ্বের বেদান্ত হইয়া উঠিতেছে। সেই বেদান্তের পদধ্বনি শুনিতেছি। সেই ধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া সারা বিশ্বের মর্ম স্পর্শ করিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, আমরা বিবেকানন্দের নববেদান্তকে নবযুগের এক নবীন শ্রুতি বলিয়া গ্রহণ

করিব। তাঁহাকে বেদান্তের ব্যাখ্যাতামাত্র বলিলে তাঁহার সকল কথার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিব না।

এমন কথা কোনও অর্থেই আমার একার কথা নহে। কত ঋষি, কবি, মনীষীর মুখে এই কথা শুনিয়াছি। আমেরিকার এক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক উইলিয়াম জেম্স্ বলিলেন: "The paragon of all monistic system is the Vedanta philosophy of Hindustan, and the paragon of Vedantist missionaries was the late Swami Vivekananda." এইখানে কোনও একটি কথা যোগ করিতে পারি এবং সেই কথাটি এই যে বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদকে আধ্যাত্মিক চরম আদর্শ বলিলেও, তিনি বেদান্তকে কেবল অদ্বৈতবেদান্ত বলিয়া উপস্থিত করেন নাই। তিনি বেদান্তের বিচিত্রমুখিতা, ইহার দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত—ইহার সকল দিক স্পষ্ট করিয়াছেন। এমনকি বিবেকানন্দ প্রতীক-উপাসনা—যাহাকে আমরা মূর্তিপূজা বলি, তাহাকেও তুচ্ছ করেন নাই। তিনি পরমহংসকে কালীমূর্তির সামনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইতে দেখিয়াছেন। আর রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনি: "আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহাবাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি,—দরিদ্রের মধ্যে ব্রহ্ম তোমাদেব সেবা চান। এই কথাটা যুবকদের চিত্তকে সমভাবে জাগিয়েছে। তাঁর এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে, বিচিত্র ত্যাগে ফলেছে।" ইহা তো এক নববেদান্তের কথা। এই বেদান্ত গুহাবাসীর বেদান্ত নহে, অরণ্যবাসীর বেদান্ত নহে। ইহা বিশ্বের মানুষের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ আধুনিক মানুষের বেদান্ত।

শ্রীঅরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে এক যুগ্মশক্তিরূপে দেখিয়া লিখিলেন: "The going forth of Vivekananda, marked out by the Mother as the heroic goal destined to take the world between his two hands and change it, was the first visible sign to the world that India was awake not only to survive but to conquer." বিপিনচন্দ্র পালও দেখি স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একত্র করিয়া ফেলিলেন: "The modern man can only understand Paramahansa in and through Vivekananda, even as Vivekananda can be understood only in the light of the life of his Master." ইহার পর বিপিনচন্দ্র বিবেকানন্দের বেদান্তবাণী সম্বন্ধে বলিলেন: "He was a true universalist, but his universalism was not the universalism of Abstraction" ইহার পর বিপিনচন্দ্র আরও বলিলেন: "The Vedantism of Ramakrishna Paramahansa could hardly be labelled as Sankara-Vedantism, nor could it be labelled as any of the different schools of Vaishnava-Vedanta." বিপিনচন্দ্রের এই বিষয়ে শেষ কথা এই যে শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্ত এবং বিবেকানন্দের বেদান্ত অভিন্ন বস্তু। তিনি লিখিলেন: "Paramahansa Ramakrishna, like Jesus Christ needed an interpreter to explain and deliver his message to his age. Jesus found such an interpreter in St. Paul : Ramakrishna found him in Vivekananda."

বাংলা ভাষায় বিপিনচন্দ্রের কথা বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়—রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের বেদান্ত কেবল তত্ত্বকথা নহে, উহা এক অনুভূতির কথা। উপলব্ধির কথা।

এখন একজন মার্কিন দার্শনিকের একটি উক্তি উপস্থিত করিতে চাহিতেছি। তাঁহার এই উক্তিটিকে বিবেকানন্দের বাণী সম্বন্ধে একটি মৌলিক উক্তি বলিয়া মনে করি। আমাদের শ্রুতিগ্রন্থগুলি অপৌরুষেয় বলিয়াই আমরা উহাদের শ্রুতি বলিয়া থাকি—এই কথা মনে রাখিয়া তিনি বলিতে চাহিলেন যে বিবেকানন্দের বাণীও ঠিক যেন পার্থিব মানুষের কথা নহে। অর্থাৎ প্রাচীন বেদের ন্যায় বিবেকানন্দ দৈববাণীর বাহকমাত্র। স্বামী চেতনানন্দ-সংকলিত বিবেকানন্দের বেদান্ত সম্বন্ধে উক্তিসমূহের এক সংগ্রহ 'Vedanta : Voice of Freedom' গ্রন্থের ভূমিকায় এক বিশিষ্ট দার্শনিক হাস্টন স্মিথ (Huston Smith) লিখিলেনঃ "...the voice of freedom that resounds through its pages has no identifiable source, if we hear it aright, we see that from the world's perspective it issues from nowhere. This is not, of course to deny, that an identifiable human being, a very great one, uttered or penned the words that fill these pages. But if we listen through the words to the thoughts they express, we know that Vivekananda is their conduit only, nor their author." অর্থাৎ বিবেকানন্দের বাণী—তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী হইয়াও উহা ঈশ্বর-প্রেরিত সনাতন বেদান্তের বাণী। উহা একালের শ্রুতি।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি—এই বাণীর নবত্ব কোথায়? ধর্ম অর্থে বিবেকানন্দ-কথিত বেদান্ত শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য প্রভৃতি বিশিষ্ট ভাষ্যকারের বেদান্ত হইতে ভিন্ন। যদি বেদান্ত সম্বন্ধে বিবেকানন্দের কোনও নূতন উপলব্ধি না থাকিত, তাহা হইলে তিনি পূর্বাচার্যদের কথাগুলি ইংরেজীতে উপস্থিত করিতে পারিতেন। অবশ্যই পূর্বাচার্যদের ভাষ্যগুলি তিনি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন। একথাও সত্য যে তিনি সেই ভাষ্যগুলির মাহাত্ম্যও স্বীকার করিয়াছেন। তবু তিনি অনুভব করিলেন যে নূতন কালে এই তত্ত্বের নূতন ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি অভিব্যক্তিতে বিশ্বাস করিতেন। ধর্মের ইতিহাস মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের এক পরিবর্তনশীল অগ্রগতির ইতিহাস। যাহা প্রাচীন তাহার সারতত্ত্ব এক নবীন রূপ ধারণ করিয়াই সঞ্জীবিত হয়। তিনি উপনিষৎসমূহের মধ্যেও তত্ত্বের এই ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন। ঈশ্বরের সকল কথা কি ফুরাইয়া গিয়াছে? তিনি একটি বক্তৃতায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বেদান্ত সম্বন্ধে সকল কথা শেষ হয় নাই বুঝিয়াই তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে নূতন ভাবনা উপস্থিত করিয়াছেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁহার একটি অনবদ্য প্রবন্ধে বলিয়াছেনঃ "স্বামীজী শ্রুতির ভাষ্য, টীকা-টিপ্পনী অপেক্ষা মূল বাক্যগুলিকে স্বাধীনভাবে বুঝিবার উপর জোর দিতেন।—স্বামীজীর দর্শন সর্বতোভাবে তাঁহার জীবনদর্শন।" এই কথাগুলি মনে রাখিয়াই স্বামীজীর নববেদান্তের মর্ম বুঝিয়া লইতে হইবে। এই নববেদান্তে যে আশার বাণীটি উচ্চারিত হইয়াছে সেই কথাটিই প্রথম বলিতে হয়। এই আশার কথাটি ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্যের ভাষায় উপস্থিত করিঃ "পৃথিবীর সকল মানুষকে, বেদান্ততত্ত্বজ্ঞানের অধিকার

দেওয়া স্বামীজীর সম্পূর্ণ নূতন এক মহান অবদান।" কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই কথাটির যাথার্থ্য তখনই বুঝি যখন দেখি স্বামীজী যত্রতত্র সকলের কাছে, দেশে বিদেশে, বেদান্তের কথা বলিতেছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পড়ি—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা'। যে কালে এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, সেইকালে বিশ্বের সকলেই অমৃতের পুত্র বলিয়া গণ্য হইতেন না। বিবেকানন্দ সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমাদের সকলের মধ্যেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। কেবল অরণ্যবাসী যোগী পুরুষই বেদান্ততত্ত্ব বুঝিবে, সাধারণ গৃহী মানুষ বেদান্ত বুঝিবে না, এমন কথা বিবেকানন্দ কখনও বলেন নাই। বরং তিনি বলিয়াছেনঃ "বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে একান্তভাবে কার্যকর হইতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে।" (বাণী ও রচনা, ২/২১৯) আমাদের এই উক্তিটির মাহাত্ম্য একটু চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। এখানে স্বামীজী সন্ন্যাসী ও গৃহীর মধ্যে যে অভেদের কথা বলিতেছেন, তাহাও বেদান্তের কথা। বেদান্তের কথা অভেদের কথা, সমন্বয়েব কথা, সমতার কথা।

বিবেকানন্দ 'ভাববার কথা' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধে এক 'নব যুগধর্ম' সম্বন্ধে তাঁহার উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন। আমরা যাহাকে নববেদান্ত বলিতেছি তাহা এই নব যুগধর্ম। তিনি এই প্রবন্ধে লিখিলেনঃ "এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন ধর্ম ও শাস্ত্রে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।" এখানে স্মরণ করিতে হইবে এই প্রবন্ধটি 'হিন্দুধর্ম কি' নামে ১৮৯৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের সময় পুস্তিকার আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে বিবেকানন্দ আমাদের বুঝাইলেন যে এই নব যুগধর্মের প্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার কথাগুলিই নববেদান্তের উৎস।

এখন স্বামীজীর এই নববেদান্তের কথাগুলি শুনিয়া লইতে পারি। একটি কথা শুনা হইয়া গিয়াছে। সে কথাটি এই যে বেদান্ত সকলের—ইহা এক সার্বজনীন, সার্বভৌমিক দর্শন। ইহাকে ধর্ম বল, তত্ত্ব বল, দর্শন বল—ইহা কোনও গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের বিত্ত নহে। ইহা তোমার, আমার, সকলের। বিবেকানন্দের নববেদান্তের দ্বিতীয় নূতন কথা এই যে বেদান্তকে একটি বিশেষ মতবাদের দর্শন বলিলে উহার বিচিত্রমুখিতা বুঝিতে পারিব না। বেদান্ত যেমন অদ্বৈতবাদী, তেমন দ্বৈতবাদী, তেমন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, আরও তেমন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যার পেটে যা সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন'। বিবেকানন্দের কথাঃ "একটি তত্ত্ব যেন অপরটির সোপানস্বরূপ। প্রথমে দ্বৈতভাবের কথা উপাসনা প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে। দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর পরস্পর বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। জাতীয় জীবনে উভয়েরই বিশেষ স্থান আছে। একটি ব্যতীত অপরটি থাকিতে পারে না, একটি অপরটির পরিণতি।"

আমি কল্পনা করিতে পারি বিবেকানন্দ রামপ্রসাদের গান 'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি'—সজলনয়নে শুনিতেছেন। আবার ইহাও কখনও শুনিতে পারি যে তিনি রামপ্রসাদের 'মা মা করে ডাকিস নে, মায়ের দেখা পাবি নে, থাকলে এসে দেখা

দিত, সর্বনাশী বেঁচে নাই, মা গেছে নাম-ব্রহ্ম আছে'—গানটি শুনিয়া ধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন। আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনার সকল ভাব, সকল চিন্তা, সকল অনুভূতি, সকল উপলব্ধি বেদান্তে বিধৃত। শাক্তকবি যখন বলেনঃ

মা কখন শ্বেত কখন পীত
কখন নীল লোহিত রে...
কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি
কখন শূন্যরূপা রে—

তখন তিনি পরম বৈদান্তিক। আমরা যদি স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তদর্শনের বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিব যে সেই দর্শন কেবল প্রস্থানত্রয়ের দর্শন নহে। স্বামীজীর বেদান্ত ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনার বিচিত্র প্রকাশের এক সমন্বিত রূপ। ইহার মধ্যে উপনিষদ্, গীতা, ব্রহ্মসূত্রের তত্ত্ব যেমন রহিয়াছে, মধ্যযুগের বেদান্ত-ভাষ্যকার শঙ্কর-রামানুজ প্রভৃতি যেমন রহিয়াছে, বৈষ্ণব-শাক্ত, মধ্যযুগের সন্তবর্গ—নানক, কবীর প্রভৃতির ভাবগুলিও তেমন রহিয়াছে। ভাবতের আধ্যাত্মিক চেতনার বিচিত্র প্রকাশের এক অপূর্ব সমন্বয় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ সেই সমন্বয়েব প্রবক্তা। যাঁহারা মনে করেন বিবেকানন্দের তিরোভাবের পব আমাদের ধর্মচেতনায় দ্বৈতবেদান্তের প্রতিষ্ঠা, তাঁহাবা রবীন্দ্রনাথ যে অদ্বৈতভাবেরও কবি তাহা লক্ষ্য কবেন না। স্বামীজী রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতভাবেব গানের প্রতি উদাসীন থাকিতেন—এই কথা মনে হয় কোনক্রমেই বলিতে পাবি না। বস্তুত স্বামীজী রবীন্দ্রনাথের গান গাহিতেন এবং সে গান পরমহংস শুনিতেন। কথামৃতে দেখি শ্যামপুকুরের বাড়িতে ১৮৮৫ সালের ২৪ অক্টোবর নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ' গানটি গাহিতেছেন। গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই দ্বৈতভাবের কবি। কিন্তু বিবেকানন্দ যে বলিয়াছেন দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের সোপান—তাহা রবীন্দ্রনাথে প্রত্যক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে লিখিলেনঃ

আমি চলিলাম
যেথা নাই নাম
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সংগমে।

বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে টানিয়া আনিলাম ইহা স্পষ্ট করিবার জন্য যে বিবেকানন্দের বেদান্তভাবনার বাহিরে কোনও আধ্যাত্মিক অনুভূতি নাই এবং রবীন্দ্রনাথ

যে বলিয়াছেন 'প্রেম যদি সমস্ত ভেদের মধ্যেই সম্বন্ধ স্থাপন না করিত, তবে অদ্বৈত কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন'—সেই কথাটিও বিবেকানন্দ-কথিত দ্বৈত এবং অদ্বৈতের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা। আসল কথা এই যে বিবেকানন্দ বেদান্তের যে অর্থ বুঝাইয়াছেন তাহা ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার এক পরিপূর্ণ প্রকাশ।

বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি বেদান্তকে সারা বিশ্বের ধর্ম হিসাবে উপস্থিত করিয়াছেন, ইহার মধ্যে স্বাদেশিকতার গন্ধমাত্র নাই। সারা পৃথিবী পর্যটন করিয়া, নানা ধর্মের সার্থক আলোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন না যে বেদান্তকে গ্রহণ করিয়া সকলে স্ব-স্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিবেন। তিনি বহুবার বলিয়াছেন যে তাঁহার সার্বভৌম ধর্মের পরিকল্পনায় ধর্মান্তরের স্থান নাই। যে কোনও ধর্মই বেদান্তমুখী হইতে পারে। হিন্দুধর্মও বেদান্তমুখী ধর্মে পরিণত হয় নাই। তিনি বলিলেনঃ "আমার ধারণা, বেদান্ত কেবল বেদান্তই সার্বভৌম ধর্ম হইতে পারে, আর কোন ধর্মই নয়।" (বাণী ও রচনা, ৯ · ৭১) তিনি আরও বলিলেনঃ "বেদান্তই একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম। জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল বেদান্তের উপদেশের সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে লব্ধ জ্ঞানের পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।" (বাণী ও রচনা, ৯ · ৭৩)

এখানে আমরা প্রশ্ন তুলিতে পারি, এই যে বিবেকানন্দ নববেদান্ত প্রচার করিয়াছেন, একশত বর্ষ পূর্বে, আজিও দেখি ভারতেই বেদান্ত এক সার্বজনীন ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইল না। বিশ্বের কথা আর নাই বলিলাম। ইহার কারণ স্বামী বিবেকানন্দই আমাদের বুঝাইয়াছেন। বেদান্তের ধর্ম আমরা বা বিশ্বের মানুষ গ্রহণ করি নাই, তাহার কারণ আমাদের জীবনে এখনও ধর্মপ্রাণতাই অনুপস্থিত। বেদান্ত সেইদিনই সারা বিশ্বে এক নূতন আধ্যাত্মিক চেতনার সৃষ্টি করিবে, যেদিন বেদান্তের জন্মভূমি এই ভারত জীবনের সর্বক্ষেত্রে বেদান্তমুখী হইয়া এক নূতন ধর্মপ্রাণ সমাজ গড়িয়া তুলিবে। বেদান্তের কথা আজ বিশ্বের বহু চিন্তাশীল মানুষের হৃদয় পূর্ণ করিয়াছে এবং সেকথা বিশ্বের মানুষ বিবেকানন্দের মুখেই শুনিয়াছে। কিন্তু কোনও দেশের ধর্মজীবনে তাহা এখনও প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। একদিন এই বেদান্তই ভারত এবং সারা বিশ্বে এক নূতন আধ্যাত্মিক চেতনা সৃষ্টি করিয়া, এক নবতম মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিবে এই প্রত্যয়েই বিবেকানন্দ বেদান্তপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই বেদান্তেই তিনি সেই ঐক্য ও অভেদের মন্ত্র শুনিতে পাইয়াছিলেন। সেই মন্ত্র আজিও দেশ-বিদেশে নানা কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে স্বামীজীর বেদান্তচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হইয়া Schuon Frithjob তাঁহার Language of the Self (১৯৫৯) গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ "The Vedanta appears among explicit doctrines as one of the most direct formulations possible of what makes the very essence of our spiritual reality." আমরা বেদান্তের ন্যায় আর একটি formulation-এর কথা জানি না এবং বিবেকানন্দ শুধু 'essence of our spiritual reality' বুঝাইয়া দেন নাই, সেই তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া কিভাবে আমরা সারা পৃথিবীতে এক মুক্ত, ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারি তাহার পথ নির্দেশ করিয়াছেন। সেই পথ আমরা কবে চিনিব, সেই পথে কবে চলিতে আরম্ভ করিব—আজ সেটাই প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের সহজ উত্তর বিবেকানন্দের বাণী ও রচনাতেই পাইব। যেদিন বুঝিব কেবল রাজনীতি, অর্থনীতি আশ্রয়ে আমরা

বিশ্বশান্তি বা বিশ্বমৈত্রী আনিতে পারিব না, যেদিন বুঝিব ধর্মই মানুষের একমাত্র গতি, সেইদিন এই পথের সন্ধান পাইব। বিবেকানন্দ বুঝাইয়াছেন যে বেদান্তের ব্রহ্মবাদই একালের মানবতাবাদ। 'তৎ ত্বম্ অসি' তত্ত্বের মধ্যে তৎ 'ত্বমে'র সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়াছে। এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ আধুনিক প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ।

বুদ্ধভাবনা ও বিবেকানন্দ

অমলেশ ত্রিপাঠী

পশ্চিমে যখন বুরনুফ (Bournouf), সেনার (Senart), ওল্ডেনবার্গ, গাইগার (Geiger) ও রিস ডেভিডস্ দম্পতি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তখন প্রশ্ন উঠেছিল—বৌদ্ধ মতবাদকে কি 'ধর্ম' আখ্যা দেওয়া যায়? ঈশ্বর বা দেবদেবীতে বিশ্বাস যদি ধর্মের লক্ষণ হয়, তবে হিন্দুধর্ম অবশ্যই ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ধর্ম নয়। বুরনুফের মতে তা হল 'a moral system without a god', ওল্ডেনবার্গের ভাষায়ঃ 'a faith without a god'. কিন্তু এমিল দুর্খাইম (Durkheim) 'The Elementary Forms of Religious Life'-এ বলছেনঃ 'ধর্মের প্রধান লক্ষণ হল—a sense of the sacred'. কোথা থেকে আসে এই পবিত্রতার প্রেরণা? দুর্খাইমের মতে, তা আসে সমাজের মূল্যবোধ ও সামগ্রিক জীবনের ওপর ব্যক্তির জীবনের নির্ভরতা থেকে। ব্যষ্টি, সমাজ, সমূহ—এগুলি ব্যক্তির চেয়ে ঢের বড়। ব্যক্তির আচার-আচরণকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তারাই অনুমোদন (sanction) দেয়। আর sanction দেয় বলেই sacred। যদি সমাজতাত্ত্বিকের কথা আমরা মেনে নিই তবে বৌদ্ধ মতবাদকে ধর্ম বলতে হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে বারংবার বলা হচ্ছে—ব্যক্তিসত্তা সীমাবদ্ধ, সীমাই অবিদ্যা এবং অবিদ্যাই দুঃখের মূল কারণ। বৃহৎ বিশ্ব থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধে এর জন্ম আর তার সঙ্গে ঐক্যানুভূতিতে এর বিলয়, এর নির্বাণ। 'নির্বাণ' শব্দ নেতিবাচক মনে হলেও আসলে নয়, তার মধ্যে একটা বড় ইতিবাচক দিক রয়েছে—মৈত্রীভাবনা। সাধককে ব্রহ্মাণ্ডের দেবমানব, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা সকলের সুখকামনা করতে হবে, করতে হবে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সমূহের কল্যাণচিন্তা।

দিট্‌ঠা যে অদিট্‌ঠা
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে
ভূতো বা সম্ভবেসী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

'অভিধর্মপিটক' (theology) পড়লে মনে হবে বৌদ্ধসাধনা শুধু অনিচ্চ, অবিজ্জা, অনত্তা বা শুধু সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ প্রভৃতি কার্যকারণ-শৃঙ্খলা নিয়ে নয়, এমনকি তৃষ্ণা দূর

করার জন্য অষ্টাঙ্গ মার্গ যোগসাধনাও নয়, তাকে বলা যেতে পারে জ্ঞানমূলক প্রেমের সাধনা। 'অঙ্গুত্তর নিকায়' গ্রন্থে বুদ্ধের শেষ বচনঃ "হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞানপূর্বক মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি মনে করিলে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন ব্যাপাদ বিনষ্ট হয় অর্থাৎ মন যখন সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রীময় হয়, তখন কামাভিলাষ, পরের অহিত চিন্তা ও ঔদ্ধত্য প্রভৃতি দূরে যায়।" থেরবাদীরা (হীনযানীরা) ব্যক্তিগত নির্বাণ (অর্হৎত্ব)-এর ওপর জোর দিলেও, ঈশ্বর, স্বর্গ, বোধিসত্ত্ব ইত্যাদি বাদ দিলেও, সমাজ এবং জাতির জীবনে সুমহান মূল্য ও নীতিবোধের উদ্বোধন চান। তারই জন্য ভিক্ষুর নিরলস উদ্যম, ক্ষুদ্র অহংবোধ ত্যাগ। তলিয়ে দেখলে উপনিষদ, গীতা থেকে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহামানবের অন্যতম শিক্ষা কি তাই নয়? নির্বাণ, মোক্ষ, মুক্তি সবই শেষ কথা ; প্রাথমিক কথা হল—'ছোট আমি' থেকে 'বড় আমি'র উপলব্ধিতে উত্তরণ। ধর্ম শুধু 'আত্মনো মোক্ষার্থম্' নয়, তা 'জগদ্ধিতায় চ' বটে।

॥ দুই ॥

বুদ্ধের উপদেশ এবং আচরণ, বস্তুত যাকে থেরবাদ বলি, তা বুঝতে গেলে, তার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বোঝা দরকার। বুদ্ধের জন্ম হিমালয়সানুতে অবস্থিত কপিলবাস্তুতে হলেও তাঁব কর্মজীবন বিস্তৃত ছিল কোশল থেকে মগধ হয়ে বৃজি, হয়তো অঙ্গ পর্যন্ত—মোটামুটি লক্ষ্ণৌর পশ্চিম থেকে পূর্বে ভাগলপুর। জন্ম হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে—(আঃ ৫৬৩ খ্রীস্টপূর্ব)। সে সময় এ অঞ্চলে দু'ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছিল ; (১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দ্রুত নগরায়ণ। তা সম্ভব হয়েছিল উন্নততর লৌহাস্ত্র দ্বারা বনভূমি উৎসাদন ও লাঙ্গল দ্বারা কৃষিক্ষেত্র বিস্তারের ফলে। বড় নগরের মধ্যে শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, রাজগৃহ, বৈশালীর নাম শোনা যাচ্ছে। কাশী পড়তি, কপিলবাস্তুও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। নগরায়ণের সঙ্গে এল বাণিজ্য, মুদ্রানির্ভর অর্থনীতি, ভূমি ও মূলধনের প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠী, গৃহপতি ইত্যাদি বণিক ও তাদের গোষ্ঠী-শ্রেণী (guild)-র গুরুত্ব। প্রাক্-বৌদ্ধ আমলে সবকিছু ঘটনার উৎস ছিল দৈব। এখন থেকে দেবতার ইচ্ছার চেয়ে মানুষের কর্মের মূল্য বাড়তে থাকে। কর্ম বৌদ্ধ মতবাদের কেন্দ্র। (২) দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন—রাজনৈতিক। জাতি (tribe) নির্ভর শাসনতন্ত্রের স্থলে দেখা দিল জনপদ বা আঞ্চলিক (territorial) শাসনতন্ত্র—তা কোশল ও মগধে রাজতন্ত্রের এবং কপিলবাস্তু ও বৈশালীতে অভিজাতপ্রধান সাধারণতন্ত্রের রূপ নেয়। এই রাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রের বিরোধ বুদ্ধের সময় থেকে প্রকট হয় এবং পরিণামে সকল কিছু গ্রাস করে, মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য অতীন্দ্রনাথ বসুর 'Social and Rural Economy of Northern India' (1961) ও ডি. ডি. কোশাম্বীর 'The Culture and Civilisation of Ancient India' (1965) দ্রষ্টব্য। প্রধানত এদের অনুসরণ করেছেন রোমিলা থাপার। রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্য অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'Political History of Ancient India' আজও অনন্য। তার সঙ্গে অধ্যাপক ইউ. এন. ঘোষালের 'A History of Indian Public Life', vol. II ; 'The Maurya

and Pre-Maurya Period' (1966) পড়লে ভাল হয়।

সোজা কথায় একটা প্রচণ্ড ভাঙা-গড়া চলছিল কি অর্থনীতি কি রাজনীতিতে। প্রথম নগরায়ণ হয়েছিল প্রাগার্য হরপ্পা ও মহেন্‌জোদারোতে, তেমনি প্রথম সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় কুরু-পাঞ্চালের যুদ্ধ তথা কুরুক্ষেত্র। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে মধ্যদেশ দিয়ে রাজমহল পর্যন্ত অগ্রসর হতে উৎকৃষ্টতর প্রযুক্তির প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ণ ও সাম্রাজ্য তাই উন্নত ধরনের। এমন নতুন পরিবেশে ব্যক্তি ক্রমশ আপন ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র গণ্ডিতে আলাদা হয়ে যাচ্ছিল। তার মধ্যে দেখা দিচ্ছিল একটা অস্থিরতা, অশান্তি, উদ্বেগ এবং নিরাপত্তার অভাবে হেরে যাবার ভয়ে, সে আরও জোরে আঁকড়ে ধরছিল আপন 'অহম্'কে। আজকালকার ভাষায়— 'identity crisis', দুর্খাইমের ভাষায়—anomie, বুদ্ধের ভাষায়—প্রথম আর্যসত্য—দুঃখ।

বুদ্ধের সময়, বরং কিছু আগে থেকেই, বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। আজীবিক, জৈন, লোকায়ত—তাদের নানা নাম। 'ব্রহ্মজাল সুত্তে' ও 'শ্রামণ্যফল সুত্তে' (সামঞ্ঞফল সুত্ত) তাদের বিস্তৃত বর্ণনা পাই। এদের গুরুদেবের নাম—পূবণকশ্যপ (পূরণকস্সপ), মক্‌খলিগোসাল পুত্ত, অজিত কেশকম্বলী, নিগণ্ঠ নাটপুত্ত ইত্যাদি। বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে সিদ্ধার্থ এঁদের কারুর কারুর কাছে শিক্ষালাভের জন্য গিয়েও ছিলেন। এঁদেব বলা হত শ্রমণ বা পরিব্রাজক। এঁরা কাম্যুর ভাষায়—outsider অর্থাৎ বর্তমান ধর্মমত ও আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে এঁরা স্বেচ্ছায় সমাজ ত্যাগ করেছেন। মতের নামও মেলে। এঁদের কেউ ছিলেন শাশ্বতবাদী, কেউ অশাশ্বতবাদী, কেউ অন্তানন্তিকবাদী। তাছাড়াও পূর্বান্ত ও অপরান্তকল্পিক, উচ্ছেদ-নানাবাদের উল্লেখ রয়েছে। সবাই প্রায় একে অন্যের বিরোধী এবং সেজন্য ব্রহ্মণ্য ধর্মের সুদৃঢ় বর্মে ছিদ্র করতে অসমর্থ ছিল।

বুদ্ধই প্রথম প্রখর যুক্তি ও উদার মানবিকতা অবলম্বনে এমন একটা ধর্মমত রচনা করলেন, যা ব্রহ্মণ্য কর্মকাণ্ডকে প্রবল চ্যালেঞ্জ জানাল। তিনি শুধু অপচয়ী ও হিংসাশ্রয়ী যজ্ঞবিধির বিরোধিতা করলেন না, ব্রহ্মণ্য সৃষ্টিতত্ত্ব এবং স্রষ্টা ব্রহ্মাকে উপহাস করে বৈদিক দেবতত্ত্ব উড়িয়ে দিতে চাইলেন। 'অমবট্‌ঠ সুত্তে' তিনি যেভাবে জাতিভেদ খণ্ডন করেছেন তা আর্য বর্ণাশ্রম মেনে নিতে পারে না। 'সুত্তনিপাতে' পড়ি, "জাতি দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, জাতি দ্বারা কেহ অব্রাহ্মণও হয় না, কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, কর্ম দ্বারাই অব্রাহ্মণ হয়।" আরও—"যিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন, তাঁর যে জাতি হোক না কেন, তিনি শ্রেষ্ঠ।" আবার অন্যদিকে সব লোকাচার মেনে নিয়েছেন তাও নয়। জনসাধারণের মধ্যে সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বেশি সময় চাই, নতুন কৌশল চাই। ধীরে ধীরে, সহজ পালি ভাষায়, জাতকের মতো কাহিনীর সাহায্যে, মাঝে মাঝে নিরীহ লোকাচার মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে—এ মনস্তত্ত্ব বুদ্ধের অজানা ছিল না। কিন্তু কোনও ক্ষতিকর লোকাচার বা কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। তার প্রমাণ—'শিগালবাদ সুত্ত'। তখন দিক্‌পূজার প্রচলন খুব বেশি ছিল। বুদ্ধ দিকের অর্থই বদলে দিলেন। বললেন: "পিতামাতা—পূর্বদিক, স্ত্রীপুত্র—পশ্চিম, গুরু—দক্ষিণ, বন্ধুবান্ধব—উত্তর, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ—উর্ধ্ব এবং দাসদাসী—অধঃ।" একই সঙ্গে সমস্ত মানবিক সম্পর্ককে জড়িয়ে এবং তাদের গুরুত্ব হিসেবে স্থান নির্দেশ করে তিনি তৎকালীন সামাজিক নৈরাজ্য দূর করতে চেয়েছিলেন।

আচার, ভাগ্যগণনা, তন্ত্র, মন্ত্র, অভিচারের ঘোরবিরোধী ছিলেন তিনি। সাধারণে প্রচলিত ভূতপূজা, পিশাচপূজা (worship of evil spirits) প্রাগার্য সংস্কার। ব্রাহ্মণেরাও অর্বাচীন লোক বশ করার জন্য অথর্ববেদে তাদের স্থান করে দিয়েছিল। বুদ্ধ সুকৌশলে সমস্ত রকম ভূতপ্রেতকে মারের ধারণায় সংহত করলেন। তাঁর মারদমনের কাহিনী কিছুটা কুসংস্কার দমনেরই রূপক।

কিন্তু ব্রহ্মণ্য কর্মকাণ্ডই ছিল তাঁর আসল প্রতিপক্ষ। 'কূটদন্ত সুত্তে' তিনি যজ্ঞবিধির যে নিন্দা করেছিলেন তার তুলনা নেই। এর মধ্যে অহিংসা তো ছিলই, তদুপরি ছিল আর্থিক অপচয়-বিরোধিতা। কোনও উন্নয়নশীল অর্থনীতি এত ঘৃতের শ্রাদ্ধ আর এত অজস্র পশুবধের প্রশ্রয় দেবে না। মনে রাখতে হবে, পশু তখনও মূল্যবান মূলধন। যজ্ঞের ব্যয় তোলা হত প্রজাদের ওপর কর বসিয়ে। সেটা বন্ধ করতে পারলে মূলধন বাঁচবে, সাধারণের শোষণও কমবে। কিন্তু এখানেও মনস্তত্ত্ববিদ্ বুদ্ধ মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়ালেন—বিকল্প যজ্ঞের ব্যবস্থা করে। প্রব্রজিতদেব দান; সংঘের জন্য বিহারনির্মাণ; ত্রিশরণ গ্রহণ এবং জীবহিংসা, অদত্ত গ্রহণ, মিথ্যা ও পরুষভাষণ, পরদার গমন, মাদকসেবন এসব ত্যাগই—বিকল্প যজ্ঞ। শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ অবশ্যই তন্হা বা তৃষ্ণাত্যাগ।

কিন্তু শুধু ব্রহ্মণ্য আচার নয়, লোকায়ত, আজীবিক, সন্দেহবাদী প্রভৃতি শ্রামণ্যপন্থাও তিনি খণ্ডন করেন। লোকায়ত মতাবলম্বীরা বলতেন—চতুর্ভূতের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে চৈতন্যের উদ্ভব; নৈতিক বা অনৈতিক কর্মের ফল ভিন্ন নয়; ইন্দ্রিয়জ সুখই কর্মের নিরিখ; সকলেরই ইচ্ছার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এদের যদৃচ্ছাবাদীও বলা হত। বুদ্ধ এমন hedonist দর্শন মানেননি। আজীবিক আলাড় কালামের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ভুললে চলবে না। বলা হয়, তাঁরই শিষ্যরূপে গৌতম সাংখ্যবাদের সঙ্গে পরিচিত হন ও নিরীশ্বরবাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু অধ্যাপক দণ্ডেকারের মতে সাংখ্যের উৎপত্তি প্রাগার্য, প্রাগ্‌বৈদিক। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাগার্য পরিবেশে গৌতম স্বাধীনভাবেই নিরীশ্বরবাদে উপনীত হতে পারেন। তাছাড়া বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদের ওপর বেশি জোর দেওয়া ঠিক নয়। ঈশ্বর আছেন কি নেই, বুদ্ধ এ প্রশ্ন সর্বব্যাপী দুঃখের পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে করতেন। দুঃখের শর মানুষকে নিয়ত বিদ্ধ করছে। তার দুঃখ উপশম প্রাসঙ্গিক কর্তব্য—ব্যাধ কি বর্ণের পোশাক পরেছিল, কত বয়স তার, ধনু ও তীরই বা কিরূপ—এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক, তাই অনালোচ্য। রিস ডেভিডস্ তাঁর অনুবাদ গ্রন্থে[১] আজীবিক পূরণ কস্‌সপের উক্তি তুলে দিয়েছেন: "In generosity, in self-mastery, in control of the senses, in speaking truth, there is neither merit nor increase of merit." বুদ্ধ একথা আদৌ মেনে নেননি। কর্ম তাঁর প্রতীত্যসমুৎপাদের কেন্দ্রে। তিনি মনে করতেন শুভ ও অশুভ কর্মের ব্যাপারে মানুষের নৈতিক নির্বাচন-স্বাধীনতা আছে (freedom of moral choice)। আজীবিকরা মানুষকে সে ক্ষমতা না দিয়ে তার চারদিকে যে কারাগার রচনা করেছিল, বুদ্ধ বরং তা ভেঙে দেন। সন্দেহবাদীদের নেতা সঞ্জয়ের বাণীও উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এদের মতে সত্য কি সে সম্বন্ধে শেষ কথা জানা যায় না। বিতর্কে শুধু শান্তি নষ্ট। বৌদ্ধরা উপহাস করে এদের 'eel-wrigglers' বা পাঁকাল মাছ আখ্যা দিয়েছেন। চার আর্যসত্যের প্রাসঙ্গিক কোনও প্রশ্ন না এড়িয়ে বুদ্ধ তাঁর মতবাদ স্থাপন

করেছিলেন। এজন্য তা এত বাস্তবানুগ। তাঁর অসামান্য বিশ্লেষণ শক্তি আবার মনস্তত্ত্বসম্মত। সর্বোপরি তার কেন্দ্রে বিরাজ করছে সর্বব্যাপী, সর্বত্রগামী এক মানবিকতা, যেখানে ভ্রাতা আনন্দ ও নাপিত উপালি, ধনী শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ ও দরিদ্র মোগ্‌গলায়ন, মহিষী উর্বিরি ও দাসী পূর্ণা, লিচ্ছবিনায়ক সিংহ ও নটীমুখ্যা আম্রপালির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সকলেই জরামরণব্যাধিবিধ্বস্ত মানুষ—আর তাঁর দিকে নির্বাণ ভেষজের জন্য উদ্‌গ্রীব আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে।

মহাবংশে আছে, বুদ্ধ তখনও বোধিসত্ত্ব—উরুবিল্বে বসে ভাবছেনঃ "কেন আমি তা চাইছি যা জন্ম, জরা, বিনাশ, মৃত্যুর অধীন? কলঙ্ক, দুঃখের অধীন? আমার উচিত অজাত, অজর, অবিনাশী, অমর, কলঙ্কহীন ও দুঃখরহিতকে অন্বেষণ।" তার পূর্বে জানতে হবে দুঃখের কারণ কি? রোগ-নির্ণয় না হলে কি নিরাময় হয়? দুঃখের কারণ—অত্তা, অহম্-বোধ, যার আসল কোনও অস্তিত্ব নেই। অনিচ্চ ও অনত্তা বারংবার তাঁর কথোপকথনে উচ্চারিত।

অথচ উপনিষদের মূলভিত্তি—আত্মা। তবে কি তিনি কর্মকাণ্ডের মতো ব্রহ্মণ্য জ্ঞানকাণ্ডকেও অস্বীকার করতে চেয়েছেন? কাল-নিরূপণ-বিজ্ঞান (chronology) আমাদের সাহায্য করতে পারে। বুদ্ধের সময় ৫৬৩-৪৮৩ খ্রীস্টপূর্ব হলে কয়েকটি উপনিষদ তাঁর পূর্ববর্তী বলতে হবে। বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য তো বটেই, তৈত্তিরীয়, ঈশা, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য হওয়াও সম্ভব। তেবিজ্জসুত্তে তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের কথা পড়ি। যাজ্ঞবল্ক্য বেদব্যাসের কনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন এমন প্রমাণ মহাভারতে রয়েছে। বিদেহের রাজা জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর সঙ্গে ব্রহ্ম নিয়ে বিতর্কে নেমেছিলেন। তখন বিদেহ বড় রাজ্য ছিল। বুদ্ধের সময় কুরু, পঞ্চাল বিনষ্ট, বিদেহ হীনবল, কাশী মগধের কুক্ষিগত। দ্বিতীয়ত, অরণ্যই ঔপনিষদ জগতের পরিবেশ জুড়ে আছে। তার এক ভাগের নামই ছিল আরণ্যক। বৌদ্ধ পরিবেশ সম্পূর্ণ নাগরিক। জীবনের অধিকাংশকাল রাজগৃহ ও শ্রাবস্তীতে কাটিয়েছেন বুদ্ধ—শুধু শ্রাবস্তীতেই ঘটেছিল তাঁর পঁচিশটি বর্ষাবাস। সুত্তপিটকের ৮৭১টি, জাতকের ৪৯৮টি শ্রাবস্তীতে উচ্চারিত হয়েছিল। বাইরেও তিনি কাশী, কোশাম্বী, বৈশালী ও কপিলবাস্তুতে কয়েকবার গেছেন। সারনাথে ঘটেছিল ধর্মচক্রপ্রবর্তন, বহু জাতকের কাহিনী বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত দিয়ে শুরু। মূলত, তাঁর বাণী নগরবাসীদের প্রতি—তা রাজা থেকে দরিদ্রতম নরনারী পর্যন্ত প্রসারিত। আরণ্যক তো সম্পূর্ণ বানপ্রস্থী অরণ্যবাসীদের জন্য আর উপনিষদ গুরুশিষ্যের গুহ্য সংলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্য তা রাজসভায় নিয়ে এলেও কর্ম, পুনর্জন্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে মতবাদ সর্বসমক্ষে উচ্চারণ করেননি। কর্মানুসারে জন্ম থেকে জন্মান্তরে আত্মার পরিক্রমাই সংসার।

ঋগ্‌বেদের বাক্, নাসদীয় ও পুরুষসূক্ত থেকে যাজ্ঞবল্ক্যের বৃহদারণ্যক—অদ্বৈতবাদের এক দুঃসাহসী অভিযান। ছান্দোগ্য ও মাণ্ডূক্যকে অদ্বৈতবাদী বলতে হবে। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি—এই চার মহাবাক্যে ব্যক্তির আত্মা, জগৎ ও ব্রহ্মের নিগূঢ় ঐক্যতত্ত্ব ধ্বনিত হয়েছে। ব্রহ্ম একো হি সদ্বিপ্রঃ। তিনি বহু শক্তি যোগে অনেক বর্ণে নিহিত হয়েছেন। তিনি সমস্ত রূপ ধারণ করেছেন, সবকিছু ব্যাপ্ত করে আছেন। সব দৃশ্যবস্তুর ground reality তিনি, পরিবর্তমান সংসারের অপরিবর্তমান সার তিনি। ঈশ

বলছেন, তিনি অকায়, অব্রণ, অস্নাবিঃ অথচ সকলকে যথাযথ চালনা করছেন (ঈশঃ ৮)। তিনি দ্রষ্টা, শ্রোতা, বোদ্ধা, সত্তা, কর্তা, অক্ষর, উপাধিরহিত, নির্গুণ (প্রশ্ন ৪।৯)। বাইরের জগৎ—phenomenal, ব্যবহারিক, মায়া, অবিরত বদলে যাচ্ছে। উপনিষদে মায়াকে ব্রহ্মের অনির্বচনীয় সৃষ্টিশক্তিরূপে দেখা হয়েছে। শঙ্করাচার্য তো তাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। অতটা না গিয়েও বলা যায়, কিছুরই ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। অন্যদিকে মানুষের মধ্যে রয়েছে আত্মা। তা কি রকম? শরীরমধ্যে (গুহাহিত) অবস্থিত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ কিন্তু অজ, নিত্য, শাশ্বত (কঠ ১।২।১৯), অরূপ. অশব্দ, অব্যয়, অস্পর্শ (তদেব, ১।৩।১৫)। তা সব বিপরীতের সমন্বয়, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, মহৎ থেকে মহত্তর। অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে তার অনেক সাদৃশ্য। তার স্বরূপ জানলে ব্রহ্মের স্বরূপও জানা যায়। অবিদ্যাজালে জড়িত হয়ে, ইন্দ্রিয়ের বশীভূত ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ জানে না। যজ্ঞাদি দ্বারাও নয়। 'প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা'। তৃতীয় মুণ্ডকেব অনবদ্য রূপক—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' মন্ত্রে—দুই পাখির কথা আছে, এক পাখি স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি তা দেখে। প্রথমটি ভোক্তা—'ছোট আমি', দ্বিতীয়টি—দ্রষ্টা বা 'বড আমি'। এই দ্বৈতবাদের ওপরে অক্ষর পুরুষের অদ্বৈতভাবে উঠতে হবে (প্রশ্ন ৪।৯।১০)। যোগধ্যানাদির সাহায্যে এবং ধাতু প্রসাদে (মানুষের সাধনা যথেষ্ট নয়, ঈশ্বরের করুণাও দরকার) মানুষ একদিন আপন অন্নময় কোষ থেকে আনন্দময় কোষে উত্তীর্ণ হবে (তৈত্তিরীয় ২।৬।৭), আত্মার সে ব্রহ্মোপলব্ধির নাম—সমাধি। মুণ্ডকের ২।২।৩ ও ২।২।৪-এ (এবং কঠে) সাধনার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। উপলব্ধির ফল—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ' (মুণ্ডক ২।২।৮)। তখন আত্মার নদী ব্রহ্মের সমুদ্রে মিশে যাবে (মুণ্ডক ৩।২।৮)। তারপর ভেদ বা অভেদ বোঝা যাবে না। যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় কে দেখছে, কাকে দেখছে, কি দিয়ে দেখছে—সব ভেদ বিলীন। এ এক রহস্যানুভূতি বা mystic experience। তবে আলো, অমৃত, আনন্দ প্রভৃতি শব্দ কিছুটা বোঝায়। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' (মুণ্ডক ২।২।৭)-কে দেখলে 'ন বিভেতি কদাচন'; 'ন বিভেতি কুতশ্চন' (তৈত্তিরীয়, চতুর্থ ও নবম অনুবাক)। আমাদের ভাষায়-সমস্ত existential fear বিদূরিত হবে। বুদ্ধের ভাষায়—দুঃখনিবোধ বা নির্বাণ।

দেখা যাচ্ছে, আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব থেকেও বুদ্ধের পরিণাম ও বেদান্তের পরিণাম খুব আলাদা নয়। 'অবিজ্জা' তো অবিদ্যারই পালিরূপ। কামক্রোধাদি তো তন্‌হা বা তৃষ্ণার বিশ্লেষণ। সমাধি, মোক্ষ, মুক্তি ও নির্বাণের সীমারেখা নির্দেশ করা কঠিন। আসলে সুত্তনিপাত, উদান ও ইতিবুত্তকে নির্বাণের ধারণা এত নেতিবাচক হয়নি যেমন হয়েছে পরবর্তী সংযুক্ত বা অঙ্গুত্তর নিকায়ে। রাজা প্রসেনজিৎ-এর সভায় যে বিতর্ক হয়েছিল তাতে, নির্বাণের আনন্দ বর্ণনাতীত হলেও, তাকে পদ্ম, জল, ওষধি, সমুদ্র, আকাশ প্রভৃতি দশবস্তুর সঙ্গে তুলনা করেন বুদ্ধ। পদ্মের মতো জলে থেকেও নির্লিপ্ত, জলের মতো দহনপ্রশমক, ওষধির মতো ভবরোগহর, সমুদ্রের মতো বহু সাধনের সঙ্গম (মুণ্ডক তুলনীয়), আকাশের মতো অজ, অব্যয়, অনাদি, অনন্ত (আকাশ-চেতনা বৈদিক ভাবনার অঙ্গ), গিরিশৃঙ্গের মতো অত্যুচ্চ, অটল ইত্যাদি। নিরোধ, নিব্বিদা প্রভৃতি নেতিবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে অভিঞ্‌ঞা (অভিজ্ঞা), সম্বোধির মতো ইতিবাচক শব্দ। উপনিষদ

দেশ, কাল, কার্যকারণশৃঙ্খল থেকে মুক্তির কথা বলছে। নির্বাণেও প্রতীত্যসমুৎপাদের শৃঙ্খলের, সমস্ত becoming-এর অবসান। একটা কথা না বলে পারছি না। মৃত্যুর কিছু পূর্বে আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন: "সংঘ চালনার জন্য আপনি কাউকে নির্বাচন করলেন না?" তখন উত্তর এসেছিল: "সংঘ আমার কাছে আর কি প্রত্যাশা করেন? আমি কখনো মনে করিনি আমি এই সংঘের চালক বা সংঘ আমার অধীন। সংঘরক্ষার জন্য আমি কোন বাঁধাধরা নিয়ম রাখতে চাই না। আনন্দ, আত্মদীপো ভব—আপনারাই আপনাদের প্রদীপ হও।" এখানে 'আত্ম' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। তিনি 'অত্তা' ও 'আত্মা' কথা দুটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করলে আশ্চর্য হব না। সেই 'ছোট আমি' ছেড়ে 'বড় আমি'-র আশ্রয় গ্রহণ। 'আত্মদীপো ভব'—অশোকের মনকে এমন স্পর্শ করেছিল যে এক অনুশাসনে তিনি এর উল্লেখ করেছেন। উপনিষদ যেমন যোগ-ধ্যান ইত্যাদি সাধন মার্গের ওপর, ব্যক্তির উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ওপর জোর দিয়েছেন, বুদ্ধও তাই। তুলনা করুন উপনিষদের বাক্য—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' আর বুদ্ধের বাক্য—'কুসীদ্পঞ্ঞায় মগ্গং অলসো ন বিন্দতি' অর্থাৎ নির্বীর্য ও অলসব্যক্তি জ্ঞানপথ লাভ করতে পারে না। ধম্মপদে আছে ধর্মের জন্ম মনে, নির্মলান্তঃকরণের কাজে সুখ আর দূষিত মনে কাজ করলে চক্র যেমন ভারবাহী বলদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, দুঃখও তাকে সেরূপ অনুসরণ করে। চিত্তশুদ্ধি উপনিষদের প্রথম শর্ত। বুদ্ধ 'সভাবিত চিত্ত' দ্বারা এই কথাই বলেছেন। আর কর্ম বাঁধে একথা বললেও পুনঃপুনঃ পুণ্যকর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শুধু পুনঃপুনঃ নয়—মনের আনন্দে কর্ম, পাখিদের গান গাওয়ার মতো সহজে, স্বেচ্ছায় আনন্দে কর্ম। তা বিমূঢ়ের অভ্যস্ত আচার হবে না, সম্যক্ জ্ঞানপূর্বক আচরিত হবে।

'অত্তদত্থমভিঞ্ঞায় সদত্থপসুতো সিয়া' পঞ্চশীল বা অষ্টশীল বা দশশীলের লক্ষ্য অবিজ্জারূপ 'পরমং মলং' বিনাশ। উপনিষদ বলছেন—ব্রহ্ম শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। মানুষ যখন ব্রহ্মোপলব্ধি করবে সেও হবে ব্রহ্মস্বভাব—শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। বুদ্ধ কি তাই বলেননি? তৃষ্ণার মূল উৎপাটন কর, ঊর্ণনাভের ক্ষুদ্রজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এস, কূপমণ্ডূকত্ব ত্যাগ করে ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ কর। তুমি ওঠো, জাগরিত হও। স্বার্থত্যাগ করে পরার্থে জাগরিত হও, ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করে বিরাটকে গ্রহণ কর, সর্বজীবের মধ্যে আপনার বৃহৎ মূর্তি প্রত্যক্ষ কর। প্রীতিকে বাধাহীন, সীমাহীন করে সর্বদেশে, সর্বকালে প্রসারিত কর। নির্বাণী যিনি, তিনি বিচ্ছিন্ন নন, সমস্তের সঙ্গে যুক্ত, সর্বভূতের মঙ্গলে রত। এখানে সাধক কর্মের দাস নয়, প্রভু। কারণ তার সমস্ত তৃষ্ণা বিগত। তিনি কর্ম করবেন—তার বন্ধনে বাঁধা পড়বেন না। বুদ্ধ বন্ধনমুক্তির ক্ষমতা ও স্বাধীনতা মানুষকে দিয়ে মানবাত্মাকে চরম গৌরব দান করেছেন। বুদ্ধত্ব লাভের অর্থ—আপনার ভিতরের বৃহৎ সত্য সম্বন্ধে বোধি লাভ—তা আমিত্বের প্রসার ছাড়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত জীবন যখন বিশ্বজীবনের সঙ্গে একীভূত হয় তখন তা কি উপনিষদের নদীর সমুদ্র-সঙ্গমের মতো নয়? বা রামকৃষ্ণের—'নুনের পুতুলের সমুদ্রে যাওয়ার' মতো নয়? বা রোমাঁ রোলাঁর 'oceanic feeling' এর মতো নয়?

॥ তিন ॥

উপনিষদের যুগের শেষ দিকে সাংখ্য ও যোগের গুরুত্ব বেড়েছিল, যদিও তাদের উদ্ভব অনেক আগে। নির্লিপ্ত পুরুষ ও অব্যাকৃত প্রকৃতি সাংখ্যের আদিতত্ত্ব। প্রকৃতির তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ তমঃ। প্রকৃতি ব্যাকৃত হতে শুরু করলে পুরুষরা তার জালে জড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ বা অন্য জীবের আকার ধারণ করে। ফলে তারা দেশ, কাল ও কর্মের বন্ধনে বন্দী হয়। পুরুষে তখন বুদ্ধি, অহম্, মন, কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ইত্যাদি তত্ত্ব আরোপিত হয়। অন্তহীন কর্মচক্রে আবদ্ধ পুরুষ পূর্বতন নির্লিপ্ত অবস্থায় ফিরতে পারে, তখন সে কৈবল্য লাভ করে। অর্থাৎ প্রকৃতি ও অন্যান্য পুরুষ থেকে পৃথক হয়ে যায়। সাংখ্যে ঈশ্বর ও ব্রহ্মের উল্লেখ কম। যোগের ঈশ্বরকে প্রকৃতি বাঁধতে পারে না। সে ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে ঈশ্বরের মতো হওয়া যায়। তাই মোক্ষ। সাংখ্যে যা জ্ঞান, যোগে তা সাধনা—theory ও practice-এর মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন বা ঈশ্বরে লুপ্ত হবার ভাব নেই।

শেষ দিকের উপনিষদে ঈশ্বর গুরুত্ব পেতে থাকেন। কঠ (৩, ১০-১১) ও মুণ্ডকে (মু ২, ১-৯) ভক্তির সুর বাজতে শুরু করে। ভক্তিযোগে উত্তরণের transitional stage রূপে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদকে চিহ্নিত করা যায়। এখানে সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বভূতান্তরাত্মা, সাক্ষী, চেতা ইত্যাদি ব্রহ্মভাবনা থেকে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের মধ্যে মহেশ্বর, দেবতার মধ্যে পরম দৈবত, পতির পতি, শরণ্য ও পূজনীয় ঈশ্বর বেশি গুরুত্ব পাচ্ছেন। আত্মার ব্রহ্মোপলব্ধির কথা আছে ২।১৪।১৫ শ্লোকে। তারপর তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে রুদ্রশিবের কথা। তাঁকে বিশ্বস্রষ্টা, ঈশান (নিয়ন্তা), বিশ্বকর্মা ও বিশ্বরূপ ইত্যাদি নানা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাছে প্রার্থনার মন্ত্র—'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'।

কেন জ্ঞান ভক্তির দিকে মোড় নিল তার একটা সমাজতাত্ত্বিক কারণ রয়েছে। উপনিষদ বেড়ে উঠেছিল আশ্রমিক প্রচ্ছায়ে, বৌদ্ধ হীনযান সদ্য-জায়মান নগর সভ্যতার আশ্রয়ে।

যতদিন জনকের মতো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ততদিন উপনিষদ বর্ধিষ্ণু ছিল। মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্ম শুধু ভারতেই প্রতিষ্ঠা পায়নি, সুদূর লঙ্কা, তক্ষশীলা, এমনকি এশীয় গ্রীসেও প্রভাববিস্তার করেছিল। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্য বিনষ্ট হবাব পর শুঙ্গ ও কাণ্ব আমলে ব্রহ্মণ্যবাদ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একদিকে ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীক, অন্যদিকে মধ্য এশীয় শক-কুষাণ জাতি ভারতের পশ্চিমে রাজ্য স্থাপন করে। তারা মথুরা পর্যন্ত এসেছিল। কেউ কেউ বলে পাটনা পর্যন্ত। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত ভারতে যা চলছিল তা আর্নল্ড টয়েনবির ভাষায়, time of troubles, অতীব সংকটকাল। নানা জাতি, নানা মানের ধর্ম (তার মধ্যে animism-ও ছিল), নানা উচ্চ-নীচ সংস্কৃতি-সংঘর্ষের ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ফলে সাধারণ মানুষ বিপন্ন ও বিভ্রান্ত বোধ করে। জ্ঞানমার্গ বা যোগসাধনা হয় সাধ্যাতীত। তারা সহজ ভক্তির পথ নিয়ে শান্তি ও সান্ত্বনা পেতে চায়—দৈবী আশ্রয় পেতে চায়। বৈদিক রুদ্রশিব ও বিষ্ণুর ঐতিহ্য তো ছিলই। মহাভারতের সময় থেকে বাসুদেব কৃষ্ণও প্রাধান্য পাচ্ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভীষ্মের কৃষ্ণবন্দনা স্মরণীয়। মানুষ বুদ্ধ ও তাঁর নীতিবাদী সাধনা সংঘকে সন্তুষ্ট

রাখতে পারছিল না। আর কোন গ্রীক, শক বা কুষাণ বেদান্ত বা থেরবাদের তত্ত্ব বুঝবে? কাশীপুত্র ভাগভদ্রের সভায় গ্রীক-দূত হেলিও ডোরাসের গরুড় স্তম্ভ নবাগত অভারতীয়দের মধ্যে ভক্তিবাদের জনপ্রিয়তার প্রমাণ। কুষাণরাজদের মুদ্রা থেকে বোঝা যায় তাঁরা কেউ ছিলেন শৈব (হুবিষ্ক) কেউ বৌদ্ধ (কণিষ্ক), কেউ ব্রহ্মণ্যবাদী, (শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামন)।

এই সময় মহাযানের আবির্ভাব হল। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ যেমন ঔপনিষদিক জ্ঞান ও শিবভক্তির সন্ধিস্থল, তেমনি থেরবাদ ও মহাযানের মধ্যে—মহাপদান সুত্তান্ত। সেখানে আর মানুষ শাস্তা (teacher)-কে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর স্থান নিচ্ছে অতিমানবিক, অতিমর্ত্য নির্মাণকায়, ত্রিকায় ইত্যাদি। বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর, অমিতাভ প্রাধান্য পাচ্ছেন। পালি শাস্ত্রের সঙ্গে 'ললিতবিস্তর' তুলনা করলে পরিবর্তনটা ধরা পড়বে। চৈনিক পরিব্রাজকদের বর্ণনায়, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, সুবর্ণবিভাষা সূত্র, মহাযান শ্রদ্ধোৎপত্তি (অশ্বঘোষ) ইত্যাদি গ্রন্থে মহাযানের বিজয় অভিযান অব্যাহত। যেখানে ভারহুত ও সাঁচীতে শুধু বোধিবৃক্ষ, স্তূপ, ও ধর্মচক্রের প্রতীকে বুদ্ধকে বোঝানো হত সেখানে ছড়িয়ে পড়ল গান্ধার মথুরা, পাল, কত না শৈলীর মনুষ্যাকৃতি বুদ্ধমূর্তি। বৌদ্ধ দেবদেবী যেন হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামল। জয়দেব অতি সহজেই বুদ্ধকে দশাবতারের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন একাদশ শতাব্দীতে।

সাংখ্য, যোগ ও বৌদ্ধ মতবাদকে কুক্ষিগত করার প্রথম সার্থক চেষ্টা—গীতা। R. L Zachner তাঁর গীতার ভূমিকায়, Hindu Scriptures-এর ভূমিকায়, Hinduism গ্রন্থে গীতার তিনটি পৃথক স্তর লক্ষ্য করেছেন। প্রথম থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভিন্ন উপায়ে মুক্তির পথ বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম অধ্যায়ে কর্মের তত্ত্ব। কর্মতত্ত্ব অতিগুরুত্বপূর্ণ, কারণ কুরুক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে অর্জুন কর্মবিমুখ হয়ে গাণ্ডীব ত্যাগ করেছেন। তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে হলে কৃষ্ণকে কর্মের প্রকৃতি, ফল, অনিবার্যতা, কর্মবন্ধন মোচনের উপায় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। সবচেয়ে বড় তত্ত্ব হল—কৃষ্ণে কর্মফল ত্যাগ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যান ও যোগ। সপ্তম থেকে ব্যক্তিগত ঈশ্বরের স্বভাববিশ্লেষণ শুরু এবং তার অপূর্ব কবিত্বময় উপসংহার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শনে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তি ছাড়া একটা নতুন কথা পাচ্ছি—মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা। ভক্তির বদলে প্রীতি এবং তা সর্বব্যাপী। তারও শর্ত আছে এবং তা অনেকটাই বুদ্ধের মৈত্রীভাবনার অনুরূপ। 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী' (১২.১৩) ধম্মপদের বচনও হতে পারত। ঐ অধ্যায়ের ১৫ থেকে ১৯তম শ্লোকে যোগীর কথা মনে পড়ে। বস্তুত এর পরের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সাংখ্যের নানা তত্ত্ব আলোচিত (১৯ থেকে ২৬)। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রকৃতির তিন গুণের নানা আলোচনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞ, চতুর্দশ অধ্যায়ের মুক্ত পুরুষ এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের (১৩—২০), ঈশ্বরের প্রিয় ভক্ত—তিনজনই সমীকৃত। চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোক লক্ষণীয়। সেখানে 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' অর্থাৎ ব্রহ্মভবনের পরের শ্লোকেই কৃষ্ণ বলছেনঃ

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্ অমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ ব্রহ্মাকেও অতিক্রম করে গেছেন। তেমনি গীতার নির্বাণ ব্যক্তিগত ঈশ্বর ছাড়া নয় (৬/১৫)। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২০ শ্লোক থেকে শেষ পর্যন্ত যোগের সীমাবদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। ৪৭ শ্লোকে পরিষ্কার বলা হচ্ছেঃ

যোগিনামপি সর্বেষাম্ মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাম্, স মে যুক্ততমো মতঃ॥

বস্তুত ভক্তিকে নির্বাণ ও কৈবল্য উভয়েরই উচ্চে স্থান দেওয়া হচ্ছে। গীতার শিক্ষার সার—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী, মাং নমস্কুরুঃ।
মামেবৈষ্যসি, সত্যং তে প্রতিজানে, প্রিয়োঽসি মে॥ ১৮/৬৫

॥ চার ॥

তারপর কেটে গেল প্রায় দু'হাজার বছর। গীতার কাল যদি খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী ধরা হয় (কারণ তার মধ্যে বৌদ্ধভাবনার পরিচয় পাওয়া গেছে এবং তার সংস্কৃত উপনিষদের সংস্কৃত থেকে কিছুটা আধুনিক), তবে তার (মহাভারত ও রামায়ণের মতো) সম্পূর্ণ রূপ পেতে খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক অর্থাৎ গুপ্ত যুগ লেগে যায়। ততদিনে পৌরাণিক যুগ এসে গেছে। রমিলা থাপার তাঁর Interpreting Early India (1992) গ্রন্থে জানাচ্ছেন, ততদিনে শাক্তধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। তার উৎস হরপ্পা সংস্কৃতি এবং প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে। ব্রাহ্মণরা খুবই বর্ণসচেতন ছিল। শ্রমণ (বৌদ্ধ, জৈন) রা অতটা না হলেও প্রথমদিকে গৃহী শিষ্যদের এবং সংঘবাসীদের অধিকাংশই ছিল উচ্চবর্ণের (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য), যদিও নিম্নবর্ণ থেকে সদ্ধর্ম গ্রহণ করার কোনও বাধা ছিল না। অন্যদিকে শাক্ত সম্প্রদায়গুলি ব্রহ্মণ্যধর্মের খাদ্য, পানীয়, বর্ণ, যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে বাধা-নিষেধ মানতে রাজি ছিল না। কিছু-কিছু ব্রাহ্মণ অবশ্য তাদের বৈদিক মতে শুদ্ধ করে নিতে চান, কিছু বা গোঁড়া থাকেন।

গুপ্তযুগে ব্রহ্মণ্য শক্তি বৃদ্ধি পায়। সম্রাটরা ছিলেন পরম ভাগবত, পরম বৈষ্ণব, তাঁদের লাঞ্ছন ছিল গরুড়ধ্বজ। অধিকাংশ পুরাণ এই আমলে লিখিত হয় বা সম্পূর্ণ হয়। ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের মাত্রা কত বেড়ে যায় তার প্রমাণ মিলবে অসংখ্য তাম্রপট্টে। অবশ্যই তাকে ইউরোপীয় অর্থে feudalism বলা যাবে না। তবু ভূমির মালিকানা যে ব্রাহ্মণদের বর্ণগৌরবকে শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি দিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে বাণিজ্যের অবনতির ফলে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক বণিক শ্রেণীর শক্তি কমে। হর্ষবর্ধন বা পাল সম্রাটদের আমলে অবশ্য কিছু সুবিধে তারা পেয়েছিল। পরে শঙ্করাচার্যের আক্রমণে তারা দেশ-ছাড়া হয়। তবু স্থানীয় cult-এর সঙ্গে ব্রাহ্মণদের একটা সমঝোতায় আসতে হয়। একে বলা হয়েছে সংস্কৃতায়ন। রমিলা দুটি উদাহরণ দিচ্ছেন—পান্ঢারপুরের বিঠ্ঠল ও পুরীর জগন্নাথ। কিন্তু জগন্নাথ সম্বন্ধে জার্মান পণ্ডিত কুলকে (Kulke)-র মত আরও কিছু বিস্তৃত করতে হবে। জগন্নাথের মধ্যে সমন্বয় হয়েছিল শবর জাতির টোটেম উপাসনা,

বৌদ্ধ ত্রিরত্ন, পূর্ব উপকূলে পূজিত নৃসিংহ এবং পশ্চিম উপকূলে পূজিত—কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রা। নতুন পূজার সঙ্গে নতুন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, কখনও নতুন caste-এর জন্ম হয়েছে। মুক্তি বা মোক্ষ আর আগের অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না। অনেক সময় ব্রাহ্মণদের প্রতিরোধ ঠেকাতে ছোট ছোট সম্প্রদায় মিলে আঞ্চলিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে—যেমন বীর শৈব ও শ্রীবৈষ্ণব। মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা এই সময় পুণ্যতীর্থের সম্মান পায়। মোটকথা, নানা বৈচিত্র্যের পরিণামে হিন্দুধর্ম একশৈলিক রূপ পায়নি। রাজনৈতিক দিক দিয়েও এক রাজপরিবারের বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

ইতিমধ্যে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও সাফল্য (break through) লক্ষ্য করি না। শ্রুতি-স্মৃতির ওপর নতুন ভাষ্য, নতুন টীকা এবং তাদের ওপর নতুন টিপ্পনী অনেকটা ইউরোপের মধ্যযুগীয় স্কলাসটিসিজমের কথা মনে পড়ায়। শঙ্করাচার্য বেদান্ত ও গীতার ওপর যে অদ্বৈতপন্থী ভাষ্য রচনা করলেন তাতে অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় রয়েছে কিন্তু মানবিকতার নয়। বিবেকানন্দের ভাষায়—'শুষ্ক পণ্ডিতজী' যিনি বেদান্তকে বৃহত্তর সংসার থেকে নিয়ে গেলেন বনে, পাহাড়ে, গুহায়, দশাশ্রমীদের মধ্যে। বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযানের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম হারাল তার openness, হয়ে গেল গুহ্য সাধনা। রামানুজ, মধ্ব, চৈতন্য, ভক্তির নানা ব্যাখ্যা দিলেন এবং তাঁদের চারদিকে সম্প্রদায় গড়ে উঠল। চৈতন্যের 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' বোধহয় দ্বৈতাদ্বৈতের শেষ মীমাংসা কিন্তু তার চেয়েও বড় তার প্রেমধর্ম—যা আচণ্ডালকে কোল দেয়, এমনকি হরি ভজলে যবনকেও। এতে হিন্দুধর্মকে একদিকে ইসলাম, অন্যদিকে চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি শক্তি পূজার এবং লোকায়ত বৌদ্ধধর্ম পূজার ও সহজিয়া সাধনার হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা দেখি। ইসলামের সঙ্গে শুধু বিরোধ হয়নি, কিছু সমন্বয়ও হয়েছিল। নাহলে নানক, কবীর, দাদূদের আমরা পেতাম না। ইংরেজাধিকারের পর থেকে খ্রীস্টধর্ম ও পাশ্চাত্য দর্শন একই সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঘাত হানল। প্রয়োজন হল আত্মসমীক্ষার, আধুনিক যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলবার জন্য নতুন সমন্বয়ের।

রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার (প্রায় সমসাময়িক) যে বেদান্ত চর্চা শুরু করলেন তার ঢেউ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রবল ছিল। তার শেষ মহান প্রতিনিধি—বিবেকানন্দ। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বুদ্ধ যেন আবার ফিরে এলেন। 'অবতার' বলব না—আধুনিক সমাজতত্ত্বের ভাষায় বুদ্ধ বিবেকানন্দের role model, অন্যদিকে রামকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য ব্যক্তিত্বকেও তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি, কারণ তিনি ছিলেন সকল শাস্ত্রের জীবন্ত সার। রামকৃষ্ণ শঙ্করের মায়াবাদ আদৌ মানেননি। কিছুই অলীক নয়, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—সসীম ও অসীম পৃথক নয়, সীমার মাঝেই অসীম নিজেকে প্রকাশ করছে। মায়া ও ব্রহ্ম আলাদা নয়—মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। তবে মায়া দু রকম। বিদ্যা ও অবিদ্যা। দ্বিতীয় মায়াকে ছাড়তে হবে। তোতাপুরীর কাছে পাওয়া অদ্বৈতসিদ্ধির চেয়ে মৃন্ময়ী রূপে চিন্ময়ী সাধনাই তিনি বেশি পছন্দ করতেন। কালীর অদ্বৈততত্ত্বে তিনি সব শিব-অশিব সুখদুঃখ পাপপুণ্যকে মেলাতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দ এর সবটা নিতে পারেননি (হয়তো ক্ষীরভবানীর অভিজ্ঞতার পর নিতে পেরেছিলেন)। তাঁর আধুনিক যুক্তিবাদী মন, পাশ্চাত্য

জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষা, পরিব্রাজকরূপে রোগদারিদ্র্য অশিক্ষার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা—পার্থিব শিব-অশিব সুখদুঃখকে উড়িয়ে দিতে পারেনি, লীলা বলে মানতেও পারেনি। আপন মোক্ষের জন্য তিনি সাংখ্যের কৈবল্য বা শঙ্করের সমাধি চাননি, বুদ্ধের মৈত্রীভাবনা ও করুণাকেই জগতের হিতে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে প্রথম থেকেই একটা দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করি—তিনি একবার অশেষ ধনসম্পদ লাভের ইচ্ছা আর পর মুহূর্তে সর্বস্ব ত্যাগ করে "ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ভরপূর্বক কৌপীনধারণ, যদৃচ্ছালব্ধ ভোজন এবং বৃক্ষতলে রাত্রিযাপনের কল্পনা" করতেন। তাঁর মধ্যে দ্বিতীয় ভাব ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে এবং রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসার পর নির্বিকল্প সমাধি হয়ে ওঠে একান্ত অন্বিষ্ট। গুরুর কাছে বারংবার ধিকৃত হলেও তিনি সন্ন্যাসজীবনের বাসনা ছাড়েননি। তবে গুরুর একটা কথা তাঁর জীবনের গতি নির্দিষ্ট করে দেয়। ১৮৮৪ সালের কোনও সময় 'সর্বজীবে দয়া' কথাটা উচ্চারণ করেই ঠাকুব সমাধিস্থ হলেন এবং অধর্বাহ্যদশায় ফিরে এসে বললেনঃ "না, না—জীবে দযা নয়—শিবজ্ঞানে জীবেব সেবা।" লীলাপ্রসঙ্গকার বিবেকানন্দের জবানিতে লিখেছেনঃ "ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন কবিতে পারা যায়।...সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তিলাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত থাকে।...কর্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে যে-সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও ঐ কথায় বিশেষ আ'লোক পাইবে।...যাহা হউক, ভগবান যদি কখনও দিন দেন তো আজ যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসাবে সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।"

বুদ্ধ সম্বন্ধে বাল্যকাল থেকে সচেতন ছিলেন বিবেকানন্দ। ছাত্রাবস্থায় তাঁর দিব্যদর্শনে বুদ্ধ আবির্ভূত হন। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তাঁর নেতৃত্বে বুদ্ধের জীবন ও মতবাদ নিয়ে খুব আলোচনা হত—'ললিতবিস্তর' ও 'ত্রিপিটক' পাঠ হত। তখনই শিবানন্দ ও অভেদানন্দের সঙ্গে তিনি বুদ্ধগয়া যান এবং বোধিবৃক্ষতলে ধ্যানের সময় এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার বশে বুদ্ধের বিরহে কাতর হয়ে কেঁদে উঠে শিবানন্দকে জড়িয়ে ধরেন। সব শুনে রামকৃষ্ণ বলেন, বুদ্ধদেব নাস্তিক ছিলেন না, "তবে মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কি জান? বোধ স্বরূপকে চিন্তা করে করে তাই হওয়া—বোধ স্বরূপ হওয়া।" কথামৃতে এ ধরনেব আরও আলোচনার উল্লেখ পাই। Lex Hixon-এর Great Swan-এ (p. 235-37) তার কিছু উল্লেখ রয়েছে। স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে পত্রযোগে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নানা আলোচনা করেন তিনি। পরিব্রাজকরূপে ত্রিবান্দ্রামে বুদ্ধের বৈরাগ্য, সত্যানুসন্ধিৎসা, সত্যলাভ, জাতিবর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ- নির্বিশেষে সদ্ধর্ম প্রচার সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতার কথা পড়ি। অর্থাৎ অনেকদিন ধরে তাঁকে অদ্বৈতবাদ ও বুদ্ধভাবনা একই সঙ্গে আলোড়িত করেছিল। উভয় পথেই সন্ন্যাস—জীবনচর্যার আদর্শরূপে যা তাঁকে চিরদিনই টেনেছে। কিন্তু অদ্বৈতবাদ শুধু আত্মমোক্ষের কথা ভেবেছে বলে তার সঙ্গে তিনি যোগ করতে চেয়েছিলেন বৌদ্ধ মৈত্রী ও করুণা—অর্থাৎ জগতের হিতার্থ নিষ্কাম কর্মযোগ। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই হবে তাঁর মিশন ও মঠ (১৮৯৭)-এর motto। 'বনের বেদান্তকে ঘরে আনা' শব্দাবলীর প্রয়োগে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের দুই শ্রেষ্ঠ ধারা উপনিষদ ও বৌদ্ধ মতবাদকে

মেলাতে চেয়েছেন। বস্তুত তিনি মনে করতেন যদিও বৈরাগ্য উপনিষদের প্রাণ, "ভগবান বুদ্ধদেবের পর থেকেই ভারতবর্ষে এই ত্যাগব্রত বিশেষরূপে প্রচারিত হয়েছে এবং বৈরাগ্য ও বিষয় বিতৃষ্ণাই ধর্মের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সেই ত্যাগ-বৈরাগ্য হিন্দুধর্ম absorb করে নিয়েছে। ভগবান বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মায়নি।...ভারতবর্ষের এই যে সব সন্ন্যাসীর মঠফঠ দেখতে পাচ্ছিস—এ সব বৌদ্ধদের অধিকারে ছিল, হিন্দুরা সকলকে এখন তাদের রঙে রাঙিয়ে নিজস্ব করে বসেছে। ভগবান বুদ্ধদেব হতেই যথার্থ সন্ন্যাসাশ্রমের সূত্রপাত হয়েছিল। তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমের মৃতকঙ্কালে প্রাণসঞ্চার করে গেছেন।" রামকৃষ্ণানন্দ যখন বললেন, বৌদ্ধধর্ম উপনিষদ, সংহিতা, পুরাণের আগে একথা বলা যায় না, স্বামীজীর উত্তর—"History পড়ে দেখ। দেখতে পাবি, হিন্দুধর্ম বুদ্ধদেবের সব ভাবগুলি absorb করে এত বড় হয়েছে।" আরও বললেনঃ "...History-কে authority বলে মানলে একথা স্বীকার করতে হয় যে, পুরাকালের ঘোর অন্ধকারে ভগবান বুদ্ধদেবই একমাত্র জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"[২] কোন অদ্বৈতবাদীর সাহস ছিল শঙ্করাচার্যের সঙ্গে বুদ্ধের তুলনা করে বলা—উভয়ই যদি fanatic হন, বুদ্ধের ধর্মোন্মাদ (ছাগ শিশুর জন্য জীবনদান প্রস্তাব)-এর ফলে জীবের কত কল্যাণ হল। "বুদ্ধদেব জন্মাবার আগে এদেশে (এ-সব স্কুল কলেজ হাসপাতাল স্থাপত্য) ছিল কি? তালপাতার পুঁথিতে বাঁধা কতকগুলো ধর্মতত্ত্ব—তা-ও অল্প কয়েকজনের জানা ছিল মাত্র। ভগবান বুদ্ধদেব সেগুলি pratical field-এ আনলেন...ধরতে গেলে তিনিই যথার্থ বেদান্তের স্ফুরণমূর্তি।"[৩]

অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ না করলে ঠিক ঠিক পরার্থ করা যায় না। স্বামীজী তা স্বীকার করেও বলতেনঃ "পরার্থে সেবাপর হতে হতে সাধকের জীবন্মুক্তি অবস্থা ঘটে, নতুবা কর্মযোগ বলে একটা আলাদা পথ উপদেশ করবার শাস্ত্রে কোনই প্রয়োজন ছিল না।"[৪] যোগানন্দ প্রশ্ন তুললেনঃ "তোমার এসব বিদেশীভাবে কাজ করা হচ্ছে।—ঠাকুরের উপদেশ কি এ-রকম ছিল?" বিবেকানন্দের উত্তর স্মর্তব্যঃ "কি জানিস, সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্ত ভাবময়।... তবে তিনি তা না করে ইচ্ছা করে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র করে এরূপ করাচ্ছেন—তা আমি কি করব বল?"[৫]

মোটের ওপর বুদ্ধের বাণী, রামকৃষ্ণের ইচ্ছা, গীতার উপদেশ সব বর্তমান ভারতের প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে বিবেকানন্দের কর্মপ্রণালী স্থির হয় আর ১৮৯৭, মে-র প্রথম সপ্তাহে আলোচিত রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবী কার্যপ্রণালী তারই আলোকে নির্দিষ্ট হল। এর সঙ্গে বৌদ্ধ সংঘের কিছু পার্থক্য রয়েছে। মহাপরিনিব্বাণ সুত্তান্তের কথা আগেই তুলেছি। বুদ্ধ সংঘকে বৃজির মতো পুরো সাধারণতন্ত্রের ছাঁচে গড়তে চেয়েছিলেন, কোনও মঠাধ্যক্ষ বা পরিচালক নিযুক্ত করে যাননি। তাঁর শেষ উপদেশ—'আত্মদীপো ভব'। প্রথম দিকের সংঘ জীবনের বিস্তৃত বিবরণ রেখে গেছেন সুকুমার দত্ত। বিবেকানন্দ কিন্তু বৌদ্ধ সংঘের ক্রমাবনতি এবং নানা দেশের আশ্রমিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রথম থেকে সাধারণতন্ত্রের আদলে সংঘ গড়তে চাননি। তিনি মনে করতেন এক সঙ্গে কাজ করার বা ভোট নিয়ে কাজ করা ভারতের পক্ষে সুবিধের হবে না। "সেইজন্য এই সংঘে একজন

dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সকলের মত লয়ে কাজ করা হবে।"

ভগিনী নিবেদিতার 'The Master as I saw Him' ও 'Notes on some wanderings with the Swami Vivekananda in the Himalayas' গ্রন্থে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে অনেক আলোচনার কথা আছে। স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনার ফলে জনৈক শ্রোত্রীর মনে হল, বৌদ্ধধর্মের ব্রাহ্মণ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবটিই তাঁর মনোগত ভাব। তিনি বললেন, "স্বামীজী, আমি জানিতাম না যে, আপনি বৌদ্ধ।" উক্ত নাম শ্রবণে তাঁর মুখমণ্ডল দিব্যভাবে উদ্ভাসিত হল। তিনি বললেনঃ "আমি বুদ্ধের দাসানুদাসগণের দাস। তাঁহার মত কেউ কখন জন্মিয়াছেন কি? স্বয়ং ভগবান হইয়াও তিনি নিজের জন্য একটি কাজ করেননি। আর কি হৃদয়! সমস্ত জগৎটাকে তিনি ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছিলেন।" অম্বাপালীর কাহিনী শুনিয়ে তিনি সে কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন আর একদিন। কিন্তু ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যান্য দিকে বুদ্ধের অসামান্য প্রভাব সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। জাতিভেদ প্রথার উপর আঘাত বুদ্ধই প্রথম দিয়েছিলেন।[৬] বিবেকানন্দ জাতিভেদ বিশেষত ছুঁৎমার্গের, ঘোর-বিরোধী ছিলেন। তেমনি বুদ্ধ যজ্ঞে প্রাণিবধের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন, প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন—তারপর গোবধ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নরনারীর অধিকার বৈষম্যের জন্য বিবেকানন্দ বৌদ্ধধর্মকে দায়ী করে গেছেন। অবশ্য তা বৌদ্ধধর্মের অবনতির যুগে শুরু হয়। "নরশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধের সম্প্রদায় গঠন ও পরিচালনশক্তি অদ্ভুত ছিল আর ঐ শক্তিতে তিনি জগৎ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম কেবল সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের ধর্ম।" তার এক অশুভ ফল সন্ন্যাসীর ভেক পর্যন্ত সম্মানিত হল। দ্বিতীয়ত মঠপ্রথা প্রথম চালু করতে গিয়ে তাঁকে বাধ্য হয়ে নারী জাতিকে পুরুষ অপেক্ষা নিম্নাধিকার দিতে হল। বড় বড় মঠাধ্যক্ষাও নির্দিষ্ট মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোনও গুরুতর কাজে হাত দিতে পারতেন না। এতে সাময়িক শৃঙ্খলা এল বটে কিন্তু ভিক্ষুণীদের initiative ও কর্মোদ্যমে বাধা জন্মাল। প্রাচীন আরণ্য শিক্ষাকেন্দ্রে কিন্তু নারীর সমানাধিকার ছিল, না হলে বাচক্নবী গার্গী জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বিতর্কে নামতে পারতেন না।

নারীশিক্ষার ওপর খুব জোর দিতেন তিনি, না হলে নিবেদিতাকে তার ভ'র দিতেন না। তবে তাঁর শিক্ষার ব্যাখ্যাটা মনে রাখতে হবে। "শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং সফল হয়। এইভাবে শিক্ষিতা হইলে ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থ নির্ভীক মহীয়সী নারীর অভ্যুদয় হইবে।" নারীকে পবিত্র, স্বার্থশূন্য, বীর করতে চেয়েছিলেন তিনি। ধর্মশিক্ষা ব্যতীত তা সম্ভব নয় এবং তা উদার বিশ্বজনীন অর্থে, হিন্দু বা শিক্ষিকার নিজস্ব মতামতে নয়। এখানে বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য, ভাল বা মন্দ বড় কথা নয়—যা অনিত্যের মধ্যে নিত্যবস্তুর সন্ধান দিতে পারবে—তাই। বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানগুলিও যেন তাঁর এ আশা বহন করে চলেনঃ "ভারত ও ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধো, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর...আর স্মরণ রাখিও আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য

জাতি অপেক্ষা আমাদের অপরকে দিবার জিনিস সহস্রগুণ বেশী আছে।" আছে ঠিক, কিন্তু তা বজায় রাখতে হবে, বাড়াতে হবে, দরকার হলে পশ্চিমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। স্বামীজী শ্রেয়ঃ হতে বলেছিলেন কিন্তু শ্রেয়োমন্যতার প্রশ্রয় দেননি।

রাজা রামমোহন রায় ও স্বামী বিবেকানন্দঃ একটি সমীক্ষা

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

রাজা রামমোহন রায় ও স্বামী বিবেকানন্দ এই দুটি নাম দুটি যুগকে চিহ্নিত করে। দুটি নাম যেন দুটি যুগের প্রতীক—প্রাক্‌নবজাগরণ পর্বের প্রস্তুতি ও নবজাগরণের পরবর্তী অধ্যায় যেখানে নবজাগরিত চেতনার রূপায়ণ স্বকীয়করণ বা ভারতীয়করণ। রাজা রামমোহন রায়কে যদি প্রস্তুতিপর্বের পথিকৃৎ বলি, তবে স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে পরবর্তী পর্বে রূপায়ণের ঋত্বিক।

অক্ষয়কুমাব দত্ত তাঁব রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে বলেছেনঃ "তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তর মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছ।" মন্তব্যটি গভীর অর্থবহ যা সেই যুগের প্রেক্ষিতে আলোচনা করলেই বোঝা যায়।

ক্ষয়িষ্ণু মোগল সাম্রাজ্য ও উদীয়মান বৃটিশ শাসন—এ দুয়ের সন্ধিক্ষণে অষ্টাদশ শতকের শেষে রামমোহনেব আবির্ভাব। এ দুয়ের চাপে তখন ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি বিপন্নপ্রায়। হিন্দুধর্মের সংস্কৃতভাষা-নির্ভর বেদ-উপনিষদ, পুরাণাদি তখন জীবিকানির্ভর আরবী, ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। হিন্দু জনসাধারণের কোনও মৌলিক জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে চেতনা নেই। শুধু প্রাণধারণের, দিনযাপনের তাগিদে গড্ডলিকাব স্রোতে ভেসে যাওয়া। স্বধর্মচর্চা যদি থেকেও থাকে, তবে তা নিতান্তই স্থূলভাবে গৃহাভ্যন্তরে। অবশ্যই দুটি একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। তবে নিজদেশে পরবাসী পরাধীন জাতির ইহকাল-পরকাল যখন কোনটিই থাকতে নেই, তখন এমনটিই তো স্বাভাবিক চিত্র। এমনই এক রাজনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমিকায় রামমোহনের আবির্ভাব। গ্রামের এক অভিজাত ও সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে, স্বাধীন চিন্তায়, মননশীলতায়, কর্মের ব্যাপকতায় এবং বিধিপ্রদত্ত নেতৃত্বপ্রদানের ক্ষমতায় তিনি 'রাজা'র মতনই হয়ে উঠেছিলেন পরবর্তী কালে।

রামমোহনের প্রবল ইংরেজপ্রিয়তার মধ্যেও এক প্রখর আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত ছিল, যা সেই আমলে নিঃসন্দেহে মৌলিকতার দাবি রাখে। কার্যোপলক্ষে ভাগলপুরে থাকাকালীন একদিন পালকিতে করে যাবার সময় কর্মরত স্থানীয় কালেক্টর হ্যামিলটন সাহেবকে দেখে নেমে দাঁড়াননি বলে সাহেব তাঁর প্রতি অপমানজনক শব্দ প্রয়োগ করেন। রামমোহন এই

অপমানের প্রতিকারকল্পে তৎক্ষণাৎ লর্ড মিন্টোর কাছে চিঠি পাঠান ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে। এটিই তাঁর প্রথম ইংরেজী রচনা। চিঠিতে তিনি একথা উল্লেখ করার সাহস দেখিয়েছিলেন যে "what must be the sensations of any native gentleman under a public indignity and disgrace." তৎকালীন পরাধীন, হৃতগৌরব, পরিবেশপীড়িত ভারতবাসীর সুপ্ত ও আহত হৃদয়ের যেন প্রথম জাগরণ ও প্রতিবাদ ঘটেছে তাঁর মধ্য দিয়ে। এই প্রতিরোধেই ছিল পরিত্রাণের আভাস। মৃতকল্প জাতির মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াস তাঁরই। তাঁরই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা।

রামমোহনকে শুধুমাত্র একজন সমাজসংস্কারক বললে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে। নিঃসন্দেহে তিনি প্রগতিশীল যুগের সেই প্রতিনিধি যাঁর জীবন অবলম্বনে একটি নবযুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেরণা-অগ্রগতি, নবনব চিন্তার উন্মেষ প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁর ছিল সুঠাম দীর্ঘ শরীর, উজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত আয়তচক্ষু, রাজোচিত পরিচ্ছদ, বিশাল পাণ্ডিত্য, উদার সর্বমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, সর্বোপরি তাঁর অতুল অর্থসম্পদ। সব মিলিয়ে তিনি দেশবাসীর কাছে রাজার সম্মান পাবার যোগ্য ব্যক্তি। সমকালীন বাঙালী-মানসের বহু ঊর্ধ্বে তাঁর উত্তুঙ্গ অবস্থান। তাঁর প্রথম বৈদান্তিক চিন্তাধারা, যা তৎকালে বৈপ্লবিকও বটে, তাঁর একেশ্বরবাদ, বহুবিচিত্র, কলহপরায়ণ হিন্দু দেবতাবিলাসীদের গতানুগতিক চিন্তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে, প্রায় তাদের নাগালের বাইরে।

পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের প্রবল প্রতিপত্তির সময়েই রামমোহন তাকে ত্যাগ করার নৈতিক সাহস দেখিয়েছিলেন এবং সেই কারণেই পিতামাতার বিরাগভাজন হয়ে নিজ বাসগৃহ পরিত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। একটি জাগ্রত মন, জাগ্রত চেতনা নিয়ে তাঁর অগ্রগতি। একটি সত্য জিজ্ঞাসা, সংশয় নিরসনে এক ঐকান্তিক প্রয়াসই তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। প্রশ্ন থেকেই প্রজ্ঞা, সংশয় থেকেই সত্যে উত্তরণ। রাজার সমগ্র জীবন এই অন্বেষণে ব্যয়িত, সত্যলাভের পথে সঞ্চরমান। আমেরিকার মনীষী H.D. Thoreau তাঁর বিখ্যাত 'Walden' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "I know of no more encouraging fact than the unquestionable ability of man to elevate his life by a conscious effort." মানুষের উন্নত হবার সযত্ন প্রয়াসই যথার্থ উদ্দীপনাময়। একথা সত্য এবং এও সত্য যে একজনের মধ্যে দিয়েই সে উদ্দীপনা অনেকে সঞ্চারিত হয়।

দিল্লীর সম্রাট আনুষ্ঠানিকভাবে দৌত্যকার্যের জন্য রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে ১৮২৯ সালের আগস্ট মাসে বিলাতে পাঠিয়েছিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাতে কতটা সাধিত হয়েছিল, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে একথা অনস্বীকার্য যে সাংস্কৃতিক দৌত্যকার্যে তিনিই প্রথম বিদেশে গিয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব বিনিময়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি অনমনীয় ছিলেন বলেই সমুদ্র পেরিয়ে বিধর্মীদের দেশে উপস্থিত হয়েছিলেন যে কাজ তখন সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ কর্ম ছিল এবং এও লক্ষণীয় যে বৃটিশ শাসকবর্গ এই পরাধীন ভারতেরই একজন—রামমোহন রায়কে রাজা বলে স্বীকার না করলেও ওদেশে যে অভূতপূর্ব সম্মান প্রদর্শন করেছিল তাতে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জয়ই ঘোষিত হয়।

ইউরোপীয় রেনেসাঁ রোম ও গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে যোগসাধন করেই গড়ে

উঠেছিল। ঐতিহাসিক চেতনায় সমৃদ্ধ রামমোহনও তেমনি চেষ্টা করেছিলেন নতুন ও পুরাতনের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য-বিধান করে ভারতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধন করতে। তিনিই প্রথম যিনি বলতে পেরেছিলেন স্বজাতির মধ্যে দিয়ে সর্বজাতির এবং সর্বজাতির মধ্যে দিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্বে পৌঁছাতে হবে। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের একেশ্বরবাদ, হিন্দুদের ব্রহ্মবাদ, সুফীদের হাফেজ, মৌলানা রুজিদের মতবাদ ও বাইবেল ইত্যাদি পাঠ করে রামমোহনের এক নিরাকার সর্বজনীন ধর্মের প্রতি আকর্ষণ জাগে, যদিও খ্রীস্টধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের মাত্রা অধিক ছিল। এইরূপ এক Universal Religion তিনি এদেশে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতায় অংশগ্রহণ না করে তাকে challenge করা যাবে না, যেমন যাবে না হিন্দুধর্মের কুসংস্কারগুলিও দূর করা। তিনি তাই ধর্ম ও সমাজসংস্কারেই অধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন। মানুষ তৈরির কথা তিনি তেমন করে বলেননি, যার ওপর পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ স্বামীজীর মতে মানুষই হল সুসংস্কৃত সমাজের স্তম্ভ।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে রাজা রামমোহন রায়ের তিনটি দান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়ঃ "His acceptance of Vedanta, his preachings of patriotism and the love that embraced the Musalman equally with the Hindu." এই তিনটি মূল বিষয়েই স্বামীজী রামমোহনের সঙ্গে ভাবগত ঐক্য অনুভব করেছেন শতাধিক বৎসরের ব্যবধানে দাঁড়িয়েও। কলকাতা অভিনন্দনের উত্তরে (১৮৯৭, ২৬ ফেব্রুয়ারি) স্বামীজী তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেনঃ আমাদের পতনের অন্যতম কারণ এই যে, আমরা কখনও বাইরে গিয়ে অপর জাতির সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে দেখিনি। যেদিন রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙলেন, সেইদিন থেকেই ভারতের সর্বত্র আজ যে একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হচ্ছে, তা আরম্ভ হয়েছে। আর সেইদিন থেকেই ভারতের ইতিহাস অন্যপথ অবলম্বন করেছে ও ক্রমবর্ধমান গতিতে উন্নতির পথে চলেছে। তিনি রামমোহনকেই The first man of new regenerate India বলেছেন।

Brahmanical Magazine-এর প্রথম সংখ্যায় রামমোহন লিখেছিলেনঃ "It is well-known to the whole world that no people on earth are more tolerant than the Hindoos who believe all men to be equally within the reach of Divine benificence. The Vedas teach the only religion which considers toleration to be a duty of man."

স্বামী বিবেকানন্দ এই একই কথা আরও একটু প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে বলেছেনঃ "We not only tolerate but accept other religions as true."

রামমোহনই প্রথম যিনি আমাদের বেদান্তের মহান সত্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়েছেন। কিন্তু বেদান্তকে মানবসমাজের সার্বিক উন্নয়নের মূলনীতি এবং বেদান্তই মানবজীবনের সর্বাধিক ব্যাপ্তি—একথা তিনি মনে করেননি। প্রবলভাবে সংস্কারান্ধ সমকালীন পৌত্তলিক হিন্দুর মানসমুক্তির অস্ত্রহিসাবে যে নিরাকার ব্রহ্মবাদের চর্চা তিনি শুরু করেন তার সঙ্গে বৃহত্তর জনমানসের কোনও সম্পর্কই স্থাপিত হয়নি। তা শুধু শহরের মুষ্টিমেয়

ইংরেজী-শিক্ষিত অভিজাত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বামীজী বুঝেছিলেনঃ "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা ও তাদের উন্নত করাই জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা।" তিনি ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেছেনঃ "ভারতের নানা স্থান বিচরণ করে দেখিলাম, সমাজসংস্কার সভায় দেশ পরিপূর্ণ কিন্তু যাদের রুধির শোষণের দ্বারা ভদ্রলোকেরা ভদ্রলোক হইয়াছেন, তাদের নামে একটি সভাও দেখিলাম না।" এই যে বৃহত্তর জনসাধারণ এরা বেদ-বেদান্তশাস্ত্রের মর্মদর্শী নয়। এরা পুঁথি-পুরাণ বিশ্বাস ও ভাবাবেগ দ্বারাই প্রধানত পরিচালিত। এদের হৃদয় রামমোহন স্পর্শ করতে পারেননি। তাঁর মধ্যে বৌদ্ধিক ও নৈতিক চেতনার যেমন স্ফুরণ ঘটেছিল, তেমনভাবে আধ্যাত্মিক চেতনারও পরিণতি ঘটেছিল, এমন কথা বলা যায় না। তবে বৌদ্ধিক চেতনার প্রভাবেই যে তিনি ব্যক্তি, জাতি ও বিশ্বের সমীকরণে সফল হয়েছিলেন, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। ১৮৩২ সালে ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীর কাছে পাসপোর্টের জন্য আবেদন পত্রে লিখেছেনঃ "It is now generally admitted that not religion only, but unbiased commonsense as well as accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches."

'তুহ্-ফাৎ-উল-মুয়াহহিদীন' প্রবন্ধে রামমোহন লিখেছেনঃ "আমি হিন্দু, মুসলমান খ্রীস্টানাদি নানা সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্রের গূঢ় আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে ঈশ্বর একমাত্র, অদ্বিতীয় ও তিনিই উপাস্য।" মুণ্ডকোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেনঃ "The observance of idolatrous rites can never be productive of eternal beatitude... It is the source of prejudice and superstition and of total destruction of moral principles." প্রতীক বা প্রতিমাপূজাকে তিনি সর্বদাই দুর্বল বা নিম্ন অধিকারীর করণীয় ব্যাপার বলে মনে করেছেন এবং এর মূলে রয়েছে তাঁর মুসলমান বা খ্রীস্টীয় ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু রামমোহনের এই মত সর্বাংশে মেনে নিলে শ্রীরামানুজ, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি ধর্মাচার্যদের মূল্যায়ন অসম্ভব হয়। স্বভাবতই মনে হয় এই মতবাদে কোথাও ত্রুটি রয়ে গেছে এবং সেই ত্রুটি সংশোধন করতেই যেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগের সূচনা।

মানবসমাজের অগ্রগতির ইতিহাস dialectic বা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিচরণ করে বলে মনে করে থাকেন ঐতিহাসিকেরা। পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেলের মতে 'Absolute Idea' বিবর্তনের পথে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। একেই তিনি 'spiritual dialectic' বা আধ্যাত্মিক বিবর্তন বলেছেন। রামমোহন পূর্ববর্তী যুগে দেখি গোঁড়া Cult বা আচার-সর্বস্ব ধর্মের প্রাবল্য যা মানবিক যুক্তি-বুদ্ধিকে একেবারে ভোঁতা করে দিয়েছিল। রামমোহনযুগে তার antithesis বা বিরোধী মত তৈরি হল। প্রতীক-প্রতিমা, আচার-বিচার বিরোধী কিছু মুক্ত মনোভাব গড়ে উঠল। পরবর্তী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগে এই দুয়ের Synthesis বা সমন্বয় পেলাম। এঁরা বললেন দুইই চাই—বেদও চাই, পুরাণও চাই; জ্ঞান চাই, পূজা-উপাসনা, ভক্তিও চাই; নিরাকার ব্রহ্মচৈতন্য-সাধনা ও প্রতিমা পূজা উভয়েই মানবকল্যাণমুখী। উভয়ের সম্মিলনেই সমৃদ্ধ হবে মানবজীবন এবং তাতেই লাভ হবে পূর্ণতা।

রামমোহন হিন্দুধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের বাহ্যিক এক সমন্বয়ের পথ দেখিয়েছিলেন, যা সেই নবজাগরণের উষালগ্নে খুবই জরুরি ছিল সন্দেহ নেই। অন্তত আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকে তিনি অনেকখানি প্রসারিত করে দিতে পেরেছিলেন মুক্ত দিগন্তের দিকে। তবে এই কাজ তাঁর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি-প্রসূত ছিল না, ছিল শুধু বৌদ্ধিক বিচারবিশ্লেষণগত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধর্মের এক আভ্যন্তরীণ সমন্বয় দেখালেন নিজ জীবনে সেগুলিকে সাধন করে যার দ্বারা প্রমাণিত হল সকল ধর্মের সমান সত্যতা ও মানুষের অনন্ত মহিমা। সভ্যতার ইতিহাস অবশ্যই সমন্বয়ের ইতিহাস ; বিরোধের নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে মনুষ্যত্বের মানদণ্ডও তাই ঃ 'যে সমন্বয় করেছে সেই মানুষ'। তবে এ জ্ঞান সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত যা রাজার ছিল না। তাঁর অধীতবিদ্যার প্রেক্ষাপট ছিল বিশাল, মননের জগৎ ছিল অনেকই বিস্তৃত। কিন্তু তারও উর্ধ্বে যে ধ্যানময় আত্মমগ্নতা, আত্মসাক্ষাৎকার, যেখানেই একমাত্র সর্বাত্মবোধের স্ফূর্তি, যেখানে সর্বপ্রকার বিভেদের একত্বে পরিণতি, যেখানে আত্মার অনন্ত আনন্দময় স্থিতি, সেখানে রামমোহনের বিচরণ সম্ভব হয়নি। মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তিকে আরাধনার মধ্য দিয়ে নিরাকার ব্রহ্মচৈতন্যে উত্তরণের যে কঠোর সাধনপথ, যা জ্ঞান, ভক্তি, ত্যাগ-বৈরাগ্য, নিরাসক্ত, নিষ্কাম কর্মসাধনার পথ, সে পথে রামমোহন পরিভ্রমণ করেননি। তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে বিত্তশালী এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্র ও পবিজনের জন্য তিনি প্রভূত অর্থসম্পদ রেখে গেছেন। নিজ জননীর সঙ্গেও তাঁকে মামলা করতে হয়। তিনি তাঁর মাতাকে গোঁড়া পৌত্তলিকরূপে গণ্য করে তাঁর সমালোচনা ও বিরোধিতা করেন। দুঃখের বিষয় রামমোহনকেও ইতিহাস চিহ্নিত ও দোষযুক্ত করেছে নিরাকার একেশ্বরবাদের বিচারহীন সমর্থক বলে।

রামমোহন লিখেছেন ঃ "হিন্দুগণ প্রায়ই অত্যন্ত লজ্জাকর ভঙ্গিতে, জঘন্যতম ভাষা প্রয়োগে এবং কুৎসিত শ্লোক ও অঙ্গভঙ্গিতে মূর্তিপূজার দ্বারা নিজেদের অপমান, লজ্জা ও উপহাসের পাত্র করে তুলেছে।" এরই প্রতিকারকল্পে তিনি ভিক্টর জ্যাকমেন্টকে যে পত্র লেখেন, তাতে মন্তব্য করেন ঃ "দেশজয় কদাচিৎ মন্দ ব্যাপার (অর্থাৎ মোটেই মন্দ ব্যাপার নয়) যখন বিজয়ীগণ বিজেতাদের থেকে অধিক বেশী সভ্য হয় কারণ এক্ষেত্রে বিজয়ীরা বিজেতাদের কাছে সভ্যতার আশিস বহন করে আনে। তাই ভারতের আরও অনেক বৎসর ইংরেজ শাসনে থাকা উচিত।" ভারতীয় সভ্যতায় ইংরেজদের অবদানকে তিনি সর্বদাই আকাঙ্ক্ষিত মনে করতেন কারণ তাঁর ধারণা ছিল পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভাবসংমিশ্রণে আমাদের সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও রাজনৈতিক চেতনা উন্নত ও সফল হবে। ১৮২৮ সালে তিনি বন্ধুস্থানীয় ডিগবীকে লিখেছিলেন ঃ "It is, I think necessary that some change should take place in Hindu religion at least for the sake of their political advantage and social comfort." পৌত্তলিক হিন্দুর অনুষ্ঠান ও জাতিভেদপ্রধান ধর্মের পরিবর্তন তিনি একান্তভাবে চেয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, খ্রীস্টধর্মের প্রতি অচল বিশ্বাসবশত তার আনুষ্ঠানিক দিকটির পরিবর্তনের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। রামমোহন রবার্ট ভেল ওয়েনকে লিখেছেন ঃ "It is not necessary either in England or in America to oppose religion in promoting social and political welfare, for it inculcates doctrine of

universal love and charity."

রামমোহন যেহেতু হিন্দুদের চিরাচরিত ধর্মচর্চার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন, যে ধর্মভাব তাদের নানা আচার-অনুষ্ঠান, পুরাণনির্ভর ভক্তি-বিশ্বাসের দ্বারা পুষ্ট, তার জন্য তিনি বৃহত্তর হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর ধর্মসংস্কার কার্য ব্যর্থ হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এর কারণ প্রদর্শন করে লিখেছেনঃ "সংস্কারকেরা বিফল মনোরথ হয়েছেন। তার কারণ কি? কারণ তাঁদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি নিজের ধর্ম অতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করেছেন আর তাঁদের একজনও সকল ধর্মের প্রসূতিকে (হিন্দুধর্মকে) বোঝবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনের মধ্যে দিয়ে যাননি। ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যার মীমাংসা করেছি বলে দাবী করি।" তিনি এই সত্য উপলব্ধি থেকেই লিখেছেনঃ "This is one of the great points to be remembered that those who worship God through ceremonials and forms, however crude we may think them, are surely, not in error. It is journey from truth to truth, from lower truth to higher truth." স্বামী বিবেকানন্দের মতে সবকিছুকেই, ভাল-মন্দ সব ব্যাপারকেই দেখতে হবে এক বিরাটের প্রেক্ষিতে, মানবিক সহনশীল প্রেমময় দৃষ্টিতে, দেখতে হবে সত্যের অভিমুখে এক মহান অভিযাত্রারূপে এবং এইটিই তাঁর মতে সত্যদর্শন।

রাজা রামমোহন রায়ের স্বদেশপ্রীতি প্রশ্নাতীত। ভারতের পরাধীনতায় তিনি যে মর্মবেদনা অনুভব করেছেন, সভ্য শিক্ষিত ইংরেজদের মহত্ত্ব দর্শন করেও, এ তৎকালে এক বিরল প্রতিভা। স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন তিনি। স্বাধীন চিন্তাপ্রকাশের মাধ্যম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে তিনিই এদেশে প্রথম তৎপর হন। সহমরণপ্রথা রোধ করে ভারতীয় নারীকে তার পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকার ফিরিয়ে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। পরাধীন জাতির একজন হয়েও একথা প্রকাশ্যে লেখার সাহস দেখিয়েছিলেনঃ "enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful." শুধু স্বদেশের নয়, সমগ্র বিশ্বের পরাধীন মানুষের মুক্তি আন্দোলনে তাঁর সাগ্রহ ও সানন্দ সমর্থন শ্লাঘনীয়।

রামমোহনের ধর্মসংস্কার-কার্যে কিন্তু কয়েকটি অসঙ্গতি দেখা দেয়। তিনি উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদ বা একেশ্বরবাদকে স্বীকার করলেও বাহ্যজীবনে বা দৈনন্দিন গৃহজীবনে সে তত্ত্ব প্রয়োগে সমর্থ হননি। তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল, ছিল না কার্যে প্রয়োগ। যে বেদান্তকে তিনি সর্বপ্রকার মহান ও উদার চিন্তাধারার উৎসরূপে স্বীকার করেছিলেন তাকেই কিন্তু জীবনের সার্বিক উন্নয়নের মূলনীতিরূপে তিনি বুঝতে সক্ষম হননি। এর জন্য তিনি সমালোচিত হন এবং 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় বশিষ্ঠ প্রদত্ত শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি উপদেশ উদ্ধৃত করে নিজের অবস্থার সমর্থনে উত্তর দেনঃ "বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জিতঃ কর্তাবহিরকর্তান্তরেবং বিহর রাঘব।" প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, যিনি পুরাণের সত্যতা মানেননি, শ্রীরামচন্দ্রকে যিনি ঐতিহাসিক পুরুষ বলে মনে করেন না, উপরন্তু শ্রীরামচন্দ্র দেবী দুর্গার আরাধনা করেছেন বলে যাঁকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেন না, তিনি সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজেকে সমর্থন করতেও পারেন না।

এখানে এক স্ববিরোধিতা দেখা যাচ্ছে রামমোহনের মধ্যে। (বক্তৃতামালা এশিয়াটিক সোসাইটি)। অনুরূপভাবে যে বেদান্ত সত্য নিয়ে তিনি জয়যাত্রায় অগ্রসর হয়েছিলেন, তার সঙ্গেও হয়েছে তাঁর বিরোধিতা। লর্ড আমহার্স্টকে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তিনি চিঠিতে লেখেন ঃ "Nor will our youths be fitted to be better members of society by the Vedanta doctrines, which teach to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother etc. have no actual entity and therefore, the sooner we escape from them and leave the world the better."

বেদান্তের মায়াবাদকে রামমোহন illusion মনে করে তাকে জগতের ব্যবহারিক উন্নতির ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেননি। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু লিখেছেনঃ 'এই যে জীবন-মৃত্যু, ভালমন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞানের সংমিশ্রণ এটিই মায়া বা প্রকৃতি।' স্বামীজীর মতে মায়া 'Statement of fact'—বস্তুনিষ্ঠ প্রত্যক্ষবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই বিবেকানন্দে বেদান্তধর্মের যে আধুনিক ভাষ্য পাই, যাকে তিনি ব্যবহারিক বেদান্ত বলেছেন, সেটিই সর্বকালের জীবনোপযোগী—সেই তত্ত্বই সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিরও মূলভিত্তিরূপে ব্যাখ্যাত ও স্বীকৃত। এর সন্ধান রামমোহনে আমরা পাইনি। স্বামীজী লিখেছেনঃ "জগতকে যদি আমাদের কিছু জীবনপ্রদ তত্ত্বশিক্ষা দিতে হয়, তবে তা এই অদ্বৈতবাদ। ভারতের মূক জনসাধারণের উন্নতিবিধানের জন্য এই অদ্বৈতবাদ প্রচারের আবশ্যকতা। এ তত্ত্ব কার্যে পরিণত না হলে আমাদের মাতৃভূমির পুনরুজ্জীবনের আর কোন উপায় নেই।"

রামমোহন একটি কাল্পনিক বিশ্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় জাতীয় ঐতিহ্য ও স্বভাবকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। এইখানেই তাঁর ভ্রম হয়েছিল। স্বামীজী বললেন, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের পথ দিয়ে, বিভিন্ন প্রকার প্রতীক বা প্রতিমা পূজার মধ্যে দিয়েও অন্তর্লীন, এক অখণ্ড সত্যকে লাভ করা যায়। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনই এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সংস্কারবাদী ইউরোপ যে চোখে তার মধ্যযুগকে দেখেছিল, আমাদের সংস্কারকগণও সেই বক্র সমালোচনার দৃষ্টিতে পুরাণের যুগকে দেখেছেন। পৌরাণিক যুগের লোকব্যবহার, ধর্মসাধনা-পদ্ধতি প্রভৃতিকে রামমোহন সমালোচনা করেছেন এবং তার স্কন্ধে জাতীয় অবনতির দায়ভার চাপিয়ে দিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু ভারতীয় সভ্যতায় ও ধর্মে পৌরাণিক অবদান সশ্রদ্ধ ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে তাদের প্রতি সুবিচার করেছেন। পুরাণের যুগকে তিনি একটি বিকাশের যুগ বলে চিহ্নিত করেন। স্বামীজী লিখেছেনঃ "এই পুরাণেই ভক্তির চরম আদর্শ দেখতে পাওয়া যায়। চরিত্র সৌন্দর্যের, মহান আদর্শের দৃষ্টান্তসমূহ বিবৃত করাই পুরাণের প্রধান কাজ। পুরাণ সাধারণ মানুষের ধারণার অধিকতর উপযোগী। পুরাণগুলির বৈজ্ঞানিক সত্যতায় বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও নেই যাঁর জীবনে প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি চরিত্রের প্রভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। ... আবার পুরুষ অপেক্ষা ভারতীয় নারীগণের এগুলি অধিক আবশ্যক।" শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে "যে নবযুগ বা জাতীয় পুনরুত্থানের উষা আভাসিত হচ্ছিল,

সেটি রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বনে হয়নি। তা ছিল অতীত গৌরববোধ ও ভবিষ্যৎ আশার ওপর ভিত্তিযুক্ত এবং তা দৃঢ় হিন্দু জাতীয়তাবাদী মানসের দ্বারা চিহ্নিত। তারই পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটলো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সনাতন হিন্দুধর্মের পুনর্নবায়নের মধ্যে।"

রামমোহন রায় নিশ্চিতভাবে আধুনিকতার অগ্রদূত। রেনেসাঁর যে অন্যতম লক্ষণ অসাম্প্রদায়িকতা, তা তাঁর মধ্যে পুরোমাত্রায় ছিল। তাঁর স্থাপিত ব্রাহ্মসভায় উপাসনা বিষয়ে দলিলে স্পষ্ট করে তিনি লিখেছেনঃ "কোন সাম্প্রদায়িক নামে পরমেশ্বরের উপাসনা হবে না। কোন প্রকার চিত্র বা মূর্তি খোদিত থাকবে না। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে ঐক্যবন্ধন হয়, সেইপ্রকার উপদেশ, প্রার্থনা, বক্তৃতাদি হবে।" এদেশে তিনি সকল সম্প্রদায়ের জন্য একটি সার্বভৌম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের জনজীবনে তা করা সম্ভব ছিল না। ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার বৈশিষ্ট্যই হল বৈষম্যের মধ্যে একের উপলব্ধি। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেও ভারতবর্ষ যুগে যুগে ধর্মে ও সমাজজীবনে ঐক্যের সন্ধান করেছে ও সেই স্বর্ণসূত্রটি লাভ করেছে। বৈচিত্র্যকে সে কখনই বাহুল্যবোধে বিসর্জন দেয়নি। এইখানেই তার জাতীয় মহিমা।

রামমোহনের ঠিক পরেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন এবং দুঃখের বিষয় তিনি রামমোহনের অনুগামী হয়েও তাঁর নিরাকার ব্রহ্মচৈতন্যবাদ অস্বীকার করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেনঃ "আমরা যেমন পৌত্তলিকতা বিরোধী, তেমন অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী। যদি উপাস্য উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহার উপাসনা করিবে?" তিনি আরও স্পষ্ট করে লেখেনঃ "বৈদান্তিকেরা ঈশ্বরকে শূন্যে পর্যবসিত করে।" এতেই প্রমাণিত হচ্ছে রামমোহনের মতবাদ তাঁর শিক্ষিত অনুগামীরাই গ্রহণে অক্ষম, তবে সর্বসাধারণের আর কি কথা!

রামমোহন বেদান্তপ্রচার করলেও তাতে নীতির স্থান তিনি আবিষ্কার করতে পারেননি। তিনি লিখেছেনঃ "The doctrines of Christ are more conducive to moral principles, and better adapted for the use of rational beings than any other."

স্বামী বিবেকানন্দের আবিষ্কার ঠিক এর বিপরীত। তাঁর মতে অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদে নীতির কথা আছে বটে কিন্তু তার যুক্তিসম্মত প্রতিষ্ঠা নেই। একমাত্র বেদান্তশাস্ত্রেই তা যুক্তিবিচারসহ। তিনি লিখেছেনঃ "অপর প্রাণিবর্গকে আত্মতুল্য ভালবাসলে কেন কল্যাণ হবে, কেউই তার কারণ নির্দেশ করেনি। একমাত্র অদ্বৈতবাদই কারণ নির্দেশে সমর্থ। তখনই তুমি এটি বুঝবে, যখন তুমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক অখণ্ডস্বরূপ জানবে। যখন তুমি জানবে অপরকে ভালবাসলে নিজেকেই ভালবাসা হল, অপরের ক্ষতি করলে নিজেরই ক্ষতি করা হল—তখনই আমরা বুঝব অপরের অনিষ্ট করা উচিত নয়।"

ভারতের জাতীয় জীবনে তামসিকতা, গতানুগতিকতা ও নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই প্রতিবাদমুখর হয়েছিলেন এবং এর প্রতিকারকল্পে উভয়েই বেদান্তের পঠন-পাঠন ও প্রচার চেয়েছেন। কিন্তু বেদান্তধর্ম প্রচারে রামমোহনের লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র জাতীয় মনের প্রসার। স্বামীজী জাতীয় চেতনার জাগরণে যেমন বেদান্ত প্রয়োগ করেছিলেন, তেমনি খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের এদেশে ধর্মান্তরিতকরণ

প্রতিহত করতে পাশ্চাত্যে বেদান্তের মহিমা প্রচার করেছিলেন এবং শিকাগো বিশ্বধর্মসভায় বেদান্তধর্মকে শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী ধর্মরূপে প্রমাণ করে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

রামমোহন রায় মনে করতেন না ইংরেজদের অবদানের প্রতিদানে আমাদেরও কিছু দেবার মতন সম্পদ আছে। স্বামীজী কিন্তু ভারতের মহান সম্পদ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্যের ঐহিক সম্পদের বিনিময়ে প্রাচ্যের শাশ্বত আত্মসম্পদ বিতরণ করতে চেয়েছেন এবং একই সঙ্গে ভারতবাসীকে পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব জীবননীতির দ্বারা প্রলুব্ধ না হতে সচেতন করে দিয়েছেন, যে জীবনধারা রামমোহনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। স্বামীজী পরিব্রাজক অবস্থায় ভারতের দুর্বলতার স্থানটি যেমন দেখেছিলেন, তার মহিমার বিষয়টিকেও চিনতে ভুল করেননি। রামমোহনের সে সুযোগ ছিল না।

অদ্বৈততত্ত্বে যে সর্বজনীন মুক্তির কথা স্বামীজী প্রচার করেছেন রামমোহন সে সম্বন্ধে একেবারেই নীরব। আমরা যদি সকলে একই চৈতন্যসত্তায় বিধৃত, তবে একজনের মুক্তি হতে পারে না অন্যের না হলে। তাই নিজের মুক্তির জন্যেই চাইতে হবে অন্যের মুক্তি, জগতের সকলের মুক্তি এবং এর জন্য প্রয়োজন প্রাণপাত পরিশ্রম, অপরের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবাভাব। এই নিষ্কাম কল্যাণব্রতই আত্মসাম্য স্থাপন করবে এবং সেটিই ধর্মানুভূতির চরম বিকাশরূপে গণ্য হবে সর্বদেশে সর্বকালে। তাই মূলমন্ত্র হলঃ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' এ সত্য স্বামীজীর দিব্যানুভূতির, তাঁর ঐশী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান আমাদের প্রতি। এই নিষ্কাম সেবাসাধনার পথেই তিনি গিরিকন্দরের অদ্বৈতবাদকে বর্তমান যুগে, শুধু বর্তমানে নয়, সর্বযুগে, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক—সর্বক্ষেত্রে, কার্যকরী করার এক মহানবার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং এটিই তাঁকে অনন্তকাল ধরে মানব ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী করে রাখবে।

নবজাগরণে নববেদান্ত

পূর্বা সেনগুপ্ত

ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তর ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম এবং আচরণের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের মতবাদ জন্ম নিয়েছিল তাই প্রোটেস্টান্ট ধর্ম হিসাবে খ্যাত। উনবিংশ শতাব্দীতে কতকগুলি ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে এই মতবাদের দ্রুত প্রসার ঘটে এবং তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনে তা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই নতুন ধর্মের প্রবক্তা ছিলেন মার্টিন লুথাব।[১] যদিও জন ক্যালভিন এবং Zwingly-র কিছু অবদান এতে ছিল তবু লুথারকেই আমরা প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রবক্তা বলে চিহ্নিত করে থাকি। লুথার মানুষ এবং ঈশ্বরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে খ্রীস্টীয় দুনিয়ায় এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। মানুষের মুক্তির দায়িত্বকে তিনি অর্পণ করেন মানুষেরই উপর, মাধ্যম ছিল শুভ কাজ। বাইবেলের প্রাধান্যকে স্বীকার করে চার্চের মধ্যস্থতাকে তিনি নাকচ করে দেন। রাষ্ট্র এবং চার্চের পৃথকীকরণের ফলে ধর্ম এবং রাজনীতিও পৃথক হয়ে যায়। জাতীয়তাবাদের নবজন্ম এবং যৌক্তিক চিন্তার বিকাশে সমাজে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। মার্টিন লুথারের সেই Protestant Ethics যেমন এক Enlightenment-এর সূচনা করেছিল ঠিক তেমনি ভারতীয় চিন্তার জগতকেও আলোকিত করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের সমকালীন সমাজের পটভূমিকা যদি বিশ্লেষণ করতে যাই, সেখানে আমরা কেবল হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্মের বিকৃতিই দেখতে পাই না, ধর্মকেন্দ্রিক সমাজজীবনেও বিকৃতি দেখি। উনবিংশ শতাব্দীর যৌক্তিক চিন্তার জোয়ারে এই বিকৃতি ভেসে গিয়েছিল। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়ঃ "তখন দেশের চতুর্দিকে অন্ধকার! আর্য-ভারতীয় ধর্মের নামে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দেশবাসীর মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। শোনা যায়, হিন্দুমানসের সেই অজ্ঞতার যুগে শ্রাদ্ধকার্যের সময়ে নাকি সত্যপীরের পাঁচালী পাঠ করা হত।"[২]

রাজা রামমোহনের জন্মলগ্নই ভারতীয় রেনেসাঁসের সূচনাকাল। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রামমোহনের পটভূমিকা বর্ণনায় বলেছেনঃ "গুপ্তযুগ থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদে নির্বোধ প্রথা, অনুষ্ঠান, নানাবিধ অন্ধবিশ্বাস সংযুক্ত হয়ে তাকে পুরোহিতদের শোষণযন্ত্রে পরিণত করেছিল। এরপরে ইসলামের আক্রমণের ফলে গুপ্তযুগের ব্রাহ্মণ্যপ্রথা, বৌদ্ধতান্ত্রিক এবং বৌদ্ধ মহাযানী ও সহজযানী প্রথাদি সমস্তই একত্রে জট পাকিয়ে যায়। এই পাঁচমিশালী

ধর্মবিশ্বাসকেই বিদেশীরা সেযুগে 'হিন্দুধর্ম' নামে অভিহিত করত।"[৩]

রামমোহনের পরবর্তী যুগে ভারতে এল হেনরি ডিরোজিও-র (১৮০৮-৩১) ভাঙার গান। রামমোহন গঠনের মাধ্যমে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ডিরোজিও-র আন্দোলন শুরু হল ভাবতীয় অতীতের সমস্ত অস্তিত্বকে বর্জন করে।

ভারতীয় নবজাগরণের তৃতীয় ধাপ—ব্রাহ্ম আন্দোলন যার সূচনা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে ও বিকাশ কেশবচন্দ্র সেনের হাতে। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব, সমাজে যখনই যৌক্তিকতার প্রয়োজন হয়েছে এই আন্দোলন নিজেকে বিভক্ত করে সেই মনোভাবের সামিল হয়েছে। সেইদিক দিয়ে আন্দোলনের সচলতা ছিল প্রচণ্ড।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর্য সমাজ এবং থিওসফিকাল সোসাইটির কথা বলতে পারি। এই দুই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং তার প্রচার। এই মতাদর্শের মধ্যে আমরা কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীলতার গন্ধ পেয়ে থাকি। পরবর্তী পর্যায়েই আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশিত এবং বিবেকানন্দ-পরিচালিত 'মিশনারি' আন্দোলনের কথা উল্লেখ করতে হবে। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলির দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিই তবে দেখব রামমোহন থেকে দয়ানন্দ সরস্বতী পর্যন্ত প্রত্যেকের আন্দোলন সংস্কারপন্থী। সামাজিক সংস্কারই এদের লক্ষ্য কিন্তু রামকৃষ্ণ আন্দোলন সামাজিক সংস্কারের উপর কেবল গড়ে ওঠেনি। স্বামী বিবেকানন্দ কখনই নিজেকে সমাজসংস্কারক বলে চিহ্নিত করেননি,[৪] তিনি সামান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিন্দায় তাঁর আন্দোলনকে পরিচালিত করতে চাননি। তাই তাঁর কপালে জুটেছিল প্রতিক্রিয়াশীলতার বদনাম। অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ঃ "আজকাল সামান্য মার্ক্সবাদ জানা তরুণরা স্বামীজীকে প্রতিক্রিয়াশীলরূপে অভিহিত করে থাকেন। তাঁর জীবদ্দশাতেও সমাজসংস্কারক কর্মীরা তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করতেন, কারণ তিনি একথা প্রচার করতেন না যে, বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা বা অসবর্ণ বিবাহ ও অনুরূপ সমাজসংস্কার কার্যের দ্বারাই ভারতেরও নবজাগরণ সম্ভব হবে।"[৫]

বস্তুত স্বামীজী ছিলেন সংগঠক, তিনি সমাজের আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন।[৬] রামমোহনের শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস ও তার সাফল্য ভারতীয়দের সুযোগ এনে দিয়েছিল মানসিক উৎকর্ষতালাভের। এর উপর পড়েছিল পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রলেপ। এই যুগে ভারতীয় সভ্যতাকে পুরোপুরি নাকচের ভাব নিয়ে ইয়ং বেঙ্গল এবং অপরদিকে হিন্দু আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করে আর্য সমাজ প্রভৃতি প্রভাববিস্তার করলেও তৎকালীন জনগণের ঘুম ভাঙানোর জন্য যে ভাবপ্রবাহের প্রবল আঘাত প্রয়োজন ছিল তা কোনও আন্দোলনই যোগান দিতে পারেনি। এই আন্দোলনগুলি প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু সংকীর্ণতায় আবদ্ধ ছিল এবং একে অপরের প্রতি সহিষ্ণু ছিল না, বৈচিত্র্যের মধ্যে একতারূপ সংহতিসৃষ্টির ক্ষমতা এদের ছিল না।

এই প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "এই সর্বপ্রকার উদ্যমই বুদ্ধি ও প্রচারের স্তরে সীমিত ছিল—অপরের হৃদয়ে স্বধর্মাবলম্বনে অধ্যাত্মপথে যাত্রার উদ্দীপনা জাগাইবার উপযুক্ত অনুভূতি উহাতে ছিল না। আবার এইসকল চিন্তার মধ্যে ভারততের

দেশ স্থান পায় নাই বলিলেই চলে। এইসকল মত ও প্রচেষ্টার কোনটিই বিশ্বের সকল ধর্মকে কেন, শুধু ভারতীয় ধর্মগুলিকেও উদার সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখিয়া সব কয়টিকে সমভাবে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়া বিশ্বময় যথার্থ সৌভ্রাত্র স্থাপনে যত্নপর হয় নাই।"[৭]

তৎকালীন ভারতীয় সমাজের পক্ষে প্রয়োজন ছিল প্রথমত সংহতি এবং দ্বিতীয়ত, গণজাগরণ ও গণসচেতনতা। স্বামী বিবেকানন্দ এই গণসচেতনতা এবং সংহতির বাণীই শুনিয়েছিলেন। কেবলমাত্র শোনাননি, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ভাবধারার মিলন ঘটিয়ে এমন এক ভাবধারার প্রবর্তন করলেন যা ভারতীয় সমাজজীবনে নতুন, যার নাম নববেদান্ত বা কর্মে পরিণত বেদান্ত।

ইউরোপীয় সমাজতাত্ত্বিকেরা ভারতীয় দর্শনকে এবং সংস্কৃতিকে 'অতিজাগতিক' বা 'Other worldly' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে এই দর্শন অতিজাগতিক দিককে এত বেশি গুরুত্ব দান করেছে যার ফলে ইহজাগতিক এবং সামাজিক উন্নতি উপেক্ষিত থেকে গেছে।[৮] যদিও সমাজবিজ্ঞানী শ্রীমতী বেলা দত্তগুপ্ত তাঁর সুবিখ্যাত বই Sociology in India-তে এই মতের বিরোধিতা করেছেন, তবুও এই ধারণা বুদ্ধিজীবীদের জগতে স্বীকৃত। স্বামী বিবেকানন্দের মতে কেবল লৌকিক এবং লোকোত্তর জগৎ দুই-ই সত্য নয়, তাঁর মতে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু, যাবতীয় কর্মই ঈশ্বর উপাসনার অঙ্গবিশেষ, মানুষের মানসিকতা অনুযায়ী এই পূজা সার্থকতা পেয়ে থাকে, অদ্বৈত চিন্তাকে কর্মে পরিণত করার দর্শনই হল কর্মে পরিণত বেদান্ত। সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্ক্স তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ চেয়েছিলেন। তেমনি স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ভারতীয় দর্শন অদ্বৈত বেদান্তকে বাস্তব জীবনে প্রযুক্ত করতে—'বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে'।

নববেদান্ত হল সেই দর্শন যা নতুন জগতকে নতুন পথে চলার সন্ধান দিতে পেরেছিল। এইভাবে ইহজাগতিক এবং অতিজাগতিক ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্যকে মুছে দিল। সেইসঙ্গে জাগতিক কাজকে পূজার পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে মানুষকে যৌক্তিক এবং কর্মঠ করে তুলল। যে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকেই তাকে শুরু করতে হবে। স্বামীজী বলেছেনঃ "খ্রীষ্টান আরো ভাল খ্রীষ্টান হবে, একজন ছাত্র আরো ভাল ছাত্র হয়ে উঠবে।" লুথারের মতো স্বামীজীও বললেনঃ 'প্রত্যেক কাজই ঈশ্বরনির্দিষ্ট।' লুথার ঈশ্বরনির্দিষ্ট কাজকে 'calling'-বলে চিহ্নিত করেছেন যা প্রত্যেক মানুষের আবশ্যিক কার্য। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ভাব Protestant Ethics-এর মতো মুক্তির উদ্বেগ (Salvation anxiety) সৃষ্টি করেনি। খ্রীস্টধর্ম পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করে না সুতরাং প্রত্যেকের এক জন্মের মধ্যেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা একটি মানসিক উদ্বেগের কারণ হয় কিন্তু হিন্দুধর্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি জীবনের ভুল দিকগুলিরও একটি অর্থ বা উপযোগিতাকে স্বীকার করে এমন এক দর্শনের সৃষ্টি করল যা একাধারে মানুষকে বিশ্বজনীন, যৌক্তিক ও অপরদিকে স্বাধীনতা বা মুক্তির পথে চালিত করবে। কেবল ভাল কাজই নয়, মন্দ কাজেরও একটি গুণগত দিক আছে, তা বাঁকা পথে জীবনের উন্নতিতে সাহায্য করে চলে।

D. S. Sharma স্বামী বিবেকানন্দ বর্ণিত নববেদান্তের কতগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, সেগুলি হল—(১) বিশ্বজনীনতা (Universality) (২) নৈর্ব্যক্তিকতা

((Impersonality) (৩) যৌক্তিকতা (Rationality) (৪) উদারতা (Catholicity) ও (৫) আশাবাদ (Optimism)।

বেদান্ত সবসময় সার্বজনীনতার কথা বলে। এই ভাব সমস্ত ধর্মমতকে স্বীকার করে। বেদান্তের মতে জগতে প্রত্যেক ভাবেরই কিছু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাই তা নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। সুতরাং কোনও ধর্মের অস্বীকার বা নিন্দা করা উচিত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সামাজিক পটভূমিতে এসেছিলেন, সে সমাজ বিভিন্ন ভাবকে কেন্দ্র করে বিভক্ত ছিল, কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের মধ্যেই ছিল শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি ভাবের বিবাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ গীতার সমন্বয় বাণী পুনঃপ্রচার করে ধর্মের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়ত, বেদান্ত কোনও ব্যক্তিকে ঘিরে গড়ে ওঠেনি, আদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কোনও ব্যক্তিকে ঘিরে গড়ে ওঠেনি বলেই প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যতখানি ধর্মীয় স্বাধীনতার দরকার তা বেদান্ত দিয়ে থাকে। স্বামীজী একথা বারে বারে বলেছেন যে একমাত্র নৈর্ব্যক্তিক ধর্মই সমস্ত ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং মর্যাদা দেখাতে পারে। তৃতীয়ত, বেদান্ত একটি যৌক্তিক আদর্শে সারবত্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে এর কোনও বিরোধ নেই। তাই এই মতকে 'বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিক ধর্ম' বলে চিহ্নিত করা হয়। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হিসাবে উদারতার কথা বলা হয়েছে, মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করে বেদান্ত যে উদারতা দেখায় তা এই ভাবাদর্শের একটি বৈশিষ্ট্য। জগৎ বৈচিত্র্য নিয়ে গঠিত, বেদান্ত এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে। স্বামীজী বলেছেনঃ "Unity in variety is the plan of nature and the Hindu has recognised it".[৯]

বেদান্তের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তার আশাবাদী চরিত্র। মানুষের মনুষ্যত্ব, আশা এবং বিশ্বাসের উপর নির্মিত হয়েছে নববেদান্ত। স্বামীজী মানুষের অনন্ত শক্তিকে স্বীকার করেছেন। তাঁর দর্শনে যে আশাবাদী এবং ইতিবাচক রূপ ফুটে উঠেছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়[১০] এই 'আশাবাদী' বৈশিষ্ট্যকে 'মানবতাবাদী' হিসাবে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে ভারতীয় রেনেসাঁসে স্বামী বিবেকানন্দের মানবতাবাদ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছিল। তাঁর মানবতাবাদে শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় আরও দুটি বৈশিষ্ট্যের সংযোজন করেছেন।[১১] এই বৈশিষ্ট্য দুটি হল (১) গণতান্ত্রিকতা (Democracy) (২) বাস্তবতা (Practicality)। তাঁর মতে ভারতীয় নবজাগরণের প্রধান অবদান হল স্বামী বিবেকানন্দের Neo-Vedanta. তিনি নবজাগরণের ধারাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন (১) সামাজিক ধর্মীয় আন্দোলন, (২) সাহিত্য আন্দোলন, (৩) জাতীয় আন্দোলন। তাঁর মতে আন্দোলনের এই তিনটি পর্যায়েই স্বামী বিবেকানন্দের নববেদান্তের প্রভাবকে খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি নববেদান্তের আর একটি অবদান হিসাবে বলেছেনঃ "Through his Neo-Vedanta, Vivekananda addressed himself to liberation of the human spirit, which implies complete emancipation of the individual." এমন এক ব্যক্তিত্বের কথা বলেছেন যে ব্যক্তিত্ব মুক্তি, সচেতনতা এবং বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। ব্যক্তি-আত্মার মুক্তির একটা সমষ্টিগত দিক আছে। কারণ এটাই 'ন্যায়' (Justice) হিসাবে বৃহত্তর জীবনকে পরিচালিত করে। এই নববেদান্ত মতাদর্শ দুটি দিক নিয়ে গড়ে উঠেছিল, যা একদিকে

স্বামীজীকে একটি ভাব প্রচারক এবং অপরদিকে সেবাকার্যের প্রচারক করে তুলেছিল। এইরকম চিন্তাধারা (thought) এবং কার্যধারার (action) সমন্বয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের মৌলিক অবদান।

স্বামীজী নবজাগরণে নববেদান্তের মাধ্যমে যে ভাব প্রচার করেছিলেন সেগুলি হল, প্রথমত, ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে তার সমাধান। দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্মিকতা এবং বাস্তব জগতের মধ্যে একটি সেতু নির্মাণ, তৃতীয়ত, সাধারণ মানুষের সমস্যাকে তিনি তুলে ধরেছিলেন এবং প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এই আদর্শ ছিল মানুষের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার উপর দাঁড়িয়ে—দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিক। এই আধ্যাত্মিক ভাব ভারতবাসীর জীবনকে নতুন বিপ্লবের পথ দেখায়।

ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থায় প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রভাব বিবিধ উপায়ে পড়ে। প্রথমত আধুনিক জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল এই ধর্মমত। রাষ্ট্র এবং ধর্মকে পৃথক করে নতুন রাজনৈতিক ধারা এবং চিন্তনের সৃষ্টি করেছিল আবার প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত নতুন এক সামাজিক ethic বা ভাবের সৃষ্টি করে যা সমাজবিজ্ঞানী Max Webber-এর[১২] মতে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে। এছাড়া সাংস্কৃতিক এবং শিল্পের দিক দিয়েও দেশের উন্নতি হয়। মানুষ চার্চের আওতা থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন ভাবে ধর্মীয় তথা সমাজজীবন যাপন করার সুযোগ পেয়েছিল। সমাজ এবং ধর্ম যে পৃথক নয়, তা মার্টিন লুথার দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। অপরদিকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত নববেদান্তের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে যে রূপান্তর হয়েছিল তা লুথারের প্রবর্তিত পরিবর্তনের তুলনায় কোনও অংশে কম ছিল না। সবক্ষেত্রে যে এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল তা নয়, অনেক ক্ষেত্রেই তা পরোক্ষভাবে এবং ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে চলেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ সেই নতুন ভারতকে আহ্বান করেছিলেন। বস্তুত তাঁর জীবনে ঈশ্বর এবং ভারতবর্ষ যেন মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষ আবার জাগবে, এবার জাগবে জগতের প্রয়োজনে।

ভারতীয় সমাজে নববেদান্ত কিভাবে প্রভাববিস্তার করে তার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। প্রভাব পড়েছিল—জাতীয়তাবাদের উন্মেষে, ভারতীয় শিল্পকলায় এবং তৃতীয়ত বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে। যদিও আমরা এই তিনটি ক্ষেত্রকে পৃথকভাবে দেখব, তবুও এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে সব কয়টি ক্ষেত্র পরস্পরের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের পটভূমি এক যুগসন্ধিক্ষণ, ভারতবর্ষ যখন একটি পরিবর্তনের মুখে দণ্ডায়মান। নতুন ভারত জাগতে চাইছে নতুনভাবে, সামনে পর্বতপ্রমাণ বাধা, বিভিন্ন ভাবের দ্বন্দ্ব। ঠিক এই সময় স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় চরিত্রের প্রধান দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। স্পষ্ট ঘোষণা করলেন; 'ঘুমন্ত লেভিয়াথান', 'দুহাজার বছরের মমি' বলে। বললেনঃ 'দেশটা তমোগুণে ছেয়ে গেছে, এখন প্রয়োজন রজোগুণের। এখন প্রেমের কৃষ্ণ ছেড়ে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের ভজনা কর।' সন্ন্যাসী হয়েও দেশকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। এই ভালবাসার মধ্যে কেবল আবেগ ছিল না, ছিল কর্মতৎপরতা। শোনা যায় তিনি বন্দুক নির্মাতা হিরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন।[১৩]

নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বাঘা যতীন, শ্রীঅরবিন্দ এবং আরও অনেক দেশনেতা ও বিপ্লবী স্বামীজীর দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পরে তাঁর এই দেশসেবার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন সিস্টার নিবেদিতা। আয়ার্ল্যাণ্ডের কন্যা মার্গারেটকে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের জন্য নিবেদন করে গিয়েছিলেন। তাঁর এই নিবেদন সার্থক হয়েছিল। কেবল জাতীয়তাবাদ নয়, দেশের স্বাধীনতা নয়, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির যে রূপরেখা নিবেদিতা তাঁর, 'Master'-এর কাছ থেকে পেয়েছিলেন তার চিত্রণে তিনি জীবনপাত করেছেন। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ বলেছেনঃ "স্বামীজী ছিলেন, 'পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার মন্ত্রগুরু, মুক্তির মন্ত্রচৈতন্যদাতা'।" আরও বলেছেনঃ "আমি তাঁকে দেখেছি। আমি তাঁর পা ছুঁয়েছি। আমার মাথায়, পিঠে তাঁর অগ্নিস্পর্শ এখনও যেন অনুভব 'করছি। আমার জীবনের চরম ক্ষণ সেই মুহূর্তগুলি, যখন স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসে দেশকে ভালবাসতে আমি শিখলাম, পরাধীনতার বেদনা যে কত মর্মদাহী হতে পারে তা তখন প্রাণের গভীরে অনুভব কবলাম।"[১৪]

দেশের মুক্তি আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব প্রত্যক্ষ, ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রেও কিন্তু তাঁর প্রভাব কম নয়। স্বামীজী শিল্প সম্বন্ধে আলোচনায় বলেছেনঃ "মানুষ যে জিনিসটি তৈরি করে তাতে কোনো একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)... তবে এক একটা জাতের এক একটা characteristic (বিশেষত্ব) আছে।...যে জাতটা বড় materialistic (জড়বাদী), তারা nature (প্রকৃতি) টাকেই ideal (আদর্শ) বলে ধরে।...যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাব প্রাপ্তিকেই ideal (আদর্শ) বলে ধরে সেটা ঐভাবেই nature-এর প্রকৃতিগত শক্তি সহায়ে শিল্পে express (প্রকাশ) করতে চেষ্টা করে।"

বস্তুত তিনি শিল্পকলা সম্বন্ধে নতুন ভাবের সৃষ্টি করেছেন। বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির নির্মাণেব স্থাপত্যকার্যক্ষেত্রে সর্বধর্মসমন্বয় সূত্র প্রয়োগ করেছিলেন। সমস্ত ধর্মের ভাব এবং বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের মধ্যে ফুটে উঠেছে এবং সহযোগিতা ও সমন্বয়ের বাণী বহন করে চলেছে। স্বামীজীর শিল্পভাবকে বিশেষ করে ছড়িয়েছিলেন সিস্টার নিবেদিতা। তাঁর সঙ্গে জাপানী শিল্পী ওকাকুরা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল[১৫] এবং তাঁর প্রভাবে জন্ম হয়েছিল নন্দলাল বসুর মতো মৌলিক শিল্পীর।

স্বামী বিবেকানন্দ যে ভারতীয় পটভূমিতে এসেছিলেন, সেই ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছিল। ভারতে সামন্ততান্ত্রিক, গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর সমাজ ভেঙে গিয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের শোষণে। যে হস্তশিল্পগুলি ছিল তাও ইউরোপীয় কলের উৎপাদনের সঙ্গে গুণমানে পাল্লা দিতে না পেরে ধ্বংস হয়ে গেল। কিন্তু নতুন অর্থনীতির বিকাশে শা ভারতবর্ষকে শিল্পক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে ব্রিটিশরা চায়নি, মূলত কোনও সাম্রাজ্যবাদী দেশই চায় না যে তার উপনিবেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে, 'ইকনমিস্ট' পত্রিকায় ভারতের শিল্প প্রবর্তনে অগ্রগতি সম্পর্কে বলা হয়ঃ "ভারত উহার শিল্পকে আধুনিক করে গড়ে তুলতে আরম্ভ করেছে বটে কিন্তু সেদেশে এখন 'শিল্পোন্নয়ন' চলছে এমন কথা বলা যায় না।"

প্রকৃতপক্ষে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই ভারতে যন্ত্রের যুগ (Age of

Machine) শুরু হয় সুতি ও পাট শিল্প এবং কয়লাখনি শিল্পের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে কোয়াস জী নানাভাই বোম্বাইতে প্রথম সুতি কল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম বাংলার রিষড়ায় প্রথম পাটকলের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ভারতে আধুনিক শিল্প সংস্থাগুলির অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশ মূলধন ও ব্রিটিশ মালিকদের পরিচালনাধীন। অতিরিক্ত মুনাফার আশায় বহু বিদেশী পুঁজিপতি ভারতে নতুন নতুন শিল্প সংস্থা গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। ভারতীয় মূলধন শিল্প ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার নিযুক্ত করতে দেননি।[১৬] ভারতীয় মূলধনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার বিদেশী মূলধনের প্রতি অধিক পক্ষপাতিত্বের নীতি গ্রহণ করে ভারতীয় শিল্পের সম্প্রসারণে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতেন। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ইংরেজ সরকারের এই শিল্পনীতির ফলে ভারতে ঊনবিংশ শতকে শিল্প বিপ্লব ঘটতে পারেনি।

আমরা দেখতে পাই, ভারতে প্রথম ভারি শিল্পের প্রবর্তন করেন জামসেদজী টাটা এবং তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ঃ "স্বামীজী টাটাকে বলেছিলেন, 'জাপান থেকে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেশলাই বিক্রয় করে জাপানকে টাকা দিচ্ছ কেন? তুমি তো সামান্য কিছু দস্তুরী পাও মাত্র, এর চেয়ে দেশে দেশলাই-এর কারখানা করলে তোমারও লাভ হবে, দশটা লোকেরও প্রতিপালন হবে এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে।' এইভাবে তিনি শিল্প সম্বন্ধে সচেতন করেছিলেন টাটাকে। দেখা যাচ্ছে, জামসেদজী টাটা আত্মত্যাগী যুবকদের বিজ্ঞান সাধনা সম্বন্ধে স্বামীজীর কাছে যে প্রস্তাব করেছিলেন, তা স্বামীজীর ভাবধারা অনুযায়ীই এবং টাটা তাঁর পত্রের প্রথম দিকে তা স্বীকারও করেছিলেন।"[১৭] স্বামীজী তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও বলেছেন ঃ "The speaker explained his mission in his country to be to organize monks for industrial purposes, that they might give the people the benefit of this industrial education and thus to elevate them and improve their condition. (Aug. 29, 1893)

এছাড়া বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানগবেষণার পিছনে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণাময় বাণী এবং সিস্টার নিবেদিতার স্নেহ।

স্বামী বিবেকানন্দের সবথেকে বড় অবদান হল নতুন এক ভাবধারার সৃষ্টি। যে ভাবধারাকে আমরা সামাজিক এবং ধর্মীয় এই দুইভাবেই চিহ্নিত করতে পারি। এ যাবৎ বনে গিয়ে তপস্যা করাই ছিল সন্ন্যাসীর এবং ধর্মীয় পুরুষের একমাত্র কাম্য। ত্যাগ বলতে আমরা কেবল বুঝতাম সবকিছু ছেড়ে, চোখ কান বন্ধ করে কোনও কিছুর সন্ধান। যদিও ঈশ্বরলাভই ছিল বিবেকানন্দের চরম উদ্দেশ্য কিন্তু জীবনের কোনও অংশকে তিনি উপেক্ষা করেননি। মানুষের সেবার মধ্যেই সাধনাকে তিনি এনে দিয়েছেন। এই 'সেবা'র তাৎপর্য কিন্তু রামকৃষ্ণদর্শনে বিরাট কারণ, মানুষকে মানুষ ভেবে সেবা করা নয়, তাকে ঈশ্বর ভেবে সেবার মধ্যে এই সাধনা নিহিত। আমরা জানি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও সেবার আদর্শ নিয়ে সেবাকার্য করেন কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের সেবা একেবারে ভিন্ন, এখানে প্রতিটি সেবাই পূজায় পরিণত।

ভারতবর্ষের নবজাগরণে নববেদান্তের অবদান অপরিসীম। এই ভাবধারার অবদান

বুঝতে গেলে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি তথা সমাজজীবনের জাগৃতির স্বরূপ অনুধাবন করা প্রয়োজন। যদিও ভারতের এই জাগরণকে আমরা নবজাগরণ বা রেনেসাঁস বলে থাকি, তবুও এর স্বরূপকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দেখা দেয়। রেনেসাঁস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'পুনর্জন্ম' অর্থাৎ পুরাতনকে ফিরিয়ে আনাই 'রেনেসাঁস'। অপরদিকে 'Enlightenment' বলতে একটি নতুন ভাবাদর্শের আলোকে আলোকিত হওয়াকেই বুঝায়। 'Enlightenment' সমাজের ক্ষেত্রে সদর্থক-নঞর্থক দুই রকমের হতে পারে। এক্ষেত্রে নতুন করে গড়া এবং ভাঙার একটা ব্যাপার এসে যায়। ভারতের নবজাগরণকে রেনেসাঁস বলে অভিহিত করা হলেও বামপন্থী ঐতিহাসিকগণ আন্দোলনকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ তাঁদের মতে এই আন্দোলন জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি বা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততা এতে ছিল না। একটি গোষ্ঠীর স্বার্থেই এর সৃষ্টি এবং গোষ্ঠীতেই তা সীমাবদ্ধ থেকেছিল। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, স্বামী বিবেকানন্দ পরিচালিত ভাবান্দোলনকে আমরা কি বলব ? স্বামীজী ভারতীয় সনাতন ধর্মেরই প্রবক্তা এবং ভারতীয় বেদান্তের প্রচারক ছিলেন। এদিক দিয়ে তাঁকে রেনেসাঁসের অনুগামী বলা যায়। তবে বামপন্থীরা তাঁকে 'সংস্কারপন্থী' এবং 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যায় বারে বারে ভূষিত করতে চাইলেও স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বিখ্যাত বই 'স্বামী বিবেকানন্দ'-তে ভারতের নবজাগরণকে শ্রেণী-স্বার্থের দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করলেও স্বামী বিবেকানন্দের সম্যক ভূমিকাকে তুলে ধরতে তাঁর ভুল হয়নি। স্বামীজী সন্ন্যাসী হয়েও সাধারণ জনসাধারণের স্বার্থের জন্য যেরকম কথা বলে গেছেন তা অভাবনীয়। গণজাগরণই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা যায় না। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যদিও তিনি প্রাচীন সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে সহায়তা করেছিলেন তথাপি তিনি কখনও কোনও সমাজে নির্দিষ্ট অংশের জন্য কালক্ষেপ করেননি। কেবল তাই নয়, কর্মে পরিণত বেদান্তের মাধ্যমে নবজাগরণে একটি নতুন মাত্রার সংযোজন করেছিলেন। ভারতীয় ধর্মাশ্রিত সমাজ একটি পুরাতন আদর্শকে নতুন এবং আধুনিক যুগোপযোগী রূপে পেল। ভাতের হাঁড়ির ধর্মকে স্বামীজী সমাজের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিলেন। জীবনের সব ছন্দ গতি পেল, অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল, সমস্ত জীবনের ওঠাপড়া একটি লক্ষ্যে নিবদ্ধ হয়ে গেল। ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে নববেদান্ত এক নতুন ইতিবাচক দর্শনের প্রবর্তন করেছিল। এই ভাবাদর্শ নতুন যুগের গীতা। যে গীতার মূল সুর হল সমন্বয় এবং বিস্তার। ধর্ম কেবল মন্দিরে, মসজিদে অথবা ব্রাহ্মণ বা মৌলবিতে সীমাবদ্ধ থাকল না। পূজার ধূপের আত্মবিলয় কারখানার শ্রমিকের কাজের টেবিলে পৌঁছে গেল, ক্ষেত-খামারে কৃষকের লাঙলের ধারে, শিক্ষকের শিক্ষকতার মধ্যে প্রবেশ করল। তাই নিবেদিতার ভাষায় আমরা বলতে পারিঃ "ইহাই আমাদের গুরুদেবের জীবনের চরম আদর্শ, এখানেই তিনি যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ক্ষেত্র হইয়াছেন, তাহা নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতেরও। বহু এবং এক যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনা পদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি, সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই প্রার্থনা, জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধর্মকার্য হইয়া যায়। যোগ ও ক্ষেম ত্যাগ বর্জনের মতোই দায়স্বরূপ।"[১৮]

ধর্মের মানুষ ঃ মানুষের ধর্ম ঃ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে হিন্দুধর্মপ্রসঙ্গে যে লিখিত প্রবন্ধ পড়েছিলেন (পেপার অন হিন্দুয়িজম্, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩) তাতে পৃথিবীর নানা ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের কথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে জৈন ও বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বর-ধারণা প্রসঙ্গে অজ্ঞেয়তা ও নাস্তিকতার যে প্রতিবাদী সুরের কথা তিনি বলেছিলেন, তাতে তাঁর মতে সুরবৈচিত্র্যই ফুটে উঠেছিল এবং সে সুরবৈচিত্র্য হিন্দুধর্মকে জনমুখী চরিতার্থতার পথেই নিয়ে গেছে বলে তাঁর মনে হয়েছিল। তাছাড়া বৈদিক হিন্দু ধর্মে পরধর্মবিদ্বেষের কথা যে একেবারেই নেই তা-ও বিবেকানন্দ খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন।

কিন্তু এ আলোচনার লক্ষ্য ধর্ম-সমন্বয়ের ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করা নয়। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে (পেপার অন হিন্দুয়িজম্) বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ কীভাবে ধর্মকে জীবন-বিকাশের স্বরূপ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, কীভাবে মানুষকে 'ঈশ্বরিত মানুষ' হিসেবে বুঝতে চেয়েছেন, ধর্ম যে তাঁর চোখে মানব-মহিমারই পরম প্রাপ্তির পথ, অনন্ত প্রাণধারাকে চৈতন্যে ধরবারই চেষ্টা—তাই সংক্ষেপে দেখিয়ে তুলনামূলকভাবে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনাকে এই ধর্মবোধ ব্যাখ্যার পটভূমিতে রাখতে চেষ্টা করব।

হিন্দুধর্মের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে বিবেকানন্দ তাঁর এই প্রবন্ধে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। প্রথমত, হিন্দুরা বেদ-উপনিষদকেই ধর্মভাবনার উৎস হিসেবে দেখেছেন। তাঁরা মনে করেন, বেদধৃত সত্যোপলব্ধির কোনও শুরু নেই, শেষও নেই। কথাটা শুনে আশ্চর্য লাগতে পারে। কীভাবে এক বা একাধিক গ্রন্থ অনাদি বা অশেষ হতে পারে? আসলে বেদ-উপনিষদ ইত্যাদি বলতে কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ বোঝায় না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষার সত্যোপলব্ধির সূত্র-সংকলনে এই বেদ-উপনিষদ উপলব্ধির অতি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে। যেমন, আবিষ্কৃত হবার আগে থেকেই মাধ্যাকর্ষণ সূত্র কাজ করছে এবং মানুষ যদি ভুলেও যায় তাহলেও এই সূত্র কাজ করবে, তেমনি এই উপলব্ধিগত সত্য উপলব্ধির আগে থেকেই রয়েছে এবং থাকবে। মানুষে মানুষে এই আত্মিক ও নৈতিক সম্পর্ক, ব্যক্তি এবং বিশ্বজনীনতার ভিতরকার এই গূঢ় সম্পর্ক চিরকালই আছে। মানুষের উপলব্ধি বা বিস্মৃতির অপেক্ষা সে করে না।

দ্বিতীয়ত, কোনও শূন্যতা থেকে এই শাশ্বত আত্মিক-নৈতিক উপলব্ধির সূত্রগুলি

আসেনি। যদি শূন্যতা থেকেই হঠাৎ এই উপলব্ধি শুরু হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎ এ শক্তির 'প্রকাশ' কোথা থেকে হল? কেউ বলবেন, ঈশ্বরেরই নিহিত শক্তি। তাহলে বলতে হয় ঈশ্বর কখনও নিহিত, কখনও ব্যক্ত। অর্থাৎ ঈশ্বর পরিবর্তনশীল। আর ঈশ্বর যদি পরিবর্তনশীল হন তাহলে তিনি আর পাঁচটা জিনিসের যোগফল। আর যোগফল হলে তিনি হবেন বিনাশধর্মী। তাহলে ঈশ্বর হবেন মরণশীল। কিন্তু শক্তির তো কোনও বিনাশ নেই। বিজ্ঞানও বলছে, বিশ্বশক্তির সামগ্রিক পরিমাণ একই হয়েছে। কাজেই এমন কোনও সময় ছিল না যে সময়ে সৃষ্টি ছিল না।

বিবেকানন্দের অনুসরণে বলতে গেলে বলতে হয়, স্রষ্টা ও সৃষ্টি চিরকালই পাশাপাশি সমান্তরালভাবে চলেছে। তার শুরুও নেই, শেষও নেই। আর ঈশ্বর হলেন এমন এক 'চির সক্রিয় শক্তি' (ever active providence) যার প্রভাবে শৃঙ্খলার পর শৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে বিশৃঙ্খলা থেকে, কিছুকাল তা চলছে, আবার নষ্ট হয়ে নতুন শৃঙ্খলা আসছে। আধুনিক বিজ্ঞানও একথা মানছে।

আমরা যখন এই অস্তিত্বকে ধ্যান করার চেষ্টা করি তখন 'আমি' বলতে কোন্ ধারণাটি আমাদের চোখের সামনে ভাসে? ভেসে ওঠে এই শরীরটি। এই শরীর তো কিছু পদার্থেরই সমষ্টি। কিন্তু বৈদিক মনীষী বলছেন, না। 'আমি' শুধু শরীর নয়, 'আমি' এই শরীরবাসী আত্মা। শরীরটি বিনষ্ট হবে কিন্তু আত্মা বিনষ্ট হবে না। এই আত্মা শরীরের মতো নিছক কিছু পদার্থের সমষ্টিমাত্র নয়।

আমরা শরীর এবং মনের প্রবণতা ও দক্ষতাকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। বোধহয় দুটির অস্তিত্বই সমান্তরালভাবে চলেছে। পদার্থের যোগে যে শরীর তার বিনাশ হচ্ছে, রূপান্তরও হচ্ছে। কিন্তু তার সঙ্গে আত্মা বা মনের স্বভাবগত কোনও মিল নেই। শরীর থেকে চৈতন্য যে কীভাবে এসেছে তা প্রমাণ করা যাবে না।

যে শারীরিক প্রবণতাগুলি নিয়ে আমরা জন্মাই তা উত্তরাধিকারসূত্রেই পাচ্ছি। সেই প্রবণতা অনুযায়ী আমাদের মনও কাজ করে যাচ্ছে। উত্তরাধিকারসূত্রে যে প্রবণতাগুলি যেরকম শরীরে যথার্থভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত, সেইরকম শরীর নিয়েই আত্মিক শক্তির প্রকাশ হচ্ছে। আমাদের স্মৃতি-সমুদ্রের গভীরে যা থাকে তা অনেক সময়েই আমাদের চেতনায় ফিরে আসে। তবে বিবেকানন্দ যেমন বলেছেনঃ সেই ফিরে আসা স্মৃতি কোন্ পূর্বজন্মের তা আলাদা করে বলে দেওয়া সম্ভব নয়—'Try it and you would get a complete reminiscence of your past life.'—একি সম্ভব?

যাই হোক, হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, আত্মা অপরিবর্তনীয়, অভেদ্য। আগুন জল হাওয়ায় তার পরিবর্তন হয় না। তরবারি দিয়ে তা বিদ্ধ করা যায় না। আত্মা এমনই এক বৃত্ত যার কেন্দ্র এই শরীরেই কিন্তু তার পরিধি বলে কিছু নেই। মৃত্যু মানে শুধু শরীর থেকে শরীরে ঐ আত্মিক কেন্দ্রের সরে যাওয়া। কিন্তু পদার্থের কোনও শর্ত দিয়ে আত্মাকে বেঁধে রাখা যায় না। এই অর্থেই আত্মা শর্ত-নিরপেক্ষ, স্বাধীন, মুক্ত, বিশুদ্ধ। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, তাকে শরীরে বন্দী হতে হয়, যে শরীর বিনাশশীল। তাহলে এই বিশুদ্ধ অবিনাশী আত্মা বিনাশী শরীরে কেন? হিন্দুর কাছে এর উত্তর নেই। বিবেকানন্দ বলছেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছে' বললেও এর উত্তর হয় না।

তাহলে সেই অবিনাশী আত্মা, সেই 'এক'—তাকে বোঝাব কী করে? সে সর্বত্র, বিশুদ্ধ, অরূপ। বৈদিক মনীষী এই শক্তিকেই পিতা, মাতা, বন্ধু বলে ভেবেছেন। এই বিশ্বের প্রচণ্ড ভার সেই শক্তি যদি বহন করতে পারেন, তাহলে এই ছোট জীবনের ভারটিও বহন করতে তিনি সাহায্য করুন। বৈদিক মনীষীর এই যে বাণীটি বিবেকানন্দ উদ্ধার করেছেন, সেই উদ্ধৃতির পরেই বলছেন, সেই শক্তিকে পুজো করব কীভাবে? নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, প্রেমে। এই জীবনে এবং অন্য কোনও জীবনের যা কিছু আছে এবং থাকবে তাদের সবকিছুর চেয়ে এই শক্তি প্রিয়তম। তাঁকে এই প্রিয়তম ভেবেই পুজো করতে হবে। বৈদিক ঋষির মুখে প্রিয়তমের আরাধনায় এই প্রেমের যে বোধন ঘটেছে তা পরবর্তী কালে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের মুখেই পরিণতি পেয়েছে, অন্যের মনে সঞ্চারও করছেন তিনি। জলেই যার জন্ম অথচ যে জলসিক্ত নয়, সেই পদ্মপত্রের মতন জীবনে বাঁচতে হবে। ঈশ্বরের কাছে কিছু প্রাপ্তির জন্যে, বা জন্মান্তরের আশায় নিজেকে সমর্পণ করা ভাল। কিন্তু শুধু ভালবাসার জন্যেই তাঁকে ভালবাসা বোধহয় আরও ভাল। 'বিদ্যা, অর্থ, সন্তান কিছুই চাই না। তোমার ইচ্ছেতে যদি জন্ম থেকে জন্মান্তরে যেতে হয় তাতেও রাজি, কিন্তু আমাকে যদি নিঃস্বার্থ ভালবাসা দাও, তবে সেই ভালবাসাই তোমাকে নিবেদন করি।' ভারতবর্ষের এক রাজা, কৃষ্ণের শিষ্য যুধিষ্ঠির যখন শত্রু-তাড়িত হয়ে হিমালয়ের অরণ্যে সস্ত্রীক আশ্রয় নিলেন, তখন একদিন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, তোমার মতো ধার্মিকশ্রেষ্ঠ মানুষের কপালে এত দুঃখ কেন? উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, দেখ সামনের এই হিমালয়কে, বিরাট সুন্দর বলেই একে ভালবাসি। এই বিরাট সুন্দর কিন্তু আমাকে কিছুই দেয় না, তবু তাকে ভালবাসি। তেমনি, ঈশ্বর এই সমস্ত সুন্দর ও বিরাটের উৎস বলেই তাঁকে ভালবাসি। তাঁর কাছে কিছু চাই না। তিনি যেখানে আমাকে রাখবেন সেখানেই রাখুন। আমার ভালবাসায় কোনও দেনাপাওনা নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'আমার বলে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে / তোমার ক'রে দেব তখন তারা আমার হবে / সব দিতে হবে।' অর্থাৎ আমার পাওনা বলে কিছু নেই।

বৈদিক বাণীতে আত্মাই ঐশ্বরিক। শুধু সে জড়-বন্দী হয়ে আছে। পূর্ণতা তখনই আসবে যখন এই বন্ধন 'কেটে যাবে, ঝরে যাবে।' একেই বলে মুক্তি। অপূর্ণতা থেকে, মৃত্যু থেকে, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। কিন্তু এই বন্ধন খসে যাবে কীভাবে? যদিও, কেন এই অপূর্ণতা, কেন মৃত্যু, কেন যন্ত্রণা—এসবের কোনও উত্তর নেই। 'ঈশ্বরের ইচ্ছে' বললে ব্যাখ্যা হয় না, তবু বিবেকানন্দ বলছেন, সেই অবিনাশী শক্তি যেহেতু অজর, অক্ষয়, অমর—অতএব বিশুদ্ধ, সেইজন্যেই আমাদের মতো অপূর্ণ ও বিনাশী জীবকে তাঁরই দয়ার অপেক্ষায় থাকতে হবে। সে দয়া আসবে কীভাবে? বিশুদ্ধ, অকলঙ্ক হওয়াই তাঁকে পাওয়ার একমাত্র শর্ত। হৃদয়ের বক্রতা থেকে সারল্যের পথে, জটিল থেকে সহজে। তখনই সমস্ত সন্দেহের নিরসন। তখন আর সে কোনও দুঃসহ কার্যকারণের অস্বাভাবিক ফল নয়। সে নিছকই সহজ এবং শুদ্ধ।

হিন্দুর কাছে এই হল 'ঈশ্বরিত' মানুষ। কোনও বাক্যে বা তত্ত্বে তার আস্থা নেই। যদি এই ইন্দ্রিয়ময় অস্তিত্বের ওপারেও অস্তিত্ব বলে কিছু থাকে, তাহলে হিন্দু তার মুখোমুখি হতে চায়। যদি তার মধ্যে জড় ছাড়াও আত্মা বলে কিছু থাকে, যদি সে আত্মা দয়াময়

কোনও সার্বজনীন শক্তি হয়, তাহলে হিন্দু তার মুখোমুখি হবে, কারণ, সমস্ত সন্দেহই তার দূর হওয়া চাই। 'আমি আত্মাকে দেখেছি, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি'—এইটিই তার কাছে একমাত্র প্রমাণ, তা শুদ্ধতার শর্ত। কোনও শাস্ত্রবচনে বা সংস্কারে তার বিশ্বাস নেই। প্রমাণ বিশ্বাসে নয়, প্রমাণ তার নিজের অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে। Being এবং becoming-এ।

তাহলে আত্মা হল শাশ্বত, অমর, অনন্ত, শুদ্ধ। আর মৃত্যু এক দেহ থেকে অন্য দেহে রূপান্তর। তার বর্তমান রূপ পাই তার অতীত কর্মপ্রচেষ্টায়, তার ভাবী রূপ পাই বর্তমানের কর্মসাধনায়। এখন প্রশ্ন, তাহলে আমরা কি ঝোড়ো সমুদ্রে ঢেউয়ের বুকে দোল-খাওয়া এক-একটি খেয়া নৌকার মতো? আমাদেরই ভালমন্দ কাজের ফলে ওঠা-নামা করছি? অসহায়, অক্ষমের মতো কার্যকারণের নিরাসক্তির শিকার হয়ে চলেছি? কিংবা কার্যকারণের চক্রে পিষে যাওয়া পতঙ্গের মতো, যে নিষ্ঠুর চক্র বিধবার অশ্রু বা অনাথের কান্নার জন্যে অপেক্ষা করে না? ভাবলে হয়তো বিষণ্ণ হয়ে পড়ি কিন্তু প্রকৃতির নিয়মই তো এই। তাহলে কোনও আশা নেই? এই পেষণের থেকে কোনও নিস্তার নেই? এই আর্তস্বর সেই দয়াময়ের কাছে পৌঁছোয় কিনা জানি না কিন্তু এক বৈদিক মনীষীর জলদস্বর নেমে আসে আমাদের কাছেঃ 'ওহে অমর শিশুরা, তোমরা যারা ঊর্ধ্বলোকবাসী তারা শোনো, আমি সেই আদি এক-কে জেনেছি যিনি সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত মায়ার ওপারে। একমাত্র তাঁকে জেনেই এই মৃত্যুরীতি পার হতে পারা যায়।' বিবেকানন্দ বলছেন, এই দিব্যধামবাসী দেবশিশুরই সন্তান এই মানবশিশুরা তাহলে নিশ্চয় 'পাপী' নয়! এই সিংহশক্তির মানুষরা কোন কারণেই পাপী হতে পারে না, দুর্বল ভীরু মেষ হতে পারে না। তারা জড় নয়, শরীর নয়, তারা মুক্ত, শাশ্বত, আশীর্বাদধন্য আত্মা। শরীর তাদের দাস, তারা শরীরের দাস নয়।

কাজেই বৈদিক মনীষীর চোখে মানুষ এই নিষ্ঠুর 'অক্ষমা'র দাস নয়। কার্য-কারণের শৃঙ্খলে বন্দী পশুও নয়। এই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে, এই জড়শক্তির প্রতিটি অণু-পরমাণুর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে সেই আত্মা, 'যাঁর আদেশে হাওয়া, আগুন, মেঘ আর মৃত্যুর নিরন্তর ক্রিয়া চলেছে।'

এই সর্বশক্তিমানের কী রীতি? তিনি তো আমাদের পিতা, মাতা, বন্ধু ও সমস্ত প্রেরণারই উৎস। তাঁকে পাব কীভাবে? কীভাবে আমরা শুদ্ধ মুক্ত পূর্ণ হতে পারি? আগেই বলেছি, উপলব্ধিতে। শাস্ত্রবচনে নয়, অস্তিত্বের অনুভবে ও ক্রমবিকাশের উপলব্ধিতে। এই 'ঈশ্বরিত' হয়ে ওঠাতেই হিন্দুধর্মের পরম সার্থকতা। এই পরম পূর্ণতা সার্বভৌম। পূর্ণতার এই প্রাপ্তিতে সেই বিশ্বচৈতন্যকেই উপলব্ধি করা সম্ভব। তখনই এই বন্দী ব্যক্তিত্ব মুক্তি পাবে। তখন বেদনা নেই, ত্রুটি-বিচ্যুতির যন্ত্রণা নেই, তখন অবিচ্ছিন্ন রূপান্তরশীল এই জড় সমুদ্র থেকে অদ্বিতীয় চৈতন্যে পৌঁছে যাওয়া। বিজ্ঞানও তো এক মৌল শক্তিতে পৌঁছাতে চাইছে। সেই বিচিত্র মৃত্যুময় বিশ্বের ভিতরকার এক প্রাণের বীজে, রূপান্তরের আড়ালে এক দৃঢ়ভূমিতে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য সেই একই।

বিবেকানন্দের ধারণা, বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাই শেষ পর্যন্ত পৌঁছোবে সেই এক সত্যে যা 'সৃষ্টি' নয়, 'প্রকাশ' (creation নয়, manifestation)। সৃষ্টির মৃত্যু আছে, প্রকাশের মৃত্যু নেই। বৈদিক কাল থেকে মূল শক্তিকে যে অবিনাশী, অনন্ত বলা হয়েছে তা-কেই

বোধহয় বিজ্ঞানও প্রমাণ করতে চলেছে।

ঈশ্বরিত মানুষের এই ব্যাখ্যা ছেড়ে বিবেকানন্দ গেছেন অন্য প্রসঙ্গে, দেবদেবীর কল্পনায়, প্রতিমা নির্মাণে, ধর্মস্থানে। তুলনায় এসেছে অন্য ধর্মের প্রসঙ্গ। এর মধ্যে ঈশ্বরিত মানুষের নির্ভর হিসেবে দেবকল্পনা ও প্রতিমা-নির্মাণ-প্রসঙ্গ আমাদের এই আলোচনায় জরুরি। ধর্মবোধ যদি হয় উর্ধ্বতর চৈতন্যের জন্যে ব্যাকুলতা, তাহলে সেই চৈতন্যকে অমোঘভাবেই ধরতে হয় মানসিক প্রতিমায়, চিন্তার অনিবার্য নির্ভর হিসেবেই। ল' অব অ্যাসোসিয়েশন বা অনুষঙ্গের নিয়মেই বস্তুজগতের কোনও দৃশ্য, মূর্তি বা ছবিই মানসিক ধারণার অবলম্বন। উল্টোদিক থেকে ভাবলেও বলতে হয়, মানসিক কোনও ধারণা বস্তুজগতের প্রতিমাকেই ধারণ করে। পূজার্চনায় এই বহিরাশ্রয় অবধারিতভাবেই এসে যায়। এ নিছক হিন্দুধর্মবোধ নয়; সাধারণভাবে, মানুষের কল্পনাশক্তির এই হল স্বভাব। অনন্তকে ধারণা করতে যেমন মনে এসে যায় নীলাকাশ কিংবা মহাসমুদ্র, তেমনি বিশুদ্ধ পূর্ণতাকে ধারণায় আনতে গিয়ে মঠ, মসজিদ, চার্চ, মন্দির কিংবা ক্রুশ এসে গেছে স্থাপত্যের নানা ভঙ্গিতে বা প্রতীকের দ্যোতনায়। সবই প্রতিমা কিন্তু প্রতিমাকে অতিক্রম করে গেছে ধ্যানের গরিমা। ঈশ্বরিত হতে গেলে ঈশ্বরকে ধ্যানে ধারণায় আনতে হয়। মঠ-মসজিদ, চার্চ বা পুঁথিপত্র সেখানে নির্ভরমাত্র। আদিম মানুষের গাছপাথরনির্ভর দেবকল্পনা থেকে শুরু করে উচ্চতম সার্বভৌমত্বের কল্পনা, সবই সেই অনন্তকে ধ্যানে আনবারই চেষ্টা। বিবেকানন্দ বলছেন, তারুণ্যদীপ্ত ঈগলের মতই সে ক্রমাগত উঠে যাচ্ছে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র-সূর্যের কাছে। কোনও শাস্ত্রনির্দেশ মানা বা না মানা নয়, শুধু সেই অতুলনীয় অনন্তকে ধারণায় আনা, মূর্তি যদি থাকে তাহলে তা হবে পেরেকের মতো যাতে অনন্তের ধারণার ছবিটি টাঙানো হবে। আত্মশুদ্ধির জন্যে সে আগুনে আত্মাহুতি দিতে পারে, কিন্তু অন্য ধর্মে আগুন দেবে না। যদি দেয় তাহলে সে ধার্মিক নয়, ধর্মান্ধ।

হয়তো বৌদ্ধ বা জৈনরা ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করেন না কিন্তু তাঁদের নিহিত ধর্মবোধ এইটেই প্রমাণ করে যে, মানুষের মধ্য দিয়ে তাঁরা ঈশ্বরের প্রকাশই ঘটাতে চান। এ তো সব ধর্মেরই মূল কথা। অন্যেরা হয়তো পিতাকে দেখেনি, দেখেছে পুত্রকে। আর পুত্রকে যদি দেখে থাকে তাহলে পিতাকে তারা নিশ্চয় দেখেছে। মূল লক্ষ্যের কথা ভাবলে শাস্তি, বিদ্বেষ বা অসহনীয়তার প্রশ্ন ওঠেই না। জাগ্রত বোধের দীপ্তি বুদ্ধির খণ্ডতাকে অবশ্যই ম্লান ক'রে দেবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' ব্যাখ্যায় 'ব্যক্তিত্ব'-কে বড় দেখেছেন। হয়তো ভিত্তি হিসেবে 'ব্যক্তি' থেকে শুরু করেননি। বিবেকানন্দ, কিন্তু যখন তিনি বলেন, নিজেকে 'শরীর' হিসেবে নয়, অব্যয়, অক্ষয় আত্মা হিসেবেই বুঝতে হবে, তখন ব্যক্তি মানুষ হিসেবেই সেই চিন্তা করতে হবে, এ-কথা তিনিও বোঝাতে চান। এই বোধ অন্যের বচনে, পুঁথি-পড়া বিদ্যাতে তো আসে না। যখন নৈরাশ্যের 'নখরছিন্ন' [রবীন্দ্রনাথের কথায়] মানুষ জীবনচক্রে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে তখন বৈদিক মনীষী যে বলেছিলেন, 'আমি তাঁকে জেনেছি', তখন বুঝতে হবে, ব্যক্তি হিসেবেই তাঁর সে বোধ এসেছিল এবং সেই বোধেই উদ্দীপ্ত হয়ে 'Children

of Immortal Bliss' যে মানুষ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'তোমরা অনন্ত, তোমরা মুক্ত'। কিন্তু এই বোধ তো অন্যের মুখে শুনে আসে না, পড়ে-শুনেও আসে না। খানিকটা সঞ্চারিত হয়। তারপর কাজ শুরু করে, তারপর তাকে ধারণায় ধরতে হয়, উপলব্ধি করতে হয়। যা শেষ পর্যন্ত উপলব্ধির বস্তু তা যে ব্যক্তিগতভাবেই আসে এ কথা রবীন্দ্রনাথ খুব জোর দিয়েই বলেছেন। এই উপলব্ধিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দি ওয়ার্লড্ অব পার্সোনালিটি' বক্তৃতায় (আমেরিকায় প্রদত্ত, 'পার্সোনালিটি' বই-এর অন্তর্ভুক্ত) বলেছেন রিয়্যালিটি বা বাস্তবতা। এ বাস্তবতা মানুষের ব্যক্তিত্বেরই অন্তর্গত, তার বোধের অর্ন্তগত, কিন্তু তার যুক্তির অন্তর্গত নয়। যুক্তির বড় ভূমিকার অপরিহার্যতা মেনে নিয়েও বলতে হয়, মানুষের যে গভীরতম 'বোধ' তার ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে সেই ব্যক্তিত্ব থেকে 'যুক্তি' একটু দূরেই থাকে।

বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন, যে কোনও কারণেই হোক, বিনাশশীল শরীরে অবিনাশী আত্মা বন্দী হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রক্রিয়াটিকেই অসীম ও সীমার সম্পর্কে দেখতে চান এবং এই সম্পর্ক বিশ্লেষণে তিনি বিজ্ঞানকেও টেনে এনেছেন। যে বাস্তবতা আমরা বিচিত্ররূপে দেখি তার মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে এবং বিশ্ব সেই একেরই বিচিত্র প্রকাশ। বিজ্ঞান এই বিচিত্র প্রকাশের ভিতরকার বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিত ও বর্ণবৈচিত্র্যকে দেখতে চায়, কিন্তু একটি ছবির মধ্যে যে বর্ণমিশ্রণ থাকে তা তো ছবি-আঁকিয়ের ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। কিন্তু বিজ্ঞান সেই ব্যক্তিত্বটিকে দেখে না। যে অনন্ত অসীম বা অরূপ (তিনটিই রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত পদ) রূপেব মাধ্যমে প্রকাশ পায় সেই মাধ্যমটিই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। দেশ কাল রূপ এবং গতির মধ্যেই সেই মাধ্যমটি প্রকাশিত। এ হল যুক্তির দেখা। সৃষ্টির মধ্যে যে বিচিত্র ছন্দ-স্পন্দন চলছে, বিচিত্র নিয়ত পরিবর্তনশীল রূপের মধ্যে যার প্রকাশ তার মধ্যে যে সার্বজনীন যুক্তির পারম্পর্য চলছে তাকে দেখা।.এ দেখাকে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে ইউনিভার্সাল রীজন্ বা 'বিশ্ববুদ্ধি' বলতে পারা যায়।

কিন্তু বিশ্ববুদ্ধির আড়ালে যে বিশ্বমন বা ইউনিভার্সাল মাইন্ড্ কাজ করছে তার ছন্দ-স্পন্দন ধরা পড়ছে যে তন্ত্রীগুলিতে সেই তন্ত্রীগুলিই এক-একটি ব্যক্তিমন। দেশ কালের মধ্যে সেই তন্ত্রীগুলিই ব্যক্তিমন হয়ে বেজে উঠে সাড়া দিচ্ছে। এই তন্ত্রীগুলির গুণ, পরিমাণ ও স্বরভঙ্গি সবই আলাদা-আলাদা এবং সেসব সুর এখনও নিখুঁত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাদের রীতিনীতি 'বিশ্বমন'-এর নিয়মেই বাঁধা, সীমার বাজনায় বেজে উঠছে। কিন্তু বাজাচ্ছেন সেই অবিনাশী শাশ্বত বাদক, যাঁর নৃত্যসঙ্গীতের তালে তালে বিদ্রোহী পরমাণু থেকে চন্দ্রভানু ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত বিবশ অবস্থা ছেড়ে, প্রাণবেদনায় ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছেঃ 'the Eternal Player plays his dance—music of creation.'

এই অনন্ত অবিনাশী অরূপের আবির্ভাব যেমন ঘটছে রূপের সীমায়, অন্যদিকে রূপের ব্যাকুলতাও চলেছে সেই অরূপের উপলব্ধির জন্যে, তাকে ধ্যানে পাবার জন্যে। এই পারস্পরিক অভিমুখীনতাকে বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই মর্মস্পর্শীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বিবেকানন্দের বাচনে এই আত্মিক অভিযান. যেমন দুঃসাহসিক স্পর্ধায় প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কাছে এই অভিযান যেন কাব্যিক অভিসারের অন্ধকার

যাত্রাপথে নক্ষত্র-স্পন্দনের রোমাঞ্চ পেয়েছে। সত্যসন্ধানে বিবেকানন্দ যেন দুর্ধর্ষ অশ্বশক্তি নিয়ে মানুষের হৃৎপিণ্ড থেকে ঈশ্বরকে টেনে এনে বলছেন ঃ 'Every religion is only evolving a God out of the material man, and the same God is the inspirer of all of them' এবং সেইজন্যই প্রায় হুঙ্কার ছেড়েই বলছেন ঃ 'to gain this infinite universal individuality, this miserable little prison-individuality must go.' এই miserable prison-কে কবি বিবেকানন্দ তাঁর কবিতায় তীক্ষ্ণ আবেগে ভেঙে দিয়ে এক লহমায় অনাদি সৃষ্টধারাকে দেখে নিয়েছেন। তাঁর মধ্যে যে রূপকারটি বসে আছে সে তীব্র বেদনায় মৃত্যুশীল এই মায়া-পর্দাকে ছিঁড়তে চেয়েছে। তাঁর সাধনায় গোপন নিভৃতি নিশ্চয় আছে, কিন্তু তার প্রকাশে এক দুর্মর শক্তি যেন উচ্চকিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা মূলত শান্ত বিচারশীল কবি-সাধকের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু পথ একই। যে অনন্তকে ধ্যানে ধরবার জন্যে বিবেকানন্দ কৃষ্ণপ্রেমের প্রত্যাশাহীন আত্মসমর্পণের সাধনাকেই চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই বৈষ্ণব প্রেমকেই আমাদের দেহবাসী ব্যাকুল আত্মার কাছে পরম আহ্বান বলেই জেনেছেন। যে 'পরম' বিবেকানন্দের ভাষায়, 'infinite universal individuality—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেই হল—'Supreme Person, Person, the Greatest' Master, the Eternal Player অথবা Lover. তাঁর 'Personality' কিংবা 'Religion of Man' বইটির নানা প্রবন্ধে এই অতিমানব মহাশিল্পীর নানান খেলা রূপ-অরূপের সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। বিবেকানন্দের কাছে মানুষ ঈশ্বরিত হয় তখনই যখন তারই ঈশ্বর তার মধ্যে প্রকাশ পান, তাঁরই দয়ায় দীপ্ত হয়ে ওঠে মানুষ! কিন্তু তাঁরও একটা অপেক্ষা থাকে, মানুষের শুদ্ধতার সাধনাই সেই অপেক্ষার অবসান ঘটায়। সেই আত্মিক সাধনা বিবেকানন্দ-ভাষায় ঃ 'a young Eagle soaring higher and higher, gathering more and more strength till it reaches the Glorious Sun.' একদিকে দয়া আর এক দিকে ঊর্ধ্বায়নের শ্রমসাধনা। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে religion আসলে তাঁর a poet's religion, সেখানেও দেখি, নীল আকাশের বৃষ্টি আর মাটির ঝর্ণার মেশামেশি। সেই মহাপ্রেমিক মহাশিল্পীর বাঁশিতে নানা ছিদ্রের নানা সুর, প্রেম ও সুন্দরের কত বিচিত্র ইশারা দিচ্ছে। সে ইশারা তাঁর নিজের মধ্যে আছে, প্রকৃতির মধ্যেও আছে। সে সুর আমাদের আহ্বান করছে, আমরা যেন আত্মকেন্দ্রিকতার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে সেই মহাপ্রেমকে বুঝতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বাউলদের গানেও এই খোলস-ছাড়া 'মনের মানুষ'কেই দেখেছেন। দেখেছেন জরথুস্ত্রের বাণীতেও, যেখানে একটি গোষ্ঠীদেবতা মুক্তি পেয়েছে বিশ্বমানবদেবতার মধ্যে—'God who is God and man at the same time'. কাজেই বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই ধর্মের মানুষকে দেখেছেন মানুষের ধর্মে।

ধর্মের মানুষ যখনই বুঝেছে 'আমি জেনেছি', তখনই আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বে সে পৌঁছে গেছে। অন্যদিকে যাকে জানা হল সেই 'the other'—সেও সচেতন হয়ে 'আমি'র সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে অনন্তকাল ধরেই। রবীন্দ্রনাথের চোখে সেই 'the other' হল 'self conscious personality' যাকে বিবেকানন্দ বলেছিলেন 'ever active providence'—তফাতটা কোথায়?

বিশ্বে বিবেকানন্দ

পবিত্রকুমার ঘোষ

সূর্যের উদয় কখনও মধ্য গগনে হয় না। কিন্তু আত্মপ্রকাশ মুহূর্তেই বিবেকানন্দ ছিলেন মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে ভাস্বর। তাই তাঁর আলোর সবটুকুই আলো। সে আলোয় ছিল না ছায়ার প্রশ্রয়। বিবেকানন্দের সঙ্গে সূর্যের সাদৃশ্য স্বপ্রকাশধর্মে। আঙুল দেখিয়ে চিনিয়ে দিতে হয়নি তাঁদের। প্রয়োজন হয়নি প্রচারের, বাদ্যভাণ্ডের। প্রকাশেই তাঁদের প্রচার। আপামর জনকে অকৃপণভাবে আলোকদানেও সূর্যের সঙ্গে বিবেকানন্দের আছে মিল। তাঁদের কাছ থেকে আলোর আশীর্বাদ পেতে হাতজোড় করে দাঁড়াতে হয় না। তাঁদের দান স্বতঃস্ফূর্ত, স্বভাবসিদ্ধ।

পার্থিব পরিচয়ে তিনি ছিলেন নরেন্দ্র। 'নরাণাং ইন্দ্রঃ'। কিন্তু যে অখণ্ড জ্যোতির্লোকে তাঁর স্বভূমি, যেখানে তাঁর অটল অধিষ্ঠান, যেখান থেকে তাঁর ক্ষণমাত্রও চ্যুতি হয় না, প্রভুর বিনতিতে পৃথিবীর ধূলিতে অবতরণসঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও, সেই মহান দিব্যধামে নরেন্দ্র ছিলেন ইন্দ্রেরও ইন্দ্র। তাঁর স্বধামে দেবতাদেরও প্রবেশাধিকার নেই। সমাধিমগ্ন আত্মস্থ সেই ঋষিদেব আবাস থেকে অনেক নীচুতে দেবমণ্ডলীর অবস্থান। ধ্যানলীন সপ্ত ঋষির শ্রেষ্ঠজনই নরেন্দ্র। পরব্রহ্ম প্রেমে গলে দিব্য শিশুর রূপ ধরে এই শ্রেষ্ঠ ঋষির গলা জড়িয়ে বলেছিলেনঃ 'আমি যাচ্ছি, তুমিও এসো।'

মর্তই ছিল তাঁদের গন্তব্যলোক। অবতরণ-লীলার সূচনাতেই পরব্রহ্ম ও পরম ঋষির প্রেমালিঙ্গন! ঋষিমণ্ডলীতে ইনি প্রেমিক। জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনে ইনি পূর্ণ থেকেও পূর্ণতর। তাঁর আনন জ্ঞানবিভামণ্ডিত। কিন্তু নয়ন দুটি প্রেমে পরিপূর্ণ; দিব্য শিশুর আহ্বানে তাই তাঁর সস্মিত সম্মতি। এই ঋষি-চরিত্রে প্রেমের সর্বজয়িত্ব অঙ্গীকৃত ছিল বলেই সমাধিসমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে উঠে এসে ধূলিমলিন মর্তের ক্ষণভঙ্গুরতার মধ্যে ঝাঁপ দিতে তিনি রাজি হলেন।

অখণ্ডের ঘরে সমাধিলীন অবস্থান থেকে খণ্ড ও খণ্ডিতের ভূমিতে অবতরণ। ঠাকুর জানতেন, পৃথিবীতে দানযজ্ঞ শেষ হওয়া মাত্র নরেন্দ্র স্বধামে ফিরে যাবে। এখানকার কাজ সমাপন করার আগেই সে যদি চোঁ-চোঁ দৌড় লাগায় তবে এবারের অবতরণ-লীলাই হবে অসফল। তাই ঠাকুর নরেন্দ্রের ঘরের চাবিটি নিজের কাছে রাখলেন।

পৃথিবীতে মাতৃতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ছিল রামকৃষ্ণাবতারের প্রধান দায়। মাত্র যে দুই জনের

কাছে এই দায়ের কথা তিনি বলতে পারতেন তাঁদের একজন মা সারদা, অন্যজন নরেন্দ্রনাথ। শুধু এই দুজনই জানতেন, জগতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মিশন কি! কেন তিনি এসেছেন, কোন কাজ তিনি নিজে করে গেলেন, কোন কাজের ভার জননী সারদাদেবীকে নিতে বললেন এবং বিবেকানন্দকে 'তোর ঘাড় করবে' বলে শুনিয়ে গেলেন।

বিশ্বে বিবেকানন্দের ভূমিকা বুঝতে গেলে ও তাঁর অবদানের পরিমাপ করতে গেলে দু'দিক থেকে বিচার করতে হবে। এক, জগতে তিনি কি করে গিয়েছেন, জগৎ তাঁর কাছ থেকে কি পেয়েছে। দুই, এবারের মহাবতরণের উদ্দেশ্য তিনি কিভাবে সার্থক করেছেন।

ইতিপূর্বে কোনও অবতারলীলায় যা হয়নি তেমন একটি ইচ্ছা হয়শো সম্পূর্ণ হয়েছিল রামকৃষ্ণাবতারের কালে। অদ্বৈতসিংহকে তিনি তাঁর বাহন করেছিলেন। অদ্বৈতের দ্বৈতভাগেই সিদ্ধ হয় অবতারলীলা। তাই দ্বৈতভাগে মুগ্ধতা স্বীকার করে নেন লীলাসঙ্গীরাও। নইলে খেলা জমে না। রামের লক্ষ্মণ, কৃষ্ণের অর্জুন, বুদ্ধের আনন্দ, চৈতন্যের রামানন্দ, সবাই দ্বৈতবুদ্ধিযুক্ত পার্ষদ। অবতারলীলার ইতিহাসে বিবেকানন্দই প্রথম পুরুষ যিনি কখনও দ্বৈতের ভাগ স্বীকার করেননি। বিশ্বের জনারণ্যে একক সিংহের মতো তিনি পাদচারণা করে গিয়েছেন। এই অদ্বৈতসিংহকেই এযুগে ঈশ্বরের প্রয়োজন ছিল।

কেননা আধুনিক যুগে যে জগৎ জাত হচ্ছে তা সেই পুরোনো দিনের ছোট ও খণ্ড সীমায় আবদ্ধ জগৎ নয় ; তা উদার একবিশ্ব। এমনকি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—এই দুই গোলার্ধও আর বিচ্ছিন্ন নয়। বিচ্ছিন্নতার দেয়ালগুলি ভেঙে পড়ছে। যে স্বার্থবোধ সংকীর্ণতাকে আঁকড়ে থাকার প্রেরণা দেয় শুধু সেটুকু সম্বল করে কোনও দেশ ও জাতিরই আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এই বোধেরই প্রতিফলন ঘটেছে রাষ্ট্রসংঘ-নির্মাণে।

জায়মান একবিশ্বকে খণ্ডভাবের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করতে, মানবজাতিকে অখণ্ডতার চেতনায় উত্তীর্ণ করতে অদ্বৈতপুরুষের প্রয়োজন ছিল। বনের বেদান্তকে ঘরে আনার মহাব্রত পালন এযুগেই ছিল অবশ্যকরণীয় ও অনিবার্য। বিবেকানন্দ সেই মহাব্রতের আচার্য, জগদ্‌গুরু।

ইতিহাসে সব মহাযুগই আনে নতুন জীবনদর্শন, নতুন ধর্মবোধ। মহাযুগ চিহ্নিত হয় নতুন সভ্যতার স্ফুরণে ও বিকাশে। নতুন দর্শন ভিন্ন নতুন সভ্যতার বনিয়াদ গড়া যায় না। সভ্যতার প্রাণশক্তি তার দর্শনে। এমনকি মহাযুগের অন্তর্গত যেসব খণ্ড যুগ সেগুলির বেলাও একই কথা সত্য।

ইদানীংকালের, মাত্র একশ বছর বা তার কিছু বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। বিবেকানন্দ জগতে বেদান্তপ্রচার করার অব্যবহিত আগে অপর একটি নতুন দর্শন প্রচারিত হয়েছিল। সে দর্শন ও মতবাদও ছিল আন্তর্জাতিক ভাবনায় সমৃদ্ধ। সেই নতুন ভাবতরঙ্গের মধ্য থেকে যে মুখ্য ধ্বনিটি উঠে এসেছিল তাতেও ছিল একবিশ্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। 'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও' শ্লোগানটিতে দেশগত সীমার পরপারে বিশ্বের সব শ্রমজীবী জনকে একত্র করার আকূতি ছিল।

কিন্তু এই দর্শন চৈতন্যের উৎসমূলকে অস্বীকার করে খণ্ডবোধকেই করেছে নিজের প্রত্যয়-ভিত্তি। খণ্ডবোধ স্বার্থ, সঙ্কীর্ণতা, দ্বেষ, হিংসা ও হানাহানির দিকে শুধু নিয়ে যায় না, এসবকেই একান্ত সত্য বলে মানে। আধুনিক যুগের দর্শন বলে—মার্ক্সীয় ভাবনায়

একবিশ্বের আভাস ছিল কিন্তু শ্রেণী-সংঘাত তথা শ্রেণী-যুদ্ধকে মুখ্য ইস্যু করে তোলায় এই দর্শন গোড়া থেকেই হয়ে দাঁড়ায় অখণ্ডতাবোধের পরিপন্থী। জাতিগত অহংয়ের মতবাদ নাৎসিবাদ। শ্রেণীগত অহংয়ের দর্শন মার্ক্সবাদ। এই দুই দর্শনই বিশ্বকে করেছে শোণিত-প্লাবিত, বিদ্বেষবহ্নিতে দগ্ধ। মানুষের বন্দিদশা ঘোচাবার বদলে হাত-পা ও অন্য অঙ্গের বেড়িগুলিকে করেছে আরও ভারি ও জবরদস্ত।

মার্ক্সবাদ ও নাৎসিবাদ একান্তভাবেই ক্ষমতাকেন্দ্রিক দর্শন। সে ক্ষমতাও মূলত রাজনৈতিক ক্ষমতা। তার চাপে মানুষ পীড়িত, পিষ্ট, ন্যুব্জ হয়েছে। এই দুই মতবাদশাসিত রাষ্ট্রে কারও মুখে প্রশ্নচিহ্ন ঈষৎ আভাসিত হলেও তার জন্য স্থান নির্ধারিত হত দাস শিবিরে, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে।

এজন্যই আধুনিক যুগসম্ভূত এই দুই দর্শনের ভিত্তিতে গড়া সমাজ, সভ্যতা ও রাষ্ট্র হয়েছে স্বল্পমেয়াদী। রাশিয়ায় জারতন্ত্রের তুলনায়ও সোভিয়েত তন্ত্র স্বল্পায়ু। জার্মানীর নাৎসি রাষ্ট্র দুই দশকও টেকেনি। দর্শন হিসাবেও মার্ক্সবাদ ও নাৎসিবাদে দীপ্তি ও আকর্ষণ হয়েছে অল্পকাল স্থায়ী।

আধুনিক যুগের আলোড়নকারী প্রধান দুটি দর্শনের ব্যর্থতার পটভূমিতে স্বামীজী প্রচারিত বেদান্ত তথা অদ্বৈতবাদের মহিমা আজ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। বেদান্তের জগৎ ক্রম-প্রসারিত। তার কারণ স্বামীজীর বাস্তব-বেদান্তে মানুষ ও ব্রহ্ম, মর্ত ও অমর্ত, ব্যক্তি ও জাতি, দেশ ও মহাদেশ ইত্যাদি সবকিছুর আছে স্বীকৃতি, সমন্বয় ও সংহতি। এই দর্শন বিভেদসৃষ্টির দর্শন নয়। বেদান্ত কখনও হিংসা ও বিদ্বেষমূলক রাজনীতির আশ্রয় হতে পারে না। বেদান্ত ক্ষমতাকেন্দ্রিক দর্শন নয়। মানুষের অবনয়ন, অবদমন ও উৎপীড়নে বেদান্ত সায় দেয় না। বরং বিবেকানন্দের বেদান্তে আছে সর্ববিধ বন্ধনমুক্তির আহ্বান। ঐহিক ও পারমার্থিক সব পাপ ছিন্ন করার জন্যই তিনি আমাদের দিয়েছেন অভীঃ-মন্ত্র।

স্বামীজীর দেহান্তের পর যুগচক্রের আবর্তনে দুনিয়া জুড়ে যে মানব পরিস্থিতির অভ্যুদয় ঘটেছে তাতে প্রচলিত দর্শনগুলি অবান্তর হয়ে যেতে পারে কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের জীবনধারা অব্যাহত রাখার জন্যও বেদান্তদর্শনের উপযোগিতা ক্রমশ ব্যাপকভাবে উপলব্ধ হচ্ছে। খণ্ড দৃষ্টি, খণ্ড বুদ্ধি ও খণ্ড বোধ থেকে উত্তরণ না ঘটলে মানুষের ভবিষ্যৎ যে আঁধারে ছেয়ে যাবে, এমনকি তার অস্তিত্বই বিপন্ন হবে, এই বোধ প্রতিদিন হচ্ছে ঘনীভূত।

বিশ শতকের সূচনালগ্নে বিবেকানন্দের দেহরক্ষা; অন্ত্যলগ্নে যেন তাঁর পুনরুত্থান। তিনি চলে যাবার পর প্রায় এক শতাব্দী জুড়ে যে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে মানুষ তা নিষ্ঠুর, করুণ ও মর্মন্তুদ। বিশ্বযুদ্ধ হল, যার প্রাক্ নজির ইতিহাসে নেই। তাও একবার নয়, দুবার। প্রথমবারের মহাসমর যেভাবে সমাপ্ত হয়েছিল ও পরাজিত দেশের ওপর যে চুক্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাতেই ছিল দ্বিতীয় দফার প্রলয়ের সূচনা। এই দুই যুদ্ধের পিঠোপিঠি এসেছিল রক্তক্ষয়ী বিপ্লব, ইউরোপে ও এশিয়ায়। কোটি কোটি নরমুণ্ডের ওপর স্থাপিত হয়েছিল বিপ্লবোত্তর কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যের আত্মম্ভরিতাখচিত সিংহাসন। অন্যদিকে কমিউনিজম রোধের নামে উঠে দাঁড়াল যে প্রতিস্পর্ধী শক্তি, তারও চরিত্র দানবিক। মহাযুদ্ধ থামলে এল ঠাণ্ডা যুদ্ধের কাল। পৃথিবী তখনও দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত।

বিবেকানন্দ-উত্তর যুগ বিশ্বব্যাপী বিরোধ ও সংঘাতের যুগ। যুদ্ধ, বিপ্লব ও ধ্বংসযজ্ঞের কাল। কিন্তু এসবেরই ভিতর দিয়ে অখণ্ডমানবতার ঐক্যবীজও হয়েছে অঙ্কুরিত। রাষ্ট্রসংঘ এই ঐক্যের বাতায়ন। ইনফরমেশনের বিস্ফোরণ সব দেশের ঘেরাটোপকেই অকেজো করে দিয়েছে। লৌহযবনিকাগুলি হয়েছে উৎখাত। কোনও সমাজই আব্রু আঁটা হয়ে আর বাস করতে পারবে না। কোনও দেশ বিশ্বকে দূরে ঠেকিয়ে রেখে আত্মমগ্ন হয়ে থাকার সুযোগ পাবে না। পর্দাঘেরা জাতীয় জীবন আর ফিরবে না। সংকোচন ও সংকীর্ণতার কাল হয়েছে অস্তমিত।

ইনফরমেশন বিস্ফোরণের ফলে কোনও দেশ লুকিয়ে কাজ করতে পারছে না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হাঁড়ির খবর জানে। মাটির তলার গোপন কুঠিতে কে কোন নিষিদ্ধ বস্তু সঞ্চয় করেছে, দুর্ভেদ্য যবনিকার আড়ালে কে নির্মাণ করছে মহামারণাস্ত্র, কোন বনঘেরা নির্জন জমিতে চলছে চরস-আফিং-এর চাষ ও চোরা পথে চলছে মাদকের বেসাতি, 'উপগ্রহে'র শ্যেনচক্ষু তা সবই দেখে ফেলছে। অন্যকে ফাঁকি দিয়ে দূরে ঠেকিয়ে রাখা আর যাবে না। প্রবঞ্চনা-প্রতারণার দিনও হয়ে এসেছে শেষ।

তাই পরস্পরকে মেনে নেওয়া, বোঝা ও সহানুভূতিশীল হওয়া—এযুগে জাতিসমূহের বাঁচার প্রাথমিক শর্ত। জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনও দেশের পক্ষে আত্মরক্ষা করা যেমন সম্ভব নয়, অন্যের প্রতি অসূয়াপোষণ ও প্রভুত্বের বোধ বজায় রাখার দিনও হয়েছে বিগত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পোষণমূলক ব্যবস্থাগুলি এখনও রদ হয়নি, অপরের মূল্যে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতেও কোনও দেশ বিরত নয়। কিন্তু তারই পাশাপাশি এই চেতনাও বেড়ে চলেছে যে, বর্তমান বিশ্বে কেউ কাউকে বাদ দিয়ে কোনদিন বাঁচতে পারবে না। অন্যকে ধ্বংস করে নিজে সমৃদ্ধ হবার স্বপ্ন দেখা হয়ে যাবে বাতুলতা।

অন্যদিকে, পৃথিবী সংঘাতমুক্ত হয়ে যায়নি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্য ও সৌভ্রাত্র হয়নি প্রতিষ্ঠিত। আজও আঞ্চলিক যুদ্ধের যেন অন্তই নেই। ভারতের সীমান্তরেখা জুড়েও বারবার বেজেছে রণদামামা। চীন ও পাকিস্তান করেছে ভারতকে অস্ত্রাঘাত। একই ধর্ম ও একই ইডিওলজি শাসিত দেশগুলির মধ্যেও হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। যথা ইরাক-ইরানে, যথা চীন-ভিয়েৎনামে। কিন্তু এসবই খণ্ড যুদ্ধ, অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ। দিগন্তে নেই নতুন বিশ্বযুদ্ধের আভাস।

রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পালাও পেরিয়ে এসেছি আমরা। বিশ শতকের দুনিয়া কাঁপানো দুটি বিপ্লব, রাশিয়া ও চীনের মহাবিপ্লব, স্বামীজীর দূরবিসারী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। ইউরোপ যে বারুদস্তূপের ওপর বসে আছে তাও তিনি স্পষ্ট দেখেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ লগ্নে স্বামীজী যুদ্ধ ও বিপ্লবের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তাঁর সেইসব হুঁশিয়ারি অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে বিশ শতকে।

স্বামীজী কি শুধু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? না, তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টির সামনে ভাবী যুগের খণ্ডচিত্রই শুধু উদ্ভাসিত হয়নি। সৃষ্টির ধারাটি কি তা তিনি জানতেন। দুর্যোগ ও প্রলয় মাথায় করে মানবযাত্রীকে চলতে হবে যুগ থেকে যুগান্তরের পানে, একথা স্বামীজীর চেয়ে আর কে বেশি বুঝেছে?

বিশ্বজুড়ে রুদ্রের প্রলয়নৃত্য স্বামীজী দেখতে পাচ্ছিলেন। আযৌবন তিনি নটরাজকে

আহ্বান করেছেন। বরানগরের তপোভূমিতে নরেন্দ্রের আধারে যিনি জেগে উঠছিলেন তিনি স্বয়ং সেই নটরাজ ভোলানাথ। বসানো শিব নয়, পাতাল-ফোঁড়া শিব! ঠাকুর নিজমুখে সেকথা বলে বহুদিন আগেই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশেই ঝঞ্ঝার মতো ভেঙে পড়েছিলেন পশ্চিমের মহাকাশে। খ্রীস্টীয় মিশনারিরা মোকাবিলায় নেমে অল্পদিনেই বুঝে গিয়েছিলেন, এ ঝড় অপ্রতিরোধ্য। সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ঐ ঝড় ছিল অনিবার্যও। মেরী লুইস বার্কের অনুসরণে বলব, পাশ্চাত্যে কখনও কোনও প্রাচ্য অবতারের পদচিহ্ন পড়েনি। পশ্চিমী ভূখণ্ডে প্রথম যে অবতার পদার্পণ করেছেন তিনিই স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর শ্রীচরণস্পর্শে পাশ্চাত্য জগৎ সঞ্জীবিত হয়েছে। পশ্চিমী সভ্যতা পেয়েছে পূর্ণের পদপরশ।

১১ এপ্রিল, ১৯০০। উনিশ শতক শেষ হয়ে যাচ্ছে। চৈত্র সংক্রান্তি আসন্ন। আমেরিকার একটি ছোট শহর আলামিডায় স্বামীজী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বিষয় 'দি আলটিমেট ডেস্টিনি অব ম্যান', মানুষের চূড়ান্ত নিয়তি। এই বক্তৃতার অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে শ্রোতাদের মধ্যে একজন লিখেছেনঃ তিনি এক পা এক পা করে অদ্বৈতের শিখরে আমাদের নিয়ে গেলেন। তারপর নিজের বুকে হাত রেখে বললেনঃ 'আমি ঈশ্বর।' শ্রোতৃমণ্ডলী স্তব্ধ।

শ্রীমতী লুইস বার্ক লিখেছেন, সেদিন স্বামীজী নিজেকে ঈশ্বর বলেছিলেন অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বেদান্তবাক্যের প্রতিধ্বনিই শুধু তিনি করেননি, বরং তিনি বলেছিলেন, আমিই সেই ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর। 'A tremendous statement indeed'—শ্রীমতী বার্কের অভিমত।

আলামিডায় প্রকাশ্যসভায় নিজেকে ঈশ্বর বলার আট-দশ দিন আগে বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ 'আমি সচ্চিদানন্দ। নৈর্ব্যক্তিক। সতত ব্রহ্ম-আলিঙ্গিত। ব্রহ্মই।'

'ব্রহ্ম এবং ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর একই। ঈশ্বর ও ঈশ্বরপুত্রও এক। যিনি নিজেকে ব্রহ্ম বলে জানেন তিনি ব্যক্তি-ঈশ্বররূপে নিজেকে প্রক্ষেপ করতে পারেন।' এই উক্তিগুলি স্বামীজীর। আলামিডায় পূর্ণ স্বরূপ-উন্মোচনের কয়েকদিন আগে নিজের অবস্থার কথা এভাবেই তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন সানফ্রান্সিস্কোয়।

স্বামীজী তখন উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়ায়। তাঁর বেদান্ত ক্লাসের একজন ছাত্রী বলে উঠলেনঃ 'আঃ, যদি আগে জন্মাতুম! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পেতুম!' অন্যত্র ভক্তের মুখে এরকম প্রশ্নের জবাবে মা সারদা বলেছিলেনঃ 'কেন আমাকে তো দেখেছ! ঠাকুর ও আমাকে অভেদ জানবে।' স্বামীজীও সরাসরি বললেনঃ 'আমিই সেই। ঈশ্বর। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।' ঠাকুর নিজেই তাঁকে নিজ মুখে বলেছিলেনঃ 'তুই আর আমি কি আলাদা? এ পিঠ ওপিঠ।'

ঠাকুরের ওপিঠ বিবেকানন্দকে অবতাররূপেই দেখেছিল পশ্চিমী ভক্তমণ্ডলী। এঁদের একজন ক্যালিফোর্ণিয়ার ডাঃ মিলবার্ন হিল লোগান। এই প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার যেমন ছিলেন বিজ্ঞানে অনুসন্ধিৎসু, তেমনই অধ্যাত্মপিপাসু। তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে, স্ত্রী এবং ভগিনীর বিরোধিতা সত্ত্বেও, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, তুরীয়ানন্দ এবং ত্রিগুণাতীতানন্দকে আতিথ্য দিয়েছিলেন। তাঁর উৎসাহ এতদূর ছিল যে, পারিবারিক বিরূপতা অগ্রাহ্য করে নিজের ঐ

বাড়িতেই তিনি বেদান্ত সোসাইটির সদর দপ্তর বসিয়েছিলেন। স্বামীজী তাঁর বাড়িতে যে কয়দিন অতিথিরূপে বাস করেছিলেন সে কয়দিনের স্মৃতিকথা লিখেছেন ডাঃ লোগান। স্বামী অভেদানন্দকে এই প্রসঙ্গে লেখা এক পত্রে তিনি জানিয়েছিলেনঃ

স্বামীজী চলে যাবার পর বিষাদের মুহূর্তগুলি ছেয়ে ফেলল। মনে হত, সব দেবতাই আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন। কেননা তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই তাঁর দিব্য উপস্থিতি ছড়িয়ে দিত শান্তি ও প্রশান্তি; তাঁর যাদুময় কণ্ঠস্বরে আমার আত্মা অনিশ্চয়তার আলোড়ন থেকে সরে আসত। তাঁর মূর্তি ও প্রতিটি ভাব ছিল কোমল, অনুকম্পা ও সহানুভূতিময়। যারা তাঁকে জানত তারাই তাঁকে ভালবাসত। যারা তাঁকে জীবন্ত সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেছে তারা একদিন উপলব্ধি করবে দিব্য অদ্বৈতের খাঁটি অবতারকেই তারা দেখেছে।

আমার কাছে তিনি খ্রীস্ট। তাঁর চেয়ে মহত্তর কোনও অবতার জগতে আসেননি। তাঁর মহৎ ও উদার আত্মা আর সব জিনিসের চেয়ে বেশি দীপ্তিমানঃ His mighty spirit was as free and liberal as the great sun, or the air of heaven.

জগতের ক্ষেত্রে বেদান্তের বাণীই স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ অবদান। বাণীর সঙ্গে তিনি দিতেন সজীব উপলব্ধি। যাঁরা তাঁর ক্লাসগুলিতে হাজির থাকতেন কিংবা তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন তাঁদের হৃদয় ও মনে বেদান্ত প্রতিপাদিত সত্যের নিবিড় অনুভূতি হত। এমনকি যাঁরা বড় হলঘরে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতেন, তাঁরা যে শুধু তাঁর কথাই শুনতেন তা নয়। 'সত্যে'র স্পর্শ পেতেন তাঁরা। স্বামীজী শুধু 'দিব্য-অধিকারের বাগ্মী' ছিলেন না, তাঁর বাক্য, স্পর্শ এমনকি চাহনিতেও মানুষের মধ্যে আত্মানুভূতি জেগে উঠত।

বেদান্ত-বাণীই বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ দান একথা বলা যেত না যদি তিনি ভারতের পুরোনো শাস্ত্রবাক্যগুলি-সহ শঙ্করাচার্যের ভাষ্যই শুধু আউড়ে যেতেন। শাস্ত্র ও শঙ্কর প্রচারিত বেদান্ত থেকে তিনি বহুদূর এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি প্রচার করেছেন নতুন বেদান্ত, যার আবেদন অরণ্যের ঋষি ও সংসারী গৃহী নির্বিশেষে সব নরনারীর কাছেই। বিবেকানন্দের বেদান্তের উপযোগিতা রয়েছে জগতের সর্বস্তরের মানুষের জীবনে।

ডাঃ লোগানের অতিথিরূপে বাস করার সময় বেদান্ত সোসাইটির বৈঠকে গীতা ব্যাখ্যা করেছিলেন স্বামীজী। তাঁর প্রচারিত নতুন বাণীর বৈশিষ্ট্য তাঁর গীতা-ব্যাখ্যা থেকেই তুলে দিচ্ছি। এই বাণীর প্রথম কথাটি ছিলঃ "নিজের পায়ে দাঁড়াও। নিজেকে নিজেই সাহায্য কর।" স্বামীজীর গীতা ক্লাসের একজন শ্রোতা লিখেছেনঃ তিনি যখন একথা বলছিলেন তখন আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম অদ্বৈতসিংহের গর্জন।

শক্তি ও বীর্যই ছিল বিবেকানন্দের বাণীর বাদী সুর। নিবেদিতাকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেনঃ "তুমি দেখবে উপনিষদ ছাড়া আর কোনও শাস্ত্র থেকে আমি উদ্ধৃতি দিইনি। উপনিষদ থেকেও আমি শুধু শক্তির কথাই বলেছি। বেদ ও বেদান্তের সার 'শক্তি' এই একটি শব্দেই নিহিত।"

সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজী একদিন ক্লাসে এসেছিলেন হাতে একখানি গীতা নিয়ে। গীতার তত্ত্ব আলোচনা করে তিনি সেই নিবিড় শ্রোতৃমণ্ডলীকে বলেছিলেনঃ তোমাদের

একাকী দাঁড়াতে হবে। আমরা ব্রহ্ম। আর সব ভাব মিলিয়ে দিতে হবে এই একটি ভাবে।

মানুষের বাস্তব জীবন নিরন্তর কর্ম দাবি করে। সে কর্ম বর্জন করার কথা স্বামীজী বলেননি। কৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বলেছিলেন, স্বামীজীও তেমনই কর্ম অব্যাহত রাখার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে গীতার কেন্দ্রীয় বাণী হল, প্রত্যেককেই নির্ধারিত কাজ করে যেতে হবে অকুণ্ঠিতভাবে, পূর্ণ উদ্যমে। কিন্তু অন্তরে নিটোল প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রেখে।

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এ স্বামীজী শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলছেন ঃ 'বীর হ, সর্বদা বল অভীঃ অভীঃ। সকলকে শোনা 'মাভৈঃ মাভৈঃ'—ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই নরক, ভয়ই অধর্ম, ভয়ই ব্যভিচার।'

শরচ্চন্দ্র লিখেছেন ঃ 'বলিতে বলিতে স্বামীজীর নীলোৎপলনয়নপ্রান্ত যেন অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। যেন অভীঃ মূর্তিমান হইয়া গুরুরূপে শিষ্যের সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন।'

স্বামীজী বলতেন ঃ 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' শরচ্চন্দ্রকে স্বামীজী যেদিন দীক্ষা দেন সেদিন দীক্ষান্তে তাঁর প্রিয়শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ "যত প্রকার দুর্বলতার অনুভবকেই পাপ বলা যায়—Weakness is sin. এই দুর্বলতা থেকেই হিংসাদ্বেষাদির উন্মেষ হয়। তাই দুর্বলতা বা weakness-এরই নাম পাপ।" পরে একদিন এই শিষ্যকেই আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বামীজী ঃ "সিংহ গর্জনে আত্মার মহিমা ঘোষণা কর। জীবকে অভয় দিয়ে বল, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। Arise ! awake ! and stop not till the goal is reached."

পরে আরও একদিন শিষ্যের কাছে স্বামীজী নিজের জীবনব্রতের কথা বলেছিলেন। শিষ্যের ধারণা হয়েছিল, স্বামীজী বেদান্ত-সিদ্ধান্তসম্মত পরমজ্ঞানের কথা বলেন, আবার সেইসঙ্গে প্রচণ্ড কর্মের কথাও বলেন, এ দুয়ের মধ্যে কি বিরোধ নেই ? শাস্ত্রে তো বিরোধের কথাই রয়েছে ! তাই শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আপনি ইতঃপূর্বে বলিলেন, জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরবিরোধী ; ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের তিলমাত্র স্থান নাই, অথবা কর্মের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মদর্শন হয় না। তবে আপনি মহা রজোগুণের উদ্দীপক উপদেশ—মধ্যে মধ্যে দেন কেন ? এই সেদিন আমাকেই বলিতেছিলেন ঃ 'কর্ম কর্ম কর্ম নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'।"

এ-প্রশ্নের জবাব স্বামীজী দিয়েছিলেন ভারতের যুগপ্রয়োজনের দিক থেকে। দেশের জনসাধারণের তখনকার অবস্থা দেখে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যে হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে, ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটতে পারছে না, সর্বাঙ্গে প্যারালিসিস হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে।...শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই ! কী হবে রে জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা ? আমি নেড়েচেড়ে এদের ভেতর সাড় আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্র বলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম।"

স্বামীজী যে নতুন বেদান্ত প্রচার করেছিলেন এ তার একদিক—জাতীয় জাগরণের দিক। কিন্তু তাঁর বাস্তব বেদান্তের আরও উচ্চ ও সর্বজনীন দিকও ছিল। স্বামীজী শঙ্কর-প্রচারিত বেদান্তের সঙ্গে তাঁর নিজের প্রচারিত বেদান্তের পার্থক্য কোথায় তা বোঝাতে গিয়ে তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন ঃ "বেদান্ত কেবল পড়ে কী হবে ? Practical life-এ শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সত্যতা প্রমাণিত করতে হবে। শঙ্কর এ অদ্বৈতবাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে

রেখে গেছেন; আমি এবার সেটাকে সেখান থেকে সংসারে ও সমাজের সর্বত্র রেখে যাব বলে এসেছি। ঘরে ঘরে, মাঠে ঘাটে, পর্বতে প্রান্তরে এই অদ্বৈতবাদের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে।"

স্বামীজীর নব বেদান্তের উচ্চতম লক্ষ্যের কথাও তিনি ঐ প্রসঙ্গেই শিষ্যকে বলেছিলেনঃ "ত্রিজগৎ মুক্ত করে নিয়ে যেতে হবে। মহামায়ার রাজ্যে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে! তখনই নিত্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবি। সে আনন্দের কি তুলনা আছে রে! 'নিরবধি গগনাভম্' আকাশকল্প ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হবি। জীবজগতের সর্বত্র তোর নিজ সত্তা দেখে অবাক হয়ে পড়বি। স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত তোর আপনার সত্তা বলে বোধ হবে। তখন সকলকে আপনার মতো যত্ন না করে থাকতে পারবিনি। এরূপ অবস্থাই হচ্ছে Practical Vedanta—বুঝলি?"

স্বামীজী বলতেন, বেদান্তের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য, দিব্য ভাষ্য গীতা। আমেরিকায় তিনি বলেছিলেন, গীতাই আমেরিকান সভ্যতাকে সঞ্জীবিত করেছেন। এমার্সন লণ্ডনে গিয়েছিলেন কার্লাইলের সঙ্গে দেখা করতে। কার্লাইল তাঁকে একখানি গীতা উপহার দিয়েছিলেন। এমার্সন গীতার বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। গীতাই concord-আন্দোলনের প্রেরণামূল। স্বামীজীর মন্তব্যঃ "All the broad movements in America, in one way or other, are indebted to concord party."

গীতাশ্রয়ী আন্দোলন আমেরিকার ভাবী কালকে গড়ে দিয়েছিল। তারই পরবর্তী পর্যায়ে এসেছিল বিবেকানন্দের বেদান্ত আন্দোলন। শুধু আমেরিকা নয়, বিশ শতকের পশ্চিমী সভ্যতার মানসলোককে নতুন রূপ দিয়েছে এই আন্দোলন। সে রূপ এখনও পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়নি। কিন্তু সূর্য একবার উদিত হলে মধ্য গগনে তা আরোহণ করবেই। বিশ্বে বেদান্তসূর্যের মধ্যাহ্ন গগনে আরোহণ হয়তো হবে একুশ শতকেই।

পাশ্চাত্য যা কখনও শোনেনি তা বিবেকানন্দের কণ্ঠে তারা প্রথম শুনেছিল। শুনে তারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হয়েছিল। যত দিন যাবে তত এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্য তারা উপলব্ধি করবে। পশ্চিমের সভ্যতা, এমনকি গোটা বিশ্বের মানবসভ্যতা অদ্বৈতবোধে সঞ্জীবিত হয়ে রূপান্তরিত হবে। ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি তারই ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেনঃ হিন্দু ভাবধারাতেই রয়েছে মানবসভ্যতার রক্ষাকবচ।

স্বামীজীর মুখ থেকে পাশ্চাত্য জগৎ অভাবিত নতুন বাণী শুনেছিলঃ সকলেই দিব্য! সর্বভূতেই ব্রহ্ম! এই বাণী পাশ্চাত্যে নতুন কেননা তারা চিরকাল শুনেছে, মানুষ মাত্রেই পাপী, তাদের পাপ নিজে বহন করতে খ্রীস্ট আত্মদান করেছেন; যারা খ্রীস্ট-ভজনা করে না তারা পাপেই ডুবে থাকবে ও দেহান্তে অনন্ত নরকে যাবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা দুই হাজার বছর ধরে 'আমরা পাপী, আমরা পাপী' এই ধুয়া শিখিয়েছে। মানুষ পাপজাত, পাপের সন্তান—এই মজ্জাগত বিশ্বাস ও সংস্কার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পশ্চিমী মানসকে গড়ে তুলেছে। বিবেকানন্দই পশ্চিমীদের প্রথম শোনালেন, একা খ্রীস্ট নয়, সবাই ঈশ্বরপুত্র! সবাই ঈশ্বর! ঈশ্বরত্বে সবার জন্মগত অধিকার।

স্বামীজী এও দেখালেন, যে যেখানে যে অবস্থায় থাকুক সকলেই নিত্যদিনের কর্মের মধ্য দিয়ে নিজের অন্তরে নিহিত দিব্যের উপলব্ধি ও তা প্রকাশ করার লক্ষ্যের দিকে

এগোচ্ছে। কর্ম তাই বৃথা নয়, নিন্দনীয় নয়, বর্জনযোগ্য নয়। কর্ম ও ধর্মকে এভাবে মেলানো সম্ভব জেনে পশ্চিমের মানুষ জীবনপথে নতুন আলোক পেয়েছিল।

ব্যক্তির মতো জাতিরও থাকে স্বভাবধর্ম। পশ্চিমের জাতিগুলি কর্মনিষ্ঠ। কর্মবিচ্যুত অলস ধর্মচর্চা তাদের স্বভাববিরোধী। স্বামীজীর ভাষায়ঃ 'ওরা মহাপরাক্রান্ত বিরোচনের সন্তান; ওদের শক্তিতে পঞ্চভূত ক্রীড়াপুত্তলিকার মতো কাজ করছে।' পাশ্চাত্যবাসীদের কর্ম ত্যাগ করতে বললে সে কথায় সাড়া দেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন। তাদের এইজাতীয় স্বভাবকে স্বীকার করে স্বামীজী বেদান্তভিত্তিক কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন।

ঘোর কর্ম কিন্তু পূর্ণ নিরাসক্তি, এই হল কর্মযোগের রহস্য। নিরন্তর কাজ করতে হবে বাসনাশূন্যভাবে। পশ্চিমী জগৎ কর্মের উপাসনা করে। স্বামীজী তাদের কর্মপরায়ণতার নিন্দা করেননি। তিনি তাদের গীতার নিষ্কাম কর্ম শিখিয়েছেন। এই শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে পাশ্চাত্যবাসীদের স্বধর্মভ্রষ্ট হতে হবে না, নিজেদের স্বভাব লঙ্ঘনও করতে হবে না। শুধু কর্মের কৌশলটুকু আয়ত্ত করতে হবে। সে কৌশলই হল নিরাসক্তি, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যতা।

নিরাসক্তির অর্থ এই নয় যে কাজটিতে কম মনোযোগ দেওয়া; কাজ থেকে মন আলগা করে [illegible] যা। সানফ্রান্সিস্কোয় স্বামীজী বলেছিলেনঃ It is the power of concentration and attachment as well as the power of detachment that we must develop. তিনি আরও বলেছিলেন, আসক্তি ও নিরাসক্তি দুয়েতেই যে শক্তিমান, সেই লাভ করেছে মনুষ্যত্ব।

স্বামীজী যে কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন তার মূল নিহিত অদ্বৈত বেদান্তে। অথচ তা হল দুনিয়ার বাজারে বসে 'আত্মার দ্বারা আত্মার উপাসনা'। এই কর্মযোগ পশ্চিমী জগতকে রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে নিয়ে যাবে। যুদ্ধ ও বিপ্লবের মহামারণযজ্ঞ থেকে উত্তরণের এই-ই পথ।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর লগ্নে—১৯০০ সালে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতার মুক্তির এই পথ দেখিয়েছিলেন। তাদের রাজসিক শক্তি ও প্রতিভা এই পথে প্রবাহিত হলে সভ্যতার ক্রমমুক্তি হবে বলে তিনি অবধারণ করেছিলেন। মুক্তি হবে গোটা মানবসভ্যতারই। কেননা বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, অন্যোন্যসম্পর্ক। পাশ্চাত্যকে বাদ দিয়ে প্রাচ্যের দিন যাবে না। পশ্চিমের কাছ থেকে আমরা হাত পেতে নেব বিদ্যা, জাগতিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তিকলা। এমনকি নিতে হবে শিল্পে বিনিয়োগের মূলধন, জনকল্যাণের জন্য অর্থ। তার বিপরীতে পশ্চিমকেও ভারতের কাছ থেকে নিতে হবে আত্মজ্ঞান, অধ্যাত্মবিদ্যা, উত্তরণের মন্ত্র, পরমার্থের আলো।

বিবেকানন্দ নিজেই ছিলেন সেই আলো। অদ্বৈতের অখণ্ডের ঘর থেকে নেমে আসা পুরুষ এই প্রথম পশ্চিমী জগতে পা রেখেছিলেন তখন, যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, শিল্প-বাণিজ্যে, ধনৈশ্বর্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। সে সময় বিশ্বে ঐ সভ্যতাই জয়মাল্য ধারণ করে অন্যান্য জাতীয় সভ্যতার ওপর প্রভুত্ব করছে। মেকলে রায় দিয়েছিলেন, এক শেলফ ইংরেজী বইয়ে যে জ্ঞান ধরা আছে গোটা সংস্কৃতসাহিত্যে তা নেই। গোটা উনিশ শতক জুড়ে এই ধারণাই ছিল বলবৎ। রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্র পর্যন্ত ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতারা কেউই পাশ্চাত্য জ্ঞান, দর্শন ও মতবাদকে

চ্যালেঞ্জ করেননি। তাঁরা সবাই জোর দিয়েছিলেন পশ্চিমী ভাবধারাকে ভারতীয় পটভূমিতে adapt করা বা মানিয়ে নেবার ওপর। খ্রীস্টান ধর্মের তত্ত্বকেও ভারতীয় আবরণ পরাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রামমোহন, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্রাহ্মনেতারা। ভারতের অন্যান্য প্রান্তের বিদ্বানরাও পশ্চিমকে কিছু দেবার কথা ভাবতে পারেননি। শতবর্ষব্যাপী এই দৃষ্টিকোণ বজায় থাকার পর শতাব্দীর শেষে বিজয়ী পাশ্চাত্যের বুকেই সর্বভারতীয় শাস্ত্র ও দর্শনের প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, জীবই শিব-তত্ত্ব, 'মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ'—ভারতীয় সাধনার এই নির্যাসবাণী শুনিয়েছিলেন বিবেকানন্দ।

স্বাধিকারেই তিনি ভারতের চিরন্তন প্রজ্ঞাবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর আচার্যত্ব কোন পর্যায়ের ছিল তা বোঝাতে তাঁর দ্বিতীয়বার আমেরিকা সফরের কালে সানফ্রান্সিস্কোয় অনুষ্ঠিত ক্লাসগুলির একজন নিবিষ্ট শ্রোতা ফ্রাঙ্ক রোডহ্যামেলের সাক্ষ্য থেকে উদ্ধৃতি দেবঃ "ইন্দ্রিয়গুলির ওপর চেপে বসল স্পর্শাতীত মাধুর্য। ইন্দ্রিয়গুলি শান্ত হয়ে গেল। যে শান্ত গভীরতা স্বামীজীর স্বাভাবিক অবস্থা, আমাদের মনেও তা প্রতিবিম্বিত হল। (সংস্কৃত মন্ত্রের) অনুবাদ করার জন্য তিনি শব্দের ইন্দ্রজাল দিয়ে আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের পরিবেশ গড়ে দিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব চুম্বকের মতো আমিত্ব থেকে আমাদের টেনে নিল। স্বাভাবিক অবস্থায় যে চিন্তা ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী মনে হত এখন সেই চিন্তাগুলি আনন্দদায়ক লাগল। অন্তরে কোনও জিনিস যেন লাফিয়ে ঊর্ধ্বমুখী হল।"

রোডহ্যামেল অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। স্বামীজীর ক্লাসে বক্তৃতা শুনতে শুনতে তাঁরই এমন মনে হত; বিবেকানন্দের আচার্যত্ব কোন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, রোডহ্যামেলের বর্ণনা থেকে তা বোঝা যাবে।

স্বামীজী দ্বিতীয়বার যখন পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন সে সময়ের কথা থেকেই বিশ্বে তাঁর অবদানের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করছি। কেননা এই দ্বিতীয়বারের সফরেই বিশ্বকে তিনি তাঁর পূর্ণ পরিণত ও অন্তিম বাণী দিয়ে গিয়েছেন। মেরী লুইস বার্ক স্বামীজীর এই সময়কার বাণীকে New Gospel আখ্যা দিয়েছেন।

মানুষের দেবত্বই ছিল পশ্চিমের কাছে বিবেকানন্দের শেষ ও শ্রেষ্ঠ ঘোষণা। এমনকি তিনি এও বলেছিলেনঃ অদ্বৈত সত্যের পূর্ণ প্রকাশ মানুষে, তাই মানুষই অন্য ঈশ্বর। বুদ্ধ সব মানুষকে জগৎ পরিহার করতে বলেছিলেন। তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ মানুষকে ডাক দিলেন জগতের অধ্যাত্মকরণে, বিশ্ব এবং নিজেদের দিব্য বলে জানতে। স্বামীজী তাঁর সব উপদেশেই বলতেনঃ মানুষের মুক্তির উপায় মানুষেরই কাছে রয়েছে, কারও কাছে সাহায্যভিক্ষা করার কিংবা কান্নাকাটি করার দরকার নেই। মানুষ পূর্ণরূপেই স্বয়ংসম্পূর্ণ—এই কথার ওপর শেষ দিকে বিবেকানন্দ বেশি জোর দিতেন। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষই হল 'the other God'—যার সেবায় বুদ্ধের মতই বিবেকানন্দ স্বেচ্ছায় সহস্রবার নিজের জীবন বলি দিতে আগ্রহী।

আমেরিকায় দ্বিতীয়বারের সফরে পূর্ববর্তী অবতারদের কথা আলোচনা করে স্বামীজী তাঁর একটি বক্তৃতামালা সমাপ্ত করেছিলেন 'বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম?' এই ভাষণ দিয়ে। তিনি এ সময় সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন মানুষ গড়ার ওপর। তাঁর প্রচারিত বেদান্ত ছিল মানুষ গড়ার ধর্ম। শাস্ত্রের কর্তৃত্ব, পরিত্রাতার ওপর নির্ভরশীলতা, এমনকি

ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারণা এসব ছাড়িয়ে যাবে বেদান্তধর্ম। স্বামীজী বলেন ঃ বই নয়। মানবজাতি থেকে কোনও ব্যক্তিকে আলাদা করে তুলে ধরা নয়, কোনও ব্যক্তি ঈশ্বরও নয়। এসবকেই বিদায় দিতে হবে।

বেদান্তের ঈশ্বর কে?—স্বামীজী প্রশ্ন তুললেন। নিজেই জবাব দিলেন ঃ যে ঈশ্বর 'তত্ত্ব', 'ব্যক্তি' নয়। তুমি আমি ব্যক্তিগত দেবতা। কিন্তু বিশ্বের পরমেশ্বর, স্রষ্টা, পালক, ধ্বংসকর্তা—তিনি এক নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব। তুমি, আমি, বিড়াল, ইঁদুর, শয়তান, প্রেত সবই তাঁর ব্যক্তি—সবাই ব্যক্তি দেবতা।

স্বামীজী বললেন ঃ "আমরা চাই ব্যক্তি ঈশ্বর, পরিত্রাতা, অবতার, কেননা তিনি আমাদের হয়ে সবকিছু করে দেবেন। সাহায্য পাবার জন্য এমন ছোটা মূর্খতা। বাইরে থেকে কোনও সাহায্যই আসে না। মানুষের জন্য কোনও সাহায্য নেই। কোনও দিন ছিল না। কোনও দিন নেই, কোনও দিন থাকবে না। কেন থাকবে?... তোমরাই পৃথিবীর প্রভু, অন্যের সাহায্য তোমাদের পেতে হবে কেন?... তোমরা যে আত্মা। বিপদ থেকে নিজেরাই নিজেদের টেনে তোল। তোমাদের সাহায্য করার কেউ নেই, কখনও ছিল না। এমন কেউ আছেন একথা ভাবা মধুর মোহ মাত্র। এতে কোনও লাভ নেই।"

পাশ্চাত্যে এই নতুন বেদান্ত ধর্ম—এই man making religion—প্রচার করেছিলেন স্বামীজী তাঁর সেখানের শেষ দিনগুলিতে।

কিন্তু জগৎ কি এই ধর্মকে নেবে? নিতে পারে? নিজের আধ্যাত্মিক সার্বভৌমতার সত্য মর্তের ধূলিমাখা মানুষ কি স্বীকার করে নিতে সক্ষম? কিন্তু সব ধর্ম, ধর্মাচার, বাইবেল, দেবতা ইত্যাদি ধর্মের অ আ ক খ মাত্র। স্বামীজী বললেন ঃ এগুলি ধর্মের কিণ্ডারগার্টেন। প্রচলিত সব ধর্ম ও তাদের আচার মানুষকে দুর্বল করে, তাই সেগুলি ভুল।

এই ছিল পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের নতুন বাণী। ভারতেও তিনি এই একই বাণী দিয়েছেন। জগদ্‌গুরুরূপে সমগ্র মানবতাকে তিনি উচ্চতম সত্য দান করেছিলেন। মানবাত্মাকে দ্রুত উর্ধ্বমুখী করার জন্যই হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। স্বামীজী বললেন ঃ আমি তাঁর সেবক ও দূত। আমি তোমাদের যে বেদান্তের শিক্ষা দিয়েছি তা আগে কখনও পরীক্ষিত হয়নি। বেদান্ত বিশ্বের প্রাচীনতম দর্শন। কিন্তু বরাবরই তা ছিল কুসংস্কার ও অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে জড়ানো।

স্বামীজী বললেন ঃ সবই এক আত্মা—এই সচেতন জ্ঞানই বেদান্ত। এই বেদান্ত প্রসারিত হলে গোটা মানবজাতি হয়ে উঠবে আধ্যাত্মিক। তা হবে কি না, হলে কবে হবে সে প্রশ্ন স্বামীজী নিজেই তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ কিছু শক্তিশালী আত্মা থাকেন যাঁরা মায়ার উর্ধ্বে ওঠেন। "The hour comes when great men shall arise and cast off these kindergartens of religion and shall make vivid and powerful the true religion, the worship of the spirit by the spirit."

মেরী লুইস বার্ক লিখেছেন ঃ সেই সিংহ আত্মা মানুষগুলি নিশ্চয়ই আসবে এ বিশ্বাস স্বামীজীর ছিল। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত না হলে জীবনের শেষ বছরগুলিতে মানুষের দিব্যত্ব প্রচার করতেন না। তাও এত খোলাখুলিভাবে ও জোরের সঙ্গে।

বিবেকানন্দের প্রথমবারের পাশ্চাত্য সফর (১৮৯৩-এর জুলাই থেকে ১৮৯৬-এর

ডিসেম্বর পর্যন্ত) ও দ্বিতীয়বারের পাশ্চাত্য সফরের (১৮৯৯-এর আগস্ট থেকে ১৯০০ সালের ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত) মধ্যে পার্থক্য আছে। দুটি সফরের উদ্দেশ্য এক ছিল না। বাণীও নিয়েছিল অন্যরূপ।

স্বামীজী ভাঙা শরীর নিয়ে বিশ্রামলাভের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু এবার তাঁর অবতার রূপ উন্মোচিত হয়েছিল। তাঁর জগদ্‌গুরু ও অবতার সত্তা প্রথমবারের পাশ্চাত্য ভ্রমণকালেও সক্রিয় ছিল বলে মেরী লুইস বার্ক জানিয়েছেন ঃ তিনি নিঃশব্দে আমেরিকান জাতির সমষ্টিগত মনে নতুন চিন্তাপ্রবাহ প্রবেশ করিয়েছিলেন। সেই চিন্তাপ্রবাহের শুভফল প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর হবে ধীরে ধীরে। তিনি মানুষের চিন্তাধারার গড়ন পাল্টে দিয়েছেন, সমৃদ্ধ ও দ্যুতিময় করেছেন। মানুষের আন্তর চেতনাকে জাগিয়ে দেন অবতার। বিবেকানন্দ তাই করেছিলেন।

পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের অন্তিম বাণী ছিল ঃ মানুষ ক্রমে ক্রমে নিজের দিব্যত্ব উপলব্ধি করবে তা নয়। 'বনত বনত বনি যাই', এমনটি হলে চলবে না। আধুনিক যুগ মন্থরতাকে বরদাস্ত করে না। যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে, তেমনই ঈশ্বরসন্ধানে, ধীর লয় অচল। মানুষ শুদ্ধ নিরঞ্জন, এখনই, এইখানেই। এই মুহূর্তেই সে পূর্ণ দিব্য। দিব্য গুণে সে ভরপুর। যে অবস্থাতেই সে থাকুক, যে কাজই সে করুক, এই সত্যকে সে এখনই প্রতিষ্ঠা করতে পারে। স্বামীজী বললেন ঃ দিনরাত এই চিন্তায় মন পূর্ণ রাখ, আমিই সেই, আমিই ব্রহ্মাণ্ড। আমি মায়াধীন নই, কখনও ছিলাম না। ব্রহ্ম কখনও ব্রহ্ম থেকে ন্যূন হয় না। আমিও হইনি।

এই ছিল স্বামীজীর নতুন গসপেল। "দুর্বলতাই একমাত্র পাপ। তিনিই সন্ত যিনি কখনও দুর্বল হন না। যিনি সবকিছুর মুখোমুখি হন। জগতকে একটি কথাই আমার বলার আছে, শক্তিমান হও।" এই-ই স্বামীজীর সর্বোত্তম বাণী।

রোমাঁ রোলাঁ বিশ্বে বিবেকানন্দের অবদানকে অন্য একটি দিক থেকে দেখেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "বিবেকানন্দের বয়স যতই বাড়িতে থাকে, তাঁহার মনে এই ধারণা ততই দৃঢ়তর হয় যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন চাই-ই।...তাহাদের প্রয়োজন পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া বিকাশ লাভ করা।"

স্বামীজী নিবেদিতাকে লিখেছিলেন ঃ "পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রা অট্টহাস্যের মতো কিন্তু তাহার তলায় তলায় আছে কান্না। উহার সমাপ্তিও কান্নাতেই। হাসি, ঠাট্টা, তামাশা যাহা কিছু সব উপরেই; কিন্তু ভিতরটা বড়োই করুণ।...এখানে (ভারতে) উপরেই যত বিষাদ, যত কান্না; কিন্তু ভিতরে আছে নির্বিকার একটা ভাব আর আনন্দ।"

এই যুদ্ধ ও বিপ্লবে দীর্ণ বিশ্বকে নব বেদান্ত বা প্র্যাক্‌টিক্যাল বেদান্ত দান করে গিয়েছেন বিবেকানন্দ, এটুকু বললে সামগ্রিক চিত্র মেলে না। চিত্রের অন্য পিঠও আছে। সেই পিঠে অদ্বৈতসিংহরূপী পুরুষকে ছাপিয়ে উঠেছে স্নেহভারাতুর মাতৃহৃদয়ের কান্না। এই কান্নাই বিবেকানন্দের মানবপ্রেমের উৎসমূল।

বিবেকানন্দের বীর হৃদয় ও সমাধিমুখী মন মায়ার সর্ববিধ বন্ধনকে মুহূর্তে ছিন্ন করে ঊর্ধ্বাভিসারী হয়ে যেত। মানুষের ক্ষুদ্র দুঃখ, ক্ষুদ্র সুখ, শোক, মোহ, কল্পনা, কল্পনার আতিশয্য কোনমতেই বিবেকানন্দকে স্পর্শ করত না। নিজের চারপাশে স্বার্থকামনাময়

নরনারী মায়ার ছলনায় উচ্ছল বা কাতর হলেও স্বামীজীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারত না। তিনি হয়তো ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করে প্রাকৃত জীবনযাত্রার হাসিকান্না, জয়-পরাজয়, ঐশ্বর্য-দারিদ্র্য এক লহমায় দেখে নিতেন, তারপর ডুব দিতেন সমাধির অতলে।

তা যে হল না তার কারণ বিবেকানন্দের পুরুষসত্তার গভীরে মাতৃহৃদয় প্রোথিত করে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। 'নরেন মাকে মেনেছে'—এই কথাটুকু বলতে ঠাকুর আনন্দসাগরে ভেসে গিয়েছিলেন। বিশ-বাইশ বছরের একজন গ্র্যাজুয়েট যুবক রামকৃষ্ণের আরাধিতা মা কালীকে মেনেছে বলে আহ্লাদে আটখানা হয়েছিলেন ঠাকুর। আরও অনেকে কালী মেনেছিলেন. যেমন কেশব সেন ও তাঁর সম্প্রদায়। তাতে ঠাকুরকে বিগলিত হতে দেখা যায়নি। অথচ পারিবারিক ভাগ্য-বিপর্যয়ের কঠোর নিষ্পেষণে অসহায় নরেন যখন মা-ভাইদের ভরণপোষণের জন্য প্রার্থনা জানাতে কালীঘরে গিয়ে সেসব কিছুই জানাতে পারলেন না ও পর পর তিনবার শুদ্ধ-জ্ঞান-ভক্তি চেয়ে মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন সেদিন ঠাকুরের তৃপ্তির অবধি ছিল না।

তার প্রথম কারণ, ঐ প্রার্থনা নিবেদনের রাতে বিবেকানন্দের সিংহবিক্রম পুরুষসত্তার আবরণ-উন্মোচন হয়েছিল; দ্বিতীয় কারণ, ঐ একইসঙ্গে জীবনে এই প্রথম তিনি মায়ের চরণে অশ্রুমোচন করেছিলেন। সিংহবিক্রম এজন্য যে নিজের মা ও ভাইদের ক্ষুধার দাবিকেও তিনি অনায়াসে অগ্রাহ্য করে সেদিন মায়াকে করেছিলেন পরাস্ত। কিন্তু সেইসঙ্গেই বিশ্বজননী মাতৃসত্তার জীবন্ত প্রত্যক্ষ উপলব্ধি তাঁকে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করে দিয়েছিল। অন্য ভাষায়, দক্ষিণেশ্বরে সেই নিশুতি রাতে নরেন্দ্রনাথের আধারে ভবতারিণী জেগে উঠেছিলেন।

অখণ্ড ঘরের ঋষি, পাতাল-ফোঁড়া শিব মাতৃভাবে ভাবিত, মায়ের মতো করুণার্দ্রহৃদয়, মাতৃময় হয়ে গেলেন। রামকৃষ্ণের অলৌকিক যাদু! ঠাকুর নিজেই নিজের কারসাজি দেখে বিমোহিত! বুঝলেন, তাঁর আশা পূর্ণ করার জন্য নরেন্দ্রসত্তার প্রয়োজনীয় গড়ন এতদিনে সুনিশ্চিত হল। তাই সেই শুভরাত্রি পোহালে ঠাকুর সামনে যাকেই দেখেছিলেন তাকেই ডেকে বলেছিলেনঃ "নরেন মা মেনেছে, বেশ হয়েছে, নরেন কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে, তাই না?"

এই মানা জিনিসটি যে কি, তার তাৎপর্য কত বিশাল, তা সেদিন তেমনভাবে বোঝা যায়নি। নরেনের বন্ধুরা, গুরুভাইরা, বিচক্ষণ অগ্রজরা বড়জোর ভাবতে পেরেছিলেন, নরেন তার উদ্ধত মাথাটিকে কালীর পায়ে নুইয়েছে, ঠাকুরের প্রতি বিরোধিতার মনোভাব ছেড়েছে অর্থাৎ 'লাইনে' এসেছে। এরকম ভাবনাও অসঙ্গত ছিল না। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের জীবনহ্রদে কালীকমল ফুটে ওঠা এক দৈবী ঘটনা। এই ঘটনাটি ঘটে কিনা তা দেখার জন্য বিশ্বের প্রাণ যেন চুপিসারে সে রাতে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছিল। কালীমন্দিরে তিনবার ঢুকে নরেন্দ্র যখন একদিকে আত্মবিস্মৃত, অন্যদিকে আত্মসমর্পিত হলেন তখন ঠাকুর বুঝলেন, জগতে তাঁর মিশন সফল হবে, তাঁর অবতারলীলা সার্থক হবে। সে সাফল্য ও সার্থকতার চাবিকাঠিই নরেন।

নরেনের মধ্যে মাতৃহৃদয়ের জাগরণ স্থায়ী ও সম্পূর্ণ করতে রামকৃষ্ণ আরও কৌশল এঁটেছিলেন। নরেন তাঁর পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে হিমসিম হলেন, ব্যর্থও হলেন

পুরোপুরি। দারিদ্র্যের করাল রূপ তিনি নিজ জীবনেই দেখলেন। যাদের বলি আত্মীয় ও বন্ধু তারা যে তা নয়, বরং প্রচ্ছন্ন শত্রু, প্রয়োজনে প্রকাশ্য বিরোধী—সরল ও উদারমনা নরেন তা টের পেলেন। বাস্তবের ধূলিমলিন, রিক্ত, রুক্ষ রূপ তিনি চোখ মেলে দেখলেন। এতদিন তিনি চিনতেন ভাবের জগৎ। যৌবনসমাগমে অভাবের জগৎ তাঁকে কামড়ে ধরল।

তারপর শুরু হল স্বামীজীর ভারত পরিক্রমা। দেখলেন দেশজুড়ে দুঃখের চিত্র। গ্রীষ্মের কড়া রোদে ফসলশূন্য মাঠ যেমন ফেটে চৌচির হয়ে যায়, জলের তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে—পায়ে হেঁটে হেঁটে স্বামীজী দেখলেন, তাঁর দেশের জনগণের প্রাণপাত্রখানি অমনই ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ফেটে চৌচির হয়ে রয়েছে। স্বামীজীর মাতৃহৃদয় কেঁদে উঠল।

আর সব কিছু ভেসে গেল এই অপ্রতিরোধ্য কান্নায়। বিবেকানন্দ সিদ্ধান্ত করলেন আগে জনগণকে, পদদলিত-নিপীড়িতকে জাগাতে হবে, তাদের অন্নবস্ত্র শিক্ষা দিতে হবে, তাদের মেরুদণ্ডের গড়ন সোজা করে তুলতে হবে, তাদের অবদমিত মনুষ্যত্বের স্ফুরণ ঘটাতে হবে। এই-ই এযুগের ব্রহ্মসাধনা। কন্যাকুমারীর মন্দিরে শেষ উপাসনা, তারপর ভারতের শেষ উপলখণ্ডে গভীর রজনীতে ধ্যান ও সঙ্কল্প গ্রহণের এই ছিল মহাপুণ্যফল।

সে পুণ্যফল শুধু ভারতের কোটি কোটি মানুষের জন্যই নয়। সেই ফল বিশ্বমানবের হাতে তুলে দিতে বিবেকানন্দকে আবার সাগর ডিঙোতে হল। সপ্তসমুদ্রের পারে যাদের বাস তাদেরও যে রামকৃষ্ণ এবং সারদা আগেই নিজেদের ধন বলে অঙ্গীকার করে রেখেছেন। এই দেবপিতা-মাতার জ্যেষ্ঠপুত্র বিবেকানন্দ। তাই দেশে দেশে ঠাকুর ও মায়ের আপন জনদের খুঁজে নিতে হবে যে বিবেকানন্দকেই।

মানুষ দুঃখলাঞ্ছিত তো শুধু ভারতেই নয়। ভারতের জনসাধারণ দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতে পায় না, তাই দুঃখ। শিক্ষাহীন তাই দুঃখ। কিন্তু বিবেকানন্দ প্রথমে পাশ্চাত্যের নরনারীকে সুখী ও উজ্জ্বল ভাবলেও পরে বুঝলেন, এঁরা ভারতীয়দের তুলনায় আরও গভীর দুঃখে দুঃখী। আরও বেদনার্ত। জগৎজুড়ে শিবশক্তির সন্তানরা যন্ত্রণায় জর্জরিত, ম্রিয়মান, ব্যথার বিষে নীল। সেই বিষহরণের মন্ত্র নিয়ে বিশ্বের দিগন্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বয়ং নীলকণ্ঠ শিব। বেদান্ত তাঁর জাগ্রত বিষহর মন্ত্র। গরলকে অমৃতে রূপান্তরিত করার জন্যই তাঁর অভিযান। তাই বিবেকানন্দ বুদ্ধের মতো জগতকে পরিহার করতে বলেননি। বলেছেন, জগতকে দিব্যায়িত করতে!

বিবেকানন্দের ছিল পঞ্চ জননী। ভুবনেশ্বরীদেবী, মা সারদা, মা কালী, জননী জন্মভূমি ও বিদেশের মাতৃশক্তি। এঁদের কোলেই বিবেকানন্দের একই জীবনে নানা জন্মপরিগ্রহ, নানা রূপান্তর। আবার এঁদের সবাইকে রেখেই জগৎ নাট্যমঞ্চ থেকে তাঁর বিদায় গ্রহণ। রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, সৃষ্টি শক্তির আণ্ডারে। মা সৃষ্টি করেন আবার তা গিলেও ফেলেন। আদিতে ও অন্তে একা মা-ই থাকেন।

বেলুড়ে বিবেকানন্দের দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সেই ছাইয়ের ভিতর থেকে জেগে উঠেছিলেন ভারতজননী। আশি কোটি মানুষের মা। তাদের মাতৃ আহ্বানের সাধনায়, রক্তশপথ রণে বিবেকানন্দই পুনরুত্থিত হলেন। যেন তিনিই মহাজননীর দিব্য ফুল্ল আনন।

স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম সবেরই নির্বাণ হয়েছিল কালীর চরণে। কাশ্মীরে

ক্ষীর ভবানীর মন্দিরেই হয়েছিল তাঁর জীবনব্রত উদ্‌যাপনের সমাপ্তি। ক্ষীর ভবানীর মন্দির থেকে ফিরে স্বামীজী বললেন, "আমার স্বদেশপ্রেম ভাসিয়া গিয়াছে; আমার যাহা কিছু ছিল, সব গিয়াছে। এখন কেবল মা মা।"

বিবেকানন্দের লয়। তাঁর জীবনের পূর্ণাহুতি মায়ের পায়ে। দুনিয়া ঘুরে তিনি ঘরে ঘরে, ঘটে ঘটে মাকেই দেখেছেন, সব দেশের মায়েরা তাঁকে আঁচল টেনে কাছে নিয়েছেন, ভাসিয়ে দিয়েছেন তাঁকে স্নেহবন্যায়।

বিশ্বের পথে পা বাড়াবার সময় স্বামীজী বেলুড়ের কাছে ঘুষুড়ীতে সারদা মায়ের কাছে আশীর্বাদ চাইতে গিয়েছিলেন। মাকে প্রণাম করে তিনি বললেনঃ 'মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি তবেই ফিরব; নতুবা এই-ই।' মা চমকে বললেনঃ 'সে কী!' স্বামীজী শুধরে নিয়ে বললেনঃ 'না, না, আপনার আশীর্বাদে শীঘ্রই আসব।' সারদা মা প্রশ্ন করলেনঃ 'বাবা তোমার মাকে দেখে যাবে না।' স্বামীজী উত্তর দিলেনঃ 'মা, আপনিই আমার একমাত্র মা।'

সব মায়ের সমাহার এই একমাত্র মা। ইনিই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়ঃ 'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি।' যেখানে যত নারী আছে সবই সারদা, সারদার প্রতিমূর্তি!

বিবেকানন্দ নিজে সেই সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, দক্ষিণেশ্বর থেকে সানফ্রান্সিস্কো পর্যন্ত মা বিরাজেন সর্বঘটে। সেই মা কালী! সেই মা সারদা! সেই রামকৃষ্ণ!

অদ্বৈতসিংহের নিজের বুকটি জুড়েও ছিল মাতৃহৃদয়ের ধুকপুকুনি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাই বলেছিলেনঃ 'দেখলি বাঙাল, কত বড় প্রাণ। তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ-বেদান্ত কোথায় উড়ে গেল!'

বেদ-বেদান্তের চর্চা অনেকেই করেন। অনেকেই আচার্য। কিন্তু এমন কুসুমকোমল মাতৃহৃদয় ছিল আর কোন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর?

বিবেকানন্দ বিশ্বকে দেখালেন শুধু অদ্বৈতের উপলব্ধিই সব নয়। তার সঙ্গে মাতৃহৃদয়ের কান্নাটুকুও জুড়ে দিতে হবে। চিদানন্দসাগরে সৃষ্টির শতদল তবেই উঠবে টলমল করে।



বরণীয়ের স্মরণে এক অনালোচিত অধ্যায়। আলোকবর্ষী তরঙ্গ বিবেকানন্দের অভিঘাতের প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে অধ্যাত্মজগতে। ত্যাগ ও সেবার নবীন মন্ত্র কর্মকে ধর্মের সঙ্গে মিলিত করেছে। সাহিত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে মিলেছে তাঁর শিল্পচেতনা ও অধ্যাত্মভাবনা। আধুনিক যুগের অত্যাশ্চর্য সমন্বয়ী স্থাপত্য স্বামীজীর ধ্যানের শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির—সর্বধর্মের ঐক্যের প্রতিফলন। বিবেকানন্দকে ঘিরে আজ পাশ্চাত্যের অনেক জিজ্ঞাসা, প্রাচ্যের অনেক প্রশ্ন। উত্তর কি নিহিত আছে ইতিহাসের গর্ভে!

লাহোর ট্রিবিউন পত্রিকায় বিবেকানন্দ-সংবাদ এবং বিবেকানন্দ ও সম্পাদক নগেন্দ্র গুপ্তের সম্পর্ক-কথা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ এক ॥

স্বাধীনতা-পূর্বে লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকা উত্তর-পশ্চিম ভারতে ভারতীয়-পরিচালিত প্রধান সংবাদপত্র, একথা সর্বসম্মত। মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকার জুলাই ১৯১০ সংখ্যায় দেখি—ট্রিবিউন ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১-তে শুরু হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে।[১ক] ১৬ অক্টোবর ১৮৮৬ থেকে সপ্তাহে দুবার, জানুয়ারি ১৮৯৮ থেকে সপ্তাহে তিনবার এবং ১৯০৬ সাল থেকে দৈনিক পত্র হিসাবে ট্রিবিউন বেরোতে থাকে। স্বামীজীর সময়কার সংবাদ বেরোবার কালে (১৮৯৩-১৯০২) পত্রিকাটি প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পর্বে সপ্তাহে দুবার, তারপরে সপ্তাহে তিনবাব হিসাবে বেরিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, পত্রিকাটির ১৮৯৮ সালের কোনও সংখ্যাই সন্ধানের জন্য গ্রন্থাগারে পাইনি।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই পত্রিকা সূচনার ব্যাপারে পূর্বভারতের বাংলার একটা ভূমিকা ছিল এবং পত্রিকার খ্যাতি প্রধানত যেসব সম্পাদকের উপর নির্ভরশীল ছিল তাঁরা তিনজনই বাঙালী—শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং কালীনাথ রায়। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী কিন্তু পঞ্জাবের বিখ্যাত প্রগতিশীল শিখ—সর্দার দয়াল সিং মাজিতিয়া। ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসমূলক বিভিন্ন গ্রন্থে ট্রিবিউন আরম্ভের পিছনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণার কথা বলা আছে। তাঁরা সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী থেকে এই ব্যাপারে তথ্যসংগ্রহ করেছেন।[১খ] আমরা এক্ষেত্রে সরাসরি সুরেন্দ্রনাথের রচনার ব্যবহার করব।

সরকারী চাকরি থেকে অন্যায়ভাবে পদচ্যুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকতাকে বৃত্তি করেছিলেন কিন্তু আন্দোলন ছিল তাঁর স্বভাবে, তা বৃদ্ধি পেয়েছিল সরকারের অবিচারে। সেই আন্দোলনের উপযুক্ত সংগঠন ছিল না জমিদারদের স্বার্থ-প্রহরী 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ এবং আনন্দমোহন বসু প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (২৬ জুলাই ১৮৭৬), যা প্রথম উল্লেখযোগ্য আন্দোলন করে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার বয়স একুশ থেকে কমিয়ে উনিশ করার বিরুদ্ধে। এই আন্দোলন সারা ভারতে শিক্ষিত মহলে সাড়া জাগায়। ফলে একই মঞ্চে সারা ভারতের প্রতিনিধিদের সমবেত করার সম্ভাবনা দেখা যায় এবং সেই উদ্দেশ্যে বক্তৃতা সফর করতে সুরেন্দ্রনাথকে স্পেশাল ডেলিগেট

মনোনীত করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে কলকাতার শিক্ষিতসমাজে মাৎসিনী ও ইতালীর স্বাধীনতাসংগ্রামের বিষয়ে বক্তৃতাদি করে বাগ্মী খ্যাতি পেয়েছেন (সুরেন্দ্রনাথের মাৎসিনী অবশ্য বহুলাংশে নিরামিষ চরিত্র কারণ মাৎসিনীর দেশপ্রেমটুকু নিয়ে বিপ্লবের অংশটুকু সরিয়ে রাখা হয়েছিল,[২] নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর এসব বক্তৃতার শ্রোতা ছিলেন কিন্তু সেই জ্বলন্ত যুবকটি এই ছাঁটাই মাৎসিনীকে গ্রহণ করেছিলেন কিনা সন্দেহ)—ফলে তিনিই কার্যসিদ্ধি করতে পারবেন, ধরে নেওয়া হয়। ভারতের নানাস্থানে তাঁর বক্তৃতাসফর সফল হয়, পঞ্জাবেও তাই। সেখানে গঠিত হয় 'লাহোর ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। তারপর সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ "পঞ্জাবে আমি অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলাম,...যা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মহাসম্পদরূপে রক্ষা করেছি। পঞ্জাবেই সর্দার দয়াল সিং মাজিতিয়া-র সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সে পরিচয় দ্রুত প্রাণোত্তপ্ত ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের রূপ নেয়। এতাবৎ আমার দেখা সত্যকার খাঁটি মহৎ মানুষদের মধ্যে তিনি অন্যতম।... আমি যে-কাজের ভারপ্রাপ্ত তার সমর্থনে তিনি সক্রিয়ভাবে নেমে পড়লেন। লাহোরে একটি সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য তাঁকে আমি প্রভাবিত করতে পেরেছিলাম। তাঁর ট্রিবিউন কাগজের জন্য প্রথম মুদ্রাযন্ত্র আমিই কলকাতা থেকে কেনবার ব্যবস্থা করেছি। প্রথম সম্পাদক নির্বাচনের ভারও তিনি আমার উপর দেন। এই পদের জন্য ঢাকার প্রয়াত শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নাম সুপারিশ করি। প্রথম সম্পাদক হিসাবে তাঁর সাফল্য আমার নির্বাচনের যথার্থতা দেখিয়ে দিয়েছে।... ট্রিবিউন দ্রুত জনমত প্রকাশের শক্তিশালী বাহন হয়ে দাঁড়ায়।"[৩]

প্রথম পর্বের ট্রিবিউন সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ 'হিস্টরি অব ট্রিবিউন' গ্রন্থ থেকে উপস্থিত করা যায়। এই সংবাদগুলির সঙ্গে ট্রিবিউনের বিবেকানন্দ-মূল্যায়নের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক আছে।

সর্দার দয়াল সিং ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাবে এসেছিলেন। তাঁর প্রগতিশীলতা কিন্তু উদারনৈতিক। সেজন্য পঞ্জাবে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও তিনি উভয় সমাজের মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলতে চেষ্টা করেছেন। স্বামী দয়ানন্দের সংস্কারমুক্ত কার্যাবলী তাঁর পত্রিকার সমর্থন পেয়েছে। শিখ-স্বার্থের সপক্ষতা করলেও তাঁর পত্রিকা শিখদের মধ্যে হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল।[৪] কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, তিনি ব্রাহ্মসমাজের দিকেই ঝুঁকছেন, বিশেষত যখন আর্যসমাজ 'আর্য পত্রিকা' নামে ইংরেজী কাগজ শুরু করল। ১৮৯১ সালে বেরুল 'পঞ্জাব পেট্রিয়ট' নামক সাপ্তাহিক কাগজ, যার উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল ট্রিবিউন এবং ট্রিবিউনের বাঙালী সম্পাদককে কটু ভাষায় নিন্দা করা। এই পত্রিকার মূল অভিযোগ ছিল, ট্রিবিউন আসলে বাঙালী কাগজ। ১০ জুন, ১৮৯৫ তারিখে এক সম্পাদকীয়তে (**A Reptile Press**) ট্রিবিউন বলেঃ ট্রিবিউন বাঙালী কাগজ কিনা এবং সে পঞ্জাবের সেবা করছে কিনা, সে বিচারের ভার পাঠকদের উপর। তবে একথা বলা যায়, পঞ্জাব পেট্রিয়ট বেরোবার পরে ট্রিবিউনের প্রচারসংখ্যা কমেনি বরং বেড়েছে। এখানে শুধু এই প্রশ্নই করতে পারি, পঞ্জাব পেট্রিয়ট কি পঞ্জাবী কাগজ, নাকি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ? মনে তো হয় যে, একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ ভারতীয় পোশাক গায়ে চাপিয়ে ঘোরাফেরা

করছে।[৫]

প্রকাশ আনন্দ্ তাঁর ট্রিবিউনের ইতিহাসে লিখেছেন, ট্রিবিউন প্রথমাবধি স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, ১৯০০-১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বা তাঁর অনুবর্তীদের মত সম্বন্ধে এই কাগজে রীতিমত সমালোচনার সুর। তার আগে ১৪ মার্চ ১৮৯৯ তারিখের সম্পাদকীয়তে ('Europeans and the Natives under their Control') শিক্ষিত বাঙালীদের নিয়ে কটু ব্যঙ্গ করা হয়েছে।[৬] নগেন্দ্রনাথের জীবনচিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি ১৮৯১-এর মাঝামাঝি ট্রিবিউনের সম্পাদনা গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৯ সালের গোড়ায় তা ত্যাগ করেন। ১৯১০ সালে আবার ট্রিবিউনে ফিরে গিয়েছিলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক অধিকাংশ লেখা নগেন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৮৯৯-তে নগেন্দ্রনাথের বিদায়ের পরেই বাঙালী-নিন্দা ট্রিবিউনে ফেটে পড়ে। পরবর্তী বাঙালী সম্পাদক, বিখ্যাত কালীনাথ রায় ঠিক কোন সময় থেকে সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছিলেন, আমরা বলতে পারব না। ধরে নিতে পারি, তখন বাঙালী-দূষণে ঘাটতি পড়েছিল।

ট্রিবিউনের অগ্রগতিতে নগেন্দ্রনাথের ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়ন করেছিল এলাহাবাদের নামী কাগজ 'লীডার' ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪০ তারিখে, তাঁর মৃত্যুর পরে। নগেন্দ্রনাথ এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান পীপল্'-এর সম্পাদনা করেছেন, পত্রিকাটি লীডার পত্রিকার সঙ্গে সম্মিলিত হলে, কিছুদিন তার সম্পাদনাও। লীডার উক্ত সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে অন্যান্য কথার সঙ্গে লিখেছিলঃ "মিঃ গুপ্ত প্রসিদ্ধ সাংবাদিক। করাচীর 'ফিনিক্স' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেই তিনি প্রথম জনসমাজে পরিচিতি লাভ করেন। লাহোর ট্রিবিউনের সম্পাদক হিসাবেই তাঁর খ্যাতিপথে আরোহণ, যে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী সর্দার দয়াল সিং মাজিতিয়া তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। মিঃ গুপ্তের সম্পাদনাকালে ট্রিবিউন এমনই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে, একবার স্থানীয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট' প্রশ্ন করে—এই প্রদেশ এখন শাসন করছেন কে, স্যার ভেনিস ফিৎসপ্যাট্রিক, নাকি ট্রিবিউনের সম্পাদক ?... মিঃ গুপ্তের রচনারীতি সুন্দর সাহিত্যগুণান্বিত এবং তিনি রাজনৈতিক বিষয় অপেক্ষা সাহিত্য বিষয়ে লেখাতেই অধিক পারদর্শী ছিলেন। এই সঙ্গে তিনি ছিলেন গল্পলেখক, কবি ও শিল্পী।"[৭]

শেষোক্ত প্রসঙ্গে বলা যায়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নগেন্দ্র গুপ্তের খ্যাতি যদিও ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে, বাংলায় তিনি কিন্তু খ্যাতিলাভ করেছেন বাঙালী সাহিত্যিক হিসাবেই। ইংরেজীনবিশ হিসাবেও তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন—রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতার ইংরেজী ভাষান্তর করে। তিনি মাসিক 'প্রদীপ' ও সাপ্তাহিক 'প্রভাত' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন, ইংরেজী ও বাংলায় নানা ধরনের প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন, প্রথম পর্যায়ে বাংলা ছোটগল্পের বিশিষ্ট লেখক তিনি, অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ ও উপন্যাসেরও রচয়িতা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের সমঝদার, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-সুহৃদ, কেশবচন্দ্র সেন তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়।[৮]

॥ দুই ॥

সারা ভারতের বহু বিখ্যাত মানুষের নিকটবর্তী হবার সুযোগ পেলেও, নগেন্দ্র গুপ্তের বিভিন্ন লেখা থেকে মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর সর্বোচ্চ ভক্তির পাত্র। স্বামী বিবেকানন্দও উপযুক্ত মাত্রায় তাঁর শ্রদ্ধালাভ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী সংকলন ও অনুবাদ করে উৎকৃষ্ট ভূমিকা-সহ তিনি প্রকাশ করেছেন—**Sayings of Paramhansa Ramakrishna** (April, 1936)। তাঁর **Reflections and Reminiscences** (১৯৪৭), **Noble Lives** (১৯৫০), **Place of Man and Other Essays** প্রভৃতি গ্রন্থে দীর্ঘ রামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ আছে, বিবেকানন্দপ্রসঙ্গও। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর কিছু লেখা একত্র করে বোম্বাই রামকৃষ্ণ মঠ ১৯৩৩ সালে প্রকাশ করেছিল **Ramakrishna-Vivekananda** গ্রন্থ। রামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে তাঁর সকল বক্তব্য বলবার স্থান এ নয়, তবে নির্দ্বিধায় বলা যায়, রামকৃষ্ণ-উক্তির শ্রেষ্ঠ মূল্যায়নকারীদের মধ্যে তিনি পড়েন। ঈষৎ প্রসঙ্গ-বহির্ভূত হলেও, কথক রামকৃষ্ণের একটি প্রত্যক্ষদৃষ্ট রূপচিত্র নগেন্দ্রনাথের লেখা থেকে অনুবাদে উপস্থিত করব, বিশেষত এইজন্য যে, নগেন্দ্রনাথের কাছে বিবেকানন্দ বহুলাংশে রামকৃষ্ণের আলোকপ্রাপ্ত চরিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে কেশবচন্দ্র সেন গঙ্গাবক্ষে স্টিমারভ্রমণের আয়োজন করেছিলেন—সেখানে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম)-সহ নগেন্দ্র গুপ্তও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা এই প্রকারঃ "রামকৃষ্ণের ভাবোন্মাদনা যখন বেড়ে উঠল তখন তিনি কেশবের আরও নিকটে সরে এলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর জানু কেশবের কোলের উপর স্থাপিত হল। আমি তাঁদের একেবারে পাশে প্রায় কেশবকে স্পর্শ করে বসেছিলাম। পরমহংস স্টিমারে প্রায় আট ঘণ্টা ছিলেন। অল্প যে কিছুক্ষণ সমাধিতে ছিলেন, তা বাদ দিলে, তাঁর কথা বলার বিরাম ছিল না। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সময়ে (১৮৮২-১৯৩৩) অপর কোনও মানুষকে তাঁর মতো করে কথা বলতে শুনিনি। বাক্যবিনিময় বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু ঘটেনি। এই দীর্ঘ আট ঘণ্টা সময়ে অসাধারণ বাগ্মী ও বিশিষ্ট পণ্ডিত কেশব ডজনখানেক বাক্যও বলেছেন কিনা সন্দেহ। দীর্ঘ ব্যবধানে কখনও একটা প্রশ্ন বা কখনও বুঝিয়ে বলার জন্য অনুরোধ—এইমাত্র করেছিলেন। রামকৃষ্ণই ছিলেন একমাত্র বক্তা—তাঁর বাক্যধারা অবিরাম বয়ে গিয়েছিল, যেমন করে আমাদের নীচে বয়ে যাচ্ছিল তরঙ্গভঙ্গে গঙ্গার ধারা। তখন তাঁর সেই মধুর কোমল ঐকান্তিক কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছু শুনিনি, তপঃকৃশ দেহটি ছাড়া আর কিছু দেখিনি—যিনি আমাদের সামনে অর্ধমুদ্রিত নেত্রে, কোলের উপর দুখানি হাত রেখে বসেছিলেন। তাঁর কম্পমান ওষ্ঠ থেকে সহজতম উক্তি নির্গত হচ্ছিল—কিন্তু তার অন্তর্গত ভাবের চেয়ে ঊর্ধ্ববিহারী বা গভীরে অবগাহনকারী আর কোন্ ভাব সম্ভবপর! প্রতিটি চিন্তাই দিব্যসত্যের উন্মোচক; প্রতিটি উপমা, রূপকল্প বা কাহিনী পরমাশ্চর্যের দ্যোতক। তিনি কত কথাই না বলেছিলেন—মানুষের মুখ দেখে কিভাবে তার চরিত্র বোঝা যায় সেকথা, নানা অধ্যাত্মপথ সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা, পরম সত্তার স্পর্শলাভের কালে অনন্ত অপরিমেয় অনুভূতিলাভের কথা। যখন তিনি নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলেছেন, তখনই সমাধিমগ্ন। তাঁর মুখে তখন দিব্যানন্দের আলোকচ্ছটা।... শরীর আড়ষ্ট, স্থির, পেশী বা স্নায়ুর কম্পন নেই। কোলের উপর ন্যস্ত

হাতের আঙুলগুলি একটু বাঁকা, অপূর্ব পরিবর্তন মুখমণ্ডলে, ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক, তার মধ্য দিয়ে সাদা দাঁতের ঝিলিক, যেন হাসছেন, নেত্র অর্ধমুদ্রিত, অক্ষিতারকা ঈষৎ ব্যক্ত, আর সমস্ত মুখের উপর পবিত্রতম ঐশ্বরিক ভাবের অনির্বচনীয় দ্যুতি। নীরবে সসম্ভ্রমে আমরা তাঁর দিকে কিছু সময় তাকিয়ে রইলাম। তারপর কেশবচন্দ্রের সম্প্রদায়ের সঙ্গীতাচার্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল যন্ত্রসহযোগে গান শুরু করলেন। কিছু পরে পরমহংস ধীরে চোখ মেললেন।"

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে মহাকালের বিচারের কথা নগেন্দ্রনাথের রচনায় এইপ্রকার ঃ "যেসব মানুষ পরমহংস রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এমন কেউই নেই যিনি ধর্মের ইতিহাসে বা সমুচ্চ আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে তাঁর সমস্তরের। যেসব ধনী ব্যক্তি তাঁর সাক্ষাতে গিয়েছেন কিংবা যাঁদের বাড়িতে তিনি গিয়েছেন, তাঁদের কাউকেই প্রায় কেউ মনে রাখবে না—যদি রাখে তার একমাত্র কারণ, ঘটনাচক্রে রামকৃষ্ণ-কথামৃতে তাঁদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই ইতিমধ্যে বিস্মৃত, তাঁদের খেতাব আর অর্থসম্পদ ধুলোয় বিলীন। কেউ-কেউ তাঁকে খ্যাপা মানুষ বলে দেখেছেন, অন্য অনেকের কাছে তিনি নিছক কৌতূহলের বস্তু। এইসব লোক বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন, অপরদিকে মহাকাল মানবসংসারের মহান আচার্যদের সারিতে রামকৃষ্ণের স্থান সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করে দিয়েছে। যে কতিপয় তরুণকে তিনি নিজের কাছে আকর্ষণ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই বিরাট আধ্যাত্মিক মহিমার অধিকারী হয়েছেন। আর তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও বন্দিত শিষ্য বিবেকানন্দ—দেশপ্রেমিক, আচার্য, স্বদেশীয় জনগণ ও প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং মহান বার্তাবহরূপে অবিনশ্বর খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন।"[৯]

॥ তিন ॥

১৮৯৩ সাল থেকে ট্রিবিউনের বিবেকানন্দ-সংক্রান্ত সংবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পত্রিকাটিতে অন্য নানা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সারাংশ প্রকাশ করা হয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩-এর কাগজে শিকাগো ধর্মমহাসভার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ বেরোয়, ভুল বানানে স্বামীজীর নাম-সুদ্ধ (Vurkenanda), তা সম্ভবত কলকাতার ব্রাহ্ম পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলিত কারণ হুবহু একই সংবাদ বেরিয়েছিল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের 'মিনিস্টার' কাগজে, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩। কেবল বিবেকানন্দ-সংবাদ নয়, সারা দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদকে, বিশেষত ইণ্ডিয়ান মিরারের সংবাদকে, সংক্ষিপ্ত করে ট্রিবিউনে প্রকাশ করা হত। ২২ নভেম্বর তা প্রকাশ করে বিবেকানন্দেব পূর্বপরিচয়, মিরার থেকে সংগ্রহ করে। ৬ ডিসেম্বর বেরোয় 'শিকাগো ট্রিবিউনের' বিবেকানন্দ-প্রশস্তি। ১৮৯৪-এর ৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ইংলণ্ডের বিখ্যাত 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকার ধর্মমহাসভা-সম্বন্ধীয় এই মন্তব্যের উল্লেখ সে করেছিল—'ধর্মমহাসভা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নবযুগসৃষ্টিকারী ঘটনা'। একই সংখ্যায় বিবেকানন্দকে আমেরিকার কাগজপত্র যে 'ব্রাহ্মণ' বলেছে এবং সেটি যে ভুল, আসলে তিনি কায়স্থ শূদ্র, এই সংবাদটি জানায়। ২১ মার্চ 'পায়োনীয়ার' থেকে মারউইন মেরী স্নেলের পত্র উদ্ধৃত করে, যাতে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অত্যুচ্চ শ্রদ্ধা

প্রকাশিত। ১৮ এপ্রিল, প্রাপ্ত সংবাদসূত্রে সে জানায়, বিবেকানন্দ আমেরিকায় বহু মানুষকে নিজ মতের দ্বারা প্রভাবিত করেছেন। ২১ জুলাই, ভারতে দুর্ভিক্ষের সুযোগে খ্রীস্টানের সংখ্যাবৃদ্ধিতে সচেষ্ট মিশনারিদের সম্বন্ধে বিবেকানন্দের চেষ্টায় আমেরিকার মানুষের মোহভঙ্গ ঘটছে, একথা তৃপ্তির সঙ্গে লেখে। ৮ সেপ্টেম্বর, কলকাতায় বিবেকানন্দকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন সভা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ঐ সভার প্রস্তাবাবলী, ১০ নভেম্বর, মাদ্রাজে ধন্যবাদ সভার উত্তরে স্বামীজীর মহান উত্তর-পত্রের সংবাদ পাই। ১৮৯৫ সালে নানা ধরনের টুকরো সংবাদের মধ্যে মিশনারি ট্রাস্ট-এ বিবেকানন্দ-নিন্দা (১৫ মে), খেতড়ির রাজাকে স্বামীজীর উদ্দীপক পত্র (৪ সেপ্টেম্বর), ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকায় বিবেকানন্দ সংবাদ (১৯ অক্টোবর), লণ্ডনে বিবেকানন্দের সাফল্য (৬ নভেম্বর, ২০ নভেম্বর) উল্লেখযোগ্য। আর উল্লেখ করা যায় ৯ মার্চ সংখ্যায় রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সংবাদ। রামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্র সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত নগেন্দ্র গুপ্তের এই লেখাটিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শ অনুভব করা যায়, যেখানে তিনি বলেছিলেনঃ "এই ঋষিতুল্য হিন্দু ভক্ত শত শত শিক্ষিত সংশয়বাদীকে বিশ্বাসী করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। কেশব তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, বিবেকানন্দ তাঁর অন্যতম শিষ্য।"

১৮৯৬ সালের ২৫ জুলাই পুনশ্চ রামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ এসে গেল। ম্যাক্সমূলার সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদিন্-এ বিবেকানন্দ যে প্রবন্ধ লেখেন তার সারাংশ উপস্থিত করা হয়েছিল, বিশেষত সেই অংশটি যেখানে ম্যাক্সমূলার রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-নিবেদন করেছেন—"শুনিয়াছ কি, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 'নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং যদি উপযুক্ত উপাদান পান, তবে আনন্দের সহিত তাঁহার জীবনী ও উপদেশের আরও বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ-সংবলিত একখানি গ্রন্থ লিখিতে প্রস্তুত আছেন? কী অসাধারণ ব্যক্তি এই অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার! আমি দিনকয়েক পূর্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কাবণ যে কোনও ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসেন—তিনি নারীই হউন, পুরুষই হউন, তিনি যে কোনও মত-সম্প্রদায় বা জাতিভুক্ত হউন—তাঁহাকে দর্শন করিতে যাওয়া আমি তীর্থযাত্রাতুল্য জ্ঞান করি।... স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে হঠাৎ গুরুতর পরিবর্তন কী শক্তিতে সাধিত হইল, অধ্যাপক প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন। তারপর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন ও ঐগুলির চর্চা আরম্ভ করেন। আমি বলিলাম, 'অধ্যাপক মহাশয়, আজকাল সহস্র সহস্র লোকে রামকৃষ্ণের পূজা করিতেছে।' অধ্যাপক বলিলেন, 'এরূপ ব্যক্তিকে লোকে পূজা করিবে না তো কাহাকে করিবে?' অধ্যাপক যেন সহৃদয়তার প্রতিমূর্তি। তিনি মিঃ স্টার্ডি ও আমাকে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং আমাদিগকে অক্সফোর্ডের কতকগুলি কলেজ ও বোডলিয়ান লাইব্রেরি দেখাইলেন। রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিলেন। আমাদের জন্য এতকিছু কেন করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'প্রত্যেক দিন তো আর রামকৃষ্ণ পরমহংসের এক শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হয় না'?" [বাণী ও রচনার দশম খণ্ডভুক্ত অনুবাদের অনুসরণে]

স্বামীজীর সুরচিত রচনার এই বিশেষ অংশটি ট্রিবিউনে উপস্থিত করার মধ্যে সাংবাদিকের উপযুক্ত নির্বাচনক্ষমতার পরিচয় আছে এবং আভ্যন্তর প্রমাণে এই অংশ যে

নগেন্দ্র গুপ্তের নির্বাচন, তাও ধরে নেওয়া যায়। প্রথমত, এর মধ্যে প্রয়োজনীয় উৎসাহজনক এই সংবাদ আছে, ম্যাক্সমূলার কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের উপর একটি প্রবন্ধ লেখেননি, পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লিখতেও ব্রতী। এই সংবাদ ভারতীয় পাঠকদের মনে সবিশেষ ঔৎসুক্য-সঞ্চারক। দ্বিতীয়ত, কেশবচন্দ্র সেনের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব ব্যাপারটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। কেশবপন্থীরা ঐ প্রভাবকে লঘু করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন, সেখানে নগেন্দ্র গুপ্তের ধারণা ভিন্ন প্রকার। কেশবের উপর রামকৃষ্ণের বিপুল প্রভাবের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। উক্ত প্রভাবকে ম্যাক্সমূলার বিশেষভাবে স্বীকার করেন, বিবেকানন্দের উদ্ধৃত রচনাংশের মধ্যে তা দেখা গেল। তৃতীয়ত, নগেন্দ্র গুপ্ত রামকৃষ্ণকে সাধারণ একজন ধর্মপ্রচারক মনে করতেন না—সে আবির্ভাব দিব্য। তারই ঘোষণা ছিল বিবেকানন্দের কথায় এবং কার্যত ম্যাক্সমূলারের উক্তিতে। অংশটি নগেন্দ্র গুপ্তের মনঃপূত।

১৮৯৬ সালে ট্রিবিউন আরও বিবেকানন্দ-সংবাদ ছেপেছে, যথা লণ্ডনে স্বামীজীর সাফল্য (১ আগস্ট, ১২ আগস্ট), স্বামীজীর দুই গুরুভাই সারদানন্দ ও অভেদানন্দের পাশ্চাত্যগমন ও কার্যাবলী (৪ মার্চ, ১৪ নভেম্বর), স্বামীজীর রাজযোগ প্রকাশ (২৬ সেপ্টেম্বর), মহীশূরের মহারাজকে জনকল্যাণমূলক কাজে স্বামীজীর প্রেরণা (৯ সেপ্টেম্বর), ইত্যাদি। এর মধ্যে ট্রিবিউনের দুটি উদ্ধৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। পাশ্চাত্যে প্রচাররত বিবেকানন্দের দ্বারা সৃষ্ট সর্বভারতীয় উন্মাদনার উৎকৃষ্ট প্রমাণ দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশীয় সংবাদপত্র 'হিন্দু'র ২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৫ তারিখের উদ্দীপ্ত সম্পাদকীয়টি—ট্রিবিউন ১ জানুয়ারি ১৮৯৬ তারিখে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছিল—সেখানে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ট্রিবিউন-সম্পাদকের ব্যক্তিগত ধারণার প্রতিধ্বনি ছিল সন্দেহ নেইঃ "ভারতবাসীর জীবনের আত্মলোপ ও অগৌরবের দীর্ঘরাত্রি স্পষ্টত অবসানপ্রায়—দিগন্তে গৌরবদিনের শুভ্র উষাকিরণের উদ্ভাস। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বদা যা হয়ে থাকে এখানেও তা হয়েছে। কাল পূর্ণ হলেই আবির্ভূত হন নবযুগের স্রষ্টা—জাতীয়জীবনের আশা ও আদর্শ স্থাপনা করতে।... তাঁর [বিবেকানন্দের] পূর্বে এমন কোনও প্রাচ্যবাসীর কথা আমাদের জানা নেই যিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্যসমাজে অমন শক্তিশালী, সুগভীর এবং স্থায়ী প্রভাববিস্তারের কারণ হয়েছেন। তা ঘটেছে কেবল স্বামীজীর মহান ও উদ্দীপক বাগ্মিতা বা আমাদের পবিত্র শাস্ত্রাদিতে তাঁর প্রায়-অতুলনীয় অধিকারের জন্যই নয়, সেইসঙ্গে তাঁর চরিত্রের সুমহান সরলতা ও অপরিসীম মাধুর্যের জন্যও বটে। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের যেসব পাঠকের ব্যক্তিগত পরিচয়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাঁরা নিঃসন্দেহে আমাদের এই অভিমতের সমর্থন করবেন যে, তাঁর গৃহীত ধর্মক্ষেত্রে তাঁর অপেক্ষা মহত্তর, যোগ্যতর এবং সত্যতর প্রতিনিধি আর কেউ নেই।"

স্বামীজীর সঙ্গে ট্রিবিউন-সম্পাদক নগেন্দ্র গুপ্তের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল।

ভারতীয় পুনর্জাগরণের সম্ভাবনায় উচ্চকিত ও উল্লসিত ট্রিবিউন ২৫ জুলাই ১৮৯৬, 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার রচনাংশ উপস্থিত করেছিলঃ "এমন শত শত শিক্ষিত মানুষ আমাদের মধ্যে আছেন যাঁরা রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম পর্যন্ত শুনেছেন কিনা সন্দেহ কিন্তু তিনি অক্সফোর্ডের জার্মান অধ্যাপকের (ম্যাক্সমূলারের) সজাগ ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র। কেবল আজকের দিনেই এ-জিনিস সম্ভব, পঞ্চাশ বছর আগে তা অসম্ভব ছিল।"

১৮৯৭ সালের নভেম্বর মাসে স্বামীজী লাহোরে পৌঁছন এবং নগেন্দ্র গুপ্তের অনুরোধে তাঁর বাড়িতে আতিথ্য নেন। পঞ্জাবের নানা স্থানে স্বামীজী বক্তৃতাদি করেন। এই সময়ে এবং পূর্বের মাসগুলিতে ট্রিবিউনের পৃষ্ঠা বিবেকানন্দ-সংবাদে পূর্ণ। যথা, লণ্ডনে বিবেকানন্দের বিদায়-সংবর্ধনা (১৬ জানুয়ারি); স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তন ও দক্ষিণভারতে কল্পনাতীত সংবর্ধনা (৩০ জানুয়ারি) এবং ৩, ১০, ১৩ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড ও হিন্দু-র সংবাদ-সংকলন); বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদন (১৭ ফেব্রুয়ারি); স্বামীজীর বাগ্মিতা বিষয়ে হিন্দু-র মন্তব্য উদ্ধৃত ('স্মরণকালের মধ্যে মাদ্রাজে বিবেকানন্দই সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী,' ২০ ফেব্রুয়ারি); কলকাতায় প্রত্যাবর্তন (২৭ ফেব্রুয়ারি); আলমোড়ায় সংবর্ধনা (২২ মে) এবং আরও নানা টুকরো সংবাদ। ১৭ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজের কাগজে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে স্বামীজী একদিকে পাশ্চাত্যে তাঁর প্রচারকার্যের কথা বলেছিলেন (ইংলণ্ডে বেদান্তপ্রচারে ভবিষ্যতে অধিক সাফল্য-সম্ভাবনা; আমেরিকায় ব্যাপক সমাদরের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থাহত মিশনারিদের কুৎসা-বন্যা; হারবার্ট স্পেনসার থেকে ম্যাক্সমূলার পর্যন্ত পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বেদান্তসত্যের প্রবেশ ইত্যাদি)—তেমনি খুলে ধরেছিলেন সমকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক অধোগতির রূপ (কূপমণ্ডূকতার জন্যই ভারতের পতন, ভারতে এখন 'ভাতের হাঁড়ির' ধর্ম ইত্যাদি)। উল্লেখযোগ্য, খেতড়ির মহারাজের স্বীকারোক্তির সূত্রে ৬ নভেম্বর হিন্দু-র বোম্বাই-সংবাদদাতার মন্তব্যের উদ্ধৃতি। খেতড়ির রাজা বলেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দই তাঁকে জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যায় আকৃষ্ট করেছেন। তাঁর এই স্বীকারোক্তির সূত্রে মন্তব্য করা হয়েছিল ঃ

"এতেই বোঝা যাচ্ছে, কী অসাধারণ মানুষ এই স্বামী বিবেকানন্দ! কোনও রাজপুত রাজার মধ্যে পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করা কম কথা নয়, বিশেষত যখন একথা জানাই আছে যে বিবেকানন্দ ঐ দুই বিদ্যার কোনটিতেই বিশেষজ্ঞ নন। তবে তিনি অবশ্যই বিষয়-দুটি ভালভাবে জানেন। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য তো ধর্ম ও দর্শন। তাই এই ব্যাপারটা দেখিয়ে দিচ্ছে, অপরের মধ্যে নিহিত প্রবণতা লক্ষ্য করে, সেইসব শক্তির বিকাশে তাদের প্রণোদিত করার অসাধারণ গুণ বিবেকানন্দের আছে। ইংরেজ ও আমেরিকানদের উপর তিনি যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছেন, তার কিছু কারণ এখানে পেয়ে যাই।"

এইকালে কোনও কোনও মহলে ফ্রেনোলজির ('শিরোমিতি-বিদ্যা') চর্চা ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-জীবনীতে (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ষষ্ঠ খণ্ড) দেখা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বিদ্যার 'রীতিমত চর্চা' করতেন, এ বিষয়ে বাংলায় প্রবন্ধাদিও লিখেছেন ১৮৮৫ সাল ও পরবর্তী কালে। তাঁর আগেই ১৮৪৫ সালে কলকাতায় ফ্রেনোলজিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়ে গেছে এবং পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি থেকে সংকলন করে রাধাবল্লভ দাস ১৮৫০ সালে বাংলায় 'মনতত্ত্ব সারসংগ্রহ' প্রকাশ করেছেন। স্বামীজীপ্রসঙ্গে এইসব তথ্যের উল্লেখের কারণ, তিনিও ফ্রেনোলজি পরীক্ষার উপাদান হয়েছেন—বিদেশে এবং এদেশে। ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় ৫ অক্টোবর ১৮৯৫ সংখ্যায় নিউ ইয়র্কের 'ফ্রেনোলজিক্যাল জার্নাল'-এ প্রকাশিত স্বামীজী সম্বন্ধীয় পর্যবেক্ষণাত্মক প্রবন্ধটি উৎকলিত

হয় (অন্য কয়েকটি ভারতীয় পত্রিকাতেও তা করা হয়), তার মধ্যে জীবনীকারদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু সংবাদ ছিল—স্বামীজীর উচ্চতা ও ওজন কী, মাথার মাপ কী, মাথার অন্য অংশগুলির অবস্থানগত সৌষম্য কী প্রকার ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারতবর্ষেও স্বামীজীকে দৃষ্টি পরীক্ষার মধ্যে টেনে আনা হয়েছিল, বাংলায় নয়, পঞ্জাবে এবং ট্রিবিউন কাগজে সেই পরীক্ষাফল প্রকাশিত হয়—১৮৯৭-এর ৬ নভেম্বর। ট্রিবিউনের সম্পাদক যেহেতু কথাশিল্পী এবং সেই ভুবনে রূপপতিদের বিশেষ সমাদর, তাই ঐ তারিখের আগেই ১৭ ফেব্রুয়ারি স্বামীজীর দেহসৌন্দর্যের এক কথাচিত্র উৎকলিত হয়েছিলঃ "স্বামী বিবেকানন্দ পুরুষ-সৌন্দর্যের আদর্শবিগ্রহ। তাঁর চেহারার রূপরেখা এইঃ আকার—শক্তিশালী ও আজ্ঞাপ্রদ; বক্ষ—সিংহতুল্য প্রশস্ত ও গভীর; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—বিরাট কিন্তু সুঠাম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ; দেহভঙ্গি—স্বচ্ছন্দ সুন্দর; সম্মুখ-ললাট—উচ্চ ও বিস্তৃত; চক্ষু—বিশাল, কোমল এবং অন্তর্লীন, যেন স্থির জলে ভাসমান পদ্ম; নাসিকা—বৃহৎ কিন্তু বেমানান নয় অন্য অঙ্গাদির তুলনায়; অধরোষ্ঠ—সুন্দরভাবে খোদাই; চোয়াল—ভারী; সমস্ত মুখটি—কোমল কিন্তু মর্যাদা-মহান। কণ্ঠস্বর মধুর, গরীয়ান এবং ঝঙ্কারিত। সব জড়িয়ে মহামহিম মূর্তি—মানবজাতির জন্মসিদ্ধ নেতা।"

অন্তর্বিজ্ঞানে আমাদের সবিশেষ আসক্তির কারণে বহির্বিজ্ঞান মার খেয়েছে। যে মনোভাব গড়ে উঠেছিল তদনুযায়ী স্বামীজীর অসাধারণ সুন্দর চেহারার বর্ণনার জন্য আমাদের প্রধানত বিদেশী কাগজের উপরই নির্ভর করতে হয়। ব্যতিক্রমও আছে, যেমন ট্রিবিউনে উল্লিখিত বর্ণনাটি। এছাড়া জনৈক ভারতীয় শরীরলক্ষণতাত্ত্বিকের একটি বর্ণনাও ৬ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল। তার অংশ ঃ "স্বামীজীর মুখমণ্ডল তাঁর অনন্যসাধারণ শক্তির চমকপ্রদ নির্দেশক। তাঁর অবয়বের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র বোঝা যায়, তিনি পুরুষোত্তম। তাঁর সামগ্রিক দেহভঙ্গি দেখে প্রথমেই ধারণা জন্মে—মহান প্রশান্তির মানুষ তিনি, যা সৌন্দর্যের কিংবা অনির্বচনীয় বিরাটের ধ্যানে নিমগ্ন চিত্তের অবর্ণনীয় নির্লিপ্ত সন্তোষের অনুরূপ।... তাঁর কোমল 'কমলনয়ন' অবিলম্বে 'সর্বাত্মক পর্যবেক্ষণের' এবং অন্তর্দর্শনের ক্ষমতা দেখিয়ে দেয়। দ্বিতীয় শক্তি প্রথমটির চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে বর্তমান। অক্ষিপুটের স্ফীত অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বাগ্মিতাশক্তির নিশ্চিত নির্দেশক।... উচ্চ নাসিকা অগ্রভাগে প্রশস্ত, মস্ত ভারী চৌকশ চোয়াল—অসাধারণ দৃঢ়তা, প্রতিজ্ঞাশক্তি এবং পৌরুষের সূচক।... তাঁর মাথার গড়নে সর্বোচ্চ ধরনের মানব-বিকাশ লক্ষিতব্য। ললাটের অর্ধগোলাকৃতি সুন্দর আকার থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ রসবোধ বোঝা যায়। দৃঢ় খোদাই সুন্দর ঠোঁট দেখিয়ে দেয়, লেগে-থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চেহারাকে।... পেশীর স্বতঃস্পষ্ট শক্তির সঙ্গে কিন্তু চলাফেরার অলস মন্থরতা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সব জড়িয়ে এই হল মানবজাতির স্বতঃসিদ্ধ নায়কের আকার, কিন্তু তা [ভারতীয়] আর্য ধরনের। অর্থাৎ, আমি বলতে চাই—আর্যজাতির পাশ্চাত্য অংশে শ্রেষ্ঠ মানবের বৈশিষ্ট্য-রূপে যে-প্রাণশক্তি ও তেজঃশক্তির খেলা, সংঘাত-সংগ্রামের জন্য অস্থির আকাঙ্ক্ষা, বাধার বিরুদ্ধে প্রতিঘাত, সদাসতর্ক যুযুধান প্রবৃত্তি ইত্যাদি দেখা যায়—তা তাঁর মধ্যে নেই।... স্বামীজীর সকল গুণের শ্রেষ্ঠ গুণ হল—ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে প্রশান্ত থাকার ক্ষমতা।..."

ফ্রেনোলজি বিদ্যার যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করার অভিপ্রায় আমার নেই, স্বামীজীর

চেহারা থেকে তাঁর চরিত্রগুণ নির্ণয় করা হয়েছে, নাকি তাঁর চরিত্রগুণ ভালভাবে জেনে নিয়ে তা তাঁর মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের উপর আরোপ করা হয়েছে, সংশয়ীর মনে সে প্রশ্ন উঠবে। আমরা কেবল আনন্দিত এই দেখে যে, স্বামীজীর দেহরূপের একটি বিশ্লেষণমূলক বিবরণ এখানে পেয়ে গেলাম।

স্বামীজী সম্বন্ধে ট্রিবিউনে প্রথম সম্পাদকীয় লেখা হয় ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭—তাঁর দক্ষিণভারতীয় সংবর্ধনার বিবরণ প্রকাশিত হয়ে যাবার পরে। ভারতের দক্ষিণ অংশের আবেগতরঙ্গ দূর পশ্চিম ভারতকে কিভাবে নাড়া দিয়েছিল, তার নিদর্শন এই সম্পাদকীয়টি। ট্রিবিউনের রীতি অনুযায়ী সম্পাদকীয়টি নাতিদীর্ঘ, মন্তব্য সংযত, তারই মধ্যে ট্রিবিউন-সম্পাদক স্বামীজীর সমূহ গৌরবগান করেছেন। মাদ্রাজের অভূতপূর্ব সংবর্ধনার উল্লেখের পরে, তিনি মন্তব্য করলেনঃ "এ সকলই দেশবাসীর কাছ থেকে বিবেকানন্দের প্রাপ্য, এমন কি তার বেশিও প্রাপ্য, কারণ তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তারাজি সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সংস্কৃতিজগতের বহুসংখ্যক বিশিষ্ট মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগাতে সমর্থ হয়েছেন।" সম্পাদক স্পষ্টভাবে বললেন, স্বামীজীর আগে কয়েকজন ভারতীয় পাশ্চাত্যে গেছেন (ইচ্ছে করেই সম্পাদক তাঁদের নামোল্লেখ করেননি) কিন্তু তাঁরা ধর্মব্যাপারে পাশ্চাত্যভাবের আনুগত্য করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। অপরপক্ষে, বক্তব্য প্রকাশের ব্যাপারে বিবেকানন্দ বিদেশী ভাষার সাহায্যে খাঁটি আর্যধর্মের তত্ত্বপ্রচার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, যে বেদান্তের উপর হিন্দুধর্মের ভিত্তি, তা উদ্ভট কল্পনার উর্ধ্ববিহার নয়, যেকথা কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলে থাকেন কিংবা মানসিক উদ্ভাবন-ক্ষমতার চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্তও নয়, ফলাও করে যা অনেকে বলতে ভালবাসেন ; পরন্তু তা হল একমাত্র দর্শন যা অধ্যাত্মসত্যের সত্যকার সন্ধানী অনতিসংখ্যক আলোকপ্রাপ্ত মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে সমর্থ। ইতিহাসে বিবেকানন্দের স্থাননির্ণয়ের প্রযত্নে সম্পাদক ভিক্টর হুগো-র এই উক্তি উদ্ধৃত করলেন—"যে ব্যক্তি স্বীয় প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁর মাতৃভূমিকে বিদেশীয়দের দৃষ্টিতে অধিকতর সম্মানের পাত্রী করে তুলতে পারেন, তিনি দেশের খাঁটি সন্তান এবং দেশবাসীর পক্ষে প্রদেয় সম্ভবপর সকলপ্রকার সম্মান লাভের যোগ্য পুরুষ।" এর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ট্রিবিউন-সম্পাদক বললেন, "অন্য কোনও কারণে যদি নাও হয়, কেবল উক্ত কারণেই তরুণ বাঙালী সন্ন্যাসীর প্রত্যাবর্তন স্বদেশের সর্বত্র যে সর্বজনীন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে, তা ঘটেছে যোগ্য মানুষের জন্যই।"

এর পরেই রাওয়ালপিণ্ডি ও শিয়ালকোটে বক্তৃতাদি শেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবেশ করলেন লাহোরে—নভেম্বর মাসের গোড়ায়। ৬ নভেম্বরের সংবাদে জানা যায়, স্বামীজী শিয়ালকোটে কেবল ইংরেজীতে নয়, হিন্দীতেও ভাষণ দিয়েছিলেন। "শিয়ালকোটে স্বামীজীর অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ হল—কেবল পুরুষরা নন, মহিলারাও দলে দলে এই পরমশ্রদ্ধেয়, বহুবিস্তৃত খ্যাতিসম্পন্ন স্বামীজীর দর্শনে এসেছিলেন।"

লাহোরে স্বামীজীর অভ্যর্থনার বিপুলতায় বিস্মিত ট্রিবিউন সম্পাদক ১০ নভেম্বর লিখলেনঃ "স্বামী বিবেকানন্দ লাহোরে 'সাদর অভ্যর্থনা' লাভ করেছেন—একথা বললে শহরের উন্মাদনার অতি ক্ষীণ পরিচয় দেওয়া হয়। প্রথম বক্তৃতায় চার হাজারের বেশি লোক উপস্থিত ছিল—দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত না থাকায় অনেককে ফিরে যেতে হয়েছিল।"

আমরা জেনেছি, রাজা ধ্যান সিংয়ের হাভেলিতে আয়োজিত সেই বক্তৃতায় দূর-দূর থেকে মানুষ এসেছিল, নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে থেকেই ঐতিহাসিক ভবনটি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অপেক্ষমাণ জনতাকে তুষ্ট করতে বাইরের অঙ্গনে বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে হয়, তার জন্য আধ ঘণ্টার মতো সময়ে বিশৃঙ্খলা চলে ইত্যাদি। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ।'

স্বামীজীর তৃতীয় এবং সর্বশেষ বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ট্রিবিউন ১৭ নভেম্বরে লেখেঃ "[বেদান্ত বিষয়ে] এই বক্তৃতায় স্বামীজী যেন নিজের বিরাট ক্ষমতাকেও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর ভারতীয় বক্তৃতার সবকটি পড়েছেন এবং যাঁরা তাঁর কোনও কোনও বক্তৃতা শুনেছেন, তাঁদের মত হল—গত জানুয়ারি মাসে কলম্বোয় অবতরণের পরে তিনি যত বক্তৃতা করেছেন, তাদের মধ্যে এই বক্তৃতাতেই অদ্বৈতদর্শনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ঘটেছে।" ছাত্ররা বক্তৃতার ব্যবস্থাপনা এমন সুচারুভাবে করেছিল যে, "দুই ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ সকলে স্বচ্ছন্দে উপবেশন করে পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে।"

॥ চার ॥

১০ নভেম্বর ট্রিবিউন-সম্পাদক সম্পাদকীয় মন্তব্যে যা বলেছিলেন, তার শেষাংশ উপস্থিত করিনি, এবার তা করা যাকঃ "যাঁরা তাঁকে দেখেছেন এবং জেনেছেন, তাঁরা এটুকু বুঝে নিয়েছেন—বাগ্মী হিসাবে তাঁর বিরাট ক্ষমতা তাঁর সামগ্রিক ক্ষমতারাজির মধ্যে সবচেয়ে গৌণ বস্তু।... কোন্ শিক্ষা এবং আত্মশাসন স্বামী বিবেকানন্দকে এ হেন অনন্যসাধারণ মানুষ করে তুলেছে, সে কাহিনী এখনও লেখা হয়নি। দেখা যাবে, মূলত তা ভারতীয় কাহিনী—যাতে আছে বহু বৎসরের স্থৈর্যযুক্ত ধ্যানসাধনা, ঐকান্তিক আত্মজিজ্ঞাসা, স্বেচ্ছাগৃহীত দারিদ্র ও কৃচ্ছ্রসাধনা। এ-জিনিস ভারতীয় ফকিরদেরই সাধ্য। বহু বৎসরের কঠিন আত্মশাসন এবং নিজ মহান গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করার মধ্যেই আছে তাঁর ব্যক্তিত্বের অপূর্ব চৌম্বকশক্তির রহস্য। যে-আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক শক্তি ইউরোপ ও আমেরিকার বিস্ময় ও শ্রদ্ধা সবলে আকর্ষণ করেছে—তার সৃষ্টিরহস্য এখানেই মিলবে।"

লেখাটি থেকে বোঝা যায়, 'যাঁরা তাঁকে দেখেছেন এবং জেনেছেন', তাঁদের একজনেরই এই লেখা। সেই একজন কিন্তু কখনই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভিত্তি ছাড়া বিবেকানন্দসৌধের কথা ভাবতে পারেন না। লেখাটিতে অধিকন্তু কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শ আছে। পরবর্তী কালে আমরা জেনেছি যে, লাহোরে নগেন্দ্র গুপ্তের বাড়িতে স্বামীজী অতিথি হয়েছিলেন। সেখানে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। বিভিন্ন সময়ে স্মৃতিকথায় নগেন্দ্র গুপ্ত তা লিখেছেন। সংক্ষেপে তা উপস্থিত করব।

নগেন্দ্র গুপ্ত দাবি করেছেন, স্মৃতিকথনকালে তিনি বিবেকানন্দের কাছ থেকে সরাসরি যা জেনেছেন, তার বাইরে যাননিঃ "তাঁর জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনার প্রয়োজন নেই [নগেন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন], তা তাঁর শিষ্যদের দ্বারা প্রস্তুত চারখণ্ড জীবনীতে ভালভাবে বলা হয়েছে। আমি তাঁকে সরাসরি যেভাবে দেখেছি সেইসব ব্যক্তিগত কথাই যতদূর সম্ভব স্মরণ করে

বলব। আমি বলব, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু বৃহৎ তাৎপর্যবাহী কিছু ঘটনার কথা এবং তাঁর চরিত্রের যেসব লক্ষণাবলী চতুষ্পার্শ্বের মানুষদের মধ্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে সূচিত করে অসাধারণ আকারে তাঁকে প্রতিভাত করেছিল—সেই সকলের কথা। তাঁর সঙ্গে একই কলেজে পড়তাম। সেই অখ্যাত, সাধারণ এক ছোকরার কথা আমি জানি; আবার আমেরিকা থেকে খ্যাতি ও গৌরবের পূর্ণ ঝলক নিয়ে ফিরে-আসা স্বামী বিবেকানন্দকেও জেনেছি। আমার [লাহোরের] বাড়িতে কয়েকদিন তিনি কাটিয়েছিলেন। সেই সময়ে, মধ্যে যে কয়েক বৎসর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি সেইকালের ঘটনাবলীর কথা রাখ-ঢাক না রেখে আমাকে বলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে কলকাতার নিকটবর্তী বেলুড় মঠে। তাঁর বিষয়ে আমি যা লিখছি, তা অপরের কাছ থেকে শুনে নয়—তাঁর নিজের মুখে শুনে।"[১০]

মডার্ন রিভিউ পত্রিকার মার্চ ১৯৩০ সংখ্যায় একই ধরনের কথা তিনি বলেছেন। লাহোর স্টেশনে স্বামীজী পৌঁছলে বিরাট সংবর্ধনার ফাঁকে নগেন্দ্র গুপ্ত স্বামীজীকে বলেন, আপনার হয়তো বিশ্রামের দরকার, সেক্ষেত্রে আমার বাড়িতে চলুন। নগেন্দ্র গুপ্তের বাড়িতে স্বামীজীর শিষ্য শুদ্ধানন্দ তখন ছিলেন। অপর এক শিষ্য স্বামী সদানন্দকে নিয়ে স্বামীজী সেই রাত্রেই গুপ্তের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন এবং লাহোরে অবস্থানের পুরো সময়ে স্বামীজী গুপ্তের বাড়িতেই ছিলেন।

"দিনের পর দিন, যখনই আমি কাজের মধ্যে ফাঁক পেতাম তখন এবং গভীর রাত্রেও, আমরা কথা বলেছি। অবাক হয়ে ভেবেছি, কলেজে আমার জানা সেই মোটামুটি চুপচাপ-থাকা এবং কোনও মতেই প্রদীপ্ত ছাত্র নয় এমন একজন, কিভাবে এ হেন দারুণ বিচ্ছুরিতশক্তি ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়ালেন, পরমাশ্চর্য যাঁর কথাবার্তার ক্ষমতা এবং সকল মানুষকে তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করে কাছে এনে ফেলার মতো চৌম্বকশক্তি!! যে কোনও সমাবেশেই নিজের ভূমিরক্ষার সামর্থ্য তাঁর ছিল। অত্যুজ্জ্বল অগ্নির মতো জ্বলন্ত তাঁর উদ্দীপনা।"

নগেন্দ্র গুপ্ত একই লেখায় আরও বলেছেনঃ "তাঁর মেজাজের অন্যদিকও ফুটে উঠত যখন তিনি উচ্চাঙ্গের রসিকতা এবং ঠাট্টা-তামাশা করে প্রাণখুলে হাসতেন। তিনি চমৎকার গায়ক এবং ওস্তাদ বাদক। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে আসার পরে যেসব অভিজ্ঞতা ঘটেছিল সে সকলের কথা একেবারে খোলাখুলি আমাকে তিনি বলেছিলেন।"[১১]

আরও অগ্রসর হবার আগে, নগেন্দ্র গুপ্তের একটি মন্তব্য নিয়ে অল্প নাড়াচাড়া করা যায়। কলেজ জীবনের বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে দুটি কথা বলেছেন; উনি সাধারণ ছাত্র, দীপ্তপ্রতিভা নন এবং মোটামুটি নীরব থাকতেন। পরবর্তী কালে বিবেকানন্দের কল্পনাতীত ঔজ্জ্বল্যের অপরূপতা ফোটাতে প্রথম বয়সের অনুজ্জ্বলতার কথা বলার মূলে রচনাগত কৌশল থাকতে পারে—সাহিত্যিকরা এই কৌশল নিয়েই থাকেন। এতে অভাবিত পরিবর্তনের চেহারাটা ভালভাবে আঁকা যায়। নগেন্দ্র গুপ্ত হয়তো সেই পদ্ধতি নিয়েছিলেন কিন্তু প্রথম বয়সের নরেন্দ্র দত্ত সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য তথ্যসম্মত নয়। এখানে দুটি প্রশ্ন—নগেন্দ্র গুপ্ত কোন সময়ে কলেজে কিভাবে নরেন্দ্র দত্তকে দেখেছেন? নিকট থেকে ঘনিষ্ঠভাবে যে দেখেননি তা স্পষ্ট কারণ ঐ সময়ের কথা তিনি আদৌ বলেননি। উভয়ে এক শ্রেণীতে পড়েননি বলেই মনে হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বোক্ত জীবনীতে বলেছেন, "১৮৭৮ সনের

গোড়ায় তিনি [নগেন্দ্র গুপ্ত] কলিকাতায় আসিয়া জেনারেল এসেমব্লিজ্ ইনস্টিটিউশনে প্রবিষ্ট হন এবং ঐ বৎসর এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পারিবারিক আবহাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষালাভে অন্তরায় হওয়ায় নগেন্দ্রনাথের ভাগ্যে কোনও ডিগ্রিলাভ ঘটে নাই। জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত (জে. এন. গুপ্ত, আই-সি-এস) তাঁহার স্মৃতিকথায় জ্যেষ্ঠতাতপুত্র নগেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—"...[মেজদা] জেনারেল এসেম্‌ব্লি কলেজে পড়তেন। জগৎ-আলোক বিবেকানন্দ হয় তাঁহার সহপাঠী, নয় সেই কলেজের সহাধ্যায়ী ছিলেন। সেকথা মেজদা নিজেই একটা প্রবন্ধে বলেছেন।"

ব্রজেন্দ্রনাথের রচনা অনুসারে নগেন্দ্র গুপ্ত ১৮৭৮ সালেই মাত্র জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ্ ইনস্টিটিউশনে এনট্রান্স-পর্বে ছাত্র ছিলেন। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী অনুযায়ী স্বামীজী ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে এনট্রান্স পাস করেন। ১৮৮০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ. পড়া শুরু করে, সেই কলেজ ত্যাগ করে, ১৮৮১ সালে জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনস্টিটিউশনে গিয়ে এফ. এ. পাস করেন। সেক্ষেত্রে নগেন্দ্র গুপ্ত ও নরেন্দ্রনাথ কাছাকাছি সময়ে জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনস্টিটিউশনে পড়েছিলেন, এইটুকু মাত্র মানা যায় এবং নগেন্দ্র গুপ্ত কেবল দূর থেকে নরেন্দ্রনাথকে দেখেছেন। কলেজী পরীক্ষায় নরেন্দ্রনাথ অবশ্যই বিশেষ-রকম কৃতিত্বের পরিচয় দেননি, সে ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের প্রকট অভাব ছিল কিন্তু তিনি 'সাধারণ ছাত্র' ছিলেন, বা 'ব্রিলিয়ান্ট' যুবক ছিলেন না—একথা কোনমতেই বলা যাবে না এবং তিনি 'নীরব' থাকার পাত্রও ছিলেন না। তাঁর মজলিশী স্বভাব, সঙ্গীতপ্রতিভা, বাক্‌পটুতা, স্বভাবগত নেতৃত্ব, বিদ্যার দীপ্তি (প্রিন্সিপ্যাল হেস্টি-র মতো বিরাট পণ্ডিতের কাছেও তিনি 'জিনিয়াস', ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর দর্শনজ্ঞানের সাক্ষী) সম্বন্ধে এতরকম সাক্ষ্য আছে যে, সে সম্বন্ধে অনবহিত থাকা দেখিয়ে দিচ্ছে, ঐ সময়ে নগেন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কত ভাসাভাসা রকমের। এমন হতে পারে, এর কিছু বছর পরে নরেন্দ্রনাথ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ প্রভাবের অধীন হয়ে ঈশ্বর-অন্বেষণে অধীর এবং অন্য সবকিছু সম্বন্ধে গভীরভাবে উদাসীন, সেই সময়ে মাঝে মধ্যে তাঁকে নগেন্দ্র গুপ্ত দেখেছেন এবং তখনকার ধারণা পূর্বকালের উপর চাপিয়েছেন।

পূর্ব প্রসঙ্গে অর্থাৎ ট্রিবিউনের ১০ নভেম্বরের সম্পাদকীয়ের বক্তব্যে ফেরা যাক। ওখানে প্রথমত লাহোরে বিবেকানন্দের সংবর্ধনার কথা আছে। দ্বিতীয়ত বাগ্মিতার কথা। তৃতীয়ত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, মোহময় আকর্ষণীশক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব এবং কঠোর সাধনার কথা। এইসকল বিষয়ে স্মৃতিকথায় নগেন্দ্র গুপ্ত আরও বেশি কিছু সংবাদ পরিবেশন করেছেন।

লাহোর অভ্যর্থনার কথাই ধরা যাক। লাহোরে অবস্থান করার সময়ে নগেন্দ্র গুপ্ত শুনলেন, স্বামীজী পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস ধর্মশালা থেকে জম্মু ও কাশ্মীর গেছেন। সেখান থেকে তিনি লাহোরে এলেন। "লাহোরে জনসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। [নগেন্দ্র গুপ্ত মডার্ন রিভিউ-এর স্মৃতিকথায় লিখেছেন] বহুসংখ্যক লোক তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন—সেখান থেকে শোভাযাত্রা করে শহরের একটি বৃহৎ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। আমিও সেখানে ছিলাম।" 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' গ্রন্থে নগেন্দ্র গুপ্ত স্টেশনের

একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা লিখেছেনঃ "রেল স্টেশনে ট্রেন পৌঁছলে একজন ইংরেজ মিলিটারি অফিসার প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে নেমে সম্ভ্রমের সঙ্গে ভিতরকার কারো জন্য দরজা খুলে দাঁড়ালেন—আর পর মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দ সেখান থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন। অফিসারটি নত হয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে যাচ্ছেন, স্বামীজী তাঁকে থামিয়ে সাদরে করমর্দন করে অল্পকথায় বিদায়কালীন সম্ভাষণ জানালেন। পরে প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে অফিসারটিকে চেনেন না। কম্পার্টমেন্টে প্রবেশের পরে অফিসারটি স্বামীজীকে জানান—তিনি ইংলণ্ডে স্বামীজীর কয়েকটি আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি ইণ্ডিয়ান আর্মির একজন কর্নেল। জম্মুর লোকেরা বিবেকানন্দকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে দিয়েছিল, তাই সেই শ্রেণীতে ভ্রমণ করছিলেন।"

পরাধীন ভারতের রেলস্টেশনে একজন নেটিভ সন্ন্যাসীকে শত শত নেটিভের সামনে এক ইংরেজ কর্নেলেব এই প্রকাশ্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের তাৎপর্য কী, তা পরাধীন ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত মানুষদের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। স্মবণ রাখতে হবে, ঘটনাটা ১৮৯৭ সালের—ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম তখন দূরের ব্যাপার।

নগেন্দ্র গুপ্তের বাড়িতে অবস্থানকালে আর একটি ঘটনা—জাতিসংস্কারশূন্য মুক্তপুরুষের সাক্ষাৎ যেখানে পাওয়া যায়। "এক পঞ্জাবী ভদ্রলোক, বক্শী জৈসী রামের সঙ্গে পঞ্জাবের ধর্মশালায় বিবেকানন্দের আলাপ হয়েছিল। তিনি বিবেকানন্দ ও আমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বিবেকানন্দকে ধূমপানের জন্য নূতন চমৎকার হুঁকা দেওয়া হয়েছিল। হুঁকাটি ব্যবহারের আগে বিবেকানন্দ গৃহস্বামীকে বললেন, 'জাতি-ব্যাপারে আপনার যদি গোঁড়ামি থাকে তাহলে হুঁকাটি আমাকে ব্যবহার করতে দেবেন না কারণ আগামী কাল যদি কোনও ঝাড়ুদার আমাকে তাঁর হুঁকা সেজে দেয়, আমি তা আনন্দের সঙ্গে টানব। আমি জাতিসীমার বাইরে আছি।' গৃহস্বামী বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, স্বামীজী হুঁকাটি ব্যবহার করলে তিনি ধন্যবোধ করবেন। ভারতে পরিব্রাজক জীবনেই অস্পৃশ্যতার সমস্যা স্বামীজী নিজের জন্য সমাধান করে ফেলেছিলেন। উচ্চবর্ণ স্পর্শও করবে না এমন দরিদ্রতম দীনতম মানুষের দেওয়া আহার্য তিনি গ্রহণ করেছেন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন তাদের আতিথ্য।"

"তাই বলে", নগেন্দ্র গুপ্ত বিবেকানন্দের মহামহিম ব্যক্তিত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, "বিবেকানন্দ কোনমতে ন্যাতানো নীচু স্বভাবের মানুষ ছিলেন না। তাঁর সর্বোচ্চ ভাষণের অন্যতম লাহোরের 'বেদান্ত' বক্তৃতাকালে মস্তক উন্নত করে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে, তিনি বলেছিলেন, 'এ পৃথিবীতে সর্বাধিক গর্বিত জীবিত মানুষদের আমি একজন।' এ কোনও অপদার্থের অহঙ্কার নয়—এ হল নিজের বিরাট ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন এক পুরুষের সুমহান গর্ব—যার মধ্যে ছিল দেশের চরম অধোগতি ঘটিয়েছে যে-ধরনের অতিবিনয়ের নাটুকেপনা, তার বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণার বিস্ফোরণ।"

লাহোরে স্বামীজীর অবস্থানকালে [মডার্ন রিভিউ-এর রচনায়] একটি বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনার কথা নগেন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, যা অলৌকিকতার ধার ঘেঁষে যায়। গোলবাগেব টাউন হলে লাহোরের নাগরিকরা বিবেকানন্দের জন্য গার্ডেন পার্টির আয়োজন করেন।

"আমার বিশেষ পরিচিত [গুপ্ত লিখেছেন] এক পার্শী ভদ্রলোক গোলবাগের অপরদিকে বাস করতেন। গোলবাগে ভিড় জমেছে, প্রবেশপথের কাছে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক লক্ষ্য করছিলেন। সেইসময়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন, উনি পার্শী কিনা? কোথা থেকে এসেছেন—বোম্বাই না কলকাতা? পার্শী ভদ্রলোক জানালেন, বোম্বাই থেকে। দুজনের মধ্যে আরও দু-চার কথা হল, তারপর স্বামীজী ধীরগতিতে উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পার্শী ভদ্রলোক স্বামীজীকে জানতেন না, পরেও স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। [এখানে স্মর্তব্য, সেকালের কাগজে কদাচিৎ ছবি ছাপা হত, বিশেষত ভারতীয়দের এবং সাধারণ একজন পার্শী তৎকালীন জাতীয় জাগরণের নেতা সম্বন্ধে অবহিত না থাকতেই পারেন, বিশেষত তাঁর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপের মানুষটি যে স্বামী বিবেকানন্দ, তাও তিনি না বুঝতে পারেন]। স্বামীজীর নাম অবশ্য তিনি পরে শুনেছিলেন। দু-এক বৎসর পরে ভদ্রলোক, উনি এখনও আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বোম্বাই ফিরে গিয়ে ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন। আরও কিছু বছর গেল, তারপর তিনি ধারাবাহিক স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন, তাতে অদ্ভুতরকমের দৃশ্যাদি দেখে খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। সেসবের মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলেন না। তিনি প্রায়ই দেখতেন—একটি কালো মূর্তি, তার চারধারে আরও কয়েকটি মূর্তি। স্বপ্নে মনে হত, তিনি সবসময়ে উত্তরদিকে হাঁটছেন। এই কাহিনী আমি স্বয়ং তাঁর মুখে শুনেছি। কোনই সন্দেহ নেই, এই সুস্পষ্ট এবং প্রায়শ-সংঘটিত স্বপ্নে তিনি বিশেষরকম বিচলিত হয়েছিলেন। চার কি পাঁচ বছর আগে [এই লেখা প্রকাশের সময় মার্চ ১৯৩০] বোম্বাইয়ের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি একটা দোকানের শো-কেসে স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী রক্ষিত দেখতে পান। তৎক্ষণাৎ দোকানে ঢুকে বইগুলি কিনে ফেলেন, পড়েন এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর গোটা জীবনের ধারা বদলে যায় এবং বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনে বেশ কয়েক হাজার টাকা দান করেন কিন্তু তাঁর নাম যেন কোনভাবে এ-ব্যাপারে প্রকাশিত না-হয় সে সম্বন্ধে দৃঢ় নিষেধ করেন।"

ঐতিহাসিক তথ্যমূলক রচনার স্বাদবৃদ্ধির জন্য নগেন্দ্র গুপ্তের মতো সতর্ক বা সন্দিগ্ধ, বিচারশীল লেখক-পরিবেশিত এই 'স্বপ্নমঙ্গলকথা' উপস্থিত করলাম।

রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতার যেসব কথা নগেন্দ্র গুপ্ত বিবেকানন্দের মুখে শুনে লিপিবদ্ধ করেছেন, তাদের অধিকাংশই স্বামীজীর জীবনীতে বিস্তৃতভাবে লিখিত ও ব্যাখ্যাত। যথা, অখ্যাত এক ছোকরা নরেন্দ্র সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের অতিকায় ভবিষ্যদ্বাণী, যা সমকালে হাস্যকর কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে বাস্তবাধিক বাস্তব। স্থায়ী সমাধির জন্য নরেন্দ্রের ব্যাকুল প্রার্থনা ও রামকৃষ্ণের নিষেধাত্মক উত্তর। তবে মাঝে মাঝে তাঁর সমাধির আকাঙ্ক্ষা পূরণ। প্রথম পর্বে নরেন্দ্রের এই সংক্রান্ত একটি অভিজ্ঞতার কথা, যা জীবনীতেও আছে, নগেন্দ্র গুপ্তের স্মৃতিকথায় তার রূপ এই—রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে স্পর্শ করলেন। তারপর—"বিবেকানন্দের মুখ থেকে আমি (গুপ্ত লিখেছেন) স্বকর্ণে শুনেছি"—"সেই মুহূর্তে বালকটি সহসা দেখল চোখ-ধাঁধানো আলোর ঝলক, অনুভব করল, তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পৃথিবীর মাটি থেকে উপড়ে। আতঙ্কে সে কেঁদে উঠল—'আমাকে নিয়ে এ কী করছ তুমি? আমার যে, মা ভাইয়েরা আছে।' পরমহংস তার পিঠ চাপড়ে ঠাণ্ডা করে বললেন, 'হয়েছে হয়েছে! এখন এতেই হবে'।"

বিবেকানন্দের মুখ থেকে তাঁর পরিব্রাজক-জীবনের নানা ঘটনা নগেন্দ্র গুপ্ত শুনেছিলেন, তার মধ্যে স্মরণ করে তিনি দু-একটির কথা বলেছেন, যার বেশির ভাগ আবার স্বামীজীর জীবনীতে পাই। যেমন, একটি ঘটনা, যার মধ্যে পরাধীন ভারতে পুলিশী প্রতাপ, পথচারী সাধুদের নানা দুর্দৈব, বিবেকানন্দের তৎপর বুদ্ধি ও অপরাজেয় রসবোধের নমুনা। তাঁর বিহারে থাকাকালে দারুণ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি ছিল। অনেক জেলায় দেখা গেল, শস্য লাগানো, সিঁদুর মাখানো এক তাল মাটি আম গাছগুলির গুঁড়িতে চাপড়ানো রয়েছে। সাম্রাজ্যরক্ষী সরকারের অপরাধী মনে ভয় ঢুকে গেল, তবে কি পূর্বতন মিউটিনির চাপাটি-সংকেতের মতো এ কোনও বিদ্রোহের ঘোষণা? গাঁয়ে গাঁয়ে সশস্ত্র পুলিশ ভরে গেল। সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা একবাক্যে বলল, কে বা কারা ও জিনিস করেছে তা তারা জানে না। তখন সন্দেহ গিয়ে পড়ল পথচারী সাধুদের উপর। কিন্তু তখনও বর্তমানের (অর্থাৎ স্বদেশী যুগের পরবর্তী কালের) মতো বিনা বিচারে কয়েদের নানা আইনকানুনের জাল দেশে ছড়ায়নি। যাই হোক, তখন বিবেকানন্দের কাজ—খুব ভোরে উঠে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে, কিংবা কোনও গ্রাম্য পথ ধরে হাঁটা, যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ তাঁকে কিছু খাদ্যবস্তু দেয়, কিংবা তিনি তীব্র গরমে পথের ধারে কোনও গাছতলায় বিশ্রাম করতে বাধ্য হন। এক সকালে পথ ধরে হাঁটছেন, পিছনে প্রচণ্ড হাঁক—'ঠারো!' ফিরে দ্যাখেন, ঘোড়ার পিঠে পুলিশ অফিসার, মুখে দাড়ি, গায়ে জমকালো পোশাক, হাতে চাবুক, পিছনে পুলিশের পাল। সুপরিচিত পুলিশী রাসভমধুর কণ্ঠে তিনি হাঁক দিলেন—'কে তুমি?' বিবেকানন্দ বললেনঃ 'দেখতেই পাচ্ছেন খানসাহেব—আমি সাধু।' গাঁ-গাঁ করে মহাবিচার ঘোষণা করলেন পুলিশের উক্ত সাব-ইনস্পেকটার—'সব সাধু বদমাশ।' এই সিদ্ধান্তের উপর আপীল নেই কারণ ভারতের পুলিশ সত্য বই মিথ্যা বলে না। তদনুযায়ী তারপরেই গর্জে উঠলেন, 'চলো হামারা সাথ। তোমাকে জেলে ঢুকিয়ে তবে ছাড়ব।' শুনে বিবেকানন্দ একেবারে বিগলিত, 'কতদিনের জন্য খানসাহেব?' সাহেবের সুগম্ভীর উত্তর, 'পনের দিনের জন্য হতে পারে, মাসখানেকের জন্যও হতে পারে।' বিবেকানন্দ আর থাকতে পারলেন না, খানসাহেবের একেবারে গায়ের কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, কণ্ঠে যতখানি সম্ভব অনুনয়ের কাতরতা ঢেলে দিয়ে বললেন, প্রায় কাঁদো-কাঁদো ভাবে—'খানসাহেব, মাত্র একমাসের জন্য? ওটাকে ছয় মাস, নিদেন তিন কি চার মাস করতে পারেন না?' পুলিশ অফিসারের চক্ষু ছানাবড়া—গাল ঝুলে পড়ল—'এক মাসের চেয়ে বেশি জেলে কাটাবার ইচ্ছে কেন তোমার?' বিবেকানন্দ একান্ত নির্ভরতার স্বরে ফিস্‌ফিস্ করে বললেনঃ 'এই জীবনের চেয়ে জেলের জীবন অনেক ভালো। এখন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে মরছি, প্রতিদিন খাবার জোটে না, না খেয়ে পড়ে থাকতে হয়। জেলে তো দুবেলা পেট পুরে খাবার জুটবে। সাহেব, যদি কৃপা করে কয়েক মাস জেলবাসের সুযোগ করে দেন, বড়ই কৃতজ্ঞ থাকব।' খানসাহেব যতই শুনছেন ততই হতাশা ও বিরক্তিতে তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠছে। মুখ ফিরিয়ে পুনশ্চ গর্জন করে বললেন, 'ভাগো হিঁয়াসে।'

আর একটি পুলিশী অভিজ্ঞতার কথা স্বামীজী বলেছিলেন, সেটা বরাহনগর মঠের ব্যাপার। স্বামীজীদের পারিবারিক বন্ধু এক বড়দরের পুলিশ কর্মচারী (সি আই ডি-র এস পি) স্বামীজীকে নিজের বাড়িতে রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেন। খাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই

করেননি, উল্টে চাপ দিয়ে জানতে চান, বরাহনগর মঠে যারা জুটেছে তারা কী ধরনের রাজদ্রোহের কাজ করছে কারণ সেইরকম খবরই তাঁর কাছে আছে। 'আর তুমিই তাদের লীডার। সবাইকে পাকড়াও করা হবে, তবে তুমি যদি অ্যাপ্রুভার হও, তাহলে ছাড়ান পাবে।' লোকটির অসভ্য ব্যবহারের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য স্বামীজী উঠে পড়ে, প্রথমে দরজাটি বন্ধ করলেন, তারপর নিজের ব্যায়ামপুষ্ট শক্তিশালী চেহারাটি মেলে ধরে, পুঁচকে চেহারার ক্ষীণজীবী পুলিশ অফিসারকে বললেনঃ "ছল করে আমাকে বাড়িতে ডেকে এনে আপনি রাজ্যের মিথ্যে অভিযোগ আমার এবং আমার বন্ধুদের বিরুদ্ধে করছেন। এই হল আপনার চাকরির প্রকৃতি। অপরপক্ষে আমার প্রকৃতি হল অপমান হজম না-করা। আমি যদি ষড়যন্ত্রকারী বা অপরাধী হতাম তাহলে এখনি, আপনি কাউকে ডাকার আগেই, আপনার ঘাড় মটকে দিতাম, বাধা দিত কে? যাই হোক, আপনাকে ছেড়ে দিলাম।" অফিসারটি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন, স্বামীজী দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

জীবনীতে আছে এমন একটি হাস্য-করুণ ঘটনার কথাও স্বামীজীর মুখে নগেন্দ্র গুপ্ত শুনেছেন। পরিব্রজ্যাকালে স্বামীজী একবার ব্রত নিয়েছিলেন, সারাদিন তিনি সামনের দিকে হাঁটবেন, পিছন ফিরবেন না এবং কারো কাছে ভিক্ষা চাইবেন না। যদি কেউ স্বেচ্ছায় তাঁকে খাদ্য দেয় তবেই থামবেন। এই পর্যায়ে কখনও কখনও তাঁকে চব্বিশ ঘন্টা, এমনকি আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত অনাহারে কাটাতে হয়েছে। একবার সন্ধ্যার মুখে তিনি এক ধনী ব্যক্তির আস্তাবলের কাছ দিয়ে এগোচ্ছিলেন, সেখানে সহিস দাঁড়িয়েছিল, স্বামীজী দুদিন খাননি, তাঁকে খুবই ক্লান্ত ও দুর্বল দেখাচ্ছিল। তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে, সহিসটি সেলাম করে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সাধুবাবা, আজ কি আপনার আহার হয়েছে?' স্বামীজী জানালেন, না, সারাদিন কিছু খাননি। সহিস তাঁকে আস্তাবলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে, হাত-মুখ ধোয়ার জল দিয়ে, নিজের খাবারটি তাঁর হাতে তুলে দিল—কয়েকটি চাপাটি ও একটু লঙ্কার চাটনি। স্বামীজী পরিব্রাজক পর্বে (বরাহনগর মঠেও) খুব ঝাল লঙ্কা খেতে অভ্যস্ত ছিলেন, অনেক সময়ে তাই ছিল ভাতের সঙ্গে একমাত্র তরকারি। নগেন্দ্র গুপ্ত তাঁকে পরমানন্দে মুঠোভর্তি কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে খেতে দেখেছেন। সে হেন বিবেকানন্দ চাপাটি ও চাটনি খেলেন কিন্তু তার পরেই বিপর্যয় কাণ্ড—পেটের যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল, ভিতরে আগুন জ্বলতে লাগল, অসহ্য কষ্টে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তা দেখে সহিসের কষ্টের সীমা রইল না, মাথা চাপড়ে বলতে লাগল, 'এ আমি কী করলাম, সাধুকে মেরে ফেললাম!' যন্ত্রণাটা নিশ্চয় ঘটেছিল দীর্ঘসময় খালিপেটে থেকে তীব্র ঝাল লঙ্কার চাটনি খাওয়ার জন্য। ঠিক সেই সময়ে ঝুড়ি-মাথায় একটি লোক যাচ্ছিল, সহিসের কাতরোক্তি শুনে থেমে পড়ল। স্বামীজী যখন শুনলেন, তার ঝুড়িতে তেঁতুল আছে, তখন বললেন, 'আঃ, ঠিক ঐ জিনিসটিই আমার দরকার।' সেই তেঁতুল গোলা জল খেয়ে তবে তাঁর পেটের যন্ত্রণা যায়। বাঘা ঝালের মুখে পড়েছিল বাঘা তেঁতুল।

হিমালয়ে ভ্রমণকালীন অনেক অভিজ্ঞতার কথা নিশ্চয় স্বামীজী নগেন্দ্র গুপ্তকে বলেছিলেন। আফসোসের কথা, সেসব গুপ্ত লিখে যাননি। কেবল সারসংক্ষেপ করেছেন এই বলেঃ "হিমালয়ের ভিতরে দূর অঞ্চলে বিবেকানন্দ নানাপ্রকার বিপজ্জনক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। অতীব সাহস এবং জীবনীশক্তিসহায়ে

তিনি অধ্যাত্মসাধনার নীতিনিয়ম পালন করে গেছেন। সহ্যশক্তির দীর্ঘস্থায়ী পরীক্ষা, অখণ্ড আত্মশাসন, নিবিড় ধ্যান এবং নিরন্তর ঈশ্বরসান্নিধ্যের বোধ—এই ছিল তাঁর ব্রতসাধনা।"

স্বয়ং তীক্ষ্ণবুদ্ধি বহুদর্শী সাংবাদিক ও লৌকিক জীবনের কথাশিল্পী হলেও নগেন্দ্র গুপ্ত বিবেকানন্দের চরিত্রায়নের কালে বারে বারে তাঁর অধ্যাত্মচরিত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কোন্ শক্তিতে স্বামীজী অকূল সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, লড়াই করেছিলেন উত্তাল তরঙ্গমালার সঙ্গে, তার কারণও তিনি একই দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেনঃ "পরিব্রাজক জীবনের অভিজ্ঞতাই এই বন্ধুহীন, অর্থসামর্থ্যহীন সন্ন্যাসীকে আমেরিকার বিরূপ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামের শক্তি দিয়েছিল—যাঁর সম্বল নিজের বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি।"

বিবেকানন্দের মুখে নগেন্দ্র গুপ্ত আমেরিকায় বিখ্যাত হয়ে যাবার পরে চূড়ান্ত খাতিরের কাহিনী শুনেছেন, তবে স্বামীজী সেসব নিয়ে মজাও করেছেন। তিনি রাশি রাশি প্রেমপত্র পেয়েছেন, দাঁতের ডাক্তার তাঁব তত্ত্বাবধান করতে এবং বিউটি পার্লারের মালিক তাঁব নখের ঔজ্জ্বল্যবিধানে কী প্রকার উৎসাহী ছিলেন, তাও বলেছেন। কিন্তু সব মজা হারিয়ে যেত যখন ভারতপ্রসঙ্গ আসত। স্বপ্ন-সাধ-সাধনা ও যন্ত্রণার ভারত তাঁর।

"স্বদেশের প্রতি বিবেকানন্দের ব্যাকুল ভালবাসা ও তীব্র অনুভূতিই আমাকে সবচেয়ে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর মধ্যে ঘটেছিল আধ্যাত্মিক উন্মাদনা ও অন্তর্ভেদী মনীষার নিখুঁত মিশ্রণ। বহু সমস্যার আসল রূপ তিনি যথাযথ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং অধিকাংশেব সমাধানের উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। ভবিষ্যদর্শনের অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'ভারতের মধ্যবিত্ত সমাজের শক্তি নিঃশেষিত। তাদের মধ্যে দৃঢ়সংকল্প ও ধারাবাহিক প্রয়াসের তাগিদ নেই। ভারতের ভবিষ্যৎ—জনগণের হাতে।' এক অপরাহ্ণে ভাবমগ্ন মুখে তিনি ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে বললেন, 'আমি জেলে গেলে যদি দেশের কোনরকম উপকার হয়, তাহলে আমি প্রস্তুত।' আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তখনও তাঁর ললাটের জয়তিলক শুকোয়নি—সে সম্বন্ধে উল্লেখমাত্র না করে তিনি স্বেচ্ছায় জীবনের আকাঙ্ক্ষিত পরিণতিরূপে কারাগারে প্রবেশের কথা ভাবছেন, যার দ্বারা হয়তো তাঁর দেশের ক্ষুদ্র কোনও উপকার ঘটতে পারে! তাই বলে শহীদের মুকুট পরার অভিলাষ তাঁর ছিল না, ওসব ভান একেবারেই ছিল না তাঁর মধ্যে, তাঁর মন নিঃসন্দেহে পাক খাচ্ছিল একটি ভাবনায়—আত্মত্যাগের দ্বারা যদি আসে দেশের মুক্তি।"

একই প্রসঙ্গঃ "জাপান দেখার পরে জাপানী জাতির দেশপ্রেমের রূপ তাঁর মনকে পূর্ণ করেছিল একান্ত বিস্ময় ও শ্রদ্ধার আবেগে। উৎসাহে উজ্জ্বল মুখে তিনি বলেছিলেন, জাপানীদের কাছে তাদের দেশই ধর্ম। জাপানের জাতীয় ধ্বনি—'জয় জাপান!' সবার উপরে তাদের দেশ। দেশের মর্যাদা ও সংহতি রক্ষার জন্য কোনও ত্যাগই তাদের কাছে বড় ত্যাগ নয়।"

নগেন্দ্র গুপ্ত ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত (ঠিক কোন সময় পর্যন্ত জানি না) ট্রিবিউনের সম্পাদক ছিলেন। আগেই বলেছি, ১৮৯৮ সালের ট্রিবিউনের পুরাতন সংখ্যা পাওয়া যায়নি। অথচ ঐ সময়ে স্বামীজীর সঙ্গে নগেন্দ্র গুপ্তের দেখা হয়েছে। সে বিষয়ে গুপ্তের দু-এক টুকরো স্মৃতিকথা উপস্থিত করতে পারি।

১৮৯৮ সালের মে মাসে আলমোড়ায় থাকাকালে স্বামীজীর সঙ্গে অ্যানী বেশান্তের সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। স্বামীজীর ২০ মে-র চিঠি থেকে জানা যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর (ধর্মমহাসভায় ইনি থিয়জফিক্যাল সোসাইটির প্রতিনিধিত্ব করেন) স্ত্রীর (ইনি পরবর্তী কালে যশোদা মাতা নামে পরিচিত) নির্বন্ধে পড়ে তিনি বেশান্তের সঙ্গে দেখা করেন। শ্রীমতী চক্রবর্তী গাজিপুরের গগনচন্দ্র রায়ের কন্যা। পরিব্রজ্যাকালে এঁর বাড়িতে স্বামীজী কিছুদিন ছিলেন—সেইসময়ে বালিকা কন্যাটিকে স্বামীজী খুবই স্নেহ করতেন। আলমোড়ায় তাঁর অনুরোধ এড়াতে না পেরে স্বামীজী অ্যানী বেশান্তের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হন। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, কিছু-বেশি এক বৎসর আগে স্বামীজী কঠোরভাবে থিয়জফিক্যাল সোসাইটির কিছু কর্তার দুমুখো আচরণের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করেছিলেন, সেইসঙ্গে থিয়জফি-মত সম্বন্ধেও বিরূপ ধারণার কথা বলেন। তবে ব্যক্তিগতভাবে অ্যানী বেশান্ত শ্রদ্ধেয় মহিলা, এও জানান। এই পটভূমিকায় বেশান্তের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎকারে আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে স্বামীজী তাঁব চিঠিতে যে-কথা লিখেছেন, তাঁর পূর্বতন জীবনীগুলিতে তার অতিরিক্ত কোনও কথা নেই। তবে 'যুগনায়ক' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (পৃঃ ২৪৯) স্বামী গম্ভীরানন্দ নগেন্দ্র গুপ্তের 'স্মৃতিকথা' থেকে ঘটনাটির কথা বলেছেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু কথাবার্তা যে অ্যানী বেশান্তের সঙ্গে হয়েছিল তাব উল্লেখ করেননি। স্বামীজীর পত্রে পাই, সাক্ষাৎকালে "এনি বেস্যান্ট আমাকে অনুনয় করে বললে যে, আপনার সম্প্রদায়ের সহিতং যেন আমার সম্প্রদায়ের পৃথিবীময় প্রীতি থাকে, ইত্যাদি।" এক্ষেত্রে অতিরিক্ত কথা পাই একমাত্র নগেন্দ্র গুপ্তের স্মৃতিকথায় এবং তাঁর কথিত 'বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ইংরেজ মহিলা' নিঃসন্দেহে অ্যানী বেশান্ত, একথা বলা যায় বলে বিবেকানন্দ-অনুসন্ধিৎসুদের কাছে তার মূল্য আছে। নগেন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, "একবার আলমোড়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন (স্বামীজীর চিঠিতে আছে, তিনিই দেখা করতে যান; বেশান্ত ফিরতি-দেখা করেন; ইংরেজী জীবনীর প্রথম সংস্করণে উভয়ের দুবার সাক্ষাতের কথা আছে) বিশিষ্ট ও বিখ্যাত এক ইংরেজ মহিলা। হিন্দুধর্মের আচার্যের ভূমিকা নিয়েছেন বলে বিবেকানন্দ সেই মহিলার সমালোচনা করেছিলেন। মহিলা জানতে চান, ঠিক কোথায় তিনি আপত্তির হেতু হয়েছেন? বিবেকানন্দ উত্তরে বলেন, 'তোমরা ইংরেজ—কেড়ে নিয়েছ আমাদের দেশ, হরণ করেছ স্বাধীনতা, স্বভূমিতে আমাদের দাসজাতিতে পরিণত করেছ, তোমরা শোষণ করে নিয়ে যাচ্ছ আমাদের সব সম্পদ। তাতেও সন্তুষ্ট নও—এখনও এদেশে অবশিষ্ট আছে যে ধর্ম, তাও কেড়ে নিতে চাও—আমাদের ধর্মগুরুর আসনে বসবার মতলব তোমাদের'!"

এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, স্বামীজী এই সাক্ষাৎকারের আগেই ১১ মার্চ ১৮৯৮, স্টার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত নিবেদিতার এক বক্তৃতাসভায় সভাপতির ভাষণে অ্যানী বেশান্তের ভারতপ্রীতির প্রশংসা করেছিলেন।

স্বামীজী সম্পর্কে নগেন্দ্র গুপ্ত লিখিত ১৮৯৮ সালের একটি উপভোগ্য স্মৃতিকথা উপহার দেব। আষাঢ় ১৩০৮ প্রবাসীতে নগেন্দ্র গুপ্ত উৎকৃষ্ট কথাচিত্র-সমন্বিত এবং তথ্যসম্বলিত কাশ্মীর ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন—সেই সময়কার কাশ্মীরের প্রকৃতি ও মানুষের বিষয় জানতে হলে লেখাটি উপকারে লাগবে। এখানে তার থেকে স্বামীজী-সংশ্লিষ্ট অংশটি তুলে ধরছি, "অন্যান্য সামগ্রীর মতো কাশ্মীরের কলহও প্রসিদ্ধ। মারামারি প্রায় কখনই

হয় না, কিন্তু গালাগালির বৈচিত্র্য ও ঘটা এমন নাকি আর কোথাও নাই! ঝগড়াতে রূপকের ছড়াছড়ি। একটা ঝগড়ার বর্ণনা করিয়া এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ শেষ করি।...

"এক দিবস সূর্যোদয়ের কিছু পরে পরপারে তুমুল কোলাহল শুনিয়া নৌকা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। নদী অপ্রশস্ত, এক পারে চীৎকার করিলেই অপর পারে শুনিতে পাওয়া যায়। দেখিলাম, একজন পক্ককেশ কিন্তু বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি বসিয়া পাথর ভাঙিতেছে; একটা স্ত্রীলোক ও দুই-তিনজন পুরুষ তাহাকে ঘিরিয়া ভয়ানক চীৎকার ও আস্ফালন করিতেছে। সকলেই মুসলমান। নৌকার একটা মাঝিকে ডাকিয়া ব্যাপারখানা জানিলাম। যে পাথর ভাঙিতেছে, স্ত্রীলোকটা তাহারই স্ত্রী; অপর পুরুষ দুইজন স্ত্রীর ভাই; ভাই ভগিনী একদিকে, আর সেই পাথর-ভাঙা বৃদ্ধ আর একদিকে। তাহাকে বৃদ্ধ বলা অন্যায়, কারণ তাহার নগ্নদেহ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার শরীরে বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে। সে ব্যক্তি যেন কিছুই শুনিতেছে না, লোহার হাতুড়ি দিয়া এক মনে পাথর ভাঙিতেছে। সহসা স্ত্রীলোকটা দৌড়িয়া তাহাদের নৌকায় প্রবেশ করিল—নৌকা ছাড়া অনেকের অন্য গৃহ নাই—ও কতকগুলা মলিন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড আনিয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিল। এ প্যান্টোমাইমের [মূকাভিনয়ের] অর্থ এই যে, যখন তুমি আমায় বিবাহ করিয়াছিলে, তখন তোমার এইরূপ দুর্দশা ছিল, অঙ্গে বস্ত্র জুটিত না, আমার জন্য এখন তুমি পরিতে পাও। ষাঁড় যেমন লাল ন্যাকড়া দেখিলে রাগিয়া ওঠে, ময়লা ন্যাকড়াগুলা দেখিয়া তাহার স্বামী সেইরূপ জ্বলিয়া উঠিল। হাতুড়ি ফেলিয়া, লাফাইয়া উঠিয়া, সকলকে গালি পাড়িতে লাগিল। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

"আমার নৌকার পাশে প্রথিতযশা বিবেকানন্দ-স্বামীর নৌকা বাঁধা ছিল। এইসময়ে তাঁহাকে ডাকিলাম। তিনি বাহির হইয়া আমার নৌকায় আসিলেন। সে ব্যক্তি আবার পূর্বের মতো পাথর ভাঙিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী আবার নৌকায় গিয়া কতকগুলা হাঁড়ি লইয়া আসিল—অর্থ, তোমাব এইরকম শুধু হাঁড়ি ছিল, পেটে ভাত জুটিত না, এখন আমার জন্য খাইতে পাইতেছ। কিছুকাল এইরকম রূপক-যুদ্ধের পর এক শ্যালক আসিয়া, ভগিনীপতির মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গালি দিতে লাগিল। বৃদ্ধ তখন ক্রোধসংবরণ করিতে না পারিয়া শ্যালককে চপেটাঘাত করিল। অমনি শ্যালকদ্বয়, ভগিনী ও ভগিনীপতি জড়াজড়ি করিয়া ভাঙা পাথরের উপর পড়িল। পাশে অনেক লোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল কিন্তু ছাড়াইবার জন্য কেহ অগ্রসর হইল না। বৃদ্ধের বাহুতে এমন শক্তি যে, সে শ্যালকদ্বয় ও স্ত্রীকে প্রহার করিয়া, সরিয়া গিয়া বসিল। তাহারা তিনজন তিনরকম সুরে কাঁদিতে লাগিল।

"বিবেকানন্দ-স্বামী ও আমি ডিঙ্গিতে করিয়া, পার হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। এক শ্যালকের পিঠে পাথর ফুটিয়া রক্ত বহিতেছে। বিবেকানন্দ-স্বামী বৃদ্ধকে বলিলেন, 'স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিস, তুই এত বড় পাষণ্ড!' সন্ন্যাসীর ক্রোধ দেখিয়া সকলে ভীত হইল। আমি মাঝিকে দিয়া স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করাইলাম, কি হইয়াছে? সে তাড়াতাড়ি লোহার হাতুড়িটা তুলিয়া লইয়া বলিল, আমাকে এই হাতুড়ি দিয়া মারিয়াছে। কথাটা বাড়াইয়া বলিল কিন্তু আমরা তাহা অবিশ্বাস না করিয়া, তাহার স্বামীকে বলিলাম, 'আয়, আমাদের নৌকায় আয়, তোকে পুলিশে দিব।'

"তৎক্ষণাৎ স্বামীর স্ত্রী-বিদ্বেষ অন্তর্হিত হইল। শ্যালকরাও মিনতি করিতে লাগিল,

যেন অপরাধীকে ধরিয়া না-লইয়া যাওয়া হয়। আমরা কোনো কথা শুনি না দেখিয়া স্ত্রী নৌকায় গিয়া একটি শিশুকে কোলে করিয়া আনিয়া স্বামীর কোলে দিল—যেন জন্মের শোধ সে একবার স্ত্রী-পুত্রকে দেখিয়া লইবে। সকলের নিকট বিদায় লইয়া বুড়ো আমাদের নৌকায় উঠিল। আমাদের যে কী ক্ষমতা তাহাকে লইয়া যাই, সেকথা কেহ একবার জিজ্ঞাসা করিল না। একজন সন্ন্যাসী, আর একজন পরিব্রাজক, আমাদিগকে যদি মারিয়া হাঁকাইয়া দেয় তো কোনো উপায় নাই, কিন্তু কেহই কোনো কথা বলিল না, কেহ বৃদ্ধকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল না। তাহাকে পারে লইয়া আসিয়া, খানিক বসাইয়া রাখিয়া, ধমক দিয়া আবার ছাড়িয়া দিলাম।"

নগেন্দ্র গুপ্তের এই বিবরণের তথ্যগত নয়, ব্যাখ্যাত্মক অংশ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা যায়। দৃষ্টি দিতে বলি, নারীর উপর উৎপীড়নের ক্ষেত্রে স্বামীজীর কঠোর মনোভাবের দিকে। স্বামী ও স্ত্রী—দুই পক্ষের ঝগড়া তিনি, তাঁর যে-রকম মজাদার স্বভাব, তাতে খুবই উপভোগ করছিলেন, ধরে নেওয়া যায়। এমনকি পুরুষদের অল্পমাত্রার মারামারির শরীর-প্রতিযোগিতায় আপত্তি থাকার কথা নয় কিন্তু যে-মুহূর্তে নারীর গায়ে হাত উঠল সেই মুহূর্তে তিনি অগ্নিমূর্তি। আর একটি কথা, নগেন্দ্র গুপ্ত যে বলেছেন, বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী আর তিনি ভ্রমণকারী, এই যখন তাঁদের পরিচয় তখন তাঁরা যখন পুলিশে দেবার কথা বললেন, তখন কেনই-বা লোকগুলি তা মেনে নিয়ে, পুরো বিয়োগান্ত একটি নাটকীয় দৃশ্য সৃষ্টি করল? নগেন্দ্র গুপ্ত কি তখনকার কাশ্মীরের পরিস্থিতি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন? ১৯০১ সালের মাঝামাঝি যখন ১৮৯৮ সালের কাহিনীপ্রসঙ্গে এই লেখা লিখছেন, যার মধ্যে স্বামীজীর পরিচয় হিসাবে বলেছেন, 'প্রথিতযশা বিবেকানন্দ-স্বামী', সেই বিবেকানন্দ ঐ সময়ে কাশ্মীরে স্থানীয় মাঝিমাল্লার কাছে সুপরিচিত সম্ভ্রমের পাত্র। ১৮৯৭ সালে স্বামীজী যখন প্রথম কাশ্মীরে এসেছিলেন, কাশ্মীরের রাজা জম্মুতে থাকার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা না হলেও, রাজাভ্রাতা ও সেনাপতি শ্রীনগর দরবারে তাঁর সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করেছিলেন, রাজমন্ত্রীদের অনেকে তাঁর অনুরাগী হয়ে ওঠেন। প্রথমে তিনি আতিথ্য নিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে, পরে, নিজেই চিঠিতে লিখেছেন (১৫·৯·১৮৯৭): "কাশ্মীর গভর্নমেন্ট আমাকে তাঁদের একখানি বজরা ব্যবহার করতে দিয়েছেন। বজরাটি বেশ সুন্দর, আরামপ্রদ। তাঁরা জেলার তহশিলদারদেরও উপর আদেশ জারি করেছেন। এদেশের লোকেরা আমাদের দেখবার জন্য দল বেঁধে আসছে, আমাদের সুখে রাখার জন্য যা-কিছু প্রয়োজন সবই করছে।" পরবৎসর স্বামীজী যখন আবার কাশ্মীরে গেলেন তখন অবস্থার পরিবর্তন তো হয়ই-নি, অধিকন্তু তাঁর সঙ্গে পাশ্চাত্য নারীরা রয়েছেন, মানে মেমসাহেবরা, যাঁদের সম্বন্ধে স্থানীয় মানুষরা একেবারে তটস্থ। স্বামীজী শ্রীনগরের নানা স্থানে এঁদের নিয়ে ঘুরতেন এবং স্থানীয় স্থাপত্য ও শিল্পনিদর্শন দেখাতেন। মিসেস বুল চা-পানের আয়োজন করে এক ইউরোপীয় ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, স্বামীজীর সঙ্গে মাঝেমাঝেই দেখা করতে আসতেন আমেরিকার কনসাল-জেনারেল, জেনারেল প্যাটারসন—স্থানীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তো আসতেনই এবং এই পর্বের সাধারণ মানুষদের ভালবাসা সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন: "তাঁকে ভালবাসতেন শুধু পণ্ডিতেরা, প্রাজ্ঞরা কিংবা রাজনৈতিকের দল? না—অজ্ঞান

যারা তারাও। মাঝি প্রতীক্ষা করত জলের দিকে তাকিয়ে—কখন ফেরেন তিনি! কোলাহল করত ভৃত্যরা, কাড়াকাড়ি করত—কে তাঁর সেবা করবে তাই নিয়ে। সকলের—সকল কিছুর—মধ্যে তিনি।" নগেন্দ্র গুপ্ত এ সকলই জানতেন, তা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত কথাগুলি প্রবাসীতে যদি লিখে থাকেন (তিনি একজন সন্ন্যাসী এবং আমি ভ্রমণকারী, সুতরাং আমাদের কথায় বৃদ্ধ মুসলমানটি জেলে যাবাব বিষয়ে কেন সুনিশ্চিত হল বোঝা যায় না, ইত্যাদি)—তাহলে বুঝতে হবে সেটা লেখার কৌশল ছাড়া কিছু নয়, ঘটনার বর্ণনায় বৈপরীত্যের চেহারা ফোটাবার জন্যই কৃত। এ-ধরনের কাজ বিবেকানন্দপ্রসঙ্গে তিনি আগেও করেছেন, আমরা দেখেছি। যাই হোক, কাশ্মীরে বিবেকানন্দপ্রসঙ্গে আর বেশি কথা নেই, তুলনায় নিবেদিতা বিষয়ে অনেকখানি কথা আছে মডার্ন রিভিউ-এর লেখাটিতে ঃ "শ্রীনগরেই তাঁর (নিবেদিতার) সঙ্গে প্রথম দেখা। স্বামী বিবেকানন্দ যে-ডোঙ্গায় ছিলেন, তার কাছেই একটি হাউসবোটে আমি ছিলাম। আমরা অনেকটা সময় একত্রে কাটাতাম। কাশ্মীরেব মহারাজার গেস্ট হাউসেব কাছাকাছি আমাদেব বোট বাঁধা ছিল। একটু উজিয়ে, রেসিডেন্সি পেরিয়ে, ঝিলামের উপরে একটি বোটে স্বামী বিবেকানন্দের তিন শিষ্যা থাকতেন—নিবেদিতা তাঁদের একজন। এক সকালে পায়চারি সেরে বিবেকানন্দের বোটে উঠে দেখলাম—সেখানে তিন মহিলা উপস্থিত। আমাদেব পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। দেখলাম—নিবেদিতা তরুণীবয়স্কা, খুবই সুদর্শনা, পুবন্ত গঠন, চড়া রঙ। তাঁর চোখ খুবই উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হলেও তাঁকে পাণ্ডিত্যগর্বী বিদুষী বা মনস্বিনী বলে মনে হয়নি (অথচ অনেকের কাছে নিবেদিতা প্রথম দর্শনেই তা মনে হয়েছে!!), কিন্তু প্রথম দেখার সিদ্ধান্ত প্রায়শই ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়।

"নৌকার তলা দিয়ে তবঙ্গভঙ্গে বয়ে চলছিল ঝিলাম। প্রভাতের শীতল নির্মল বাতাসের আঘাতে ভাঙা ঢেউয়ের উপরে ফেনার পুঞ্জ। দূরে উঁচুতে তক্ত-ই-সুলেমানের স্তম্ভ! নদীতটে পপ্‌লার, চিনার—সেইসঙ্গে ফলভারপূর্ণ আপেল ও নাশপাতি বৃক্ষরাজি। বাইরের সৌন্দর্যগরিমায় ভরা প্রকৃতিতে মন রেখে বা না-রেখে আমরা উৎসাহিত কথাবার্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলাম। সিস্টার নিবেদিতার কণ্ঠস্বর সঙ্গীতময়; উদ্দীপ্ত ঐকান্তিকতার সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন। অজস্র বিষয়ে সংবাদ তাঁর চাই। স্বামী বিবেকানন্দ আমার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে হেসে নিবেদিতাকে বললেন, 'ঠিক, ঠিক, ওঁর মস্তিষ্কে খোঁচা মেরে যত সংবাদ পারো আদায় করে নাও। তোমার যা দরকার, সব উনি সরবরাহ করবেন।' বিদায় নেবার সময়ে বয়স্কা মহিলাদের একজন আমাকে পরদিন অপরাহ্নের চা-পানে আমন্ত্রণ জানালেন।

"চা-পানের পরে তাঁরা চলে গেলে, বিবেকানন্দ সিস্টার নিবেদিতা সম্বন্ধে অনেক কিছু আমাকে বললেন—নিবেদিতার মস্ত মস্ত কাজের কথা, জ্ঞানের বিস্তার ও ভারতবর্ষের প্রতি ব্যাকুল ভালবাসার কথা। তারপর তিনি আমাকে ছোট একটি কাহিনী শোনালেন। তাঁরা সবে কাশ্মীরের তুষারতীর্থ অমরনাথ দর্শন করে শ্রীনগরে ফিরে এসেছেন। অমরনাথে যাবার সময়ে বিবেকানন্দ অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে হেঁটে গিয়েছিলেন। তরুণ বয়সে পরিব্রাজক জীবনে তিনি ভারতের অনেকখানি অংশ হেঁটে অতিক্রম করেছেন। [তাই হাঁটা তাঁর অভ্যাসের মধ্যে] সিস্টার নিবেদিতার জন্য কিন্তু ডাণ্ডি ছিল। যখন ভ্রমণের কয়েকটি

পর্যায়মাত্র অতিক্রম করেছেন, তখন নিবেদিতা দেখেন যে, যাত্রীদের মধ্যে এক বৃদ্ধা আছেন, বড় কষ্টে লাঠি ধরে তিনি ঠুক্‌ঠুক্‌ করে হাঁটছেন। তাই দেখে নিবেদিতা তখনই ডাণ্ডি থেকে নেমে বৃদ্ধাকে তার উপরে তুলে দিলেন—তারপর অমরনাথ গুহা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন এবং গোটা পথ পায়ে হেঁটেই ফিরে এলেন। পরবর্তী কালে এ সম্বন্ধে যখন আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, তখন নিবেদিতা বলেছিলেন, তাঁর তো দুটি কম্বল ছিল, [তাই পেতে এবং গায়ে দিয়ে] ভূমিতে শুয়েছিলেন। জীবনে অতখানি তৃপ্তি আর কখনো পাননি।"

নিবেদিতার আরও কিছু স্মৃতিকথা নগেন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, সেগুলির সঙ্গে স্বামীজীর সরাসরি যোগ নেই বলে বাদ দিচ্ছি। এইপ্রসঙ্গে গুপ্তের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' গ্রন্থমধ্যে কথিত আর একটু অংশ উপস্থিত করব, "যাঁরা স্বচক্ষে না দেখেছেন তাঁরা বুঝতেই পারবেন না—আমেরিকান ও ইংরেজ শিষ্যদের উপর স্বামী বিবেকানন্দের কোন বিপুল প্রভাব ও আধিপত্য ছিল। আলমোড়ায় ভগিনী নিবেদিতা ও অপর পাশ্চাত্যমহিলাদের রন্ধনাদির জন্য যে সরলস্বভাব মুসলমান পাচকটি ছিল, সে পর্যন্ত ঐ ব্যাপারটি দেখে চমৎকৃত। লাহোরে সে আমাকে বলেছিল, 'স্বামীজীর প্রতি এইসব মেমসাহেবরা যে-ধরনের ভক্তিশ্রদ্ধা দেখান তা আমাদের মুর্শিদদের [ধর্মগুরুদের] প্রতি মুরিদদের [শিষ্যদের] ভক্তির তুলনায় অনেক বেশি। মোটা চামড়ার ভারতীয় জুতো এবং সাদামাটা পোশাকপরা এই ভারতীয় সাধু উপস্থিত হলেই তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যরা—তাঁদের মধ্যে কলকাতায় অবস্থানকারী' আমেরিকার কনশাল জেনারেলও ছিলেন—অতিশয় সম্ভ্রমের সঙ্গে উঠে দাঁড়াতেন এবং তিনি কথা শুরু করলে তা শুনতেন গভীরতম মনোযোগ ও সম্ভ্রমের সঙ্গে। তাঁর সামান্যতম ইচ্ছাও আদেশতুল্য জ্ঞান করে তৎক্ষণাৎ পালিত হত। বিবেকানন্দ কিন্তু সেই একই মানুষ—সহজ, সরল, ভঙ্গিহীন, ঐকান্তিক, ভাবগম্ভীর এবং মহাপ্রাণ।"

আর এক-টুকরো স্মৃতিকথা দিয়ে ১৮৯৮ পর্ব শেষ করব। "[কাশ্মীর থেকে] কলকাতায় ফেরার পথে বিবেকানন্দ লাহোরে কয়েকদিন আমার বাড়িতে ছিলেন। এই সময়ে তাঁর মনে মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ববোধ জেগেছিল। নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে তিনি আমাকে বললেন, 'আমি আর তিন বছর বাঁচব। যে-চিন্তা আমাকে কেবল বিচলিত করছে তা হল—এই সময়ের মধ্যে আমার সকল ভাবকে কাজে রূপ দিয়ে যেতে পারব কিনা?' প্রায় ঠিক তিন বছর পরে তাঁর দেহান্ত হয়।"

॥ পাঁচ ॥

খুবই আক্ষেপের বিষয়, ১৮৯৮ সালের ট্রিবিউন দেখার সুযোগ পাইনি—যে-অবধি নগেন্দ্র গুপ্ত পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। হয়তো স্বামীজী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ স্মৃতিজাত কিছু তাৎপর্যপূর্ণ লেখার দর্শন তাতে মিলত।

১৮৯৯ সাল থেকে ট্রিবিউনের বেশ কয়েকটি লেখায় বিবেকানন্দ ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে রীতিমত ঝাঁঝ। এই সময়ে যিনি সম্পাদক, তিনি যদি বাঙালী হনও (কে সম্পাদক জানি না) তবু বিশেষ বিবেকানন্দ-অনুরাগী নন। তাছাড়া পত্রিকার মালিক ব্রাহ্মসমাজী এবং আর্যসমাজের বিশেষ প্রভাব ঐ অঞ্চলে। এই দুই সমাজীরা বিবেকানন্দকে পথ ছেড়ে

দেবেন না। নগেন্দ্র গুপ্ত সম্পাদক থাকাকালে যা করা যায়নি, তাঁর অবর্তমানে ক্ষেত্রবিশেষে তাই করা হল, বিবেকানন্দ ও বিবেকানন্দপন্থীদের কিছু মতের কঠোর সমালোচনা বেরুল, যাদের মধ্যে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে আর্যসমাজের ধারণার স্পষ্ট প্রভাব এবং 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র এক লেখকের কিছু অসতর্ক মন্তব্যের উপর মাত্রাতিরিক্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আরোপ করে সমালোচনা। তবে বিবেকানন্দ ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে অবিতর্কিত, ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসাযুক্ত, সংবাদও বেরিয়েছে।

যথা, বাংলায় উদ্বোধন পত্রিকার সূচনা, যার মধ্যে ধর্ম থেকে রাজনীতি ও যন্ত্রশিল্প পর্যন্ত আলোচিত হবার প্রতিশ্রুতি (২৪ জানুয়ারি ১৮৯৯), ইণ্ডিয়ান মিরার থেকে রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সংবাদ (১৪ মার্চ ১৮৯৯); রামকৃষ্ণ-বাণীর উৎকলন (২৭ জুন ১৮৯৯), মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব, যাতে কিছু খ্রীস্টান ও মুসলমানও আহার্যগ্রহণ করেছেন (২০ মার্চ ১৯০০); স্বামীজীর ভগ্নস্বাস্থ্য এবং তুরীয়ানন্দ-স্বামী ও নিবেদিতাদি-সহ পাশ্চাত্য যাত্রা (৮ জুলাই ১৮৯৯); ভারতীয় নারীবিষয়ে নিবেদিতার উক্তি এবং স্বামীজীর 'Angles Unawares' কবিতার মুদ্রণ (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯); অদ্বৈত আশ্রম সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এবং স্বরূপানন্দের আবেদনপত্র প্রকাশ (১২ নভেম্বর, ১৮৯৯); পুনার মারাঠা পত্রিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের সংবাদ (১১ মে ১৮৯৯); কিষেনগড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ (২৬ মে ১৯০০); রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ-সেবার রিপোর্ট, ফেমিন কমিশনার মেজর ডানলপ স্মিথ কর্তৃক মিশনের কাজের প্রশংসা (২৯ মে ১৯০০); প্রবুদ্ধ ভারতে স্বামীজীর সাক্ষাৎকার (১৭ জুন ১৮৯৯); আমেরিকার 'ইউনিটি' পত্রিকায় বিবেকানন্দের উচ্চ প্রশংসা (৫ জুলাই ১৯০০); বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যা, পূর্বাশ্রমে র‍্যাডিক্যাল সমাজতন্ত্রী, মারী লুইস, বর্তমানে স্বামী অভয়ানন্দের, ভারতে আগমন, তাঁর আত্মঘোষিত কিছু ইন্টারভিউ-সহ কয়েকটি সংবাদ (৯ মার্চ ১৮৯৯, ১৬ মার্চ ১৮৯৯ ইত্যাদি)। তাছাড়া প্রবুদ্ধ ভারতে আর আরামুখু আয়েঙ্গারের একটি হিন্দুধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল—সেটি ট্রিবিউন পুরোপুরি উৎকলন করেছিল ২৭ জুলাই ১৮৯৯ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধে আয়েঙ্গার বলেন, সারা পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম বিষয়ে আগ্রহের নানা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, ভারতেও সচেতনতা এসেছে। এই জাগরণ একটা বাস্তব ঘটনা। কিন্তু এই উদ্দীপনাকে ঠিকভাবে কর্মে রূপায়িত করার পথ গ্রহণ করা হয়নি। লেখক দু-একটি পথের নিশানা দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর মূল আক্ষেপ, জনসাধারণের মধ্যে ঠিকভাবে ধর্মপ্রচার করা হয়নি। হিন্দুধর্ম এখন ইসলাম ও খ্রীস্টধর্ম, এই দুই শক্তিশালী ধর্মের আক্রমণের সম্মুখীন। হিন্দুদের বহিষ্কারনীতি তাদের দুর্বল করেছে এবং তার দ্বারা লাভবান হচ্ছে অপর ধর্মগুলি। কিভাবে কেবল প্রোটেস্টান্ট মিশন হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করেছে তার হিসাব লর্ড নরফোকের বিবরণ থেকে ইনি তুলে ধরেন। এর মধ্যে ক্যাথলিক মিশনের অনুরূপ কার্যাদির বিবরণ নেই। ১৮৫১ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে দেশী পাদবীর সংখ্যা কুড়ি থেকে বেড়ে হয় আটশ, গৃহী এজেন্টদের সংখ্যা পাঁচশ থেকে বেড়ে তিন হাজার পাঁচশ; খ্রীস্টীয় সম্মেলন দুশ পঞ্চাশ থেকে বেড়ে পাঁচ হাজার; ধর্মান্তরিতের সংখ্যা সত্তর হাজার থেকে বেড়ে ছয় লক্ষ সত্তর হাজার। এই প্রবন্ধের সূত্রে ট্রিবিউন পত্রিকার ৫ অক্টোবর ১৮৯৯ সংখ্যায় ইংলণ্ড থেকে বিমলচন্দ্র ঘোষ এক দীর্ঘ সমর্থক প্রবন্ধ লিখে পাঠালেন। সাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের

ব্যাপারে তিনি জোর দিলেন কথকতার উপরে, তারপরে ল্যান্টার্ন লেকচার। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপন, প্রচার ফাণ্ড তৈরি করে চতুর্দিকে প্রচারক প্রেরণের ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হোক। এসব কাজে বাধাগুলির বিষয়ে আলোচনাও তিনি করেছিলেন। আর্যসমাজী, ব্রাহ্মসমাজী ও মুসলমানদের দলে টেনে কাজ করতে হবে—এমন বহুতর উপদেশ-নির্দেশ তিনি দূর ইংলণ্ডে বসে ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে দান করেছিলেন।

ট্রিবিউনের তৎকালীন সম্পাদক ১৯০০ সালে একেবারে ছুরি শানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন প্রবুদ্ধ ভারতের জনৈক সন্ন্যাসী লেখকের উপর—পরোক্ষে তা অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দের উপর আঘাত। মনের সমস্ত জ্বালা ঢেলে দিয়েছিলেন তিনি একাধিক লেখায়।

প্র ন্ধ ভারতে প্রকাশিত 'পঁয়ত্রিশ বৎসর পরিব্রাজকের' একটি রচনার প্রতিবাদে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গসহ প্রতিবাদ করা হয় ট্রিবিউনে ১৭ জুলাই ১৯০০-র সম্পাদকীয় Rubbing Oil on the Annointed Head এবং ৩১ জুলাই-এর সম্পাদকীয়, Latter-day Sannyasins-এর মধ্যে। ১৭ জুলাইয়ের সম্পাদকীয়তে পূর্বোক্ত 'পরিব্রাজকের' বক্তব্য নিজের মতো করে তুলে ধরা হয়। গোড়াতেই ছিল শ্লেষাত্মক আক্রমণ, 'সারভাইভ্যাল অব দি ফিটেস্ট' থিয়োরির প্রসঙ্গ এনে। উক্ত থিয়োরিতে শক্তিমান কর্তৃক দুর্বলকে পীড়নের সাফাই ছিল (স্বামীজী তাঁর মাদ্রাজ বক্তৃতাবলীতে আরও তীব্র ভাষায় এই থিয়োরিকে আক্রমণ করেছেন)। দুর্বল একমাত্র করুণার সাহায্যটুকু নিয়ে বেঁচে থাকে। সেই পটভূমিকায়, ট্রিবিউন-সম্পাদক তিক্তভাষায় লিখলেনঃ "যাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে সংসারত্যাগ করেছেন, দারিদ্র্য ও আত্মত্যাগের ব্রত নিয়েছেন—তাঁদেবও কখনো-কখনো দেখা যাচ্ছে দুর্বল ও দরিদ্রদের বঞ্চিত করে শক্তিমানের সেবা করার প্রয়াসে!" এহেন ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণের কারণ, প্রবুদ্ধ ভারতে উক্ত 'পরিব্রাজক' লেখক পাশ্চাত্যের ধর্মপ্রাণ মানুষদের আহ্বান করেছিলেন কুমায়ুন পাহাড়ে অবস্থান করে বেদান্তচর্চা করতে—আর যদি তেমন ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ধনী না হন তাহলে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁরা কুমায়ুনের সস্তা জমিতে কৃষিকাজ করতে পারবেন। পরিব্রাজকের এই আমন্ত্রণ প্রথম বেরিয়েছিল উদ্বোধন পত্রিকায়। সেখানে তিনি বলেন, সেইসব পাশ্চাত্যবাসী ভারতে আসুন, যাঁদের বাড়ির আবহাওয়া অনুকূল নয়, আয় সীমাবদ্ধ। তাঁরা কুমায়ুনে চমৎকার আবহাওয়া পাবেন, জিনিসের দরদাম কম, জমি সস্তা, শ্রম সস্তা, চাষবাসের সহজ সুযোগ আছে, উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে অধিক ফলন ঘটাতে পারবেন, স্থানীয় মানুষেরা সেই প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করতে পারবে ইত্যাদি। ট্রিবিউন সম্পাদক পরিব্রাজকের এই প্রস্তাবের মধ্যে বিপজ্জনক রাজনৈতিক গন্ধ শুঁকলেন। তিনি বললেন, পাশ্চাত্যবাসী তো সারা পৃথিবী শোষণ করছেন, ভারতের সেরা জিনিসগুলি তাঁদের আহার্য, তাঁরা এখানকার শিল্পবাণিজ্য খেয়ে ফেলেছেন, আর এঁদের জন্যই কিনা হিমালয়বাসী তপস্বীদের করুণা!! আসলে এ তো ভারতীয়দের জমি কেড়ে নেওয়ার প্ররোচনা। একবার যদি ওঁরা হাজির হন তাহলে এখানকার কৃষকদের কী অবস্থা দাঁড়াবে, তা কি মাথায় এসেছে?

ট্রিবিউন ৩১ জুলাই, প্রবুদ্ধ ভারতের পক্ষ থেকে পাঠানো 'জনৈক সন্ন্যাসী'র 'উত্তেজিত' উত্তর সম্পাদকীয়ের মধ্যে প্রকাশ করল। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, ট্রিবিউন পত্রিকায় আগেকার মতো ধীরতা নেই। (এখানে সম্পাদক বদলের স্পষ্ট ইঙ্গিত) ট্রিবিউনে যেভাবে

তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে তা কেবল ভুল নয়, অভিসন্ধিপূর্ণ। সম্পাদক ভালো করে উদ্বোধনের দুটি প্রবন্ধ পড়েননি—তাদের মধ্যে কেবল ভারতীয়দের কুমায়ুনে বসতি করতে বলা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত 'পরিব্রাজকের' বক্তব্যের অংশমাত্র ট্রিবিউনে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বর্জিত অংশ আছে—দরিদ্র ভারতীয় ভ্রাতৃগণের উপকারের জন্যই কিছু পাশ্চাত্যবাসীকে আসতে বলা হয়েছিল। পার্বত্য অঞ্চলে উপযুক্ত শিক্ষা নেই, তাই সেখানে জীবনসংগ্রামে নামবার মতো শিক্ষা চাই—শিল্পবিজ্ঞানের শিক্ষা—সেই শিক্ষা বিস্তারের কাজে পাশ্চাত্যের ভারতপ্রেমিক মানুষরা নামতে পারবেন। (ধরা যাক, যে-কাজ করেছিলেন পরবর্তী কালে শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রানুরাগী এলমহার্স্ট)। পরিব্রাজক আরও বলেছিলেন, কেবল সেইসব পাশ্চাত্যবাসী আসুন, যাঁরা দৈনন্দিন জীবনের ঘানিটানায় ক্লান্ত, সংসারের বন্ধন ছিন্ন করতে চান অধিকন্তু স্বামীজীর শিক্ষাগ্রহণের দুর্লভ সুযোগ তাঁরা পাবেন, নিজেদের প্রস্তুত করবেন ত্যাগের জন্য—তাঁদেরই জন্য অদ্বৈত আশ্রম। 'পরিব্রাজক' আশ্বাস দিয়ে বললেন, সন্ন্যাসীরা দেশকে কম ভালবাসেন না।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কিন্তু তাঁর রচনার শেষে একটি অংশে ট্রিবিউন-সম্পাদকের হাতে মারাত্মক অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন এবং সে-কাজ তিনি নিজের অজান্তে করেছেন—সাংবাদিকতা নামক ব্যাপারটায় কত কৌশলী চোরাগলি থাকে তা তাঁর জানা ছিল না। তিনি লেখেন, আমরা ঠিক কোন উদ্দেশ্যে ঐ ধরনেব লেখা লিখেছি, তা সম্পাদক আমাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে জেনে নিতে পারতেন, তাহলে তো এত তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হত না! এ-ই তো! ট্রিবিউন-সম্পাদক সুযোগ পেয়ে গেলেন। মূল বিষয় ছেড়ে দিয়ে তিনি ঐ শেষের কথাগুলি নিয়ে পড়লেন। বললেন, এমন অদ্ভুত কথা তো শুনিনি কখনো—যেখানে প্রবুদ্ধ ভারতে ওঁরা প্রকাশ্য রচনায় নিজ বক্তব্য বলছেন সেখানে ট্রিবিউন-সম্পাদক তাঁদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে জেনে নেবেন আসল কথাটি কি!! দুমদাম্ করে এই ধরনের লেখার ব্যাপারে সন্ন্যাসীদের সাবধান হওয়া উচিত। প্রবুদ্ধ ভারতে বলা হয়েছিল, গোটা পরিকল্পনা ভালভাবে লেখা হয়েছে বাংলা উদ্বোধন পত্রিকায়। ট্রিবিউন-সম্পাদক চাঁছা-ছোলা ভাষায় জানালেন, অন্যত্র ওঁরা কী লিখেছেন, তা জানাব দায় আমাদের নেই—এখানে কী লিখেছেন সেটাই বিবেচ্য। আর সেটা পাশ্চাত্যের লোককে হিমালয়ে কলোনি করতে প্রলুব্ধ করা ছাড়া আর কিছু নয়। 'পঁয়ত্রিশ বৎসরের পরিব্রাজকের' প্রাণ কাঁদছে পাশ্চাত্যের দরিদ্র মানুষদের জন্য—তার ফলে যে, দরিদ্রতম ভারতবাসীর জীবন অধিকতর কষ্টকর হবে, এমন কি, তাদের উৎখাত হবার সম্ভাবনা, তা তাঁর খেয়াল নেই। তাছাড়া, প্রশান্ত হিমালয়ের উপরে বসবাসকারী সন্ন্যাসীরা মাথা গরম করে প্রবন্ধ লিখবেন, এটা বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁরা বড় বেশি সাংসারিক ব্যাপারে জড়াচ্ছেন। তাঁরা ত্যাগব্রত নিয়ে সেবাকাজে লিপ্ত থাকুন কিন্তু দরিদ্র পাহাড়ী মানুষের মুখের অন্ন কাড়বার ব্যবস্থা যেন না করেন। আর যদি কলোনি গড়ে ওঠে, তাহলে সাধুদের 'তত্ত্বমসি', 'ওঁ তৎ সৎ', কি করে চলবে? সম্পাদক তৃপ্তিভরে রচনা শেষ করে বললেন, আমরা গোঁড়া মানুষ নই, তাহলেও হিমালয়ের প্রতি ভারতবর্ষের বহুযুগের শ্রদ্ধার কথা জানি, তাই সেখানে পাশ্চাত্যবাসীদের স্বার্থের জন্য লণ্ডভণ্ড কাণ্ডকে সমর্থন করতে পারি না।

প্রবুদ্ধ ভারতের কর্তৃপক্ষ ঝানু সাংবাদিক ছিলেন না, তাঁদের লেখায় অসতর্কতা

ছিল, তথাপি এই সংক্রান্ত তাঁদের রচনার ভিতরকার উদার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য এবং ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কল্যাণেচ্ছার কথা বুঝতে অপরাপর পত্র-পত্রিকার অসুবিধা হয়নি অথচ ট্রিবিউন ঐ প্রকার নিষ্ঠুর আক্রমণ করে বসল! বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাঁরা সুযোগ খুঁজছিলেন।

আক্রমণ অব্যাহত রইল। এবার সরাসরি বিবেকানন্দের বক্তব্যকে আক্রমণ। স্বামীজীর বাংলা রচনা 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে কিছু কিছু ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল, তার একাংশে ছিল মাংসাহারের ঔচিত্যপ্রসঙ্গ। এরই সূত্রে ট্রিবিউনের ১ আগস্ট, ১৯০১ সংখ্যার সমালোচনামূলক সম্পাদকীয়—Animal vs Vegetable Diet আমিষাহার সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য তখন (এখনও) সুপরিচিত এবং সেজন্য তিনি নানা মহলে ধারাবাহিকভাবে নিন্দিত। স্বামীজী তাতে পরোয়া করেননি। তিনি স্বয়ং আমিষাহারী, সেকথা কখনও গোপন করেননি। বরং মাঝে মাঝে উস্কানি দেবার জন্য আগ বাড়িয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। পরিব্রাজক জীবনে এর জন্য তাঁকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং বিখ্যাত হয়ে ভারতে ফেরার পরেও সে প্রশ্ন থামেনি। রক্ষণশীলেরা এই সূত্রে তাঁর বিশেষ দোষদর্শন করেছেন, প্রগতিশীলেরাও পিছিয়ে থাকেননি। তাঁর দেহান্তের পরে বালগঙ্গাধর তিলক যখন কেশরী পত্রিকায় তাঁর ভূমিকার সঙ্গে শঙ্করাচার্যের ভূমিকার তুলনা করে তাঁকে দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য বলেছিলেন, তখন পুনার্ সমাজসংস্কারকদের শীর্ষ-পত্রিকা সুধাকর বলেছিল—ছোঃ, একজন মাংসাহারী কিনা শঙ্করাচার্য!! অন্য সংস্কারপন্থী পত্রিকারও একই দৃষ্টিভঙ্গি। পঞ্জাবের আর্যসমাজীরাও এই প্রশ্নে স্বামীজীর সমালোচক। ট্রিবিউন সেই সুযোগ নিয়ে পূর্বোক্ত সম্পাদকীয়তে দীর্ঘ স্থান ধরে স্বামীজীর মত খণ্ডনের চেষ্টা করল। স্বামীজী অবশ্য নির্বিচারে আমিষাহার সমর্থন করেননি। তিনি বলেছিলেন—পরিবেশ, জাতি, বৃত্তি ও ব্যক্তিভেদে খাদ্যরূপ নির্ধারিত হয়। সেই কথায় ট্রিবিউনের আপত্তি ছিল না। আপত্তি জানাল, স্বামীজী যখন বললেন, ভারতের সাধারণ মানুষের পক্ষে মাংসাহার অত্যাবশ্যক কারণ তারা নিছক নিরামিষ ভোজনের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ছে, জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে গেলে তাদের উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করতে হবে, বিদেশে বলবান জাতি মাংসাহারী, ভারতের সাধারণ মানুষকে যদি তাদের সঙ্গে লড়াই করে এগোতে হয় তাহলে শরীরে বলসঞ্চারের জন্য মাংসাহার করা প্রয়োজন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, সমাজে যতদিন দুর্বলের উপর বলবান জয়ী হতে থাকবে, ততদিন দুর্বলকে মাংসাহার করে যেতে হবে, যাতে সে পদতলে পিষ্ট না হয়। এসব কথায় ঘোর আপত্তি জানালেন ট্রিবিউন-সম্পাদক। নিরামিষ না আমিষ—কোন আহার উচিত, এ নিয়ে তর্কবিতর্ক আরও পূর্ব সময় থেকে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সর্বত্র চলে আসছে। ট্রিবিউন-সম্পাদক নিরামিষ আহারের পক্ষে যেসব যুক্তি সাজালেন, সেগুলি ঐ তর্কধারা থেকেই গৃহীত এবং এই ধরনের লেখায় কোনই আপত্তি করা যায় না, কেননা মত থাকলেই মতভেদ থাকবে এবং তা ব্যক্ত করাও হবে। আপত্তি মুরুব্বিয়ানায়। ট্রিবিউন-সম্পাদক ধর্মনেতা বিবেকানন্দকে ঐ লেখায় কিঞ্চিৎ ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলেনঃ "ধর্মপ্রচারক এমন জীবনচর্যা ও চিন্তাপ্রকৃতির পক্ষে প্রচার করবেন যাতে বস্তুর উপর আত্মার বিজয় ঘোষিত হয়। তাঁর কাছে তাই প্রত্যাশিত। মানুষের পশুসত্তার উপরে দিব্যসত্তার আধিপত্য স্থাপনের

কথাই তো তিনি বলবেন। পৃথিবীর সকল ধর্মই ঐ উদ্দেশ্যমুখী। মানুষের মধ্যে নিম্নতর পশুভাব ও পার্থিবতা যেমন আছে, তেমনই আছে আধ্যাত্মিকতার উর্ধ্বতর জীবন—আর ধর্মীয় পুরুষের কাজ হল, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে শেষোক্ত ভাবের বৃদ্ধিতে সাহায্য করা। স্বামী বিবেকানন্দ এতে নিজেই স্বীকার করেছেন, 'মাংসাহার বর্বরতা' এবং যাঁরা নিছক আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতে চান তাঁদের পক্ষে নিরামিষ আহারই উপযোগী। যে অবস্থার প্রকোপে শক্তিশালী দুর্বলের উপরে জয়ী হয় সেই অবস্থা কোনও ত্যাগধর্মী সাধু বা সন্ন্যাসীর কাম্য হওয়া উচিত নয়।"

বিবেকানন্দের ভাগ্য, রাজনৈতিক পত্রিকা ট্রিবিউনের দ্বারা তিনি ধর্মব্যাপারে উপদিষ্ট হলেন! তথাপি তাঁর চৈতন্যোদয় হয়েছিল কিনা সন্দেহ। তাঁর পক্ষে কি পুনশ্চ হিন্দী দোঁহাটি শোনানোর দরকার হয়ে পড়েছিল—যার মধ্যে আছে, গরু ঘাসপাতা খায় তবু গরুই থাকে, বাঁদর ফল-পাকড় খায় তবু বাঁদরই থাকে কিংবা শিষ্যদের যেকথা তিনি বলতেন—'তোরা খুব করে মাংস খাবি, পাপ যদি হয় সে আমার হবে।' হিংসা-অহিংসা প্রশ্নে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে তো তিনি বৌদ্ধ ও জৈন অহিংসার চর্চায় ভারতের কোন্ সর্বনাশ হয়েছে, তা বলার পরে, শ্রীকৃষ্ণের সমন্বিত জীবনাদর্শ গৃহী মানুষের পক্ষে গ্রাহ্য বলে নির্দেশ করেছিলেন। (স্মর্তব্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমিষাহারী ছিলেন)। বস্তুতপক্ষে আধুনিক ভারতে বিবেকানন্দের প্রফেট ভূমিকা অনুধাবনে ভ্রান্তিই ঐসব সমালোচনার মূলে। তিনি জাতীয়জীবনে সর্বাত্মক পুষ্টি চেয়েছেন। মানবজীবনে আধ্যাত্মিকজীবনের মতো দেহজীবনও রয়েছে। জনসাধারণের দৈহিক শক্তির বিকাশ ঘটে, যতদিন-না তারা শক্তিমানের সমস্তরে ওঠে, ততদিন ভারতের মুক্তি নেই—এই বিশ্বাস থেকেই স্বামীজী মাংসাহার সমর্থন করতেন। সেকথা জানবার ও মানবার মতো ব্যাপক দৃষ্টি ছিল না তৎকালীন ট্রিবিউন-সম্পাদকের, যিনি স্বামীজীকে প্রচলিত ধারার একজন ধর্মপ্রচারকের ভূমিকাতেই দেখতে চেয়েছিলেন।

॥ ছয় ॥

এই লেখার এক বৎসরের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্ত হয়। ১০ জুলাই ১৯০২ তারিখের সম্পাদকীয়তে ট্রিবিউন পত্রিকা স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্র ও কীর্তির মূল্যায়নের চেষ্টা করে এবং স্বীকার্য তা বহুলাংশে যথাযথ। ভারতীয় ইতিহাসে বিবেকানন্দের ভূমিকার উপযুক্ত স্বীকৃতি তার মধ্যে আছে। আবার তার একাংশে সীমাবদ্ধ দৃষ্টির অসম্পূর্ণতাও দেখা যায়। প্রথমোক্ত রূপটি আগে উপস্থিত করিঃ "দার্শনিক হিন্দুধর্মের প্রচারক এই ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণ ভারতীয় নিজ ব্যক্তিত্বের প্রবল শক্তিতে অপরিচয়ের অন্ধকার জগৎ থেকে এক ঝটকায় খ্যাতির শিখরে উত্থিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা তাঁর পূর্বপুরুষদের বহুলাঞ্ছিত ধর্মবিশ্বাসকে পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল মানুষদের ধারণালোকে সমুচ্চস্থানে স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল।... সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে তিনি যা সম্পন্ন করেছেন তা মোটেই সামান্য নয়। অন্য যে কোনও পণ্ডিত অথবা ধর্মপ্রচারক অপেক্ষা তিনি পাশ্চাত্যের মানুষদের কাছে দার্শনিক হিন্দুধর্মের অপূর্ব ও সুনিশ্চিত প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হয়ে, তাকে সশ্রদ্ধ

মনোযোগ ও সতর্ক অনুশীলনের বস্তু প্রতিপন্ন করেছেন। আর স্বদেশে তাঁর প্রতিভা, তাঁর পূজনীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বশেষ অবতাররূপে কেন্দ্রে রেখে, নির্দিষ্ট মত ও পন্থার প্রবর্তন ঘটিয়েছে, সৃষ্টি করেছে বাস্তব লোকসেবার আন্দোলন, যা স্মরণ করিয়ে দেয় অতীতের মহান সন্ন্যাসীদের কথা, যাঁরা মানবসেবার মন্ত্র প্রচার করতেন ও জীবনে তার রূপায়ণ ঘটাতেন। ভারতে রামকৃষ্ণ মিশন এখন সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান, যাঁর সদস্যরা দুর্ভিক্ষ ও প্লেগাক্রান্ত স্থানে উপস্থিত হয়ে ধীরস্থিরভাবে দুঃখী দুর্গতদের সেবা করে যাচ্ছেন। স্বামীজী বেলুড়, মায়াবতী ও অন্য কয়েকটি স্থানে মঠ স্থাপন করেছেন, যেসব জায়গায় সংসারত্যাগী শিক্ষিত মানুষেরা তাঁদের আচার্যের দ্বারা প্রবর্তিত মানবসাধারণের সেবার কাজ এবং শ্রীগুরু রামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির চর্চা করে যাচ্ছেন। বিবেকানন্দের প্রতিভাই আধুনিককালে নূতন এবং অনন্য সন্ন্যাসধর্মকে আকার দিতে সমর্থ হয়েছে—অবশ্য তাঁর পূজনীয় গুরুর অধ্যাত্মভাবরাজি এর পিছনে উদ্দীপক শক্তিরূপে বর্তমান ছিল। রামকৃষ্ণ—অসাধারণ, তাঁর বাণীর জন্য, যা বাংলা ভাষায় নূতন প্রবচনের সৃষ্টি করেছে; বিবেকানন্দ—অসাধারণ, তাঁর কর্মশক্তি ও সংগঠনী শক্তির জন্য। আর কর্মবীরদের যেমন পৃথিবীর সংস্রবে আসার ফলে দ্বন্দ্বসংঘাতে পড়তে হয়, তেমনই বিবেকানন্দেরও সমালোচক ও নিন্দুক ছিল। তাঁর গুরু যে সর্বজনীন ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন, বিবেকানন্দের ভাগ্যে যদিও তা পুরোপুরি জোটেনি, যদিও গতানুগতিক বিচারে তাঁর ইতস্তত ত্রুটি ধরা পড়বে, কিন্তু তাঁর কঠিনতম সমালোচকও অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বিবেকানন্দ এক অসাধারণ পুরুষ—এক মহাবীর চরিত্র—যাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কর্মশক্তি আত্মস্বার্থে নয়—নিয়োজিত ছিল পতিত দেশবাসীর উন্নয়নে।"

বিবেকানন্দের কীর্তি যখন কেবল তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত, তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলনের যখন একেবারে শৈশবাবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সন্দেহের অধীন, যখন তিনি নানা সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের শরলক্ষ্য, তখন পঞ্জাবের একটি কাগজে এই ধরনের ভারসাম্যযুক্ত রচনার প্রশংসাই করতে হয়। অসুস্থ বিবেকানন্দ যখন নিজেকে বহির্জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে, পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত মনুষ্যসৃষ্টিতে একান্তে নিয়োজিত এবং সেই নীরবতার সাক্ষ্যে শত্রুদল উল্লসিত হয়ে ভাবছে, ইতিহাস তাঁর উপরে চিরসমাপনের দাঁড়ি টেনে দিয়েছে—ঠিক তখনই ঘটল তাঁর মৃত্যু। "আচার্য যখন শিষ্যবৃন্দের মধ্য থেকে বিদায় নিলেন—(নিবেদিতা লিখেছেন), শ্মশানের অগ্নিশিখার সামনে সমালোচকের গুঞ্জন যখন স্তব্ধ হয়ে গেল, তখন শোনা গেল স্বাধীনতার বিশাল কণ্ঠ অব্যাহত মহিমায় নিনাদিত—আর সারা জাতি সাড়া দিল একস্বরে।"

যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ট্রিবিউন-সম্পাদক ছিলেন। কে তিনি? অবশ্যই নগেন্দ্র গুপ্ত নন। লেখার মধ্যে কিন্তু নগেন্দ্র গুপ্তের ভঙ্গি অনেকটা আছে। তবে কি তিনি লেখাটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং তা পরিবর্তিত করে বা না-করে সম্পাদকীয় রচনা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল? একথায় সায় দেবার বিরুদ্ধে আছে স্বামীজী সম্পর্কে নগেন্দ্র গুপ্তের পরবর্তী রচনাদি। ট্রিবিউনের শোক-সম্পাদকীয়ের যে-অংশ উদ্ধৃত করিনি, তার প্রতিটি অংশের প্রতিবাদ ঐসব লেখায় নগেন্দ্র গুপ্ত করেছেন। সে-কথায় আসার আগে বাদ-দেওয়া অংশ হাজির করা যাকঃ "নিন্দুকরা তাঁর চরিত্র ও শিক্ষার ত্রুটি সম্বন্ধে অনেক কিছু

বলেছেন।... জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যাপকতর হলে—গভীরতর আধ্যাত্মিকতায় অবগাহন করতে পারলে—তিনি দেশবাসীকে ধর্মীয় ও সামাজিক মুমূর্ষু অবস্থা থেকে উত্তোলনের ব্যাপারে অঘটন ঘটাতে পারতেন। তাঁর জীবন দীর্ঘায়ত হলে তা ঘটতে পারত। কিন্তু অতীব সম্ভাবনাময় এই জীবনে অকালে ছেদ ঘটল—পুরো জ্বলে ওঠার আগেই নিভে গেল দীপ।"

এ ছাড়া পূর্বের উদ্ধৃত অংশে পেয়েছি, 'গতানুগতিক বিচারে তাঁর ইতস্তত ত্রুটি ধরা পড়বে।'

প্রথমেই বলে নেওয়া যাক, ১৯০০-১৯০১ সাল পর্যন্ত সময়ে ট্রিবিউন-পত্রিকা বিবেকানন্দ ও তাঁর কর্মনীতির অন্যতম নিন্দুক সমালোচক। 'প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং তাঁর মাংসাহার বিষয়ক বক্তব্য সম্বন্ধে সাধারণ প্রতিবাদের অতিরিক্ত প্রচুর অযথা কটু কথা ট্রিবিউন-সম্পাদকই লিখেছেন, যা বাদ-প্রতিবাদের স্বীকৃত ভদ্রসীমাকে অতিক্রম করেছিল।

স্বামীজীর স্বভাব ও শিক্ষা সম্বন্ধে নিন্দার উল্লেখ সম্পাদক করেছেন। মনে হয়, ট্রিবিউনের লেখার এই অংশ সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হয়ে নগেন্দ্র গুপ্ত পরবর্তী কালে উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। নিন্দুকদের একজন—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। তিনি আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতবর্ষের এক 'ভ্যাগাবণ্ড' বলে প্রচার করেছিলেন। সমসাময়িক নগেন্দ্র গুপ্ত সেকথা জানতেন। তিনি লিখেছেন, "অভিযোগ করে বলা হয়েছিল, বিবেকানন্দ ভারতে ভ্যাগাবণ্ড পার্টির অন্তর্ভুক্ত। ভ্যাগাবণ্ড শব্দটিকে অনিকেত পরিব্রাজক ধরে নিলে, সেই কথা, অনন্তকালের বক্ষে ক্লান্তিহীন পরিক্রমণরত জ্যোতির্ময় চরিত্রগুলির সম্বন্ধে সত্য। আর, মানবসমাজের মধ্যে যাঁরা অবতারপুরুষরূপে লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বারা স্বীকৃত ও পূজিত—তাঁরাও ভ্যাগাবণ্ড। কী বলব সেই মানুষটির সম্বন্ধে যিনি নিজ রাজ্যপাটকে হেলায় সরিয়ে দিয়ে ভিক্ষাপাত্র তুলে নিয়েছিলেন এবং বরণ করেছিলেন ভ্যাগাবণ্ডের ভ্রাম্যমাণ জীবন? অন্য একজনকেই বা কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাবে, সেই মহান মানবপুত্রকে, যিনি বলেছিলেন, শৃগাল তার বাসের জন্য গর্তের আশ্রয় পায়, পাখির আছে নীড় কিন্তু মানবপুত্রের নেই মাথাগোঁজার ঠাঁই? আমাদেব এই ভারতীয় সন্ন্যাসীটির [বিবেকানন্দের] নাম বুদ্ধ ও খ্রীস্টের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষ তাই করেছিল। ইংরেজদের ধারণা— আমেরিকানরা নিরেট ব্যবসায়ী হলেও তাদের স্বভাবে রয়েছে মিস্টিক ভাবের ছোঁয়া, তাই তারা সহজেই বিবেকানন্দের প্রভাবে ধরা পড়েছে। কিন্তু তারপর বিবেকানন্দ যখন অ্যাটলান্টিক পার হয়ে ইংলণ্ডে উপস্থিত হলেন, তখন তার ফল কিন্তু কম আশ্চর্যজনক হল না। 'লণ্ডন ডেইলি ক্রনিক্‌ল' পত্রিকায় লেখা হল—বিবেকানন্দের মুখাবয়বের সঙ্গে বুদ্ধের ক্লাসিক মুখের অদ্ভুত সাদৃশ্য। পরবর্তী কালে এক ইংরেজ মহিলা, সিস্টার নিবেদিতা, লিখেছিলেন—আত্মমগ্ন অবস্থায় অথবা ধ্যানকালে ঐ হিন্দুসন্ন্যাসীর মুখচ্ছবিতে যে-কোমলতা ও মহিমার মিশ্রণ দেখা যেত, তার অনুরূপ এঁকেছেন [রাফায়েল] সিস্টিন চাইল্ডের [শিশু যীশুর] ললাট ফলকে।"

এই সূত্র ধরে নগেন্দ্র গুপ্ত খানিক জায়গা নিয়ে ব্যাখ্যাসহ জানালেন, বুদ্ধ বা খ্রীস্টের সমকালীন কোনও প্রতিমূর্তি নেই, তাঁদের সম্বন্ধে যে সহস্র সহস্র চিত্র বা মূর্তি তৈরি করা

হয়েছে সেসব অনেক পরবর্তী কালের। তাঁদের আকারের সমকালীন বর্ণনা পর্যন্ত নেই। তাই তাঁদের মূর্তি আদর্শায়িত রচনা—সেসব 'আর্য ও সেমিটিক দেহাবয়বের সুন্দরতম আদর্শ রূপ'। অপরপক্ষে বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষদৃষ্ট চেহারা, নগেন্দ্র গুপ্ত বোঝাতে চাইলেন, ঐসকল আদর্শ রূপের তুল্য। সেই আদর্শ দেহবিগ্রহের আধারে ধৃত ছিল কোন্ চরিত্র এবং তা বাঙ্ময় হয়েছিল কিভাবে, সে প্রসঙ্গও নগেন্দ্র গুপ্ত একই সূত্রে বলে গেছেনঃ "যদি বলি, তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যে শ্রোতারা প্রভাবিত হয়েছিল, তাহলে অধিকন্তু বলতে হবে, তারা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছিল তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে। তাঁরা তখন কোনও প্রাচ্য-স্বাপ্নিক, বাস্তববোধহীন মিস্টিককে দেখছিলেন না—তাঁরা দেখছিলেন সেই পুরুষপ্রবরকে যিনি পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে অতীব সজাগ, যাঁর নখাগ্র পর্যন্ত প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত, যিনি অতি বিচক্ষণ পর্যবেক্ষক ও নির্ভীক সমালোচক।"

শিক্ষাদাতা বিবেকানন্দের চেহারা এই। একেও ছাপিয়ে গেছে রামকৃষ্ণ-জ্বলিত বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বঃ "বিবেকানন্দের প্রদত্ত শিক্ষা অপেক্ষা প্রবলতর ও প্রভাবশালী ছিল তাঁর বিরল ব্যক্তিত্ব—তা প্রাণদ্যুতিময়, গতিশীল, চৌম্বকধর্মী, অপরিচিত প্রকৃতি, প্রচণ্ড শক্তিশালী, উদ্দীপক এবং অনিবার্যবেগে আকর্ষক।"

ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের আবির্ভাব সম্বন্ধে মাতোয়ারা বর্ণনাগুলি যখন আমেরিকা থেকে এসে ভারতে উপস্থিত হয়েছিল, তখন নগেন্দ্র গুপ্ত ট্রিবিউনের সম্পাদকীয় ডেস্কের সামনে আসীন। তারপরে তিনি লাহোরে, কাশ্মীরে, সেই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ দেখেছেন। তাই তাঁর সাহিত্যিকের লেখনী আনন্দিত রেখায় ফোটাতে চেয়েছে সেই আবির্ভাবের 'শ্বাসরোধী রোমান্সের' পর্বটিকেঃ "যখন শেষ পর্যন্ত তিনি [ধর্মমহাসভায়] ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়ালেন, তখন প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশার তীব্র মুহূর্ত। সকল দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মঞ্চে দণ্ডায়মান একটি জ্যোতির্ময় দৃশ্যের উপর—সেখানে অনবদ্য পৌরুষের অসাধারণ রূপময় এক মূর্তি—তাঁর অঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সন্ন্যাসীর কমলা রঙের উজ্জ্বল-মসৃণ লম্বিত পোশাক। তাঁর সুবৃহৎ অত্যুজ্জ্বল দুই আঁখির চাহনি যখন বিপুল দর্শকশ্রেণীর উপর দিয়ে সঞ্চরণ করে যেতে লাগল, তখন সূক্ষ্ম চৌম্বকশক্তির তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে এবং শ্রোতৃবৃন্দ রোমাঞ্চিত হল কোনও এক অজ্ঞাত আবেগের শিহরণে। তারপর উচ্চারিত হল সহজ ও নিবিড় সম্বোধন—'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ'—আর তাতেই ঘটল সম্মোহনের চূড়ান্ত—সভাগৃহে আছড়ে-আছড়ে পাক খেতে লাগল করতালির শব্দতরঙ্গ।"

পরমাশ্চর্য বিবেকানন্দকে 'ভ্যাগাবণ্ড' বলার স্পর্ধা নগেন্দ্র গুপ্তের কাছে সহ্যাতীত। পুনশ্চ লিখলেনঃ "শঙ্খধ্বনির মতো তাঁর কণ্ঠস্বর যখন বেজে উঠেছিল, তখন ধর্মমহাসভার নাড়ির গতি দ্রুততর—উজ্জ্বলতর তখন মনস্বীদের চক্ষু। কারণ তাঁর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে গহন স্বর, যা দীর্ঘদিন নীরব থাকলেও নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। এখন তা ঝঙ্কারিত নবজীবনের মন্ত্রগানে। সেই বিদ্বজ্জনদের সমাবেশে এই তরুণ সন্ন্যাসী অপেক্ষা উচ্চতর পরিচয়পত্র কার ছিল—ঐ যাঁর বীর্যঘোষিত উন্নত আকার, অসাধারণ সৌন্দর্যময় মুখ, জ্বলন্ত চক্ষু, মন্দ্রিত ভরাট কণ্ঠস্বর?... তাঁর ভিতরে যে-আগুন জ্বলছিল, প্রতি পদক্ষেপে তাই যেন ঝলকে ঝলকে বিচ্ছুরিত হয়ে সমবেত মানুষদের হতচেতন করে ফেলেছিল অপরিসীম বিস্ময়ে।"

নগেন্দ্র গুপ্ত প্রসঙ্গ শেষ করে আনলেন ঃ "এশিয়ার মাতৃহস্ত চিরদিনই প্রজ্ঞাপুত্রদের শৈশবের দোলনা দুলিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ—পাশ্চাত্যের প্রতি প্রাচ্যের চ্যালেঞ্জ—পৃথিবীর শিক্ষক হবার পক্ষে প্রাচ্যের প্রাচীন অধিকারের পুনর্ঘোষণা। সুদুর পাশ্চাত্যে তিনি গিয়েছিলেন নামহারা অজ্ঞাতপরিচয় এক মানুষ হিসাবে, তারপর তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আধুনিককালের সর্বোত্তম প্রামাণ্য আচার্যদের অন্যতম।... ভারতের প্রাচীন আর্য ঋষিগণের সকল বিদ্যা ও প্রজ্ঞা আয়ত্ত করেও তিনি একেবারে আধুনিক। তিনি সেই মানুষ যিনি সমকালীন পৃথিবীতে নতুন আকারে ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকে বিশাল সহানুভূতির দ্বারা পরীক্ষা করে, প্রয়োজন মতো তাদের সমাদর করতে প্রস্তুত ছিলেন।"

এই সমস্ত কথার পরে নগেন্দ্র গুপ্তের প্রশ্ন—"এই তরুণ পরিব্রাজক তাহলে কে?—এঁকে কি ভ্যাগাবণ্ড বলব?"

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ট্রিবিউনের শোক-সম্পাদকীয়তে আর একটি মুরুব্বিবচন শোনানো হয়েছিল—বিবেকানন্দ যদি অকালে চলে না যেতেন, যদি বেঁচে থেকে আরও অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-অর্জন করতেন, তাহলে সেই প্রবীণ পরিপক্ক বিবেকানন্দ ভারতের আরও অনেক হিত করে যেতে পারতেন। বিবেকানন্দের অকাল-মৃত্যু সম্বন্ধে দুঃখ জানাবার ফাঁকে, তাঁর তারুণ্যের অপরিপক্কতা সম্বন্ধে কটাক্ষ ঐ লেখায় গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। এ ধরনের কথা আরও কেউ কেউ বলেছেন। স্বামীজী তাঁর দেহান্তের মাত্র কয়েক মাস আগে বেলুড়ে মিস ম্যাকলাউডকে বলেছিলেন, 'I shall never see forty'—চল্লিশ বছর পূরণ হওয়া পর্যন্ত আমি থাকছি না। স্বামীজীর কথাব ধ্রুবরূপ সম্বন্ধে সচেতন মিস ম্যাকলাউড গভীর বেদনার সঙ্গে বলেছিলেন—সে কি, কেন, বুদ্ধ তো চল্লিশ বৎসর বয়সেই প্রচার শুরু করেন। স্বামীজী বলেছিলেন, আমি তো আমার বাণী দিয়ে দিয়েছি। তাহলে আর থাকারই বা প্রয়োজন কি? আগামী বহু শত বৎসর ঐ বাণী সক্রিয় থাকবে। তাছাড়া আমি থাকলে অন্যরা বিকশিত হবে না—বড় গাছের তলায় ছোট গাছ বাড়ে না মিস ম্যাকলাউডের প্রশ্নের মূলে ছিল বিচ্ছেদবেদনার স্পর্শ, নচেৎ তিনি স্বামীজীকে ঈশ্বরপুত্র বলেই মনে করতেন, বয়সের মাপে যাঁদের মাপ হয় না, যাঁর সম্বন্ধে নয় বৎসর আগেই বলা হয়েছিল—'ইনি বয়সে ত্রিশ কিন্তু সভ্যতায় সুপ্রাচীন'।

নগেন্দ্র গুপ্ত, ১৯০২ সালের ট্রিবিউন সম্পাদকের প্রবীণ ও পাকা কথার উত্তর দিয়েছেন এইভাবে—সেই উত্তর উপস্থিত করেই সাঙ্গ করব এই নিবন্ধ, "তরুণ বয়সেই বিবেকানন্দের দেহান্ত হয়। কিন্তু দীর্ঘতর আয়ু তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিক দৈর্ঘ্য ঘটাত না কিংবা তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি শব্দও যোগ করত না। বয়সের দীর্ঘতার হিসাব কষে জীবনের উদ্দেশ্যসিদ্ধির মাপ আমরা করি না। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনে ঘটেছে পূর্ণ সিদ্ধির পরিণতি।...

"মাত্র দুই কি তিন বৎসর তিনি প্রচার করেছিলেন। তাঁর সেইসব শিক্ষা গ্রন্থের আধারে ধৃত। বইগুলিতে তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ মনীষা, আলোকিত ভাষ্য, ঘনসংহত যুক্তি এবং বীর্যময় ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্ত প্রকাশ।

"যতই দিন যাচ্ছে, তরুণ প্রজন্মের উপর তাঁর প্রভাব প্রবলতর হচ্ছে। সারা ভারতে

বিবেকানন্দ এখন আধ্যাত্মিক শক্তি, দেশপ্রেম এবং বীর্যের প্রতিভূ। তাঁর সমস্ত বাণীর মধ্যে এই অবিরাম নির্ঘোষ—'শক্তিশালী হও! মুক্ত হও'।"

আজকের সমাজ, বিজ্ঞান ও দর্শন

শৈবাল গুপ্ত

স্বামী বিবেকানন্দের একটি বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণীর একশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে সিস্টার কৃস্টিনকে তিনি বলেছিলেন ঃ "The next great upheaval which is to bring about a new epoch will come from Russia or China. I can't quite see which, but it will be either Russia or China."

পরবর্তী কালে হেমচন্দ্র ঘোষকে তিনি বলেছেন ঃ "তোমরা দেখতে পাচ্ছো না, আমি আবরণের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ছায়া প্রত্যক্ষ করছি। ভগবানের আশীর্বাদে এই অন্তঃশক্তি আমি অর্জন করেছি। অধ্যয়ন কর এবং ভ্রমণ কর। দূরবীক্ষণের সাহায্যে জ্যোতির্বিদরা যেমন নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, তদনুরূপ পৃথিবীর ঘটনাবলীর গতিও আমার দৃষ্টিপথে ধরা পড়ে। তোমরা আমার কাছ থেকে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে যাও. শূদ্রের অভ্যুত্থান প্রথম ঘটবে রাশিয়ায় এবং পরে চীনে। ভারতের অভ্যুত্থান ঘটবে তার পরেই এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে এই ভারত।" তদানীন্তন যুগের প্রেক্ষাপটে এই বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণীর পরে একশ বছর পার হয়ে গেছে। শূদ্রের অভ্যুত্থান বলতে যদি কম্যুনিস্ট বিপ্লবকে ধরতে হয়, তাহলে তা সফল হয়েছে রাশিয়ায় ও চীনে, সেইসঙ্গে অভূতপূর্ব দ্রুত পরিবর্তন এনে দিয়েছে সারা পৃথিবীর চিন্তামানসে ও কর্মধারায়। তারপর আবার তার অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবধারার দুর্বলতা সেই সুদৃঢ় রাষ্ট্রশক্তির পতন ঘটিয়েছে সম্প্রতি রাশিয়ায় এবং আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে ও ঘটাচ্ছে চীনে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে চীনেও রাষ্ট্রশক্তির প্রভূত পরিবর্তন হবে। ভারতবর্ষে অবশ্য শূদ্রের অভ্যুত্থান শুধুমাত্র কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক শক্তির মধ্য দিয়ে আসেনি বা আসছে না। এর কারণ বোধহয়, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের ধারণা বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীর প্রভাবে ভারতের মাটিতে মার্ক্সবাদ আসার আগেই পরিচিত ও প্রোথিত ছিল। কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক শক্তি তাই দেশের ভিতর অপেক্ষাকৃত অল্প স্থানে নিজস্ব ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে এবং ধনতন্ত্রের সঙ্গে সহাবস্থানে ও কোনও বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচীর ধারণা না থাকায় হয়ে পড়েছে বিভ্রান্ত। তবে সহাবস্থানই ভারতের ঐতিহাসিক সত্য—সেই অমোঘ নিয়মেই ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলন বাকি সমাজতান্ত্রিক ও মধ্যবাদী রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে মিলেমিশে যাবে।

এদিকে ধনতন্ত্রের ও বৈশ্যবর্ণের পুনরভ্যুত্থান আরম্ভ হয়েছে পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনে। আরও লাভ, আরও লোভ, আরও ভোগ, আরও লালসা এই বৃদ্ধ পৃথিবী কি করে সহ্য করবে? তার মাটির ভিতর থেকে, আকাশ থেকে, তার সমুদ্রের তলদেশ থেকে আর কত সম্পদ বার করবে পৃথিবী? ভারতবর্ষে বৈশ্যবর্ণের উত্থানের অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। তা হল, দেশের রাজনৈতিক শক্তির—তাকে ক্ষত্রিয় শক্তি বলা যাবে কি না জানি না, ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ ও তাৎক্ষণিক স্বার্থের জন্য দেশকে, সমাজকে টুকরো করার প্রবণতা। বৈশ্যশক্তির সম্প্রসারণ ছাড়া আপাতত এর কোনও সমাধান চোখে পড়ছে না। তবু ভয় হয় যে ক্ষত্রিয়শক্তির অসাধু দিকটার মতন বৈশ্যশক্তির অসাধু দিকটাই প্রকট হয়ে পড়বে না তো? এই ন্যায়-নীতি-নিষ্ঠাহীন সমাজের পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাই মনে হয় যে স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ অংশটা কিভাবে ফলবে? এই বিপর্যস্ত মানসিকতা ও নৈতিকতার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কোনরকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কি করে পালন করবে? অতঃ কিম্—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আরেকজন বিবেকানন্দের প্রয়োজন—একথা বিবেকানন্দ নিজেই বলেছেন। শিকাগো থেকে হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে ১৮৯৪ সালে লিখছেনঃ "When one of our great men dies, we must sit for centuries to have another ; they (পশ্চিমী সভ্যতা) can produce them as fast as they die." তিনি বলছেন, এর জন্য সর্বসাধারণের শিক্ষা প্রয়োজন। আবশ্যক প্রকৃত স্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থা যা মানুষকে উৎসুক আবিষ্কারক করে তোলে এবং সেইসঙ্গে জাতীয়তাবাদ। এই রজোগুণের উদ্ভব এখনও হয়নি। প্রাচীন ভারতের মতন ক্ষত্রিয়েরা না শিক্ষায় আগ্রহী, না নিষ্কাম জাতীয়তাবাদী।

যে কোনও সঙ্কটাপন্ন রোগীর চিকিৎসা করতে গেলে আগে তার রোগনির্ণয় করতে হয়। তা না করে শুধু বাইরের লক্ষণগুলোর চিকিৎসা করলে রোগ ভাল হয় না। ভারতীয় সমাজের রোগনির্ণয় না করে শুধু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিকাঠামো নিয়ে চিন্তা করলেই কি তাকে সারানো যাবে? এর অন্তত একটা উত্তর এক অভিনব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমার মনে এসেছিল এবং সেটি না বলেও পারছি না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরের ভিতরের বারান্দার সিঁড়িতে একা চুপ করে বসে এইসব কথাই ভাবছিলাম। সামনে মন্দিরের সারি, অজস্র জনস্রোত। নানা বর্ণের, নানা ভাবের, নানা আকাঙ্ক্ষার মানুষ। প্রত্যেকের পিছনে এক একটা জগৎ। এ যেন ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানুষের যাত্রা—কোথা থেকে আসছে, কোথায় যেতে হবে, কি চাইতে হবে, কি পাওয়া যাবে কিছুই জানে না; আমি একপাশে নির্জনতায় বসে আছি—ভাবছি স্বামীজীকে নিয়ে সুবিধা এই—যুক্তি-তর্ক ও বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে ছোঁয়া যায়। অসামান্য মেধাবী, সৎ, তেজস্বী এবং অনুপ্রাণিত এক যুবক। তাঁর সঙ্গে তর্ক করা যায়, বলা যায়—তোমার একথাটা, ঐ কাজটা এখন কি প্রাসঙ্গিক? আজকে জন্মালে তোমাকে অন্যভাবে বলতে হত। যেমন আজকের সমাজজীবন সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি-প্রভাবিত—তোমার সময়ে রাজনীতির প্রভাব সমাজে বেশি পড়েনি। দ্বিতীয়বার বিদেশ গিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও রাজনীতির অন্ধকার দিকটা সম্বন্ধে যে-কথা তুমি লিখেছ—তা কি আজকে আমাদের দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়? কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব? তিনি তো সমস্ত যুক্তি, তর্ক, বিচারের বাইরে।

তিনি এমন একটা phenomenon যা বিশ্লেষণের বাইরে—বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে ছেদ করা যায় না। অথচ ঐ ছোট্ট ঘরটা থেকে এই বিশাল নবজাগরণের শুরু—একথা তো আর অস্বীকার করা যায় না। দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণের চারপাশ থেকে কী সেই শক্তি এল যা সমাজের সমস্ত ছোট ছোট ক্ষেত্রে, প্রায় লোকচক্ষুর অগোচরে, এমন এক জাগরণ, এমন এক প্রাণশক্তি এনে দিল যাতে দেশ নড়েচড়ে উঠে বসল! অবশ্যই পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি এসেছিল কিন্তু স্ফুলিঙ্গটি যিনি দিলেন, তিনি তো সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির কিছুই জানতেন না। অথচ যে শক্তির প্রকাশ হয়েছিল তাকে তো উপেক্ষা করা চলে না। প্রশ্ন ওঠে ভারতবর্ষের প্রত্যেক নবজাগরণে ধর্মের প্রয়োজনই বা কেন হবে, প্রত্যেকবারই কেন সেই এক শাশ্বত সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে শুধু বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে নয়—মূর্ত হয়ে! কোনও দেশের তো তা হয় না। ইউরোপে রেনেসাঁস এসেছে প্রচলিত ধর্ম ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। ইউরোপীয় চিন্তামানসের ভিত্তি গ্রীক-পুরাণের ঐতিহ্য—যেখানে দেবতা ও মানুষের দ্বন্দ্বে মানুষ বারবার জিতেছে নিজস্ব বাহুবল ও মনোবল দিয়ে। আর আমাদের পুরাণে যতক্ষণ না মানুষ দেবত্বে উপনীত হচ্ছে, ততক্ষণ সে দেবতার হাতের পুতুল। তাই কি আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে চিরকাল অপেক্ষা করব দেবতার আবির্ভাবের জন্য?...

অন্যমনস্কতার ঘোর তখনও কাটেনি। ফেরার পথে চোখে পড়ল—ভিখারিনীদের একটা দল ঘুবে ঘুবে ভিক্ষা কবছে। এমন সময় আমার কাছেই ডানদিক থেকে মহিলাকণ্ঠে আওয়াজ এল, 'দুটো পয়সা দেবে বাবা?' অর্ধেক অন্যমনস্কতা, অর্ধেক বিরক্তি নিয়ে মুখ ঘোরালাম। দেখি এক প্রৌঢ়া দাঁড়িয়ে আছেন। ফর্সা, অল্প অল্প ভাঁজখাওয়া মুখ, পরনে হাল্কা নীলরঙের শাড়ি। চোখাচোখি হতেই নির্মল হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত—আমি যেন তার বড়ই পরিচিত। এরপর থেকে শুধুই তার monologue, আমি শুধু শুনে যাচ্ছি। প্রৌঢ়া বিড় বিড় করে বলছে—'ওমা, কার কাছে কি চাচ্ছি গো, এ যে রাজাবাবু! তুমি রাগ করনি তো? সেই সেবার তুমি কম্বল দিলে, গরিব, দুঃখী সবাই যে যেখানে ছিল কম্বল নিয়ে চলে গেল। কত কম্বল দিলে, সকলে পেলে। শুধু আমার ছোট মেয়েটা পেল না। তা, রাজাবাবু, আমার ছোট মেয়েটাকে একটা কম্বল দেবে? রাতের বেলা গঙ্গা থেকে হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়, তার বড় শীত করে'। কেউ পুণ্যার্জনের জন্য কম্বল বিলিয়ে থাকবে—এ আমাকে সেই লোক ভেবে ভুল করছে। কিন্তু তার কথার মধ্যে মিশে ছিল পরম শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আকুতি। কথা থামছে না দেখে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা আনন্দের হাসিতে ভরে গেল। আমার স্ত্রী-কন্যা পাশের দোকানে খাবার কিনতে গিয়েছিল। স্ত্রী ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলঃ 'কি হল, কি দেখছিলে ওদিকে?' বললামঃ 'না, ঐ বৃদ্ধা—মেয়ের জন্যে একটি কম্বল চাইছিল'—বলতে বলতে ডানদিকে তাকিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। কম্বলটা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না আর। হঠাৎ মনে হল—কম্বলটা আমি মোটেই দিতে চাইনি—তাহলে ওর খোঁজটা ভাল করেই নিতাম। হঠাৎ যেন মাথার মধ্যে একটা দরজা খুলে গেল—মনে হল, আমি ঠকিয়েছি। যেভাবে আমরা সকলকে ঠকাই. সেইভাবেই! আমরা রাজনীতিতে ঠকাই, ধর্মের নামে ঠকাই, ব্যবসায়ে ঠকাই, মন্ত্রী হয়ে ঠকাই, আমলা হয়ে ঠকাই, কেরানী

হয়ে ঠকাই, পুলিশ হয়ে ঠকাই, ডাক্তার হয়ে ঠকাই, উকিল হয়ে ঠকাই, দোকানদার হয়ে ঠকাই—শ্রমিক হয়ে ঠকাই। যে যত ঠকাতে পারে, সে ততই বুদ্ধিমান, আর যে ঠকে সে বোকা। সমাজ জুড়ে যেন প্রতারণার চক্রান্ত। আর কোনও সমাজে এমনটি নেই। কত সহজেই আমরা এই পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছি—এখন আর এসব গায়েই লাগে না। আমি ঠিক একই রকমভাবে একজন গরিব ভিখারিণীকে ঠকালাম, আর সে কৃতজ্ঞ, গদগদস্বরে ভালবাসা জানাল। একটা কম্বল কিনে পরপর দুই রবিবার দক্ষিণেশ্বরে তন্নতন্ন করে খুঁজেছিলাম—না দেখলাম সে বৃদ্ধাকে, না তার ছোট মেয়েটিকে। এই অভিজ্ঞতার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা কি চলে? সম্পূর্ণ আত্মস্থ হয়ে চিন্তা করতে করতে Gestalt perception-এ হঠাৎ মনের ভিতর থেকে উঠে এসেছে সেই কথা যা মনেই লুকানো ছিল। ভিখারিণীর অভিজ্ঞতা সেখানে শুধু catalyst-এর কাজ করছে! সেই আদিকাল থেকে ভারতের শাশ্বত প্রজ্ঞা বলে আসছে আত্মস্থ হও, বাইরের ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা অন্তত মাঝেমাঝে ছেড়ে দিয়ে নিজের অন্তস্তলে ডুব দাও। আমরা কি সেকথা—নিজের মনের কথা শুনি?

সমাজের মনটা আজ হারিয়ে গেছে। তার শক্তির কেন্দ্রস্থল শুকিয়ে যাচ্ছে। ভিতরটা ফোঁপরা—তাকে কোনরকমে ধামাচাপা দিয়ে কাজ চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজনীতিবিদ মিথ্যা কথা বলবে আমরা ধরেই নিয়েছি—এটা ওটা করবে বলে শেষপর্যন্ত কিছুই করবে না। পুলিশ চোর-ডাকাত ও খুনী ধরবে কিনা সে তাদের মর্জি—ধরলেও বিচার বা সাজা হবে কিনা আমরা জানি না। এইরকম ওপর থেকে নামতে নামতে সমাজের সর্বস্তরেই আজ প্রতারণা, চালাকির দ্বারা বাজিমাতের চেষ্টা। স্বামীজীর সময়েও এই চালাকির বাতাবরণ নিশ্চয় ছিল তা না হলে তার বিরুদ্ধে সাবধান করবেন কেন? কিন্তু সমাজের গতি যত বাড়ছে তত সেই বেনো জলই যেন আরও বেশি করে ঘুলিয়ে উঠছে। চালাকির শক্তিকেই যেন বেশির ভাগ কর্মধারা মদত দিচ্ছে। আর বুদ্ধি, বিদ্যা, কাজ ও চিন্তার ক্ষেত্রে সততার যে আদর্শে সমাজের পুনরুজ্জীবন হয়েছিল তা ক্রমেই পিছু হটছে।

আজকে ঘোলা অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা প্রায়ই শোনা য়ায় যে বিশ্বের কাছে আমাদের প্রমাণ করতে হবে—উচ্চমানের পণ্য উৎপাদনে আমরা কারোর চেয়ে কম নই, তবেই আমরা সার্থক হব। কিন্তু শুধু এটুকু হলেই কি হবে? আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে না যে আত্মিক ও চারিত্রিক বলেও আমরা কারো থেকে কম নয়? একথা কি বিশ্বাস করতে বা দেখাতে হবে না যে ভারতীয়ের ভারতীয়ত্ব—ইংরেজের ইংরেজত্ব, আমেরিকার আমেরিকাত্ব বা জাপানীর জাপানীত্বের থেকে কিছুমাত্র কম শক্তিমান নয়। এই শক্তি সামাজিক সততা ছাড়া আসতে পারে না, আর এই শক্তি না থাকলে উচ্চমানের পণ্যও উৎপাদন করা যায় না। আমাদের দেশের export reject মালের পরিমাণ দেখলেই একথা বোঝা যাবে। তাই একজন বিবেকানন্দ নয়, প্রতিটি কর্মধারায় হাজার জন বিবেকানন্দ প্রয়োজন। এই শক্তি কি আত্মিক শক্তি ছাড়া সম্ভব? অথবা আর একটু ঘুরিয়ে বলা যাক—আমাদের দেশে এই শক্তির উন্মেষ যদি আত্মিক শক্তি দিয়ে হয়, তাতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে কি? প্রথম মারুতি গাড়ি তৈরি করার সময় অল্প কয়েকজন জাপানী কর্মী মিলে সমস্ত গাড়িটা তৈরি করত। তারা প্রতিদিন এসে জুতো খুলে, পুজো প্রার্থনা

করে কারখানায় ঢুকত। যাঁরা জাপানের কারখানা দেখেছেন তাঁদের কাছে শুনেছি যে সেখানেও এইরকম। কারখানাটা হচ্ছে মন্দির—কাজের মন্দির। আর জাপানীরা যখন ব্যক্তিগত পুজো করে তখন মূর্তি-টুর্তি বিশেষ থাকে না—বেশির ভাগটাই আত্মস্থতা, পবিত্রতার পুজো। তা এতে ক্ষতি কিছু হয়েছে? জাপানীদের জাপানীত্ব প্রায় সারা পৃথিবীকে কিনে ফেলতে চলেছে।

আমাদের সমাজে এই শক্তির, এই সামাজিক ethics-এর মূলমন্ত্র কি আছে? সামাজিক সততা প্রতিষ্ঠার, একটা ব্যবহারিক দিক আছে যা করতে হবে। কিন্তু মূলমন্ত্র ঠিক না থাকলে ব্যবহারিক দিকটা ঠিক থাকা সম্ভব না। এ তো একজনের কাজ নয়, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ জনের কাজ। সামাজিক সততার একমাত্র মূলমন্ত্র হচ্ছে সমাজসেবার ধারণা। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সেবার যে মূলমন্ত্র দিয়েছেন, তার ব্যবহারিত্ব, দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতা অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। সেবা মানে তো শুধু দরিদ্রের সেবা, দুর্বলের সেবা নয় এবং অবসর সময়ে সামাজিক কাজও নয় যদিও তার মূল্যও অপরিসীম। সেবা মানে NGO সোপানশ্রেণীর শীর্ষচূড়ায় উঠে কোনও মন্ত্রীর সঙ্গে টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে বসা নয়, নয় কোনও সাংবাদিকের মাধ্যমে খবরের কাগজে আত্মপ্রশস্তি বের করা। সেবা হচ্ছে একটি মানসিক attitude। একটি মানুষের সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক সমাজ ও পৃথিবীর যে সংযোগ তার গুণগত definition. সে কি চোখ দিয়ে দেখবে, কিভাবে অনুভব করবে এবং তার প্রতিক্রিয়া কি গুণগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা determined হবে—তারই পরম মন্ত্র। সেবা যদি আমার জীবনের মূলমন্ত্র হয়, তাহলে আমার প্রত্যেকটি কাজই সেবা। অফিসে, কারখানায়, সরকাবি সচিবালয়ে, হাসপাতালে, আদালতে কাজ করছি মূলত সেবার জন্য। পারিশ্রমিক তো নিতেই হবে—নাহলে খাব কি, বাঁচব কি করে? পারিশ্রমিক নিয়ে মনে ক্ষোভও থাকতে পারে—সেজন্য প্রতিবাদও করা যায় কিন্তু কাজটা যখন করছি সেটা সেবা। কাজে জটিলতা আসছে, সেটা সমাধান করছি সেবার আদর্শে—যাতে সমাজের ও ব্যক্তির কল্যাণ হয়। এটা কি একেবারেই সম্ভব নয়? অবসর সময়ে সেবামূলক কাজের ধারণা এবং ইচ্ছা আগের থেকে বিস্তৃতি-লাভ করেনি কি? নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা সমাজের অন্ধকার দিকগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আলোয় তুলে ধরছে কোনও স্বার্থবুদ্ধি ছাড়াই। সেবার মূলমন্ত্র যদি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তবে তার ব্যবহারিক দিকগুলোও ক্রমশ সহজেই প্রশাসনে, শিল্প-বাণিজ্যে ও পেশাতে দেখা যাবে। সেবাধর্মের যে মানসিকতা তা হচ্ছে সামান্য একটু অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিকতার মানসতা, বাইরের জগতের প্রতি সামান্য ভালবাসাপূর্ণ নির্লিপ্তির ভাব। তাতেই সমাজে এমন শক্তি জন্ম নেবে যা বিশ্বজয় করতে পারে। আর বাকি বিদ্যা, বুদ্ধি, উদ্যম প্রভৃতি মালমশলাগুলি তো সবই আছে—নেই শুধু প্রেরণা। একমাত্র সেবার আদর্শই সেই প্রেরণা জাগাতে পারে।

ভাবা যায় কি এমন একটা অবস্থা, যখন সমস্ত সরকারি অফিসে, দপ্তরে, থানার কাউন্টারে যিনি বসে আছেন, তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছেন কি করে আপনাকে সাহায্য করা যায়! কল-কারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যে শ্রমিককে ঠকিয়ে, সরকারি নিয়মকে লঙ্ঘন করে আর্থিকভাবে শিল্পকে রুগ্ন করা হচ্ছে না! শ্রমিক কাজ করছে পুরোদমে কোনও ফাঁকি না দিয়ে উৎকৃষ্টমানের উৎপাদনের জন্য। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষার

মানই নির্ধারণ করবে পণ্যের উৎকর্ষ ও উন্নতিকামী দেশের ভবিষ্যৎ। কি করে সেই শিক্ষা হবে প্রতারণার বাতাবরণ না সরালে—শ্রমিক, মালিক, সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস না জন্মালে? সেবাই একমাত্র চাবিকাঠি যার দ্বারা নির্লজ্জ লোভের অন্তত কিছুটা সংবরণ হবে, তৈরি হবে বিশ্বাসের বাতাবরণ। এর পরিণামেই স্বামীজী-বর্ণিত আদর্শ সমাজ সম্ভব যেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেই সমান উৎকর্ষ লাভ করবে, পরস্পরকে শোষণ করবে না বা দাবিয়ে রাখবে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মানে—Education ও Intellect ; Politics, Administration ও Armed Forces ; Commerce, Industry ও Finance ; Labour ও Employments. এইভাবে বললে কথাটা হয়তো আজগুবি শোনায় না। আজকের জাতপাতভিত্তিক রাজনীতির দেশে এই নতুন সূত্র কি দেওয়া যায় না? এমনিতেই ধর্ম নিয়ে সমগ্র উপমহাদেশে যে বিকট তাণ্ডব, তাতে ধর্ম কথাটা শুনলে যে কোন শিক্ষিত মন আঁতকে ওঠে—তা হোক না সেবাধর্ম!

মানুষের ইতিহাস মাত্র পাঁচ হাজার বছরের। তাই হাল ছাড়লে চলবে না। গত বারো বছরেই পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দারুণ দুর্যোগের মধ্যেও আশাবাদী হওয়ার অনেক কারণ আছে। সেই কারণ শুধু রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে নয়, মানুষের চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তনে, বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানদর্শনের যুগান্তকারী পরিবর্তনে, ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে Quantum Theory দ্বারা মানুষের জীবনদর্শন ও মানসিকতার ওপর অবশ্যম্ভাবী গভীর প্রভাবে, এই উপমহাদেশের বিভিন্ন দিকে ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মের নামে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, ধর্মকে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ব্যবহারের বিপক্ষে সাধারণ মানুষের নীরব প্রত্যাখ্যানে। পৃথিবীর মানুষের ভাবী দার্শনিক-সামাজিক বিবর্তনে সেবাধর্ম ও ভালবাসাই হবে প্রধান চাবিকাঠি—এই কলকাতার মাটিতে যার প্রথম প্রকাশ।

এক একটা দিক সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে দেখা যাক—এই বিশ্বাস যুক্তির ধোপে টেকে কিনা। রাজনৈতিক দিকটাই প্রথমে দেখি। গত বারো বছরে দুটি প্রধান রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমটি চামড়ার রং দিয়ে মানুষের মূল্য নির্ণয়ের প্রবণতা—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে, দ্বিতীয়টি হল মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদের পতন। চামড়ার রং সাদা-কাল-হলদে-বাদামী—যাই হোক না কেন, মানুষ যে আসলে এক, এই ধারণা কতদিনের? সবে তিরিশ বছর পার হতে চলেছে—মার্টিন লুথার কিং-এর হত্যা, আলবামা দাঙ্গা, কু-ক্লুক্স-ক্ল্যানের দাপট—দক্ষিণ আফ্রিকার কথা ছেড়েই দিলাম। আজকে পৃথিবীর দেশে দেশে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললেও দেখা যায়, এর রেশ প্রায় মুছে গেছে। মানুষের চিন্তার জগতে যখন পরিবর্তন আসে তখন তা এমনই দ্রুত হয়। মার্ক্সবাদের পতনের শুধু দুটো দিক নিয়ে আলোচনাই এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। প্রথম দিক হচ্ছে—মার্ক্সবাদ বিশ্বাস করিয়েছিল যে সামাজিক নৈতিকতার ভিত থেকে ধর্মকে একেবারে বাদ দিতে হবে কারণ যুগ যুগ ধরে ধর্ম খালি শোষণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ভুল না হলেও, শুধুমাত্র দ্বান্দ্বিক জড়বাদ দিয়ে কোনও সামাজিক নৈতিকতা স্থাপন করা যায় নি পঁচাত্তর বছরের চেষ্টায়। ব্যক্তির শোষণ পরিবর্তিত হয়েছে গোষ্ঠীর শোষণে অথবা শোষণের যন্ত্র চলে গেছে এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর হাতে। তবে মার্ক্সবাদ চলে

গেলেও তা বিরাট পরিবর্তন করে দিয়ে গেছে চিন্তার জগতে—এমনকি ধর্মীয় চিন্তার জগতে—আমাদের দেশে না হলেও পাশ্চাত্য সভ্যতায়। আমরা তো বহুকাল ধরেই সোনার খনি আগলে বসে আছি তার মূল্য না জেনেই। কিন্তু ধর্মকে যে শোষণের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না, কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর আনুকূল্যে দেখানো যাবে না, ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না মানুষ মারতে—অথচ ধর্মের প্রয়োজন আছে ব্যক্তির এবং সমাজের মানসিক ও আত্মিক বিকাশে—এই ধারণা পৃথিবীতে ধীরে ধীরে আসছে। দ্বন্দ্ববাদের দিক থেকে বিচার করলে এই পরিবর্তনে মার্ক্সবাদের উত্থান ও বিবর্তনেরও অবদান আছে। দ্বিতীয় দিকটি হল, তার মানবতাবাদী আবেগ ও তার ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধারণা। মার্ক্সবাদের প্রথম যুগে তার মানবতাবাদী আবেগ তদানীন্তন যুবসমাজকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করে তাকে ক্ষমতার গদিতে বসিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করার প্রবণতা এবং তাকে একটি ছোট ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর স্বার্থে অত্যন্ত নিষ্ঠুর সীমা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ যুবসমাজকে বিমুখ করে তোলে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা মানে চিন্তা-কর্ম-জ্ঞানের স্বাধীনতা যা মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় নতুন উপলব্ধির দিকে—'চরৈবেতি' মন্ত্রে—তাকে বন্ধ করা যাবে না। মার্ক্সবাদের পতনের ভিতর দিয়ে মানুষ আজকে সগর্বে এই কথাই ঘোষণা করেছে, এর জন্য যে কোনও মূল্য দিতে তারা প্রস্তুত। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবকে এমন অনেক লোক সমর্থন করেছিলেন বা তাতে অংশ নিয়েছিলেন, যারা বলশেভিজম বা মার্ক্সবাদ পুরোপুরি সমর্থন করতেন না কিন্তু বিশ্বাস করতেন যে সমাজের পুনর্গঠনে এই বিপ্লব এক অবশ্যম্ভাবী প্রথম পদক্ষেপ—পরে এর পরিবর্তন হবে। বিপ্লবোত্তর কালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেনিনের সঙ্গে এঁদের বাদানুবাদের বহু রচনা আছে। অবশ্য এদের অনেকেরই গতি হয়েছিল সাইবেরিয়াতে। উপযুক্ত সময় না এলে কোনও চিন্তাই ফলপ্রসূ হয় না। আজকের চিন্তা যখন কালকের জন্য, তখন তার গতি হয় দুর্বার। আর আজকে যার প্রবল প্রতাপান্বিত পদভরে মেদিনী থরথর, কালকে তাকে ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করতে হয়—এক কবর থেকে অন্য কবরে। এই হচ্ছে চিন্তার শক্তি, মনের শক্তি, উপলব্ধির শক্তি—কোনকিছুর দ্বারাই যার গতিরোধ করা যায় না। এই হচ্ছে মার্ক্সবাদের পতনের শিক্ষা।

এরপরে আসা যাক, বিজ্ঞানের স্রোতে। আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা বলা যায় নিউটনকে দিয়ে। তার আগে টলেমীয় মহাবিশ্বের মডেল ছিল পাশ্চাত্য মানুষের ধ্যান-ধারণার মূলে—যাতে পৃথিবী আছে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। আর সেই কেন্দ্রে রয়েছেন ঈশ্বর বা তাঁর প্রতিনিধি পোপ বা খলিফা বা ইমাম। এই বিজ্ঞান-ধারণা পাল্টিয়ে নিউটন দেখালেন, মহাবিশ্ব কতগুলো নিয়মে চলে—যাকে বলা হয় Clockwork Universe। এই নিয়ম বা আইনগুলো আমরা সব জানি না। কিন্তু চেষ্টা করলে জেনে ফেলতে পারি—আর তখনই এই মহাবিশ্বে কোনও রহস্যই আর রহস্য থাকবে না। এমনকি অঙ্ক কষে আমরা বলে দিতে পারব—মহাবিশ্বে ভবিষ্যতে কখন কি ঘটবে। এই ধারণা মানুষের মনে একটা বিরাট প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস এনে দিল—তার ক্ষমতা ঈশ্বরের থেকে কম নয়! যে সভ্যতায় এই বিজ্ঞানদর্শনের জন্ম অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতা, তা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠল—পৃথিবী ও মহাবিশ্ব, সবটাই জেনে নিতে হবে, জিতে নিতে হবে। এই প্রচণ্ড

কর্মপ্রেরণা দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সবাইকে জিতে নিল—কালো-বাদামী-হলুদ সবাইকে। তৈরি করল নতুন নতুন যন্ত্র, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, শিল্পবিপ্লব—তৈরি করল নতুন Dialectic। Scientific determinism থেকে এল social determinism অর্থাৎ মানুষের সমাজ ও ব্যবহারের আইনগুলো জেনে ফেলতে পারলেই অঙ্ক কষে ঠিক করে দেওয়া যাবে সমাজকে সুষ্ঠু করতে কি করতে হবে, ভবিষ্যতেই বা কি হবে ইত্যাদি। এর প্রথম এবং অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হলেন ফরাসী পদার্থবিদ লাপ্লাস। এই Social deterministic ধারণা পূর্ণ পরিণতি লাভ করল মার্ক্সবাদে। বিজ্ঞানের, বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষমতা অসাধারণ—আজকে যা বিজ্ঞান, কালকে তা দর্শন হয়ে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচার-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে। আজকে পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নানা শাখার জৈববিজ্ঞান। কিন্তু এই শতাব্দীর গোড়া থেকে নিউটনের Clockwork Universe—ধারণা পাল্টে যেতে লাগল।' এল আইনস্টাইনের Theory of Relativity। দেখা গেল নিউটনের Mechanical Clockwork Universe-এর যেগুলো স্তম্ভ অর্থাৎ constants, সেগুলো অনড় নয়। Time এবং Space-এর কোনও আলাদা অস্তিত্ব নেই—দুটো মিলে Time-space-dimension। তেমনি আরও অনেক dimensions-ও থাকতে পারে। বস্তু ও শক্তির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য থাকলেও, আসলে পার্থক্য নেই—একটি অন্যটিতে রূপান্তরিত হতে পারে একটি constant-এর মাধ্যমে। দেখা গেল আলোর ভর আছে এবং তা মাধ্যাকর্ষণের টানে বেঁকে যায় সূর্যের পাশ দিয়ে আসতে গিয়ে। আলোর রশ্মি বেঁকে যায় মানে সময় বেঁকে যায়, কারণ আলোর গতি তো constant. সময় বেঁকে যায় মানে time-space বেঁকে যায়-অর্থাৎ space-এর curvature আছে—সে সসীম। Hubble আবিষ্কার করলেন যে Galaxy-গুলো আমাদের থেকে দ্রুত ছুটে আরও দূরে চলে যাচ্ছে—অর্থাৎ মহাবিশ্ব প্রসারণশীল। তার একটা আরম্ভ আছে—যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে—সেই দুই জায়গায় তাহলে সময় থেকে যাবে—অর্থাৎ Time-space-continuum বন্ধ হয়ে যায়—এই দুটো জায়গাকে বলা হল Theory of Relativity-র Singularity. Singularity যে শুধু আরম্ভ বা শেষে আছে তাই নয়, মাঝে মাঝেও আছে—তার মধ্যে পড়লেও হারিয়ে যেতে হবে। মহাবিশ্ব, মহাবিশ্বের space—ফাঁকা নয়, যেন ফোম-এর মতন, মাঝে মাঝে ফুটো—গোলাকৃতি ফোম, না ত্রিভুজাকৃতি, না কোনও জ্যামিতিক আকৃতি—অসংলগ্ন, এবড়ো-খেবড়ো। কিন্তু তার একটা আরম্ভ আছে, বর্তমানে সে প্রসারণশীল, ভবিষ্যতে আসবে তার সঙ্কোচনের পালা। সঙ্কুচিত হতে হতে শেষ হয়ে যাবে অসীম ঘনত্বের একটি বিন্দুতে —সময়ের হয়ে যাবে শেষ, ফিরে যাবে আবার সেই শুরুতে। Gamow-র Big Bang Theory, Penrose ও Hawking-এর Black Hole Singularity, Guth-এর Inflationary Expansion, Winberg-এর অপূর্ব বিবরণ First three minutes. প্রমাণও মিলল—যার সর্বশেষ এবং চমকে দেওয়া প্রমাণ এনে দিল আমেরিকার NASA থেকে পাঠানো একটি Space Probe যার সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে COBE অর্থাৎ Cosmic Background Explorer—মহাবিশ্বের দূরতম কোণে তাপাঙ্কের সামান্য একটু তারতম্য মেপে দিয়ে। ঈশ্বরের স্থান হল শেষপর্যন্ত মহাবিশ্বের আরম্ভে আর

শেষে—মহাবিশ্ব কেন এই প্রশ্নে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় ঈশ্বরের স্থান নির্দেশে সকলেই দ্বিধাগ্রস্ত—কোথাও না কোথাও তিনি আছেন—মহামান্য পোপও তাই মনে করেন, গ্যালিলিও তাই মনে করতেন এবং হকিং-ও তাই মনে করেন। ক্রমাগত হৈ হৈ করে ঈশ্বরকে স্থানচ্যুত করছেন পদার্থবিজ্ঞানী, শরীরবিজ্ঞানী এবং মার্ক্সবাদীরা—তাঁর রক্ষক পোপ মহাশয় অনবরতই বলছেন—না না এদিকে নয় ওদিকে, ঐ যে ঐদিকে বসে আছেন—আছেন, আছেন। আসলে যীশুখ্রীস্ট খ্রীস্টধর্ম প্রচার করার পর পাশ্চাত্য শয়তান ভয় পেয়ে গেল। তখন সে নতুন খ্রীস্টধর্মীদের কাছে গিয়ে কানে কানে বলল "get organised"। ব্যস্ অমনি তরোয়ালের হাতলকে ক্রুশ মনে করে তারা বেরিয়ে পড়ল দিগ্বিজয়ে। এদের কবীর, সূরদাস, পদাবলী, শ্যামাসঙ্গীত—এসব কিছুই গাইতে হয়নি—শুধুই 'Saints go marching in' গাইলেই হল। এই বর্বর জাতীয়তাবাদী, অর্থকামী আক্রমণে ইসলামও হয়ে পড়ল organised martial religion। আর আমরা হিন্দুরা রয়ে গেলাম disorganised, কারণ ভারতীয় দর্শনের সর্বোচ্চ মার্গে Reality বাইরে নয়, অন্তরে। বাইরেটা organised, disorganised যাই হোক, সেটা projection বা মায়া। Reality বা ঈশ্বর আমার চেতনাব ভেতরে। আমিই সেই। আমার মধ্যেই যুগপৎ মহাবিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা এবং তা উপলব্ধির শক্তি। আসলে এইসব ধর্মগুলি কোনও দেশ ও কালে বিভক্ত সম্প্রদায় নয় যারা মন্দিরে যায়, মসজিদে যায় বা গীর্জায় যায়। এরা সমগ্র মানবসভ্যতায় চিন্তা ও কর্মপ্রবাহের এক একটি ধারা। সব সম্প্রদায়ের ভেতরেই সব সম্প্রদায়ের লোক আছে। কিন্তু এই ভারতীয় হিন্দুদর্শনের আজকের দিনে যুক্তিসঙ্গত কোনও ব্যাখ্যা আছে কি?

Theory of Relativity এবং Cosmology নিয়ে বাইরের বিশ্ব বা Macrocosmos-এর আইন কানুনের আবিষ্কার এবং তার পিছনে physical reality-র খোঁজ বেশ সুষ্ঠুভাবে এবং রোমহর্ষকভাবেই এগোচ্ছিল। কিন্তু গণ্ডগোল বাধল যখন নজর ফেরানো হল অণু-পবমাণুর ক্ষুদ্র বিশ্ব বা Macrocosmos-এর দিকে। সেখানেও তো এক একটা সৌরজগৎ—প্রত্যেকটি পরমাণুর কেন্দ্রে একটি নিউক্লিয়াস আর তার চারপাশে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন। আর অসংখ্য এই ধরনের সৌরজগৎ মিলে সমস্ত জড় পদার্থ, সমস্ত প্রাণী, আমরা, সমস্ত galaxy ও এই মহাবিশ্ব। অতএব মহাবিশ্বের যা আইনকানুন তা এখানে খাটবে, এখানকার যা আইনকানুন তাই মহাবিশ্বের নিয়ম হবে। কিন্তু সেইখানেই গোল বাধল। দেখা গেল, পরমাণুর ভেতরের কণিকাগুলো কোনও আইনই মানছে না। গণ্ডগোলটা আরম্ভ হল ইলেকট্রনের ভর ও অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে—আলো জিনিসটা ছোট ছোট কণা না রশ্মি তাই নিয়ে, কারণ তারা দুটোর আইনই মানছে—যখন যেটা খুশি—আর ইলেকট্রনের প্রকৃতিও বদলাচ্ছে, কখন কিভাবে দেখা হচ্ছে—তার উপর। জন্ম নিল Quantum-এর ধারণা এবং তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাড়তে বাড়তে জন্ম দিল বিরাটকায় Quantum Theory-র। এর শাখা-প্রশাখা, প্রয়োগ, পরীক্ষা এবং তার প্রতিফলন মহাবিশ্ব ও মানুষের মনের ওপর—বিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতের এক বিশাল মহাকাব্য যার ফল গিয়ে পড়বে একবিংশ শতাব্দীর মানুষের ওপর। এই মহাকাব্যের বিশদ বর্ণনা এবং তার রোমাঞ্চকর চরিত্রদের আলোচনার জায়গা এটা নয়। সম্ভব নয় Davission, Dirac, Max Planck, Einstein, Niels Bohr, Yukawa, Penrose,

Hawking-এর বিশদ বিবরণ, সম্ভব নয় Einstein-Rosen-Podolsky Paradox-এর আলোচনা। শুধু নামজাদা পদার্থবিদ্‌দের সাধারণ ভাষায়, এঁদের প্রমাণিত সত্যগুলোর উপস্থাপন এবং ছোট ছোট বর্ণনার মধ্য দিয়ে মানুষের মন, চিন্তাধারা এবং সমাজের সঙ্গে তার যোগসূত্রগুলো কিছুটা অন্তত দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব। Paul Davies-এর 'Other Worlds' বইয়ের কথায়ঃ 'The apparently concrete world around us is seen to be an illusion when we probe into the microscopic recesses of matter.' 'The compulsion to seek an underlying lawfulness beneath this sub-atomic anarchy is strong but apparently fruitless. We have to face the fact that the world is far less substantial and dependable than envisaged hitherto.' Quantum theory-র অগ্রগতিতে ও তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অতীত-বর্তমান, সময় ও space-এর ধারণা, মহাবিশ্ব কি একক না অনেক, তার শুরু-শেষ আছে না নেই, মানুষ ও তার চেতনার বাইরে কোনও Reality বা Physical World আছে না নেই—এসব ধারণার সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণমাত্র দেওয়া যাক। 'Is it necessary to regard time itself as a thing, or only a linguistic convenience for expressing the relation between events ?' ভাগবতে সময়ের সূত্রে বলা আছে—সময় শুধু দুটি ঘটনার পরম্পরাগত সম্পর্ক। মহাবিশ্বের বস্তু ও শক্তিরাশিতে ঘটনার পরম্পরা যেহেতু চলতেই থাকবে তাই সময়েরও শেষ নেই। Hawking 'Theory of Relativity'-র সাহায্যে মহাবিশ্বের প্রারম্ভে প্রথম Black Hole-এর বর্ণনা দিয়ে দেখলেন—সময় স্তব্ধ হয়ে গেল ও ঈশ্বরের জায়গা রয়ে গেল—মহাবিশ্ব কেন এবং আরম্ভেরও আগে কি ছিল এই দুটি প্রশ্নের মধ্যে। তখন Pauli-র 'Exclusion Principle ও Quantum Theory' প্রয়োগ করে দেখালেন যে একেবারে সম্পূর্ণ singularity-তে পৌঁছানোর দরকার নেই এবং সম্ভবও নয়, অতএব সময় চলবে। Hawking তাঁর নিজের পঙ্গুত্বের প্রতিবাদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চেয়েছেন কিন্তু আমাদের ভাগবতে যে সময়কে অনন্ত বলা হয়েছে তাতে ঈশ্বরের কি এল গেল! ভাগবতে space-ও পরিবর্তনশীল, Quatum Theory-তেও তাই। অসংখ্য মহাবিশ্ব তো ভাগবতেরই ধারণা বলে জানতাম এবং সবটাই যেহেতু মানুষের চেতনার reflection তাই শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদাকে অনন্ত মহাবিশ্বের স্বরূপ নিজের মুখগহ্বরে দেখিয়েছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনও রথের ওপরেই তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করেন। এই বিংশ শতাব্দীর শেষের বিজ্ঞানে তা কি করে এসে পৌঁছাবে? অসংখ্য মহাবিশ্ব সম্পর্কে Quantum Theory বলছেঃ 'In the same way that we may construct a different world for each electron trajectory, so we may construct a different world for each shape of space. Stitching them altogether gives us an infinite dimensional superspace. Each space of super-space will contain its own superworld of all possible particle arrangements. The world of our senses is apparently a single, three dimensional element projected out of the stupendously infinite

superspace.' এর মানে কি শ্রীকৃষ্ণ পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন? অথবা সেযুগের পূর্বেই পদার্থবিজ্ঞানের বিরাট ল্যাবরেটরি ছিল যার paper গুলোর summary শ্রীকৃষ্ণ বলে গেছেন? তা হয়তো নয়। মানুষের চিন্তাভাবনা তার চেতনার প্রতিফলন এবং সেই চেতনা যখন সে মহাবিশ্বের ওপর স্থাপন করে তখন তাতেও রঙ লাগে। এই চিন্তার projection যেভাবেই আসুক না কেন, তা অনেকটাই subjective. পদার্থবিজ্ঞানীর ভাষায়ঃ "Clearly the world that a person actually experiences cannot be totally objective, because we experience the world by interacting with it."

Quantum theory-তে অতীত-বর্তমান মিশে গেছে—Einstein, Rosen, Podolsky Pardox-এর experiment এবং তার analysis-এ। এর মানে অবশ্য নয় যে সশরীরে time travel সম্ভব। ইংরেজ পদার্থবিদ John Wheeler-এর ভাষায়ঃ "The quantum principle shows that there is a sense in which what the observer will do in the future defines what happens in the past—even in a past so remote that life did not then exist, and shows even more, that 'observership' is a prerequisite for any useful version of 'reality'." অচিন্তনীয় ব্যাপার নয় কি? এগুলো কিন্তু essay নয়। বিজ্ঞানসম্মত experiment-এর বিজ্ঞানসম্মত result analysis-এর ফল। আমরা কিন্তু কবে থেকেই যেন জানতাম—কি জানতাম তা জানতামও না, রামজন্মের আগে রামায়ণ লেখা Quantum principle-এ খুবই সম্ভব। এই cosmic supercomputer-এর সঙ্গে একটি মানুষের চেতনার যোগসাধনও হয়তো সম্ভব। তাহলে বিজ্ঞান কি তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে, নাকি আমরাই পৃথিবীতে একমাত্র জাত যারা এইসব কথা অবিশ্বাস্যভাবে intuitively বহুদিন আগেই জেনেছি। Paul Davies-এর একটি উক্তি দিয়ে এর উত্তর দেবঃ

'Science would become a game or charade. The fact that we can do it and that it is useful and we discover things through science by using these laws shows that they actually reflect, however imperfectly, some aspect of the really existing world. I think the essence of science is founded on that act of faith. It is an act of faith because may be the universe is at rock bottom absurd. Maybe it's not rational but it's merely an act of faith ?

"Incidentally, we've inherited this faith from Christianity and the Judeo-Islamic-Christian tradition of a created universe which has an order imposed on it by a deity who has planned the world and bestowed laws upon it. In doing our science we're uncovering these laws. Scientists don't use theistic terminology any more but they've inherited an essentially theistic world view. It could be that we must reject the Judeo-Christian-Islamic traditions, the whole

of Greek philosophy with its emphasis on rationality, and the whole of science. It could all go out of the window, but I don't believe it will."

যুগ যুগ ধরে যে বিরাট ঐশ্বর্যময় সাধনার সঞ্চয়, 'আমি' তার উত্তরপুরুষ—যে সাধনজগতে মানুষ external reality তে বিশ্বাস করেনি, করেছে internal reality তে। আমি তার 'cause'-ও বটে 'effect'-ও বটে। এ ঐশ্বর্য শুধু আমার জন্য নয়, হিন্দুদের জন্য নয়, ভারতবর্ষের জন্যও নয়—সমগ্র মানবজাতির জন্য।

আমাদের বেদান্তদর্শন বলে ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি করেননি, তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। সেই নিরাকার নির্গুণ আদিসত্তা বহুধা বিভক্ত হওয়ায় রূপ নিল জ্যোতিঃপুঞ্জ, নক্ষত্ররাশি, জড়পদার্থ এবং সর্বশেষে প্রাণ। সমগ্র সৃষ্টির ভিতর চেতনার সঞ্চার, এক এক জায়গায় বেশিভাবে পুঞ্জীভূত। সবচেয়ে বেশি পুঞ্জীভূত প্রাণে, প্রাণের সর্বশেষ বিকাশ মানুষে। যেহেতু ক্ষুদ্রতম অংশের ভিতরও সম্পূর্ণের গুণ বিদ্যমান থাকে, সেজন্য প্রত্যেক মানুষের ভিতরই আছে বিশ্বচেতনার—ঈশ্বরের অংশ কমবেশি। জ্যোতিঃপুঞ্জ, জড় পদার্থ ও প্রাণ সবই ব্রহ্মের অংশ তাই কোনও এক অংশ অপর অংশকে বাইরে থেকে objectively দেখতে বা বিচার করতে পারে না, subjectively অনুভব করতে পারে। মানুষ অনুভব করতে পারে আমরা জানি কিন্তু অন্য প্রাণী ও জড় পদার্থ যে অনুভব করতে পারে না; সেকথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় কি? অনুভবের রূপ হয়তো আলাদা। একটি পরমাণুর ধ্বংস থেকে উদ্ভূত বিপরীতধর্মী দুটি photon (photonpair) বহু যোজন ও বহুসময়গত দূরবর্তী হলেও একইরকম ব্যবহার করে—তাদের বিভিন্নরকম ব্যবহার করার স্বাধীনতা থাকলেও। মানুষ যখন অনুভব করে, তখন সে হয় বিশ্ব-একাত্ম, বিশ্বপ্রেমী—সে ঈশ্বরত্বে উপনীত হয়, নিজের পৃথক অস্তিত্ব হারায়।

কিন্তু ঈশ্বর কেন হঠাৎ বহুধা বিভক্ত হলেন (Big Bang কেন হল?) কারণ নির্গুণ ব্রহ্ম চাইলেন সগুণ হতে, নিজেকে নিজে আস্বাদন করতে। আর সেই আস্বাদনের আনন্দেই উদ্ভূত এই মহাবিশ্ব। দর্শনশাস্ত্রে যাকে বলা হয় ঈশ্বরের লীলা। সেই আনন্দই মূর্ত হয়ে ওঠে যখন মানুষ বিশ্ব-একাত্মতা অনুভব করে। এই আনন্দই ব্রহ্ম।

বিজ্ঞানদর্শনের প্রসঙ্গে অধ্যাত্মদর্শনের প্রসঙ্গ এসে পড়ল এই কারণে যে যদি Quantum theory অনুযায়ী physical reality মানুষের চেতনায় আরোপিত হয় তবে সে আরোপিত রূপ একই হবে, যেভাবেই তাকে বিচার করা হোক—experiment দিয়ে হোক, শুধু যুক্তি দিয়ে হোক অথবা অনুভব করে হোক। নিজ নিজ উপায়ে সত্যের বিচারে এই পথগুলো আলাদা থাকুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু এদের মূলে নেই কোনও দ্বন্দ্ব। আজকের এই ধারণা দুই-এক দশকের বেশি পুরোনো নয়। আধুনিক খ্রীস্টান থিওজফিতেও বিশ্বময় চেতনাকে Theory of Relativity-র dimension হিসাবে ব্যাখ্যা করতে চাওয়া হয়েছে, যেমন করেছেন তিরা দ্য শারদাঁ। ভারতীয় দর্শন এ বিষয়ে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ (detail) যা এখানে সবিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

আমরা সকলে ঈশ্বরের অংশ—এই বিশ্ব-একাত্ম-চেতনা সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের চিন্তায় ঠাঁই না পেলে সামাজিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হবে না। আশার কথা, গত কয়েক

বছরে সমাজচেতনার মধ্যে এই দর্শনের প্রভাব পড়ছে। প্রথমেই ধরা যাক, মৌলবাদের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত। খ্রীস্টান মৌলবাদ বহু আগেই পর্যুদস্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে। বিজ্ঞান ও শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীস্টধর্ম বুঝেছে যে বিজ্ঞানের বিরোধিতা না করে তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলাই ভাল। এরই সঙ্গে চলেছে পুরানো আধ্যাত্মিকতার খোঁজ ও তাকে নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা। এই সচেতন প্রয়াস তাকে অন্যান্য ধর্মের, বিশেষ করে ভারতীয় দর্শনের খুব কাছাকাছি এনে ফেলছে। Asimov বা Arthur C. Clark-এর মতন scientific fiction writer রা ভবিষ্যতের 'post quantum' যুগের ছবি আঁকতে ক্রমাগত সাহায্য নিচ্ছেন হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের। এদের প্রভাব পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর এখন সবচেয়ে বেশি।

যে কোনও ধর্মের মৌলবাদে প্রথম আঘাত পড়ে মেয়েদের ওপর, নারী স্বাধীনতার ওপর। তাই প্রতিবাদও শুরু হচ্ছে মেয়েদের ভিতর থেকেই। আজকের প্রয়োজন সমাজের প্রতারণাজাল ছিঁড়ে ফেলার। সেই প্রতারণা যা ধর্মীয় মৌলবাদকে ডেকে আনে, মানুষকে করে শঠ ও অসৎ।

আজকের যুগে এ প্রশ্ন তাই স্বভাবতই এসে পড়ে—ধর্মীয় মৌলবাদকে বাদ দেওয়ার অর্থ কি ধর্মকে বাদ দেওয়া নাকি শাশ্বত মানবতাবাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা যা আমাদের বহুযুগসঞ্চিত অধ্যাত্মসম্পদ? সেই বিশ্ব-একাত্মতা মানবতাবাদী ধর্মের কর্মরূপ সেবাধর্ম ছাড়া আর কি হতে পারে? মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের এই চাবিকাঠি হল একমাত্র অস্ত্র যা দিয়ে মৌলবাদ ও হিংসার জাল ছিন্নভিন্ন করে আমরা নতুন ও মহান এক সভ্যতা গড়তে পারি—সেই সভ্যতায় থাকবে খ্রীস্টানের কর্মপ্রেরণা, ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং হিন্দুর জীবনদর্শন; আর জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির মধ্য দিয়ে ভালবাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ—যে ভালবাসা ঈশ্বরের দান। সেই আনন্দময় সমাজ পরম আনন্দের সন্ধান পাবে। একশ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ ভবিষ্যৎ ভারতের এই রূপই দেখেছিলেন এবং উদারকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেনঃ "I shall inspire men everywhere, until the world shall know that it is one with God."

স্বামী বিবেকানন্দ ও সেবাধর্মের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি

এম লক্ষ্মীকুমারী

মানবসেবা সচরাচর ধর্মাচরণের সহায়ক সদাচার বলেই গণ্য হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সেই সেবাধর্মকে উপাসনার স্তরে উন্নীত করেছিলেন। জীবনের প্রতি একটা অসম্পূর্ণ খণ্ড ছিন্ন ধারণায় দীর্ণ এবং অগণিত চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার ভারে পীড়িত তৎকালীন সমাজের চাহিদা অনুসারে তিনি ধর্মকে একটি যুগোপযোগী রূপ দান করলেন। এর ফলে সেবাকর্মের ক্ষেত্রেও এল প্রভূত উপযোগিতা কারণ কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সনাতন ধর্মের ঐতিহ্যের কাঠামোতে তা অনায়াসেই খাপ খেয়ে গেল। ধন্য সেই বৈদান্তিক আদর্শবাদ। ঐ আদর্শে অবিচল থেকেই স্বামীজী ধর্ম ও নিঃস্বার্থ সেবার বিস্ময়কর সমন্বয় ও সংহতিসাধন করলেন। ফলে মানুষের অন্তর্জীবন ও বাহ্যিক অভিব্যক্তি পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দৃষ্টিভঙ্গির এক বিরল ঔদার্য এনে দিল।

তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন থেকেই স্বামীজী নিজে এই বিষয়ে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে মানুষ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় তন্ময় হয়ে যায়। তবে সে ভালবাসা যুক্তিবুদ্ধিহীন ভাবপ্রবণতামাত্র নয় বরং সমস্ত বিশ্বে ওতপ্রোত যে আধ্যাত্মিক ঐক্য, প্রতিটি বস্তুর মধ্যে যে সমত্বদর্শন—সেই বোধ থেকেই উদ্ভূত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরীয় প্রেমে সমগ্র জগতকেই আপ্লুত করতে চেয়েছিলেন। বাস্তববোধে সচেতন স্বামী বিবেকানন্দ চাইলেন, দেবত্ব বা দিব্যপ্রেমের প্রকাশ প্রথমে মানুষের ব্যক্তিজীবনে আসুক। ক্রমে ক্রমে মানুষ নিজের দেবত্ব সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হোক এবং পরে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই দেবত্বকে বিকশিত করতে শিখুক। তিনি প্রতিটি মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন কর্ম, পূজা, রাজযোগ অথবা দর্শন—এইসব পৃথকভাবে বা সম্মিলিতরূপে অভ্যাস করলেও ঐ আত্মার বিকাশ ঘটে। মুক্তিই চরম লক্ষ্য—বিষয়ের দাসত্ব থেকে, অজ্ঞান, আসক্তি ও মোহের দাসত্ব থেকে মুক্তি। জ্ঞান-ভক্তি ইত্যাদি সকল মার্গের মধ্যে কর্মকেই স্বামীজী অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বলতে গেলে, অধিকাংশ মানুষের গ্রহণীয় বলে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন কর্মযোগের ওপর। কর্মযোগের এই সংযোজনকে আরও কল্যাণকর ও ফলপ্রদ করার উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের জন্য রেখে গেলেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'রূপ

এক অপূর্ব ভাবনার সম্পদ। এই অভিনব চিন্তাধারাই আমাদের জীবনকে এক অভূতপূর্ব আলোকপাতে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ সংক্ষিপ্ত উক্তির গভীর তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং পরবর্তী কালে নিজের জীবন ও বাণীকে শ্রীগুরু-কথিত সূত্রাকার বাক্যের বিশদ ভাষ্যরূপে উপস্থাপিত করেন। স্বামীজী তত্ত্বটিকে আরও প্রাঞ্জল ভাষায় সরল করে দিলেনঃ 'মানবসেবাই ঈশ্বরসেবা'। স্বামীজী নিজে সেই আদর্শকে যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি সকলের পক্ষে তা গ্রহণীয় করে তুলতে এবং সেইসঙ্গে আমাদের জীবনে প্রয়োগের জন্য তিনি প্রায়োগিক তাৎপর্যযুক্ত বেদান্তভাবনার সূত্র ধরিয়ে দিলেন।

তাঁরা আগে থেকেই অনুমান করেছিলেন—ধর্মের ওপর আসবে বিজ্ঞানের অভিঘাত। দেখেছিলেন, তথাকথিত আস্তিকদের অন্তরেও জমে আছে ধর্ম সম্বন্ধে সংশয় ও দ্বিধা। এগুলি অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন। সুতরাং বিশেষ করে এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ব্যবহারিক বেদান্তের ভিত্তি স্থাপন করলেন—যে বেদান্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিচারের মুখে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে। বিশ্ববাসীদের জন্য সৃষ্টি করতে পারে একটি সুস্থ পরিবেশ। সেই পরিবেশে প্রতিটি মানুষেরই আত্মোন্নয়নের সুযোগ থাকবে। এইভাবেই দিব্যানুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ তাঁদের চিন্তাধারা, বাণী ও কর্মে জীবনসঞ্চার করে একটি আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গ তোলেন যার আবহে ধর্ম ও ন্যায়ের শক্তি সুস্থিত ও বলবতী হয় এবং পরম্পরাক্রমে আগামী প্রজন্মের চিত্তশুদ্ধি ঘটায়। 'মানবসেবাই ঈশ্বরসেবা'—স্বামীজীর এই মহাবাক্যের মধ্যেই নিহিত আছে ব্যক্তির উত্তরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক অভ্যুদয়ের এক অসাধারণ সমন্বয়কারী আদর্শ।

ঈশ্বরকে একমাত্র লক্ষ্যবস্তুরূপে নির্দেশ করে স্বামীজী বিশ্বজগতের নিয়ন্তারূপে এক অদৃশ্য শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। কোনও আধ্যাত্মিক ভিত্তি বা আধ্যাত্মিক চরম লক্ষ্য ব্যতিরেকে সামাজিক কল্যাণ বা ব্যক্তির মুক্তি সঠিক পথে চালিত হতে পারে না। এমন অনেক রাজনৈতিক ব্যবস্থাও দেখা গেছে যেখানে লক্ষ্যকে গৌণ করে উপলক্ষকেই প্রধান করে তোলা হয়েছে এবং পরিণামে ঘটেছে পতন ও চরম বিশৃঙ্খলা। এ ব্যাপারটির পুনরাবৃত্তি হতে দেওয়া আমাদের পক্ষে মারাত্মক ভুল হবে। একমাত্র আধ্যাত্মিক সচেতনতাই আমাদের অভিন্নরূপে একত্রে ধরে রাখতে পারে এবং মানবজাতির অস্তিত্বকে সুনিশ্চিত করতে পারে। স্বামীজী কোনও বিশেষ ঈশ্বরের উপর প্রাধান্য আরোপ করেননি বরং বলেছেন সমগ্র মানবসমাজের ঈশ্বরের কথা—তাঁকে যে নামেই আমরা উল্লেখ করতে ইচ্ছুক হই না কেন। এভাবে তিনি তাঁর আবেদনকে সর্বজনীন করে তুলেছেন।

মানুষকে ঈশ্বরের সমস্তরে স্থাপন করে একত্বের, সর্বোচ্চ বৈদান্তিক আদর্শটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে কারণ এরই মধ্যে নিহিত আছে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রকৃত অর্থ। এটি সর্বকালের বৃহত্তর মানবসমাজের জন্য ঋষিদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতে কোনও না কোনও পথ অনুসরণ করে মানুষ তার অন্তরে গুহায়িত 'ঈশ্বর'কে চিনতে পারবে এবং সেই ঈশ্বরত্বকে অভিব্যক্ত করার কৌশল আয়ত্ত করতে শিখবে—যা সকলপ্রকার সদ্‌গুণের উৎসমুখ। বস্তুত হিন্দুধর্ম ঘোষণা করে এবং স্বামীজীও এ বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন যে, সকল শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি এমনকি জীবনেরও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

হল দেবত্বকে অভিব্যক্ত করা। আমাদের সমাজে বর্তমানে অনেক অশুভ ব্যাপারের মূলে আছে এই উপলব্ধির অভাব। যে পর্যন্ত না আধ্যাত্মিক সচেতনতা আমাদের সমাজদেহে পুনরায় সন্নিবিষ্ট হবে ততদিন এই বিশ্বের, বিশেষত আমাদের মহান জাতির ভবিষ্যৎ বাস্তবিক অন্ধকার।

মানব ও ঈশ্বর উভয়ের ক্ষেত্রে একই 'সেবা' শব্দের উপর জোর দিয়ে 'সর্বাত্মভাবে'র আদর্শটিকে ব্যক্ত করা হয়েছে। সকল দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহামানব ছিলেন নিখিল বিশ্বের এই সর্বাত্মভাবের মূর্ত প্রতীক, শ্রীরামকৃষ্ণ যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শ্রীশঙ্কর 'বিবেকচূড়ামণি'তে এর ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

সর্বাত্মতা বন্ধবিমুক্তিহেতুঃ
সর্বাত্মভাবান্ন পরোঽস্তি কশ্চিৎ।
দৃশ্যাগ্রহে সত্যুপপদ্যতেঽসৌ
সর্বাত্মভাবোঽস্য সদাত্মনিষ্ঠয়া ।। ৩৪০ ।।

—'নিখিল বিশ্বকে আত্মস্বরূপ' জ্ঞান করাই হল সকল বন্ধনের ধারণা থেকে মুক্তির উপায়। 'বিশ্বকে নিজ আত্মা'রূপে উপলব্ধি অপেক্ষা উচ্চতর কিছুই নেই। চিরন্তন আত্মাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে বস্তুজগতকে অগ্রাহ্য করে মানুষ এই অবস্থা উপলব্ধি করে।

এইটি অনুভবের শেষ কথা। এরূপ একজন ব্যক্তির মধ্যে অধ্যাত্মজগৎ ও বস্তুজগতের অন্তর্বর্তী ব্যবধান লুপ্ত হয় এবং তার সঙ্গে অন্তর্হিত হয় মানুষের মানসিক পীড়াদায়ক ভয়, দুর্ভাবনা, নিরাপত্তাহীনতা, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি। সুতরাং স্বামীজীর অনুমোদিত পন্থা বা আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরবে সর্বোচ্চ সাধনায় ব্রতী হওয়ার এক অত্যন্ত সরল রূপ—তা হল মানুষের সেবার ক্ষুদ্র তুচ্ছ কার্যকে সেই সর্বশক্তিমানের সেবারূপে পরিণত করা, যিনি আমাদের নিজের আত্মার মতো সর্বভূতের আত্মায় বিরাজ করছেন।

মানুষকে পাদপ্রদীপের সামনে এনে দেখানো হয়েছে, মানুষকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ঈশ্বরের সেবা অসম্পূর্ণ। ধর্মের অবনতি তখনই শুরু হয় যখন আমরা কেবলমাত্র উপাসনালয়ে ঈশ্বরকে বেদীতে স্থাপন করি, পূজার্চনার পদ্ধতিসকল প্রণয়ন করি এবং আমাদের হয়ে আরাধনা করার জন্য অন্য কারুকে নিয়োগ করি। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কবল থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ এই বিপ্লবাত্মক আদর্শ নিয়ে এসেছেন, দেখিয়েছেন উপাসনার এক নূতন রূপ, মানবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের পথ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর অর্থ হল—সবার প্রতি আমাদের অন্তরের করুণা ও প্রেম প্রসারিত হবে, সকলের সেবা হবে আমাদের লক্ষ্য। এর অর্থ সকলকে একই সর্বশক্তিমান প্রভুর সৃষ্টি বলে উপলব্ধি করা, 'মানুষ'কে নারায়ণের চলমান মন্দিররূপে দর্শন করা। আধ্যাত্মিক স্বচ্ছ দৃষ্টি ও সর্বাত্মভাবের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একজন মানুষের পক্ষে এই প্রসারতা সর্বতোভাবে সম্ভব তখনই যখন আমরা 'মানুষের সেবাকে ঈশ্বরের সেবারূপে দেখতে শিখি।'

এই অভিব্যক্তিটির মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম অতি সুন্দরভাবে সমন্বিত হয়েছে।

মানুষ ও ঈশ্বরের একত্ববোধ আসে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে, ঈশ্বরের সেবা হয় ভক্তিপথে এবং মানবসেবা কর্মের মাধ্যমে। এই সবগুলিকে মানুষের জীবনে এমনভাবে একত্রে মিশ্রিত করতে হবে যে একটি অপরটিকে ভাবসম্পদে পরিপুষ্ট করে তুলবে। এই সূত্রটির মধ্যেই ত্যাগের ভাবটিও নিহিত আছে যা ভিন্ন মানুষের কোনও কর্মই সেবায় পরিণত হয় না। যে পর্যন্ত না মানুষ আত্ম-অবলুপ্তির মূল্য অনুধাবন করতে শিখবে ততদিন মানবসেবা কখনও ঈশ্বরসেবাতে উন্নীত হবে না।

কর্মই উপাসনা

মানুষের কর্মকে উপাসনার স্তরে উন্নীত করার জন্য স্বামীজী—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এবং 'উপাসনারূপে' কর্মের প্রবর্তন করেছেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই কাজ করেন, প্রায়শই শ্রমসাধ্য কাজ কিন্তু তা করেন অনিচ্ছায়, মন এবং করণীয় কাজের মধ্যে কোনও যোগ থাকে না। সুতরাং আমরা সেই কাজে কোনও আনন্দও পাই না, বাধ্য হয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করি। আমরা ভুলে গেছি যে প্রত্যেকটি কাজকেই অন্তর্নিহিত দেবত্ব বা পরিপূর্ণতা বিচারের উপায়রূপে এমনভাবে রূপান্তরিত করা যায় যে—একটি সামান্য কাজও তখন উপাসনা ও সেবার রূপ নিতে পারে, যা শুধু ব্যক্তিবিশেষেরই নয় বৃহত্তর মানবসমাজের পক্ষেও মঙ্গলকর।

সমগ্র জীবন ও তার কার্যাবলীকে অধ্যাত্মরসে জারিত করার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিরূপে দেখা দেয় মানসিক সমতা এবং তাই হল সামঞ্জস্যসাধন, কর্মনৈপুণ্য ও সর্বোপরি সমন্বয়মূলক পারস্পরিক সম্পর্ক অর্জনের নিশ্চিত পথ। এটি আসে এক ঊর্ধ্বতন পরম অধিকর্তার বা ঈশ্বরের কাছ থেকে অথবা মানবচিত্তের ঊর্ধ্বায়ন ঘটায় এমন কোনও সুমহান ভাবধারা বা নীতির কাছে আত্মসমর্পণের সদাপ্রস্তুত মনোভাব থেকে। এই আত্মনিবেদন সেই সবকিছুর কাছে যা আমাদের ভিতরকার ক্ষুদ্র 'মানুষ'কে উদ্বুদ্ধ ক'রে এক বৃহত্তর 'বিশ্বজনীন মানুষ'রূপে বিবর্তিত ও লীন হতে সহায়তা করবে।

ত্যাগ ও সেবা

'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'—ত্যাগের দ্বারা মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে—একথা ঘোষণা করেছেন মহানারায়ণ উপনিষদ।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে ঘোষণা করেছিলেনঃ "ভারতবর্ষের আদর্শ হল 'ত্যাগ ও সেবা'। সেই সকল পথে দেশকে সবেগে চালিত কর, তাহলেই বাকি যা কিছু আপনি ঠিক হয়ে যাবে।"

এই সকল উক্তির তাৎপর্য কি? এই সকল আদর্শ জীবনে চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে মানুষকে কিভাবে সাহায্য করতে পারে? এ সমস্তকে জাতীয় আদর্শরূপে ধারণ করে আমাদের কী উপকার হবে?

স্বামীজীর আদর্শের সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তির কাছে এই শব্দগুলির প্রত্যেকটি পৃথক

পৃথক অর্থে প্রতিভাত হবে কারণ 'ত্যাগ' শব্দটি দ্বারা মনের এক ভাবগত আদর্শ বা মূল্যায়ন বোঝায় এবং 'সেবা' শব্দটি মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও কর্মের আঙ্গিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু মূলত তারা এক এবং মানবজাতির সম্ভাবনাসমূহের সামগ্রিক পরিধিকেই প্রভাবিত করে।

একথা সুবিদিত যে আমাদের সকল কর্মের উৎপত্তি ঘটে মনের চিন্তাপ্রণালী থেকে। একথাও সত্য যে কর্মের ক্ষেত্র বাইরে স্থিত হলেও তা মনের উপরও ছাপ রেখে যেতে সমর্থ। এজন্যই মনের শুচিতা বা অশুচিতা কর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং বিপরীতক্রমে কর্মের গুণমান মনকে প্রভাবিত করে। এভাবে একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ হওয়ার দরুন মানুষের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে 'ত্যাগ ও সেবা'র এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। যাঁর মধ্যে এই দুই আদর্শের মিলন ঘটে, তিনি একাই একশ হয়ে ওঠেন। এই কারণেই স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের সকল মহান শিক্ষাদাতাগণ ব্যক্তিজীবন ও জাতীয়জীবনে 'ত্যাগ ও সেবা'র উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

যেহেতু সত্য হল সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও বিশ্বজনীন অতএব তাকে উপলব্ধি করতে হলে স্বভাবতই মানব মনকেও প্রসারতা ও সর্বজনীনতার মতো সমভাবের গুণাবলী বিকাশ করতে হবে। একমাত্র অশেষ পবিত্র ও সূক্ষ্ম মনই সত্যকে ধারণ ও বহন করতে সক্ষম। এটি অর্জন করতে হলে, যা কিছু মনের প্রসার ও বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে। 'সর্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু'—স্বামীজীর এই প্রায়শ উদ্ধৃত কথাগুলি প্রকৃতির এই বাস্তব বিষয়টি সম্বন্ধে মূল্যবান সমাধানসূত্র প্রদান করে। ঠিক যেমন একখণ্ড বরফের মধ্যে মিশ্রিত দূষিত পদার্থসকল বরফ তরলাকারে গলে যাবার সময় থিতিয়ে পড়ে এবং আরও সূক্ষ্মতর বাষ্পীয় অবস্থায় রূপান্তরের পর সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়ে যায়, তেমনি মানবমনও আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বিশ্বজনীন একাত্মতার সূক্ষ্মতর জগতে বিস্তারিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই অধিকতর পবিত্রতা লাভ করে। প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আসে আরও বেশি ব্যাপকতা ও সূক্ষ্মতা যার পরিণামে ঘটে বিশুদ্ধীকরণ। মন মানেই চিন্তার সমষ্টি, তার শুদ্ধীকরণ হতে পারে একমাত্র চিন্তার পরিবর্তনের মাধ্যমেই। যে ক্ষুদ্র 'আমি' মানুষের মনকে তার সবরকম আত্ম-সর্বস্বতার বিষাক্ত আকর্ষণে, স্বার্থপর বাসনায়, অভিসন্ধিমূলক অভিপ্রায়ে ও অহমিকায় পূর্ণ করে রাখে সে 'আমি'কে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। এগুলিই হল সেই শৃঙ্খল বা বন্ধন যা মানুষের ব্যক্তিত্বকে নীচের দিকে টেনে বেঁধে রাখে এবং তাকে তার পূর্ণতর স্বরূপে বিকশিত হয়ে উঠতে বাধা দেয়। চিন্তার স্তরে 'আমিত্ব' বোধকে বিসর্জন দিয়ে ধীরে ধীরে স্থিরভাবে 'নাহং' ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিলে অনুপ্রাণিত হয়ে মন কর্মের স্তরে নেমে আসে। ক্ষুদ্র 'আমি'কে বৃহত্তর 'আমি'র বেদীতলে সমর্পণ করে মানুষ সবশেষে পরিপূর্ণতালাভ করে।

কী ত্যাগ করতে হবে এই প্রশ্নটি অনেক আন্তরিক জিজ্ঞাসুর মনকে তোলপাড় করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জীবনে এটি দেখিয়ে গেছেন এবং গীতায় তার ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের কর্ম, আমাদের শ্রমকে কি ত্যাগ করতে হবে? এর নিশ্চিত উত্তর হল, 'না', আমরা যেন চোখ মেলে আমাদের চারপাশের বিস্ময়কর সৃষ্টি এবং তার গতিময় সাবলীল

ছন্দকে প্রত্যক্ষ করি। বিশ্বজগৎ এক মুহূর্তও স্থির নেই। ছায়াপথসকল, গ্রহরাজি, তারকাপুঞ্জ, প্রাণিগণ, বৃক্ষসমূহ এমনকি পর্বতগুলিও চলমান ও পরিবর্তনশীল—কখনও প্রচণ্ড গতিতে আবার কখনও বা প্রায় অলক্ষিতভাবে অবিরাম চলাই হল প্রকৃতির নিয়ম। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বস্তুর ধর্ম। ক্রিয়াপরতাই যদি সৃষ্টির সঙ্গে একীভূত তবে তা কি পরিত্যাগ করা সম্ভব?

আমরা পুনরায় এই প্রশ্নের উত্তর পাই গীতায়। যা ত্যাগ করতে হবে সেটি কর্ম নয়, কর্মফলের প্রতি আসক্তি। স্বধর্মের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিরূপে কর্মের প্রবাহ চলতে থাকবে—শুধু থাকবে না কোনও ব্যক্তিগত মতলব, বাসনা বা স্ব-ইচ্ছার দ্যোতনা। এরজন্য কেবল একটি পথই আছে—ক্ষুদ্র 'আমি'কে ত্যাগ ও তার স্থানে বৃহত্তর বিশ্বজনীন 'আমি'কে অধিষ্ঠিত করা। এটি অর্জন করতে হলে মানুষকে সর্বাগ্রে তার ব্যক্তিত্বের গভীরে কর্মের সূক্ষ্ম স্পন্দন সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং তারপর এসব থেকে স্বার্থপ্রণোদিত প্ররোচনাসকলের এবং অহমিকাপ্রসূত ক্রিয়াকর্মের যাবতীয় মালিন্য দূর করার প্রয়াস করতে হবে এবং সবকিছুকে একান্ত নীরবে উৎসর্গ করতে হবে অন্তর্যামী প্রভুর চরণপ্রান্তে। এই ত্যাগের মধ্য দিয়ে 'আমি' ও 'আমার' রূপান্তরিত হয়ে হয় 'তুমি' ও 'তোমার'। তখন 'সবকিছু তাঁর, আমার কোনও কিছুই নয়', এই জ্ঞান কর্মীর হৃদয়ে উদিত হয় এবং তিনি কর্ম ও সেবার মধ্যে এক অপূর্ব সরসতা আস্বাদন করেন।

অপরপক্ষে, কেউ যদি সেবার পথে চলাকে কল্যাণকর বলে মনে করেন তাহলেও প্রথম ধাপ হল আত্মোৎসর্গের ভাবে ও বাসনাশূন্য হয়ে কর্ম করে আমিত্ববোধ বিসর্জন দেওয়া। চিন্তাভাবনার, বাক্যালাপের ও কাজকর্মের নিরন্তর সতর্কতা ধীরে ধীরে স্বার্থবোধের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত করে এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর বিশ্বজনীন ও পবিত্র করে তোলে। তখন কর্মের ফলের প্রতি তাদের অনাসক্তি জন্মায় এবং কর্মের জন্যই কর্ম সম্পাদিত হয়। কর্মফলের জন্য দুশ্চিন্তাবর্জিত হয়ে এবং অতীতের সুখ বা দুঃখের বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে একই কর্ম এখন এক বিরল আনন্দ সঞ্চার করতে শুরু করে। তখন পরিকল্পনা, কূটকৌশল ইত্যাদির কোনও অবকাশ থাকে না। কর্ম হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত ও অর্থপূর্ণ। স্বার্থ-বাসনা বিলুপ্ত হয়ে আবির্ভূত হয় এক মহত্তর ও প্রবলতর ইচ্ছা এবং শেষ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে যান 'তাঁর যন্ত্ররূপে'। এর সঙ্গে আসে কর্মজনিত দুঃখ-যাতনা, দাসত্ব-বন্ধন ও সকলপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি। তখন কর্ম কর্মযোগে পরিণত হয় এবং মানুষকে তার পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দেবার প্রকট মাধ্যম হয়ে ওঠে। যখন জ্ঞান ও কর্ম সম্মিলিত হয়ে একীভূত হয়, কর্ম ও উপাসনা সংযুক্ত হয় এবং শ্রম প্রার্থনায় পরিণত হয়; তখন ত্যাগ সেবার মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে। তখন এই মহা অলৌকিক ঘটনাটি ঘটে—'আমি' বিলীন হয়ে যায় অথচ সে নিজেকে দেখতে পায় 'অসীমে'র দ্বারা ভরপুর।

স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের সকল মহান শিক্ষাদাতাগণ ঐক্যের এই বোধ, প্রেমের এই অত্যাশ্চর্য শক্তি, সেবাধর্মের এই সুমহান ঐতিহ্যবাহী কাহিনী বিশ্বমানবের কাছে প্রচার করে গেছেন। এই সকল মহান নীতি, যা প্রকৃতির আপন নিয়মাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে, যদি আমাদের জীবনের প্রিজম্-এর (ত্রিকোণ স্ফটিকাধারের) তিনটি পার্শ্ব হয়ে উঠতে পারে তবেই আমরা চিরন্তন শুভ্র আলোককে যথার্থরূপে ধরে রাখতে পারব।

বিবেকানন্দ ও খ্রীস্টধর্ম : প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

(১৮৯৩-১৯৯৩)

স্বরাজ মজুমদার

সুইডিশ অ্যাকাডেমী যেদিন মাদার টেরিজাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করলেন, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায়, তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম : 'আজকের এই আনন্দের দিনে আপনার বাণী কি?' নরম গলায়, পরিষ্কার বাংলায় মাদার টেরিজা বললেন : 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

চমকে উঠলাম। এতো স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ববিশ্রুত বাণী![১] আজকের এই আনন্দসন্ধ্যায় সেই বাণীই ঝঙ্কৃত হল ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীর কণ্ঠে! তখনই ভিড়ের সব মুখগুলি ঝাপসা হয়ে ভেসে উঠল স্বামী বিবেকানন্দের জগৎ-থেকে আলগা-হয়ে-যাওয়া, অনন্তের নিরাবয়ব সত্তার ওপর ভাসমান, ভালবাসা দিয়ে গড়া মুখখানি; অনুভব করলাম বিবেকানন্দ দেশ-কাল-ধর্ম দ্বারা খণ্ডিত কোনও মানুষের নাম নয়, বিবেকানন্দ একটি সত্যের প্রতীক, মানুষের মহত্তম প্রেরণার উৎস ও নির্যাস। সেই সত্যকে আমরা জীবনে স্বীকৃতি দিই বা না দিই, সেই সত্যকে অস্বীকার করা চলে না। সুখে-দুঃখে, মিলনে-বিরহে, তিরস্কার-পুরস্কারে, প্রাপ্তি-বঞ্চনায়, জীবনের সর্ব অবস্থায় 'সেই সত্যের অনন্য জ্যোতি আমাদের নিত্যসঙ্গী, আমাদের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে জাজ্বল্যমান।

আদিপর্ব

মাদার টেরিজার কথায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কারণ বিবেকানন্দের জীবনের সঙ্গে যীশুখ্রীস্ট এবং খ্রীস্টধর্মের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। সংযোগের সেই আদিপর্বে দেখতে পাই নরেন্দ্রের পিতা উদারমনা বিশ্বনাথ দত্ত সাগ্রহে বাইবেল পাঠে রত।[২] অনুমান করি, ১৮৭১ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন-এ নাইনথ্ ক্লাসে ভর্তি হবার বেশ কয়েক বছর পরই বাইবেল-এর সঙ্গে কিশোর নরেন্দ্রনাথের পরিচয়। কারণ আশৈশব যাঁর মা আর দিদিমার কাছে রামায়ণ-মহাভারত আর ভাগবতের গল্প শুনে কাটত, সাধু-সন্ত দর্শন মাত্রই যাঁর শিশু মন উল্লসিত হয়ে উঠত, নিজের হাত দেখিয়ে ক্লাসের বন্ধুদের সগর্বে যিনি বলতেন—আমার হাতের যা রেখা তাতে আমাকে সাধু হতেই হবে—তাঁর পক্ষে বাবার বাইবেলখানি পড়ে ফেলা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। বিশেষ করে

মনে রাখতে হবে তখন ব্রিটিশ শাসন এবং মিশনারিদের রমরমা। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলের কাছে বাইবেল বিশেষভাবে আদৃত।

১৮৮০-র জানুয়ারি মাসে নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এক বছর ঐ কলেজে পড়ার পর তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে পড়াশুনায় সাময়িক ছেদ পড়ে। বাধ্য হয়ে পরে তিনি জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ্ ইনস্টিটিউশন-এ (এখনকার স্কটিশচার্চ কলেজ) ভর্তি হন এবং ১৮৮৪ সালে ঐ কলেজ থেকেই বি.এ. পাশ করেন। অধ্যাপক উইলিয়াম হেস্টি তখন ঐ কলেজের অধ্যক্ষ। তখনকার দিনে মিশনারি কলেজগুলিতে বাইবেল পড়ানো হত। তাছাড়া বি. এ. পরীক্ষার বিষয় হিসেবে যেহেতু নরেন্দ্রনাথ সাহিত্যের সঙ্গে দর্শনকেও বিশেষভাবে বেছে নিয়েছিলেন, সেইহেতু একথা মনে করা অসঙ্গত হবে না, বাইবেল এবং বাইবেল-এর প্রাণপুরুষ ভগবান যীশুর তপঃপূত জীবনের সঙ্গে তত্ত্বজিজ্ঞাসু নরেন্দ্রের পরিচয় এই কলেজ জীবনেই ঘনিষ্ঠ হয়। এই প্রসঙ্গে এই কথাটাও বিশেষভাবে স্মরণে রাখা দরকার শ্রীরামকৃষ্ণের নাম নরেন্দ্র প্রথম শোনেন হেস্টি সাহেবের মুখেই। একদিন ওয়ার্ডসওয়র্থ-এর 'এক্সকারসান' কবিতাটি ব্যাখ্যা করছিলেন হেস্টি। সেখানে সমাধির কথা আছে। কথাপ্রসঙ্গে হেস্টি বলেনঃ "আমি একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণেরই এইরকম অবস্থা দেখেছি। দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তোমরা যদি নিজের চোখে দেখ, তাহলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা কি রকম।"[৩] ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ, যাঁকে নরেন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে 'Indian Christ' এবং যীশুর ছোট ভাই বলে কোনও কোনও জায়গায় সম্বোধন করেছেন, তাঁর নাম প্রথম শুনলেন একজন খ্রীস্টান পণ্ডিতের মুখ থেকে, ঘটনা হিসাবে এটি কি অসামান্য নয়?

১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে সিমলার সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম দেখা। তারপর ক্রমশ আত্মীয়তা এবং ঈশ্বরলাভের অভিলাষে আত্মসমর্পণ। ১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ। ১৮৮১—১৮৮৬, এই ছ-বছরে শ্রীগুরুর সান্নিধ্যলাভ, খ্রীস্টধর্ম সমেত তাঁর বিভিন্ন ধর্মসাধনের গূঢ় রহস্য শ্রবণ, শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বরূপ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ এবং তাঁরই নির্দেশিত পথে সাধন করে সমাধিতত্ত্ব অধিগত করা—এইসব যুগান্তকারী ঘটনাগুলি পরপর ঘটে গেছে। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হবার পূর্বাহ্ণেই তপস্বী নরেন্দ্রনাথের এই দিব্যদর্শন হয়েছিল যে যিনি এবার রামকৃষ্ণ, আগের অবতারে তিনিই রাম এবং কৃষ্ণ হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারও আগে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বলেছিলেন তিনিই চৈতন্য-অবতার হয়ে এসেছিলেন। ভক্তদের তিনি যীশুখ্রীস্টের দিব্যদর্শন ও মেরীতনয়ের দেহ বিনির্গত রশ্মি তাঁর দেহে কেমন করে মিলিয়ে গিয়েছিল সে অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করেছিলেন।[৪] শুধু গুরু রামকৃষ্ণের মুখের কথা বলেই নরেন্দ্রনাথ তা সত্য বলে মেনে নেননি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তিনি অভ্রংলিহ শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্রের ত্যাগ, পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা ও প্রেম যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিয়ে, আপন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা তা অন্বিত করে নিয়ে তবেই তা গ্রহণ করেছিলেন। নরেন্দ্র বুঝেছিলেন যিনি যীশু, তিনিই রামকৃষ্ণ।

এখানেই দুটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে করি। প্রথম ঘটনাটি

ঘটে ১৮৮৫ সালের ৩১ অক্টোবর। শ্রীম-র বর্ণনাঃ "বেলা এগারটা। মিশ্র নামক একটি খৃষ্টান ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। মিশ্রের বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর হইবে। মিশ্র খৃষ্টানবংশে জন্মিয়াছেন। যদিও সাহেবের পোষাক, ভিতরে গেরুয়া আছে। এখন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। একটি ভ্রাতার বিবাহের দিনে তাঁহার এবং আর একটি ভ্রাতার একদিনে মৃত্যু হয়। সেই দিন হইতে মিশ্র সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত।...

মিশ্র—মেরীর ছেলে Jesus নয়। Jesus স্বয়ং ঈশ্বর। (ভক্তদের প্রতি)—ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এখন এই আছেন—আবার এক সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর। আপনারা (ভক্তেরা) এঁকে চিনতে পাচ্ছেন না। আমি আগে থেকে এঁকে দেখেছি—এখন সাক্ষাৎ দেখছি। দেখেছিলাম—একটি বাগান, উনি উপরে আসনে বসে আছেন...।"

শ্রীরামকৃষ্ণঃ তুমি কিছু দেখতে-টেকতে পাও?

মিশ্র—আজ্ঞা বাটীতে যখন ছিলাম তখন থেকে জ্যোতিঃ দর্শন হত। তারপর যীশুকে দর্শন করেছি। সে রূপ আর কি বলব!—সে সৌন্দর্যের কাছে কি স্ত্রীর সৌন্দর্য!

কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মিশ্র জামা পেন্টলুন খুলিয়া ভিতরের গেরুয়ার কৌপীন দেখাইলেন।

...ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন। পশ্চিমাস্য হইয়া দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মিশ্রকে দেখিতে দেখিতে হাসিতেছেন।

এখনও দাঁড়াইয়া। ভাবাবেশে মিশ্রকে শেক হ্যাণ্ড (হস্তধারণ) করিতেছেন ও হাসিতেছেন। হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি যা চাইছ তা হয়ে যাবে।"

ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হইল। তিনি আর যীশু কি এক?

মিশ্র (করজোড়ে)— আমি সে দিন থেকে মন, প্রাণ, শরীর—সব আপনাকে দিয়েছি।[৫]

ঠাকুর ভাবাবেশে হাসিতেছেন।"[৬]

কথামৃতকার যদিও বিস্মিত হয়ে স্বগতোক্তির মতো অস্ফুট প্রশ্ন করেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ আর যীশু কি এক? পরবর্তী কালে এ ব্যাপারে তাঁর নিঃসংশয় স্বীকৃতির কথা আমরা জানতে পারি স্বামী নিত্যাত্মানন্দ প্রণীত 'শ্রীমদর্শন' পড়ে। সেখানে 'A Search in Secret India'-র লেখক Paul Brunton শ্রীম-র মুখে অনর্গল বাইবেল এবং ভগবান যীশুর কথা শুনে প্রশ্ন করছেন—আপনি যীশুর কথা এমনভাবে জানলেন কেমন করে? মাস্টারমশাই তার জবাবে সবিনয়ে বলেছেনঃ আমরা যে তাঁর সঙ্গে ঘর করেছি। অর্থাৎ কিনা, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর অন্যান্য অবতারাদির মতো যীশুকে দর্শন করেছি। ব্রাণ্টন অবাক!

শ্রীম যদি বুঝে থাকেন, নরেন্দ্রনাথ যে সেই সত্য শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর থাকতেই বুঝেছিলেন এ তথ্য বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁকে স্নেহময়ী মায়ের মতো হাত ধরে সব দেখিয়ে, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—কারণ 'নরেন যে শিক্ষে দিবে।'

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরেই। বরানগর মঠ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে স্বামী গম্ভীরানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী মনে হয়, ঠাকুরের দেহ যাবার কয়েক সপ্তাহ পর অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের সেপ্টেম্বর

মাসেই টাকির মুন্সীদের এক পোড়ো বাড়িতে এই মঠের প্রতিষ্ঠা।[৭] বুড়ো গোপাল দাদা যিনি পরে স্বামী অদ্বৈতানন্দ বলে পরিচিত হন, তিনিই মঠের প্রথম স্থায়ী বাসিন্দা। শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) রাত্রে মঠে থাকতেন, দিনের বেলা পড়াশোনার জন্য বাড়ি যেতেন। ধীরে ধীরে তারক (স্বামী শিবানন্দ), কালী (স্বামী অভেদানন্দ), শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), এঁরাও এসে যোগ দিলেন। নেতা নরেন্দ্র। স্বামী বিরজানন্দের স্মৃতিকথায় পাই মঠের ভাঙ্গা ঘরের দেওয়ালে যেসব দেবদেবীর ছবি টাঙ্গানো থাকত, তার মধ্যে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একটি ছবি ছিল। শ্রীম জানিয়েছেন বরানগর মঠে ধ্যান, জপ, ভজন-কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জোর শাস্ত্রচর্চাও চলত। আলোচিত হত মহাপুরুষদের জীবনী। শ্রীরামকৃষ্ণ, আচার্য শঙ্কর, রামানুজের পাশাপাশি যীশুর জীবনী নিয়েও হত বিস্তর আলোচনা।[৮]

মঠ প্রতিষ্ঠার মাস দুই বা তিন পরের একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। বাবুরাম-জননী মাতঙ্গিনী দেবী ক্রিস্‌মাস উৎসব উপলক্ষে পুত্রকে আঁটপুরে দিন কয়েক কাটিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলে পাঠান, নরেন্দ্রও যেন সঙ্গে আসেন। ওঁরাও ভাবলেন, উত্তম প্রস্তাব। দিন কয়েক কাটিয়ে আসা যাবে। কিন্তু সেকথা আর গোপন থাকল না। ফলে নরেন্দ্র, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর এবং সারদা সকলে মিলেই হাজির হলেন বাবুরামের পিতৃভিটা আঁটপুরে। আঁটপুরের নিস্তব্ধ শ্যামল পল্লী-আবেষ্টনীর মধ্যে গিয়ে নরেন্দ্রের প্রেরণায় সকলেই গভীর তপস্যায় ডুবে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় সকলের ভিতরেই তিনি ত্যাগের আগুন এমন তীব্রভাবে জ্বালিয়ে দিলেন যে সকলেই প্রাণে-প্রাণে অনুভব করতে লাগলেন ঈশ্বরলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভোগ নয়, নাম-যশের বা প্রতিষ্ঠার শূকরী বিষ্ঠা লেহন করা নয়, ব্রহ্ম উপলব্ধি এবং বহুজনহিতায় প্রাণপাত করাই তাঁদের জীবনের লক্ষ্য। ত্যাগ ও সাধনার এই উদ্বেল আকুতি রামকৃষ্ণ-তনয়দের একত্র সংঘজীবনের ইচ্ছাকে দৃঢ়তর করে তুলল।

একদিন সন্ধ্যায় খোলা আকাশের তলায় ধুনি জ্বালিয়ে গুরুভ্রাতারা সকলে ধ্যানে বসেছেন। বহুক্ষণ পর তাঁদের ধ্যান ভাঙ্গলে নরেন্দ্র যীশুখ্রীস্টের জীবন, বিশেষ করে তাঁর ত্যাগের কথা, আবেগদৃপ্ত ভঙ্গিতে বলে চললেন। নরেন্দ্র বললেনঃ আমাদের প্রত্যেককেই এ্যাপোসল্ (apostle) হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও তাঁর অত্যাশ্চর্য বাণী জগতের মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। শুধু প্রচার নয়, জীবনযাপনেও আমাদের প্রত্যেককেই এক একজন ক্রাইস্ট হতে হবে, তবেই মানুষের মুক্তি।[৯] ধুনির আগুন অন্তরের বৈরাগ্য-বাতাসে এমনই লেলিহান হয়ে উঠল যে তাঁরাও সকলে উঠে দাঁড়িয়ে সমবেতভাবে অগ্নিময় ত্যাগের জীবন বরণ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। খ্রীস্টের প্রসঙ্গ এমন অভাবিতভাবে এসে পড়ায় সকলেই প্রথমটায় কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন। পরে তাঁরা জেনেছিলেন দিনটি ছিল যীশুর জন্মের ঠিক আগের দিন। ক্রীস্‌মাস ইভ।

স্বামী শিবানন্দ পরবর্তী কালে এই ঘটনাটির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেনঃ শ্রীরামকৃষ্ণ দেহে থাকতেই আমাদের সন্ন্যাসী করে দিয়েছিলেন। আঁটপুরে সেই সঙ্কল্পটি দৃঢ়তর হয়।[১০]

ঈশা-অনুসরণ

আঁটপুরের এই অলৌকিক ঘটনার প্রায় তিন বছর পর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালে দেখি বৈরাগ্যের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি নরেন্দ্রনাথ টমাস আ কেম্পিস প্রণীত 'Imitation of Christ' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ শুরু করেছেন। 'ঈশা-অনুসরণ' নামে তা 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামক মাসিক পত্রের প্রথম বর্ষের প্রথম পঞ্চতম সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদের প্রেরণা নরেন্দ্রনাথ কোথা থেকে পেয়েছিলেন তা যেমন সূচনায় তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, তেমনি ঐ ভূমিকা খ্রীস্ট সম্পর্কে তাঁর মনোভাবকেও পরিষ্কার করে আমাদের কাছে তুলে ধরে! সূচনায় নরেন্দ্রনাথ লিখছেনঃ "'খ্রীষ্টের অনুসরণ' নামক এই পুস্তক সমগ্র খ্রীষ্টজগতের অতি আদরের ধন। এই মহাপুস্তক কোন 'রোম্যান ক্যাথলিক' সন্ন্যাসীর লিখিত—লিখিত বলিলে ভুল হয়, ইহার প্রত্যেক অক্ষর উক্ত ঈশা-প্রেমে সর্বত্যাগী মহাত্মার হৃদয়ের শোণিতবিন্দুতে মুদ্রিত। যে মহাপুরুষের জ্বলন্ত জীবন্ত বাণী আজি চারি শত বৎসর কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় অদ্ভুত মোহিনীশক্তি বলে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, রাখিতেছে এবং রাখিবে, যিনি আজি প্রতিভা ও সাধনবলে কত শত সম্রাটেরও নমস্য হইয়াছেন, যাঁহার অলৌকিক পবিত্রতার নিকটে পরস্পরে সতত যুধ্যমান অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত খ্রীষ্ট-সমাজ চিরপুষ্ট বৈষম্য পরিত্যাগ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে—তিনি এ পুস্তকে আপনার নাম দেন নাই। দিবেন বা কেন? যিনি সমস্ত পার্থিব ভোগ এবং বিলাসকে, ইহজগতের সমুদয় মান-সম্ভ্রমকে বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি কি সামান্য নামের ভিখারী হইতে পারেন? পরবর্তী লোকেরা অনুমান করিয়া 'টমাস আ কেম্পিস' নামক একজন ক্যাথলিক সন্ন্যাসীকে গ্রন্থকার স্থির করিয়াছেন, কতদূর সত্য ঈশ্বর জানেন। যিনিই হউন, তিনি যে জগতের পূজ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"এখন আমরা খ্রীষ্টিয়ান রাজার প্রজা। রাজ-অনুগ্রহে বহুবিধ-নামধারী স্বদেশী বিদেশী খ্রীষ্টিয়ান দেখিলাম। দেখিতেছি যে মিশনরী মহাপুরুষেরা 'অদ্য যাহা আছে খাও, কল্যকার জন্য ভাবিও না' প্রচার করিয়া আসিয়াই আগামী দশ বৎসরের হিসাব এবং সঞ্চয়ে ব্যস্ত—দেখিতেছি, 'যাঁহার মাথা রাখিবার স্থান নাই' তাঁহার শিষ্যেরা—তাঁহার প্রচারকেরা বিলাসে মণ্ডিত হইয়া, বিবাহের বরটি সাজিয়া, এক পয়সার মা-বাপ হইয়া ঈশার জ্বলন্ত ত্যাগ, অদ্ভুত নিঃস্বার্থতা প্রচার করিতে ব্যস্ত, কিন্তু প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান দেখিতেছি না। এ অদ্ভুত বিলাসী, অতি দাম্ভিক, মহা অত্যাচারী, বেরুস এবং ব্রুমে চড়া, প্রোটেস্ট্যাণ্ট খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় দেখিয়া খ্রীষ্টিয়ান সম্বন্ধে আমাদের যে অতি কুৎসিত ধারণা হইয়াছে, এই পুস্তক পাঠ করিলে তাহা সম্যকরূপে দূরীভূত হইবে।

"'সব সেয়ান্‌কী এক মত'—সকল যথার্থ জ্ঞানীরই এক প্রকার মত। পাঠক এই পুস্তক পড়িতে পড়িতে গীতার ভগবদুক্ত 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' উপদেশের শত শত প্রতিধ্বনি দেখিতে পাইবেন। দীনতা, আর্তি এবং দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মুদ্রিত এবং পাঠ করিতে করিতে জ্বলন্ত বৈরাগ্য, অত্যদ্ভুত আত্মসমর্পণ এবং নির্ভরের ভাবে হৃদয় উদ্বেলিত হইবে। যাহারা অন্ধ গোঁড়ামির বশবর্তী হইয়া খ্রীষ্টিয়ানের লেখা বলিয়া এ পুস্তককে অশ্রদ্ধা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ন্যায়দর্শনের একটি সূত্র

বলিয়া আমরা ক্ষান্ত হইবঃ 'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ'—সিদ্ধ পুরুষদিগের উপদেশ প্রামাণ্য এবং তাহারই নাম শব্দ প্রমাণ।"[১১]

'ঈশানুসরণ'-এর ভূমিকাটি পড়ে কারোরই বুঝতে ভুল হয় না যীশুর অলৌকিক পবিত্রতা, সুতীব্র বৈরাগ্য, জ্বলন্ত ত্যাগ, নিঃস্বার্থতা ও পাষাণ-গলানো প্রেমই নরেন্দ্রনাথকে অনুবাদে অনুপ্রাণিত করেছিল; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একদিকে কেম্পিস্-এর দাস্যভক্তি ও শরণাগতির অপূর্ব মহিমা, অন্যদিকে খ্রীস্টান মিশনারিদের অসহ্য ভণ্ডামি ও অভিসন্ধিমূলক উৎকট কার্যকলাপ। বরানগর মঠের চরম বৈরাগ্যতপ্ত দিনগুলিতে স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরের ভাবটিও যে কেমন ছিল তাও অনূদিত দুটি পরিচ্ছেদের ছত্রে ছত্রে কিঞ্চিৎ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কেম্পিস-এর অনেক কথাই যেন তাঁর মনের কথা।[১২] কিন্তু সে কথাগুলি সযত্নে তিনি আরও চারটি বছর লালন করেছেন, তপস্যা ও ভারত পরিক্রমার কণ্টকাকীর্ণ পথে সঞ্চয় করেছেন বিপুল অভিজ্ঞতা। তারপর ১৮৯৩-এর শিকাগো ধর্মমহাসভায় ঘটালেন এক অভাবনীয় বিস্ফোরণ।

যীশু ও খ্রীস্টধর্ম

যীশুখ্রীস্ট এবং খ্রীস্টধর্ম সম্পর্কে স্বামীজীর মনোভাব আমরা বিস্তারিতভাবে জানতে পাবি পাশ্চাত্যে তিনি যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন মূলত সেইগুলি থেকেই। স্বামীজী প্রথমবার পাশ্চাত্যে যান ১৮৯৩ সালেঃ উপলক্ষ শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন।[১৩] সেবার তিনি একটানা চার বছর সনাতন হিন্দুধর্ম তথা বেদান্তের বাণী প্রচার করে দেশে ফেরেন ১৮৯৭ সালের ২৬ জানুয়ারি। আড়াই বছর দেশে থেকে তিনি দ্বিতীয় ও শেষবারের মতো পাশ্চাত্যে যান ১৮৯৯ সালের জুন মাসে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ৯ ডিসেম্বর, ১৯০০। দুবারের এই প্রচার অভিযানে হিন্দুধর্মের ওপর বক্তৃতা ছাড়াও স্বামীজী খ্রীস্ট এবং খ্রীস্টধর্মের ওপর বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছেন, বিদেশী পত্র-পত্রিকায় দিয়েছেন অজস্র সাক্ষাৎকার। সহস্রদ্বীপোদ্যান, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা তাঁর বিদগ্ধ শিষ্যমণ্ডলীর কাছেও স্বামীজী বিভিন্ন সময় যীশুর জীবন ও খ্রীস্টধর্মের প্রসঙ্গ করেছেন। স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'র পাতায় পাতায় সেইসব মহামূল্যবান প্রসঙ্গের বেশ কিছু লিপিবদ্ধ আছে। দেখা যাবে ভক্তি-যোগ, জ্ঞান-যোগ এবং কর্ম-যোগের আলোচনাপ্রসঙ্গে যেমন খ্রীস্ট এবং খ্রীস্টধর্মের কথা এসে গেছে, তেমনি বেদান্ত, কর্মে পরিণত বেদান্ত, বিশ্বজনীন ধর্ম, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রীতিনীতির তুলনামূলক পর্যালোচনাতেও অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে ভগবান যীশু এবং খ্রীস্টধর্মের প্রসঙ্গ।

স্বামীজীর আলোচনাগুলি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখা যাবে কখনও কখনও বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল করে তোলার জন্য যেমন তিনি সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই খ্রীস্ট এবং খ্রীস্টধর্মের প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, তেমনি আবার হিন্দুধর্ম প্রচার করতে গিয়ে খ্রীস্টান মিশনারিদের একাংশের যে তীব্র বিরোধিতা এবং অপপ্রচারের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল, সেই বৈরিতার অন্তর্জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে সত্য উদ্ঘাটনের জন্যও তাঁকে খ্রীস্ট এবং

খ্রীস্টানদের প্রসঙ্গ টেনে আনতে হয়েছে বারবার। সেই সমস্ত আলোচনার মূল সুর একটাই—খ্রীস্টান বলে পরিচিত তোমরা অধিকাংশই খ্রীস্টান নও, তোমরা 'চার্চিয়ান'। তোমরা যীশুর আদর্শের অপমৃত্যু ঘটাচ্ছ। যদি বাঁচতে চাও, যাও—ভগবান যীশুর শরণাগত হও। লক্ষণীয়, মিশনারিদের আক্রমণের উত্তর স্বামীজী দিয়েছেন তীব্র ভাষায় এবং অকাট্য যুক্তির কশাঘাতে। কিন্তু ক্রাইস্ট-এর প্রতি তাঁর অতলান্ত শ্রদ্ধা, কি গভীর ভক্তি, কি অন্তহীন ভালবাসা! হবেই তো। তিনি তো আর যীশুকে মানুষ বলে দেখেননি, দেখেছিলেন 'চিদ্‌ঘনকায়' রূপে।

তাই Thousand Island Park-এ তিনি তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের অধ্যাত্মজীবন গড়ে তোলার তালিম শুরু করলেন বাইবেল দিয়েই। মিস ওয়াল্ডো (S.E. Waldo) যিনি ক্লাসে স্বামীজীর কথাগুলি লিখে রাখতেন, Inspired Talks-এর শুরুতে লিখছেন ঃ "বুধবার, ১৯শে জুন, ১৮৯৫। (...আজ স্বামীজীর প্রথম ক্লাস। সকালে বাইবেল হাতে নিয়ে তিনি ঢুকলেন। 'বুক অফ জন'-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন—-তোমরা যেহেতু সকলেই খৃষ্টান, আমার মনে হয় খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্র দিয়েই আমার শুরু করা উচিত।)"[১৪]

ক্রাইস্ট সম্পর্কে স্বামীজীর ধারণা কিরকম ছিল তা এখন একটু দেখা যাক। স্বামীজী বলছেন ঃ তিনি হচ্ছেন অনন্তের একটি বিশেষ প্রকাশ, ঈশ্বরের অবতার। অনন্তের ধারণা তো আমরা করতে পারি না; ক্রাইস্ট-এর মধ্য দিয়ে সেই অনন্তের কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। ভগবানকে যেমন ভক্তি করা উচিত বলে তোমরা মনে কর, আমি বলি ক্রাইস্টকেও তেমনি কর। যদি মুক্তি চাও, ক্রাইস্টকে ধরে থাকো; তোমরা তাঁকে ছেড়ো না। ক্রাইস্ট বা বুদ্ধ একটা অবস্থার নাম। প্রতি পাঁচশো বছর অন্তর বিশ্ব যখন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ডুবতে বসে, তখনই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অধ্যাত্ম-তরঙ্গ এসে জগতকে পরিপ্লাবিত করে দেয়, আর সেই তরঙ্গের চূড়ায় বসে থাকেন একজন ক্রাইস্ট। এমন যে ক্রাইস্ট তাঁর কাছেই প্রার্থনা কর, তাহলেই কাজ হবে। আলাদা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা না করলেও চলবে। ঐ ক্রাইস্ট-এর কোনও পারিবারিক বন্ধন ছিল না। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী। নিজেকে কেবল আত্মা বলেই জানতেন। তাঁর কোনও জীবিকা ছিল না, কোনও ভাবনা ছিল না। অহর্নিশি চিন্তা ছিল একটাই—'আমি আত্মা।' বাস্তবিক তিনি ছিলেন বিদেহী, মুক্ত আত্মা। তিনি জানতেন নারী, পুরুষ প্রত্যেকেই অমর আত্মা, ঠিক তাঁরই মতো। ক্রাইস্ট ছিলেন ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। তিনি ঐহিক জীবন ও তার ভোগসুখের কথা বলেননি। বলেছেন—তোমাদের যা কিছু আছে, সব গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে আমাকে অনুসরণ কর। এই ত্যাগের আদর্শই তিনি প্রচার করেছেন। কেউ তাঁকে মনে রাখবে কি রাখবে না এ মাথাব্যথা তাঁর ছিল না। তিনি জগতের কাছে একটি বাণী দিতে এসেছিলেন; সে বাণী তিনি দিয়ে গেছেন। যদি তিনি বিশ হাজার বারও জন্ম নেন, গরিব অসহায় মানুষের কল্যাণে সে জীবন উৎসর্গ করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হবেন না। লোকের কাছে ঘৃণার পাত্র যে 'সামারিটান'রা, তাদের মঙ্গলের জন্য যে কোনও অত্যাচার তিনি হাসিমুখে সহ্য করবেন।

স্বামীজী আরও বলেছেন ঃ অলৌকিক কাণ্ড দেখানো বা রোগ নিরাময় করা ক্রাইস্ট-এর আসল পরিচয় নয়। অনেক লোকই তা করতে পারে। তাঁর প্রকৃত শক্তি নিহিত ছিল তাঁর চরিত্রে। ঈশ্বর ক্রাইস্ট হয়ে এসেছিলেন আমাদের কাছে এই সত্যটি তুলে ধরার জন্যে যে

আমরাও দেবতা। কিন্তু খ্রীস্টান প্রচারকেরা অন্য কথা বলেন। তাঁরা মানুষকে বোঝাতে চান, ক্রাইস্ট হচ্ছেন মানুষের মুক্তিদাতা আর আমরা হচ্ছি কৃমি-কীট। চার্চ ক্রাইস্টকে নিজেদের সুবিধামত গড়তে চায়, ক্রাইস্ট-এর আদর্শমত নিজেদের গড়ে তোলে না। যীশু ছিলেন ভক্ত। অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে তিনি ক্রাইস্ট হয়েছিলেন। তোমাদের প্রত্যেককেই সেই উচ্চতম অবস্থা লাভ করতে হবে। ক্রাইস্টকে ছেড়ে প্রাসাদের ভোগ-সুখে পচে মরার চেয়ে শতচ্ছিন্ন, মলিনবসনে ক্রাইস্ট-এর সঙ্গে দিন কাটানো কোটিগুণে শ্রেয়। যে মুহূর্তে তোমরা নিজেদের ভিতর ক্রাইস্টকে অনুভব করবে সেই লগ্নেই তোমাদের মধ্যে নেমে আসবে পরম প্রশান্তি। আমার ধারণা বুদ্ধই ক্রাইস্ট হয়ে এসেছিলেন। ক্রাইস্ট-এর অধ্যাত্মশক্তি, তাঁর বাণী এবং প্রেম শাশ্বত।

স্বামীজীর চোখে ক্রাইস্ট-এর ভাবমূর্তিটি ছিল ঠিক এমনই। তাঁর কথা বলতে বলতে স্বামীজী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। মিস ম্যাকলাউড স্বামীজীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেনঃ "স্বামীজীর যেসব অসাধাবণ বক্তৃতা আমি শুনেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'Jesus of Nazareth'। বক্তৃতাকালে যীশুর বিস্ময়কর শক্তিব অনুধ্যানে তিনি এমনই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক শুভ্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছিলাম। তাঁর মধ্যে সেই অধ্যাত্ম-দ্যুতির স্ফুরণ দেখে সেদিন আমি এতটাই বিহ্বল হয়েছিলাম যে বাড়ি ফেরার পথে কোন কথা বলে তাঁর সেই ধ্যানতন্ময়তা ভঙ্গ করার সাহস হয়নি।"[১৫]

একবার তাঁর এক বিদেশী শিষ্যা সিস্টাইন ম্যাডোনার একটি ছবি স্বামীজীর হাতে দিয়ে বলেন, আপনি ছবিটিকে আশীর্বাদ করুন। এ হেন অনুরোধে স্বামীজী বিস্মিত! কোনও কথা না বলে তিনি কেবল দেবশিশুর পাদস্পর্শ করলেন।[১৬] আরেকবার তেজের সঙ্গে তিনি আরেকজনকে বলেছিলেনঃ "ম্যাডাম, যীশুর সময় আমি যদি প্যালেসটিনে থাকতাম তো আমার চোখের জল দিয়ে নয়, হৃদয়টা উপড়ে ফেলে, সেই রক্ত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম।"[১৭]

এমনই ছিল যীশুখ্রীস্টের প্রতি স্বামীজীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা। কিন্তু ভারতবর্ষে খ্রীস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপ এবং বিদেশে গোঁড়া ধর্মযাজকদের জীবনযাত্রা, অপপ্রচার, খ্রীস্টের উপদেশাবলী এবং ভাবমূর্তিকে বিকৃতভাবে দেখাবার চেষ্টা এবং সর্বোপরি অন্যান্য ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রাণান্তকর ও সংঘবদ্ধ প্রয়াস দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়েছিলেন তিনি। বিভিন্ন বক্তৃতায় এবং কথাবার্তায় তাঁর সেই ক্ষোভ ফুটে উঠেছে। যীশুর অনুগামীদের অধঃপতনে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সকরুণ আর্তি। সমালোচনার জন্যই তিনি কখনও সমালোচনা করেননি; শুধু তাঁদের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তাঁরা আরও ভাল খ্রীস্টান হতে পারেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার শেষ অধিবেশনে স্বামীজী বলেছেনঃ "Do I wish that the Christian would become Hindu ? God forbid. Do I wish that the Buddhist would become Christian ? God forbid."[১৮] তাহলে কি চেয়েছিলেন তিনি? তার উত্তরে স্বামীজী বলছেনঃ "...each must assimilate the spirit of others and yet preserve his individuality and grow according to his own law of growth."[১৯]

অর্থাৎ আদান-প্রদানের মাধ্যমে অন্য ধর্মের ভাল দিকগুলি গ্রহণ করে আপন আপন ধর্মের মধ্য দিয়েই, আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে প্রত্যেকেই স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠুক। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী! তাই স্বামীজীর উদারতম ভাবের কথা শুনে একদিকে যেমন আমেরিকা ও ইউরোপের মননশীল মানুষ ধন্য ধন্য করতে লাগলেন, অন্যদিকে তেমনি গোঁড়া ধর্মযাজকেরা স্বামীজীর জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। শুরু হল স্বামীজীর বিরুদ্ধে ক্রুসেড। তাতে ইন্ধন যোগাতে লাগলেন ভারতের কিছু মিশনারি, ব্রাহ্মনেতা প্রতাপ মজুমদার ও রমাবাঈ সার্কল-এর সদস্যরা। বিবেকানন্দও পিছু হটবার মানুষ নন।

স্বামীজী বজ্রকণ্ঠে বললেনঃ বাপু হে, তোমরা কি খ্রীস্টান? তোমরা কি মহান যীশুর ত্যাগ, তপস্যা, পবিত্রতা ও প্রেমের শিক্ষা মেনে চল? তোমরা দুনিয়াটাকে অত্যাচার আর রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছ। ডলারই তোমাদের উপাস্য দেবতা। কই, চারদিকে তাকিয়ে তো একজন সত্যিকারের খ্রীস্টানকেও দেখতে পাচ্ছি না! দু'কোটি লোকের ভিড়ে একজনও যথার্থ খ্রীস্টান আছে কিনা সন্দেহ। খ্রীস্টান হতে গেলে তোমাদের Sermon on the Mount-এর উপদেশগুলিকে জীবনে রূপ দিতে হবে। কারণ ক্রাইস্টকে বাদ দিয়ে খ্রীস্টধর্ম বাঁচতে পারে না। আলো এবং অন্ধকার যেমন একসঙ্গে থাকতে পারে না, তেমনি ধনদৌলতের পিছনে ছোটা এবং ঈশ্বর-উপাসনা একই সঙ্গে চলতে পারে না।

স্বামীজী আরও বললেনঃ তোমরা তো ঈশ্বরকে ভালবাস না; তোমাদের ভালবাসার মধ্যে যা আছে তা হল এক ধরনের দোকানদারি—হে প্রভু, আমাদের এই দাও, সেই দাও। এতো স্বার্থপরতা! এর মধ্যে আবার ভালবাসা কোথায় দেখলে? জাতি হিসাবে তোমরা এখনও খ্রীস্টান হয়ে উঠতে পারনি। ক্রাইস্ট-এর কাছে ফিরে যাও, সেই ক্রাইস্ট যাঁর মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। আমেরিকানরা মনে করেন ধর্ম হচ্ছে রোগ সারানো, অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখানো, এবং টাকাপয়সা রোজগারের একটা পথ। ধর্ম যদি তা করে দেয়, সে ধর্ম ভাল, নইলে দূর হটো!

স্বামীজী বললেনঃ যে ক্রাইস্ট-কে আমরা ভক্তি করি তোমরা সেই ক্রাইস্ট-এর মতো নও। ক্রাইস্ট-এর দরজা সকলের জন্য অবারিত ছিল; তিনি ছিলেন দীনতা, বিনয় ও নম্রতার চাক্ষুষী রূপ। কিন্তু তোমরা উদ্ধত। তোমরা যেখানেই গেছ, এক হাতে নিয়েছ বাইবেল, অন্য হাতে তরবারি। তা না হলে একশ বছরের খ্রীস্টান শাসনে ভারতবর্ষে কুড়ি লক্ষ খ্রীস্টান হয় কি করে? জন্ম থেকেই তোমাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে, তোমরা সব দেবদূত আর অখ্রীস্টান যারা, তারা সব শয়তানের অনুচর। সেই কারণেই তোমরা শুধুমাত্র খ্রীস্টান অথবা Christianised heathen-দের দিকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও। হিন্দুদের মধ্যেও ধর্মান্ধ এবং গোঁড়া মানুষের অভাব নেই। কিন্তু তোমাদের গোঁড়াদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ এই, তারা নিজেদের ওপর পীড়ন চালায়; আর তোমরা কাটো অন্যের গলা। খ্রীস্টান দেশগুলির সমৃদ্ধি নির্ভর করে 'অখ্রীস্টান' দেশগুলির দুঃখ-দুর্দশার ওপর। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিসন্ধিমূলক বইপত্র খ্রীস্টান মিশনারিরা এ যাবৎ লিখেছেন, খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধে যদি কোনও হিন্দু সেইরকম একটি লাইনও লিখত তাহলে মিশনারিরা প্রতিহিংসা নেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠতেন। অনেকে মনে করতে পারেন ভারতে যে

সমস্ত মিশনারি আছেন আমি তাঁদের প্রতি বিরূপ। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। আমার আপত্তি শুধু তাঁরা যেভাবে মিথ্যা প্রচার করে আমেরিকার মানুষদের কাছ থেকে টাকা তোলেন, কেবল তারই বিরুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে একজন সাচ্চা হিন্দু এবং একজন প্রকৃত খ্রীস্টানের মধ্যে কোনও তফাত নেই; এবং তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারেন, একথা আমি বিশ্বাস করি।

খ্রীস্টান দৃষ্টিভঙ্গি

ভগবান যীশু এবং খ্রীস্টানদের কথাপ্রসঙ্গে বাইবেল, চার্চ এবং খ্রীস্টধর্মের কথাও বারবার এসেছে বিবেকানন্দের মুখে। আলোচনাগুলি খ্রীস্টতত্ত্বের ওপর এমন গভীর আলোকপাত করেছে যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। প্রবন্ধের শেষপর্বে আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। এখন খ্রীস্টধর্মের মূল তত্ত্বগুলি এবং খ্রীস্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তব্য অনুধাবন করার চেষ্টা করা যাক।

(১) Addresses on Bhakti Yoga'-এ[২০] স্বামীজী খ্রীস্টানদের গোঁড়ামির গোড়ায় অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেনঃ "খৃষ্টানদের সবচেয়ে বড় সঙ্কীর্ণতা তাঁরা ক্রাইস্ট ছাড়া ঈশ্বরের অন্য কোনো প্রকাশকে স্বীকার করেন না।" তাঁরা বিশ্বাস করেন ক্রাইস্ট হচ্ছেন 'the only begotten Son of God'। স্বামীজী বলছেন—এসব হল গোঁড়া মিশনারিদের মতুয়ার বুদ্ধি। পৃথিবীর বহু দেশেই অবতার এবং অবতারকল্প মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, মহম্মদ—এঁরাও অবতার। বুদ্ধ, ক্রাইস্ট এঁরা অনন্ত ঈশ্বরের 'বুদবুদ' মাত্র। এঁদের থেকেও বড় মহাপুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা নীরবে এসে নীরবেই চলে গেছেন, মানুষ তাঁদের কথা জানে না।[২১] ঈশ্বর অসীম, অনন্ত। তাঁর ইতি করা যায় না। ক্রাইস্ট-কে একমাত্র অবতার বলার অর্থ অসীম ঈশ্বরকে ছোটো করা। তাতে অখণ্ড সত্তাকে খণ্ড সীমিত করে দেখানো হয়। কালে আঙ্গুরের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ ক্রাইস্ট-এর জন্ম হবে।[২২] ১১ মার্চ, ১৮৯৪ ডেট্রয়েটে 'Christianity in India' শীর্ষক একটি বক্তৃতায় তাই বিবেকানন্দ বললেনঃ "যে হিন্দু যীশুর চরিত্রের সৌন্দর্য ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হন না, আমি তাঁকে কৃপার পাত্র বলেই মনে করি। ঠিক তেমনিভাবে যে খ্রীস্টান হিন্দু ক্রাইস্টকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন না, আমি তাঁকেও ধিক্কার দিই। যিনি নিজেকে নিয়ে যত বেশি মত্ত প্রতিবেশী সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ততই কম হতে বাধ্য।"[২৩]

(২) ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট, প্রেসবিটেরিয়ান এ্যাঙ্গিলাক্যান বা অন্যান্য খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ও আচার-আচরণগত পার্থক্য যাই থাক না কেন, একটা বিষয়ে ওঁদের মতৈক্য ছিল। সেটি এই—ভগবান যীশুই একমাত্র পরিত্রাতা। অখ্রীস্টান যাঁরা, তাঁরা সকলেই নরকের আগুনে ঝলসাপোড়া হবেন। অবশ্য তাঁরা যদি প্রভু যীশুর শরণ নেন, তাহলে তাঁদের সব অপরাধই ক্ষমার্হ অর্থাৎ হরেদরে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই—খ্রীস্টধর্মই একমাত্র ধর্ম। বাদবাকি যা কিছু, সে হয় 'ফেটিশিজম্' নয়তো কুসংস্কার! এইরকম একটা আজগুবি ধারণা খ্রীস্টান চার্চগুলি সৃষ্টি করেছিলেন।

১৮৯৩ সালে স্বামীজী যখন শিকাগো গেলেন তখনও এই ধারণা খুব প্রবল এবং

ধর্মমহাসভা আয়োজনের পিছনেও এই মনোভাব ছিল খুবই সক্রিয়। চার্চ অফ ইংলণ্ডের কর্ণধার ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপকে যখন ধর্মমহাসভায় নিমন্ত্রণ করা হল, তিনি বলে বসলেন—Parliament of Religions ? ধর্ম তো একটাই। না, আমি ওসব তামাশার মধ্যে নেই।[২৪] সে যাই হোক উদ্যোক্তাদের বেশিরভাগই তলে তলে খ্রীস্টানধর্মের ঢাকই পেটাতে চেয়েছিলেন। প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন খ্রীস্টধর্মই একমাত্র ধর্ম। স্বামীজীর সিংহগর্জনে সে অভিসন্ধি অবশ্য চুরমার হয়ে গেল।

সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির মূলে কুঠারাঘাত করে স্বামীজী বললেনঃ "আমরা শুধুমাত্র যে পরস্পরকে সহ্য করার নীতিতে বিশ্বাস করি তাই নয়, আমরা হিন্দুরা সব ধর্মকেই সত্য বলে স্বীকার করি।"[২৫] ১৫ সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় বক্তৃতায় ধর্মসম্প্রদায়গুলিকে কুয়োর ব্যাঙের সঙ্গে তুলনা করলেন। ১৯ সেপ্টেম্বরের বক্তৃতা শুরুই করলেন তিনটি প্রাচীন ধর্মের নাম করে যার মধ্যে খ্রীস্টধর্মের উল্লেখ নেই। ২০ সেপ্টেম্বরের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় খ্রীস্টানদের মিশনারি পাঠানোর আগ্রহ অথচ সত্যিকারের সাহায্যের ব্যাপারে হাত গুটিয়ে বসে থাকার মনোভাবকে তুলোধোনা করে ছাড়লেন। পঞ্চম বক্তৃতাটি বৌদ্ধধর্মের ওপর। ষষ্ঠ ও শেষ বক্তৃতাটি নরম সুরে শুরু করলেও তিনটি বিস্ফোরক মন্তব্যে আতপ্ত। প্রথম মন্তব্যঃ " এখানে যদি কেউ আশা করেন একটি মাত্র ধর্মেরই জয় হবে এবং অন্যান্য ধর্মগুলির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটবে এবং তার মধ্য দিয়েই ধর্মজগতে ঐক্য স্থাপিত হবে, তবে৲ বলব, তিনি আকাশকুসুম কল্পনা করছেন।" দ্বিতীয় মন্তব্যঃ "খ্রীস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে হবে না। আবার হিন্দু বা বৌদ্ধকেও খ্রীস্টান হতে হবে না।" তৃতীয় মন্তব্যঃ "পার্লামেণ্ট অফ রিলিজিয়নস্ জগতের সামনে যদি কিছু প্রমাণ করে থাকে তো সেটা এই—পবিত্রতা, উদারতা প্রভৃতি সদ্ গুণাবলী কোনও সম্প্রদায়েরই একচেটিয়া সম্পত্তি নয়; সব ধর্মই দেবচরিত্রের মানুষের জন্ম দিয়েছে। ফলে কেউ যদি এই স্বপ্ন দেখে থাকেন যে একমাত্র তাঁর ধর্মটিই টিকে থাকবে আর অন্য ধর্মগুলি নিশ্চিহ্ন হবে, তাহলে তাঁর কথা ভেবে আমার দুঃখ হয়...।"[২৬] এখানে লক্ষণীয় প্রতিটি ভাষণেই স্বামীজী খ্রীস্টধর্মই যে একমাত্র ধর্ম, এই সঙ্কীর্ণ ও ভ্রান্ত ধারণাটিকে নস্যাৎ করেছেন বহুধর্মের উল্লেখ করে এবং এই কথা ঘোষণা করে যে সব ধর্মই সত্য।

(৩) বহু ধর্মান্ধ খ্রীস্টানের এই রকম একটা ধারণা ছিল এবং মিশনারিরাও তাঁদের প্রচারের একটা উত্তম হাতিয়ার হিসেবে একটা যুক্তি সেযুগে ব্যবহার করতেন যে 'খ্রীস্টধর্ম' এবং 'সমৃদ্ধি' এ দুটি শব্দ সমার্থক। আরও একটা কথা তাঁরা প্রচার করতেন 'Christianity is a saving religion'. অর্থাৎ যারা খ্রীস্টধর্মের আশ্রয়ে আসবে তারাই রক্ষা পাবে। অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য। স্বামীজী তাঁর বহু বক্তৃতায় বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন কথাগুলি আষাঢ়ে গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। ২৮ এপ্রিল, ১৮৯৭ দার্জিলিং থেকে ডাঃ ব্যারোজ-এর ভারতভ্রমণ প্রসঙ্গে দুঃখ করে স্বামীজী মেরী হেলকে লিখছেনঃ "আশ্চর্যের ব্যাপার এই, খ্রীস্টান দেশগুলি থেকে যাঁরাই ভারতে আসেন তাঁরাই নির্বোধের মতো বস্তাপচা একটা যুক্তি দেখান—যেহেতু খ্রীস্টানরা ক্ষমতাবান ও ধনী এবং হিন্দুরা তা নয়, অতএব হিন্দুধর্মের চেয়ে খ্রীস্টান ধর্ম অনেক উন্নত। এর উত্তরে হিন্দুরা কি বলে জান? তারা বলে, সেই কারণেই হিন্দুধর্ম ধর্ম আর খ্রীস্টান ধর্ম, ধর্ম নয় কারণ এই জঘন্য সংসারে

যারা নীচতার আশ্রয় নেয়, তারাই উন্নতি করে; যারা সত্যকে ধরে থাকে, তারাই সর্বদা কষ্ট পায়। তবে আমার মনে হয়, পাশ্চাত্যের দেশগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যতই উন্নত হোক না কেন, দর্শন ও অধ্যাত্মশিক্ষার ব্যাপারে দুধের শিশু।"[২৭]

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪ ডেট্রয়েটে দেওয়া এক বক্তৃতার শেষে বিবেকানন্দ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেনঃ "তোমাদের যে এত বিত্ত-বৈভব, এসব ক্রাইস্ট-এর কৃপায় এসেছে, বলতে চাও! ক্রাইস্ট দেহে থাকলে এসব ভণ্ডামির প্রতিবাদ করতেন।...যদি তোমরা ক্রাইস্ট-এর আদর্শ আর এই বিস্ময়কর সমৃদ্ধিকে সমন্বিত করতে পার, অতি উত্তম। কিন্তু যদি তা না পার, এসব তঞ্চকতা ছেড়ে দাও।"[২৮]

খ্রীস্টধর্ম আর পাঁচটা ধর্মের মতই সত্য এবং ঈশ্বরলাভের একটি পথ, এ নিয়ে বিবেকানন্দ কখনও সংশয় প্রকাশ করেননি। করবেনই বা কেন? কিন্তু এই ধর্ম যে সকলকে 'রক্ষা' করে সেকথা ভিত্তিহীন বলেই স্বামীজী মনে করতেন। তিনি প্রশ্ন করেছেনঃ "খৃষ্টধর্ম যদি সকলকে রক্ষাই করবে তাহলে ইথিওপিয়ান এবং আবিসিনিয়ানদের রক্ষা করল না কেন?"[২৯] 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' তিনি লিখছেনঃ "স্পেনের আরবরা এবং আমেরিকার আদিবাসীরা আজ কোথায়? ইউরোপের ইহুদিদের প্রতিই বা খৃষ্টানবা কি ধরনের আচরণ করছে?...ইউরোপ আজ যে উন্নতি করেছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা সম্ভবপব হয়েছে খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে—বাইবেলের বিরুদ্ধাচরণ করে।...আধুনিক ইউরোপে 'খৃষ্টধর্ম' এবং 'কৃষ্টি' দুটি ভিন্ন জিনিস।" স্বামীজী প্রশ্ন তুলেছেন—কনস্টানটিন-এর সময় থেকে সভ্যতার বিকাশে খ্রীস্টধর্মের ভূমিকা কি? যে ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, খ্রীস্টধর্ম তাঁকে কোন পুরস্কাবে সম্মানিত করেছিল?

(৪) প্রচলিত খ্রীস্টধর্মের প্রকৃতি পর্যালোচনা করে স্বামীজী দেখালেন প্রকৃত ধর্মীয় মনোভাবের পরিবর্তে সেখানে একটা দোকানদারির মনোভাবই প্রশ্রয় পেয়েছে। পার্থিব সুখ ও সমৃদ্ধিই সেখানে একমাত্র প্রার্থিত বস্তু, নিষ্কাম ভালবাসাব স্থান সেখানে নেই বললেই চলে। কোনও কোনও ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে ব্যতিক্রম হিসাবে বাদ দিলে, ত্যাগ, তপস্যা ও চরিত্র গঠনের দিকে কারোরই দৃষ্টি নেই। ধর্ম বলতে শুধু বিশেষ পোশাকে সজ্জিত হয়ে রবিবার চার্চে যাওয়া! ১৮৯৬ সালে লণ্ডনের 'The Echo' পত্রিকার কাছে এক সাক্ষাৎকারে স্বামীজী বলেছেনঃ "লোকে চার্চে যায় দুটি কারণে, বিয়ে-থা হলে, আর নয়তো আত্মীয়স্বজন মারা গেলে।"[৩০]

(৫) যদি কেউ ভাবেন স্বামীজী চার্চে যাওয়ার নিন্দা করেছেন, তাহলে তিনি ভুল করবেন। স্বামীজী চার্চে যেতে বারণ করেননি। বরং বলেছেনঃ "ধর্মজীবন শুরু করার সময় চার্চ এবং কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠানের খুবই প্রয়োজনীয়তা আছে।"[৩১] কিন্তু চার্চ-সর্বস্ব হওয়াকে তিনি সমালোচনা করেছেন। স্বামীজীর বক্তব্যঃ যদি একজন যুবক চার্চে না যায়, তাহলে তার ভর্ৎসনাই প্রাপ্য। কিন্তু যদি একজন পলিতকেশ বৃদ্ধ চার্চে যান, তাহলে তাঁরও সমালোচনা করা উচিত। অন্যত্র বলেছেন—চার্চ বা অন্যান্য প্রতীক উপাসনা শিশুদের পক্ষে সঙ্গত কিন্তু শিশু যখন পূর্ণবয়স্ক হয়, তখন অধ্যাত্মজীবনে পরিপূর্ণতা লাভের জন্য চার্চের বাঁধাধরা গণ্ডি ছেড়ে অনন্ত আকাশের তলায় এসে তাকে দাঁড়াতেই হয়। বলেছেনঃ

"It is very good to be born in a church, but it is very bad to die in a church."[৩২]

(৬) মানুষ যে স্বরূপত ঈশ্বর সেকথা খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকেরা সচরাচর বলেন না। কেন বলেন না, তার উত্তরও লণ্ডনে একটি বক্তৃতায় স্বামীজী দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন : "মানুষ যে ঈশ্বর, সেকথা বলে দিলে চার্চের কর্তৃত্ব আর টেকে না।"[৩৩]

(৭) খ্রীস্টান চার্চগুলি সহজ, সরল মানুষের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য তাই শুধু পাপবাদ প্রচার করে বেড়াত। বাইবেলে অবশ্য পাপের কথা অনেক আছে। কিন্তু প্রচারকদের প্রচারগুণে মনে হত 'পাপ'-এর কথা ছাড়া বুঝি পবিত্র বাইবেলে আর অন্য কোনও কথা নেই! বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের ওপর যে ভাষণটি দিলেন, সেখানেই প্রথম তিনি এই পাপবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। ধর্মমহাসভার হাজার হাজার শ্রোতা তথা সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন : "আপনারা সব অমৃতের সন্তান। অমৃতেই আপনাদের জন্মগত অধিকার। ঐ মধুর নামেই আমি আপনাদের ডাকতে চাই। হ্যাঁ, আমি সত্যি বলছি, হিন্দুরা কখনই মনে করে না আপনারা পাপী। আপনারা ঈশ্বরের সন্তান, আনন্দ, শান্তি ও পবিত্রতা আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ। কী দুর্দৈব! যারা দেবতা, তাদের পাপী বলা! মানুষকে 'পাপী' বলাই সবচেয়ে বড় পাপ; মানুষের পক্ষে ওর থেকে বড় অসম্মান আর কিছুই হতে পারে না। সিংহ-বিক্রমে হুঙ্কার দিন, আপনারা যে মেষশাবক, এ বিভ্রম মন থেকে চিরতরে ঝেড়ে ফেলে দিন। আমি সত্য বলছি, আপনারা প্রত্যেকেই নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত আত্মা। আপনারা দেহ নন, জড় বস্তু নন, আপনারা আত্মা। জড়বস্তু যা কিছু সব আপনাদের দাস।"[৩৪]

১০ নভেম্বর, ১৮৯৬। লণ্ডনে Practical Vedanta-সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : বেদান্তে 'পাপ' বলে কিছু নেই। যেটাকে লোকে 'পাপ' বলে বেদান্তের পরিভাষায় সেটা 'ভুল'। আর সবচেয়ে বড় ভুল এই কথা বলা—তুমি পাপী, তুমি হতভাগ্য, তুমি দুর্বল, তুমি অক্ষম। যতবার তুমি এইভাবে ভাবিত হও, ততবারই তুমি তোমার অজ্ঞানজনিত বন্ধনের বোঝা বাড়িয়ে তোল, নিজেকে সম্মোহিত করে আত্মার প্রকাশকে আচ্ছন্ন কর। যারা নিজেদের দুর্বল, অশুদ্ধ মনে করে, তারা ভুল করে এবং জগতে মলিন চিন্তার প্রসার ঘটায়।[৩৫] নিউ ইয়র্কের একটি বক্তৃতাতেও স্বামীজী একই কথার প্রতিধ্বনি করে বললেন : তুমি পাপী হয়ে জন্মেছ, দুষ্ট লোক হয়ে জন্মেছ—এই কথা ভাবা বা বলার চেয়ে মিথ্যা কথা আর কিছুই হতে পারে না। আমি তাকেই পাপী বলি যে অন্যের মধ্যে পাপ দেখে।[৩৬]

(৮) হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে মিশনারিদের একটা চিরাচরিত অভিযোগ ছিল তারা নাকি পুতুল পুজো করে। Idolaters বা পৌত্তলিক বলে তাদের অনেক বিকৃত সমালোচনা করা হত। বিবেকানন্দ সেকথা ভালভাবেই জানতেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন হিন্দুরা কাঠ, মাটির পুজো করে না, তারা প্রতীক উপাসনা করে। তারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। অতএব যে কোনও বস্তুতেই ঈশ্বর বা নামরূপহীন অখণ্ড চৈতন্যের আরাধনা করা চলে। স্বামীজী আরও বললেন : যদি একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে হিন্দুরা পৌত্তলিক কারণ তারা মূর্তি বা প্রতীকের পুজো করে, তাহলে কোন ধর্ম পৌত্তলিক নয়? কোন ধর্মে প্রতীক

উপাসনা নেই? খ্রীস্টানরা তাহলে চার্চে যায় কেন? বলতে পার, ক্রস্ তাদের কাছে এত পবিত্র কেন? ঐগুলি কি পবিত্র প্রতীক নয়? নামাজ পড়ার সময় মুসলমানরা পশ্চিমমুখো দাঁড়ান কেন? কেনই বা কাবার পবিত্র প্রস্তরখণ্ডটিকে তাঁরা সশ্রদ্ধভাবে চুম্বন করেন? ঐগুলি কি প্রতীক উপাসনা নয়? অবশ্যই তাই। অতএব স্বামীজী বললেনঃ হিন্দুদের যদি পৌত্তলিক বল, তোমরাও পৌত্তলিক। প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই জন্মসূত্রে পৌত্তলিক, 'born idolaters'। যতক্ষণ আমরা নিজেদের আত্মা না ভেবে দেহমাত্র মনে করছি, যতক্ষণ জগতে নাম-রূপের বৈচিত্র্য দেখছি, যতক্ষণ বিমূর্ত সত্যকে বিমূর্তভাবে উপলব্ধি না করতে পারছি, ততক্ষণ আমরা সবাই প্রতীক উপাসক। পৌত্তলিক। তবে সমস্যা বাধে এই কারণে, প্রত্যেকেই মনে করেন তাঁর ধর্মের প্রতীকটিই ঠিক, অন্য ধর্মের প্রতীকগুলি অজ্ঞতার নিদর্শন।[৩৭] বস্তুত কোনও প্রতীকই মিথ্যা নয়, প্রত্যেকটি প্রতীকের মাধ্যমেই উপাসক ক্রমশ উচ্চতর সত্যের দিকে এগিয়ে যায়।

(৯) স্বামীজী খ্রীস্টানদের দান-ধ্যানের খুব প্রশংসা করেছেন। তাঁরা কলেজ, হসপিটাল স্থাপন করে বহু মানুষের সেবা করেন। এমনকি তিনি একথাও বলেছেনঃ "যতদিন খ্রীস্টানরা এই আদর্শটিকে ধরে থাকবেন, ততদিন তাঁদের ধর্ম অবশ্যই টিকে থাকবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, দান-ধ্যান নিশ্চয় একটা মহৎ কাজ কিন্তু যে মুহূর্তে আপনারা বলবেন ঐটাই সব, তক্ষুনি আপনারা materialism-এর খপ্পরে পড়বেন।... বাস্তবিক, আপনারা যাঁরা খ্রীস্টান, তাঁরা কি মনে করেন পরোপকার ছাড়া বাইবেল-এ আর অন্য কোনও কথা নেই?"[৩৮] এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ-ই কি ধর্মের লক্ষ্য? না, তা হতে পারে না। আমাদের লক্ষ্য মুক্তি।

(১০) 'সৃষ্টিতত্ত্ব' সম্পর্কে খ্রীস্টানদের যে সনাতন ধারণা, স্বামীজী তার সমালোচনা না করলেও প্রচ্ছন্নভাবে তিনি যা বলেছেন তার অর্থ এই—ঈশ্বর একদিন হঠাৎ তাঁর খেয়াল খুশিমত এই বিশ্ব সৃষ্টি করলেন, এমনটি ভাবা অযৌক্তিক। বস্তুত বেদান্ত ধর্ম 'সৃষ্টি' বা 'creation'-এ বিশ্বাসী নয়। বেদান্ত মতে 'projection', বা 'manifestation'. বেদান্ত বলে 'কারণ' না থাকলে 'কার্য' অসম্ভব। কোনও কিছুই শূন্য থেকে উদ্ভূত হতে পারে না। একটা গাছ হতে গেলে বীজের প্রয়োজন। ব্রহ্মই সেই বীজ অর্থাৎ কারণ। ব্রহ্মই আবার গাছ অর্থাৎ কার্য। এক অবস্থায় বীজ, আরেক অবস্থায় গাছ। যখন প্রকাশ হচ্ছে তখন বলি কার্য। যখন অপ্রকাশ তখন কারণ অবস্থা। তখন বলি ব্রহ্ম। দুই-ই এক তত্ত্ব। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের এই সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ নেই। কিন্তু বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টির বর্ণনা আজ কজন শিক্ষিত খ্রীস্টান মানেন তা হাতে গোনা যায়।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে শিষ্যমণ্ডলীকে গড়ে তোলার সময় স্বামীজী খ্রীস্টানদের সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণা নিয়ে একটা মজার গল্প বলেছিলেন। সিস্টার কৃস্টিন তাঁর স্মৃতিকথায় সেই গল্পটির উল্লেখ করেছেন।[৩৯] স্বামীজী বলেছিলেনঃ একবার এক নিগ্রো প্রচারক এ্যাডামকে কিভাবে সৃষ্টি করা হল সেই কাহিনী বর্ণনা করছিলেন। যেই না তিনি বলেছেনঃ "ভগবান এ্যাডামকে সৃষ্টি করে বেড়ার ওপর শুকোতে দিলেম," অমনি শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কিন্তু দাদা, বেড়াটা এল কোত্থেকে?" প্রশ্ন শুনে প্রচারক গম্ভীর হয়ে বললেনঃ "বাছারা, ঐ রকম আরেকটা প্রশ্ন তুললেই থিয়লজির দফা গয়া হয়ে যাবে।"

(১১) বিভিন্ন খ্রীস্টান চার্চ ক্রাইস্ট-এর শিক্ষাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তবে মোটামুটিভাবে তাঁদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই ক্রাইস্ট শুধু ভক্তিবাদ অর্থাৎ দ্বৈতভাবই প্রচার করেছেন। ক্রাইস্ট যে চরম অদ্বৈতজ্ঞানের কথাও বলেছেন এবং বাইবেলে সেসব কথাও আছে, সেকথা তাঁরা ভুলেও বলেন না। সেইখানেই স্বামীজীর আপত্তি ছিল। ক্ষোভের সঙ্গে তাই তিনি মন্তব্য করেছেন: "The most profound and noble ideas of Christianity were never understood in Europe..." অর্থাৎ ইউরোপ ক্রাইস্ট-এর শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গভাবে উপলব্ধি করেনি। 'Practical Vedanta'-এ স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে প্রফেট প্রচার করেছিলেন, 'Our Father which art in heaven', তিনি আবার এও বলেছেন: 'I and my Father are one'. ক্রাইস্ট জানতেন দ্বৈতের পথ ধরেই শেষ পর্যন্ত অদ্বৈততত্ত্বে পৌঁছানো যায়। খ্রীস্টতত্ত্বের প্রচলিত ব্যাখ্যাকে বিবেকানন্দ এইখানে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিলেন।

(১২) সবশেষে একথা বলা প্রয়োজন স্বামীজী খ্রীস্টানদের 'atonement' নীতিরও কড়া সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন: যীশু প্রেমিক ছিলেন। নম্রতা তাঁর সহজাত। ইহুদিদের এই নিষ্ঠুর প্রথা খ্রীস্টানধর্মে অনুপ্রবেশ করে এক ধরনের প্রতিশোধ স্পৃহা ও জিঘাংসার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলেছে।[৪০]

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছিলেন—স্বামীজী যেন তাঁর বক্তৃতাগুলির মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের একটি নতুন রূপ দিয়েছিলেন। যীশু, খ্রীস্টধর্ম ও বাইবেল সম্পর্কে স্বামীজী যেসব আলোচনা ও ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাতে আমার মনে হয় একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে তিনি খ্রীস্টধর্মকেও যেন নতুন আলোক ও প্রেরণা দিয়ে সঞ্জীবিত করে গেছেন।

প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

জীবনের শেষ দিকে স্বামীজী একটা কথা প্রায় বলতেন: বিবেকানন্দ কি করে গেল, আরেকটা বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারত। শ্রীরামকৃষ্ণও একটা কথা বলতেন: ছোট স্টীমার চলে যাওয়ামাত্রই পাড়ে ছোট ছোট ঢেউ এসে ধাক্কা মারে। কিন্তু যখন একটা প্রকাণ্ড বড় জাহাজ চলে যায়, তখন তেমন কিছু বোঝাই যায় না। জাহাজটা যখন অনেক দূরে, বিশাল বিশাল ঢেউ তখন কূলে এসে একটার পর একটা আছড়ে পড়ে, জল তোলপাড় হয়। স্বামী বিবেকানন্দও যেন সেইরকম একটা আদিগন্ত জাহাজ। ধর্মমহাসভায় তাঁর দৈবী আবির্ভাবের একশ বছর পূর্ণ হল। খানদানি চাষার মতো শ্রোতা, শিষ্যমণ্ডলী এবং অন্তরঙ্গদের হৃদয় খুঁড়ে উচ্চতম বেদান্তচিন্তা এবং মহান অধ্যাত্মভাবের যে বীজ তিনি ছড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন, আজ তার কিছু কিছু প্রকাশ সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। কালে তা আরও পুষ্ট হয়ে সকলেরই দৃষ্টিগোচর হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমরা সামগ্রিকভাবে স্বামীজীর প্রভাব ও অবদানের কথা প্রবন্ধের এই অংশে আলোচনা করছি না, আমরা শুধু দেখব খ্রীস্টধর্মের ওপর স্বামীজীর প্রচারের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কি রকম ও কতখানি হয়েছে।

এক: শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ভাষণগুলি খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের প্রধানত দু'ভাবে নাড়া দিয়েছিল। যাঁরা শিক্ষিত, উদারপন্থী এবং যুক্তিবাদী খ্রীস্টান এবং যাঁরা

অজ্ঞেয়বাদী, তাঁরা স্বামীজীর উদার ও বিশ্বজনীন ভাবনার তড়িৎস্পর্শে যেন জেগে উঠলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন ধর্ম কোনও প্রহেলিকা নয়, আজগুবি কল্পনা নয়; ধর্ম জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং খ্রীস্টান ধর্মের মধ্যেও সার আছে। তাঁরা তাঁদের বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে এটাও বেশ বুঝতে পারলেন যে মিশনারিরা প্রাচ্যের মানুষ এবং তাঁদের ধর্ম সম্পর্কে যেসব কথা প্রচার করেন সেগুলি মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। Lucy Monroe ৭ অক্টোবর 'Critic' পত্রিকায় লিখলেনঃ বিদেশে অর্ধশিক্ষিত মিশনারি পাঠিয়ে প্রজ্ঞাবান প্রাচ্যের মানুষদেব শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা যে কতখানি আহাম্মকি, শিকাগো ধর্মমহাসভা তা প্রমাণ করেছে। তাদেব কাছ থেকে যে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে, সে কথা বোঝার সময় এসেছে।[৪১] ধর্মমহাসভার বিজ্ঞানশাখার সভাপতি Merwin Marie Snell লিখলেনঃ ধর্মমহাসভার সবচাইতে জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ধর্মমহাসভার মূল অধিবেশনে এবং বিজ্ঞানশাখার সভাগুলিতেও তিনি অনেকবার বলেছেন। কিন্তু তবু যেখানেই তিনি গেছেন, লোকে তাঁর প্রতিটি কথা হাঁ করে শুনত। গোঁড়ার চাইতেও গোঁড়া এমন সব খ্রীস্টানদের বলতে শুনেছি, বিবেকানন্দ মানুষটি সত্যিই বাজার রাজা।[৪২] ৭ অক্টোবর 'Outlook' পত্রিকায় লেখা হলঃ "হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিবা হেলাফেলাব মানুষ নন। তাঁবা অনেক খ্রীস্টানেব চোখ খুলে দিযেছেন। হাজার হাজাব বছব ধবে প্রাচ্যেব যে সমস্ত ধর্ম বহু দার্শনিকের হৃদয়-মন জুড়ে আছে, কোটি কোটি মানুষেব আশা আকাঙ্ক্ষাকে যা ঈশ্বরমুখী করেছে, সেই ধর্মের গভীরে অনেক খ্রীস্টান এই প্রথম দৃষ্টি দিলেন।"[৪৩] এই সুর এবং আত্মসমীক্ষার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তখনকার উদার পত্র-পত্রিকাব পাতায় পাতায়, বিশেষ করে সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলিতে।

বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়াব ও আবিষ্কাবক স্যার Hiram Maxim শিকাগোয় স্বামীজীর বক্তৃতা মন দিয়ে শুনেছেন। কুড়ি বছর পর স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভূমিকা স্মরণ করে তিনি লিখেছেনঃ "ধর্মসভার কৃপায আমেরিকানদের বছরে দশ লক্ষ ডলার বেঁচে গেল; বহু মানুষের জীবনের কথা তো ছেড়েই দিলাম।" সিস্টার কৃস্টিন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেনঃ স্বামীজীর কথা যে একবাব শুনেছে, সে কি আর আগের মানুষটি থাকতে পারে? তার যেন নবজন্ম হয। আমাদেরও তাই হয়েছিল।[৪৪] জোসেফিন ম্যাকলাউডেরও একই অভিজ্ঞতা। তিনি স্বামীজীর বক্তৃতা যেদিন প্রথম শুনলেন সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল স্বামীজীর প্রতিটি কথাই সত্য। সিস্টার দেবমাতা তাঁর স্মৃতিকথায় একজন Swedenborgian যাজকেব কথা লিখেছেন। তিনি তাঁর মা ও বোনের সঙ্গে যখন Ohio-তে ছিলেন তখন ধর্মমহাসভা ফেরত ঐ যাজকের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয়। তিনি বলেছিলেনঃ শিক্ষা, বাগ্মিতা এবং ব্যক্তিত্বে বিবেকানন্দই ধর্মমহাসভা আলো করেছিলেন।[৪৫] প্রখ্যাত দার্শনিক William Ernest Hocking যখন স্বামীজীর হিন্দুধর্মের ওপর বক্তৃতাটি শোনেন, তখন তাঁর বয়স কুড়ি। হার্বার্ট স্পেন্সারই তখন তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। তিনি মেথডিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বহু বছর পর স্বামীজীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেনঃ "তাঁর সব কথা হুবহু মনে না থাকলেও এটি বেশ মনে আছে, তিনি এক সময় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন এই বলেঃ 'মানুষ পাপী? মানুষকে পাপী বলাই সবচেয়ে বড় পাপ।' সব মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের সত্তা লুকিয়ে আছে। সত্য এক। অখণ্ড। ব্রহ্ম হচ্ছেন

সেই সত্য বস্তু যা আমাদের ভিতরে বাইরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। বিবেকানন্দের ঐ বাণীর তাৎপর্য তৎক্ষণাৎ হজম করা আমার পক্ষে কঠিন হলেও আমি এটা বেশ বুঝেছিলাম তিনি শেখা কথা বলছেন না, যা তিনি নিজে উপলব্ধি করেছেন, সেই কথাই বলছেন। ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম স্পেনসারই শেষ কথা নয়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তী কালে বুঝেছিলাম বিবেকানন্দের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।"[৪৬]

উদার খ্রীস্টান ও বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি এইভাবে একদিকে যেমন উদারতর হল, অন্যদিকে গোঁড়া খ্রীস্টানদের একাংশও ঘন ঘন সভা-সমিতিতে মিলিত হয়ে আত্মসমীক্ষা শুরু করে দিলেন। তাঁদের ভুলত্রুটি কোথায় এবং কিভাবে তা সংশোধন করা যায়, সেকথাও তাঁরা ভাবতে লাগলেন। যাঁরা চার্চে আসা বন্ধ করেছিলেন, তাঁরাও দলে দলে দিনরাত চার্চে ভিড় করতে লাগলেন। গোটা আমেরিকা জুড়েই যেন একটা religious revival বা ধর্মীয় পুনর্জাগরণ শুরু হয়ে গেল। একটা নতুন আগ্রহ, নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। স্বামীজীর প্রচার এবং তার দিব্য উপস্থিতিই যে এর জন্য বহুলাংশে দায়ী, একথা অনস্বীকার্য।

দুই : স্বামীজী পাশ্চাত্যের মানুষের চোখ এমনভাবে খুলে দিলেন যে মিশনারিদের অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা দারুণভাবে বিঘ্নিত হল। অন্যদিকে খ্রীস্টানদের মধ্যে 'অন্তর্নিহিত দেবত্বের' ধারণাটি সংক্রামিত হওয়ায় বিভিন্ন চার্চের ধর্মযাজকরাও তাঁদের প্রচারের সুর পালটাতে বাধ্য হলেন। 'পাপ' 'পাপ' করে মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত করে তোলা এবং নরকের ভয় দেখানো কিছুটা বন্ধ হল। তার পরিবর্তে তাঁরা ক্রাইস্ট-এর প্রেম ও করুণার কথাই বেশি করে বলতে লাগলেন। বিগত একশ বছরের খ্রীস্টধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ধীরে ধীরে প্রাচ্যের মূর্তিপুজোর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার এবং পাপবাদের প্রচার কেমন করে স্তিমিত হয়ে এসেছে। আজ পাশ্চাত্যের কোনও শিক্ষিত খ্রীস্টানই পুরোনো দিনের ঐ অন্ধ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্রয় দেন না। শুধু পাশ্চাত্যের খ্রীস্ট অনুরাগীদের কথাই বা বলি কেন, ভারতের খ্রীস্টানদের মুখেও আজকাল পাপের কথা বড় বেশি শোনা যায় না।

তিন : ভারতীয় খ্রীস্টতত্ত্ববিদদের অনেকেই আজ অদ্বৈতবেদান্তের আলোকে ক্রাইস্টকে দেখতে শুরু করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ K. Subba Rao (১৯১২-১৯৮১)-এর নাম উল্লেখ করতে পারি। তাঁর মতে মানুষ স্বরূপত 'Spirit' (আত্মা) এবং এই সত্যকে ভুলে থাকার নামই 'Fall' বা পতন। আমরা যে জড় (matter) নই, আমরা যে আত্মা, সেই অভিজ্ঞতার নামই মুক্তি। 'Towards an Alternative Theology—Confessions of a Non- Dualist Christian' গ্রন্থের লেখিকা Sara Grant 'পাপ'-কে অবিদ্যা বলে বর্ণনা করেছেন। Bede Griffiths-এর মতে 'পাপ' হল পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'কাঁচা আমি' বা এখনকার এই 'খণ্ড আমি'তে তুষ্ট থাকা। 'Redemption' অথবা 'Atonement' হল প্রকৃত একত্ব বা অখণ্ড সত্তায় ফিরে যাওয়া।

বিবেকানন্দের রচনাবলীর সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরা বুঝতে পারবেন এসব কথা হুবহু স্বামীজীরই প্রতিধ্বনি। মেমফিসে দেওয়া (১৭ জানুয়ারি, ১৮৯৪) একটি

বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলেছেনঃ 'Original sin' বা সনাতন পাপ সম্পর্কে বাইবেলে যে রূপক গল্প আছে তার দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। কারণ তোমাদের বাইবেলে 'Original purity' বা স্বরূপের পবিত্রতার কথাও আছে। এ্যাডামের যে পতন, সে এই পবিত্রতা থেকে। পবিত্রতাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, সেই স্বরূপে ফিরে যাওয়াই সব ধর্মের লক্ষ্য। তোমরা বলতে পার, সব মানুষই যদি পবিত্র তাহলে কোনও কোনও মানুষ পশু-স্বভাবের হয় কেন? তার উত্তর এই—যাকে তোমরা পশুমানব বলছ, সে আসলে একখণ্ড হীরে। কাদা বা ধুলোয় পড়ে আছে এই যা তফাত। ধুলোটা ঝেড়ে ফেল, দেখবে প্রকৃত হীরের দ্যুতিতে এ এমন ঝলমল করে উঠবে যে ওর গায়ে যে কোনও কালে ধুলো লেগেছিল তা আর মনেই হবে না। প্রত্যেকটি মানুষই বিরাট এক এক খণ্ড হীরে।[৪৭]

চারঃ Atonement theory-র কথা এবং সে সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তব্য আগেই উল্লেখ করেছি। এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে বাইবেলে বর্ণিত এই তত্ত্বটিও আজকের খ্রীস্টানদের কাছে বড় একটা গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলি ডঃ কে. পি. এ্যালিয়াজ সম্প্রতি এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে লিখেছেনঃ "...it is accepted today that atonement theory is not the only way to understand the work of Chirst. H. A. Krishna Pillai's thought during his conversion experiences (1857-59) had already shown the difficulty an Indian faces with regard to atonement theory."[৪৮] শুধু atonement তত্ত্বই নয়, খ্রীস্টধর্মের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞরা, বিশেষত ভারতীয় খ্রীস্টতত্ত্ববিদদের একাংশ বিবেকানন্দ তথা নববেদান্তের আলোকে ভগবান যীশুর জীবন ও তাঁর তাৎপর্য বিশ্লেষণ শুরু করেছেন। সুব্বা রাও-এর কথা আগেই বলেছি। তিনি যীশুর ক্রসে মৃত্যুর ঘটনাটিকে আত্মোৎসর্গ হিসেবে বর্ণনা করে এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে যীশুর মৃত্যু দেহ, অহংকার এবং জাগতিক ব্যাপারে যে আসক্তি, সেই সীমিত চেতনার মৃত্যু। বিবেকানন্দের সহপাঠী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় হিন্দু ছিলেন। পরে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। শোনা যায়, শেষ জীবনে আবার তিনি হিন্দুধর্মে ফিরে আসেন। সে যাই হোক, ভারতীয় খ্রীস্টানরা তাঁকে খ্রীস্টধর্মাবলম্বী হিসেবেই দেখেন। ব্রহ্মবান্ধবের ওপর স্বামীজীর প্রভাব যেমন তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন, তেমনি পণ্ডিত গবেষকরাও এ ব্যাপারে একমত। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Julius J. Lipner সম্প্রতি এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন 'হিন্দু-ক্যাথলিক' উপাধ্যায় যে সন্ন্যাসীর পোশাক ধারণ করেছিলেন তা বিবেকানন্দের অনুকরণেই।[৪৯] বস্তুত ব্রহ্মবান্ধবই সর্বপ্রথম খ্রীস্টধর্মকে ভারতীয় রঙে রাঙ্গান। খ্রীস্টধর্মে যে পবিত্র Trinity-র কথা আছে, সেই তত্ত্বকে তিনি সৎ, চিৎ এবং আনন্দ—এইভাবে ব্যাখ্যা করেন। খ্রীস্টান সৃষ্টিতত্ত্বকেও তিনি বেদান্তের মায়াবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার পিছনে স্বামীজীর প্রভাব যে ছিল সে বিষয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই।

James Hastings সম্পাদিত 'Encyclopaedia of Religion and Ethics'-এর ষষ্ঠ খণ্ডে একটি মন্তব্য করা হয়েছে যা খুবই সত্য এবং প্রাসঙ্গিক। সেখানে বলা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে খ্রীস্টধর্মের 'ডগমা'গুলিকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিমার্জিত করতে হবে এবং ভারতের খ্রীস্টধর্ম ভবিষ্যতে বেদান্তের রঙে রেঙে যাবে।

আমরা দেখছি দুটি ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হয়েছে।

পাঁচঃ খ্রীস্টধর্ম স্বামী বিবেকানন্দের কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী বোধহয় এই কারণে যে তিনি বহু খ্রীস্টানের গোঁড়ামির জড় মেরে ছেড়েছিলেন। ধর্মীয় গোঁড়ামির বাঁধন অক্টোপাসের চেয়েও শক্ত। প্রথমত বৈদান্তিক যুক্তির আলোকে সে বাঁধন তিনি অনেকটা আলগা করে দিয়েছিলেন, যার ফলস্বরূপ আমেরিকা, ইংলণ্ড তথা খ্রীস্টান পাশ্চাত্য একথা তখনই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল—খ্রীস্টধর্ম একমাত্র ধর্ম নয়, বহু ধর্মের একটি মাত্র। স্বামীজীর প্রভাব, বহু দার্শনিক, মনীষী, লেখক ও বুদ্ধিজীবীর সমবেত প্রচেষ্টা এবং শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে আজ আর এ নিয়ে কারো কোনও সংশয় নেই। আজ সব দেশেই একটা প্রকৃত অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা জেগেছে। হার্ভার্ড ডিভিনিটি স্কুলের বিশিষ্ট খ্রীস্টতত্ত্ববিদ Robert Lawson Slater তাঁর গ্রন্থে[৫০] Paul David Devanandan-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। Devanandan লিখছেনঃ "Behind all this general tendency for a resurgence of religions in the plural, there is a quest for understanding the nature and significance of religion in the singular or religion underlying religions. To that extent not only Asians but the people of the world everywhere in our generations are justified in talking about the resurgence of religion as distinguished from religions: "অর্থাৎ বহু ধর্মমতের পিছনে যে একটি সর্বজনীন ধর্ম আছে সে সম্পর্কে পৃথিবীর বহু মানুষের একটা অনুসন্ধিৎসা জেগেছে। স্বামীজী তো এইটাই চেয়েছিলেন। বিশপ Stephen Neill মন্তব্য করেছেনঃ "A Christian today must 'put himself to school' with other faiths in readiness to believe that they may have something to teach him..."[৫১] অসাম্প্রদায়িক এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি স্বামীজীর বেদান্তপ্রচারের প্রত্যক্ষ ও অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। বেদান্তচর্চায় আজ পাশ্চাত্যের মানুষের এত আগ্রহ যে সেখানকার প্রতিটি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম চর্চার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। আমেরিকার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিতভাবে বেদান্ত সেন্টারগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। শুধু তাই নয় কোনও কোনও চার্চেও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ওকলাহামার ওসেগা মঠে হিন্দু এবং ক্যাথলিক ধর্মগ্রন্থ একই সঙ্গে পাঠ করা হয়। শুধু ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই স্বামীজীর প্রচারের প্রভাব সীমাবদ্ধ নয়, যাঁরা প্রোটেস্ট্যান্ট তাঁদের মধ্যেও চিন্তার পরিবর্তন লক্ষণীয়। তাঁদের অনেকেই আজ মনে করেন 'God the Father', এই একমাত্র তত্ত্ব নয়। ভগবানকে 'মা' অথবা 'বন্ধু' হিসেবেও ডাকা যায়।[৫২] একজন প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজক কিছুদিন আগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এক প্রবীণ সাধুকে এই মর্মে চিঠি দিয়েছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণকে না জানলে, তাঁর বাণীর গভীরে প্রবেশ না করলে, যীশুখ্রীস্টকে বোঝা যায় না। এইসবই হচ্ছে পরিবর্তনের লক্ষণ এবং এইভাবেই পাশ্চাত্যের মানুষ আজ বেদান্তধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। জন্মসূত্রে আমেরিকান, বর্তমানে সন্ন্যাসিনী, প্রব্রাজিকা ব্রহ্মপ্রাণা লিখছেন, বেদান্তের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এক Calvinist ধর্মযাজকের মারফত। শুধু আমেরিকা নয়, কানাডা, রাশিয়া এবং ইউরোপের খ্রীস্টান

ভক্তদের মধ্যেও একটা বড় রকমের পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে বেদান্ত সেন্টারগুলিতে ভারতীয় দর্শন তথা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের বই বিক্রি যেমন বহুগুণ বেড়ে গেছে, তেমনি বেড়েছে বেদান্ত সেন্টারগুলির সদস্যসংখ্যাও।

পূজ্যপাদ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর মুখে শোনা ঃ "বছর কয়েক আগে কানাডার ক্যালগেরিতে একটা ইউনির্ভাসিটিতে বক্তৃতা করতে গেছি। বিষয় বেদান্ত। ভাবছি এঁদের কাছে বেদান্তের কথা কি বলব ? তা যিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, সভার যিনি উদ্যোক্তা, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনাদের এখানে কি বেদান্ত নিয়ে অনেকেই পড়াশুনা করেন ?' উত্তরে ভদ্রলোক বললেন—'হ্যাঁ, বেদান্তচর্চা করেন এমন মানুষের সংখ্যা এখানে নেহাত কম নয়। তবে কি জানেন, আমাদের সমস্যা হচ্ছে আপনাদের ঐ Lady Maya-কে নিয়ে।' তখনই বুঝলাম বেদান্তকে এঁরা কতটা সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন।"[৫৩]

শুধু কানাডা নয়, রাশিয়া, জার্মানী, জাপান—সর্বত্রই আজ স্বামী বিবেকানন্দের স্বীকৃতি, জয় জয়কার। বছর কয়েক আগে রাশিয়ান বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, ভারততত্ত্ববিদ ও ভক্তজনের চেষ্টায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' গড়ে উঠেছে। ১৯৯১ সালে স্থাপিত হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা। একদা টলস্টয় স্বামীজীর রাজযোগ ও বচনাবলী পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আর আজ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাঙ্গাগড়ার চাপে দিশাহারা রাশিয়ার মানুষ সেই বিবেকানন্দের চিন্তাধারার মধ্য থেকেই বাঁচার পথ খুঁজছেন। Dr. R. B. Rybakov মন্তব্য করেছেন ঃ "Swamiji is the most suitable person to help our country today."[৫৪] কেন ? তার উত্তরে বলছেন—বিবেকানন্দের দর্শন ধর্ম ও বিজ্ঞানের নিখুঁত সমন্বয়। অন্যান্য আদর্শের মতো বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় কোথাও rigidity বা গোঁড়ামির ভাব নেই, এর মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত বিকাশের সুযোগ। এই কারণেই আমরা স্বামীজীর আদর্শে রাশিয়ায় 'মানুষ' গড়ার কাজে হাত দিয়েছি।[৫৫]

রাজযোগের কথা বলছিলাম। রাজযোগের ওপর বক্তৃতাগুলি যখন প্রথম বই হয়ে বেরুল তখন পাশ্চাত্যের মানুষের সে কী আগ্রহ ! সে কী উৎসাহ ! হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক William James তো ঐ যোগের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। রাশিয়ায় গেল সেই বই। পোপভ বলে একজন সেই বই রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করলেন। বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করতে গিয়ে রাজযোগের প্রভাব দেখে বিস্মিত। স্বামীজীর দেহ যাবার পরের বছর (১৯০৩ সালে) এক স্মরণসভায় স্বামী অভেদানন্দ বলেন : "নিষ্ঠাবান খ্রীস্টানরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, ঠিক সেই দৃষ্টিতেই তাঁরা রাজযোগকে গ্রহণ করেছেন। রাজযোগের প্রভাবে এদেশে বহু মানুষের জীবন ও চরিত্র আমূল পাল্টে যেতে দেখেছি।"[৫৬]

আমেরিকার জ্ঞানচর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দের বক্তৃতা সেখানকার বিদ্বৎসমাজকে এমন নাড়া দেয় যে তাঁরা প্রাচ্য দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে বিবেকানন্দকে নিয়োগের প্রস্তাব করেন। স্বামীজীর সেই বক্তৃতা যখন বই-এর আকারে বেরুল, ভূমিকায় Reverend C.C. Everett লিখলেন ঃ "হিন্দু দর্শনের মতো আকর্ষণীয় বিষয় খুব কমই আছে। বেদান্ত শুধু একটা কৌতূহল নিবৃত্তির বস্তু নয়, বুদ্ধির কচকচি নয়। আপাত বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত যে একত্ব, বেদান্ত আমাদের সেই সত্যকে

দেখতে শেখায়। আমরা পাশ্চাত্যের মানুষ বৈচিত্র্য নিয়েই মাতামাতি করি কিন্তু একত্ব না থাকলে বহুর অস্তিত্ব কোথায়? বিবেকানন্দের কাছে আমরা ঋণী তিনি সেই সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।"[৫৭]

আধুনিক লেখক Lex Hixon তাই সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেনঃ "গভীরতর অধ্যাত্মচেতনা, অথবা সঠিক বলতে গেলে, অদ্বৈত-বেদান্তের শুদ্ধ, সর্বজনীন চিন্তারাশির পবিত্র ধারায় বিবেকানন্দ জগতের প্রতিটি স্তরে মানুষের দেহ, মন, প্রাণ এমনভাবে নির্মল ও পুষ্ট করে গেছেন যে বিভেদের সঙ্কীর্ণতা, দ্বিধা, সংশয় অথবা গোঁড়ামির কোনও স্থান সেখানে নেই। কুসংস্কার অথবা দেশ-কাল-জাত কৃষ্টিকে একমাত্র সত্য বলে ধাপ্পা দেবার দিন ফুরিয়েছে।"[৫৮] Huston Smith, Gregory Elner অথবা Carl Jackson সকলেই এ ব্যাপারে একমত। শুধু কয়েকজন সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীই পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার করছেন না। অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই কাজে নিযুক্ত। সকলেরই প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দ।

যদি কারও মনে এ প্রশ্ন জাগে—স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রচারের ফলে কজন খ্রীস্টান হিন্দু হয়েছেন যে তাঁর সাফল্যকে আমাদের এত বড় করে দেখতে হবে? তার উত্তর এই, স্বামীজী conversion বা ধর্মান্তরিতকরণে বিশ্বাস করতেন না। খ্রীস্টানদের ধরে ধরে হিন্দু করে তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে চাননি। পরিবর্তে তিনি খ্রীস্টানদের আরও ভাল খ্রীস্টান হতে বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একটা ideal বা আদর্শের বীজ পুঁতে দিয়ে এলেন। স্বামীজী বলতেন, রাসায়নিক উপাদানগুলিকে একত্র করে দাও, সময়ে তা আপনিই রূপ নেবে। এখন তাই নিচ্ছে। সংস্কারমুক্ত বিশ্বের সব দেশের মানুষই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছেন অনুদার ধর্মমতগুলির দ্বারা নয়, বেদান্তের ভিত্তিতেই পৃথিবীতে সাম্য, শান্তি ও আনন্দময় এক সমাজ গড়ে উঠতে পারে। বেদান্তের এই সাফল্য সাম্প্রদায়িক খ্রীস্টানদেরও এখন মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা বলতে শুরু করেছেন, বেদান্তের প্রসার যদি এইভাবে চলতে থাকে, তাহলে খ্রীস্টানদের ভবিষ্যৎ কি? Robert Lawson Slater-এর মতো উদার পণ্ডিতও স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর 'The Christ We Adore নামক গ্রন্থটি পড়ে মন্তব্য করেছেনঃ "Our invasive Christendom is itself invaded "[৫৯] খোদ উত্তর আমেরিকার বুকেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চোদ্দটি বেদান্ত সেন্টার? এটা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। স্বামী রঙ্গনাথানন্দের বইটিতে তিনি মিশনারি অভিসন্ধির গন্ধ পেয়েছেন।

ছয়ঃ কিন্তু স্লেটার যাই বলুন না কেন, ঐতিহাসিকের খোলা মন নিয়ে যাঁরা বিবেকানন্দের মূল্যায়ন করবেন তাঁদের A.L. Basham-এর সঙ্গে একমত হতেই হবে। ১৯৬৩ সালে লণ্ডনে এক বক্তৃতায় অধ্যাপক Basham মন্তব্য করেছিলেন—বিবেকানন্দ আধুনিক বিশ্বের অন্যতম প্রধান রূপকার। শঙ্কর, রামানুজ, কবীর বা চৈতন্যের চেয়েও তাঁর ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। খ্রীস্টানদের বহুশত বছরের একতরফা আক্রমণের প্রত্যুত্তর এশিয়া মহাদেশ থেকে তিনিই প্রথম দিয়েছিলেন আর তার ফলেই পাশ্চাত্যের ধর্মগুলি, এমনকি জুডাইসম্, ইসলামের মতো ধর্মগুলিও ক্রমশ 'inclusive' বা উদার হচ্ছে।[৬০] ঐ একই মঞ্চে Reverend Sidney Spencer বলেছিলেনঃ আমাদের একথা

ভুললে চলবে না, খ্রীস্টধর্মই একমাত্র ধর্ম নয়। বহু মানুষের বহু ধর্মের মধ্যে একটি ধর্ম মাত্র। খ্রীস্টানরা তাঁদের ধর্মের প্রতি যতই অনুগত হোন না কেন, তাঁরা কোনমতেই প্রাচ্যের ধর্মগুলিকে এবং তাদের অবদানকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না।[৬১]

বাস্তবিক আজকের খ্রীস্টানদের অধিকাংশই খ্রীস্টধর্ম যে একমাত্র ধর্ম সেকথা মনে করেন না। ১৯৯১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর আমেরিকার লস্ এ্যাঞ্জেলস্ টাইমস একটি সমীক্ষার ফল প্রকাশ করে জানায় শতকরা পঁয়ষট্টি জন আমেরিকানের বিশ্বাস মানুষ একই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বিশ্বাস করেন ভগবান বা বিশ্বের চালিকাশক্তি প্রার্থনায় সাড়া দেন। ১৯৮৭-র এক গ্যালাপ সমীক্ষায় প্রকাশ পঁয়তাল্লিশ শতাংশ আমেরিকান কোনও না কোনও ভাবে সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। অতীত দিনের সংযত পারিবারিক জীবনের প্রতি আগ্রহও তাঁদের বাড়ছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের হার কমছে। বিরাশি শতাংশ পূর্ণবয়স্ক আমেরিকান আজ আর 'Redemption Theory'-তে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন যে উদ্যমী, ভগবান তাকেই সাহায্য করেন। মানুষ তার নিজের ভাগ্য নিজেই রচনা করে, এই নীতিতেই তাঁরা এখন অধিকতর আস্থাবান। স্থানীয় চার্চের সদস্য হতেই হবে, এইরকম একটা তাগিদ তাঁরা এখন আর তেমন অনুভব করেন না। খ্রীস্টানদের মধ্যে এইরকম একটা সর্বাত্মক উদারতার স্বপ্নই স্বামীজী দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন আজ সফল হতে শুরু করেছে।

সাতঃ ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, এ্যাঙ্গলিকান—সব চার্চের পালেই আজ উদারতার খোলা হাওয়া লেগেছে। কাগজ-কলমে 'Exclusivism'-এর পথ ছেড়ে আজ প্রত্যেকেই কম বেশি 'Inclusivism অর্থাৎ সকল ধর্মকে, সকল মত ও পথকে স্বীকার করার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছেন বা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এর শুরু 'Nostra Aetate' বা 'Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions'-এর মধ্য দিয়ে। ষষ্ঠ পোপ পল ১৯৬৫-র ২৮ অক্টোবর ঘোষণা করলেনঃ "The Catholic Church rejects nothing that is true and holy in these religions. She regards with sincere reverence those ways of conduct and of life, those precepts and teachings which...often reflect a ray of that truth which enlightens all men." পোপ আরও বললেনঃ চার্চ অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে যা কিছু ভাল, যে সমস্ত মূল্যবোধ মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে, তা রক্ষা ও পুষ্ট করার চেষ্টা করবে।

পোপের এই ঘোষণার ফলশ্রুতি দেখি Thomas Marton-এর চিন্তা ও ধারণায়। বিশ্বজনীন চেতনার ডাক দিয়ে ১৯৬৮-র অক্টোবরে ক্যালিফোর্ণিয়ায় একটি ভাষণে তিনি বললেনঃ "আমরা একটা যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান আজ একান্ত প্রয়োজনীয়।" মার্টন-এর এই ভাষণ পাশ্চাত্যকে চমকে দিয়েছিল। ঐ বছরই কলকাতায় মার্টন-এর একটি বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। তাঁর অকালমৃত্যুর পর সেই বক্তৃতার নোটস The Asian Journal-এ ছাপা হয়েছে। সেখানে মার্টন বলেছেনঃ "I come (To the East) as a pilgrim who is anxious to obtain not just information, not just 'facts' about

monastic traditions, but to drink from ancient sources of monastic vision and experience. I seek... to become a more enlightened monk."[৬২] মার্টন আরও বলেছেনঃ খ্রীস্টান সাধুরা যাতে উন্নততর সন্ন্যাসজীবন যাপন করতে পারেন সেইজন্যই এই আদান-প্রদান অত্যন্ত প্রয়োজন।

১৯৭৯ সালে জেনিভাতে World Council of Churches-এর এক গুরুত্বপূর্ণ সভা হয়। সেখানেও Dialogue বা আদান-প্রদানের ওপর জোর দেওয়া হয়। ঠিক তার দশ বছর পর, ১৮ জুন, ১৯৯০ সালে ঐ Council 'Bear Statement' নামক এক ঘোষণায় বলেনঃ 'Inter-religious dialogue is... a two-way street.' Christians must enter into it in a spirit of openness prepared to receive from others which on their part, they give witness of their own faith. Authentic dialogue opens both partners to a deeper conversion to the God who speaks to each through the other."

খ্রীস্টান চার্চগুলির এই যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁদের 'ডগমা' গুলির যে তাত্ত্বিক পরিমার্জনা, এসব বিবেকানন্দ ঠিক একশ বছর আগে যা বলে গেছেন, সেই পথেই এগিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও এগোবে। আমরা বিবেকানন্দকে ভালবাসি, সেইজন্যই একথা বলছি, তা নয়। Dr. K. P. Aleaz এর মতো খ্রীস্টতত্ত্ববিদও এই কথা বলছেন। তিনি সম্প্রতি মন্তব্য করেছেনঃ "...there is a paradigm shift (i.e. change in the entire constillation of beliefs, values and techniques) taking place in the Christian understanding of mission and this is in line with Swami Vivekananda's exhortation for a radical change."[৬৩]

পরিশেষে একথা বলতে চাই, বিবেকানন্দ যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে খ্রীস্টধর্মের মর্মমূলে একটা গভীর স্পন্দন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তার প্রধান কারণ এই তিনি ভগবান যীশুর অলোকসামান্য দিব্য সত্তাটিকে স্পর্শ করেছিলেন। সেই সত্তা এবং তাঁর আপন সত্তা একই বিন্দুতে অন্বিত হয়েছিল। সেই সর্বজনীন সত্তার দীপ্তি পাশ্চাত্যে থাকাকালে তাঁর ভিতর থেকে এমন তীব্রভাবে ক্ষরিত হত যে সেখানকার মানুষ সেই শক্তির প্রভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়তেন। অনেকেই ভাবতেন—ভগবান যীশু কি আবার বিবেকানন্দমূর্তিতে আবির্ভূত? বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের কিছুদিন পর তাঁরই এক বিশিষ্ট খ্রীস্টান বন্ধু ও অনুরাগী ডাঃ এম. এইচ লোগান তাই একটি চিঠিতে স্বামী অভেদানন্দকে পরম শ্রদ্ধাভরে লিখেছিলেনঃ "আমার কাছে তিনি ক্রাইস্ট ছিলেন। তাঁর চেয়ে বড় মাপের মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর কখনও আসেননি। তাঁর মুক্ত, বিশাল হৃদয় যেন আর সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায়, ছাপিয়ে যায়। সূর্যের প্রভার মতো দুর্দমনীয় তাঁর সেই তেজ এবং সমদৃষ্টি এবং স্বর্গের বাতাসের মতই উদার ও সর্বত্রগামী তাঁর প্রেম।...চিন্তার জগতের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীগুলিকে বিবেকানন্দ একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেছেন। চিন্তানায়কেরা তাঁর কাছে নতজানু হয়েছেন দেখেছি; আর যাঁরা অপেক্ষাকৃত সাধারণ, তাঁরা তাঁর গেরুয়ার প্রান্তভাগটিকে সশ্রদ্ধভাবে চুম্বন করেছেন। বিবেকানন্দের মতো আর কোনও মানুষই দেহে থাকতে এত সম্মান, শ্রদ্ধা পাননি।... যেখানেই তিনি গেছেন, সর্বত্রই তাঁর দিব্য উপস্থিতি একটা পরম প্রশান্তি ঢেলে

দিত। তাঁর কণ্ঠে জাদু ছিল; এমনই জাদু যা শুনে আমার হৃদয়ের সব অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ চিরতরে মুছে গিয়েছিল। আমাদের মধ্যে তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরা নিশ্চয় একদিন না একদিন উপলব্ধি করবেন তাঁরা ঈশ্বরের যথার্থ একজন অবতারকেই দর্শন করেছিলেন। তাঁকে দেখে আমরা অপর সব দেবদেবীকে ভুলেই গিয়েছিলাম।"[৬৪]

ভবিষ্যতে যেদিন খ্রীস্টধর্মের ইতিহাস নতুন করে লেখা হবে সেদিন দেখা যাবে সেই ইতিহাসের একটি অধ্যায় জুড়ে আছেন ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের ভাষার বৈশিষ্ট্য

বার্ণিক রায়

প্রত্যেক ভাষারই একটা নিজের বৈশিষ্ট্য আছে; এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে জাতীয় চরিত্র ব্যক্ত হয়। বাইরের বিদেশী উপাদান এই বৈশিষ্ট্যে কিছু রূপান্তর ও বৈচিত্র্য আনে ঠিকই কিন্তু অন্তর্নিহিত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থেকেই যায়। এই কারণে ভারতীয়দের ইংরেজী যত মারপ্যাঁচযুক্ত ও কেরামতিওলা হোক, তা ভারতীয় শিক্ষিত পাঠকদের বুঝতে কষ্ট হয় না, সহজেই সেই বাক্য বোধ্য। কিন্তু ইংরেজের বাক্যগঠনে পদ সহজ ও সুবোধ্য হলেও বিশেষ ভঙ্গি ও গঠনের জন্যে ভারতীয়দের ইংরেজী থেকে আলাদা; এই আলাদা হবার কারণ বাক্যের গঠনের মধ্যে জাতিগত পরিচয় রয়ে গেছে।

বাংলার বাক্যগঠন সংস্কৃত, গ্রীক বা জার্মানের মতো নয়, সেখানে শব্দ বা ধাতুরূপ থাকবার ফলে বাক্যে পদ যেখানে ইচ্ছে সেখানে বসানো যায়; লক্ষ্যটা থাকে সন্ধি, সমাস ও ধ্বনির ওপর, একটা বিশেষণ যে কোথায় বসে, কীভাবে বসে, তা আবিষ্কার করে পুলকও লাগে, বিভ্রান্তিও আসে এবং অস্পষ্টতাও আসে; গায়ত্রীমন্ত্রের 'তৎ' এই পদের যথার্থ বোধগম্যতা নিয়ে নানা দার্শনিক প্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছে, সায়ন 'তৎ'-কে সবিতার বিশেষণ করেই ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু সবিতার সেই বরেণ্য অর্থ করলে আমাদের গায়ত্রীমন্ত্র সবিতারও পরের স্তরে ব্রহ্মকে ইঙ্গিতবহ করে তোলে।

বাংলার বাক্যগঠনে উদ্দেশ্য ও বিধেয় যেমন আছে, তেমনি আরেকটি রীতি প্রায় সুনিশ্চিত, সেটি হল কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার ক্রমিক বিন্যাস ও যথাযথ স্থাপন। বাংলা বাক্যের মধ্যে পদের নৈকট্যের অবস্থানে সামান্য পরিবর্তন হলে অর্থের সুস্পষ্টতা হারিয়ে যায়; কবিতায় পদ-পরিবর্তনে এই নৈকট্যকে অবজ্ঞা করলে একটা অস্পষ্টতার মুগ্ধ আনন্দ নতুনের ও বিস্ময়ের ফলে সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু গদ্যে পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় হয় কথা বলার মধ্য দিয়ে, সেখানে 'আকাঙ্ক্ষা', বাক্যের অন্তর্গত পদের সম্বন্ধানুযায়ী যথাযথ সংস্থান ও 'অর্থসংগতি' অতীব প্রয়োজন এবং যে গদ্যের মধ্যে স্পষ্টতা, গাম্ভীর্য ও মাধুর্য সমভাবে অন্তর্নিহিত থাকে, সেই গদ্য স্বাদিষ্ট ও জনপ্রিয়। পদগুলির সংস্থানই সেই দিক থেকে বাক্যে প্রাধান্য পায়। সংস্থানের মধ্য দিয়েই পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পদসংস্থানজাত নিবিড় সম্পর্কের মধ্য দিয়েই গদ্য লেখকের ব্যক্তিত্ব, কম বা বেশি, নির্ণীত হয়। পদসংস্থান যেমন একান্ত আবশ্যিক তেমনি বাক্যের অন্তর্গত পদের

নির্বাচন ও সংকলনও বিশেষ মূল্যবান। কারণ লেখকের নির্বাচিত পদের অভিপ্রেত অর্থ যদি যথার্থরূপে পাঠক ও শ্রোতা ধরতে না পারে, সমভাবে লেখকের ঈপ্সিত অর্থের সঙ্গে একাত্ম না হয়, তাহলে অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা, দুরূহতা পাঠক ও লেখকের মধ্যে থেকেই যাবে।

বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩ সালে। তিনি যখন বড় হয়েছেন, ভাষা শিখছেন, তখন বাংলা সাহিত্যে গদ্যে ভাষা-আন্দোলনের পর্ব শেষ হয়ে গেছে। সাময়িক ও সংবাদপত্র বাংলা গদ্যকে সবকিছুর উপযোগী করে তুলেছে। সকলের কাছে বোধগম্যতার জন্যে এই ভাষায় স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা এবং সর্বজনীনতা এসেছে। বাক্যের মধ্যে এসেছে সুসামঞ্জস্য, অতি দীর্ঘ বাক্য সংবাদপত্রে ব্যবহৃত হলে ভাষার সর্বজনীনতা ও স্পষ্টতা হারায়। বিদ্যাসাগর বাক্যের সামঞ্জস্য শুধু আনেননি ধ্বনি ও সঙ্গীতের এবং ছেদচিহ্নের যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা ভাষাকে সর্বজনের উপযোগী করে তুলেছেন, বিচিত্র ও বিভিন্ন করে তুলেছেন তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী। সঙ্গীতের প্রবাহ এনেছেন মাঝে মাঝে বিরাম ও ঝোঁকের সাহায্যে এবং অনুপ্রাসময় (যদিও কখনও প্রকট নয়) পদের ব্যবহারে। তৎসম শব্দের সমন্বয়ে ধ্বনির মায়াবী রঙ কখনও অস্পষ্ট জাদুর লোকে আমাদের টেনে নিয়ে যায় কিছু অপ্রচলিত শব্দ এবং মুদ্রাদোষ থাকলেও ; বিদ্যাসাগরেব ভাষা অনুবাদকের নয়, সৃষ্টিময় এবং তর্কের ক্ষেত্রে যুক্তির বিন্যাসে পরিণামী, কৌতুকে ব্যঙ্গে শুষ্কতাকে বর্জন করেছে—তিনি নিজে আবেগপ্রবণ, তাই আবেগ তাঁর লেখায় সহজেই আসে। আবার আবেগকে তিনি উদ্বোধিতও করতে চান পাঠকেব কাছে বক্তব্যকে স্থায়ী করবার জন্যে ; তাঁর বাক্যে বুদ্ধি ও আবেগ একই সঙ্গে কাজ করে, এই কারণেই পুরো বাক্যটা অবিভাজ্য সমগ্র বলে মনে হয়। তার গঠন, সাংগীতিক ধ্বনি ও দৈর্ঘ্য সব মিলে সুসমঞ্জস ও প্রকাশক্ষম। প্রকাশের অনিবার্যতাই ভাষার শেষ কথা, তার মধ্যে এই গুণগুলি থাকা চাই, সেই সঙ্গে থাকা চাই গতিবেগ, বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্য আসে প্রাধান্য দেবার হেতু থেকে, প্রাধান্যের সঙ্গে সাঙ্গীতিক প্রবহমানতা এবং প্রকাশের অনিবার্যতা জড়িত। মাঝে মাঝে দুই বাক্যের মধ্যে অথবা একই বাক্যে বিপ্রতীপতা বা বিরুদ্ধ শক্তিকে সংস্থিত করতে হয়, সমান্তরালতা আনতে হয় সামঞ্জস্যের জন্যে, কৌতূহল অক্ষুণ্ণ রাখা গদ্যশিল্পীর অবশ্য কৃত্য। এই কারণেই একটি বাক্যের য়ুনিটে যেমন শব্দের বিন্যাসের ক্রম থাকে, শব্দের বিন্যাসে গঠনের রূপ ফুটে ওঠে, তেমনি ছেদচিহ্ন বিরাম দেয়, শ্বাসের অর্থের সুস্পষ্টতাকেও আনে ; এরই অন্তর্নিহিত হয়ে বাক্যের য়ুনিটকে সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য দেয় সঙ্গীতের প্রবহমানতা, এই প্রবহমানতার মধ্যে থাকে কালের স্রোত। সঙ্গীতের এই প্রবহমানতা বাক্য থেকে অন্য বাক্যে, বাক্যসমূহ থেকে অন্য অনুচ্ছেদে, অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদে সঙ্গীতের সুরের উত্থানপতনের মতো এগিয়ে গিয়ে পরিণামে পৌঁছয়। গঠন যেমন অর্থ দেয়, ছেদচিহ্ন তেমনি কালকে বয়ে আনে, সঙ্গীতের উত্থানপতন ধ্বনিত করে, ফলে একটি বাক্যের অর্থ পদের নির্দিষ্ট অর্থকে ছাড়িয়ে সমগ্রতায় নতুন হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের ভাষা আমাদের এক নতুন জগতে নিয়ে যায়।

বিবেকানন্দ এ মনীষীর বিদ্যালয়েই পড়াশোনা করেছেন। সেইসঙ্গেই তিনি দেখেছেন 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা ; সিমলার অধিবাসী বিবেকানন্দ—পশ্চিমে সামান্য গেলেই কালীপ্রসন্ন সিংহের পাড়া, সেখান থেকে উঠে এসেছে কলকাতার কথ্য ভাষার সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি মস্করার ভাষা। এরপরেই বঙ্কিমের ভাষা, যার মধ্যে তৎসম শব্দ আছে কিন্তু বাহুল্য

নেই। তৎকালীন মুখের ভাষার সঙ্গে ধ্বনিগত সুষমা রক্ষা করে সর্ব বিষয়ে প্রকাশক্ষম ভাষা তৈরি করলেন, যদিও এর ভিত পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের ভাষায়ই।

এঁদের সকলেরই রূপ বিবেকানন্দের গদ্যে দেখা যায় এবং সকলকে মিলিয়েই আপন বীর্যবান ব্যক্তিত্বের স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ভাষায়।

বিদ্যাসাগরীয় রীতির নমুনা মেলে 'হিন্দুধর্ম ও রামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটির মধ্যে ঃ

> "অলৌকিক জ্ঞানবেত্তৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস-পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদিদেশীয় ধর্মপুস্তকসমূহে যদিও বর্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্যজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ 'বেদ' নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্মপুস্তকের প্রমাণভূমি।"

'জ্ঞানবেত্তৃত্ব' 'অস্মদ্দেশীয়' 'ম্লেচ্ছাদিদেশীয়' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ বিদ্যাসাগরের অনুষঙ্গ আনে। এই প্রবন্ধেই আছে 'সৎশাস্ত্রবিগর্হিত সদাচারবিরোধী', 'মায়া-পার-নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া', 'বিগতাময় হইয়া' ; 'ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্তমান গভীর বিষাদ-রজনীর ন্যায়,'—এইসব শব্দনির্বাচন ও পদবিন্যাস এবং সঙ্গীতপ্রবাহ সবই পূর্বসূরির কাছ থেকে পাওয়া। সেইসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে বাগ্মীর আবেগ, জাতীয় ও ইতিহাসচেতনা ঃ "দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর।... আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক—এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।" প্রভু শব্দটিকে জোর দেবার জন্যে তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রভুর সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্কও আলাদা অথচ সম্মিলিতভাবে দেখানো হয়েছে। প্রথমে যে যুক্তিসিদ্ধ রীতিতে প্রবন্ধটি শুরু হয়েছিল, শেষে তা আবেগের প্রবাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর গদ্যরচনায়, সেন্টিমেন্টালিটি নয়, দেশ, জাতি ও মানুষের প্রতি ভালবাসায় এক বিশুদ্ধ আবেগ সমুদ্রতরঙ্গের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে; এবং দেশ, জাতি মানুষের জন্যেই ইতিহাসচেতনা তাঁকে সর্বদা সজাগ রেখেছে—যে কোনও রচনার মধ্যেই এই ইতিহাসচেতনা সুস্পষ্ট ঃ "ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা।"[১] ভদ্রলোক সম্বন্ধে বিষোদ্গার বিবেকানন্দই সম্ভবত জোরের সঙ্গে প্রথম করেছিলেন ঃ "কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না!"[২] এখানকার ভাষায় অনুসরণ নেই, তৎসম শব্দের বাহুল্য একেবারে কম ; 'রুধিরশোষণের দ্বারা' 'প্রথিত' এই শব্দগুচ্ছ ছাড়া আর কোথাও অপ্রচলিত শব্দ নেই। যদিও ক্রিয়া ও সর্বনাম পদ সাধু ভাষার।

বিবেকানন্দের বাক্যের একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, বাক্যের মধ্যে সংস্কৃত ও বাংলা ইডিয়ম ব্যবহার করবার প্রবণতা ঃ "একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাধারণ আন্দোলনের দ্বারা কোনও মহৎকার্য সাধন করার চেষ্টা বৃথা, 'মাথা নেই তার মাথা ব্যথা' ; সাধারণ কোথা?" "এইজন্যই বোধহয় আমরা প্রায়ই বঙ্গভূমে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' প্রত্যক্ষ করি।"

মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্দের বাংলা করেছেন 'ভৃত্যত্ব' (slavery), বাক্যও গঠন

করেছেন ইংরেজী বাক্য অনুসরণে। বিশেষণ ও ক্রিয়ার একত্র যোগঃ 'প্রাপ্ত হইবার জন্য' কখনও ক্রিয়ার অতীতকালে 'দিলে' 'করলে' পদের ব্যবহার দেখা যায়; অপ্রচলিত সংস্কৃত যেমন বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করে ব্যবহার করেন, 'উপরত' মনের রাগকে 'উপরত করিয়া' (উপ+রম্+ক্ত) অর্থাৎ নিবৃত্ত করে; তেমনি আরবী শব্দ ব্যবহার করতেও পেছপা ননঃ "শত শত বৎসর কসরত করিয়ে আমাদের আর্যেরা এমনি কাওয়াজ করিয়ে দেছেন যে, আমরা এক ঢঙে দাঁত মাজি, মুখ ধুই, খাওয়া খাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।" 'কসরত' 'কাওয়াজ' যথাক্রমে 'অভ্যাস' ও 'চেষ্টা'; যদিও সত্যেন্দ্র-দত্তীয় 'দেছেন' বাক্যটিকে আল্গা করে দিয়েছে। প্রায়ই দেখা যায় তিনি মিশ্রভাষা ব্যবহার করেছেন 'জিজ্ঞাসা করিতেছেন,' তারপরেই আছে, 'ক্ষিপ্র উত্তর এল'; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি ইংরেজীর মতইঃ ক্ষিপ্র উত্তর এলঃ 'সুর তানের আমার আবশ্যক কি, আমি ঠাকুরজির মন ভিজুচ্ছি।' এই অংশে যেমন সরস কৌতুক আছে তেমনি ভোলাপুরী বেদান্তীর টুকরো কাহিনীতে ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে। ভোলাপুরী কোনও প্রকার কাজ করেন না। সব কাজ পূর্ব জন্মে সেরে এসেছেন কিন্তু ভিক্ষার পরিপাটিতে ব্যাঘাত হলে গৃহস্থকে ঘৃণ্য জীব বলতে থাকেন, কেননা তাঁর সমুচিত পূজা গ্রামের লোক দেয়নি। এরা ধরণীর ভার বৃদ্ধি করছে। কথ্য শব্দের শক্তি এই বাক্যটিতে চমৎকার প্রকাশ পেয়েছেঃ "মাতাল, বেশ্যা, চোর, দুষ্টদের মহাপুরুষ কেন দূর দূর করিয়া তাড়াইতেন না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছাঁদি ভাষায় সানাইয়ের পোঁর সুরে কেন কথা কহিতেন না।" কথ্যশব্দে বাস্তবের ও প্রত্যক্ষের ছবি সুন্দর ফুটে উঠেছে এবং 'ছাঁদি ভাষা' ছাড়া অন্য কোনও শব্দ দিলে শব্দের রূপ, অর্থ ও শক্তি কোনটাই এত যথাযথভাবে প্রকাশ পেত না।

তিনি মূলত বাগ্মী। বাগ্মীর কাজই হল নিজের অভিপ্রেত চিন্তা ও ইচ্ছাকে অন্যের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়া। বিবেকানন্দ দেশ, জাতি এবং সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসায় নিজেই আবেগপ্রবণ, দেশের দুঃখ-দারিদ্র্যে কেঁদে উঠতেন বুদ্ধের করুণাময়তায়, এই আবেগপ্রবণতার সঙ্গে বাগ্মীর আবেগধর্মিতা যখন মিশে যেত, তখন ভাষা হয়ে উঠত সমুদ্রগর্জনের মতো। এখানেই কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রভেদ; দুজনেই হিন্দু মিশনারি অর্থাৎ ধর্মপ্রচারক কিন্তু বিবেকানন্দের ধর্মে মানুষই প্রধান, ঈশ্বর মানুষের মধ্যে এসে মানুষই হয়ে গেছেন। জীবে ও শিবে কোনও পার্থক্য নেই; মানুষের প্রতি এই ভালবাসা ও প্রেমেই তিনি এযুগের মনীষী। এই প্রেম ও ভালবাসাই তাঁকে কর্মে বীর করে তুলেছে, তাঁর বীর্যবত্তা নিঃস্বার্থপরতায়। তিনি অল্পবয়সেই গুরুর কৃপায় আত্মাকে লাভ করেছিলেন। তাই কর্মী হলেও তিনি সন্ন্যাসী, আত্মদ্রষ্টা বলে বীর। এই কর্মিষ্ঠতা, বীরত্ব ও আত্মসমাহিতভাব সবই বিচিত্রভাবে তাঁর লেখায় আপন ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে; বিষয় ও উদ্দেশ্য অনুসারে তাঁর লেখাও হয়েছে বিচিত্র ধরনের। এদিক থেকে কেশবের সঙ্গে তাঁর কোনও তুলনাই চলে না। তাঁর ব্যবহারিক বেদান্ত তাঁর ব্যক্তিত্বেরই অতুলনীয় দানঃ "'জীবাত্মা'তেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, পিপীলিকা হ'তে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে সেই 'আত্মা,'—তফাত কেবল প্রকাশের তারতম্য, 'বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ'—(পাতঞ্জলযোগসূত্রম্)। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশ কাল পেলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু বিকাশ হোক বা না হোক, সে শক্তি প্রত্যেক

জীবে বর্তমান—আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত।"[৩]

এই বোধ ও চৈতন্য থেকেই তাঁর লেখার শক্তি ও দৃঢ়তা এসেছে, এই বোধ ও চৈতন্যের মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্ব। যদিও এই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে বাক্যে পদের নির্বাচনে ও বিন্যাসে। শুধু তাই নয়, পদনির্বাচন ও গঠনের মধ্যেই তাঁর বিশেষ অঞ্চল ও সময়ের মুদ্রা দেখতে পাওয়া যায় এবং তাঁর উদ্দেশ্যও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, উদ্দিষ্ট পাঠক-সমাজও নির্ধারিত হয়ে যায়। উদ্দেশ্য ও বিষয় যেমন লেখার রীতির প্রভেদ ঘটায়; উদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্বতন্ত্রতাও বিভিন্ন রীতিকে ফুটিয়ে তোলে। সরলা দেবী ও মিস নোবলকে লেখা চিঠিগুলিতে ধর্মীয় প্রবন্ধের ছোঁয়া আছে। ব্রহ্মানন্দকে লেখা চিঠির ভাষা অন্যরকমঃ "তুমি ভয় খাও কেন? ঝট্ করে কি দানা মরে? এই তো বাতি জ্ব'লল, এখনও সারা রাত্রি গাওনা আছে।"[৪] প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা চিঠিতে অন্যভাব, ভাষা ভিন্ন, বিবেকানন্দ কদাচিৎ উপমা ব্যবহার করেন, এখানে করেছেনঃ 'কিয়ৎকালের জন্য যেন বাদল সরিয়া যায় ও সত্যসূর্যের প্রকাশ হয়।'[৫] শেষের আগের অনুচ্ছেদটি বিবেকানন্দের সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের দিক থেকে মূল্যবান যেমন, তেমনি মুখের ভাষাকে চিঠির লেখার ভাষায় এক করে দিয়েছেন; সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভাষার শুধু অনুসরণ করেননি, বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শকেও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই সূত্র ধরেই বিবেকানন্দের জীবনে দ্বন্দ্ব সন্ন্যাসের সঙ্গে প্রেমময় কর্মেরঃ

> "আর এক কথা বুঝেছি যে, পরোপকারই ধর্ম, বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামো—নিজের মুক্তি-ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়েছে, সেই মুক্ত হয়, আর যারা 'আমার মুক্তি, আমার মুক্তি' ক'রে দিনরাত মাথা ভাবায়, তাহারা 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হয়ে বেড়ায়, তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি।"[৬]

এই জাতীয় ভাষাতেই বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য। তিনি সামনে কথা বলছেন যেন দেখতে পাচ্ছি এবং এখনও শুনছি। এই কথ্য ভাষা গুরুর কাছ থেকেই পাওয়া।

অনুবাদক হিসেবে বিবেকানন্দের কৃতিত্ব কম নয়, Imitation of Christ-এর অনুবাদ করতে গিয়ে তার সূচনায় তিনি বলেছেনঃ 'অনুবাদ যতদূর সম্ভব অবিকল করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না।' বিবেকানন্দ মূলানুগ হতে চাইছেন। কিন্তু অথোরাইজড় কিঙ্ জেমস্ ভার্সনের বাইবেলের সঙ্গে বিবেকানন্দের অনুবাদ মিলছে না; ভাবটা শুধু আসছে, And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge ; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. I Corinthians, 13 : 2 'যদি সমগ্র বাইবেল এবং সমস্ত দার্শনিকদিগের মত তোমার জানা থাকে, তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে, যদি তুমি ঈশ্বরের প্রেম এবং কৃপাবিহীন হও।' কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বাইবেলের সঙ্গে 'গীতা' 'রামগীতা' 'বিবেকচূড়ামণি' 'মণিরত্নমালা'র সঙ্গে তুলনামূলক সাদৃশ্য বিচার।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার আদর্শ বিবেকানন্দেরও, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার প্রতিধ্বনি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধের বইয়ের প্রথমেই শোনা যায়ঃ

> "সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্বকারুকার্যমণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্মরপ্রাসাদ ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে ভগ্নমৃন্ময়প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটিরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ ছিন্নবসন যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী... ; মধ্যে মধ্যে সমধর্মী সমশরীর গো-মহিষ-বলীবর্দ ; চারিদিকে আবর্জনারাশি—এই আমাদের বর্তমান ভারত।"

এ যেমন ধ্বনিঝঙ্কৃত তৎসম শব্দের সমারোহ, তেমনি বিশেষ্যের আগে বিশেষণ বাহুল্য ক্লান্তি আনে ; 'মর্মরপ্রাসাদে'র পূর্বে বহুশব্দযোগে তিনটি বিশেষণ ; বিশেষণের প্রতি বিবেকানন্দের প্রীতি প্রায়শ দেখা যায়। তৃতীয় অনুচ্ছেদে কোনও ক্রিয়া নেই, বিশেষণগুলি জড়ের মতো স্থির ; হয়তো নিষ্ক্রিয় নিষ্প্রাণ ভারতবাসীর জড়ত্ব ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই এইরকম শব্দ চয়ন করেছেন বিবেকানন্দ—কিন্তু বাক্যের সামঞ্জস্য, গতি, দৃঢ়তা, সৌন্দর্য, সুরের উত্থানপতন তেমন দেখা যায় না। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র অন্যত্র ভাষা একান্ত মুখের, যেন কথকতার, একজন বলছে, অন্যেরা শুনছে এবং এখানেও ক্রিয়াপদ তেমন নেই, বস্তু ও ঘটনার সমারোহ, পারির রীতিনীতি ও সামাজিক বর্ণনায় এর ভাষা ঃ

> "স্থানে স্থানে জয়স্তম্ভ, বিজয়তোরণ আর বিরাট নরনারী সিংহাদি ভাস্কর্যমূর্তি। মহাবীর প্রথম ন্যাপোলেঅঁর সময়ের স্মারক এক সুবৃহৎ ধাতুনির্মিত বিজয়স্তম্ভ। তার গায়ে ন্যাপোলেঅঁ-র সময়ের যুদ্ধবিজয় অঙ্কিত। ওপরে তার মূর্তি। আর এক স্থানে প্রাচীন দুর্গ বাস্তিল (Bastile) ধ্বংসের স্মারক চিহ্ন।"

পরপর পাঁচটি বাক্যে কোথাও ক্রিয়া নেই। বিবেকানন্দ বস্তুর সমাহার ঘটিয়েছেন। বাক্যগুলি দীর্ঘ নয়, সংক্ষিপ্ত, কাটাকাটা, ফলে কিছুটা দ্রুততা এসেছে এবং মুখের ভাষা ব্যবহৃত ; এক বইতেই কতরকম রীতি। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'পরিব্রাজক'-এ তাঁর পর্যবেক্ষণ কৌতূহল এবং প্রতিটি বস্তুর নিপুণ বিশ্লেষণ, প্রতিটি জাতির বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রভেদ অল্প কথায় তুলনায় স্পষ্ট করেছেন।

বিবেকানন্দের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য,—বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার পর বর্ণিত বিষয়ের একটি সাধারণ বা সামান্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা। ফরাসীদের নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কথা, হিন্দুর চোখ দিয়ে দেখে, বলবার পর একটি বাক্যে প্রত্যেক জাতির স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন ঃ

> "এ সকল কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জাতির এক একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেইখানটা হতে সে জাতির রীতিনীতির বিচার করতে হবে। তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা—এই দুই ভুল।"[৭]

এই সঙ্গে কৌতুক ও মজা মাঝে মাঝে অন্য স্বাদ নিয়ে আসে ঃ

> "যেমন আমাদের বে, পুজো সর্বত্র নর্তকীর আগমন। ইংরেজ ওলবাটা-মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে। সদা নিরানন্দ, ওদের মতে এ বড্ডো অশ্লীল, কিন্তু থিয়েটারে হলে আর দোষ নেই।"

'বে' 'ওলবাটা' শব্দগুলি হুতোমের মস্করা স্মরণ করায়। একটি পুরো বাক্যের য়ুনিটের সমগ্রকে চারটি 'কমা'—এই ছেদ চিহ্ন দিয়ে বিরামে কালের দীর্ঘতাকে টেনে আনা হয়েছে

এবং কমার দ্বারা বদ্ধ শব্দগুচ্ছ ক্ষুদ্র বাক্যের মর্যাদা পায়, মনে হয় যৌগিক বাক্য রচিত হচ্ছে একটি বাক্যে। কম-বেশি দৈর্ঘ্যের পরিমাপ প্রায় এক রূপ। ফলে একপ্রকার সঙ্গীতের প্রবহমানতা বা 'রিদ্‌ম' সূক্ষ্মভাবে শোনা যায়; পদের মধ্যে ধ্বনির পুনরাবৃত্তিও সক্রিয়, 'অন্ধকার দেশে' 'ধ' 'দ'-এর সাদৃশ্য 'সদা নিরানন্দ' শব্দগুচ্ছে 'দ' ও 'ন'-এর অনুপ্রাস কাজ করছে কিন্তু এগুলি থাকা সত্ত্বেও বাক্যের সুষমামণ্ডিত সৌন্দর্য-মাধুর্যচিত্র আসেনি। তথ্যজ্ঞাপনই প্রাধান্যলাভ করেছে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পুস্তকে ক্রিয়াপদ যেমন চলিত, তেমনি 'পরিব্রাজক' পুস্তকের ক্রিয়াপদও চলিত, ভাষাও মুখের ভাষার আদলে, হুতোমি প্রভাব শব্দনির্বাচনে চেনা যায় এবং আঞ্চলিকতা, সময় ও ব্যক্তির রুচিও এখানে নির্ধারিতঃ 'দ্যাল' (দেওয়াল), 'বে' (বিবাহ), 'মলো' (মরলো), 'কলকেতা ফর্দা' (ফাঁকা অর্থে), 'পাতকো' (পাতকুয়ো), 'শোর' (শুয়োর) 'খ্যাঁদা', 'ন্যাতাচোতা', 'ঝাব্বাঝব্বা', 'সিঙ্গি', 'নিচু-আঁব' প্রভৃতি শব্দে বিবেকানন্দের মর্জি, মনোভাব ও তাঁর অঞ্চলের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিবেকানন্দের ভাষা যে শুধু ওজোগুণান্বিত তা নয়; বিষয়, উদ্দেশ্য ও ব্যক্তি অনুযায়ী বিচিত্র। বঙ্কিমের মতো তিনিও মনে করতেনঃ "বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য—সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই করিবে।...বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজী, ফার্সি, আর্‌বি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।"[৮] অন্যত্র বলেছেন বঙ্কিমঃ "সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।"[৯] বঙ্কিমের সরলতা ও স্পষ্টতাই ভাষার ব্যাপারে বিবেকানন্দকে প্রেরণা জুগিয়েছে, সৌন্দর্য নয়; সৌন্দর্য আনতে গেলে প্রতিটি বাক্যে, বাক্য থেকে অনুচ্ছেদে, বহু অনুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সমগ্র প্রবন্ধে পদের নির্বাচন ও সাজসজ্জায় ভাবে ভঙ্গিতে, স্বরের উত্থানপতনে, ছেদচিহ্নের বিরামকালের প্রবাহে পদের স্থানপরিবর্তনে, নতুন আচারব্যবহারের নির্দেশে একটা সুষমাময় সংযম অবশ্য পালন করতে হয়। একথা ভুললে চলবে না, বিশিষ্ট বাক্যগঠনে অন্বয়ের মধ্য দিয়ে একটা জাতির ও বিশিষ্ট ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব ও আচার-ব্যবহার নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই কারণে বাঙালীর লেখা ইংরেজী বাক্য বাঙালীর কাছে যত সহজ মনে হয়, ইংরেজের লেখা ইংরেজী বাক্য তত সহজ মনে হয় না। বিশেষ ইডিয়মের সূক্ষ্ম অর্থ ও তাৎপর্য পুরোটা সব সময় ধরা যায় না। বাক্য বা লেখার মধ্যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়ে যায়। তাই

নির্মাণ প্রচেষ্টা আবশ্যক হয়ে পড়ে বচনের সঙ্গে, কথ্য ভাষার সঙ্গে। ম্যাক্সমূলারকে লেখা চিঠিতে কেশবচন্দ্রের উক্তি বিবেকানন্দের আদর্শ সম্বন্ধেও প্রযোজ্যঃ প্রাচ্যের প্রকৃতির মধ্যে গাঢ় অনুভূত উচ্চারণে আছে সীমাহীন উচ্ছ্বসিত ভাষার ব্যবহার নিহিতঃ How can I, my friend, destroy my Asiatic nature, how can I discard the language of poetry and emotion and inspiration which is my life and nature ?

বিবেকানন্দের ভাষাতেও সরলতা, স্পষ্টতা, অনুভূত উচ্চারণ, উচ্ছ্বসিত ভাষা, ইমোশন ও কবিতার ভাষা, প্রেরণার ভাষা নতুন শক্তি দিয়েছে। বঙ্কিমেরই মতো বিবেকানন্দ বলেনঃ "আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান্ ও সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশ জনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়,—লক্ষণ।"[১০]

বিবেকানন্দ হুতোমের মস্করা ইয়ার্কি অশ্লীলতার ভাষাকে কলকাতার কথ্য ভাষা হলেও গ্রহণ করেননি, কিছু শব্দ নিয়েছেন, হয়তো একই অঞ্চল ও সময়ের লোক বলেঃ "যদি বল ও-কথা বেশ, তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা।" 'কলকেতা' 'সংস্কৃতয়' 'তৈয়ার' একেবারে কলকাতার কথ্য উক্তি থেকেই গৃহীত, 'জ্যান্ত কথা'ও এই জাতীয় শব্দ। মুখের কথ্য ভাষার জোর, হয়তো রামকৃষ্ণের মুখের ভাষা থেকেই পেয়েছিলেন। কাহিনীর গতি, বর্ণনার ছবি, চরিত্রের তাৎপর্য রামকৃষ্ণের মুখের ভাষায় যেন জীবন্ত, সেখানে শ্লীলতা-অশ্লীলতা কোথায় ঢেকে যায়। বিবেকানন্দের চেয়েও রামকৃষ্ণের ভাষা আরও জোরালোঃ "আমার বালক স্বভাব। হৃদে বললে, মামা, মাকে কিছু শক্তির কথা বলো,—অমনি মাকে বলতে চল্‌লাম! এমনি অবস্থায় রেখেছে যে, যে ব্যক্তি কাছে থাকবে তার কথা শুনতে হয়। ছোট ছেলের যেমন কাছে

লোক না থাকলে অন্ধকার দেখে—আমারও সেইরূপ হতো! হৃদে কাছে না থাক্‌লে প্রাণ যায় যায় হতো। ঐ দেখো ঐ ভাবটা আসছে! কথা কইতে কইতে উদ্দীপন হয়।" ক্রিয়াপদের জন্যেই ভাষায় জোর ও গতিশীলতা রামকৃষ্ণের ভাষায়। "সে অভিনেত্রী ঝট করে জবাব দিলে, আমি তোমার চেয়ে লক্ষগুণে ভালো। আমি একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস করি, আইনমত বে না হয় নাই করেছি; আর তুমি মহাপাপী এত বড় একটা সাধুর ধর্ম নষ্ট করলে!! যদি তোমার প্রেমের ঢেউ এতই উঠছিল, তা না হয় সাধুর সেবা-দাসী হয়ে থাকতে; তাকে বে করে—গৃহস্থ করে তাকে উৎসন্নে কেন দিলে?"[১১] সরলতা, স্পষ্টতা, ওজঃগুণ, আবেগ, দেশজাতি মানুষের প্রতি ভালবাসা ও কাব্যিক প্রেরণা, বক্তৃতার অতিরঞ্জন ও আতিশয্য এবং ধ্বনির পুনরাবৃত্তি, উচ্ছ্বাস, বিরামের মধ্যে দিয়ে উত্থান-পতন, শব্দের বিভিন্ন ভঙ্গি, বিশেষ শব্দের প্রতি ঝোঁক প্রবহমানতা—সব মিলে এক সামগ্রিক ঐক্য সৃষ্টি করেছে বহুল প্রচলিত অংশটিতে প্রাতিভদৃষ্টি লেখকের এক ও অবিভাজ্য সত্তাকে প্রকাশ করে; সেই সঙ্গে দেশকে; পদের মধ্যে ক্রমের সময় ও বিশেষ অর্থ এক অবিভাজ্য তাৎপর্যে পরিণত হয়, দেরিদার রীতিতে কখনও যা পাওয়া যাবে নাঃ

> 'হে বীর সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'[১২]

সমস্ত আবেগ উচ্ছ্বাস কাব্যপ্রেরণা পরিণতি লাভ করেছে মনুষ্যত্বে এবং এই ভাষা সৃষ্টিই হয়েছে মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের জন্য, সুতরাং ভাষার মধ্যেই বোধ অঙ্গাঙ্গী জড়িত, শুধু বাহন নয়।

বেদান্ত, বিজ্ঞান ও বিবেকানন্দ

প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা

সাল ১৮৯৬। বৈজ্ঞানিক নিকোলা টেসলার নাম তখন জগৎজোড়া। তাঁর অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা সবার মুখে মুখে। স্বামী বিবেকানন্দও সেসব কথা শুনেছেন। টেসলার বিভিন্ন গবেষণা, আবিষ্কার বিশেষত তাঁর প্রয়োগ-পদ্ধতি স্বচক্ষে দেখার অদম্য কৌতূহল হয়েছিল স্বামীজীর। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল 'matter' বা পদার্থকে 'energy' বা শক্তিতে যে পরিবর্তিত করা যায় টেসলা তা তাঁর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিশ্চিতভাবে দেখাতে পারবেন।[১] এ ব্যাপারে তাঁর বিশেষ উৎসাহের কারণে ১৮৯৫-৯৬ সালে স্বামীজী নিজেই বেদান্ত এবং বিজ্ঞান বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনার কথা ভাবছিলেন।

স্টার্ডিকে ১৩ ফেব্রুয়ারির এক চিঠিতে স্বামীজী লিখছেন ঃ "আগামী সপ্তাহে টেসলার কাছে আমার যাওয়াব কথা। গাণিতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি আমাকে হাতে কলমে করে দেখাবেন। তা যদি তিনি দেখাতে পারেন তাহলে বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব (cosmology) একটা সুনিশ্চিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।" কুম্ভকোণমে বেদান্তের ওপর একটি বক্তৃতায় স্বামীজী পরে বলেছিলেন ঃ "তাঁর (টেসলার) নাওয়া-খাওয়ার ঠিক ছিল না। ল্যাবরেটরীর বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা।"[২]

কিন্তু এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও টেসলা স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন; স্বামীজীকে তাঁর গবেষণাগারে এসে তাঁর পরীক্ষার বিস্ময়কর ফলাফল দেখে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বাস্তবিক, এটা এক দুর্লভ সুযোগই বলতে হবে।

গবেষণাগারের উঁচু সিলিং থেকে প্রকাণ্ড কয়েকটি ধাতব বল ঝুলিয়ে টেসলা কালো কোট পরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কিছুক্ষণ পর সমস্ত জায়গাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলে "তিনি দশ লক্ষ ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন তড়িৎপ্রবাহ নিজের শরীরে প্রবেশ করিয়ে সম্মুখে প্রসারিত দুই হাত দিয়ে আলো জ্বালাতেন, তামার পাত গলাতেন, এমনকি ধাতব চাকতিতে বিস্ফোরণ ঘটাতেন।"[৩] অথচ তাঁর কোনও শারীরিক বিপদ হত না। এটা তখনকার দিনে একটা রীতিমত চমকপ্রদ ব্যাপার। কিন্তু বিপদ না ঘটার আসল কারণ উচ্চশক্তিসম্পন্ন 'alternating current'-এর 'skin effect'. সে যাই হোক, এইরকম বিপদের ঝুঁকি নিয়েই টেসলা alternating current জেনারেটর এবং electro-magnetic তত্ত্বকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ছিল অসাধারণ। মাথার মধ্যে

অজস্র আবিষ্কারের বীজ সদাসর্বদাই তিনি যেন বয়ে বেড়াতেন। টেসলার ওপর তাই স্বামীজীর খুব একটা ভরসা ছিল।

১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন পূর্ব-নির্ধারিত সময়ে স্বামীজী টেসলার গবেষণাগারে হাজির হলেন। কিন্তু টেসলা স্বামীজীর সেই আশা পূরণ করতে পারলেন না। স্বভাবতই স্বামীজী খুব হতাশ হয়েছিলেন। টেসলা অবশ্য স্বামীজীর দর্শনকেই ব্যর্থতার কারণ হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন, যা সত্য নয়। যাই হোক, দুঃখিত হলেও স্বামীজীর স্বভাব এমনই ছিল যে তিনি কখনও নিরাশ হতেন না। তিনি ভাবলেন ভবিষ্যতে কোনও একদিন হয়তো তাঁর স্বপ্ন সফল হবে। তিনি শুধু মন্তব্য করেছিলেনঃ "আধুনিক বিজ্ঞান এই মূলগত ঐক্যের ব্যাপারে নীরব।"[৪]

টেসলার আত্মবিশ্বাস তাঁকে বুঝতে দেয়নি যে তত্ত্বটি তিনি প্রমাণ করতে চান তাকে সম্ভব করে তোলার উপযুক্ত গাণিতিক ঢাল-তরোয়াল তখনও তাঁর কাছে ছিল না। $E=mc^2$ অথবা সহজ করে বলতে গেলে, "mass-কে যে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়" সেই সত্য উদ্ঘাটনের জন্য বিজ্ঞানকে আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সে সত্য প্রকাশ করলেন তরুণ বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। 'matter'-কে 'energy'-তে রূপান্তরিত করা হলে কি ঘটতে পারে সে তথ্য সাধারণ মানুষ জানতে পারল হিরোশিমা, নাগাসাকির ভয়ঙ্কর ঘটনার পর। ঐ রূপান্তরিত শক্তির প্রচণ্ডতার কথা যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আণবিক বোমা তৈরি করেছিলেন তাঁরাও বিস্ফোরণের আগে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওপেনহেইমার, যিনি আণবিক বোমা সৃষ্টি করেছিলেন, বোমার প্রলয়ঙ্কর ক্ষমতা দেখে তিনিও হতবাক! তিনি শুধু ভগবদ্গীতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছিলেনঃ

"দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।"[৫]

টেসলাকে অবশ্য আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মতো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা দেখে যেতে হয়নি, এটা সুখের কথা। ১৯৩০ সালে লোকে তাঁর কথা যেন ভুলতেই বসেছিল। অবশ্য এর জন্য টেসলার নিজেরও কিছু দোষ-ত্রুটি দায়ী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এডিসন ততদিনে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন। তাঁর বাস্তববুদ্ধির কাছে টেসলা যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিলেন। অধিকাংশ পেটেন্ট তখন তাঁর হাত ছাড়া। দারুণ অর্থাভাবে তিনি জীবনের অন্তিম দিনগুলি কাটিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ চরম সঙ্কটের দিনগুলিতেও তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে ভুলতে পারেননি। স্বামীজীর ব্যাকুল প্রশ্ন—matter যে energy-তে রূপান্তরিত হয়, এটা কি দেখানো যায় না?—নিশ্চয় তাঁর কানে নিয়তই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

পাশ্চাত্যের মানুষের মনের গঠন ও প্রবণতা লক্ষ্য করে স্বামীজী একথা বুঝেছিলেন, বিজ্ঞানের ভাষা ব্যবহার করেই তাঁকে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু তাঁর যেমন 'বিজ্ঞান-বাই'[৬] ছিল না, তেমনি তিনি প্রতিটি হিন্দু রীতিনীতির 'মনগড়া বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা'[৭] দেবারও পক্ষপাতী ছিলেন না। তবুও ভারতীয় দর্শন তথা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

চিন্তাগুলিকে আধুনিক বিজ্ঞানের পরিভাষায় পরিবেশন করে স্বামীজী মানবজাতিকে চিরঋণে আবদ্ধ করে গেছেন। ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে একদিন না একদিন এই অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন করতেই হবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা স্বামীজীর এই প্রচেষ্টাকে একটু বোঝবার চেষ্টা করব।

মায়া

প্রথমেই আসা যাক 'মায়া'-র ভাবনায়। স্বামীজী বলছেনঃ "অদ্বৈত বেদান্তমতে এই মায়া, নাম এবং রূপ অথবা ইউরোপের মানুষ যাকে Space; Time এবং Causation আখ্যা দেয়, সেসবই এক অনন্ত সত্তার প্রকাশ যা আমাদের চোখে বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে।"[৮] অন্যত্র বলছেনঃ "মায়া এই জগতের এমন এক ব্যবহারিক সত্য যাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এইভাবেই আবহমান কাল চলে আসছে।"[৯]

আরেকটি বক্তৃতায় বলেছেনঃ "Will বা ইচ্ছা অখণ্ড সত্তারই একটা অংশ কিন্তু মায়ার জালে বাঁধা, স্থান-কাল-কারণের নিগড়ে আবদ্ধ।"[১০]

দেহ ও মন

দেহ এবং মন সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তব্য কি? স্বামীজী বলছেনঃ "গোটা জগতটাই পদার্থ দিয়ে গড়া এক মহাসমুদ্র; তুমি, আমি তার মধ্যে ছোট এক-একটা ঘূর্ণি। পদার্থপ্রবাহ সেই ঘূর্ণির মধ্যে ঢুকে এক-একটা বিশেষ ঘূর্ণির রূপ নিচ্ছে, আবার ক্ষণকাল পরে পদার্থ বা 'matter' হিসেবেই বেরিয়ে আসছে। এই পরিবর্তন-প্রবাহ নিত্য চলছে।...চিন্তা সম্পর্কেও এই তুলনা প্রযোজ্য। সব চিন্তার সমষ্টি নিয়ে যেন একটা অনন্ত চিন্তার সাগর; তোমার-আমার মন তার ভিতর ঘূর্ণি হয়ে নিরন্তর পাক খাচ্ছে।" [দ্রষ্টব্য ঃ টীকা নং ১১ ও ১৪]

রাজযোগের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলছেনঃ "চিত্ত, যাকে ইংরেজীতে mind-stuff বলা যায়, সেটা যেন একটা ইঞ্জিনের মতো চারপাশ থেকে প্রাণ সংগ্রহ করে তারই ভিতর থেকে বিভিন্ন ফোর্স সৃষ্টি করে চলেছে...।"[১২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বিজ্ঞানের যে অনমনীয় ও অসহিষ্ণু মনোভাব ছিল, এখন তা অনেকটা স্তিমিত। 'Quantum mechanics' এবং 'Relativity' তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণাগুলিকে প্রায় চুরমার করে দিয়েছে। নতুন নতুন আবিষ্কার বিজ্ঞানকে আজ এমন একটা জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে যে মনে হচ্ছে, টেসলার হাতে অনুসন্ধানের যে সাজসরঞ্জাম ছিল না, সেইসব বৈজ্ঞানিক যুক্তি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে এবং তা দিয়ে আমরা এখন বেদান্তকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারি। একটা লক্ষ্য করার মতো জিনিস এই, ১৯৭০ সাল থেকেই বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি খুব দ্রুত পাল্টাচ্ছে। আগে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'ইউনিট' বা এককের মধ্য দিয়ে মূল সত্যে পৌঁছবার প্রয়াস প্রাধান্য পাচ্ছিল; এখন দৃষ্টি ফিরেছে সমগ্র বা 'Whole'-এর দিকে।

স্বামীজী বলেছিলেনঃ "...যে কোনও বিষয়ই ধর না কেন, যদি ক্রমাগত অনুসন্ধান

চালিয়ে যাও তো দেখবে স্থূল পরিণত হচ্ছে সূক্ষ্মে। অবশেষে এমন একটা পর্যায় আসবে যখন জড়, স্থূল বস্তু, তা যত সূক্ষ্ম 'matter'-ই হোক না কেন, মিলিয়ে গিয়ে তোমাকে উন্নীত করবে ঊর্ধ্বতম সূক্ষ্মতম চেতনার রাজ্যে। এই ভাবেই physics পর্যবসিত হয় metaphysics-এ।"[১৩]

আশির দশকে তাই দেখা গেল বিভিন্নক্ষেত্রে গবেষণারত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার স্রোত এক তাৎপর্যপূর্ণ খাতে বইতে শুরু করেছে; জড়ের সীমিত চেতনার গণ্ডি পেরিয়ে তাঁরা যেন অসীম অনুভূতির অন্তর্লোকে মহাযাত্রা শুরু করলেন। ফলে একদিন তাঁরা পৌঁছে গেলেন 'Holistic Science' বা সর্বাত্মক বিজ্ঞানের রাজ্যে। এই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বেদান্তের সিদ্ধান্তের খুব কাছাকাছি। মনে হয় স্বামীজীর স্বপ্ন যেন সফল হতে বসেছে।

মন ও মস্তিষ্ক

ইয়ার্কস্ ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টর Karl Pribam জগদ্বিখ্যাত neuro-surgeon. বৈজ্ঞানিক Lashley-র তত্ত্বাবধানে মস্তিষ্ক নিয়ে প্রচুর গবেষণা করে মানুষের স্মৃতি সম্পর্কিত বহু নতুন তথ্য তিনি জানিয়েছেন আমাদের। শুধু জানানোই নয়, এইসব তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় আগের প্রচলিত ধারণাগুলি প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়েছে। আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা, ছিল brain যেন একটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। মনট্রিল নিউরোলজিকাল ইনস্টিটিউট-এ Wilder Penfield-এর গবেষণা এই ধারণাটিকে পুষ্ট করে। তাঁর গবেষণার ফলে মস্তিষ্কের বহুমুখী কার্যকলাপের কথা আমরা জেনেছিলাম। Penfield-এর মতে আমাদের স্মৃতি যেন অনেকটা কারখানার Card index file-এর মতো। সঠিক কার্ডটি তুলে নিলেই প্রয়োজনীয় বিষয় স্মরণে আসে; অনুষঙ্গ এই স্মৃতিকে উদ্দীপিত করে। স্মৃতির ধারক-বাহক ব্রেনের এই মুখ্য কোষটির নাম দেওয়া হয়েছিল engram.

কিন্তু Lashley এবং Pribam অনুসন্ধান করে জানালেন মস্তিষ্কের শতকরা কুড়ি ভাগও যদি কেটে বাদ দেওয়া হয়, তাহলেও স্মৃতির হেরফের হয় না। মস্তিষ্ক যদি শুধু একটা file-এর ভূমিকাই পালন করে এবং তাতে সযত্নে সঞ্চিত কার্ডগুলি যদি ধ্বংস করে ফেলা হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্তই করা যেতে পারে যে কার্ডগুলি নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাতে ধরে রাখা আমাদের জীবনের কোনও না কোনও সময়ের স্মৃতিগুলিও নষ্ট হয়ে যাবে। পরীক্ষায় কিন্তু দেখা গেছে, সেরকম কোনও কিছুই ঘটে না। স্মৃতি কিছুটা ঝাপসা হয়ে এলেও স্মৃতি-পরম্পরার মধ্যে কোনও রকম ব্যবধান সৃষ্টি হয় না। এই অনুসন্ধান ও তার ফলাফল থেকে বোঝা গেল কোনও না কোনও ভাবে স্মৃতি মস্তিষ্কেই সঞ্চিত থাকে তবে কোনও নির্দিষ্ট অংশে তা নেই (Memory must have been 'delocalized' in the brain). পরীক্ষা চালানোর সময় একদিন 'holography'-র ওপর একটি প্রবন্ধ Pribam-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রবন্ধটি পড়ে তাঁর মনে হল মস্তিষ্কের কার্যকলাপ নিশ্চয় 'holograph'-এর মতই। Holograph এবং লেসার-এর কার্যকলাপ তাঁকে যেন নতুন এক আলোর সন্ধান দিল।

Holograph-টা কি? Holograph হচ্ছে একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় লেসার রশ্মির

সাহায্যে তোলা ছবি। মজার ব্যাপার, Holographic slide-এর কোনও একটা অংশ যদি আমরা নষ্ট করে দিই, তাহলেও ত্রিমাত্রিক একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যাবে। ছবির গভীরতা বা ঘনত্ব একটু কমে যায়—এই যা প্রভেদ! ছবির সম্পূর্ণতার হানি না হওয়ার কারণ Holograph-এর সর্বত্রই সমভাবে তথ্যগুলি সঞ্চিত থাকে।

বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীই জানেন লেসার রশ্মি কৃত্রিম উপায়ে ল্যাবরেটরীতে তৈরি করা হয়। ঘনসন্নিবদ্ধ (coherent) এই আলোক রশ্মির বৈশিষ্ট্য—এর তরঙ্গের amplitude বৃদ্ধি পাবে এবং এর মূল শক্তি বা energy অক্ষুণ্ণ থাকবে। এই লেসার-রশ্মির অসীম ক্ষমতা। বিভিন্ন দ্রব্য সৃষ্টি থেকে microsurgery পর্যন্ত সর্বত্রই এর বিশেষ উপযোগিতা। আজকের প্রজন্মের মানুষের কাছে এটি সূক্ষ্মতম হাতিয়ার। Holography ছবি নেওয়ার সময় একটি লেসার রশ্মিকে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়ে তার একাংশ সরাসরি কোনও একটি নির্দিষ্ট বস্তুর ওপর ফেলা হয়। এর ফলে প্রতিফলিত রশ্মিটি গিয়ে ফিল্ম-এর reference beam-এর সঙ্গে মেশে। ফিল্ম-এর molecules গুলি তিনটি dimension-এ নিখুঁতভাবে সাজানো হয়ে যায়। এখন যে ছবিটির image পাওয়া গেল সেটি, সাধারণ অর্থে আমরা যাকে ছবি বলে থাকি, ঠিক সেরকম নয়। এটিকে দুই তরঙ্গের টানাপোড়েনের একটা নকশা বলা যেতে পারে। আমরা বলি ফিল্মটির মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় অনেক তথ্য ভরে দেওয়া গেল। এইরকম তথ্য-সম্বলিত একটি স্লাইড-এর ওপর যখন লেসার রশ্মি নিক্ষিপ্ত হয়. তখন মূল বস্তুর নিখুঁত একটি ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। একটা মজার ব্যাপার, মূল স্লাইডটিকে যদি আমরা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলি, তাহলেও কিন্তু প্রত্যেকটি টুকরো থেকেই সম্পূর্ণ ছবিটি অবিকৃতভাবে পাওয়া যাবে। এটা সম্ভব এই কারণে আলো একটা তরঙ্গবিশেষ এবং সেই তরঙ্গ স্লাইডের প্রতিটি অংশকে স্পর্শ করেছে এবং তারই ফলে স্লাইড-এর সর্বত্রই একই বাণী, একই সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে. একই তথ্য সর্বত্রই লিপিবদ্ধ।

মস্তিষ্কের তথ্যসংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের যে ক্ষমতা তার সঙ্গে holographic স্লাইড-এর কার্যপ্রণালীর দারুণ মিল। তফাতের মধ্যে শুধু এই, optical holograph সীমিত, নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়। সে যা হোক, এই আবিষ্কারের ফলে কিন্তু মানুষের স্মৃতি-সংক্রান্ত সব রহস্যের সমাধান এখনও হয়নি। বৈজ্ঞানিক মহল এখনও মন এবং মস্তিষ্কের মধ্যে সঠিক সম্পর্কটি নিয়ে প্রচুর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে Illya Prigogine, Rupert Sheldrake, David Bohm-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Prigogine এবং Dr. Jantsch এই বিষয়ে একমত যে Chemistry of brain-এর মধ্যেই মন সীমাবদ্ধ নয়। David Bohm বলছেনঃ "মন জীবন-ব্যাপারের সবকিছুর মধ্যেই জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে; শুধু মস্তিষ্কের মধ্যে তাকে সীমায়িত করা চলে না।"[১৫] Bohm আরও বলেছেনঃ "মন পদার্থের সূক্ষ্ম অবস্থা। ঘুরিয়ে বলা চলে, পদার্থ হল মনের স্থূল অবস্থা।"[১৬] প্রসঙ্গত স্বামীজীর অনুরূপ মন্তব্য স্মরণীয়ঃ "Body is only mind in a grosser form." Sheldrake-এর মতে মনের অবস্থান মস্তিষ্কে নয়। তাঁর বিশ্বাস ব্যষ্টির চেতনা এবং স্থান, কাল, এবং সময়ের ঊর্ধ্বে পুঞ্জীভূত যে

সমষ্টি-চেতনা—এ দুয়ের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ একটা সম্বন্ধ আছে।

ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউট-এর গবেষক Dr. Frank Barr সম্প্রতি এই ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে মন নিশ্চয় melanin-নামক এক অতি সূক্ষ্ম পদার্থের সমবায়ে গঠিত। এই পদার্থ এতই সূক্ষ্ম যে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তবে এটা হতে পারে এই পদার্থটি holographic film-এর মতো। অথবা এও হওয়া সম্ভব মনটাই holograph-এর মতো যা মস্তিষ্ককে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।[১৮]

স্বামী বিবেকানন্দ মনের যে অপূর্ব সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং চিন্তাধারা ক্রমশ সেই সিদ্ধান্তের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হয়। স্বামীজী বলছেনঃ "যাকে তুমি তোমার 'মন' বল, সেটি আর কিছুই নয়, মস্তিষ্কে আটকে পড়া 'মহৎ'-এর একটা টুকরো মাত্র। এইরকম অসংখ্য ব্যষ্টিমনের যোগফলকে 'সমষ্টি' বা বিশ্বজনীন মন বলা যেতে পারে।...বর্তমানে পাশ্চাত্যদেশে জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জীববিজ্ঞানেরও প্রভূত উন্নতি ঘটছে; এত দ্রুত এই বিজ্ঞানের বিকাশ হচ্ছে যে পাশ্চাত্যের ধর্মগুলি এ যাবৎ যা ব্যাখ্যা করতে পারত না, এই বিজ্ঞানে সেসবেরও ব্যাখ্যা দিচ্ছে। পাশ্চাত্যের মানুষ আজ মুষড়ে পড়েছে, তারা কোথায় দাঁড়াবে বুঝতে পারছে না কারণ আধুনিক জীববিজ্ঞান বলছে—মন আর মস্তিষ্ক একই বস্তু। কিন্তু আমরা, ভারতবাসীরা, এসব কথা অনেক কাল আগে থেকেই জানি। হিন্দুর ঘরের দুগ্ধপোষ্য শিশুও জানে, 'মন' জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়; সূক্ষ্মতর এই যা।"[১৯]

১২ নভেম্বর ১৮৯৭, লাহোরে দেওয়া ঐ একই বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেনঃ "আত্মাই মানুষের অন্তরালে গুহায়িত আসল মানুষ। এই আসল মানুষটি অর্থাৎ আত্মা, জড় মনকে তার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। অপরপক্ষে মন কয়েকটি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দৃশ্যমান স্থূল শরীরটাকে চালায়।"[২০]

খণ্ড ও অখণ্ডঃ microcosm and macrocosm

শেষপর্যন্ত স্বামীজী এই সিদ্ধান্তে এসেছেনঃ "এ জগতে আমরা প্রত্যেকেই যেন একটা অণুবিশ্ব বা microcosm এবং সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে, সবকিছু মিলিয়ে জগতটাকে macrocosm বা মহাবিশ্ব বলা যেতে পারে। ব্যষ্টিতে যা কিছু আছে সমষ্টিতেও তাই; ছোটর মধ্যে যেসব কাণ্ডকারখানা চলছে, বড়র মধ্যেও তাই।"[২১]

আশ্চর্য! বিজ্ঞানীরা যেন এখন একজোটে স্বামীজীর ভাষাতেই কথা বলছেন। বহু গবেষণা ও বিশ্লেষণের পর এখন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে শুধু মস্তিষ্কই নয়, চোখ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির কার্যকলাপের সঙ্গেও, আমরা যে holograph-এর কথা আগে বলেছি তার একটা সাদৃশ্য আছে। তাঁরা বলছেনঃ "মস্তিষ্কের মধ্যে যেসব পরিবর্তন (transformations) আমরা দেখতে পাই তা বাইরের পৃথিবীতে যে পরিবর্তন ঘটে তারই অনুরূপ। অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, পৃথিবীটাই একটা holograph।" এইভাবেই holographic model of the world-এর জন্ম হয়েছে।

এই মডেল বা তত্ত্ব অনুসারে "সমগ্র বিশ্বের স্পন্দন এবং সঞ্চলন প্রতিটি ব্যক্তির holographic মস্তিষ্কে প্রতিবিম্বিত হয়।" এই ধারণার ক্রমপ্রসারের ফলে একটা দৃষ্টিভঙ্গি দানা বাঁধছে যার সার কথাটা হল এই—মহাবিশ্বের সব খবরাখবরই অণুবিশ্বের প্রতিটি কণার মধ্যে লেখা আছে। অণুবিশ্ব এবং মহাবিশ্বের এই পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান খুব শীঘ্রই এক অনাস্বাদিত সত্যের স্বাদ পাবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞান থেকে সাময়িকভাবে আমরা বিবেকানন্দের কথায় ফিরি। একশ বছরেরও কিছু বেশি আগের (১৮৯১-১৮৯২) ঘটনা। গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে স্বামীজী চলেছেন আলমোড়ার দিকে। পথে ছোট একটা জায়গায় তাঁরা থামলেন। জায়গাটার নাম কাঁকড়িঘাট। ঝরঝর করে পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে; তারই তীরে একটা পিপুল গাছ। এত নিস্তব্ধতা! এমন ধ্যানমগ্না পৃথিবী! সহজেই চিত্ত অন্তর্মুখ হয়। স্বামীজী সেদিন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর অপূর্ব অধ্যাত্ম অনুভূতির কিছু স্পন্দন অচিন দেশের সাংকেতিক ভাষায় তিনি তাঁর নোটবই-এ লিখে রেখেছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে রাখা নোটবই-এর মূল লেখাটি হারিয়ে যায়। ইংরেজী জীবনীতে মুদ্রিত উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ'-এ দেওয়া আছে। সেটি এইঃ "বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও অণু-ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মে সংগঠিত। ব্যষ্টি জীবাত্মা যেমন একটি চেতন দেহের দ্বারা আবৃত, বিশ্বাত্মাও তেমনি চেতনাময়ী প্রকৃতির মধ্যে বা দৃশ্য জগতের মধ্যে অবস্থিত।"[২৪]

স্বামী নিখিলানন্দ প্রণীত বিবেকানন্দের জীবনী অনুসরণ করে আমরা জানতে পারি স্বামীজী বলছেনঃ অণুবিশ্ব এবং মহাবিশ্ব এ দুটি একই নিয়মে তৈরি। জীবাত্মা যেমন একটা দেহের তবকে মোড়া, বিশ্বাত্মাও তেমন দৃশ্যমান জগৎ বা চেতন প্রকৃতি দ্বারা আবৃত।[২৫]

ধ্যানের অতল গভীরতার ভিতর দিয়ে স্বামীজী এইভাবে জীব ও জগতের একাত্মতা উপলব্ধি করেছিলেন। জীব যেন মহাবিশ্বের আদলে গড়া এক অণু-প্রতিমা। বিশ্বের সবকিছুই এই শরীরের মধ্যে বর্তমান। একটি অণুর মধ্যেই গোটা বিশ্ব বিধৃত। অন্যত্র স্বামীজী বলেছেনঃ "microcosm-কে দেখলেই macrocosm-কে বোঝা যায়। আবার macrocosm-এর মাধ্যমেও microcosm-কে জানা যায়।"[২৬]

Chaos Theory

সম্প্রতি এক নতুন মতবাদের জন্ম হয়েছে। এর নাম 'Chaos Theory'. 'Fractals' নামক এক গাণিতিক নিয়মের ভিত্তিতেই এই তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের বিভিন্নক্ষেত্রে গবেষণাতে বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই এই তত্ত্বের শরণাপন্ন হচ্ছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে একসূত্রে গ্রথিত করতে এই তত্ত্ব অনেকটা সহায়তা করেছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘোষণা, এমনকি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা সমস্যার ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বটিকে এখন ভালভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে।

নতুন এই গণিতের জনক Mendel Brot 'self similarity', বা সাদৃশ্যধর্মিতাকেই তাঁর অঙ্কের মুখ্য বৈশিষ্ট্যরূপে বর্ণনা করে বলেছেন, বড় থেকে ছোট এই ক্রমে যদি একটি

দৃশ্যের খুঁটিনাটি সমস্ত কিছুরই পুনরাবৃত্তি ঘটানো যায় তাহলে নতুন নতুন আকার আকৃতি সৃষ্টি করা সম্ভব—repetition of details at descending scales is a powerful way of generating shape. আপাত-জটিল এই 'fractals'-কে একটু সহজে বোঝা যায় যদি আমরা পুরোনো দিনের একটা মজার বিজ্ঞাপনকে স্মরণ করি। ১৯৪০-এর কথা। ইংলণ্ডের এক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, জনপ্রিয় ব্রাউন সস্-এর একটা বিজ্ঞাপন দিলেন। সেই বিজ্ঞাপনে একটা বড় ছবি ছিল যেখানে দেখা যাচ্ছিল এক বাবা একটা ব্রাউন সস্-এর বোতল এনে টেবিলের ওপর রাখছেন। সেই বোতলের গায়ে একটা লেবেল সাঁটা এবং তাতেও একটা ছবি ছিল। ছবিটি এই, এক বাবা একটা ব্রাউন সস-এর বোতল টেবিলে এনে রাখছেন। ছবির সেই বোতলের গায়েও একটা লেবেল যা ঠিক আগের বড় ছবিটিরই পুনরাবৃত্তি। শুধু আকারে ছোট।..."[২৭]

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি কতটা এবং কিভাবে প্রযুক্ত হবে তা আমরা এখনও বলতে পারছি না। তবে বহু যুগ ধরেই কিন্তু বেদান্তে এই সূত্রটির প্রয়োগ চলে আসছে। স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' পাঠ করলে আমরা এ ব্যাপারে কিছুটা আলো পেতে পারি। একদিন স্বামীজী নিজের অনুভব এবং ঋষিদের উপলব্ধিজাত জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করে বললেন—অনুভূতিবান পুরুষ প্রথমেই নিজের মনের রহস্য জানেন এবং পরে Cosmic mind-কেও ঐ একই নিয়ম প্রয়োগে জানতে পারেন।[২৮]

Morphogenic resonance

Rupert Sheldrake-এর নাম আগেই করেছি। তিনি একজন প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী। 'The Presence of the Past'—নামক গ্রন্থে প্রাণীদের রূপ কেমন করে সৃষ্টি হয় সে প্রশ্ন আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অনুমান করেছেন যে একটি জীবন-নিয়ামক ক্ষেত্র নিশ্চয় কোথাও আছে যা জীবকে তার নির্দিষ্ট আকৃতি এবং গতি দেয়। Sheldrake নিজে ঐ নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন, আবার জগৎ জুড়েও এই 'morphic resonance' নিয়ে প্রভূত গবেষণা চলছে। পদার্থবিদ্যায় 'resonance' শব্দের সাধারণ অর্থ হলঃ 'বাইরের কোনও কম্পন মাত্রার সঙ্গে সদৃশ কম্পনমাত্রার সঙ্গত অনুরণন।' সুরে বাঁধা বাদ্যযন্ত্র ঘরে থাকলে ঘরে বা বাইরের কোনও কোনও শব্দে তা বেজে ওঠে অর্থাৎ অনুরণিত হয়। এই যে ঘটনা এটিকে resonance-এর একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। দুটি বস্তুর কম্পাঙ্ক এক হলে তবেই এই অনুরণন সম্ভব। Resonance-এর এই সাধারণ তত্ত্বটিকে আরও বিস্তারিত করে Sheldrake জীববিজ্ঞানের গবেষণায় কাজে লাগিয়েছেন।

Sheldrake-এর বিশ্বাস একটা শস্যবীজ থেকে ভ্রূণ পর্যন্ত সবকিছুর চারপাশেই একটা নিয়ন্ত্রণক্ষেত্র বা 'Morphic field' আছে যা তার গঠনকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে। তাঁর মতে অণুর সঙ্গে অণু এবং বিভিন্ন কোষের মধ্যে পারস্পরিক যে সংযোগ ও বোঝাপড়া তা এই নিয়ামকক্ষেত্রের অস্তিত্ব আছে বলেই। তিনি বলছেনঃ 'morphic resonance' হল এমন একটা সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া যার দ্বারা নিয়ামকক্ষেত্রে অতীতের সঙ্গে

বর্তমানের একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়; দেশ ও কালের ব্যবধান ভেদ করে কার্যরূপী এই মৌল প্রভাবতরঙ্গ যেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে অঙ্গসংস্থান কার্যকে সম্ভব করে তোলে। এই মৌল প্রভাবের দ্বারা অভিচালিত হওয়ার ফলেই দুটি কোষ-ক্ষেত্র পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বৃহত্তর আকার ধারণ করে, ঠিক যেমনটি পদার্থবিদ্যায় তড়িৎ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের বেলায় ঘটতে দেখা যায়। এই morphic fields-এ অতীতের স্মৃতি সঞ্চিত থাকে।

Morphic resonance তত্ত্ব যে উড়িয়ে দেবার নয়, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এখানে কেবল একটা মজার পরীক্ষার কথা বলব যা পরোক্ষভাবে এই তত্ত্বকেই সমর্থন করে। পরীক্ষাটি এইরকম: একটা সুস্থ ফড়িং-এর ভ্রূণ সংগ্রহ করে, তার মাঝখানটা বেঁধে দেওয়া হল। কয়েকদিন পর দেখা গেল ভ্রূণটি মানুষের এই হস্তক্ষেপ মোটেই বরদাস্ত করেনি; সে তার অঙ্গসংস্থানকে এমন সুকৌশলে নিয়ন্ত্রিত করেছে যার ফলে ভ্রূণের নীচের অর্ধাংশে তারই অনুরূপ কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি ভ্রূণের আবির্ভাব ঘটেছে এবং আশ্চর্যের ব্যাপার ছোট ভ্রূণটিরও একটি মাথা গজিয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এমন একটা কিছু আছে যা জীবের গঠনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে তার আকৃতিগত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ফড়িং-এর ভ্রূণটির স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার পথে বিঘ্নসৃষ্টি করেও ব্যর্থ হলেন। রকমসকম দেখে মনে হয় গোটা শরীরটা কেমন হওয়া উচিত সেকথা যেন ভ্রূণের কোষগুলি আগে থেকেই জানত!

Sheldrake-এর মতে একটা 'collective memory field', বা যৌথ স্মৃতি ভাণ্ডার আছে। থাকাটা খুবই সম্ভব। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা এই সম্ভাবনার কথা অনুমান করতে পারি। মনে করুন, আমরা এমন একটা জায়গায় আছি যেখানে অজস্র অর্কিড ফোটে। একদিন সকালে বাগানে গিয়ে আপনি দেখলেন এক ধরনের লাল অর্কিড অনেক ফুটেছে। ঐ একই দিনে যদি আপনি কাছাকাছি বাগানগুলি এবং জঙ্গলের আশপাশ একটু ঘুরে আসেন তো দেখে অবাক হবেন ঐ একই লাল রঙ-এর ফুল সর্বত্রই কম বেশি ফুটেছে।

Sheldrake তাঁর গ্রন্থে[২৯] দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর 'যৌথ স্মৃতি ভাণ্ডার' তত্ত্বটিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। প্রথম দৃষ্টান্ত: জাপানের কাছে একটা বিশেষ জাতের বাঁদরদের সদ্য ক্ষেত থেকে তোলা মিষ্টি আলু দিলে তারা প্রথমটায় খাবার কোনও আগ্রহই দেখায়নি। একটা মেয়ে বাঁদরের কিন্তু খুব বুদ্ধি ছিল। সে আবিষ্কার করল আলুটাকে তো পরিষ্কার করে খাবার উপযোগী করে নেওয়া যায়। যে তখন দলের সঙ্গী-সাথীদের আলু পরিষ্কার করার কায়দাটা শিখিয়ে দিল। ধীরে ধীরে সকলেই রপ্ত হয়ে উঠল। যে আচরণ প্রথমে হয়তো একশ বাঁদরের মধ্যে সীমিত ছিল, অকস্মাৎ দূরবর্তী অন্যান্য দ্বীপের বাঁদরদের মধ্যেও তা ছড়িয়ে সর্বজনীন অভ্যাসের রূপ নিল। 'যৌথ স্মৃতি ভাণ্ডারে' সেটি আসামাত্র তার প্রক্রিয়া অজান্তেই সকলের ভিতর ছড়িয়ে গেল—তাদের আর নতুন করে শিখতে হল না।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত: Blue tits নামক এক জাতের পাখি কি করে যেন দুধের বোতলের ঢাকনাটি খুলে দুধ খাওয়ার কৌশলটি শিখে ফেলেছিল। তিরিশের দশকে এইভাবে দুধ চুরির একটা পরিসংখ্যান নেওয়া হয়। ঐ প্রজাতির পাখিদের মধ্যে এই দুধ চুরির অভ্যাস

সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ফলে বাজারে দুধের বোতলের খুব আকাল পড়ে যায়। পাখিদের দুধ চুরির সুযোগও কমে গেল। কিন্তু সাত-আট বছর পর যুদ্ধ থামলে আবার বাজারে দুধের বোতল ফিরে এল এবং আশ্চর্য, দেখা গেল Blue tits-এর দল আবার দুধের বোতল দেখলেই ঠোকরাচ্ছে। এইভাবেই হঠাৎ যে অভ্যাস দু-একটি পাখির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এক সময় তা হয়ে দাঁড়াল সাধারণ ও সর্বজনীন। অন্যান্য জায়গায় Blue tits-রাও ছিপি খুলতে লাগল একই কৌশলে।

Sheldrake-এর মতে প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই কোটি কোটি 'fields' বা ক্ষেত্র বর্তমান—এ্যাটম, মলিকিউল, টিস্যু আরও অসংখ্য কত কি। কিন্তু অঙ্গাঙ্গী জড়িত সব ক্ষেত্রগুলিই ধাপে ধাপে, বিশেষ থেকে সাধারণ ক্ষেত্র অর্থাৎ ব্যক্তি অভিমুখে উঠে গেছে।

Sheldrake-এর আরেকটি মত হল—ক্ষেত্রগুলি যেসব জিনিস তৈরি করছে, সেইগুলিই আবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে ('fields themselves are formed by the very things they are forming'). তাঁর দাবি পুরাতন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর এই মতের পার্থক্য আছে। কারণ ধর্মের দৃষ্টি চিরন্তন সত্যের দিকে আর তাঁর দৃষ্টি বিবর্তনের দিকে। তাঁর মতের সমর্থনে তিনি বলছেন, অনাগত যে সমস্ত জীব বা প্রাণী, তাদের ক্ষেত্রগুলির কোনও অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। তারা আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ক্ষেত্রগুলিও তৈরি হবে।

কিন্তু আমরা বেদান্তে দেখছি মন এবং জড় পদার্থ একই সঙ্গে বিকশিত হয় এবং আজকের বিজ্ঞানীরা যাকে 'যৌথ স্মৃতি ভাণ্ডার' বলছেন, ভারতীয় দর্শন তাকেই বহু যুগ আগে 'মহৎ' (Cosmic mind) আখ্যায় ভূষিত করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, বেদান্তমতে 'মহৎ' প্রকৃতির ভিতরেই; অতএব তাকে প্রকৃতির নিয়ম-কানুন মেনে চলতেই হয়। অনুকম্পন বা অনুনাদ সেইসব নিয়মেরই একটা।

স্বামীজী বারবার বিশদ ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, আমাদের মনের সমধর্মী চিন্তাগুলি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কিভাবে একই ছন্দে স্পন্দিত হয়। এই কারণেই ভাল আরও ভাল হতে চায়, মন্দ হীনতর অবস্থায় নেমে যায়। দৃষ্টান্ত দিয়ে স্বামীজী বলছেনঃ "মনে কর, আমি কোনও খারাপ কাজ করছি। যখন কুকর্ম করছি, তখন আমার মনটি একটি বিশেষ অবস্থায় রয়েছে; এখন তামাম দুনিয়া জুড়ে যত মানুষ আমারই মতো মানসিক অবস্থায় রয়েছে, আমার চিন্তার তরঙ্গ গিয়ে তাদের আঘাত করবে এবং তাদেরও সমভাবে প্রভাবিত করবে। অনুরূপভাবে, আমি যখন কোনও ভাল কাজ করি, তখনও সৎ চিন্তার তরঙ্গ সমভাবাপন্ন মানুষকে একইভাবে মহৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে।"[৩০]

স্বামী সদাশিবানন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় একটা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার কথা জানিয়েছেন। স্বামীজী তখন বেনারসে। একদিন বিভিন্ন জটিল তাত্ত্বিক সমস্যা ও আচার্য শঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করছিলেন স্বামীজী। স্বামী সদাশিবানন্দও সেখানে উপস্থিত। আলোচনা কালে স্বামীজী দুষ্প্রাপ্য সব গ্রন্থ থেকে অনর্গল শঙ্করের উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন। স্বামীজী কিভাবে শঙ্করের প্রতিটি গ্রন্থের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়েছেন, একজন শ্রোতার মনে এই প্রশ্ন উঁকি দিলে স্বামীজী গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেনঃ "শঙ্করের মস্তিষ্কের ধ্যান করলে আমি শঙ্কর হয়ে যাই আর আমি যদি বুদ্ধের মস্তিষ্ক ধ্যানে

আনি, তাহলে আমি বুদ্ধই হয়ে যাব।"[৩১] অর্থাৎ স্বামীজী বলতে চাইছিলেন, ইচ্ছামাত্রই তিনি শঙ্কর বা বুদ্ধের মতো দেব-মানবদের চিন্তাতরঙ্গ সরাসরি ধরতে পারেন; তার জন্য তাঁদের লেখা বই-এর পাতা ওল্টাবার দরকার হয় না। এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় স্বামীজী resonance principle-এর কোনও সূক্ষ্মস্তরের প্রয়োগ ইঙ্গিত করেছেন।

স্বগঠিত বিশ্ব বা Self Organizing Universe

আমরা যদি 'Co-evolution theory' এবং Dr. Jantsch এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের 'Self-organizing Universe' তত্ত্বের একটু আলোচনা না করি তাহলে আমাদের এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমরা ইতিমধ্যেই কোষ এবং টিস্যু ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও সমন্বয়ের প্রবৃত্তি লক্ষ্য করেছি। এখন একদল বিজ্ঞানী বলতে শুরু করেছেন গোটা বিশ্বটাই পর্যায়ক্রমে এই সমন্বয়ের ফলশ্রুতি। Whitehead-এর বক্তব্য ঃ "এই মহাবিশ্বের কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা বা অসঙ্গতি নেই; বরং বলা যায়, এটি সুচারুভাবে খণ্ড ও অখণ্ডের বহু সূক্ষ্ম স্তরে বিন্যস্ত।"[৩২] এ যেন বড় থেকে ছোট—খোপের ভিতর অসংখ্য খোপ।

Co-evolution তত্ত্ব বোঝাতে সচরাচর যে উদাহরণটি ব্যবহৃত হয় তা এইঃ ধূসর অতীতে অগণিত cyanobacteria বিষাক্ত অক্সিজেন ছেড়ে বায়ুমণ্ডলকে এমনভাবে বিষিয়ে তোলে যে biosphere-টি ধ্বংস হবার উপক্রম হয়। কিন্তু পৃথিবী ইত্যাদি যে macrosystem বা বিরাট-সত্তা, তা microsystem বা অণু-সত্তা অর্থাৎ ব্যাক্টেরিয়ার কার্যকলাপের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। কিভাবে? সমগ্র biosphere-টিকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে। ফলে অক্সিজেন গ্রহণ করে জটিল ও উন্নততর জীবন অভিব্যক্ত হতে থাকে। Macro এবং micro জীবনের দুটি ক্রম বা শাখাই এইভাবে পরস্পরের পরিপূরকরূপে বিকশিত হয়েছে।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী James Lovelock তাই মন্তব্য করছেন, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত আমাদের এই পৃথিবীটা যেন এক মহাজীবনের রূপ নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি 'Gaia hypothesis' গ্যেয়া প্রকল্পের কথা বলেছেন। 'Gaia'—গ্রীক শব্দ। এর অর্থ প্রাচ্যের দেবী। এই প্রকল্প বা প্রস্তাব অনুযায়ী পৃথিবীর আনুমানিক প্রায় চার কোটি প্রজাতি পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ক্রমবিকশিত হয়েছে যে কার্যত পৃথিবীর কাঠামোটিকে 'autopoietic' বলা চলে। Lewis Thomas সেই কারণেই পৃথিবীকে একটা বিরাট কোষের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবের শরীরে যেমন বিভিন্ন কোষ এবং টিস্যুগুলি পরস্পররের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে চলে, তেমনি গোটা পৃথিবীটাই নিখুঁতভাবে সমন্বিত একটি একক তন্ত্র। Lovelock-এর এই প্রস্তাবকে আরও সম্প্রসারিত করে মহাবিশ্বের দিকে হাত বাড়িয়েছেন কিছু বিজ্ঞানী। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী McClintok তাঁদেরই একজন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তিনি একটি তত্ত্ব খাড়া করেছেন যার নাম দেওয়া হয়েছে 'Theory of symbiosis বা মিথোজীবিতা তত্ত্ব। McClintok-এর সহযোগী Margulis 'গ্যেয়া প্রস্তাব'কে খুব একটা

আমল দেননি কারণ তাঁর ধারণা ঐ চিন্তাধারার মধ্যে নাকি ধর্মের গন্ধ আছে। সে যাহোক, বিজ্ঞানী Lovelock কিন্তু ওঁদের মতামতে খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেছেন, এই প্রথম একটা বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম পাওয়া গেল।

এই দাবি সম্পর্কে অবশ্য আমাদের কিছু সংশয় আছে। কারণ একশ বছর আগেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ "সুপ্রাচীন বেদান্ত দর্শনের উত্তুঙ্গ চিন্তার কাছে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারগুলি মৃদু প্রতিধ্বনির মতো শোনায়...।"[৩৩] স্বামীজীর এই মন্তব্য এখন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক এবং অর্থবহ। বেদান্তচিন্তার যৌক্তিকতা বিষয়ে তিনি এতদূর নিঃসন্দেহ ছিলেন যে তিনি চেয়েছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানীরা বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বকেও যাচাই করে দেখুক। বেদান্তের ওপর এক বক্তৃতায় স্বামীজী বলছেনঃ "এটা পরিষ্কার যে বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে আধুনিক মানুষ জড়বাদী হয়েও অধ্যাত্মচিন্তার দিকে এগোতে পারেন। আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার কিন্তু যাঁরা কৌতূহলী তাঁরাও একটু চেষ্টা করলে উপলব্ধি করতে পারবেন যে আজকের বিজ্ঞান যেসব কথা বলছে, বেদান্ত সেসব সিদ্ধান্ত বহু যুগ আগেই নিয়ে বসে আছে।"[৩৪]

ঋষির দূরদৃষ্টি দিয়ে স্বামীজী আগামী দিনের সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং বলে গেছেনঃ "আধুনিক বিজ্ঞানের ধাক্কায় দ্বৈতবাদী ধর্মমতগুলি চীনা মাটির বাসনের মতো ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে। এখন তাই প্রয়োজন সকলের কাছে অদ্বৈত সত্য প্রচার করা; কারণ একমাত্র তার দ্বারাই আধুনিক বিজ্ঞানের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব।"[৩৫]

স্বামীজীর কথা এবং আধুনিক বিজ্ঞানী Bohm-এর কথার মধ্যে কতখানি সাদৃশ্য, পাঠক তা বিবেচনা করুন। স্বামীজী বলেছেনঃ 'মহৎ-ই মস্তিষ্কের বেড়াজালে পড়ে 'মন' হয়েছে।'[৩৬] Bohm বলছেনঃ 'মন পদার্থের সূক্ষ্ম অবস্থা। ঘুরিয়ে বলা চলে, পদার্থ হল মনের স্থূল অবস্থা।'[৩৭]

আবার John Briggs ও David Peat রচিত 'The Looking Glass Universe'-এ যে মন্তব্য করা হয়েছে তা বৈদান্তিক তত্ত্বের কত নিকটবর্তী তা ভেবে দেখুন। সেখানে বলা হচ্ছেঃ 'তলিয়ে দেখলে সামগ্রিক চেতনা বা মানুষের সমষ্টি-চেতনার অতি বাস্তব সত্তা আছে। আরও ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে জড়ের ভিতরেই চৈতন্য অনুস্যূত হয়ে আছে। জড়, চৈতন্যেরই এক অভিব্যক্তি মাত্র। "Thus individual consciousness like an individual electron, is an abstraction (of the whole)... like flaws on crystal glass."[৩৮] এই প্রসঙ্গে 'Inspired Talks'-এ স্বামীজীর উক্তি স্মরণে আসেঃ "They (name & form) are like spots in the object—glass of a telescope, yet it is the light of the sun that shows us the spots ; ...Swami Vivekananda is just the speck on the object —glass."[৩৯]

তাহলে আমরা স্পষ্ট দেখছি আধুনিক বিজ্ঞানীদের চিন্তাগুলি পরস্পরের কতখানি কাছাকাছি এসে পড়েছে। যেন একই সুরে সকলেই মূল সত্যটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন। স্বামীজীও অনেক আগে এ ধরনের কথা বলে গেছেন, অবশ্য বেদান্তের পরিভাষায়। তিনি 'অব্যক্ত'-কে 'নির্বিশেষ প্রকৃতি' বা 'Undifferentiated nature' বলেছেন যার

থেকে অণু, পরমাণু, বল, চিন্তা এবং বুদ্ধি সমস্ত কিছুই এসেছে।[৪০] কিন্তু তা প্রকৃতিই। সমষ্টি-মনের উদ্ভব এই প্রকৃতি থেকেই; তাই তা দেশ ও কালের মধ্যেই সীমিত। বিজ্ঞানী Sheldrake এই তত্ত্বটি বুঝতে ভুল করেছেন। সমষ্টি-মনের বিকাশ যেহেতু দেশ ও কালের দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত, সেই হেতুই তা বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। যাহোক, স্বামীজীর ভাবনা অনুসরণ করেই আমরা এই সমস্যার একটা সমাধান পেতে পারি। স্বামীজী বলেছেন ঃ "বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি কি অপূর্বভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে মেলে। যেখানে একটু-আধটু অমিল আছে, বুঝতে হবে তা এই জন্য যে বিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ।"[৪১]

বেদান্তে 'হিরণ্যগর্ভ' বা সমষ্টি-মনের আরেক নাম 'সূত্রাত্মা'। 'সূত্রাত্মা' বলতে এমন এক সত্তাকে বোঝায় যা বিশ্বের সবকিছুকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে। সূত্রাত্মাই হচ্ছে সংঘটক; আবার সেই এক সত্তাই অন্যদিকে সংঘটনের বিষয়।

স্বামীজীর আশা ছিল ঃ "বিজ্ঞান এবং ধর্ম একদিন পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাবে।"[৪২] Self-organizing Universe বা স্বগঠিত বিশ্বের ধারণাটি সম্প্রতি বিজ্ঞানের সমর্থন লাভ করায়, বিজ্ঞান যেন আজ বেদান্তের চিন্তাকে বরণ করে নিতে চাইছে। দুয়ের এই সার্বিক মিলনের জন্য হয়তো আরও কিছু কাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তা হোক। ত্রিকাল-অবাধিত সত্যের কাছে কয়েকটা বছরের সাগ্রহ প্রতীক্ষা আর এমনকি কষ্টকর? রাতের অন্ধকার কাটবেই। অরুণোদয় হল বলে।

বিশ্বরূপাত্মকায়

স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পতত্ত্ব ও বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

রঘুনাথ গোস্বামী

বিংশ শতক অতিক্রান্ত প্রায়। এই শতাব্দীর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব-নিকাশ শুরু হয়েছে। এই সময়কালে সৃষ্ট শ্রেষ্ঠবস্তুগুলির তালিকা প্রস্তুত করলে দেখা যাবে—সেই তালিকায় স্থান করে নিয়েছে বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, বর্তমান শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ এবং অনন্য স্থাপত্যকীর্তিরূপে। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যাবতীয় স্থাপত্যকলার সমাবেশ করতে এই মন্দিরের নির্মাণকর্মে। তাঁর এই স্বপ্নের রূপদান সম্ভব হয়েছে। বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের নির্মিতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যকলার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে সেগুলির রূপবৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মন্দিরটি সামগ্রিকভাবে অতীতের কোনও এক বিশেষ স্থাপত্যরীতির হুবহু অন্ধ অনুকরণ নয়। এই মন্দিরের সঙ্গে অবিকলভাবে তুলনীয় অতীতের কোনও স্থাপত্য পাওয়া যাবে না। এইটিই এই স্থাপত্যের অনন্যতা। কিন্তু বিভিন্ন স্থাপত্যকলার শুধু সমাবেশই নয়, সেগুলির সমন্বয়সাধনই এই স্থাপত্যকর্মের আশ্চর্য কৃতিত্ব যা প্রতিবিম্বিত করে সম্প্রতিকালের পৃথিবীর পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়—সমন্বয়ের দর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে রূপপ্রদানের জন্য কেন্দ্র স্থাপন ও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের স্মৃতি স্থায়িভাবে মূর্ত করে রাখার জন্য অসামান্য এক মন্দির নির্মাণে স্বামীজীর আগ্রহ ও তার জমি ইত্যাদি সংগ্রহের কাহিনী সুবিদিত।

১৮৯৯ সনের ২ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ সংঘের মূলকেন্দ্র বেলুড়ের নবনির্মিত মঠগৃহে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯৭-এর ২০ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসে শ্রীনগর, উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের নানাস্থানে প্রচারকার্যের পর ১৮৯৮ সনের জানুয়ারি মাসে আলমবাজার মঠে ফিরে আসেন। ১৮৯৭ সনের প্রথম দিকে হরিপ্রসন্ন অর্থাৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ আলমবাজার মঠে যোগ দেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা-বিশারদ। স্বামী বিবেকানন্দ কিছুদিন ধরেই স্বামী বিজ্ঞানানন্দের প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে পড়াশুনাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেকথা ভাবছিলেন। স্বামীজীর লেখা চিঠিপত্র থেকে জানা যায় ক্যাপ্টেন সেভিয়ারকে নিয়ে তিনি যখন হিমালয় অঞ্চলে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করার উদ্যোগ করছেন, তখন সে কাজে সহায়তার জন্য ব্রহ্মচারী হরিপ্রসন্ন অর্থাৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে লেখেন। সে

যাত্রায় বিশেষ কিছু করতে হয়নি হরিপ্রসন্নকে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮ সনে আলমবাজার মঠে ফিরে আসার আগে যখন উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করছিলেন—বিশেষত উত্তরভারত ও রাজপুতানার কয়েকটি অঞ্চল ভ্রমণের সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন ব্রহ্মচারী হরিপ্রসন্ন। সম্ভবত সেই সময় থেকেই স্বামীজী ব্রহ্মচারী হরিপ্রসন্নকে (যাকে তিনি আদর করে 'পেসন' নামে ডাকতেন) তাঁর স্বপ্নসৌধ বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির পরিকল্পনা করার গুরু দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। এই ভ্রমণকালে তাঁরা দুজনে ভারতের বেশ কিছু সুবিখ্যাত দেবালয় দেখেন এবং স্বামীজী হরিপ্রসন্নের সঙ্গে মন্দিরস্থাপত্য সম্বন্ধে নানা আলোচনা করেন।

১৮৯৮ সনে বেলুড় গ্রামে মঠের জন্য জমি নির্বাচন হয় ৩ ফেব্রুয়ারি। আলমবাজার মঠ স্থানান্তরিত হয় বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে ১৩ ফেব্রুয়ারি। বেলুড়ে জমি কিনে রেজিস্ট্রি হয় ৫ মার্চ। তারপরই স্বামীজী হরিপ্রসন্ন মহারাজকে মঠবাড়ি ও ঠাকুরঘর নির্মাণের দায়িত্ব দেন। হরিপ্রসন্ন মহারাজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, কর্মকুশলতা ও শ্রমে মূল মঠবাড়ি ও ঠাকুরঘর নির্মিত হল। স্বামীজী 'আত্মারামের' কৌটো অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের পূতদেহাবশেষপূর্ণ আধার নবনির্মিত ঠাকুরঘরে প্রতিষ্ঠা করলেন ১৮৯৮ সনের ৯ ডিসেম্বর। মঠগৃহের মূলবাড়ির সামনে গঙ্গার উপর পোস্তা নির্মাণ কাজও হরিপ্রসন্ন মহারাজকেই করতে হয়।

স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যাত্রা করেন ১৮৯৯ সনের ২০ জুন। তার আগের দিন এক অভিনন্দন সভার আয়োজন করা হয়। মঠের যাবতীয় নির্মাণকার্য সুষ্ঠুভাবে দক্ষতার সঙ্গে সমাধা করার জন্য স্বামীজী প্রস্তাব করলেন হরিপ্রসন্ন মহারাজকে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানানো হোক। সকলে সহর্ষে এই প্রস্তাবে সাড়া দিলেন। কিন্তু হরিপ্রসন্নের জন্য আরও একটি অমেয় গুরুত্বপূর্ণ ও দুরূহ কাজ অপেক্ষা করছিল। এ কাজটি হল বেলুড় মঠের জমিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির পরিকল্পনা ও তার নকশা অঙ্কন। দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যাত্রার কিছু আগে স্বামীজী হরিপ্রসন্ন মহারাজকে দিয়ে তা করিয়ে নিলেন। স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের এমন একটি মন্দির নির্মিত হবে, যার স্থাপত্য হবে সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতিফলন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের নিজস্ব রূপকল্পনের কথা মনে রেখে হরিপ্রসন্ন মহারাজ ১৮৯৮ সনের কোনও এক সময় খ্যাতনামা বিদেশী স্থপতি মিস্টার গুইথারের সঙ্গে মন্দির বিষয়ে আলোচনা করেন। তারপর তিনি মন্দিরের যে নকশাটি প্রস্তুত করেন সেটি স্বামীজী দেখেন এবং কিছু পরিবর্তনের নির্দেশ দিলে হরিপ্রসন্ন মহারাজ আবার নতুন একটি নকশা আঁকেন। কয়েকবার পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের পর অবশেষে মন্দিরের রূপকল্পনা-দ্যোতক নকশাটি সাধারণভাবে স্বামীজীর অনুমোদন লাভ করেছিল। নকশা অনুমোদনের পর স্বামীজী হরিপ্রসন্ন মহারাজকে বলেছিলেন, এই মন্দির একদিন নির্মিত হবে, তখন তিনি স্থূলদেহে থাকবেন না। মন্দিরটি দেখবেন উপর থেকে।

বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৯২৯ সনে ১৩ মার্চ। এই উপলক্ষে স্বামী অখণ্ডানন্দের একটি চিঠিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির সম্বন্ধে বিবেকানন্দের নিজস্ব রূপকল্পনের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। স্বামী অখণ্ডানন্দ যে সময়ের কথা লিখেছেন তখনও

মঠ নীলাম্বরবাবুর বাগান বাড়িতে; মঠের জমি সবে কেনা হয়েছে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ অনেকদিনের চেষ্টায় মন্দিরের নকশা প্রস্তুত করেছেন, এই নকশা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হচ্ছে। এমনি এক সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে স্বামীজী মঠের জন্য কেনা জমিতে পদচারণা করছিলেন। তাঁদের যেসব কথোপকথন হয়েছিল সে সম্বন্ধে স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেনঃ "আমি তাঁর কাছে ভাবী মঠের নক্সার কথা পাড়িলাম। তাহা শুনিয়া স্বামীজী...কোথায় তাঁহার সেই অর্ধচন্দ্রাকার মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং মন্দিরের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে বড় বড় কুলুঙ্গিতে যেরূপে যত দেবদেবী ও পৃথিবীর যাবতীয় মহাপুরুষ ও মহাজনগণের বিগ্রহ স্থাপিত হইবে এবং যেরূপে মন্দিরের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদীর উপর হীরা-চুনি-পান্না-খচিত সদাসমুজ্জ্বল একটি ওঁকার থাকিবে—তাহাই তিনি আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়াছিলেন।" অখণ্ডানন্দ মন্দিরে হীরা-চুনি-পান্না ও মণিমাণিক্যের ব্যবহারের কথায় আপত্তি তুলেছিলেন। বিবেকানন্দ ব্যাপারটির অন্যরূপ উন্মোচন করেন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে এই মন্দির ভারতবর্ষের শিল্পের নবজন্মের সূতিকাগৃহ। স্বামীজী বলেছিলেনঃ "... এই রেনেসাঁসের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অতীতকালে যেমন পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে আর্টের বিকাশ হয়েছিল, তেমনি এই নবযুগেরও উপযোগী শিল্প প্রভৃতি সভ্যতার সকল অঙ্গেরই বিকাশ অবশ্যম্ভাবী।" বর্তমান শতকের শেষপাদে বসে শিল্পের এই 'অবশ্যম্ভাবী' বিকাশ কতখানি ঘটেছে তা হয়তো বিচারের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু বেলুড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির যে ভারতশিল্পের নবজন্মের একটি তর্কাতীত উদাহরণ তা শতাব্দীর শেষপাদে পৌঁছে আবার নতুন করে উপলব্ধির প্রয়োজন আছে।

স্বামীজীর স্বপ্নসৌধ বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব রূপ-কল্পনা কি ছিল? এ সম্বন্ধে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' বইটিতে একটি পরিষ্কার বিবরণ পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে পাওয়া যায় স্বামীজীর শিল্প-দর্শনের কেন্দ্রীয় প্রতীতিসমূহ। ১৯০১ সনে বেলুড় মঠে কলকাতায় জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক শিল্পী শ্রীরণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে শিল্প সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের একটি আলোচনার বিবরণ আমরা পাই 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থটিতে।

বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশের শিল্পকলার বিকাশ সম্বন্ধে মন্তব্য করার পর স্বামীজী বললেনঃ "মানুষ যে জিনিসটি তৈরি করে, তাতে কোন একটা idea express (মনোভাব) করার নামই art (শিল্প)। যাতে idea-র (ঐরূপ ভাবের) expression (প্রকাশ) নেই, রঙবেরঙের চাক্‌চিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art (শিল্প) বলা যায় না। ঘটি, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলিও ঐরূপে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ করে তৈরি করা উচিত।" রণদাবাবু ওদেশ এবং এদেশের শিল্পের মধ্যে স্বামীজী তফাত কি দেখলেন প্রশ্ন করায় স্বামীজী বললেনঃ "প্রায় সবই সমান, originality (নতুনত্ব) প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না। ঐসব দেশে ফটোযন্ত্রের সাহায্যে এখন নানা চিত্র তুলে ছবি আঁকছে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য নিলেই originality (নতুন নতুন ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা) লোপ হয়ে যায়; নিজের idea-র expression দিতে (মনোগতভাব প্রকাশ করতে) পারা যায় না। আগেকার ভাস্করগণ আপনাদের মাথা থেকে নতুন নতুন ভাব বের করতে বা সেইগুলি ছবিতে বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন। এখন ফটোর অনুরূপ ছবি

হওয়ায় মাথা খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হয়ে যাচ্ছে। তবে এক-একটা জাতের এক-একটা characteristic (বিশেষত্ব) আছে। আচারে-ব্যবহারে, আহারে-বিহারে, চিত্রে-ভাস্কর্যে সেই বিশেষভাবের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। ...অতএব art (শিল্প) সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপ বিকাশ হয়। যে জাতটা বড় materialistic (জড়বাদী ও ইহকাল সর্বস্ব) তারা nature (প্রকৃতিগত নামরূপ) টাকেই ideal (চরমোদ্দেশ্য) বলে ধরে এবং তদনুরূপভাবের expression-ই (বিকাশ) শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাবপ্রাপ্তিকেই ideal (জীবনের চরমোদ্দেশ্য) বলে ধরে, ঐ ভাবই nature-এর (প্রকৃতিগত) শক্তি-সহায়ে শিল্পে express (প্রকাশ) করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতদের nature-ই (প্রকৃতিগত সাংসারিক ভাব ও পদার্থনিচয়-চিত্রণই) হচ্ছে primary basis of art (শিল্পের মূল ভিত্তি); আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর ideality (প্রকৃতির অতীত কোন একটা ভাবপ্রকাশই) হচ্ছে শিল্প-বিকাশের মূল কারণ। এইরূপে দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধরে শিল্পচর্চায় অগ্রসর হলেও ফল উভয় শ্রেণীর প্রায় একই দাঁড়িয়েছে, উভয়েই আপন আপন ভাবে শিল্পোন্নতি করছে। ওসব দেশের এক-একটা ছবি দেখে আপনার সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালে স্থাপত্য-বিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার এক-একটি মূর্তি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে। ওদেশে এখন যেমন আগেকার মত ছবি হয় না, এদেশেও তেমনি নতুন নতুন ভাববিকাশকল্পে ভাস্করগণের আর চেষ্টা দেখা যায় না। এই দেখুন না, আপনাদের আর্ট স্কুলের ছবিগুলিতে যেন কোন expression (ভাবের বিকাশ) নেই। আপনারা হিন্দুদের নিত্য ধ্যেয় মূর্তিগুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক expression (বহিঃপ্রকাশ) দিয়ে আঁকবার চেষ্টা করলে ভাল হয়।... এই মনে করুন, মা কালীর ছবি। এতে যুগপৎ (ক্ষেমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী) মূর্তির সমাবেশ... আমি মা কালীর ভীমা মূর্তির কিছু idea (ভাব) 'Kali the Mother' নামক আমার ইংরেজী কবিতাটায় লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। আপনি ঐ ভাবটা একখানা ছবিতে express (প্রকাশ) করতে পারেন কি?" এরপর স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের কমলদল-বিকশিত হ্রদমধ্যে হংসরাজিত সর্পবেষ্টিত যে শিলমোহর বা প্রতীকটির নকশা করিয়েছিলেন সেটির মর্মার্থ ব্যাখ্যার পর ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির যেভাবে নির্মাণ করা তাঁর ইচ্ছা, তাঁর পরামর্শ মতো স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-অঙ্কিত সেই নকশাটি (drawing) আনিয়ে রণদাবাবুকে দেখিয়ে বলেনঃ "এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার আমার ইচ্ছা আছে। আমি পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্পসম্বন্ধে যতসব idea (ভাব) নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দিরনির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা করব। উহার দেওয়ালে শতসহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে। হাজার লোক যাতে একত্রে বসে ধ্যানজপ করতে পারে, নাটমন্দিরটি এমন বড় করে নির্মাণ করতে হবে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও নাটমন্দির এমনভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখলে ঠিক ওঁকার বলে ধারণা হবে। মন্দির মধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্তি থাকবে। দোরের দুদিকে দুটি ছবি এইভাবে থাকবে—একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধুভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাটছে—অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানম্রতা

যেন প্রেমে একত্র সম্মিলিত হয়েছে। মনে এই সব ভাব রয়েছে ; এখন জীবনে কুলোয় তো কার্যে পরিণত করে যাব। নতুবা ভাবী generation (বংশীয়েরা) ঐগুলি ক্রমে কার্যে পরিণত করতে পারে তো করবে।" যে সময়ে শিল্পী রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল তখন স্বামীজী জীবনের প্রান্তসীমায়। জীবনের এই পর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ছাড়াও স্বামীজী শিল্পকলার সম্বন্ধে তাঁর প্রতীতিগুলি বলেছেন প্রায় সূত্রাকারে। এই সূত্রাকার উক্তিগুলিকে বলা যেতে পারে শিল্পকলা সম্বন্ধে স্বামীজীর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নির্যাস। শিল্পকলার ক্ষেত্রে দিগ্‌দর্শন। কেননা জীবনের এই পর্যায়ে বিবেকানন্দ যাবতীয় শিল্পকলার অন্তস্তলে যে অব্যয়তত্ত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন তা কোনও স্বতন্ত্রতত্ত্ব নয়, তা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সত্য ও তত্ত্বের সঙ্গে সমার্থক। শিল্পী রণদাপ্রসাদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দের উক্তিগুলি শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তা ও উপলব্ধিজাত সিদ্ধান্তসমূহ। কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের এই মতামত বা সিদ্ধান্তগুলি কোনও পূর্বাপর সম্বন্ধবিহীন আপতিক ব্যাপার নয়। এগুলিকে বলা যেতে পারে শিল্পকলা-বিষয়ে তাঁর জীবনব্যাপী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ক্রম-পরিণতি। বিবেকানন্দের স্বল্পায়ু জীবনে কলাশিল্প সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি গড়ে ওঠার ব্যাপারে যে বিবর্তনটি লক্ষ্য করা যায় তার পরিলেখটি সম্ভবত এই ধরনের: বিবেকানন্দের জীবনে আধ্যাত্মিকতা ও শিল্পমনস্কতার মধ্যে কোনও ব্যবচ্ছেদ পরিলক্ষিত হয় না। নিখিলবিশ্বের শিল্পসম্ভার সম্বন্ধে আগ্রহ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবনচর্যার বহির্ভূত কোনও বিষয় ছিল না।

আমেরিকার ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য যাত্রাপথে চীন ও জাপানে মন্দিরস্থাপত্য ও শিল্পকর্ম তিনি দেখেছিলেন সাগ্রহে।

আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামীজী ওদেশের শিল্পসংগ্রহ সাধ্যমত পরিদর্শন করেছিলেন—এটা নিশ্চয় ধরে নেওয়া যায়। রেড ইণ্ডিয়ানদের বাদ দিলে জাতিহিসাবে নিতান্তই তরুণ হওয়ার ফলে আমেরিকাবাসীদের নিজস্ব শিল্পসৃষ্টি বলতে উল্লেখ্য হয়তো তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু অর্থ-সামর্থ্য ও আগ্রহ থাকার কারণে আমেরিকার শিল্পসংগ্রহ উপেক্ষা করার উপায় নেই। মেরী লুইস বার্কের বিবরণ থেকে জানা যায় ডেট্রয়েটের বিখ্যাত ধনী শিল্পরসিক চার্লস ফ্রিয়ারের প্রাচ্য-শিল্পসংগ্রহ দেখেছিলেন স্বামীজী।

প্রথমবার পাশ্চাত্যদেশে পরিভ্রমণের সময় তিনি আমেরিকা থেকে ইউরোপে—ইংলণ্ডে আসেন ১৮৯৫ সনে। ইংলণ্ড থেকে প্যারিসে। তাঁর ইংরেজী জীবনীতে শিল্প ব্যাপারে বিবেকানন্দের আগ্রহের কথা জানা যায়: "He made the most of his brief stay by visiting its museums, its churches, its cathedrals, its art galleries, and was pleased to see how highly the artistic instincts of the French nation were developed." তিনি এইবারই সম্ভবত লুভর মিউজিয়াম দেখেছিলেন। ১৮৯৬-এ জুলাই-এর শেষের দিকে বিবেকানন্দ লণ্ডন থেকে কন্টিনেন্ট ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়েন ও জেনিভা ও জেনিভার শিল্পকীর্তি দেখেন।

ভারতে ফেরার পথে বিবেকানন্দের রোম ও সেখানকার শিল্পসম্পদ দেখার বিবরণ আমরা তাঁর অন্যতম যাত্রাসঙ্গিনী শ্রীমতী সেভিয়ারের রচনা থেকে জানতে পারি। ফ্লোরেন্স ইউরোপের প্রধান কলাশিল্পকেন্দ্র—এখানকার সংগ্রহালয়গুলি বিবেকানন্দ দেখেছিলেন।

ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যতম উৎসস্থল প্রাচীন রোমের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বিবেকানন্দ পরিভ্রমণ করেছিলেন। রোমের গীর্জাগুলি শিল্প-ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। লক্ষাধিক দর্শক বসতে পারে যে অ্যাম্ফিথিয়েটারে—বিখ্যাত সেই কলোসিয়াম ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেছিলেন বিবেকানন্দ। যাজক সম্প্রদায়, আচার-অনুষ্ঠানের ঘটা ও ধনরত্ন-মণিমাণিক্য, পুরোহিততন্ত্র ও পার্থিব ঐশ্বর্যের মেদভারে অবসন্ন খ্রীস্টীয় ধর্মজগতের কেন্দ্রবিন্দু রোম নগরীকে তিনি দেখেছিলেন সবিস্ময়ে এবং সম্ভবত বেদনামিশ্রিত কৌতুকের সঙ্গে। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি—শুধুমাত্র পার্থিব ঐশ্বর্য-আশ্রিত শিল্পসম্ভার কদাচ সম্মোহিত করতে পারেনি বিবেকানন্দের কেন্দ্রীয় চেতনাকে। সেন্ট পিটার্স চার্চে বড়দিনের সময় বিপুল জাঁকজমকের বাহুল্য দেখে বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ "এই যে গীর্জায় অনুষ্ঠানের এমন বাহুল্য, ঐশ্বর্যের ব্যাপক আড়ম্বর—এখানকার কর্মকর্তারা কি সেই আনত খৃষ্টের অনুগামী, যিনি তাঁর মাথাটি রাখবার ঠাঁইটুকু খুঁজে পাননি?" বিবেকানন্দ আরও বলেছিলেনঃ "বাইরের অনুষ্ঠানের সেইটুকু মূল্য যেখানে তা অন্তরের পবিত্রতা বিকাশে সহায়তা করে। যদি জীবনের বিকাশে তা সমর্থ না হয় তাহলে মায়া না রেখে তাকে চূর্ণ করে ফেলো।" এই উক্তির মধ্যে বিবেকানন্দের শিল্পতত্ত্বের মূল সুরটি আমাদের সনাক্ত করতে অসুবিধা হয় না।

বিবেকানন্দ দেখেছিলেন নেপল্‌স্, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত পম্পেই নগরীর অবশেষ। পম্পেই-র শিল্পকর্ম মুগ্ধ করেছিল বিবেকানন্দকে।

বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যাত্রা করেন ১৮৯৯ সনে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে বিবেকানন্দ প্যারিসে ছিলেন তিনমাস। এই সময় বিশ্বের বরেণ্য ভাস্কর রদ্যাঁর সঙ্গে বিবেকানন্দের আলাপ হয়েছিল। নরম্যাণ্ডিতে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে নির্মিত মন্টসেন্ট মাইকেল দেখতে যান বিবেকানন্দ। একশ কুড়িটি অলঙ্কৃত স্তম্ভ সমন্বিত গীর্জার পার্শ্বস্থ খিলান-পথটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকর্মরূপে চিহ্নিত।

এরপর ভিয়েনা, কনস্টান্টিনোপল্‌, গ্রীস ও এথেন্স। এখানে আগ্রহের সঙ্গে দেখেছিলেন প্রাচীন সৌধ—পার্থেনন, জুপিটারের মন্দির, ডায়েনিসিস থিয়েটার; ফিডিয়াস ও গ্রীসদেশীয় অন্যান্য প্রাচীন শিল্পাচার্যদের ভাস্কর্য।

এখান থেকে বিবেকানন্দ সদলে গিয়েছিলেন অসামান্য প্রাচীন শিল্পকীর্তি ও রহস্যের দেশ মিশরে। সেখানে তিনি সময় কাটিয়েছিলেন প্রাচীন স্ফিংক্স-এর ছায়ায়।

ইউরোপীয় চিত্রকলা বিবেকানন্দ খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। গ্রীক ও রোমান শিল্পকলা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবোধ করেছেন। ফরাসী শিল্পকলা সম্বন্ধে অধিক অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন পরবর্তী কালে। ওলন্দাজদের অনুকারক শিল্প ও মাংসলতা বিবেকানন্দের বিরাগ উৎপাদন করেছিল।

জীবনের গোড়ার দিকে ভারতশিল্প সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ধারণা সঠিক ছিল না। তাঁর ধারণা ছিল ভাস্কর্য, মূর্তিকলার ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্প গ্রীক শিল্পের চেয়ে ন্যূন। ১৮৯৭ সনে বিবেকানন্দের এই ধারণার পরিবর্তন ঘটে। এর পূর্বে ১৮৯২-৯৩ সনে 'মাদ্রাজে গৃহীত স্মারক লিপি' থেকে ভারতশিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ "আদর্শবাদী হিন্দুদের মধ্যে বাস্তব...দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল।... চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের কথাই ধর। হিন্দুর চিত্রকলায় কী দেখিতে পাও? সর্বপ্রকার হাস্যোদ্দীপক ও অস্বাভাবিক

মূর্তি। হিন্দুমন্দিরে কি দেখিয়া থাকো? চতুর্ভুজ নারায়ণ বা ঐ জাতীয় কোনো মূর্তি। কিন্তু কোনো ইতালীয় বা গ্রীসদেশীয় মূর্তি সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখো, ইহার মধ্যে প্রকৃত পর্যবেক্ষণের কি অপূর্ব প্রকাশ! প্রদীপ-হস্তে একটি নারীর চিত্র অঙ্কনের জন্য হয়ত একজন বিশ বৎসর ধরিয়া নিজ হাতে প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়াছিল।"

বিবেকানন্দ প্রায় একই ধরনের উক্তি করেছেন তাঁর লেখা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র পরিশিষ্টেঃ "ওদের মতো চিত্র বা ভাস্কর্য-বিদ্যা হ'তে আমাদের এখনও ঢের দেরী! ও দুটো কাজে আমরা চিরকালই অপটু। আমাদের ঠাকুর দেবতা সব দেখ না, জগন্নাথেই মালুম।"

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যদিও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশকাল ১৮৯৯-১৯০০ কিন্তু প্রখ্যাত গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মনে করেন উক্ত লেখাটি স্বামীজী লিখতে আরম্ভ করেন ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের আগে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই তখন মনে করতেন ভারতীয়শিল্পে গ্রীক প্রভাব একটি তর্কাতীত সত্য। এছাড়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে উদ্ভূত কিছু মিশ্র শিল্প, যা গান্ধার শিল্প নামে পরিচিত, ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এই শিল্পনিদর্শনকে প্রামাণিক উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করতেন। উনিশ শতকে শিল্পতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করার মতো শিল্প-সচেতনতার অভাব ছিল এদেশে। দেশীয় শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ভারতীয় শিল্পের তুলনায় ইউরোপীয় শিল্পকলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে বিরাজ করত। উদাহরণস্বরূপ রমেশ দত্তের রচনা উল্লেখ করা যায়ঃ "গ্রীকভাস্করেরা মানুষ ও দেবদেবীর মূর্তিতে সৌন্দর্যের যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পীগণ তাহার নিকটে যাইতে পারেন না।" এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে ভারতীয় শিল্পে গ্রীক প্রভাবের তত্ত্বটি প্রথম খণ্ডন করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

বিবেকানন্দের গ্রীক শিল্পকলা তথা পাশ্চাত্যের শিল্পকলা ও ভারতশিল্প সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে। তিনি যে তাঁর পূর্ববর্তী মত সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করেন তাই নয় পরবর্তী কালে শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর অভ্যুদয় ঘটে ভারতশিল্পের এক যথার্থ তত্ত্বদর্শী দিশারী ও অনন্য প্রবক্তারূপে। শিল্প সম্বন্ধে উনিশ শতকীয় অন্ধতার কালে বিবেকানন্দকে আমরা পাই এক অনন্য ব্যক্তিরূপে যাঁর শিল্প সম্বন্ধে মন্তব্য, উক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি ভারতবর্ষের শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে দিগ্‌দর্শনের কাজ করেছে। শিল্প সম্বন্ধে বিবেকানন্দের বক্তব্যের স্বল্পতা বেদনাদায়ক যদিও গুণমানের দিক থেকে সেগুলি যথার্থই অমেয়।

বিবেকানন্দ ১৮৯৭, ৩ জানুয়ারি মেরী হেলকে চিঠিতে লেখেনঃ

"মিস লককে বল, আমি যে তাঁকে বলেছিলাম—'মানবমূর্তির ভাস্কর্য-সৃষ্টির ক্ষমতা গ্রীকদের তুল্য ভারতীয়দের মধ্যে বিকশিত হয়নি—আমার সে ধারণা ভ্রান্ত। ফার্গুসন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের যেসব গ্রন্থ এখন পড়ছি তাতে দেখছি, উড়িষ্যায় (যেখানে আমার যাওয়া হয়নি) ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এমন মানবমূর্তি রয়েছে, সৌন্দর্যে এবং অবয়ব সংস্থানের নৈপুণ্যে সেগুলি যে কোনও গ্রীকমূর্তির সঙ্গে তুলনীয়। মৃত্যুর একটি বিশাল মূর্তি সেখানে আছে—লোলচর্ম প্রকাণ্ড নারীকঙ্কাল—যার অবয়বসংস্থানের নিদারুণ বাস্তবতা ভয়ঙ্কর ও

পীড়াদায়ক। উক্ত গ্রন্থকার বলেছেন অলিন্দের একটি নারীমূর্তি একেবারে ভেনিসের মেডিচির মতো। এই রকম আরও।

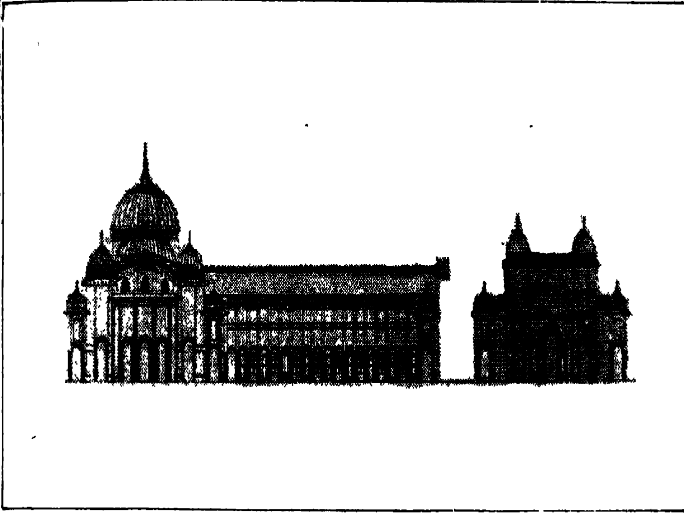
"ভগিনী লককে বল ভারতের অরণ্যের মধ্যে একটি বিধ্বস্ত মন্দির আছে, ফার্গুসন সেটিকে এবং গ্রীসের পার্থিননকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্থাপত্যশিল্পের চরম শিখর মনে করেন—একটি ভাবকল্পনার চরম প্রকাশ, অন্যটি ঐ কল্পনার সঙ্গে জড়িত খুঁটিনাটি রূপের প্রকাশক। পরবর্তী মুঘল সৌধাবলী ইত্যাদি ভারত-সারাসেন স্থাপত্য-নিদর্শনগুলি প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে কোনভাবেই তুলনায় দাঁড়াতে পারে না।"

ইউরোপীয় অনুকারক শিল্পের শ্রেষ্ঠতা ও প্রতিতুলনায় ভারতীয় শিল্পকলার ন্যূনতা বিষয়ে বিবেকানন্দের গোড়ার দিকের ধারণার কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবেঃ বিবেকানন্দের স্বল্পস্থায়ী জীবৎকালের মধ্যে তাঁর পক্ষে স্বদেশীয় স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের বেশকিছু নিদর্শন দেখা সম্ভব হয়নি। মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে তিনি এক জায়গায় বলেছেনঃ "আমি আট বছর ভারতে ঘুরেছি, তবু অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিই দেখা হয়নি।" বিবেকানন্দ সাঁচি, পুরী, ভুবনেশ্বর দেখেননি। খাজুরাহোর চোল রাজবংশের অসামান্য স্থাপত্য ভাস্কর্যের পরিচয় পাননি। নালন্দা, গৌড়, পাহাড়পুর, বিষ্ণুপুর দেখেননি, বোরোবদুর, যবদ্বীপ, শ্যাম, কাম্বোজ, সুমাত্রা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার হিন্দুস্থাপত্য, ভাস্কর্য তাঁর সময়ে বহির্জগতের কাছে অনেকটাই অপরিচিত রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যথাসময়ে বিবেকানন্দের চেতনায় ভারতশিল্পের ঐতিহ্য ও মর্মার্থ প্রতিবিম্বিত হয়েছিল যথাযথরূপে।

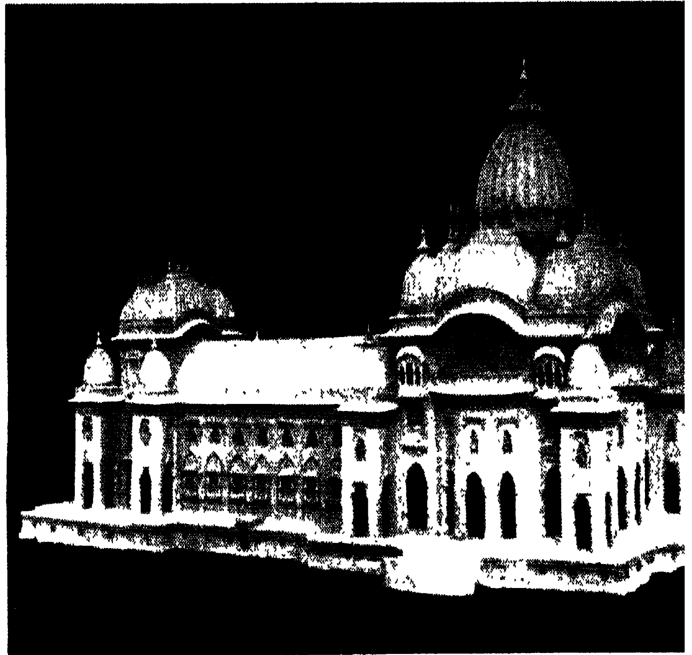
বিবেকানন্দের স্বপ্নসৌধ বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের নির্মাণকর্ম শুরু হয় তাঁর দেহান্তের দীর্ঘ তিন দশক পরে ১৯৩৫ সনে এবং শেষ হয় ১৯৩৮ সনে। নির্মাণের সময় মন্দিরের মূল নকশার কিছু কিছু পরিবর্তন করা হলেও মন্দিরটি সম্পূর্ণ স্বামী বিবেকানন্দের আদি পরিকল্পনার যথাযথ রূপায়ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পরিকল্পনাকার স্বামী বিবেকানন্দ। এই পরিকল্পনার উৎস হল ভারতশিল্প বিষয়ে স্বামীজীর উপলব্ধ তত্ত্ব, যার গভীরে রয়েছে তাঁর শিল্পদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। স্বামীজীর স্বল্পায়ু জীবনে শিল্প সম্বন্ধে বক্তব্য নিতান্তই স্বল্প যা ছড়িয়ে রয়েছে সূত্রাকারে বিশেষ কিছু ভাষণে রচনায় প্রবচনে ও অপরের স্মৃতিকথায়। এগুলি একত্রিত করলে ভারতশিল্প সম্বন্ধে বিবেকানন্দের উপলব্ধ তত্ত্বের কিছুটা সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণরূপে উল্লেখ করা যায় স্বামীজী শিল্পী-বন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে প্রদত্ত ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিবরণঃ "ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে তাঁর (স্বামীজীর) কথোপকথনকালে ভারতীয় স্থাপত্য অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়েছিল। অধ্যাপকের মত ছিল, বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে গ্রীকসৃষ্টির কিছু ঐক্য আছে, ভারতবর্ষ গ্রীকদের দ্বারা হয়তো প্রভাবিত হয়েছিল। স্বামীজী তীক্ষ্ণ উত্তর দেন—'যদি গ্রীকদের ভারতে উপস্থিতিই ভারতীয় স্থাপত্যের উপর তাদের প্রভাবের একমাত্র প্রমাণ হয়, তাহলে সেই একই যুক্তি ফিরিয়ে দিয়ে বলা যায় গ্রীক শিল্প ভারতের কাছে ঋণী।' বৌদ্ধযুগের শিল্পের সঙ্গে গ্রীকশিল্পের কোনও সাদৃশ্য নেই।

"গ্রীকরা বহির্বস্তুর রূপায়ণে চরম পারদর্শী আর ভারতীয় ভাস্কর্য অন্তঃপ্রকৃতির উদ্‌ঘাটনে ইচ্ছুক—তার জন্য বাস্তবকে বলি দিতেও প্রস্তুত। শরীরসংস্থানের খুঁটিনাটির রূপায়ণে গ্রীকরা অত্যন্ত সাবধান ও সচেতন; অপরপক্ষে ভারতীয়রা তাকে প্রায় কোন



স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা অনুসারে স্বামী বিজ্ঞানানন্দকৃত বেলুড়মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের নকশা



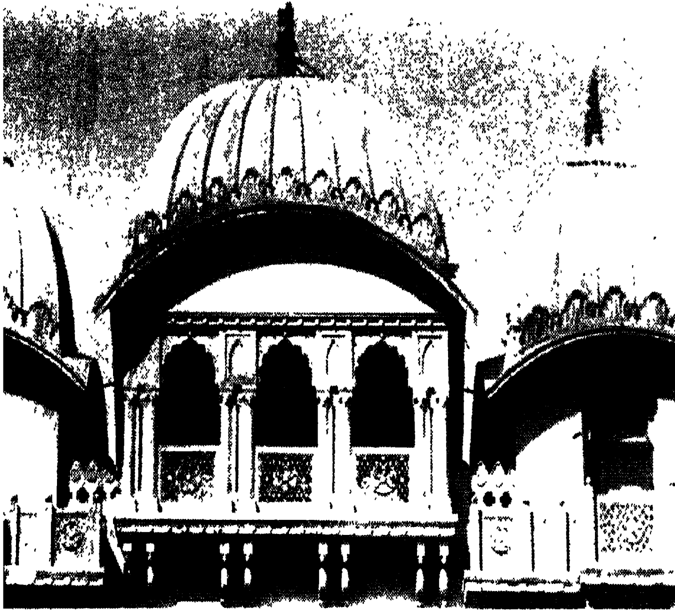
বেলুড়মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের মডেল



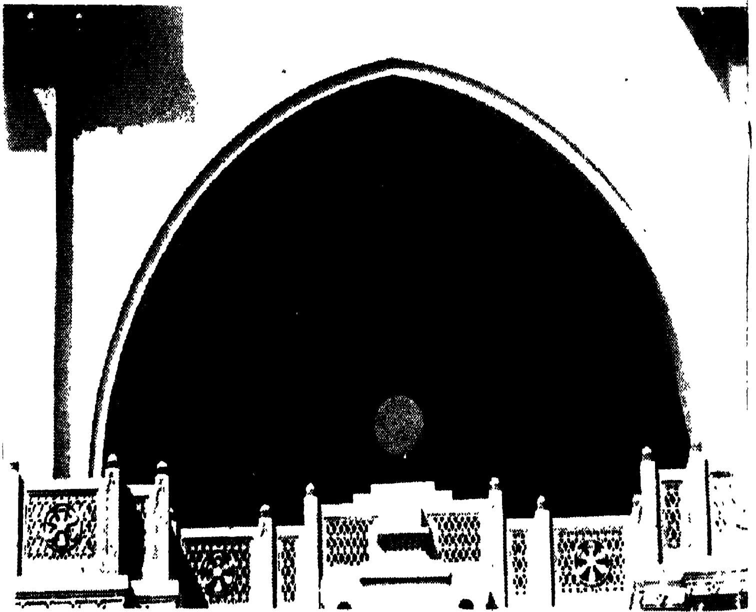
শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, বেলুড়মঠ



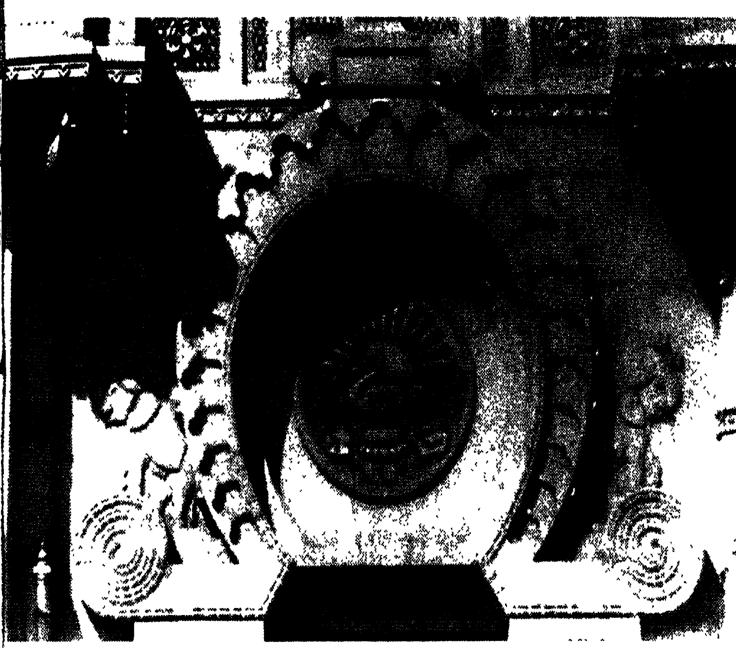
গর্ভমন্দির : প্রদক্ষিণ-বীথি ও গর্ভমন্দির বেষ্টন করে নবগ্রহের মূর্তি—উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর ও কোনারকে যেমন দেখা যায়



প্রবেশপথ : উপরে রাজপুত-স্থাপত্যরীতিব নহবৎ



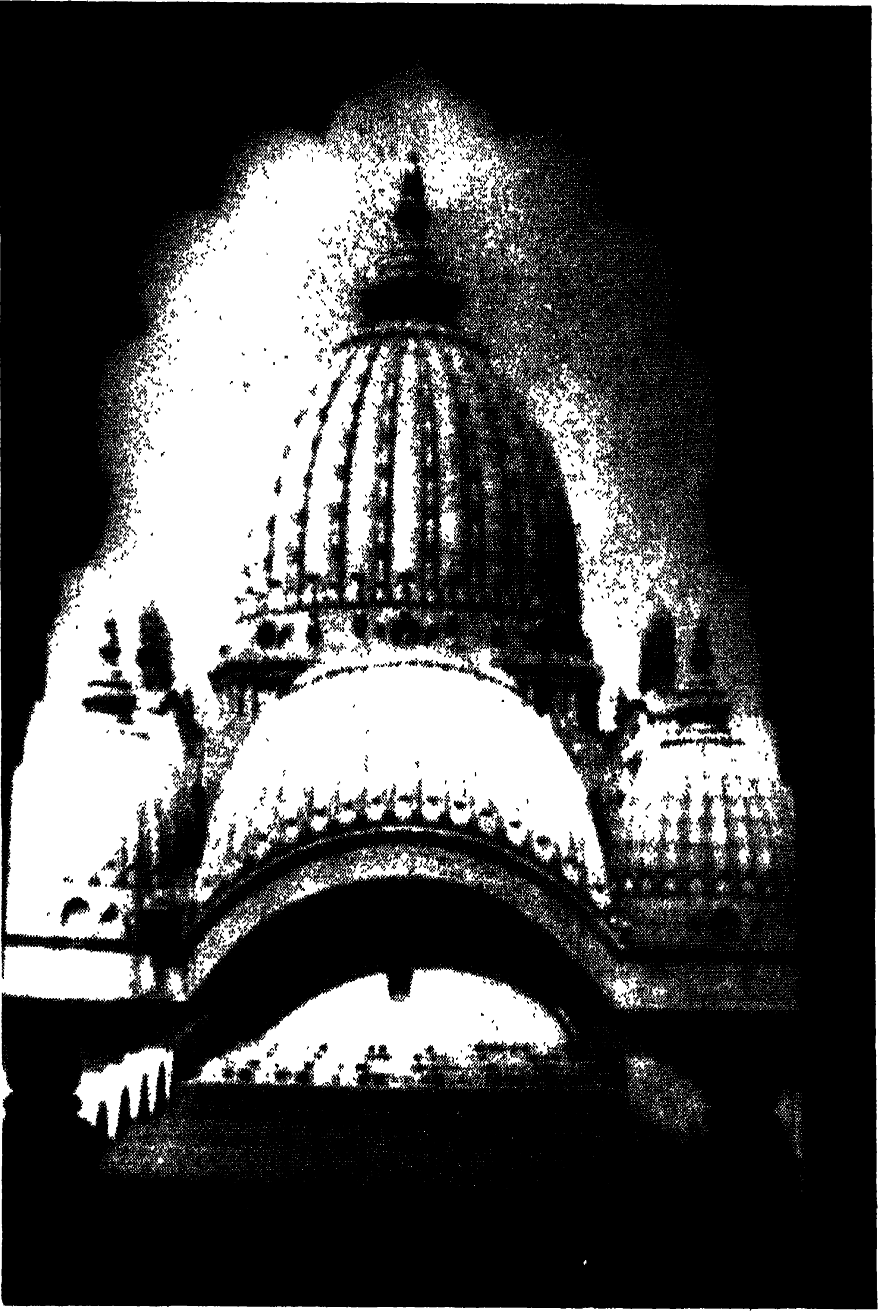
প্রবেশপথ : নহবতের নীচে বিশাল উন্মুক্ত খিলান অজন্তার চৈত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়



প্রবেশপথ · বৌদ্ধ গুহাস্থাপত্য রীতির খিলান, কেন্দ্রস্থলে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রতীক



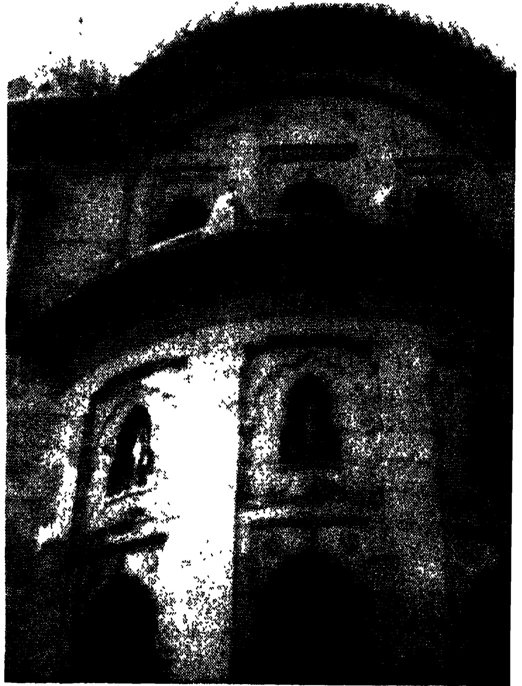
প্রবেশপথ : খিলানের ভারবহনকারী স্তম্ভের শীর্ষদুটি কুণ্ডলীপাকানো অবস্থায় দুইপ্রান্তে প্রসারিত—ভারহুত বা সাঁচীতে যেমন দেখা যায়



গর্ভমন্দিরের উপর বিমান-মণ্ডলী : মধ্যস্থলে কেন্দ্রীয় শিখরটি অন্যগুলির চেয়ে উঁচু ; এর চারকোণে চারটি শিখর এবং প্রতিজোড়া শিখরের মধ্যবর্তীস্থানে বক্র-রেখ ছাদ দেওয়া একটি করে ছত্রী। সবগুলি মিলে শিখরের এক মনোমুগ্ধকর মণ্ডলী—যা মধ্যযুগের শেষে বাংলার মন্দির-স্থাপত্যেও দেখা যায়।



গর্ভমন্দিরের পার্শ্বদৃশ্য : প্রদক্ষিণ-বীথির বাইরের দিকে স্তম্ভশ্রেণীসমন্বিত বাঁকানো অংশ ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্যের কথা মনে করিয়ে দেয় যদিও খিলান ও স্তম্ভগুলি স্যারাসিন-রীতির



পার্শ্বদৃশ্য : উপরের অংশ—
নিকট থেকে



চিতোরের কীর্তি-স্তম্ভের অনুরূপ চৌকোণা স্তম্ভ সমন্বিত গবাক্ষ

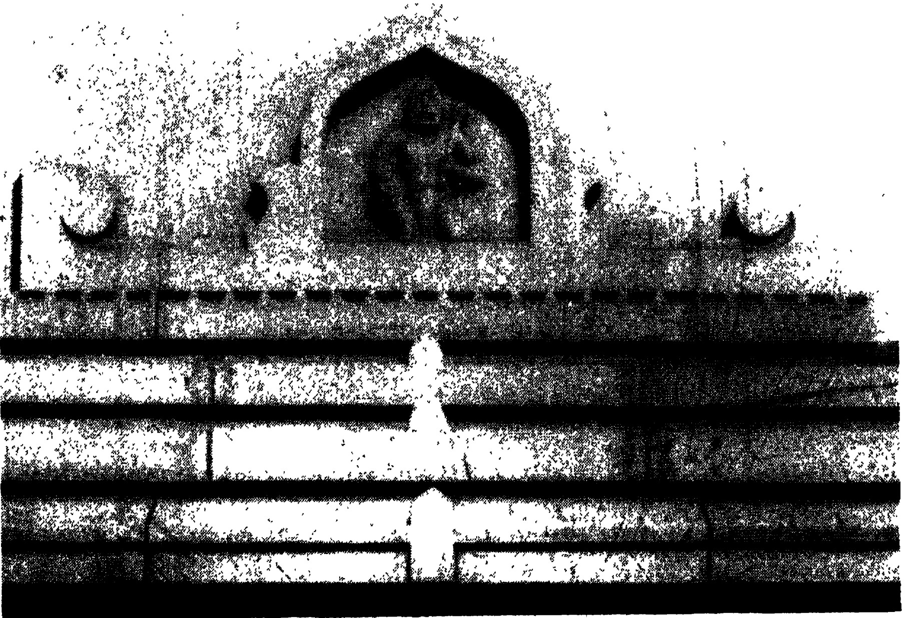


হিন্দুস্থাপত্য-রীতির চতুস্রব্রহ্মকাণ্ড স্তম্ভের উপর গজমস্তক-যুক্ত প্রলম্বিত আলম্ব সমন্বিত সরদল

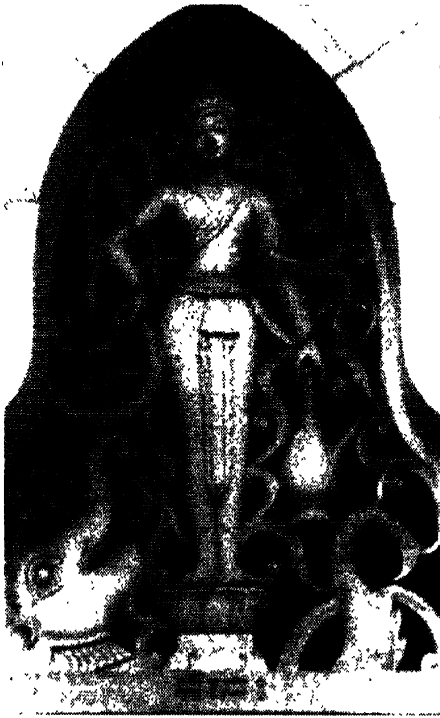


নাটমন্দিরের পার্শ্বস্থ প্রবেশপথ : প্রবেশপথের দুই পাশের স্তম্ভ চিতোরের কীর্তি-স্তম্ভের অনুরূপ

মন্দিরের উপরের দিকে জালিকাজ করা ঝুল-বারান্দা দেওয়া গবাক্ষ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর রাজপুত-স্থাপত্যরীতির অনুরূপ



নাটমন্দিরের পশ্চিমদিকের

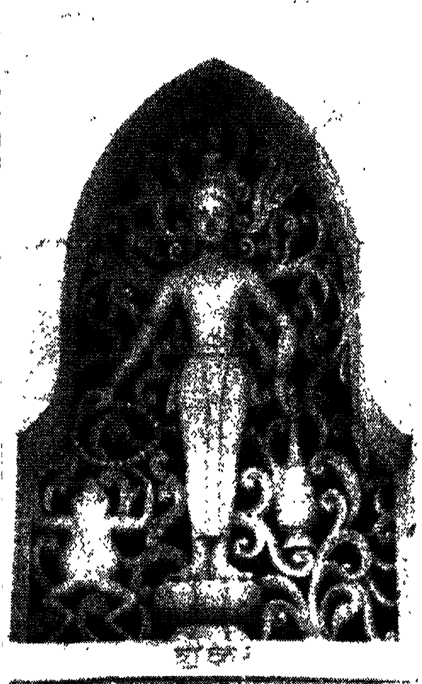


গর্ভমন্দির বেষ্টন করে
নবগ্রহমূর্তি









গর্ভমন্দির বেষ্টন করে
নবগ্রহমূর্তি







গর্ভমন্দিব বেষ্টন কবে
নবগ্রহমূর্তি





গর্ভমন্দিরে ডমরু আকৃতি মর্মরবেদীর উপর উপবিষ্ট সমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি,
বেদীর সম্মুখভাগে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মীহংস

মূল্য না দিয়ে মানসিক অবস্থাকে উন্মোচন করতে ব্রতী।...ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প গ্রীসের চেয়ে অনেক উন্নত ধরনের, কারণ ভারতীয় সৃষ্টি সবসময়েই একটা ভাবকে প্রকাশ করতে ব্রতী, গ্রীক স্থাপত্য যা করেনি।"

শিল্পকলায় প্রতীকের বা প্রতীকতার গুরুত্ব অমেয়। বিবেকানন্দ প্রতীক সম্বন্ধে উক্তি করেছেনঃ "জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে মানুষ প্রতীক বা বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক রূপের মাধ্যমে সূক্ষ্মকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।"

স্বামীজী আরও কিছু উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন প্রতীকের ক্ষুদ্র আকার কোন বিরাট ভাবের প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্বের বিভিন্ন জাতির শিল্পে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণীয় ভঙ্গি কি, কিভাবে জাতির মৌলিক প্রকৃতি তার শিল্পের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে—সেই সত্যটি বিবেকানন্দ মাত্র কয়েকটি কথায় আশ্চর্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বিবেকানন্দ বলেছেনঃ "হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়াছেন আপেক্ষিককে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরমতত্ত্ব চিন্তা উপলব্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব; এবং প্রতিমা, ক্রুশ বা চন্দ্রকলা প্রতীকমাত্র, আধ্যাত্মিকভাব প্রকাশ করিবার অবলম্বন স্বরূপ।" রূপাতীত সত্য কিভাবে রূপের সত্য হয়ে প্রকাশিত হয় স্বামীজীর কথায় তাই বিভাসিত। পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং অধিমানসিক জগৎ—এই দুইয়ে মিলে মানুষকে যখন রূপের মাধ্যমে অরূপের অভিব্যক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তখন হয় শিল্পসৃষ্টি।

শিল্পের জন্যই শিল্প—এই কলাকৈবল্যবাদে স্বামীজী অবশ্যই বিশ্বাসী ছিলেন না। স্বামীজীর শিল্পতত্ত্ব অনুসারে শিল্পই শিল্পের পরমলক্ষ্য হতে পারে না। শিল্প মাধ্যম মাত্র। এক নন্দনতত্ত্ববিদের ভাষায় স্বামীজীর মতে '...শিল্পের সর্বোচ্চ গুণ তার প্রতীকী অভিধা।' রণদাপ্রসাদের কাছে স্বামীজীর রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতীকটির ব্যাখ্যায় আমরা এর প্রমাণ পাই।

সীমা ও অসীম ওতপ্রোতভাবে একত্ব লাভ করে ভারতীয় শিল্পকৃতির মধ্যে। 'আমরা দেখি শিশু-কৃষ্ণ (নীলমণি) স্বয়ং নীলবর্ণে অনন্তকেই প্রকাশ করছেন সীমাবদ্ধ যশোদার সসীম কোলে জন্মগ্রহণ করে। স-সীম ও অ-সীমের এরূপ সহজ প্রতীক অন্যদেশের শিল্পীদের পক্ষে আনা সহজ নয়'—সম্প্রতিকালের এক ভারতীয় শিল্পী ও শিল্পতত্ত্ববিদের বক্তব্য এটি।

গ্রীক (Pagan) দেবতারা কেউই রূপক দেবতা ছিলেন না। অ্যাপোলো (Apollo) সূর্য, আর্টেমিস (Artomis) উষা বা জিউস (Zeus) গগনের দেবতা—এঁরা সবাই দেখতে ছিলেন অবিকল বাস্তবের মানুষের মতো। ভারতবর্ষের প্রতিমা দেবতার প্রতিকৃতি নয়—দেবতার গুণাকৃতি অর্থাৎ গুণের ভাবরূপ।

আমরা স্বামীজীর শিল্পতত্ত্বের কেন্দ্রীয় প্রতীতিগুলি জানতে পারি স্বামীজীর বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের রূপকল্পনার সম্বন্ধসূত্রে। স্বামীজীর পরিকল্পনার ভিত্তিতে নির্মিত এই মন্দিরটি দর্শনের পর এই স্থাপত্যকীর্তিটি যে স্বামীজীর শিল্পতত্ত্বেরই প্রয়োগের নিদর্শন তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। অর্থাৎ স্বামীজীর শিল্পদর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির—এই দুটিকে আলাদাভাবে না দেখে একটিকে তত্ত্ব ও অপরটিকে তার সফল প্রয়োগরূপেই দেখা উচিত। স্বামীজীর একটি উক্তি এখানে স্মরণীয়ঃ "স্থাপত্য ও বাড়ির মধ্যে তফাৎ হল, প্রথমটি একটি ভাবকে প্রকাশ করে, পরেরটি একটি কাঠামো, প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে

তৈরী। কি পরিমাণে ভাবকে প্রকাশ করতে পেরেছি, তার উপর কোন জিনিষের মূল্য নির্ভর করে।"

বিবেকানন্দের স্বপ্ন-সাধ ছিল রামকৃষ্ণ সংঘের কেন্দ্র বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের স্থাপত্য হবে শ্রীরামকৃষ্ণ আচরিত ধর্ম ও প্রচারিত তত্ত্বের রূপায়ণ। অন্যদিক থেকে—ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদি কলাশিল্প যেহেতু কোনও তত্ত্বগত সত্য বা তাত্ত্বিকতাকে প্রকট করে তোলার কোনও রসহীন মাধ্যম নয়, সৌন্দর্য যেহেতু শিল্পের অনবচ্ছেদ্য গুণ, তাই বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের স্থাপত্যকে করতে চেয়েছিলেন সৌন্দর্যমণ্ডিত। এই প্রসঙ্গের সম্বন্ধসূত্রে আমরা অনিবার্যভাবেই মুখোমুখি হই নন্দনতত্ত্বের অন্যতম মৌলিক প্রশ্নের—সৌন্দর্য কি? প্রশ্নটি নিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি সুন্দর আলোচনা পাওয়া যায় যাতে তিনি বলেছেন জগতে কোনও কিছুকে ভাল বা লক্ষণীয়, প্রধান বা তুলনায় উৎকর্ষযুক্ত হতে হলে, তার প্রধান উপলব্ধি-যোগ্য গুণ থাকবে, তার সৌন্দর্য; ভারতের আর্যজাতির সুপ্ত চেতনায় সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষের পরস্পরের সংযোগ সম্বন্ধে এই রকম একটি বোধ বা বিচার ছিল; সেইজন্য 'শ্রী' শব্দ থেকে সাধিত, 'শ্রী'র তারতম্য বা অতিশায়ন বাচক দুটি শব্দ 'শ্রেয়স্' (শ্রেয়ান্, শ্রেয়সী, শ্রেয়ঃ) এবং 'শ্রেষ্ঠ' সংস্কৃত ভাষায় সর্ববিধ উৎকর্ষের, এমনকি চরম বা পরম উৎকর্ষের অর্থে প্রযুক্ত হয়ে আসছে। 'শ্রী' শব্দের প্রধান ও প্রাচীনতম অর্থ, নেত্রের সাহায্যে দর্শনীয় দ্যুতিমান সৌন্দর্য; যাতে অত্যধিক পরিমাণে এই 'শ্রী' বা সৌন্দর্য আছে, তাই 'শ্রেয়স্', তাই 'শ্রেষ্ঠ'—সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ দুই যেন মিশে গিয়েছে। অধিকন্তু, কোনও পদার্থ 'সুন্দর' হলে মঙ্গলময় হবে—এই বোধেই সৌন্দর্য-বাচক কল্যাণ (কল্য) শব্দের প্রাথমিক অর্থ 'সুন্দর', 'মঙ্গল' 'ক্ষেমংকর' এই অর্থে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়েছে। 'আবার, যা ভাল করে বোঝা যায়, চিৎশক্তির দ্বারা যা গ্রহণ করা যায়, তা-ই 'চিত্র' (চিৎ-র) অর্থাৎ 'সুন্দর'। আবার মৌলিক সেই প্রশ্নে ফিরে আসা যাক—সৌন্দর্য কি? বিবেকানন্দের নিজের কথায় "...মানুষের মুখে, আকাশে, তারায় অথবা চন্দ্রে যে সৌন্দর্যের বিকাশ দেখা যায়, তাহা কোথা হইতে আসিল? উহা সেই ভগবানের সর্বব্যাপী সৌন্দর্যের আংশিক প্রকাশ।" সৌন্দর্য কি—এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত পার্থিব-সৌন্দর্যের নেত্রগ্রাহ্য সান্ত সীমারেখাকে অতিক্রম করে ধাবিত অনন্তের দিকে। বিশ্বের তাবৎ সৃজিত বস্তু প্রকৃতি ও প্রাণীর সৌন্দর্যে তবে রয়েছে পরম স্রষ্টারই সৌন্দর্যের আভাস—সৌন্দর্য তবে ঈশ্বরেরই বিভূতির প্রকাশ! 'জগতে নিসর্গজাত বস্তুর পরেই, মানুষের শিল্প-রচনাকে ঈশ্বরের সত্তার এবং তাহাতে নিহিত শাশ্বত সৌন্দর্যের অংশ-স্বরূপ বলা যায়।' গীতায় এই তত্ত্বেরই প্রতিচ্ছায়া: 'তুমি ইহা জানিও যে, বিভূতি বা ঐশ্বর্য-যুক্ত, শ্রী বা শোভা-যুক্ত এবং শক্তিমান বা প্রভাবশালী যে যে পদার্থ আছে, সে-সমস্তই আমারই তেজ বা শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন (১০।৪১)।'

সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবেকানন্দের প্রতীতীর কেন্দ্রবিন্দু আমরা খুঁজে পাই এই মন্ত্রে:

ওঁ নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়॥

'তোমাকে নমস্কার; তুমি চিৎ বা জ্ঞান-শক্তি; সমস্ত রূপ বা নেত্রগ্রাহ্য সৌন্দর্যের আভ্যন্তর আত্মা তুমি'। বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের বিমান-মণ্ডলী, বক্ররেখছাদসমন্বিত ছত্রী, প্রদক্ষিণ-বীথি, চতুরস্র ব্রহ্মকাণ্ড স্তম্ভের উপর গজমস্তকযুক্ত সরদল, অজন্তার চৈত্যের

মতো বিশাল উন্মুক্ত খিলান, খ্রীস্টীয় ভজনালয় ও একই সঙ্গে ভারতীয় গুহাস্থাপত্যের অভ্যন্তরভাগের সাদৃশ্যযুক্ত নাটমন্দিরের বর্তুলাকার দীর্ঘছাদ, স্যারাসিন-রীতির খিলান ও স্তম্ভ—সবকিছু মিলিয়ে এক আশ্চর্য সৌন্দর্যমণ্ডিত সৃষ্টি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ও বিশ্বের সামনে রেখে গেছেন যে সমন্বয়ের আদর্শ—বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের সর্বাঙ্গে তারই স্থাপত্যগত প্রতিফলন, যার পরিকল্পনায় রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের সমন্বয়ী প্রতিভা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের মূল নকশা প্রস্তুতের প্রায় তিন দশক পরে ১৯২৯ সনে রামকৃষ্ণ সংঘের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট স্বামী শিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি ১৩ মার্চ বেলুড় মঠের জমিতে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরে পাকাপাকিভাবে মন্দিরের স্থান নির্বাচিত হলে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে ১৬ জুলাই গুরু পূর্ণিমায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ভিত্তিপ্রস্তরটি একশ ফুট দক্ষিণে সরিয়ে বর্তমান মন্দিরের বনিয়াদ স্থাপিত করেন।

মার্টিন কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ সরকারের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাওয়া হয়। তিনি মার্টিন কোম্পানীর সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারকে বিষয়টি জানান এবং মঠ কর্তৃপক্ষ মার্টিন কোম্পানীর সিনিয়ার পার্টনার স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করে আলোচনার পর ঠিক হয় খরচপত্র এবং সামান্য কিছু লাভের বিনিময়ে মার্টিন কোম্পানী মন্দিরের নকশা তৈরি ও মন্দির নির্মাণ, এই দুটি কাজই করবে।

সেই সময় মার্টিন কোম্পানীর স্থপতি ছিলেন মেজর হেরল্ড ব্রাউন। তিনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সঙ্গে মন্দিরের ডিজাইন বা নকশা নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন যে স্বামী বিবেকানন্দের অনুমোদিত নকশা থেকে তিনটি জিনিস প্রতীয়মান হয়ঃ প্রথমত স্বামীজী চেয়েছেন গর্ভমন্দিরের ছাদটি হবে ডমিক্যাল বা গম্বুজাকৃতি, দ্বিতীয়ত ইউরোপীয় চার্চের মতো নাটমন্দির বা গর্ভমন্দিব একসঙ্গে যুক্ত থাকবে, তৃতীয়ত মন্দিরটির আরকিটেকচারাল মোল্ডিং বা আভরণ হবে ভারতীয় রীতিতে। নির্মিতির প্রয়োজনে ও অন্যান্য কারণে স্বামীজীর অনুমোদিত মন্দিরের মূল নকশার কিছু রদবদলের প্রয়োজন হয় এবং মঠ কর্তৃপক্ষ তিনটি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে, মন্দিরের রূপকল্পনার মূল মর্মবস্তুকে নষ্ট না করে নকশার কিছু কিছু পরিবর্তন করার অনুমতি দেন। গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটিকে কেন্দ্র করে মার্টিন কোম্পানীতে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করেন বিকল্প হিসাবে দুটি ভিন্ন নকশা প্রস্তুত করা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে স্থপতি মেজর হেরল্ড ব্রাউন তাঁর ইউরোপীয় সহকারীর সহায়তায় একটি নকশা প্রস্তুত করেন এবং অপরটি করেন গোপেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার ও আরকিটেকচারাল ড্রাফটসম্যান সুশীলবাবু। আকৃতি-প্রকৃতি ও রূপারোপের দিক থেকে দ্বিতীয় নকশাটি অধিকতর ভারতীয় প্রতীয়মান হওয়ায় মঠ কর্তৃপক্ষ এই নকশাটিই অনুমোদন করেন এবং এরই ভিত্তিতে মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করার আদেশ দেন।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ সরকারের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় তিনি ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য স্বামী প্রবোধানন্দের সঙ্গে রাজপুতানা ও উত্তর ভারতে বেশ কিছুদিন পরিভ্রমণ করে নানা শিল্পশৈলীর মন্দির স্থাপত্য পরিদর্শন করেন। বৃন্দাবনের

অদূরে অবস্থিত মন্দিরে চূড়ার কাজ তাঁকে প্রভাবান্বিত করে। পরে মন্দিরের নকশার কাজে ব্যাপৃত আরকিটেকচারাল ড্রাফট্‌সম্যান সুশীলবাবুকে জালি ও অন্যান্য গঠন কার্যের নকশা করে আনার জন্য ঐসব স্থানে পাঠানো হয়। সমগ্র মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে দুশ পঁয়ত্রিশ ফুট, প্রস্থে একশ চল্লিশ ফুট, আয়তনে বত্রিশ হাজার নয়শ বর্গফুট। নাটমন্দিরের অভ্যন্তরের মাপ, দৈর্ঘ্য একশ বাহান্ন ফুট, প্রস্থ বাহাত্তর ফুট ও আটচল্লিশ ফুট উচ্চতা। গর্ভগৃহের দৈর্ঘ্য ছাব্বিশ ফুট ও প্রস্থ ছাব্বিশ ফুট। এর চারিপাশে প্রস্থে দশ ফুট প্রদক্ষিণ-বীথি রাখা হয়েছে। গর্ভমন্দিরের উপর বড় গম্বুজ। মাটি থেকে মন্দির শীর্ষের উচ্চতা একশ আট ফুট। বড় গম্বুজের নীচে শ্যালো ডোম বা ছোট গম্বুজগুলির উচ্চতা ষাট ফুট। মন্দিরটি চুনার পাথরে নির্মিত। নাটমন্দিরের সামনের দিকে আটাত্তর ফুট উচ্চতার মূল প্রবেশদ্বার। নাটমন্দিরের পশ্চিম ও পূর্বদিকে দুটি প্রবেশ পথ। গর্ভমন্দির বেষ্টন করে প্রদক্ষিণ বীথির উপরের দিকে নবগ্রহের মূর্তি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু এই মূর্তিগুলি অঙ্কিত করে দেন এবং ঐগুলি অবলম্বনে পাথরে খোদিত করে যথাস্থানে বসানো হয়।

গর্ভমন্দিরের অভ্যন্তরে মর্মর বেদীর উপর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিমগ্ন উপবিষ্ট মূর্তিটি ভাস্কর গোপেশ্বর পাল নির্মিত। ডমরু আকৃতি মর্মর বেদীটির নকশা নন্দলাল বসু অঙ্কিত। তাঁরই পরিকল্পনা অনুসারে বেদীর সম্মুখভাগে একটি ব্রাহ্মীহংস উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এই বেদীর অভ্যন্তরে 'আত্মারামের' কৌটায় শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ রক্ষিত। প্রায় চার বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় মোট আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির নির্মিত হয়।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় পরিকল্পনা অনুসারে বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে বহু রকমের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব হয়েছিল। মন্দিরের নির্মাণ কার্য এত কম খরচে ও কম সময়ে সুচারুরূপে সম্ভব করে তোলার ব্যাপারে মার্টিন কোম্পানীর মতো অভিজ্ঞ ও সুপ্রসিদ্ধ সংস্থার ঐকান্তিক সাহায্য ও আমাদের দেশীয় পরিকল্পনাবিদ, কারুশিল্পী ও কারিগরদের কৃৎকৌশল ও দক্ষতা বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

স্বামী অখিলানন্দ ও দুই মার্কিন মহিলা-ভক্ত শ্রীমতী উর্স্টার ও শ্রীমতী রুবেল (সিস্টার অন্নপূর্ণা ও সিস্টার ভক্তি) মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আমেরিকা থেকে বেলুড় মঠে এসেছিলেন। মন্দির নির্মাণের ব্যয়ভারের গরিষ্ঠাংশই এঁরা দুজন বহন করেন। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে ১৪ জানুয়ারি বিধিপূর্বক পূজা, যাগযজ্ঞ সহকারে মন্দির উৎসর্গ করা হয়। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থিপাত্র মন্দিরে স্থাপন করেন ও গভীর অনুরাগের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে মন্দিরে অবস্থান করতে প্রার্থনা জানান।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ

নিমাইসাধন বসু

শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে নানান দেশে বহু সভা, সম্মেলন, সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে অসংখ্য স্মারকগ্রন্থ, বিবেকানন্দ বিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্ত ও অনুরাগী, এই ভাবধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তাঁদের দৃষ্টিতে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের শতবর্ষপূর্তির উৎসব এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই বৃত্তের বাইরেও ঐতিহাসিক, দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে গবেষক-অধ্যাপক এবং অনুসন্ধিৎসু মানুষ আছেন যাঁরা এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা, পড়াশোনা এবং আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন কিংবা বলা যায়, উৎসাহিত হয়েছেন। আর রয়েছেন এক বিশালসংখ্যক নানান শ্রেণীর মানুষ যাঁরা শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না। জানলেও শত বৎসর পূর্বের ঐ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁদের কোনও আগ্রহই নেই। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে সংগত কারণেই এই ঔদাসীন্য মনোবেদনার কারণ হলেও বাস্তব সত্যটি অস্বীকার করার উপায় নেই। এর কারণগুলি বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লেখা যেতে পারে। সে অবকাশ অবশ্য এখানে নেই। কিন্তু একটি কথা অনস্বীকার্য। বর্তমান বিশ্বে (ভারত তার বাইরে নয় কোনও দিক থেকেই) নতুন প্রজন্মের কাছে 'ধর্ম' বিষয়টি যে শুধু আকর্ষণ ও আগ্রহ হারাচ্ছে তাই নয়, 'ধর্ম' সম্বন্ধে এক অনীহা বা বীতরাগ দেখা দিয়েছে। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলা যায় যে, বর্তমান বিশ্বের দুঃখ-দারিদ্র্য, শোষণ-বঞ্চনা, হিংসা-বিদ্বেষ, সন্ত্রাস-রক্তপাত, সামাজিক কুসংস্কার, বৈষম্য, নারীর অবমাননা ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যার জন্যে অনেকেই সর্বপ্রথমে 'ধর্ম'কে দায়ী বলে চিহ্নিত করছেন। ধর্মীয় 'মৌলবাদ' এক ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধির মতো ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সবকিছু মিলে এমন এক পরিবেশ ও মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে শতবর্ষ পূর্বে অনুষ্ঠিত একটি ধর্মসম্মেলনে এক তরুণ ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসী কী বলেছিলেন বা করেছিলেন সে নিয়ে এতখানি উৎসাহ, উদ্দীপনা, আলোচনা ও লেখালেখি সত্যিই বিস্ময়কর। ঘটনাটিকে অভূতপূর্ব বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। এই কথাগুলি মনে রাখলে এটা না মেনে উপায় নেই যে স্বামী বিবেকানন্দ মানুষটি একটি বহু সমালোচিত ও রাজনৈতিক মানদণ্ডে প্রায় ক্ষমতাহীন ধর্মের এবং দেশের মানুষ হয়েও আজও সগৌরবে

বিরাজ করছেন। মানুষটিকে ভুলে যাওয়া তো দূরের কথা, নতুন করে তাঁর জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারার আলোচনা শুরু হয়েছে। গত দু'দশকে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যত গবেষণা হয়েছে তা জানলে বিস্মিত হতে হয়। অনেকক্ষেত্রেই বিবেকানন্দ কঠোরভাবে সমালোচিত। কোনও কোনও গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পড়লে মনে হবে স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারাকে নস্যাৎ করার যেন জরুরি প্রয়োজন বোধ করছেন কিছু মানুষ। কিন্তু প্রায় কালাপাহাড়ী চিন্তা ও উদ্দেশ্যপ্রসূত লেখাগুলি এটাও নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে স্বামী বিবেকানন্দকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। ভারতবর্ষের ইতিহাস, বর্তমান জীবন এবং চিন্তার সর্বক্ষেত্রে এক অতিকায় মানব বা Colossus-এর মতো তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। সর্বত্র তার ছায়া ও প্রভাব সুস্পষ্ট।

কে বিবেকানন্দ, কেন বিবেকানন্দ? ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, নারীবাদ বা নারীজাগরণ, মানব অধিকার, মানুষের সমমর্যাদা, বিশ্বজনীনতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবিকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোথায় তাঁর অবস্থান? এইসব প্রশ্ন নতুন করে উঠছে ও আলোচিত হচ্ছে। এর সামগ্রিক ফল হল আরও গভীরভাবে বিবেকানন্দ চর্চা—অস্পষ্ট, অজানা বিবেকানন্দকে নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণেব মাধ্যমে আবিষ্কার করা। ভক্ত ও অনুরাগী পরিমণ্ডলের বাইরে যে বৃহত্তর জগৎ রয়েছে সেখানে বিবেকানন্দের অবস্থান আরও সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বর্তমান প্রবন্ধে তারই কিছু ইঙ্গিত তুলে ধরছি।

শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন ও ঐ সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিদেশে যেসব অনুষ্ঠান হয়েছিল তার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল প্যারিসে ইউনেস্কোতে (UNESCO) আয়োজিত একটি সভা। ইউনেস্কো সভাগৃহে এই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ৮ অক্টোবর, ১৯৯৩-এর সন্ধ্যায়। ইতিপূর্বে ইউনেস্কো হলে, ইউনেস্কোর সহযোগিতায় কোনও একটি ধর্মের নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও একটি ধর্মীয় সম্মেলনকে স্মরণ করতে এরকম এক বৃহৎ সভা হয়নি। ইউনেস্কোর ইতিহাসে এ ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন। এই প্রচেষ্টার উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইউনেস্কোতে ভারতীয় প্রতিনিধি দল (Indian Delegation to the UNESCO)। ভারত সরকার এই উদ্যোগকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু সবকিছু উদ্যম ও উদ্যোগের পিছনে ছিলেন কয়েকজন বিবেকানন্দ অনুরাগী মানুষ যাঁরা কর্মসূত্রে ইউনেস্কোর সঙ্গে যুক্ত বা প্যারিসে দীর্ঘকাল বসবাস করছেন। এঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন বিকাশ সান্যাল। বিকাশবাবু দীর্ঘকাল প্যারিসে ইউনেস্কোর উচ্চ দায়িত্বশীল পদে কর্মরত। বর্তমানে তিনি Senior Programme Officer, International Institute for Educational Planning UNESCO. বিকাশবাবু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় লালিত ও অনুপ্রাণিত। স্বামী লোকেশ্বরানন্দের ছাত্র ও স্নেহধন্য। নরেন্দ্রপুরে অধ্যাপনা করেছিলেন বিদেশে যাবার আগে। তাঁর প্রচেষ্টায় তিনি পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন প্যারিসের অদূরবর্তী গ্রেৎসের (Gretz) রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টারে (Centre Vedantique Ramakrishna) স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ, স্বামী বীতমোহানন্দ, স্বামী দেবাত্মানন্দ, স্বামী গঙ্গানন্দ ও অন্যান্য কর্মীদের। অনুপ্রেরণার উৎসস্থল ছিলেন স্বামী ঋতজানন্দ (বর্তমানে প্রয়াত)।

শ্রীসান্যালের সর্বপ্রথম কাজ ছিল ইউনেস্কোর ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ ফ্রেডেরিকো মেয়রকে (Dr. Frederico Mayor) এরকম একটি অনুষ্ঠান করার যৌক্তিকতা বোঝান। কাজটি সহজ ছিল না। কেননা, হঠাৎ এইরকম অনুষ্ঠান কেন ইউনেস্কো অনুমোদন করবে, কী কারণে স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম ও চিন্তাধারাকে ইউনেস্কোর সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় তা সংশয়াতীতভাবে নিজে না বুঝলে ডিরেক্টর জেনারেলের পক্ষে এরকম এক প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া সম্ভব ছিল না। বিকাশবাবু প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানের পক্ষে যুক্তি-তথ্য দিয়ে একটি স্মারকলিপি ডঃ মেয়রকে দেন। এটি পড়ে ডঃ মেয়রের দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে স্বামী বিবেকানন্দ ইউনেস্কোর যা আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী তা অর্ধশতাব্দী পূর্বেই তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের (১৮৯৭) মাধ্যমে তিনি তা কার্যকরী করতে ব্রতী হয়েছিলেন।[১] সেই যুগে ইউনেস্কোর চিন্তাব জন্মও হয়নি।

ইউনেস্কোতে অনুষ্ঠিত সভার সূচনার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন সম্বন্ধে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডিরেক্টর জেনারেল মেয়র। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে তিনি যে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন তার গুরুত্ব অসীম। তিনি সচেতন ছিলেন যে বিবেকানন্দকে কেন্দ্রবিন্দু করে ইউনেস্কোতে এইরকম একটি সভা ও প্রদর্শনী করার সিদ্ধান্ত অনেকের মনেই প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। কোনও কোনও দেশের প্রতিনিধিদের মনে কিছুটা অসন্তোষ ও বিরূপতা থাকাও অস্বাভাবিক ছিল না। তাই পুরো ভাষণটির মধ্যেই একটা ব্যক্তিগত ও ইউনেস্কোর সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমাণের সুর ছিল খুব সুস্পষ্ট। আমরা ভারতীয় হয়েও যে ঐতিহাসিক সত্য সাহসের সঙ্গে প্রকাশ্যে বলতে দ্বিধা বোধ করি বা স্বীকার করতে চাই না ইউনেস্কোর ডিরেক্টর জেনারেল সেই কথা সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন। শুধু তাঁর পদমর্যাদার জন্যেই নয়, স্পেনের এক খ্যাতনামা কবি ও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিমান বুদ্ধিজীবিরূপেও তাঁর ঐ বক্তব্যের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে এবং এক ঐতিহাসিক দলিলরূপে তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সমগ্র ভাষণটি নথিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন ঃ

Three factors attracted me to join you in the celebration of the centenary of Swami Vivekananda's participation in the World Parliament of Religions in Chicago, hundred years ago.

First, his commitment towards universalism and tolerance. He said from the tribune of the parliament and I quote : "I fervently hope that the bell that tolled this morning in honour of this convention may be the death-knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen."

I am sure all of us present here have the same aspiration even today.

I am pleased to note that the spirit of universalism permeates through all the events of today's programme : the exhibition, the lectures and the musical recital.

Second, his concern for the poor and the destitute. The mission that he established in India and which has now spread all over the world, is working to reduce poverty and eliminate discrimination among the different segments of society. He said : "The uplift of the women, the awakening of the masses must come first and only then can any real good come about."

Third, his preoccupation for human development with education, science and culture as instruments for such development.

I was struck by the similarity of the articles of the constitution of the Ramakrishna Mission which Vivekananda established in 1897 with those of UNESCO prepared in 1945. Both organizations have put human being as the centre for development. Both organisations have placed tolerance at the top of the agenda for building peace and democracy. Both recognise the many dimensions of being human in different cultural and social contexts. The world today is going through a period of transition. It appears that the hidden evils namely racism, ethnicity and inter-religious conflicts are coming back with increased force. Celebrations like this today give us strength and encouragement to fight against these evils.

I, therefore, have pleasure in declaring this commemorative evening open.[২]

ভাষণটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অসাধারণ। ডঃ মেয়র জানালেন যে, তাঁর মতে ইউনেস্কো স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে প্রদর্শনী ও আলোচনার আয়োজনের উপযুক্ত প্রেক্ষাপট। কেননা স্বামীজীই শুনিয়েছিলেন বিশ্বজনীনতা ও সহিষ্ণুতার কথা। তিনি দরিদ্র ও আর্তের সেবা, সকল প্রকার বৈষম্যেব দূরীকরণ, নারীজাগরণ ও গণজাগরণের প্রতি ছিলেন অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এর মধ্যে দিয়েই মানুষের প্রকৃত কল্যাণসাধন সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সংবিধান যা ১৮৯৭ সালে রচিত হয়েছিল তার সঙ্গে ১৯৪৫ সালে রচিত ইউনেস্কোর সংবিধানের সাদৃশ্য দেখে তিনি চমৎকৃত। উভয় সংবিধানেই কেন্দ্রমূলে রয়েছে মানুষ। উভয় সংস্থাই শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে সহিষ্ণুতাকে। মানুষের সমষ্টিগত ঐতিহ্যের মধ্যে সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানামুখী বৈচিত্র্যের অবস্থানকে স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলে স্বীকৃতি জানিয়েছে। পরিশেষে ডঃ মেয়র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেন কেন আজকে ঐ ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠান করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে বর্তমান বিশ্ব এক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। জাতি ও গোষ্ঠী-বৈষম্য, ধর্মীয় সংঘাত আরও শক্তিশালী হয়ে মাথা চাড়া দিয়েছে। এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শক্তি ও সাহস যোগাবে এই রকম অনুষ্ঠান।[৩]

ইউনেস্কোর সমগ্র অনুষ্ঠানটির মূল সুরও ছিল অনুরূপ। ভারত-ফ্রান্স মৈত্রী সমিতির (France-Union Indienne) অধ্যক্ষা মনিকা মোরাজ (Madame Monica Moraze) পৌরোহিত্য করেন। ভারতীয় আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন ডঃ হোসেনুর রহমান ও

আমি। হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সমন্বয় চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দের অবদান প্রসঙ্গে হোসেনুর রহমানের বুদ্ধিদীপ্ত মনোজ্ঞ ভাষণ শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেছিল। ভারত উপমহাদেশের সাম্প্রতিক হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে এমন এক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, একজন ইসলাম ধর্মের মানুষ, 'হিন্দু সন্ন্যাসী' বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলবেন এইটাই এই বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পাশ্চাত্যে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার পটভূমিতে বিবেকানন্দের ভাবনা-চিন্তার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাঁকে 'মৌলবাদী' আখ্যা দেওয়া যায় কিনা এই প্রশ্নটি বার বার উঠেছে বিভিন্ন আলোচনা সভায় ও রচনায়। আমাদের বক্তব্যের বিষয় ছিল 'বর্তমান যুগে স্বামীজীর বিশ্বজনীনতার প্রাসঙ্গিকতা'। প্রকৃত হিন্দুধর্ম ও তথাকথিত 'মৌলবাদ' কখনই সহাবস্থান করতে পারে না। শব্দ দুটি সুসঙ্গত নয়। আমার এই বক্তব্য কিছু শ্রোতাকে সম্ভবত বিস্মিত করেছিল। এই প্রসঙ্গটিও দেশে-বিদেশে বার বার উপস্থাপিত হয়েছে ও হচ্ছে। তৃতীয় বক্তা ছিলেন এক প্রখ্যাত ফরাসী বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক রজে পল দ্রোয়া (Roger Paul Droit)। বিকাশ সান্যাল আমাকে পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ফরাসীরা বিশেষ করে ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা বিতর্ক করতে ও শুনতে ভালবাসেন। এঁর বক্তৃতায় সেই ফরাসী চরিত্রের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু ভাষণটি ফরাসী ভাষায় হওয়ায় ও বক্তৃতা সম্পর্কে কোনও আলোচনার ব্যবস্থা না থাকায় ইউনেস্কোর অনুষ্ঠানে বিতর্কের কোনও সুযোগ ছিল না। সভার শেষপর্বে ছিল এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্বামী বিবেকানন্দের পছন্দ, তাঁর রচিত ও তিনি গাইতে ভালবাসতেন এমন কিছু স্তোত্র ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন শর্মিলা রায়, পোমো, মেলনী জ্যাক্‌স ও ব্রুনো কাইলত্। সমগ্র সঙ্গীতানুষ্ঠানটি এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ইউনেস্কোর ঐ অনুষ্ঠানে নানান দেশের মানুষের উপস্থিতি ও তাঁদের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয়েছিল যে অন্তত বেশ কিছু মানুষের মনে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে একটি আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এঁদের অনেকেই সম্ভবত ইতিপূর্বে স্বামীজীর নামই শোনেননি বা তাঁর সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানতেন না। তবে এ অজ্ঞতা কেবলমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধেই নয়। সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষ, ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি এবং বিশেষ করে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধেই তাঁদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বিবেকানন্দকে উপলক্ষ করে সে দিনের এ অনুষ্ঠান অন্তত কিছু শ্রোতার মনের জানালা খুলে দিয়েছিল। ইউনেস্কোতে এবং শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলন সম্বন্ধে ছোট-বড় অন্য যেসব অসংখ্য অনুষ্ঠান হয়েছে সেগুলি থেকে এটাই হল সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা।

অভিজাত ফরাসী আলোচনা সভার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আধুনিক ফরাসী বুদ্ধিজীবী, লেখক ও অধ্যাপকদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম প্যারিসের The Sciences Club of the Man ও The Association France-Union Indienne-এর যুগ্ম উদ্যোগে আয়োজিত একটি সেমিনারে। এটি হয়েছিল প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা বিভাগে, ১১ অক্টোবর। সারাদিনব্যাপী এই আলোচনায় প্রবেশাধিকার ছিল শুধুমাত্র আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। মোট আমন্ত্রিত ছিলেন সত্তর-আশি জন। বক্তা মাত্র পাঁচ জন। প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার ওপর ছিল বিশেষ গুরুত্ব। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল 'শতবর্ষ পরে বিবেকানন্দের

বিশ্বজনীনতা।' আমি অন্যতম আমন্ত্রিত বক্তা ছিলাম। হোসেনুর রহমান বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে উপস্থিত ছিলেন ও আলোচনায় সক্রিয় অংশ নেন। অন্যান্য বক্তারা (এবং সভাপতিও) ফরাসী ভাষায় বক্তব্য রাখায় আমাদের উভয়ের খুব অসুবিধা হয়েছিল। অবশ্য ফরাসী জানা কয়েকজন ভারতীয় আমাদের পাশে বসায় কিছুটা সুবিধা হয় মূল বক্তব্যগুলি বুঝতে। এঁদের অন্যতম হলেন বিকাশবাবুর স্ত্রী তৃপ্তি সান্যাল। প্রথম বক্তা সেই পল দ্রোয়া যিনি ইউনেস্কোর অনুষ্ঠানেও অন্যতম বক্তা ছিলেন। দ্রোয়ার বিষয় ছিল 'ভারত ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে বিবেকানন্দ।' দ্রোয়ার বক্তব্যে উপস্থিত ভারতীয় শ্রোতাদের মধ্যে অস্থিরতা ও কিছুটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে দেখলাম। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বললেনঃ "আপনাদের প্রতিবাদ জানান উচিত, উনি সব অযৌক্তিক কথাবার্তা বলে স্বামীজীর সমালোচনা করছেন।" তাঁদের কাছে অল্প কথায় যা জানলাম তা হল এই যে দ্রোয়ার মতে বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামীজী যেসব কথা বলেছেন তার মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। এর কারণ, স্বামীজীর জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনায় গভীরতার অভাব। বিবেকানন্দের বহু বক্তব্যের মধ্যেই স্বচ্ছতা ও সম্পূর্ণতার অভাব লক্ষণীয়, ইত্যাদি। হোসেনুর রহমান স্বামীজীর ধর্মসমন্বয় চিন্তা ও ঐ প্রসঙ্গে ইসলাম ও বেদান্ত সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতার কথা বললেন। আমি পল দ্রোয়াকে প্রশ্ন করলাম তিনি বিবেকানন্দের জীবন সম্বন্ধে কতখানি গভীরভাবে পড়াশোনা করেছেন বা ভেবে দেখেছেন। যদি তিনি স্বামীজীর সমগ্র জীবন ও রচনাবলী সেভাবে চর্চা করে থাকেন তাহলে তাঁর অজানা থাকার কথা নয় যে বিবেকানন্দ মাত্র ঊনচল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন এবং তাঁর ঐ স্বল্প জীবন কী বিশাল ও বৈচিত্র্যময় ছিল! এমন কোনও বিষয় ও সমস্যা ছিল না যে বিষয়ে তিনি তাঁর মৌলিক চিন্তার ছাপ রাখেননি। তিনি ছিলেন এক অসামান্য শক্তিশালী সৃজনশীল চিত্রশিল্পী বা ভাস্করের মতো। নিজের সৃষ্টির তাগিদে ও অনুপ্রেরণার মুহূর্তে তিনি একের পর এক ছবি এঁকেছিলেন। একটিতে একাগ্র হয়ে সময় দিয়ে সম্পূর্ণ করার পূর্বেই তাঁকে আবার অন্য কাজে, অন্য শিল্পকর্মে মন দিতে হয়েছে। পূর্বের ছবি বা ভাস্কর্যের রূপরেখাটুকুই রয়ে গেছে। সম্পূর্ণ করার সুযোগ আর ঘটেনি। কিন্তু ঐ রূপরেখাই ধরে রেখেছে এক বিস্ময়কর শক্তিশালী শিল্পীর প্রতিভার ছাপ। শুরু করা কাজটি তাঁর উত্তরসাধকরা সমাপ্ত করবে এটাই ছিল তাঁর আশা ও স্বপ্ন। আর যে সৃষ্টিগুলি তিনি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন সেগুলি যে কত মূল্যবান ও সম্ভাবনাময় তার প্রমাণের তো কোনও অভাব নেই। বর্তমান যুগের বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আধুনিক স্বাধীন ভারতবর্ষের গঠনের পিছনে, তাঁর কতটা স্থায়ী ও সুগভীর অবদান আছে সে বিষয়ে দ্রোয়ার আরও একটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন। দৃশ্যতই আমাদের সমালোচনা তাঁকে বিব্রত করে তুলেছিল। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে স্বামীজীর সমগ্র জীবন ও কর্ম, সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর পড়াশোনা সীমিত। দ্রোয়ার অন্তত এইটুকু ঔদার্য ছিল যে তিনি তাঁর সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিজের বক্তব্য সংশোধন করতে প্রস্তুত ছিলেন। পাশ্চাত্যের অন্য কোনও কোনও আলোচনাসভায় বক্তাদের মধ্যে ঐটুকু ঔদার্যও দেখিনি। স্বদেশেও অনুরূপ অভিজ্ঞতা যে হয়নি তাও নয়।

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন ফ্রান্স

(France) ভট্টাচার্য। দীর্ঘকাল ফ্রান্সে রয়েছেন তিনি। জন্মসূত্রে বাঙালী। স্বদেশের সঙ্গে নাড়ির টান এখনও প্রবল। প্রবন্ধটির নামকরণ করেছিলেন, 'Bengal in the Nineteenth Century from 'Young Bengal' to the Mother's Sons.' তাঁর বক্তব্যের শেষাংশে ছিল হিন্দু জাগরণ বা পুনরভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ। বিশেষ কোনও নতুন কথা বা তথ্য না থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অবদানের সপ্রশংস উল্লেখ ছিল তাঁর বক্তব্যে। স্বামী বিবেকানন্দ যে হিন্দুধর্ম আমেরিকা ও ইউরোপে প্রচার করেছিলেন তা যে তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রচলিত 'রক্ষণশীল সনাতন ধর্ম' নয় এই কথাটির ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিরূপে স্বামীজী পরস্পর-বিরোধী আকাঙ্ক্ষা ও কর্তব্যের দোটানায় পড়েছিলেন ('torn between conflicting aspirations and duties')। পরিশেষে ফ্রান্স ভট্টাচার্যের বক্তব্য ছিল ঃ "নিঃসন্দেহে স্বামীজীর আবেগপূর্ণ লেখনী ভারতীয় জাতীয়তাবোধে এক চড়া ধর্মীয় সুর সংযোজন করেছিল" ('Undoubtedly his passionate writings contributed to give to Indian nationalism its religious overtones')।

বিবেকানন্দের সামগ্রিক ভূমিকা ও দৃষ্টিকোণ (বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে) এবং বর্তমান কালের 'হিন্দু মৌলবাদ'-এর জন্ম ও প্রসার প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি বারবার উঠছে। প্রসঙ্গটি ক্রমেই খুব স্পর্শকাতর বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্যারিসের ঐ আলোচনা সভাতেই পরবর্তী বক্তা খ্রীস্তোফ জাফ্রেলো-র (Christophe Jaffrelot) বক্তব্যের বিষয় ছিল 'জাতীয়তাবাদের উৎস ঃ হিন্দু না ভারতীয় ?' জাতীয়তাবাদ বলতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু যে স্বামীজী তা জাফ্রেলো-র বক্তব্যের যে ইংরেজী সারাংশ শ্রোতাদের সুবিধার জন্যে দিয়েছিলেন তাতেই সুস্পষ্ট ছিল। সংক্ষিপ্ত সারাংশের নামকরণ করেছিলেন 'Vivekananda as forerunner of nationalism : Indian or Hindu ?' জাফ্রেলো-র মূল প্রতিপাদ্য হল বিবেকানন্দ এক 'বিশ্বজনীন-চরিত্রের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের' অন্যতম স্থপতিও ছিলেন না কিংবা হিন্দু-জাতীয়তাবাদের স্থপতিও ছিলেন না। বরং তাঁকে ঐ দুই-এর মধ্যবর্তী 'হিন্দু সর্বজনীন-জাতীয়তাবাদ'-এর প্রতীক বলাই সংগত হবে।[৪]

জাফ্রেলো তাঁর সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধে দেখান যে বিবেকানন্দ ব্রাহ্মদের মতো পাশ্চাত্য থেকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিদ্যা গ্রহণই তিনি চেয়েছিলেন। অন্যদিকে আর্যসমাজের হিন্দুদের জন্মগত কোনও শ্রেষ্ঠত্বের দায়িত্বকেও তিনি স্বীকার করেননি। স্বামীজীর অভিমত ছিল ঃ সহিষ্ণুতার আদর্শ ও ঐতিহ্যই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান ভিত্তি। আর, এই কথাটির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেই বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভার ও পাশ্চাত্য জগতের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অর্জন করেছিলেন। হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীনতাই হিন্দুদের আত্মবিশ্বাস ও লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করবে—এই কথাই স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা এবং প্রচার করেছিলেন। জাফ্রেলো-র সিদ্ধান্ত হল 'জাতীয়তাবাদ' (Nationalism)

এবং 'বিশ্বজনীনতা' (Universalism) আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হলেও বস্তুত তা নয়। তার প্রমাণ রয়েছে ফরাসী জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে। ফরাসী জাতীয়তাবাদই মানব অধিকারের মূল্যবোধ (Human Rights : values) তুলে ধরেছিল। কিন্তু বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদের মধ্যে জাতিতত্ত্বমূলক গূঢ়ার্থ বা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য (connotation) থাকায় 'হিন্দুত্বে'র সমর্থকরা তা নিজেদের মতো করে ব্যবহার করছেন। জাফ্রেলো-র মূল বক্তব্যগুলি নিয়ে বিতর্ক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই বিতর্কের প্রয়োজনও রয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগের সমস্যা ও সঙ্কটের পটভূমিতে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার এই বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের প্রচেষ্টা বিশেষ তাৎপর্যবহ— চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই যাকে স্বাগত জানাবেন।

শতবর্ষপূর্বে শিকাগো ধর্মমহাসভায় এবং পরবর্তী সময়ে আমেরিকা ও ইউরোপে কী প্রতিকূল পরিবেশে ও তীব্র বিরোধিতার মধ্যে বিবেকানন্দকে ভারতবর্ষ, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে হয়েছিল সে বিষয়ে অন্যত্র কিছু আলোচনা করেছি।[৫] শতবর্ষ পরেও সেই বিরোধী মানসিকতার তীব্রতার কিছু পরিচয় আজও পাওয়া যায়। প্যারিসের আলোচ্য সেমিনারেই তার আঁচ পেয়েছিলাম। আর ভেবেছিলাম এখনও যদি এই বাধা প্যারিসের মুক্তচিন্তার পরিবেশে, বিদগ্ধমহলে অনুভব করি তাহলে এক তরুণ অখ্যাত অনভিজ্ঞ হিন্দু সন্ন্যাসী আমেরিকায় তা কতখানি অনুভব করেছিলেন? কী পরিমাণ শক্তি, সাহস, পাণ্ডিত্য ও যুক্তির অধিকারী হলে ঐ যুগ ও পরিবেশে নিজেকে ও নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব ছিল? এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে বলা সম্ভবত অসমীচীন হবে না।

আমাকে প্যারিসের সেমিনারে বলতে বলা হয়েছিল 'রামকৃষ্ণ মিশন কি?' —এই বিষয়ে। বিষয়টি আমি নির্বাচন করিনি। সেমিনারের উদ্যোক্তারাই করেছিলেন। কেন করেছিলেন জানি না। সম্ভবত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি তাই নিজেদের মনের মতো একটি বিষয় বেছে নিয়েছিলেন। আর এইরকম একটি বিষয় নির্বাচন থেকে অনুমান করা যায় যে, তাঁরা রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না। তাই জানার একটা আগ্রহ ছিল। আমি নিজে অবশ্য ঐ বিষয়ে বলার সুযোগ পেয়ে খুশিই হয়েছিলাম। কেন, সে প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি। বলা শুরু করার দু-তিন মিনিটের মধ্যেই সভার পরিচালক আমাকে হঠাৎ বললেন কুড়ি মিনিটের মধ্যে বলা যেন শেষ করি। সভাপতির আকস্মিক নির্দেশে আমি বেশ বিস্মিত হলাম। বলার ছন্দও কিছুটা বিঘ্নিত হল। কেননা, আমার পূর্ববর্তী বক্তাদের কারোকেই কোনও সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। তাছাড়া একেবারে গোড়ায় বলা তো দূরের কথা, চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট বলার পরেও তিনি বক্তাদের কাউকে বক্তব্য সংক্ষেপ করতে বলেননি। তাহলে আমার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য কেন? মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও আমি মিনিট কুড়ির মধ্যেই আমার বলা শেষ করলাম। ইংরেজীতে যাকে বলে—আমি সভাপতিকে 'Benefit of doubt ' দিয়ে ভাবছিলাম যে সত্যিই হয়তো পূর্ববর্তী বক্তারা বেশি সময় নেওয়ায় সেমিনারের কর্মসূচী বিলম্বিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার ঐ ব্যাখ্যা বা সান্ত্বনা যে সম্পূর্ণ ভুল তা প্রকট হল আমার পরবর্তী বক্তার বক্তৃতার সময়ে। শেষ বক্তা ছিলেন মিশেল ইউলিন (Michel Hulin). তিনি 'বিবেকানন্দ ও

বিশ্বে বেদান্ত উন্মোচন' (Vivekananda and opening of Vedanta to the World) সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন ঝাড়া একঘন্টা পনেরো মিনিট! সভাপতি একটি কথাও বললেন না। একবারও ঘড়ির দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। কেন এই শিষ্টাচারবিহীন বৈষম্যমূলক আচরণ? এই বিষয়টি নিয়ে আমি অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে এবং আমার নিজের যে বিশ্বাস জন্মেছে তা হল দুটি। (এক) ফরাসীরা অন্য কোনও ভাষায় বক্তৃতা শুনতে পছন্দ করে না। অন্যভাষা যদিও বা বরদাস্ত করে ইংরেজী ভাষাকে কোনও মতেই নয়! অত্যন্ত শিক্ষিত মার্জিত ফরাসীদের মধ্যেও এই মনোভাব আছে। তাই যেই আমি ইংরেজীতে বলা শুরু করেছিলাম তখনই সভাপতির মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'কংগ্রেস অফ্ দি হিস্ট্রি অফ রিলিজিয়ন্স'-এ (Congress of the History of Religions) স্বামীজী ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন যদিও তার মাত্র কয়েক মাস আগে ঐ ভাষা তিনি শিখেছিলেন। স্বামীজীও নিশ্চয় জানতেন এবং তাঁকে পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল যে, ইংরেজীতে বললে তাঁর ভাষণ কার্যকরী হবে না। প্রায় একশ বছরেও ফরাসীদের এই উগ্র ভাষাপ্রেম কিছু কমেনি। (দুই) অন্য একটি মনোভাবও কাজ করেছিল। প্রশ্নোত্তরের সময় এবং পাশ্চাত্যে (স্বদেশেও অবশ্যই!) নানান জনের সঙ্গে কথাবার্তায় তার প্রকাশ দেখেছি। এটি হল রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রত ও সেবাকার্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

আমার বলা শেষ হওয়ার পর যেসব প্রশ্ন করা হল তাতেই রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য, কাজকর্মের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ পেল। অনেকের মধ্যেই যে অজ্ঞতা ও বিরূপতাপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তাও প্রকাশ পেল। যেমন, রামকৃষ্ণ মিশনের কথা ভারতবর্ষের কত মানুষ জানে? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্ত ও অনুরাগী মানুষের সংখ্যা কত হবে? রামকৃষ্ণ মিশন কি খ্রীস্টান মিশনারিদের দৃষ্টান্ত ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত? বাংলার বাইরে মিশনের তেমন কোনও প্রভাব আছে কি? আপাতদৃষ্টিতে প্রশ্নগুলি নির্দোষ মনে হলেও প্রশ্নকর্তাদের জিজ্ঞাসার সুর ও কথা খুব নিরীহ ছিল না। এই আলোচনাসভায় স্বামী বীতমোহানন্দও উপস্থিত ছিলেন। স্বভাবতই তিনিও ঐসব প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া ও মিশন সম্বন্ধে আলোচনায় অংশ নিচ্ছিলেন। আমাদের দুজনের বক্তব্যে ও মিশন সম্বন্ধে আমরা যা বলছিলাম তাতে অনেকে বিস্মিত বোধ করছিলেন। কিছু কিছু উপস্থিত শ্রোতারা যে ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্টও হচ্ছিলেন তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। আসলে, পাশ্চাত্য জগতের অনেকের মধ্যে (এঁদের মধ্যে বহু অনাবাসী ভারতীয় এবং বাঙালীও আছেন) একটা ধারণা আছে যে ভারতবর্ষে সমাজকল্যাণমূলক কাজ ও আর্তত্রাণ মুখ্যত খ্রীস্টান মিশনারিরা এবং কিছু আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাই করেন। হিন্দু বা অন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ভারতীয় কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সেরকম উল্লেখযোগ্য সমাজকল্যাণমূলক এবং ত্রাণকার্যে নিযুক্ত নন। এমন এক ধারণাও রয়েছে যে হিন্দুধর্মে নানা দেবদেবীর পূজা, আচার-অনুষ্ঠান ও পরলোক-পরজন্ম নিয়ে যত বেশি চিন্তাভাবনা আছে তার তুলনায় মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করা, আর্ত মানুষকে বাঁচাবার কোনও চেষ্টা নেই। এই ধারণার পিছনে অনেকগুলি ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ রয়েছে।

এই কারণগুলি গভীরভাবে জানার ও বিশ্লেষণ করার উৎসাহের অভাবে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ধারণাগুলি ক্রমে ক্রমে স্থির অটল বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। ফলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা ও আন্দোলনের সার্বিক রূপ, চরিত্র ও কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মধ্যে এবং বিশেষ করে বহির্বিশ্বে বেশ কিছুটা অসম্পূর্ণ ধারণা রয়ে গেছে। এর প্রতিকারের দায়িত্ব শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগী প্রত্যেকের, বিশেষত ভারতীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের।

দৃঢ়সঙ্কল্প, আদর্শনিষ্ঠ সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন অল্প কয়েকজন মানুষও যে কতখানি সফল হতে পারে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে দু-একটির উল্লেখ করা যায়। ইংলণ্ডের উত্তরে মিডলসবরোতে (Middlesborough) অনাবাসী বাঙালীদের 'Tee-side Bengali Association' নামে একটি সংস্থা আছে। এর সদস্যরা সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত। নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন এঁরা সারা বছর ধরে। দীর্ঘদিন দেশ ছাড়লেও স্বদেশের সঙ্গে এখনও নাড়ির যোগ আছে। স্বামী বিবেকানন্দের একশ পঁচিশতম জন্মজয়ন্তী বছরে এবং শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের শতবর্ষপূর্তি বছরে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্যে এঁদের দুই প্রধান কর্ণধার ডাঃ সলিল ঘোষ ও ডাঃ অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম। দুজনের সঙ্গেই আমার দীর্ঘকালের পরিচয়। দুবারই ওঁরা উদ্যোগ নিয়ে যে উৎসব-অনুষ্ঠান করেছিলেন তা এক কথায় অপূর্ব। স্বামীজীর একশ পঁচিশতম জন্মজয়ন্তী সভাটি হয়েছিল নভেম্বর মাসের এক দুর্জয় শীত, বৃষ্টি ও প্রবল হিমেল হাওয়ার রাত্রে। আমার সন্দেহ হয় খোদ কলকাতা মহানগরীতে ঐরকম অবস্থায় কিরকম জনসমাবেশ হত। কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখেছিলাম (আমার সুযোগ হয়েছিল নিজে উপস্থিত থাকার ও কিছু বলার) প্রায় দেড় শতাধিক মানুষ উপস্থিত হয়েছেন ও শেষ পর্যন্ত সাগ্রহে সমগ্র অনুষ্ঠানটি দেখছেন। এঁদের মধ্যে বেশ কিছু ছিলেন বিদেশী। তাঁরা অনেকেই সভার পর স্বামীজী সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। একই ঘটনা ও অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল ১৯৯৩ সালে। অবশ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ আগের বারের তুলনায় অনেক ভাল ছিল! সভায় খ্রীস্টান, মুসলমান, ইহুদি প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এসেছিলেন। শ্রোতাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন স্থানীয় মানুষ যাঁরা জন্মসূত্রে ভারতীয় নন। উদ্যোক্তারা অনুমান করেছিলেন শ'খানেকের বেশি মানুষ আসবেন না। কারণ, সত্যিকথা বলতে কি, বেশিরভাগ স্থানীয় মানুষেরই শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না। থাকলেও তার গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন ছিলেন। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আপাতদৃষ্টিতে শ্রদ্ধার ভাব থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ঐ রকম একটা অনুষ্ঠানের সার্থকতা ও সাফল্য সম্বন্ধে তাঁদের ঘোর সন্দেহ ছিল। কিছু লোকের তো আপত্তিও ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের বিস্মিত করে দুশ-র বেশি মানুষ এসেছিলেন। সভাস্থলে বসার জায়গা ছিল না। বিভিন্ন বক্তার কথা শুনে অনেক বিদেশী স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে আরও জানতে চাইছিলেন। এঁদের অনেকেই 'বিবেকানন্দ' নামটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে অসুবিধা বোধ করছিলেন। একজন আমায় বলেছিলেনঃ "I did not know anything about this man Vi-Vek-Nanda. But he seems to have been an extremely interesting person. He has given me many things to

think about. It was really a great experience. I enjoyed it." একই কথা বলেছিলেন আরও অনেকে। যেসব প্রবাসী বাঙালীদের এই অনুষ্ঠান করা সম্বন্ধে দ্বিধা ছিল তাঁরাও লজ্জাবোধ করেছিলেন। সম্ভবত ঐ অনুষ্ঠানের স্থায়ী প্রভাব বিশেষ কিছু হয়নি। কেননা স্থায়ী ফল পেতে হলে সুচিন্তিত পরিকল্পনা, নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও সংগঠন চাই। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো (যেমন বিদেশে Festival of India-র আয়োজন) শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন বা স্বামীজীর একশ পঁচিশতম জন্মজয়ন্তী পালনেরও কোনও স্থায়ী প্রভাব বেশির ভাগ শ্রোতাদের ওপর পড়েনি বা পড়বে না। কিন্তু অন্তত কিছু শ্রোতার মনে যে একটা দীর্ঘস্থায়ী ফল থাকবে তা অবশ্যই আশা করা যায়। বড় কথা হল অনুষ্ঠান দুটি প্রমাণ করেছিল যে, সবসময় ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে না। করে নিতে হয়। চষা জমিতে বীজ রোপণ করা অবশ্যই সহজ। কিন্তু উর্বর জমি যদি চষা নাও হয় তাহলেও চেষ্টা করলে ভাল ফসল পাওয়া যায়। স্বামীজী নিজে এইটি আমেরিকা ও পাশ্চাত্য জগতে (এবং দেশের মাটিতে) করে দেখিয়েছিলেন বলেই তিনি অনন্য স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে উঠেছিলেন।

সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা শহরে (অক্টোবর, ১৯৯৩) শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন ও স্বামীজীর ভূমিকা উপলক্ষে যে দুদিনব্যাপী উজ্জ্বল বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়েছিল তার পিছনেও ছিল এক সন্ন্যাসীর নিরলস ও একক প্রচেষ্টা ও কয়েকজনের আন্তরিক সহযোগিতা। বিবেকানন্দ ও শিকাগো পার্লামেন্টের মতো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে জেনিভার প্রতিকূল পরিবেশে ঐ রকম একটি বড় মাপের উৎসব করা যে কী কঠিন তা না জানলে ও না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদগ্ধ মহলে এখন কেমন গবেষণা ও আলোচনা চলেছে তার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার। এটির উদ্যোক্তা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' (School of Oriental and African Studies)। সংক্ষেপে SOAS নামে খ্যাত। এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের পটভূমি একটু বলা প্রয়োজন। SOAS-এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হলেন উইলিয়াম রাদিচি (C.W. Radici)। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও অন্যান্য রচনা অনুবাদ করে তিনি বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেছেন। ১৯৯৩ সালের গোড়ায় কলকাতায় আমার সঙ্গে রাদিচির দেখা হয়। আমি ওঁকে শিকাগো ধর্মমহাসভা ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে SOAS-এর একটি সেমিনার করার কথা ভাবতে বলি। কেননা, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে এবং বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐ ঘটনার এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল। তাছাড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দসাহিত্য তো বাংলা এবং ভারতীয় সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ধারা। সুতরাং SOAS-এর বাংলা বিভাগের পক্ষে এরকম একটি উদ্যোগ নেওয়া যুক্তিসংগত হবে। রাদিচি সঙ্গে সঙ্গেই উৎসাহিত বোধ করেন এবং বলেন যে, তিনি অবিলম্বে SOAS-এর Department of Religious Studies-এর প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। ওঁরা যদি এই সেমিনারের ব্যাপারে যুগ্ম উদ্যোগী হয় তাহলে খুব ভাল হবে। সুখের বিষয় হল শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি কার্যকরী হয়। ২৬—২৭ নভেম্বর, ১৯৯৩-তে "Swami Vivekananda and the Modernization of Hinduism'—এই বিষয়ের ওপর এক আন্তর্জাতিক সেমিনার

হয়। শুধুমাত্র দুটি বিভাগের উদ্যোগে না হয়ে 'সেমিনার' বা 'ওয়ার্কসপ' (workshop) আহূত হয় SOAS-এর 'Centre of South Asian Studies'-এর নামে। ফলে এই 'ওয়ার্কসপ'টির তাৎপর্য ও মাত্রা অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক কালে সর্বোচ্চ শিক্ষা ও বুদ্ধিজীবী মহলে এরকম একটি চরিত্রের বিবেকানন্দকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা বিদেশে আর কোথাও বোধহয় হয়নি। প্রসঙ্গত ব্যক্তিগত একটি দুঃখবোধের কথা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারটি ছাড়াও ইউরোপ ও আমেরিকার উচ্চশিক্ষামহলে (প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথাই বলছি) শিকাগো ধর্মমহাসভা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যত আলোচনা ও লেখালেখি হয়েছে তা কিন্তু ভারতবর্ষের দেড় শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হয়নি। এমনকি খোদ পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতেও নয়। কেন হয়নি তা ভাববার কথা। হয়তো ধর্ম সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান অনীহা ও বিরূপতা। এইরকম একটি ঘটনা ও ব্যক্তিকে (ব্যক্তিটি স্বামী বিবেকানন্দ হলেও!) কেন্দ্র করে কোনও কিছু করলে তা ধর্মীয় মৌলবাদ বা সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিতে পারে এই আশঙ্কা এর কারণ। কিন্তু এরকম চিন্তা ও আশঙ্কা যে কতটা অমূলক তা SOAS-এর সেমিনার প্রমাণ করেছে। আনুষঙ্গিক একটি তথ্য হল যে SOAS-এর বাৎসরিক বক্তৃতা (Annual Lecture) দেবার জন্যে প্রতি বছর কোনও বিশিষ্ট অধ্যাপক আমন্ত্রিত হন। ১৯৯৩ সালে বিবেকানন্দ সম্পর্কিত সেমিনারের সঙ্গেই বাৎসরিক বক্তৃতার বিষয় নির্বাচিত হয় 'Vivekananda's Construction of Hinduism'. আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী।

হিন্দুধর্ম ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার ওপর গবেষণার ক্ষেত্রে SOAS-এর সেমিনারটি নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ বিভিন্ন বক্তা উত্থাপন করেছিলেন। তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। স্বল্প পরিসরে তার কিছু ইঙ্গিত বিবেকানন্দ গবেষকদের আগ্রহী করে তুলবে। সেমিনারটির আলোচ্য বিষয়ের নামকরণ প্রসঙ্গে রাদিচি ও Department of Religious Studies-এর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক পিটার রব (Peter Robb) স্থির করেন যে শুধুমাত্র বিবেকানন্দ বা শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন বিষয়ক নামকরণ না করে 'Vivekananda And The Modernization of Hinduism' নামটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। এই সিদ্ধান্তের কথা আমায় জানিয়ে রাদিচি তাঁর পত্রে লেখেন, "Peter feels—and I agree—that the scope of the Seminar should be widened beyond Vivekananda to the 'Modernization of Hinduism'—a crucial issue today, not just in Vivekananda's lifetime". চিঠির পরিশেষে লেখেন, "I am sure we can make the Celebration a major event." রাদিচির দ্বিতীয় প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছিল। সেমিনারের বিষয়বস্তুর নামকরণটি প্রচুর আলোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। 'হিন্দুধর্মের আধুনিকীকরণ ও বিবেকানন্দ' বিষয়টি কতকগুলি প্রশ্নের সৃষ্টি করে। যথা—আধুনিকীকরণ বলতে কী বোঝায়? কোনও ধর্মের আধুনিকতার লক্ষণ কী? স্বামী বিবেকানন্দ রক্ষণশীল হিন্দু পুনরভ্যুত্থানকে সহায়তা করেছিলেন, না সংস্কারের পথ নির্দেশ করেছিলেন? তাঁর বক্তব্য ও চিন্তার মধ্যে স্ববিরোধ ছিল কি? 'হিন্দুধর্ম ও আধুনিকতা' বা 'ধর্ম ও আধুনিকতা'—এই কথা দুটিই কী

অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? বিবেকানন্দ কতখানি পাশ্চাত্য জগৎ, পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা এবং খ্রীস্টীয় ও অন্য চিন্তাধারার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন? তাঁর স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বজনীনতার সহাবস্থানকে কেমনভাবে বিশ্লেষণ করা যায়? বিবেকানন্দের জীবন ও চিন্তার উৎসমূলে শ্রীরামকৃষ্ণের কতখানি প্রেরণা ছিল বা স্বামীজী ধীরে ধীরে কতখানি তাঁর গুরুর নির্দেশিত লক্ষ্য থেকে সরে গিয়েছিলেন? এইরকম নানান প্রসঙ্গ ও প্রশ্ন সেমিনারে উত্থাপিত হয়েছিল। বর্তমান ও ভাবী প্রজন্মের সামনে এইসব প্রশ্ন উঠছে ও উঠবে। বিবেকানন্দ-চর্চা যাঁরা করছেন ও করবেন তাঁদের এইসব প্রসঙ্গ সম্বন্ধে স্বচ্ছ চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

এইরকম কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন ও প্রসঙ্গে আসি। যদিও সবগুলির আলোচনা এখানে অসম্ভব। আমার নিজের বক্তব্য বলার অবকাশও কম বর্তমান প্রবন্ধে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ইন্দিরা চৌধুরী সেনগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে[৬] দেখাবার চেষ্টা করেন যে উনিশ শতকে ভারতবর্ষে খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে হিন্দুধর্ম এবং সমাজের সংস্পর্শ ও ঘাত-প্রতিঘাতকে কেন্দ্র করে যে বিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল তারই প্রতিফলন ঘটে ১৮৯৩-র শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে। যে বিতর্ক ভারতবর্ষে চলছিল বহুলাংশে তারই পুনরাভিনয় ঘটেছিল শিকাগোতে। শ্রীমতী চৌধুরী সেনগুপ্তের আর এক বক্তব্য হল যে স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর সব বক্তৃতায় হিন্দুনারীদের, বিশেষ করে বৈধব্যজীবনের দুর্বিষহ দুঃখ-যন্ত্রণা সম্বন্ধে প্রায় নীরব ছিলেন। আর খ্রীস্টধর্মের চেয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রথমে প্রমাণের চেষ্টার পর তিনি বিশ্বজনীন ধর্মের কথা বলেছিলেন। এই বক্তব্যগুলি স্বভাবতই বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল সেমিনারে। প্রবন্ধটির পূর্ব ঘোষিত মুখ্য সমালোচক রূপে আমি নারীজাগরণ ও নারীর অধিকার সম্বন্ধে বিবেকানন্দের বিভিন্ন বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। এই বিষয়ে ডঃ পাপিয়া চক্রবর্তী[৭] প্রমুখ গবেষকদের সাম্প্রতিক লেখার উল্লেখ করে বলেছিলাম যে বাল্যবিবাহ, নারীর অমর্যাদা, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, নারী শিক্ষা, বিধবাবিবাহ, Age of Consent Bill (1892) এবং প্রয়োজনে বিবাহবিচ্ছেদ প্রমুখ বিষয়ে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমতের মূল কথা হল তিনি নারীকে আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। প্রসঙ্গত আমি বলেছিলাম যে আজ থেকে শত বছর আগে বিবেকানন্দ হিন্দু সন্ন্যাসী হয়েও নারী প্রগতি ও নারীর অধিকার সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বর্তমানে উগ্র নারীবাদের দৃষ্টিকোণে সবকিছু বিচারের প্রবণতা সম্বন্ধে সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জুলিয়াস জে লিপনার-এর (Julius J. Lipner) বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব প্রসঙ্গে বক্তব্যে[৮] কিছু নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণ ছিল। মোটামুটি এই বিষয়ের ওপরই লিপনার অন্যত্র আর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন।[৯] ইংলণ্ডের নিউক্যাসল্ আপ-অন টাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের (New Castle Upon Tyne) ডঃ ডারমট কিলিংলে (Dermot Killingley) ও আমেরিকার ক্যানসাস স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের (Kansas State University) অধ্যাপক কেনেথ জোন্সের (Kenneth W. Jones) প্রবন্ধ দুটি ছিল অত্যন্ত বিতর্কিত। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে

স্বামীজীর প্রতি কটাক্ষপূর্ণ। এই দুজনের সঙ্গেই আমার ইতিপূর্বে পরিচয়ের এবং একই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। কেনেথ জোন্স তাঁর আর্যসমাজ ও স্বামী দয়ানন্দের ওপর গবেষণাগ্রন্থের জন্যে খ্যাত। কিলিংলে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের Religious Studies বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একশ পঁচিশতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মিডল্‌সবরোতে অনুষ্ঠিত সভায় প্রথম পরিচয় ঘটে। কেনেথ জোন্স তাঁর একদেশদর্শী ও তথ্যবিকারদুষ্ট প্রবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে পঞ্জাবের অত্যন্ত রক্ষণশীল দুই 'সনাতন ধর্মী' নেতা—পণ্ডিত শ্রদ্ধারাম ও পণ্ডিত দীন দয়ালুর সঙ্গে 'নব্য হিন্দুধর্মের' (Neo Hinduism) প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত অর্থে বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না! স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মূলত অত্যন্ত রক্ষণশীল। সুতরাং তাঁকে ধর্মের আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করা সমীচীন নয়।[১০] কেনেথ জোন্সের যুক্তি ও অভিমত কিন্তু একটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত নয়। ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে এই জাতীয় প্রবন্ধ ও 'গবেষণা গ্রন্থ' মাঝে মাঝেই প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে নৃসিংহপ্রসাদ শীলের কুৎসামূলক একটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধের কথা মনে আসে।[১১] খ্যাতনামা বিদেশী প্রকাশক ও পত্রিকা এই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করায় এই রচনাগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য বা উপেক্ষার মনোভাব সম্ভবত ঠিক নয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ের লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের এই বিষয়ে এক বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

কিলিংলের প্রবন্ধ ও তাঁর বক্তব্য অবশ্য সমগোত্রীয় নয়।[১২] বিবেকানন্দের গুরুত্ব এবং তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু তাঁর মূল প্রতিপাদ্য হল যে স্বামীজীর ওপর পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবের যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। স্বামীজীর ধর্মীয়, সামাজিক ও অন্যান্য অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর (Complete Works) তিনি কঠোর সমালোচক। তাঁর মতে এই সংকলনের বিন্যাস প্রস্তুতি ও সম্পাদনা মোটেই সন্তোষজনক নয়। ফলে এর ওপর বিবেকানন্দের চিন্তা-ভাবনার বিবর্তন সম্বন্ধে নির্ভর করা সমীচীন নয়। কিলিংলে ও গোয়াইলিম বেকারলেগ-এর (Gwilym Becherlegge) আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে মিল রয়েছে। বেকারলেগ ম্যাঞ্চেস্টারের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (Open University Manchester) অধ্যাপনা করেন। SOAS-এর সেমিনারে তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সেবাব্রতে সমাজকল্যাণকে তাঁর গুরুত্ব দান।[১৩] স্বামীজীর সেবাব্রত ও সমাজকল্যাণ চিন্তা কতখানি শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারা অনুপ্রাণিত, স্বামীজী ধর্ম ও মানবসেবাকে কীভাবে দেখেছিলেন ও এই আপাতভিন্ন লক্ষ্য দুটিকে কীভাবে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তিনি এই বিষয়ে কতখানি খ্রীস্টান ধর্ম ও মিশনারিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সেই সম্পর্কে বেকারলেগের বক্তব্য সুসংহত ও চিন্তাসমৃদ্ধ। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘকাল ধরেই বিতর্ক চলেছে। সাম্প্রতিককালে এই আলোচনার গভীরতা ও তারই সঙ্গে স্পর্শকাতরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত হিন্দুধর্ম, বেদান্তের ব্যাখ্যা ও বেদান্তকে সবধর্মের উৎস বা 'mother religion' রূপে উপস্থাপনা তাঁর বিশ্বজনীন ধর্মবিশ্বাস ও প্রচারের পরিপন্থী কি না, পরোক্ষভাবে তাকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা (secterianism) বলা যায় কি না, এই

বিষয়েও আলোচনা-বিতর্ক চলেছে। এইসব প্রশ্নের আলোচনা করেছেন স্টারলিং বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Sterling) Religious Studies বিভাগের অধ্যাপক গ্লিন রিচার্ডস (Glyn Richards)। তিনি যুক্তি ও তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে স্বামীজীর ধর্মীয় চিন্তায় ও তাঁর বেদান্ত ব্যাখ্যায় secterianism-এর কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাঁর বিশ্বজনীন ধর্মের গভীরতা সকল ধর্মের পটভূমি প্রস্তুত করে। রিচার্ডসের আর একটি অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মনে করেন গান্ধীজীর 'সত্য' ও 'ঈশ্বরের স্বরূপ' সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গান্ধীজী স্বামীজীর চিন্তা ও দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন, অর্থাৎ প্রভাবিত হয়েছিলেন।[১৪]

আরও বিভিন্ন বিষয়ে SOAS সেমিনারে আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছিল। সব কটি প্রবন্ধেই যে বিবেকানন্দ মুখ্য আলোচ্য ব্যক্তি ছিলেন বা তাঁর ওপর আলোকপাত করা হয়েছিল তা নয়। কিন্তু ধর্মের 'আধুনিকীকরণ' এই বৃহত্তর আলোচনা বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। দুদিনব্যাপী আলোচনার শেষে উইলিয়াম রাদিচি তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেন যে এক বড় মানচিত্রে অনেক নতুন ভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। সব জায়গাগুলিই আমাদের পরিচিত নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্র দুর্গম, কিছুটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। এসব অপরিচিত অরণ্যে আমাদের প্রবেশ করে নতুন আবিষ্কারের চেষ্টা করতে হবে। সত্যিই বিবেকানন্দ এক বিরাট মানচিত্রের মতো। আর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জগতের অনেক কিছুই এখনও অনাবিষ্কৃত। নতুন অনুসন্ধান ও আলোকপাত চলেছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জগৎ এবং এই দুজনের অবদান শুধুমাত্র ধর্মজগৎ ও ধর্মীয় ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেসব নতুন নতুন প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছে, প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তা সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করছে যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কমা তো দূরের কথা, ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই স্বীকৃতি ও উপলব্ধি শুধুমাত্র তাঁদের ভক্ত ও অনুরাগীদেরই নয় নতুন প্রজন্মের গবেষক, চিন্তাশীল মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীদেরও। নানান দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন ভারতীয় গবেষকদের (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমণ্ডলের বাইরে) লেখার মধ্যে রয়েছে তপন রায়চৌধুরীর Europe Reconsidered : Perception of the West in the Nineteenth Century Bengal (O.U.P. 1988) গ্রন্থের বিবেকানন্দ সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ অধ্যায়; সুমিত সরকারের The Kathamrita as a Text : Towards an understanding of Ramakrishna Paramahansa : 'Kaliyuga', 'Chakri' and 'Bhakti' : Ramakrishna and His Times (Economic and Political Weekly, 1992) ; অমিয়প্রসাদ সেনের Hindu Revivalism in Bengal. 1872-1905 (O.U.P., 1993) ; হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের Vivekananda and Indian Freedom ; পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের A Religion of Urban Domesticity : Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class (Subaltern Studies, Vol-VII) ; শিখা রায়চৌধুরীর ধর্মচিন্তা থেকে সমাজচিন্তা : শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন (অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র) প্রভৃতি। পাশ্চাত্যের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বিষয়ক গবেষণা হয়েছে এবং

হচ্ছে। এছাড়া আধুনিক ভারতের ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত গবেষণায় ও আলোচনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা এবং আন্দোলনের প্রসঙ্গ তো উত্থাপিত হচ্ছেই।

পূর্বেই উল্লিখিত যে কিছু কিছু গ্রন্থে, প্রবন্ধে ও আলোচনাচক্রে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের যুক্তিবাদী সমালোচনার নামে একদেশদর্শী, অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা অপবাদমূলক প্রচেষ্টাও সুস্পষ্ট। অপরদিকে প্রকৃত গবেষণামূলক মন ও দৃষ্টিকোণের পরিচয় বাহক রচনাও আমাদের জ্ঞানের সীমানা বিস্তৃত করছে। সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তা হল ভারতবর্ষের ইতিহাসে, জীবনে ও চিন্তায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের স্থান শাশ্বত ও চিরন্তন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও পাশ্চাত্য জগৎ: শতবর্ষের পর পুনর্বিচার

প্রব্রাজিকা ব্রজপ্রাণা
(সারদা কনভেন্ট, সান্টা বারবারা, ইউ. এস. এ.)

কোনও ঘটনার বর্ষপূর্তির—বিশেষ করে যেগুলি বড় ঘটনা এবং যা পূর্ণসংখ্যায় নির্দেশ করা যায়, সুবর্ণজয়ন্তী, শতবর্ষজয়ন্তী ইত্যাদি—তাদের একটি নিজস্ব মূল্য আছে। এই উপলক্ষে আমরা পুনর্বিচার, অতীতকে স্মরণ করা এবং ভবিষ্যতে কি হবে সেকথা ভাবারও সুযোগ পাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অনতিকাল পূর্বে আমেরিকায় কলম্বাসের আমেরিকা আগমনের পাঁচশতবর্ষপূর্তি উৎসব পালিত হয়েছে। নিছক একটি উৎসব হিসাবে তা পালন করার কথা ভাবা হলেও এই অবসরে আত্মানুসন্ধানের সুযোগ পাওয়ায় সকলেই এটিকে অভিনন্দন জানান। যাঁদের পূর্বপুরুষ এদেশে বারো হাজার বছর ধরে গৌরবের সঙ্গে বসবাস করছেন তাঁদের কাছে 'আমেরিকা আবিষ্কার' কথাটি নিষ্ঠুর পরিহাসের মতো শোনাবে। বর্তমানে আমেরিকার আদি ও বহিরাগত (Native ও non-Native) দু'শ্রেণীর অধিবাসীই দেশের সুমহান ঐতিহ্যের অবক্ষয় দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন। পাঁচশ বছর পরে আজ সমগ্রভাবে সারা পৃথিবী এই ক্ষতির পরিমাপ করতে শুরু করেছে।

বর্ষপূর্তিপালন উপলক্ষে পুনর্বার মূল্যবিচারের সুযোগ আসে। স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা আগমনের শতবর্ষপূর্তি উৎসবেও এর ব্যতিক্রম ঘটবে না। স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা আবিষ্কার কিংবা আমেরিকার পক্ষে স্বামীজীকে আবিষ্কারের ফলে যে ধারাবাহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার প্রভাব নতুন মহাদেশে কলম্বাসের পদার্পণের ফলশ্রুতির চেয়েও গভীর ও দূরপ্রসারী। কলম্বাসের আগমনের ফলে এই দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি পদদলিত হয়েছিল; স্বামীজীর আগমনে কিন্তু এদেশে নতুন জীবন ও আশার সঞ্চার হয় এবং পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিক পুনর্জীবনের বীজ রোপিত হয়।

World's Columbian Exposition নামক একটি সুবৃহৎ উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ১৮৯৩ সালে শিকাগোয় বিশ্বধর্মমহাসম্মেলন (Parliament of Religions) অনুষ্ঠিত হয়। এই এক্সপোজিশন, যা আসলে ছিল একটি বিশ্বমেলা—আমেরিকা আবিষ্কারের চারশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আবিষ্কারকের প্রতি জাতির শ্রদ্ধার্ঘ্য। সমগ্র উৎসবটি কি বিরাট ব্যাপারই না ছিল! নিজেদের দেশের 'আবিষ্কারকের' মতো নবীন জাতিও যেন নিজেকে আবিষ্কারের উৎসবে মেতে উঠেছিল। আমেরিকার তখন গৌরব ও ঐশ্বর্যের যুগ। পাশ্চাত্য জগৎ প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে যে কৃতিত্ব ও সাফল্য লাভ করেছে তারই নিদর্শন—'এক্সপোজিশন'

বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিল। আমেরিকানদের একান্ত বিশ্বাস ছিল যে, প্রযুক্তিবিদ্যা যে কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারে। মানুষ নিজে যা করতে পারে না যন্ত্র তা করে দেবে। স্বামীজী বলেছিলেনঃ "প্রাত্যহিক জীবনে এত রকম যন্ত্রের ব্যবহার এদেশের মানুষের মতো পৃথিবীর আর কোনও জাতি করে না। সবকিছুই হল যন্ত্র।"[১]

দ্রুত শিল্পায়নের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি এবং নিজেদের সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন ঘটছিল। রেলপথ, টেলিগ্রাফ এবং আরও হাজার রকমের প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে পূর্বে সাধারণ বুদ্ধিতে যা অসম্ভব মনে করা হত তাই সম্ভব হয়েছিল। সেই উত্তেজনার যুগে কিছুই অসম্ভব বলে বোধ হত না। নব আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহারের ফলে এক্সপোজিশন এক স্বপ্নপুরীতে পরিণত হয়। মেলাপ্রাঙ্গণ দিনের বেলা আলো দিয়ে সাজানো হত, রাত্রে কত চোখ-ধাঁধানো আলোর খেলা। নির্মাণ কাজে নবতম ইস্পাতখিলান পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে আমেরিকার শান্ত মিড ওয়েস্ট অঞ্চলে এক নব ঐশ্বর্যশালী জগৎ গড়ে উঠেছিল। এই 'এক্সপোজিশন'কে বলা হত শ্বেত শহর (White City), যাদু শহর (Magic City) কিংবা স্বপ্ন শহর (Dream City).

১৮৯৩ সালের বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনের চারিত্র-বৈশিষ্ট্য বিচার করলে 'শ্বেত শহর' (White City) নামটি ব্যঙ্গার্থে হলেও, সঠিকভাবে প্রযুক্ত। সে সময় আমেরিকায় মনে করা হত শ্বেতকায়েরা সব সময়েই অভ্রান্ত। খুব কম লোকই মনে করত তাদের মত ছাড়া আর কোনও মত থাকতে পারে এবং সেজন্য এমন ধারণার বিপক্ষে আর কেউ যে একটি কথাও বলেনি, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ১৮৯৩ সালের পার্লামেন্টে বক্তাদের মধ্যে শতকরা আটাত্তর জন ছিলেন খ্রীস্টান।[২] মাত্র দুজন আফ্রিকান আমেরিকান উপস্থিত ছিলেন এবং আমেরিকার আদি অধিবাসীদের একজনও ছিলেন না। ক্ষতের উপর বিষফোঁড়ার মতো আদি অধিবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে একজন নৃতত্ত্ববিদের লেখা একটি সংক্ষিপ্ত, অতি সাধারণ প্রবন্ধ 'এক্সপোজিশনে'র বিজ্ঞানবিভাগে পাঠ করা হয়।[৩] স্পষ্টই বোঝা যায়, আদি অধিবাসীদের মধ্যে কাউকেই বক্তৃতা দেবার জন্য যোগ্য বিবেচনা করা হয়নি এবং তাদের ধর্মকে আদৌ 'সত্য' ধর্ম বলে স্বীকার করাও হয়নি। উপরন্তু তৎকালীন 'পৃথিবীর প্রধান দশটি ধর্মসম্প্রদায়ে'র মধ্য থেকেই প্রতিনিধি নির্বাচন করায় পার্লামেন্টের অধিবেশনে এশিয়ার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মকে—যেমন, শিখধর্ম ও তিব্বতী বৌদ্ধধর্মকে স্থান দেওয়া হয়নি।

১৮৯৩ সালে শিকাগোর বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনের প্রতিটি অধিবেশন শুরু হত খ্রীস্টধর্মের একটি স্তব পাঠ করে। অন্য কিছু করা ছিল অচিন্তনীয় কারণ পার্লামেন্টের উদ্দেশ্য ছিল খ্রীস্টধর্মের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ববাসীকে দেখানো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেসব বিরাট অগ্রগতি হয়েছে তা প্রদর্শন করার জন্যই বিশ্বমেলার বাকি অংশগুলি যেমন সংগঠিত হয়েছিল, তেমনি মানবজাতির স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি দেখে সভ্য মানুষ একদিন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করবে, এটাও দেখানো উদ্যোক্তাদের পরিকল্পনা ও আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পরিকল্পনাটি করা হয়েছিল, স্বামীজী যেমন, একটু ঘুরিয়ে বলেছিলেনঃ 'অখ্রীস্টানদের জন্য প্রদর্শনী' হিসেবে।

কিন্তু ভাগ্যদেবতার ইচ্ছায় অন্যরকম ঘটল। এই পার্লামেন্ট অন্য ধর্মের উপর একটি

ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর চেয়ে আমেরিকানদের মনের দরজা খুলে দেয় এবং সেই খোলা পথে প্রবেশ করল এশিয়ার ধর্মগুলি, বিশেষ করে হিন্দুধর্মের, তাজা হাওয়া। সেই দিন থেকে আমেরিকায় ধর্মবিষয়ক আলোচনা আর পূর্বের মতো রইল না। এই পরিবর্তনের জন্য আমেরিকা বহুলাংশে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ঋণী। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বাল্যকাল থেকে যে স্তবটি তিনি পাঠ করে আসছেন স্বামীজী তার উল্লেখ করেছিলেনঃ "বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে কিন্তু তারা সকলেই যেমন সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে মিশিয়ে দেয় তেমনি হে ভগবান, নিজ নিজ প্রবণতা অনুসারে ঋজু ও কুটিল যে পথ ধরেই মানুষ চলুক না কেন, তুমিই তাদের সকলের লক্ষ্য।"[৪]

সকল ধর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং সকল জাতির মধ্যে ঐক্যবোধ স্থাপনের বিষয়ে স্বামীজীর ভাষণ শ্রোতাদের মনে গভীর অনুরণন সৃষ্টি করেছিল। তিনি চিরন্তন সত্যের কথা বলেছিলেন। তাঁর ভাষণের প্রথম পাঁচটি শব্দকে শ্রোতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দিত করেছিল। এই পাঁচটি সহজ শব্দ—'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতাগণ' (Sisters and brothers of America)—গত একশ বছর ধরে ঠিক যেন মন্ত্রবৎ চলে এসেছে। এই পাঁচটি সহজ কথা একটি শিশুও উচ্চারণ করতে পারে। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত কথাগুলি বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে। স্বামীজী যখন কথাগুলি বলেছিলেন তখন কিন্তু শিকাগোর হলঘরে বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গিয়েছিল। শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে যে ঐক্যবোধ. বিদ্যমান, এই বিশ্বাসকে সেই শক্তিশালী বিদ্যুৎতরঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছিল। মানুষে মানুষে একত্ববোধ যা প্রেমের সত্যকার ভিত্তি—সে সম্পর্কে বক্তার আবেগপূর্ণ ভাষণ শুনে আমেরিকান শ্রোতারা তাঁদের জানা একটিমাত্র উপায়ে অর্থাৎ কেবল স্বতঃস্ফূর্ত কর্ণবিদারী করতালিধ্বনিতে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

পার্লামেন্টের অধিবেশনের সময় আমেরিকার এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী ব্যঙ্গচিত্রে ছাড়া চাক্ষুষভাবে কোনও হিন্দু, বৌদ্ধ বা শিন্টো ধর্মযাজককে দেখেনি। অখ্রীস্টানদের ধর্মমত সম্বন্ধে সংবাদ খ্রীস্টান মিশনারিরা পাঠাতেন। এইসব প্রতিবেদনে কুমিরের মুখে শিশুকে ছুঁড়ে দেওয়া এবং অখ্রীস্টানদের বর্বর আচরণের আরও নানা কাহিনী পড়ে নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এক নিশ্চিত ধারণা খ্রীস্টানদের মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এ হেন অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে ভাষণ থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় চার বৎসর পাশ্চাত্যে তাঁর প্রচার-কাজের ফলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মিলিত সমাবেশে খ্রীস্টধর্ম কিংবা অন্য কোনও ধর্ম যে সন্দেহাতীতভাবে শ্রেষ্ঠ এমন ধারণা স্থান পায়নি। আর কখনও 'অখ্রীস্টানদের ধর্মমত' সম্পর্কে খ্রীস্টান মিশনারিদের রিপোর্ট শান্তভাবে গৃহীত হয়নি। এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের একত্ববোধ—বর্তমান কালের এই চেতনার উৎস নিঃসন্দেহে ১৮৯৩ সালের শিকাগোর পার্লামেন্টের অধিবেশনে দেখতে পাওয়া যাবে।[৫] এই পার্লামেন্ট পৃথিবীতে, বিশেষ করে আমেরিকায়, তুলনামূলকভাবে এবং ইতিহাস-সম্মত পদ্ধতিতে ধর্মতত্ত্ব আলোচনার কাজে মানুষের মনে প্রেরণা জাগিয়েছিল।[৬] আমেরিকায় ধর্ম-আলোচনার পরিকাঠামোয় এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পার্লামেন্টের অধিবেশনের এবং বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের একক উপস্থিতির প্রত্যক্ষ ফল।

স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ এবং তাঁর চেহারায় আধ্যাত্মিক সত্তার দীপ্তি যাঁরা তাঁকে দেখেছিল তাদের মনে এক আবেগবিহ্বল প্রভাব বিস্তার করেছিল। হ্রদের মধ্যে প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করলে প্রথম আলোড়নের পর বৃত্তগুলি যেমন ক্রমেই প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হতে থাকে, স্বামীজীর প্রভাবও তেমনি শিকাগোর বক্তৃতামঞ্চ থেকে ক্রমেই আরও দূরপ্রসারিত মানবসমাজে বিস্তৃত হতে থাকে। যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানে এবং কখনও বা সংবাদপত্রে তাঁর বিতর্কমূলক ভাষণের খবর প্রকাশের ফলে তাঁর প্রভাব ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রকাশিত রচনাবলী পাঠ ও এদেশ থেকে তাঁর চলে যাওয়ার এবং এমনকি তাঁর দেহাবসানের দীর্ঘকাল পরেও যাঁরা তাঁর উপদেশ প্রচার করেছিলেন, তাঁরাও তাঁর প্রভাবকে অব্যাহত রেখেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশে মানুষের চিত্ত পরিবর্তনকারী ক্ষমতা বিগত শতাব্দীতে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আমেরিকায় স্বামীজীর প্রথম আবির্ভাবের একশ বছর পরে পাশ্চাত্যের মানুষ আমরা আজ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে শিকাগো মঞ্চে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল আজও তা প্রবহমান।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব মূল্যায়ন করার একটি উপায় হল ১৮৯৩ সালের শিকাগো পার্লামেন্টের সঙ্গে ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত শিকাগো পার্লামেন্টের তুলনা করা। ১৮৯৩ সালের পার্লামেন্টের মতো এবারের অধিবেশনে এমন কেউ ছিলেন না যিনি 'মুখ্য চরিত্র' হয়ে উঠতে পারেন কারণ সৌভাগ্যের কথা, লোককে দেখানোর মতো কোনও 'প্রদর্শনী' এবারে ছিল না। ১৮৯৩ সালের পার্লামেন্ট ছিল মূলত খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের এক সভা, সেখানে অন্য ধর্মের প্রতিনিধিদের ভাষণ দেবার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। ১৯৯৩ সালে "প্রায় একশ পঁচিশটি ধর্মসম্প্রদায়, তাদের বিভিন্ন শাখা এবং উপগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকার আদি অধিবাসীরা কেবল উপস্থিত ছিলেন না, তাঁদের সাদরে বরণ করাও হয়েছিল। যে দুটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে সঙ্গতকারণে সাগ্রহে এবং সসম্মানে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল তারা হল আদি আমেরিকান এবং ইহুদি সম্প্রদায়।"[৭]

অধিকন্তু, ডেভিড নেলসন যেমন মন্তব্য করেছেন, "প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের একশ তিরাশি জন প্রতিনিধির মধ্যে ঊনত্রিশ জনকে হিন্দু, কুড়ি জনকে খ্রীস্টান, ষোল জনকে বৌদ্ধ, পনেরো জনকে মুসলিম, চোদ্দ জনকে শিখ, বারো জনকে ইহুদি, দশ জনকে জরথুস্ট্রধর্মালম্বী, সাত জনকে জৈন, পাঁচ জনকে বাহাই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং পাঁচ জনকে নব-পৌত্তলিক সম্প্রদায়ভুক্ত বলা যেতে পারে। অবশিষ্ট পঞ্চাশ জন ছিলেন বিভিন্ন সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়, পরিবেশই গোষ্ঠীর উন্মেষের আদি কারণ মতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়, স্বাস্থ্য, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংস্থা এবং মনোবিদ্যা, বিজ্ঞান ও ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ের অনুশীলন সংস্থার প্রতিনিধি। শতকরা প্রায় ষোল জন প্রতিনিধির হিসাবে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য ছিল সব থেকে বেশি। হিন্দু, শিখ এবং জৈন মিলিতভাবে ধরলে ভারতীয় ধর্মগুলির প্রতিনিধিত্বের অনুপাত ছিল শতকরা সাতাশ ভাগের কিছু বেশি।"[৮]

লক্ষ্য করার বিষয় সামগ্রিকভাবে আমেরিকান সমাজে অনুসৃত ধর্মমতের সঙ্গে পার্লামেন্টে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সংখ্যার অনুপাতের এক বিরাট অমিল রয়েছে। আমেরিকায় বর্তমানে প্রচলিত ধর্মমত সম্বন্ধে বিশদ পর্যালোচনা করে গবেষকরা দেখিয়েছেন

জনসংখ্যার ৮৬.২% খ্রীস্টান, ২% ইহুদি, ৫% মুসলিম, ৪% বৌদ্ধ এবং ২% হিন্দু।[৯]

১৯৯৩ সালের শিকাগো পার্লামেন্টে, স্বামী বিবেকানন্দ শারীরিকভাবে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর আদর্শ অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং জড়বাদের উপর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করাও সারাক্ষণই অনুভূত হয়েছে। আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে ১৯৯৩ সালের শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে সকল ধর্মের প্রতিনিধিরা সশ্রদ্ধচিত্তে বহুবার স্বামীজীর বাণী উদ্ধৃত করেছেন।

একশ বছর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ "সবেমাত্র আমার কাজ শুরু করেছি। আমেরিকায় কেবল দু-একটি তরঙ্গ আমি তুলেছি; প্রবল জোয়ারের তরঙ্গ তুলতে হবে; সমাজের আমূল পরিবর্তন করা দরকার। পৃথিবীতে একটি নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করতে হবে। পৃথিবী বুঝতে পারবে ঈশ্বর কি বস্তু এবং আমি কেন এসেছি।"[১০]

একশ বছর পূর্বে আমেরিকানদের মনোজগৎ যে অবস্থায় ছিল সেই তুলনায় আজ সেখানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেছে। একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন, যাতে স্বামীজীর প্রভাব প্রশ্নাতীত সেটি হল বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে।

অধিকাংশ আমেরিকান এখন বিশ্বাস করেন যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একই ঈশ্বরের উপাসনা করেন, যদিও তাঁকে নানা নামে ডাকা হয়।[১১] এ থেকে আমাদের বোঝা উচিত যে ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ আমেরিকানদের মন থেকে এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণভাবে গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে তারা নিজেদের ধর্মের মাহাত্ম্য সম্পর্কে উদাসীন। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই দেশে যখন তারা প্রথম বসবাস শুরু করেছিল সে সময়ের তুলনায় বর্তমান আমেরিকানরা আরও বেশি ধর্মপ্রাণ। অধিবাসীদের মধ্যে বিস্ময়করভাবে শতকরা চুরানব্বই জন 'ঈশ্বর কিংবা এক বিশ্বজনীন মানবধর্মে' বিশ্বাসী।[১২] ফুলব্রাইট অধ্যাপক উইনটন সোলবার্জ (Winton Solberg) লিখেছেনঃ "খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা পৃথিবীর অগ্রগণ্য শিল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে আমেরিকাকে সবচেয়ে বেশি ধর্মপ্রাণ দেশ বলে অভিহিত করেছেন।"[১৩]

কার্যত জনমত গ্রহণ করে দেখা গেছে যে আমেরিকানদের মধ্যে শতকরা বাষট্টি জন স্বীকার করেছেন তাঁদের জীবনে ধর্মের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে, শতকরা সাতাত্তর জন বলেছেন জীবনে কোনও সিদ্ধান্ত নেবার সময় ঈশ্বরই তাঁদের পরিচালিত করেন, এবং এক-তৃতীয়াংশের বিশ্বাস, যে কোনও সঙ্কটের মুহূর্তে ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে থাকেন। তবুও শতকরা সত্তর জন ব্যক্তি বলেছেনঃ "কি ঠিক আর কি ভুল তা স্থির করা প্রত্যেক মানুষের উচিত।"[১৪] U.S. News and World Report নামক পত্রিকায় একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধে বলা হয়েছেঃ "সাম্প্রতিক কালে বেশ কয়েকটি গবেষণার ফলে দেখা গেছে বিশেষ কোনও একটি ধর্মের প্রতি মানুষ এখন কম আকৃষ্ট, ধর্মবিষয়ে ভালমন্দ যাচাই করে দেখতে তারা বেশি পক্ষপাতী, অপর ধর্মের প্রতি সহনশীল এবং ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে অন্তর্মুখী হওয়ার উপরেই বেশি জোর দিয়ে থাকেন।"[১৫]

ধর্মের বহিরঙ্গ বিষয়ে এখন আমেরিকানদের আগ্রহ খুবই কম, যে যার নিজের আধ্যাত্মিক বিকাশের উপরে বেশি নজর দিয়ে থাকে। এই পরিবর্তনে স্বামী বিবেকানন্দের চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবেন না।

পাশ্চাত্য দেশে জাগতিক চেতনার ক্ষেত্রে একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে—বিজ্ঞান সেখানে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। স্বামীজীর সময়ে বিজ্ঞান ছিল জড়বাদের সঙ্গে একীভূত। নিজের মতবাদের উপর বিজ্ঞানের এমনই এক বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে—যেসব সুকুমার মানবিক বৃত্তি পশুর স্তর থেকে মানুষকে উচ্চস্তরে উন্নীত করে তাও অস্বীকার করত।

সেসব দিন বহুপূর্বেই গত হয়েছে। বিজ্ঞান নিজেই এখন নিজের তৈরি মতবাদকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছে। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর কোয়ান্টাম এবং অন্যান্য থিয়োরী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং একেবারে হাল আমলে এসেছে Chaos Theory।

কোপার্নিকাসিয়ান/কার্টেসিয়ান/নিউটনিয়ান উদাহরণগুলি একে একে আপন গৌরবের আসন হারিয়েছে; বিংশ শতাব্দীর মার্ক্সবাদ এবং ফ্রয়েডীয়তত্ত্ব নামক দুই মতবাদে নিশ্চিত বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও এমনই বিচ্যুতি ঘটেছে। এখন একই মঞ্চে ধর্মীয় নেতা, মনোবিজ্ঞানী এবং পরিবেশ বিজ্ঞানীর সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানীর আসন গ্রহণ কোনও বিরল দৃশ্য নয়।

এখনকার পৃথিবী একেবারে এক নতুন পৃথিবী। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে এই নয়া দুনিয়াও নানা কারণে আনন্দময় স্থান নয়। যুদ্ধ, দারিদ্র্য, রোগ এবং ঘৃণা এই পৃথিবীকে দগ্ধ করছে। প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললে দেখা যাবে পৃথিবীর সকল দেশেই গণহত্যা, কোনও বিশেষ জাতির উৎখাত এবং একটানা বর্বরতার নানা সংবাদ। পূর্বের মতো আজও জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী এবং লিঙ্গভেদে বৈষম্যমূলক আচরণ এবং যন্ত্রণাভোগ অব্যাহত।

আমরা এমনই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি যে অন্যের প্রতি তাকাবার অবসর আমাদের নেই। ফলে আমরা কেবল নিজেদেরই ধ্বংস করছি না, এমন শ্বাসরোধকারী পরিবেশে পৃথিবী আর কতদিন টিকে থাকবে এ নিয়ে মানুষের মনেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

মানুষের মহত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং পশুবৎ আচরণের মধ্যে এমন বিভাজন আমেরিকার মতো আর কোনও দেশে এত প্রকট নয়। টি.ভি.-র মাধ্যমে পৃথিবীর দুঃখদুর্দশা এবং সভ্যতার অবনতির কথা এখানে প্রতিগৃহে এসে পৌঁছয়। আর তার চেয়েও ভয়াবহ হল প্রতিটি গৃহই এখন এক গভীর সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে। পাশ্চাত্যের পরিবারগুলি যেন গিরিচূড়ার শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে; এদের টিকে থাকা নিয়েই আজ প্রশ্ন উঠেছে। পরিবারগুলি ধীরে ধীরে ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্যের সমাজও টুকরো টুকরো ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ফলে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে ভয়াবহ অপরাধের সংখ্যা, মানসিক রোগের চিকিৎসকদের চেম্বারে রোগীর ভিড় এবং মাদকদ্রব্য বা ড্রাগের নেশায় বুঁদ হয়ে স্নায়ু অবশ রাখার প্রবণতা। সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধনের অভাবে এক ধরনের নৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে এবং শিল্পোন্নয়নের পরবর্তী কালের পাশ্চাত্য সমাজে তা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

এসবই পাশ্চাত্য জগতের অধোগতির কথা। আমরা যদি জানালা খুলে কেবল অন্ধকারই দেখি তাহলে দৃশ্যটি নিঃসন্দেহে খুবই ভয়াবহ। স্বামীজী কিন্তু এ ধরনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে চাননি।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় এসেছিলেন তখন এদেশে বিশাল পরিবর্তনযজ্ঞ শুরু হয়েছে। অভূতপূর্ব গতিতে যেসব পরিবর্তন ঘটছিল তার ফল সমাজেও নানাভাবে দেখা দিয়েছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের আঘাত পাশ্চাত্য দেশ কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল এবং এই শতাব্দীর শেষভাগেও নিঃসন্দেহে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিষম বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারবে।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের উপর স্বামীজীর গভীর আস্থা ছিল। ১৮৯৩ সালে স্বামীজী এই অজানা দেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং নির্বান্ধব অবস্থায় পদার্পণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এমনই ভাগ্য যে অল্পদিনের মধ্যে এই অজানা দেশ তাঁর আপন দেশ হয়ে উঠল। ১৮৯৪ সালে ওয়াশিংটন থেকে স্বামীজী লিখেছিলেনঃ "এঁরা সকলেই আমাকে এবং আমার উপদেশ পছন্দ করেন। এই দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আমি ঘুরে বেড়াই। হাজার হাজার মানুষ আমার ভাষণ শুনেছেন এবং আমার বক্তব্য সহৃদয় চিত্তে গ্রহণ করেছেন।"[১৬] পুনরায় ঐ সালে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেনঃ "এই দেশ আমার কাছে স্বদেশের চেয়েও বেশি।"[১৭]

আমেরিকার প্রতি স্বামীজীর ভালবাসা ধীরে ধীরে গভীরতর হয়। তিনি দেখলেন তাঁর উপদেশ গ্রহণের পক্ষে এই দেশ বিশেষ উপযোগী। ১৮৯৬ সালে লণ্ডনে এক সাক্ষাৎকারে স্বামীজী বলেছিলেনঃ "আমেরিকান সভ্যতা, আমার মতে, এক মহান সভ্যতা। আমেরিকানরা নতুন ভাবগ্রহণে বিশেষভাবে আগ্রহী। যেহেতু নতুন সেজন্য কোনও কিছুকে এরা বাতিল করে দেয় না। নতুন জিনিসের গুণাগুণ এরা বিচার করে দেখে এবং এরকম বিচার করেই তা গ্রহণ কিংবা বর্জন করে থাকে।"[১৮] হাজার হাজার আমেরিকান স্বামীজীর শিষ্য হয়েছিলেন[১৯] এবং তাঁদের মধ্যে ভাগ্যবান কয়েকজন হয়েছিলেন তাঁর আপন পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। এরকম কয়েকজন হলেন সারা বুল, ভগিনী কৃস্টিন, সমগ্র হেল পরিবার, জোসেফিন ম্যাকলাউড।

স্বামীজীর দিক থেকে দেখলে লক্ষ্য করা যাবে যে আমেরিকায় অত্যধিক পরিশ্রম করার ফলে তিনি প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে এসে পৌঁছেছিলেন। কঠোরভাবে নিজের কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ে, তিনি তা আর পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। অন্য কেউ এমনভাবে কাজ করলে, স্বামীজীর নিজের কথায়, একেবারে মৃত্যু বরণ করত। তিনি কিন্তু সব জেনেশুনে এবং নিজের ইচ্ছেয় এমন করেছিলেন। স্বামীজীর কর্মজীবনের বেশির ভাগ কেটেছে পাশ্চাত্যের ভূমিতে বীজ বপন করে; তিনি জানতেন যত্ন করলে একদিন এই বীজ থেকে সুন্দর ফল ফলবে। শ্রীরামকৃষ্ণের চারজন মহান শিষ্যকে এদেশে পাঠানোর মধ্যেও স্বামীজীর দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকায় মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করা খুব কঠিন কাজ, এই ভেবেই মনে হয় তিনি ঐ কাজ করেছিলেন—এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি সম্ভবত এও জানতেন যে একদিন এদের মন গলবে, নইলে নিজের এবং গুরুভাইদের শক্তি এমন শ্রমসাধ্য কাজে এভাবে নিঃশেষ করতেন না।

উনিশ শতকের শেষাংশের মতো বিশ শতকের শেষপাদেও অনেক নতুন নতুন উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া পূর্ব শতাব্দীর শেষপাদের মতো বিশ শতাব্দীর

শেষপাদ হল একাধারে 'সবচেয়ে সুসময় এবং সবচেয়ে দুঃসময়,' বিশেষত ধর্মের ক্ষেত্রে। এখন পৃথিবীর সর্বত্র ধর্ম নিয়ে বিদ্বেষ ও রক্তপাত চোখে পড়ে। পক্ষান্তরে, পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করতে ধর্মের—যদি তার অর্থ ঠিকমত উপলব্ধি করা যায়—মতো শক্তি আর কিছু নেই। এই দিক থেকে দেখলে বিশ শতকের শেষপ্রান্তে আমেরিকানরা বিশেষ ভাগ্যবান কারণ Barry Kosmin এবং Seymour Lachman নামে দুজন গবেষক বলেছেনঃ "বিশ শতকের শেষভাগে আমেরিকায় ধর্ম মানুষে মানুষে মিলনের বন্ধন হয়ে উঠেছে— যা জাতি-ধর্ম এবং কিছু পরিমাণে সামাজিক ভেদাভেদের সীমা অতিক্রম করে গেছে। এই বিচারে আমেরিকা একটি অদ্বিতীয় দেশ। পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ধর্মের পার্থক্যের জন্য ভয়ানক উত্তেজনা ভেদাভেদ এবং সময় সময় প্রকাশ্য যুদ্ধ দেখা দেয়।"[২০]

বর্তমান কালে পাশ্চাত্যের অতি অল্প মানুষ 'বেদান্ত' শব্দটি শুনেছে কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ কি ছিলেন তা জানে। সংখ্যা হিসাবে বলা যায়, গত শতাব্দীতে যখন তিনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন তখন তাঁর নাম যত লোক শুনেছিল আজ তার চেয়েও কম লোক তা শুনেছে। কিন্তু এরকম হিসাবের উপর স্বামীজী বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। তিনি বলেছিলেনঃ "আমার নাম জানা নয়, আমার আদর্শ যেন লোকে উপলব্ধি করতে পারে, এটাই আমি চাই।"[২১] ধীরে ধীরে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই দেখে আমাদের আশা হয় যে পাশ্চাত্যে তাঁর কাজ ক্রমেই বাড়তে থাকবে এবং একদিন তা পূর্ণ বিকাশ লাভ করবে। কেবলমাত্র এক শতকের হিসাবে নয়, কয়েক শতাব্দীর হিসাবে স্বামীজী তাঁর কার্যক্রমের কথা ভেবেছিলেন। ১৯০১ সালে তিনি ঘোষণা করেছিলেনঃ "পনেরো শ' বছর ধরে কাজ করার মতো জিনিস আমি তাদের দিয়েছি।"[২২]

মানবসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একত্বের ধারণাটি এখন পাশ্চাত্যের অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। পুনর্জন্মবাদ ধারণাটিও অনেকে এখন মানেন এবং 'কর্মবাদ' ধারণাটি, প্রচলিত বাগ্‌ধারায় যাকে বলা যায়, 'যা চারদিকে ঘটে তাই আবার ফিরে আসে,'— প্রবাদবাক্যের আমেরিকান পরিচ্ছন্নতার মতই এদেশে ঘরোয়া জিনিস হয়ে উঠেছে।

স্বামীজীর আদর্শ ধীরে ধীরে আমেরিকার কঠিন পাথুরে ভূমিতে চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রবেশ করছে। আমরা এখন কেবল লক্ষ্য রাখব এবং অপেক্ষা করে থাকব এবং মনে রাখব, আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য স্বামীজীর কাজ যতই ধীরগতি বোধ হোক, একদিন নিঃসন্দেহে তা সফল হয়ে উঠবে। কারণ তিনি নিজেই তো বলে গেছেনঃ "আমি সর্বত্রই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করব যতদিন না সে উপলব্ধি করে ঈশ্বর এবং সে একই সত্তা।"[২৩]



সেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দাসানুদাস। আবার শ্রীমা সারদার বরপুত্র। সিমলের দুরন্ত ছেলে। দুই ভায়ের স্নেহময় দাদা। গ্রন্থপিপাসু।
শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদদের মাথার মণি, আপন জন। নিবেদিতা, গুডউইনের স্নেহময় আচার্য। মুমুক্ষু সন্তানদের করুণাময়, প্রেমময় গুরু। সেভিয়ার দম্পতির সন্তান— জীবন্ত বেদান্ত। সব মিলিয়ে অন্তরঙ্গ বিবেকানন্দ 'প্রাণের মানুষ'।

কোথায় খুঁজি তাঁরে

প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা

'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর'—মনে হয় বিবেকানন্দ-অন্বেষণেও কথাটিকে প্রয়োগ করা চলে। ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্মমহাসভার বক্তৃতাকে কি বলা যায় prophecy fulfilled ! অথবা সেটা এক আকস্মিক যোগাযোগ ! কিংবা একটি অলৌকিক সংঘটন—অনেকভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। বর্তমানে বিদগ্ধ গবেষক থেকে শুরু করে স্বামীজীর স্বরূপ অন্বেষণের আগ্রহ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই লক্ষণীয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে কি এমন মহনীয় জীবনের মূল্যায়ন সম্ভব? তাই প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থেকে যায়। স্বামীজীর জীবনের মূল সুরটিকে ধরতে পারা সহজ নয়। গিরিশবাবু তাই বলেই দিলেনঃ 'নরেন এত বড় হ'ল যে, মায়া হতাশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন।'[১] অর্থাৎ স্বয়ং মহামায়াও হার মানলেন। নাগ মহাশয় বললেনঃ "আপনাকে কে বুঝবে—কে বুঝবে? দিব্যদৃষ্টি না খুললে চিনবার জো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন; আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কেউ বুঝতে পারেনি।"[২] ঠাকুরের অসংখ্য প্রশংসাবাক্যের মধ্যে একটি পরিচয় যেন মনে গাঁথা হয়ে যায়—'আমার নরেন্দ্রের ভেতর এতটুকু মেকি নেই; বাজিয়ে দেখ, টং টং করছে।'[৩] মা অতশত কথার ঘোরপ্যাঁচে না গিয়ে বললেনঃ 'নরেন আমাদের মাথার মণি।' আর স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই বলেছিলেনঃ "যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকতো তবে বুঝতে পারতো, বিবেকানন্দ কি করে গেলো।"[৪]

যাঁরা এতদিন স্বামীজীর ভাবনাকে post dated cheque-এর মতো আবর্জনার ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন এখন তাদের একটু ফিরে চিন্তা করতে হবে। রাজনীতির মানুষ হলে অসুবিধা ছিল না। মনোমত একটা party label লাগিয়ে দিলেই হত। বর্তমান বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা ঢোঁড়া সাপের ব্যাঙ গেলার মতো। তারা বিবেকানন্দকে না পারছেন গ্রহণ করতে, না পারেন বর্জন করতে। একেবারে ঝেড়ে ফেলতেও তো পারছেন না। স্বামীজীর বর্তমানেই সমালোচনা ও নিন্দাবাদ যথেষ্ট হয়েছে। অভিধানে কোনও শব্দ বোধহয় বাকি ছিল না। অবশ্য সে-সবের মোকাবিলা করবার পদ্ধতি তাঁর ছিল আশ্চর্য। বলতেনঃ "শত শত বার মনে হইয়াছে, এ দেশ হইতে চলিয়া যাই; কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি। আমি কোন পথ দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু তো সব দেখিতেছে। মরি বাঁচি, উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি

না।"[৫]

আবার এমন মানুষ অনেক আছেন, যাঁরা এযুগে স্বামীজীকে করেছেন তাঁদের জীবনের ধ্রুবতারা। এটা কি কোনও 'ism'-এর ফল? কোনও ভিত্তিহীন আবেগ? কোনও ফাঁপা ভাবালুতা? আমরা পৌঁছতে চাইছি প্রকৃত বিবেকানন্দের কাছে। কোথায় পাব তাঁকে? একের পর এক তাঁর জীবনের বহু দিব্য দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ভাবছি কোনটি তাঁর আসল পরিচয়!

মনে পড়ে একটি বালক ছাদের ওপর থেকে তার অতি প্রিয় সীতারামের যুগলমূর্তি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে নীচে—রাজপথে পড়ে সেটি চুরমার। বাবার কোচম্যান বলেছে বিয়ে করা খুব খারাপ। রাম বিবাহিত, তাঁর বালক হৃদয় সীতারামকে আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারছে না।

আর একদিন—বালকটিকে দেখি সমবয়সী বিপন্ন অপর এক বালককে বেগবান ঘোড়ার পায়ের তলা থেকে উদ্ধার করতে নিজের প্রাণের তোয়াক্কা না করেই ছুটে যাচ্ছে।

উত্তরকালে দেখি চরম জিজ্ঞাসা নিয়ে তরুণ নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত। তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ঈশ্বরকে তিনি দেখেছেন এবং তাকেও দেখাতে পারেন। না, নিজের অনুভূতি দিয়ে সত্য প্রমাণিত না হলে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্বাসেও তাঁর জিজ্ঞাসার অবসান হয়নি। তখনও সংশয়—ঐটা শ্রীরামকৃষ্ণের hallucination বা মাথার ভুল। এখানে কি নরেন্দ্র-চরিত্রের একটু আভাস পেলাম?

যখন দক্ষিণেশ্বরে একঘর লোকের মাঝখানে নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ "কেশব যেরূপ একটা শক্তির বিশেষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরূপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান,"[৬] তখন সেই উচ্চ প্রশংসায় বিন্দুমাত্র স্ফীত হননি তিনি, তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেনঃ 'মহাশয় করেন কি? লোকে আপনার ঐরূপ কথা শুনিয়া আপনাকে উন্মাদ বলিয়া নিশ্চয় করিবে, কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব..., কোথায় আমার ন্যায় একটা নগণ্য স্কুলের ছোঁড়া।"[৭] আত্মপ্রশংসায় বিমুখ এ কোন নরেন্দ্রনাথ?

নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করছেন না টাকা বা ধাতুর স্পর্শে ত্যাগের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যিই বৃশ্চিক দংশন অনুভব করেন। নরেনের ঈশ্বর অন্বেষণের পর্ব তখন শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন অনুসরণ করেই চলেছে। সুতরাং তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য বিছানার নীচে টাকা রেখে দিলেন। এর পরের কাহিনী সকলের জানা। ফলাফল দেখে স্তম্ভিত নরেন্দ্রনাথ। এমন অসংখ্যবারই শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে নির্ভীক নরেন্দ্রনাথের কাছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্রয়। এই নরেনই আরেকদিন ঠাকুরের মুখে সব ঈশ্বর, সবই ব্রহ্মময় শুনে হাজরার কাছে 'ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর,' যা কিছু দেখছি সবই ঈশ্বর ইত্যাদি কৌতুক সংলাপে হাসির রোল তুলেছিলেন। সেদিন, সেই মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যস্পর্শে নরেন্দ্রনাথের ভাবান্তর হল! অবাক বিস্ময়ে নরেন্দ্রনাথ অনুভব করলেন ঈশ্বরভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্য কিছুই আর নেই।

আবার এই নরেনকেই দেখতে পাওয়া যায় সিমলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের

মতো ছুটে চলেছেন কাশীপুরের দিকে। ভেবেছিলেন ঘরে থেকে পড়াশোনা করে আইন পরীক্ষা দেবেন। তিনি সাবালক জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভাই বোনেদের মুখে এক মুঠো অন্নসংস্থানের দায়িত্ব যে তাঁকেই নিতে হবে। কিন্তু কোথা থেকে কি ঘটে গেল! এ প্রসঙ্গে বর্ণনা শুনি তাঁরই মুখ থেকেঃ "অমন কান্না কখনও কাঁদি নাই। তারপর বইটই ফেলে দৌড়। রাস্তা দিয়ে ছুট! জুতো টুতো রাস্তায় কোথায় একদিকে পড়ে রইল। খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, গাময় খড়। আমি দৌড়াচ্ছি— কাশীপুরের রাস্তায়।"[৮] নরেন্দ্রনাথের এ কোন অভিযান?

নরেনের উচ্চতম উপলব্ধি চাই, চাই নির্বিকল্প সমাধি। আশ্চর্য উত্তর এল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। এর চাইতেও অনেক উঁচু অবস্থা আছে আর নরেনের কাছে তাঁর প্রত্যাশা অনেক বেশি। আশ্চর্য গুরুর আশ্চর্য শিষ্য। গুরু নিজের প্রসঙ্গে বলছেনঃ "অচিনে গাছ শুনেছ?...এ একরকম গাছ আছে—তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।"[৯] আবার বলছেনঃ "বাউলের দল হঠাৎ এল,—নাচলে, গান গাইলে; আবার হঠাৎ চলে গেল! এল গেল, কেউ চিনলে না।"[১০] অবতার যেন অচিনে গাছ; তাঁকে কেউ চিনতে পারে না। অবতার সঙ্গীদের কি চেনা সোজা? আমরা তবে কোন নরেন্দ্রনাথের পরিচয় খুঁজছি?

নরেনকে নির্বিকল্প সমাধি বা ব্রহ্মানুভূতির স্বাদ দিতেই হল। এখানেও আসল নরেনকে পেলাম কি? না তো। গুরু বলে দিলেন ব্রহ্মানন্দের ঘর আপাতত বন্ধ। 'চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে।'[১১] এরপরেই সেই ছবিটি ভেসে ওঠে—গুরু-শিষ্য মুখোমুখি কাশীপুরে, শেষশয্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে জল—তিনি নরেনকে সব দিয়ে ফকির হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সব শক্তি সব সিদ্ধি লাভ করে নরেন্দ্রনাথ বিশ্বনায়ক হবার পথে। এই কি আমাদের পরিচিত নরেন্দ্রনাথ? না, নরেনের অধ্যাত্ম-তৃষ্ণা মেটেনি। তিনি উপস্থিত হয়েছেন গাজীপুরে পওহারী বাবার কাছে যোগ-শিক্ষার্থিরূপে।

'নরেন্দ্রনাথকে ধারণা করতে হলে তাঁর-source-টা বোঝা দরকার।' উৎস হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই সত্তা এক দেহে মিলে মিশে একাকার। কেবলমাত্র নরেন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া তো সহজ নয়। অর্থাৎ আমরা সেই ভুলই করছি যা বিবেকানন্দ-অন্বেষকরা প্রথমাবধি করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব অতিক্রম করা নরেনের সাধ্যাতীত। তাই ঘুরে ফিরে পৌঁছতে হয় 'রামকৃষ্ণময়' বিবেকানন্দে। যতবার তিনি পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নিতে প্রস্তুত হয়েছেন, সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই সময়ে তাঁর মনের অবস্থার একটি নিখুঁত ছবি তিনি নিজেই এঁকেছেন প্রমদাদাসবাবুকে লিখিত একটি পত্রে। "বাবাজীর তিতিক্ষা অদ্ভুত, তাই কিছু ভিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপুড়হস্তের নামটি নাই, খালি গ্রহণ! খালি গ্রহণ! অতএব আমিও প্রস্থান।"[১২] 'পুনশ্চ' দিয়ে আবার লিখছেনঃ "আর কোন মিঞার কাছে যাইব না—...এখন সিদ্ধান্ত এই যে রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy বদ্ধ জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই।...তাঁর জীবদ্দশায় আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতা মাতায় কখনও বাসেন নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, কঠোর সত্য, তাঁর শিষ্যমাত্রেই জানে।"[১৩] পরবর্তী কালে এই মর্মস্পর্শী ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর স্বরচিত কবিতায়—

"যেতে চাই দূরে পলাইয়ে;
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে
নির্বাক আনন, ছল ছল আঁখি,
চাহ মম মুখ পানে।"[১৪]

এরপর আসি আরেকটি ঘটনায়। স্থান বলরাম মন্দির। দোতলার হলঘরে পূর্বদিকে ঠাকুর শুয়ে আছেন, পশ্চিম মুখে নরেন্দ্রনাথ। "...হঠাৎ স্বামীজী বলে উঠলেন, Lo ! the old man is entering into me. ঠাকুর আস্তে আস্তে...স্বামীজীর কাছে এসে বললেন, কি ইকড়ি মিকড়ি বলছিস? তারপর পিঠের উপর উঠে বলছেন, তোর মধ্যে আমি পপ্পড়িয়ে ঢুকবো।"[১৫] এই কি নরেনের প্রকৃত পরিচয়?

বক্তৃতার চাইতে অন্তরঙ্গরূপে স্বামীজীকে পাওয়া যায় তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে। প্রমদাদাসবাবুকে তিনি যেসব চিঠিপত্র লিখেছেন তার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে কি নম্রতা! চিঠি শেষ করেছেনঃ 'ইতি দাস নরেন্দ্র।' তা বলে প্রয়োজনে নিজের মত জানাতে কখনও দ্বিধা করেননি। বলরামবাবুর মৃত্যুতে নরেনকে অশ্রু-বিসর্জন করতে দেখে প্রমদাদাসবাবু বিস্মিত হয়েছেন, প্রশ্ন করেছেনঃ "আপনি সন্ন্যাসী হয়েও এত শোকাকুল কেন? সন্ন্যাসীর পক্ষে শোক প্রকাশ করা অনুচিত।" স্বামীজী বলেছিলেনঃ "বলেন কি? সন্ন্যাসী হয়েছি বলে হৃদয়টা বিসর্জন দেব? প্রকৃত সন্ন্যাসীর হৃদয় সাধারণ লোকের হৃদয় অপেক্ষা বরং আরও অধিক কোমল হওয়া উচিত।...যে সন্ন্যাসে হৃদয় পাষাণ করতে শিক্ষা দেয়, আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না।"[১৬] এ কোন সমুদ্র-হৃদয় নরেন্দ্রনাথ?

আবার প্রমদাদাসবাবুকে লিখিত আর এক পত্রে তাঁর অনন্য এক চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি লিখছেনঃ "...আমি রামকৃষ্ণের গোলাম। তাঁহাকে 'দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু' করিয়াছি। তাঁহার নির্দেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না।...আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগীমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি।...ভগবান রামকৃষ্ণের শরীর নানা কারণে অগ্নি-সমর্পণ করা হইয়াছিল।...তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে, উহা গঙ্গাতীরে কোন স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধহয় মুক্ত হইব।"[১৭] তিনি আরও লেখেন যে এই কার্যের জন্য সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ও বলরাম বসু আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তাঁরা উভয়েই দেহত্যাগ করায় সে আশা সুদূরপরাহত। তাঁর গুরুভ্রাতারা সন্ন্যাসী, "তাঁহারা এইক্ষণেই যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত; কিন্তু তাঁহাদিগের এই দাস মর্মান্তিক বেদনা পাইতেছে, এবং ভগবান রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য গঙ্গাতীরে একটু স্থান হইল না, ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ...যদি বলেন, 'আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এ সকল বাসনা কেন?' —আমি বলি আমি রামকৃষ্ণের দাস—তাঁহার নাম তাঁহার জন্ম ও সাধনভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অণুমাত্র সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি ডাকাতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজী। আপনাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জানি, আপনাকে সকল বলিলাম। ... আপনার বিচারে যাহা হয় করিবেন।"[১৮] আমরা জানি প্রমদাদাসবাবু তাঁর এই আবেদনে সাড়া দেননি। 'দাস নরেন্দ্রে'র এই পত্র প্রমদাদাসবাবুকে বিচলিত করতে পারেনি কিন্তু

যদি উল্লিখিত পত্রটি নরেন্দ্রনাথ তাঁকে না লিখতেন রামকৃষ্ণদাস নরেন্দ্র-চরিত্রের এই অনন্যতা অজানা থেকে যেত। মনে হয় এখানেই যেন প্রকৃত নরেন্দ্রসত্তাকে একটুখানি স্পর্শ করতে পারলাম।

কাশীপুরের বাগানে অন্তিমশয্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ যে দায় নরেনের ওপর অর্পণ করেছিলেন, বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠা তার অন্যতম রূপায়ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারের যন্ত্ররূপে নরেনকে খোঁজা এখানেও শেষ করা যেত। কিন্তু আসল নাটকটাই যে তখনও বাকি। আসমুদ্রহিমাচল ভারত পরিক্রমার পর নরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন ভারতের জন্য, সমগ্র বিশ্বের জন্য তাঁকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে। হয়তো এই কর্মের আভাসই নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছিলেন। নরেনের অলৌকিক সব দর্শন হচ্ছে তখন। দেখছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদ্রের উপর দিয়ে পশ্চিমে হেঁটে যাচ্ছেন এবং তাঁকে ইঙ্গিত করছেন অনুসরণ করতে। এখানেই নরেন্দ্রের জীবন ইতিহাস এক নতুন মাত্রা পেল। এত সুস্পষ্ট আহ্বান! তবু মনে হল তা যথেষ্ট নয়। শ্রীরামকৃষ্ণশক্তি শ্রীমা সারদার চাপরাশ তাঁর চাই। এ নরেন 'সারদার বরপুত্র'। গুরুভাইদের কাছে লিখিত পত্রের ছত্রে ছত্রে তাঁর মাতৃভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। "মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়।... ঐ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া।... আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ্ করে পগার পার, এই বুঝ।"[১৯] অন্যত্র বলেছেন ঃ "যাঁর তাঁকে বিশ্বাস নাই আর মা-ঠাকুরানীতে ভক্তি নাই, তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, সাদা বাঙলা বললুম, মনে রেখো।"[২০]

নাটকের মূল দৃশ্যের শুরু এখানেই, এতক্ষণ ছিল তার মুখবন্ধ। 'নাম-যশ-ধন জনহীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন, প্রায় কপর্দকশূন্য পরিব্রাজকরূপে' একটি ত্রিশ বৎসরের যুবক একেবারে হাজির শিকাগোর ধর্মমহাসভায়—ভারতের জনপথ থেকে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে। দেবী সরস্বতীকে প্রণাম নিবেদন করে সংক্ষিপ্ত ভাষণ। কথাগুলি অতি প্রাচীন, অতি পরিচিত—মৌলিকতা কেবল উপস্থাপনে। উপনিষদের চিরন্তন বাণী এযুগের প্রফেটের মুখে পুনরুচ্চারিত। এখানেই ভারত-পথিক নরেন্দ্রনাথের বিশ্বাচার্য বিবেকানন্দে উত্তরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যরূপে তাঁর এক সত্তা দেখলাম। আবার তিনিই অধ্যাত্মশক্তির জ্যোতির্ময় বিকিরণ ঘটিয়ে দিব্যগুরুভাবে আসীন। হিমালয়ের পথে এই স্বামীজীকে দেখি প্রিয় শিষ্য সদানন্দের জুতো অবলীলায় বহন করছেন। আবার তিনিই আমেরিকা থেকে আলাসিঙ্গাকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পত্র লিখে প্রেরণা ঢেলে দিয়েছেন। বিবেকানন্দের সেই অগ্নিময় বাণী ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের যুবশক্তির ধমনীতে। "কারও ওপর হুকুম চালাবার চেষ্টা করো না—যে অপরের সেবা করতে পারে, সে-ই যথার্থ সর্দার হতে পারে। যতদিন না শরীর যাচ্ছে, অকপটভাবে কাজে লেগে থাকো। আমরা কাজ চাই—নামযশ টাকাকড়ি কিছুই চাই না।... কার্যসিদ্ধির জন্য আমার ছেলেদের আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।... তোমার যা ভাব দেবার থাকে দিয়ে যাও, বাকি প্রভু জানেন।... তোমরা যদি আমার সন্তান হও, তবে তোমরা কিছুই ভয় করবে না, কিছুতেই তোমাদের গতিরোধ করতে পারবে না। তোমরা সিংহতুল্য হবে। ভারতকে—সমগ্র জগতকে জাগাতে হবে।... কাপুরুষতা চলবে না বুঝলে?"[২১]

অন্যদিকে দেখি আর এক স্বামীজীকে যিনি নতুন সন্ন্যাসি-মণ্ডলীর আচার্য—সে যুগে ত্যাগতপস্যাময় সন্ন্যাসজীবনে অভিনব ও বৈপ্লবিক ধারা প্রবর্তন করতে চলেছেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে মায়াবতীর সেই ঘটনা। হিমালয়ে অদ্বৈত আশ্রমের প্রাণস্বরূপ মিস্টার সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। শিষ্যবৎসল স্বামীজী মর্মাহত হয়ে ম্যাকলাউডকে লিখলেনঃ '**শহীদ** যদি কোথাও থাকে তো এঁরাই তাই।' মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিতে ডিসেম্বরের শীত উপেক্ষা করে আসলেন মায়াবতী। কালীকৃষ্ণ তখন আশ্রমের কর্মী। সংঘের আদেশে তপস্যা ছেড়ে মায়াবতী আশ্রমের অনলস কর্মপ্রবাহে যোগ দিয়েছেন। ইচ্ছা 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র কাজ সামলে আবার ফিরে যাবেন নিভৃত সাধনার জীবনে। মাদার সেভিয়ার স্বামীজীকে একা পেয়ে অনুরোধ করেন, মায়াবতীর কাজে কালীকৃষ্ণের মতো সুযোগ্য কর্মীর এখন বড়ই প্রয়োজন। তিনি যেন কালীকৃষ্ণকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করেন। স্বামীজী সেদিন তেজের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিষ্যার কাছে জবাব দিয়েছিলেন—এরা ভদ্রলোকের ছেলে। আমার চাকর নয়। আমি কি করে তাদের নিষেধ করতে পারি। কিন্তু কালীকৃষ্ণকে ডেকে কর্মে উৎসাহিত করে তিনি সেই একই কথা উচ্চারণ করলেন, যে কথা তাঁকে ঢাকায় প্রচারকার্যে পাঠাবার সময় বলতে শুনেছিঃ "দ্যাখ, নিজের মুক্তি যদি খুঁজিস তবে নিশ্চয়ই জাহান্নমে যাবি, আর অপরের মুক্তির জন্য যদি কাজ করিস তো এখনই মুক্ত হয়ে যাবি।" স্বামীজী চাইতেন এক নতুন ধারার প্রবর্তনে তাঁর শিষ্যেরা তপস্যার চেয়ে কাজের দিকে মনোযোগী হন। শিষ্য কিন্তু তখনও অনমনীয়। সামনে ধমকালেও, কালীকৃষ্ণ স্থানান্তরে গেলে স্বামীজী বললেনঃ "কালীকৃষ্ণ যা বলেছে তা ঠিকই, ধ্যানধারণা আর সন্ন্যাসীব মুক্তজীবনের কি আর তুলনা আছে।" বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দের এ আর এক রূপ।

তৎকালীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষার বীজটি বপন করবার উদ্দেশ্যে নিবেদিতাকে পাশ্চাত্য থেকে নিয়ে এসে ভারতমাতৃকার পদপ্রান্তে উৎসর্গ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় নিবেদিতার ভারত পরিচয় ঘটেছিল শ্রীগুরুর দিব্যসান্নিধ্যে। অমরনাথের তীর্থযাত্রায় তিনি স্বামীজীর সঙ্গে যান। আমরা জানি, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বোচ্চ ঈশ্বরীয় অনুভবে নিমগ্ন হয়েছিলেন। সে দিব্য দৃশ্য দেখেছিলেন নিবেদিতা। তাঁর মনে হয়েছিল স্বামীজী সেই আনন্দানুভূতির আস্বাদ তাঁকেও দিতে পারতেন অথচ তিনি রইলেন আত্মমগ্ন। ক্ষোভে দুঃখে অভিভূত নিবেদিতার অভিযোগের উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'মার্গট, ও বস্তু তোমাকে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই—আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস নই।' নিবেদিতা জানতেন রামকৃষ্ণময় বিবেকানন্দের সে শক্তি আছে কিন্তু কী অহংশূন্যতা! এ হল রামকৃষ্ণদাস বিবেকানন্দের আর এক পরিচয় যিনি কোনও দিনই রামকৃষ্ণকে অতিক্রম করার চিন্তাও মনে স্থান দেননি। বিদেশিনী কন্যাটিকে অসীম মমতায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনঃ "বিপদে-আপদে আমি তোমার পাশে দাঁড়াব। ভারতে আমি যদি এক-টুকরা রুটি পাই, নিশ্চয় জেনো, তুমি তার সবটুকুই পাবে।"[২২] অন্য এক পত্রে নিবেদিতাকে আশীর্বাদে অভিষিঞ্চিত করে লিখছেনঃ "আমার অনন্ত আশীর্বাদ জেনো এবং কিছুমাত্র নিরাশ হয়ো না। ক্ষত্রিয় শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের সঙ্গের গৈরিক বাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা! ব্রত উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া

নয়।"[২৩] এমন দিব্য আশীর্বাদের বিরল অধিকারিণী নিবেদিতা বাস্তবিকই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গুরু-আদিষ্ট কর্মে আত্মনিয়োগ করে গেছেন। শ্রীগুরুর কৃপায় কর্মোদ্যমের সঙ্গে তিনি অর্জন করেছিলেন বুদ্ধের হৃদয়।

আমরা নরেনকে দেখলাম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্যরূপে। আবার তাঁর পদপ্রান্তে উপনীত মুমুক্ষু যুবক শিষ্যদের ভবরোগবৈদ্যের ভূমিকায় জন্মমৃত্যুর পারে হাত ধরে নিয়ে যেতে প্রস্তুত বিবেকানন্দকেও দেখেছি। দেখেছি আইরিশ কন্যা নিবেদিতার উপর ভারতের স্ত্রীশিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করতে। কিন্তু যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে দেখা হয়নি গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁর সপ্রেম ব্যবহারটি কেমন ছিল। সেও এক দিব্যপ্রেমের কাহিনী।

স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে পঞ্চম ভাগটির নাম দিয়েছিলেন 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ'। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রাদি শিষ্যমণ্ডলীর ত্যাগদীপ্ত জীবন-আলেখ্য তুলে ধরেছেন অনবদ্য ভঙ্গিমায়। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে কাহিনী বিস্তারিত বলার অবকাশ কোথায়? মাত্র দুটি একটি ঘটনার উল্লেখে নরেনের সঙ্গে গুরুভ্রাতাদের দিব্যপ্রেমের কাহিনী দেখার চেষ্টা করব।

ধর্মমহাসম্মেলনের পর স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় থেকে গিয়েছিলেন আরও চার বছর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ 'ভাব প্রচার' বা কর্মভিত্তিক বেদান্ত প্রচারের জন্য। অন্যদিকে তাঁর একান্ত বাসনা ছিল মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ। তাঁর পত্রাবলীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে সেই ইতিহাস! কি কঠিন ও ত্যাগদীপ্ত সেই ব্রত! মঠ স্থাপনের পর, কি করে তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে, সেই চিন্তায় ক্ষয় করেছেন তাঁর জীবনীশক্তি। শ্রীনগর থেকে অভিন্নহৃদয় গুরুভ্রাতা ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেনঃ "যখন আমি হিসাব-কিতাবের কথা বলি, তোমার মনে হয় যে, আমি তোমাদের অবিশ্বাস করছি ...আমার কেবল ভয় এই যে, এখন তো এক রকম খাড়া করা গেল। অতঃপর আমরা চলে গেলে যাতে কাজ চলে এবং বেড়ে যায়, তাহাই আমার চিন্তা।"[২৪] উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপিত করে পুনরায় আমেরিকা থেকে লিখছেনঃ "আমি আশীর্বাদ করছি...এই রাত্রে মা তোমাদের হৃদয়ে নাবুন, অনন্ত শক্তি তোমাদের বাহুতে আনুন!...আমি মায়ের দাস, তোমরা মায়ের দাস—আমাদের কি নাশ আছে, ভয় আছে? অহঙ্কার—মনে যেন না আসে, ভালবাসা—যেন না যায় মন থেকে। তোমাদের কি নাশ আছে?"[২৫] লিখছেন, "আমি চাই তোমরা (কাজ করতে করতে) মরেও যাও, তবু তোমাদের লড়তে হবে। সৈন্যের মতো আজ্ঞাপালন করে মরে যাও এবং নির্বাণ লাভ কর, কিন্তু কোন প্রকার ভীরুতা চলবে না।...আমার রূঢ়তার জন্য মন খারাপ করো না। মুখে যাই থাকুক—তুমি তো আমার হৃদয় জানো।"[২৬] ধীরামাতাকে তিনি তাঁর তৎকালীন মানসিক অবস্থা জানিয়ে লিখছেনঃ "...সে দুর্বল হৃদয়ই আবার—আমি যাদের ভালবাসি, তাদের জন্য কিছু সাহায্য ভিক্ষা করতে আমায় ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজ তাই আমি আমেরিকায়। শান্তি আমি চেয়েছি কিন্তু ভক্তির আধার সেই আমার হৃদয়টি আমায় তা থেকে বঞ্চিত করেছে। সংগ্রাম ও যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ও সংগ্রাম।...এ কথা মনে করবেন না যে, আমি মুহূর্তের জন্যও হাল ছেড়ে দেবো। কাজ ক'রে ক'রে অবশেষে রাস্তায় পড়ে মরবার জন্য ভগবান যদি আমায় তাঁর ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া করে থাকেন, তবে তাঁর

ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।”[২৭]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে এক পত্রে লিখছেনঃ “...তিনি কি শুধু ভারতের ঠাকুর? এই সঙ্কীর্ণ ভাবের দ্বারাই ভারতের অধঃপতন হয়েছে। তার বিনাশ না হলে কল্যাণ অসম্ভব। কোণ থেকে না বেরুলে কোন বড় ভাব হৃদয়ে আসে না। ক্রমে দেখা যাবে। প্রভুর ইচ্ছা। সকল বড় কাজ ধীরে ধীরে হয়।... কিছুতেই ভয় খেও না। যতদিন তিনি আমার মাথায় হাত রাখছেন, ততদিন কি কারুর দাবাবার জো আছে?”[২৮] এখানে প্রকৃত বিবেকানন্দের একটু আভাস বোধহয় পেলাম।

বর্তমান বৎসরে ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ ভূমিকাব ওপরেই আলোকপাত করা হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে যে নবীন সন্ন্যাসিসংঘ তিনি স্থাপন করেন, তার জন্যও ছিল তাঁর অসামান্য আত্মত্যাগ। শ্রীশ্রীঠাকুরের সুমহান ভাবধারাকে সম্মুখে রেখে, স্বামীজী মঠকে মহাসমন্বয়ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনি জানতেন “এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে, তা জগৎ ছেয়ে ফেলবে, মানুষেব জীবনগতি ফিরিয়ে দেবে, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে উচ্চাদর্শ সকল বেরোবে।”[২৯]

স্বামীজীর এই অভিনব প্রচেষ্টা আজ যতই সার্থকতা লাভ করুক, সেদিন কিন্তু তাঁকে গুরুভ্রাতাদের তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রকাশের সরল অভিব্যক্তির পিছনে যে গভীর ব্যঞ্জনা ছিল তা হৃদয়ঙ্গম করা তখন অনেকেরই সাধ্যাতীত। তাই গুরুভ্রাতাদের অভিযোগ স্বামী বিবেকানন্দকে কতখানি আঘাত করেছিল তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তিনি কি কেবলমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারের জন্যই জীবন উৎসর্গ করেননি? নিদারুণ অভিমানে স্বামী সারদানন্দকে তিনি লিখেছেনঃ “এবার আসি। আর তোমাদের বিরক্ত করব না;... আমি অতি আনন্দিত যে, কখনও তোমাদের কাজে লেগেছি—-অবশ্য তোমরাও যদি তাই মনে কর। অন্তত গুরু মহারাজ আমার উপর যে কর্তব্য অর্পণ করেছিলেন, তা সম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি...। সুতরাং তোমাদের নিকট বিদায়!”[৩০]

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাকালে জনৈক গুরুভ্রাতার প্রতিবাদের কথা আজ সকলেরই জানা। তাঁদের অভিযোগ ছিল যে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করবার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেননি। উপরন্তু তাঁর প্রচারিত নবীন কার্যধারা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন। এই অভাবিত অভিযোগে স্বামীজীর পক্ষে সেদিন হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ রোধ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। বাস্তবিক, আমেরিকায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে একটিমাত্র মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন, 'My Master'. এই বক্তৃতাকালে তিনি পাশ্চাত্যের ভোগপরায়ণতাকে নির্মমভাবে সমালোচনা করেন। পরে তিনি নিজের ঐ আচরণে অনুতপ্ত হন এই ভেবে যে অপর ধর্মের প্রতি সহানুভূতির অভাব শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ছিল না। উপরন্তু 'উন্মদ প্রেমপাথার' শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে তিনি ভক্তিস্রোতে আপ্লুত হয়ে পড়তেন। জ্ঞানের কঠিন আবরণে নিজেকে সংযত রাখা ব্যতীত অন্য উপায় তাঁর ছিল না।

শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে শুনেছি ঈশ্বরের ইতি করা যায় না। যে নরেনকে প্রথম দর্শনে

বন্দনা করে বলেছিলেনঃ "জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ"[৩১] সেই নরেনেরই কি ইতি করা যায়? অথচ আমরা সে অসম্ভব চেষ্টাই করে চলেছি। স্বামী বিবেকানন্দ তার আত্মপরিচয় না দিলে তাঁকে স্পর্শ করা অসম্ভব। জো-কে লেখা এক অসামান্য পত্রে আবরণ যেন ক্ষণিকের জন্য উন্মোচিত হয়েছে। "কর্ম করা সব সময়ই কঠিন, আমার জন্য প্রার্থনা কর জো, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা ঘুচে যায়; আর আমার সমুদায় মন-প্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।...

"আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই যে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর তলায় শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত।... আহা আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি। সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর।... বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে!...বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক...তুই আমার পিছু পিছু চলে আয়!'—যাই প্রভু, যাই!"[৩২]

মনে হচ্ছে 'রামকৃষ্ণময়' বিবেকানন্দ ক্ষণিকের জন্য তাঁর মুখের ওপর আলোটি ফেলেছিলেন। একটুখানি যেন এখানেই বিবেকানন্দকে স্পর্শ করতে পারলাম। ধন্য বিবেকানন্দ, ধন্য তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষ।

‘মা-ঠাকুরানী’র নরেন

হর্ষ দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকদিন থেকেই লক্ষ্য করছিলেন, সারদার উপর ভাগ্নে হৃদয়রামের অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার ক্রমশ বেড়েই চলেছে। হৃদয় জানে না, জানা তার পক্ষে সম্ভবও নয় কে এই সারদা! কী তাঁর স্বরূপ! সেই মদমত্ত রূঢ়ভাষী লোকটির কাছে তিনি কেবলই মানবী, তার মামী। শ্রীরামকৃষ্ণ আর থাকতে না পেরে একদিন ভাগ্নেকে সাবধান করে দিলেনঃ “ওরে, হৃদে, (নিজ দেহ দেখাইয়া) একে তুই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে (শ্রীমাকে) আর কখনও এমন কথা বলিসনি। এর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস; কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।”

হৃদয়রাম কোনও দিনই শ্রীমা সারদাকে চিনতে পারেনি। শুধু হৃদয় কেন, সেই সময়ে অনেকেই পারেনি। সময়ের হিসেবে আঠারশ একাশি খ্রীস্টাব্দ। শ্রীমায়ের বয়স তখন মাত্র সাতাশ-আঠাশ। তখনও তিনি নহবতবাসিনী, অবগুণ্ঠনবতী। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কেও অনেকে অবগত নয়। কেউ কেউ শুনেছেন, তিনি আছেন। তবে চোখে দেখেননি। চেনা-বোঝা তো দূরের কথা। স্বামী প্রেমানন্দ আক্ষেপ করে আরও একবার বলেছিলেনঃ ‘শ্রীমাকে কে বুঝেছে?’ অথচ সারদা তো রহস্যময়ী নন, মায়াবিনীও নন। তাহলে! শ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যচ্ছলে শ্রীমা সম্পর্কে বলতেন, ‘ছাই চাপা বেরাল!’ তাঁকে চিনতে পারা যেন অত সহজ নয়।

নরেন্দ্রের মাকে চেনা কোনও সমস্যা ছিল না, সমস্যা ছিল মাকে মানা। এই পঙ্‌ক্তিটি পড়ে অনেকেই হয়তো ভাববেন, ঐ একই বছরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রথম যাওয়ার পর থেকে নরেন্দ্র যে মায়ের দিক থেকে ভিতর ও বাইরের দৃষ্টি ফিরিয়ে রেখেছিলেন, তিনি মৃন্ময়ী কালী, ভবতারিণী; সারদা শ্রীমা তো নন!

এক বর্ষণমুখর রাত্রে (১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে), নরেন্দ্র যখন মা কালীকে মানলেন, সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দ আর ধরে না। পরদিন নিদ্রিত নরেন্দ্রকে দেখিয়ে ভক্তদের বলছেনঃ ‘নরেন মাকে মেনেছে। বেশ হয়েছে, কেমন?’

ইতিহাসে এমনই পাচ্ছি। সত্যিই নরেন্দ্র কালীকে মেনেছিলেন। হ্যাঁ, তখন সারদা বা শ্রীমা সম্পর্কে তাঁর কী ধারণা ছিল, সেই আলেখ্য আমরা পাইনি। কিন্তু একথা কি

করে অস্বীকার করব—সেই মুহূর্তে নরেন্দ্রের জীবনে—কালী এবং শ্রীমা অভেদ! যিনি ভবতারিণী তিনিই কি সারদা নন! জগৎ জুড়ে যাঁর অধিষ্ঠান, হৃদয় জুড়ে যিনি আছেন, আদিগন্ত চরাচরে যাঁর আঁচল পাতা তিনি তো একটিই মা! মানুষ নানা সম্পর্কের নিরিখে তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পনা করে নিয়েছে। নানা নামে ডেকেছে। অথচ সব মা এক, একক, অখণ্ড। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এই আবহ সত্যটিকে নিজমুখে প্রকাশ করে গিয়েছেন। শ্রীমাই একদা তাঁকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছিলেন সেকথা। সারদা হঠাৎ একদিন কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?' মায়ানির্মুক্ত ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেনঃ "যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই!"

অতএব স্বতই মনে হয়, বৃষ্টিবিধৌত সেই রাতে নরেন্দ্র যেমন কালীকে মানলেন, তেমনই মানলেন শ্রীমাকে। অথচ তখনও শ্রীমা কেবল গুরুপত্নী, পরমহংসদেবের সহধর্মিণী। তাঁকে মানার সূক্ষ্মকাজটি অনেক ধৈর্য ধরে এবং বিনা জোরে সমাধা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। না-করে উপায়ও ছিল না। কেননা ভাবী কালে নরেন্দ্র যা করবে সবই মায়ের কাজ! অখণ্ডের ঘর থেকে যিনি এসেছেন, এবার তাঁকে ষোল আনা ভার নিতে হবে 'মায়ের ঘরে'র। তাঁর মুখ দিয়ে একদিন উচ্চারিত হবে এই বাণীঃ 'জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে; কারণ কেবল এই অবস্থাতেই মানুষ চরম নিঃস্বার্থপরতা আয়ত্ত করিতে ও কার্যে প্রকাশ করিতে পারে।'

মাতৃমান্যতার ঐ বিশেষ দিনটিতে এবং তার পরবর্তী দুটি বছরে নরেন্দ্রের জীবনে, হৃদয়ে শ্রীমা সারদার আসন কত সুষ্ঠু, কত দৃঢ়, কত অলঙ্কৃত আলপনায় পাতা হয়েছিল, তার অনুপুঙ্খ বিবরণ স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে কয়েকটি খণ্ড খণ্ড অনবদ্য ছবি আমরা পেয়ে যাই, যেখানে মা ও ছেলের চিরন্তন সম্পর্কের মুহূর্তগুলি রঙে-রেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। যদিও খুব সামান্য, তবু উল্লেখ করার মতো।

দক্ষিণেশ্বরে আসা-যাওয়ার পর্বে নরেন্দ্র মাকে নিশ্চয়ই দু-একবার দর্শন করেছিলেন। লাটুর মতো একেবারে মায়ের দুয়ারে বসে তাঁর সেবা করার দুর্লভ সুযোগ নরেন্দ্র পাননি। আবার দেখা হয়ে থাকলেও দক্ষিণেশ্বরে অন্তরালবর্তিনী মায়ের সঙ্গে কখনও নরেন্দ্র বাক্য-বিনিময় করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তবে দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলিতে 'পরমান্ন-বিধায়িনী' মায়ের হাতের রান্নায় নরেন্দ্র তৃপ্ত হয়েছেন বহুবার। আত্মকথায় শ্রীমা-ই জানিয়েছেন সে ঘটনাঃ "নরেনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন বললেন, 'বেশ করে রাঁধো।' আমি মুগের ডাল, রুটি করলুম। খাবার পর নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরে, কেমন খেলি?' নরেন বললে, 'বেশ খেলুম, যেন রোগীর পথ্য।' ঠাকুর শুনে বললেন, 'ওকে ওসব কি রেঁধে দিয়েছ? ওর জন্য ছোলার ডাল আর মোটা মোটা রুটি করে দেবে।' আমি শেষে তাই করলুম। তবে নরেন খেয়ে তুষ্ট হল।"

তপস্বিনী শ্রীমায়ের এই 'রন্ধন-তপস্যা'র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীসারদার এক জীবনী-ভাষ্যকার লিখেছেনঃ "... নরেনের আধিকারিক অধ্যাত্ম-মানসের ভাবগ্রাহিতার কাছে ঠাকুরের অমূল্য কথামৃতের চেয়ে অনলস মায়ের সেবা-শুদ্ধ হাতে রান্না-করা মোটা রুটি

ও বুটের ডালের আধ্যাত্মিক চৈতন্য উর্ধ্বচারী করার শক্তি অণুমাত্র ন্যূন ছিল না।"

কলকাতার শ্যামপুকুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে যে অতন্দ্র সেবাব্রতের সূচনা হয়েছিল, সেখানে লজ্জাশীলা শ্রীমায়ের উপস্থিতি ছিল কিছুটা অভিনব, কিছুটা অপ্রত্যাশিত। তাঁর নহবতের জীবনের কথা স্মরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছিলেন ঃ "সে কি এখানে এসে থাকতে পারবে ?" সকলের ভাবনা-চিন্তা-দ্বিধাকে মিথ্যা প্রমাণ করে শ্রীমা শ্যামপুকুর বাটীতে এসে নিজের হাতে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার ভার তুলে নিয়েছিলেন। এই বাড়িতে মায়ের তপস্যা ছিল আরও কঠোর। ছাদে ওঠবার সিঁড়ি ও দরজার পাশে একটা চারহাত মাপের চারচৌকো জায়গায় দিনের পর দিন মা নীরবে অবস্থান করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের পথ্য রান্না করেছেন। এখানেও মা অন্তরালে ছিলেন। কেউ জানতে পারেনি। তবে শ্যামপুকুর বাটীতে শ্রীমায়ের জীবনধারা লোকচক্ষুর আড়ালে হলেও সামান্য বহির্মুখী। দক্ষিণেশ্বরের মতো সঙ্কোচের, নিষেধের গণ্ডি এখানে ততটা ছিল না। থাকা সম্ভবও নয়। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক-ভক্তরা মাকে এখানে আরও একটু কাছ থেকে দেখেছিলেন। এঁদের মধ্যে নরেন্দ্রও একজন। যদিও, একথাটাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে ঃ "যাহারা প্রত্যহ এখানে আসা-যাওয়া করিত তাহাদিগের অনেকেও জানিতে পারিত না তিনি এখানে থাকিয়া ঠাকুরের সর্বপ্রধান সেবাকার্যের ভার গ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন।"

শ্যামপুকুরের পর কাশীপুর। কলকাতার উপকণ্ঠে একটি বাগান বাড়ি। 'শ্যামপুকুর অঞ্চলের বদ্ধ আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর' বিবেচনা করে ভক্তরা শ্রীরামকৃষ্ণকে এই উদ্যানবাটীতে নিয়ে এলেন। সঙ্গে এলেন শ্রীমা। '...এখানে মা আর ততটা অন্তরালবর্তিনী নন। লজ্জা-সংকোচের বীজ ভেঙে ছোট চারা গাছটির মতো তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করেছেন। তবে লজ্জাশীলতা একেবারে দূর হয়ে যায়নি। ...শ্যামপুকুরে কেউ জানতে পারেনি, তিনি আছেন। এখানে অবশ্য তাঁর উপস্থিতি অপ্রকট থাকেনি।'

কাশীপুরে দিনগুলির যে রেখাচিত্র পাই তাতে দেখি, লাটু, বুড়ো গোপাল, কালীপ্রসাদ প্রমুখ কয়েকজনের সঙ্গে শ্রীমা নিঃসঙ্কোচে কথাবার্তা বলছেন। তাঁর বিভিন্ন প্রাত্যহিক কাজে এঁরা সাহায্য করছেন। নরেন্দ্রের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক এমন অন্তরঙ্গ পর্যায়ে পৌঁছেছিল কিনা, তার লিখিত বিবরণ নেই। তবে দু-তিনটি ঘটনার সাক্ষ্যে এটা স্পষ্ট হয় যে, নরেন্দ্র কাশীপুরে আরও প্রত্যক্ষভাবে মাতৃসান্নিধ্য লাভ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় নিবেদিত-প্রাণ নরেন্দ্র এখানে মায়েরও সেবা করেছেন ঘটনাচক্রে। শ্রীমায়ের আপন কথায় পাই ঃ "ঠাকুর কত রঙ্গের কথা বলতেন, আর নরেন বাবুরাম এরা আমার হেসে কুটিপাটি হোত। একদিন কাশীপুরে আড়াই সের দুধসুদ্ধ একটা বাটি নিয়ে সিঁড়ি উঠতে গিয়ে আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম। দুধ তো গেলই, আমার পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। নরেন, বাবুরাম এসে ধরলে। পরে পা খুব ফুলে উঠল। ঠাকুর তাই শুনে বাবুরামকে বলছেন, 'তাই তো, বাবুরাম, এখন কি হবে, খাওয়ার উপায় কি হবে ? কে আমায় খাওয়াবে ?' তখন মণ্ড খেতেন। আমি মণ্ড তৈরী করে উপরের ঘরে গিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতুম। আমি তখন নথ পরতুম, তাই বাবুরামকে নাক দেখিয়ে হাতটি ঘুরিয়ে ঠারে ঠোরে বলছেন, 'ও বাবুরাম, ঐ যে ওকে তুই ঝুড়ি করে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস ?' ঠাকুরের কথা শুনে নরেন, বাবুরাম তো হেসে খুন! এমনি রঙ্গ তিনি এদের

নিয়ে করতেন! তারপর তিনদিন পরে ফোলাটা একটু কমলে ওরা আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যেত—আমি খাইয়ে আসতুম।"

আর একটি চিত্রে দেখতে পাই, 'ভিক্ষাং দেহি মে পার্বতি' বলে শ্রীমায়ের সামনে ভিক্ষাপাত্র হাতে নরেন্দ্র দণ্ডায়মান। সঙ্গে নিরঞ্জন, হুটকো-গোপাল ও কালীপ্রসাদ। সেই দেবদুর্লভ, অভিনব মুহূর্তটির উল্লেখ করে মায়ের জীবনীকার লিখেছেনঃ "ত্যাগী যুবক ভক্তগণ শ্রীমাকে তখন হইতেই কি চক্ষে দেখিতেন, তাহার একটু নিদর্শন এক সামান্য ঘটনায় পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ইহাদিগকে বলিলেন, 'তোদের ভিক্ষার অন্ন খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।' ইহা শুনিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ উল্লাসে নাচিয়া উঠিলেন। ভিক্ষায় বাহির হইবার পূর্বে তাঁহাদের মনে হইল যে, শ্রীমায়ের নিকট প্রথম ভিক্ষা লওয়া উচিত। তদনুসারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীমা তাহাদের পাত্রে একটি টাকা—ষোল আনা—অর্পণ করিলেন। এইরূপে প্রতিকার্যের প্রথমে তাঁহারা শ্রীমায়ের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেন; এবং স্নেহময়ী জননীও অকাতরে তাহা দান করিতেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি লাভের পর তাঁর প্রাণপ্রিয় শুদ্ধসত্ত্ব সন্তানেরা তাঁর নাম অবলম্বন করে বরানগর মঠে যে ত্যাগবহ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন, তার দ্যুতি বিশ্বলোকে সেইসময় ছড়িয়ে পড়েনি। বরং লোকচক্ষুর উপহাস ও অবজ্ঞার আক্রমণ থেকে সেই আগুনকে নরেন্দ্রেরা তখন সযত্নে, সংগোপনে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আবার এই পর্বেই তাঁদের জীবনে মায়ের উপস্থিতি ও ভূমিকা আমাদের বিস্মিত করে।

সেই চরমতম ত্যাগসাধনার দিনগুলিতে অন্তরালে থেকে মায়ের ভূমিকাটি কেমন ছিল? স্বয়ং নরেন্দ্র, তখন বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ, স্মৃতিচারণের মতন একটি অভিভাষণে বলেছেনঃ "...একদিন আমাদের গুরুদেবের দেহান্তের দুঃখময় দিন এসে উপস্থিত হল। ...আমাদের বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কেউ ছিল না। কয়েকটি 'অদ্ভুত' ধারণা পোষণকারী অর্বাচীন তরুণের কথা কেই বা শুনবে? অন্তত ভারতবর্ষে তরুণদের কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। মাত্র দ্বাদশজন বালক লোকের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলছে, বলছে যে, তারা সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। সেকথা শুনে সকলেই উপহাস করত। উপহাস ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করল। আমাদের ওপর রীতিমত অত্যাচার শুরু হল।...তারপর উপস্থিত হল আমাদের সকলের জীবনের এক চরম দুঃসময়; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবনে যেন তা দুর্ভাগ্যের রূপ নিল। একদিকে আমার মা-ভাইয়েরা। আমাদের পিতার সদ্যপ্রয়াণের ফলে আমাদের পরিবারকে তখন চরম দারিদ্র্য এসে গ্রাস করেছে। প্রায় প্রতিদিনই আমাদের অনাহারে থাকতে হত। পরিবারে একমাত্র আমিই ছিলাম আশাভরসা—একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমার দুপাশে তখন দুটি জগৎ। একদিকে আমাকে দেখতে হচ্ছিল যে, আমার মা এবং ভাইয়েরা অনাহারে মরণাপন্ন; আর অপরদিকে আমি বিশ্বাস করতাম যে আমার গুরুদেবের আদর্শ ভারত এবং সমগ্র জগতের পক্ষে কল্যাণকর এবং তার প্রচার এবং বাস্তব রূপায়ণ করতেই হবে। সুতরাং আমার মনের মধ্যে দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই সংগ্রাম চলতে থাকল।...সে কী হৃদয়-যন্ত্রণা; সেই যন্ত্রণার তীব্রতা ছিল অসহনীয়।...সেদিন আমাকে সহানুভূতি দেখানোর কেউ ছিল না।... শুধু একজন ছাড়া। কেবল সেই একজনের সহানুভূতিই আশীর্বাদ ও

আশা বহন করে আনল। তিনি একজন নারী।... আমাদের গুরুদেবের সহধর্মিণী। কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসহায়। আমাদের চেয়েও তিনি ছিলেন দরিদ্র।" (১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ক্যালিফোর্ণিয়ার প্যাসাডেনা শেক্সপিয়র ক্লাবে প্রদত্ত 'আমার জীবন ও ব্রত' মাই লাইফ অ্যাণ্ড মিশন শীর্ষক বক্তৃতা)।

এই মর্মস্পর্শী আত্মকথন যেন শ্রীমায়ের প্রতি নরেন্দ্রের আনত কৃতজ্ঞতা। প্রারম্ভলগ্নের সেই সমস্যাদীর্ণ, যন্ত্রণাময় দিনগুলিতে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের, বিশেষত নরেন্দ্রের জীবনে শ্রীমায়ের ভূমিকা কত গভীর, কত প্রেরণাপূর্ণ! ঐ ভাষণ থেকে এও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বরানগর মঠের সেই অনিশ্চিত মুহূর্তগুলিতেও শ্রীমায়ের সঙ্গে নরেন্দ্রের আত্মিক যোগাযোগ ছিল। শ্রীমা তখন প্রায় এক বছর বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থান করে স্বামীর ভিটে কামারপুকুরে ফিরে গিয়েছেন। সেখানে শুরু হয়েছে তাঁর নিঃস্ব, অসহায়, দরিদ্রতম জীবনযাপন। শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপ্রয়াণের আগে সারদাকে কাছে ডেকে বলেছিলেনঃ "তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে, শাকভাত খাবে আর হরিনাম করবে...কারও কাছে একটি পয়সার জন্যও চিত হাত করো না।" শ্রীমা অক্ষরে অক্ষরে সেই নির্দেশ পালন করেছিলেন। সেই অনিঃশেষ কৃচ্ছ্রসাধনার দিনগুলিতেও দূর থেকে নরেন্দ্রকে তিনি আশীর্বাদ জানিয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে, শুনিয়েছেন আশার বাণী।

আর বরানগর মঠে মায়ের উপস্থিতি! সে এক আশ্চর্য ইতিবৃত্ত। সকলেই জানেন, মা কখনই বরানগর মঠে সশরীরে যাননি। তবে নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সেই আত্মিক যোগাযোগ বরাবরই ছিল। সংসারত্যাগের সঙ্কল্পে স্থিরনিশ্চয় হয়ে নরেন্দ্রেরা একদিন বিরজা হোম করে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসগ্রহণ করলেন। সম্ভবত নরেন্দ্রই ঠিক করেছিলেন, ভাব ও ধ্যানধারণা অনুযায়ী কার কী সন্ন্যাস নাম হবে। তাঁর নিজের ইচ্ছা ছিল, তিনি পরমারাধ্য গুরুর নামটি গ্রহণ করবেন। 'কিন্তু শশীর সেবা ও ভক্তির দাবি মানিয়া লইয়া তাঁহাকেই উহা দিলেন।' শশী মহারাজের নাম হল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। নরেন্দ্র নাম নিলেন স্বামী বিবিদিষানন্দ। শশীর জেঠতুতো দাদা শরৎ। তিনিও বরানগর মঠে যোগ দিয়েছেন। তাঁর নাম হল স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাইয়ের একজন আশ্রয়গ্রহণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-নামে, অপরজন সমর্পিত হলেন শ্রীমা সারদার নামে। রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাসে এ এক আশ্চর্য ও উল্লেখনীয় সংবাদ। সন্ন্যাস-নামে ঠাকুর স্বাভাবিকভাবেই এসেছেন। এ যেন প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু মায়ের নাম! আরও বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, সেদিন যাঁকে মায়ের পূতপবিত্র নামে সন্ন্যাসিরূপে চিহ্নিত করা হল, তিনিই পরবর্তী কালে শ্রীমায়ের শ্রেষ্ঠ সেবক, মাতৃ-অনুধ্যানে তদ্গতপ্রাণ। শ্রীমা বলতেন...'শরৎ হচ্ছে আমার ভারী।' কথাপ্রসঙ্গে আরও বলছেনঃ "আমার ভার নেওয়া কি সহজ? শরৎ ছাড়া কেউ ভার নিতে পারে এমন তো দেখিনি। সে আমার বাসুকি, সহস্রফণা ধরে কত কাজ করেছে, যেখানে জল পড়ে সেখানেই ছাতা ধরে।"

এরপর বরানগর মঠের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত করে নরেন্দ্র বিশ্বময় নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার, পৃথিবীর পথে পথে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীধৃত পতাকা বহন করে নিয়ে যাওয়ার প্রব্রজ্যা-সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে নরেন্দ্র পরিব্রাজকরূপে ভারতের পথে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার প্রাক্-মুহূর্তে এলেন শ্রীমায়ের আশীর্বাদ

নিতে। শ্রীমা তখন বেলুড়ের ঘুষুড়ী অঞ্চলে শ্মশানের কাছে একটি ভাড়াবাড়িতে আছেন। বিনত নরেন্দ্রকে মা আশীর্বাদ জানালেন হৃদয়ভরে। শ্রীমা যেন দেখতে পেয়েছিলেন, ঠাকুরের এই শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও সন্তানের এই যাত্রা, দিগ্বিজয়ের যাত্রা। অনুরাগ ও স্নেহে সিক্ত তাঁর আশীর্বাদই নরেন্দ্রের একমাত্র পাথেয়। এ ছাড়া নরেনের আর কোনও কিছু সম্বল নেই। তাই গভীর আশঙ্কায় নরেন্দ্রের যাত্রাসঙ্গী গঙ্গাধরকে (স্বামী অখণ্ডানন্দ) বলছেনঃ "বাবা, তোমার হাতে আমাদের সর্বস্ব দিলুম। তুমি পাহাড়ের সকল অবস্থা জান, দেখো যেন নরেনের খাওয়ার কষ্ট না হয়।"

শ্রীমায়ের কাছে নরেন্দ্র 'সর্বস্ব'। শব্দটি গভীর অভিনিবেশে লক্ষ্য করার মতো। শুধু তাই নয়, সন্তানের ক্ষুধার কষ্ট নিয়ে তাঁর চিন্তার অন্ত নেই। কেননা তিনি যে সত্যিকারের মা। পাতানো মা নন, কথার কথা মা নন।

শ্রীমায়ের আশীর্বাদ নরেন্দ্রের জীবনে যেন সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাঁর বিশ্বাস, মায়ের আশীর্বাদের শক্তি ছাড়া তিনি অচল। বলরাম বসুকে গাজিপুর থেকে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি চিঠিতে নরেন্দ্র লিখেছিলেনঃ "বলরামবাবু, মাতাঠাকুরানী যদি আসিয়া থাকেন, আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন ও আশীর্বাদ করিতে বলিবেন—যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয়, কিংবা এ শরীরে যদি তাহা অসম্ভব, যেন শীঘ্র ইহার পতন হয়।" মায়ের আশীর্বাদ যেন নরেন্দ্রের কাছে অসাধ্যসাধনের প্রেরণা, বিশ্বজয়ের মন্ত্র। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর মনে পড়েছে, একই সঙ্গে তিনি ভেবেছেন মায়ের কথা। যাবার ব্যবস্থা প্রায় স্থির হয়ে যাওয়ার পর তিনি ভাবলেনঃ "আচ্ছা, শ্রীশ্রীমা তো ঠাকুরের অংশস্বরূপিণী; তাঁকে একখানি পত্র লিখলে হয় না? তিনি যেরূপ বলবেন, সেরূপই করব।" স্বামীজী তারপর শ্রীমায়ের নির্দেশ চেয়ে যে পত্র লিখলেন তাতে শ্রীমা স্বামীজীকে আশীর্বাদ করে পাশ্চাত্যদেশে গমনের অনুমতি দিলেন। এটি পেয়ে স্বামীজীর সকল দ্বিধার অবসান হল, তিনি বললেনঃ 'আঃ, এতক্ষণে সব ঠিক হল; মারও ইচ্ছা আমি যাই।' শ্রীমায়ের আশীর্বাদকেই স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্যদেশে ঐতিহাসিক সাফল্যের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল প্রধান শক্তিরূপে গণ্য করতেন। পাশ্চাত্য থেকে ফিরে আসার পর একদিন তিনি শ্রীমাকে বলেছিলেনঃ 'মা, আপনার আশীর্বাদে এযুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরী জাহাজে চড়ে সে মুল্লুক গিয়েছি।'

অনেকটা একই কথা রসিকতার সুরে স্বামী শিবানন্দকে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা থেকে লেখা একটি বিখ্যাত চিঠিতে বলেছিলেনঃ "তারক ভায়া, আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ ক'রে পগার পার, এই বুঝ।"

আগেই বলেছি, নরেন্দ্র বিশ্বাস করতেন, শ্রীমায়ের আশীর্বাদ তাঁর জীবনে সবচেয়ে ফলবতী। এই আশীর্বাদের শক্তিতে তিনি জগতে প্রলয় কাণ্ড বাধাতে পারেন। পারেন সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এক অকল্পনীয় কাজ—'সাহেবের ছেলেকে' তাঁর বিজয়রথের 'ঘোড়া করতে'!

আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর নরেন্দ্র প্রথমেই মাকে প্রণাম জানাতে গিয়েছিলেন। সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী কুমুদবন্ধু সেন স্মৃতিচারণা করেছেন হৃদয়স্পর্শী ভাষায়ঃ

'মা তাঁর ঘরের দরজায় সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্বামীজী তাঁর সামনে এসেই সোজা মাটিতে শুয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।...কিন্তু সাধারণ রীতি অনুযায়ী তাঁর পাদস্পর্শ করলেন না। তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত আমরা যারা স্বামীজীর পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম তাদের কোমলকণ্ঠে বললেন, "যাও, মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। কিন্তু কেউ তাঁর চরণ স্পর্শ কোরো না। তাঁর এতই করুণা, এতই কোমল তাঁর প্রকৃতি, এতই তিনি স্নেহময়ী যে যখন কেউ তাঁর পাদস্পর্শ করে তিনি তাঁর সর্বগ্রাসী করুণা, সীমাহীন ভালবাসা এবং সমবেদনা দ্বারা তৎক্ষণাৎ তার যাবতীয় দুঃখকষ্ট নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে নেন। তার ফলে তাঁকে নীরবে অপরের জন্য কষ্ট ভোগ করতে হয়। ধীরে ধীরে একে একে তাঁর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হও। মুখে কেউ কিছু না বলে তোমাদের অন্তরের অন্তস্তল থেকে নীরবে তাঁর কাছে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা কর ও তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা কর। তিনি সর্বদাই অতিলৌকিক স্তরে অবস্থান করেন এবং সকলের মনের কথা জানেন—তিনি অন্তর্যামিনী।"

'..."আমি মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলাম ; সেখানে আমার বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষের মনে যে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছিলাম এবং তাদের কাছে যে অভাবনীয় সম্মান লাভ করেছিলাম তাতে আমি তৎক্ষণাৎ বুঝেছিলাম যে, মায়ের আশীর্বাদের শক্তিতেই ঐ অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল"।'

পরিব্রজ্যায় যাত্রা করার আগে নরেন্দ্র যেদিন মায়ের আশীর্বাদ নিতে এসেছিলেন, সেদিনের কথা স্মরণ করে মা বলেছিলেনঃ "(নরেন) আমেরিকা যাবার আগে আমাকে গান শুনিয়ে গেল ঘুসুড়ীর বাড়িতে। বলেছিল, 'মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি, তবেই আবার আসব, নতুবা এই-ই।' আমি বললুম, 'সে কি!' তখন বললে, 'না, না আপনার আশীর্বাদে শীঘ্রই আসব'।"

নব্বই সালের পর সাতানব্বই। দীর্ঘ সাত বছরে মায়ের আশীর্বাদে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, বিশ্বজয় করে ফিরেও এসেছেন। আশীর্বাদের শক্তিতে এত বড় কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, তবু যেন নরেন্দ্র স্থির হতে পারছেন না। এখনও অনেক কাজ বাকি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব অবলম্বন করে মানুষের হৃদয় জয় করাই শেষ কথা নয়, সেই বহুজন-হিত-সাধক ভাবটিকে চিরস্থায়ী করে রেখে যেতে হবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য—সন্তপ্ত, পীড়িত, দুঃখী, ধনী-নির্ধন সমস্ত মানুষের জন্য। যে আন্দোলনের ঢেউয়ে জগৎ আজ প্লাবিত, তাকে ধরে রাখাই এখন সবচেয়ে বড় কাজ। আর এই কাজে পুনরায় প্রয়োজন শ্রীমায়ের অমোঘ সর্বজয়ী আশীর্বাদ। নরেন্দ্রের প্রণামান্তে মা মৃদুস্বরে বলেছিলেনঃ "ঠাকুর তোমার মাধ্যমে এইসব মহৎ ও বৃহৎ কাজগুলি করাচ্ছেন। তুমি তাঁর চিহ্নিত শিষ্য ও সন্তান।" কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতিকথা থেকে জানা যাচ্ছেঃ "স্বামীজী সেকথা শুনে গভীর আবেগের সঙ্গে বলেছিলেনঃ 'মা, আমি তাঁরই বাণী প্রচার করতে চাই এবং সেজন্যে যত সত্বর সম্ভব একটি স্থায়ী সংঘ স্থাপন করতে চাই। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে এইজন্যে, যত দ্রুত আমি করতে চাই তা পেরে উঠছি না।' শ্রীমা তখন নিজেই স্নেহকোমলকণ্ঠে আশ্বাস দিয়ে বললেনঃ 'তার জন্যে তুমি কোন ভাবনা করো না। তুমি যা করেছ আর যা করবে তা চিরকাল টিকে থাকবে। এই কাজের জন্যেই তোমার জন্ম। জগতের মানুষ তোমাকে

লোকগুরু হিসাবে মানবে। তুমি নিশ্চিত জেনো, ঠাকুর তোমার আকাঙ্ক্ষা অচিরেই পূর্ণ করবেন। অল্পদিনের মধ্যেই দেখতে পাবে তোমার চিন্তা, তোমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।' সে কথা শুনে স্বামীজী ভক্তিবিনতকণ্ঠে শ্রীমাকে বললেন: 'আশীর্বাদ করুন মা, তাই যেন হয়—আমার পরিকল্পনা যেন সত্বর ফলপ্রসূ হয়'।"

শ্রীমায়ের সঙ্গে নরেন্দ্রের এই কথোপকথনের দিন খুব সম্ভবত ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মার্চ। এর মাত্র একমাস সাতদিন পরে অর্থাৎ ১ মে তারিখে নরেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে বলরাম বসুর বাড়িতে আহূত একটি সভায় রামকৃষ্ণ সংঘ বা 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিলেন। মায়ের আশীর্বাদ নরেন্দ্রের জীবনে আর একবার সত্য হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে বাস্তবায়িত হল ঋষি বিবেকানন্দের স্বপ্ন। শ্রীমা নিজের মুখে বলেছিলেন: '...দেখতে পাবে তোমার চিন্তা, তোমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।' এখানে একটি ছোট্ট জিজ্ঞাসা—স্থায়ী সংঘ বা মঠ স্থাপনের স্বপ্ন কি কেবল নরেন্দ্রই দেখেছিলেন? না, কেবল নরেন্দ্র নন, আরও একজন দেখেছিলেন। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং শ্রীমা। নরেন্দ্র স্বপ্ন দেখার অনেক আগে মায়ের অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানদের মাথাগোঁজার ঠাঁই-এর জন্য স্বপ্ন ও আকুলতা ঘনিয়ে উঠেছিল। নরেন্দ্রকে সেদিন একথা মা মুখ ফুটে বলেননি। অনেক বছর পরে সেবক স্বামী অরূপানন্দকে কথাপ্রসঙ্গে তা বলেছিলেন। ১৮৯০-এর মার্চ মাসে শ্রীমা বুদ্ধগয়া দর্শনে যান। সেখানে বৌদ্ধ মঠ দেখার পর মায়ের অন্তর বেদনায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলছেন: "বোধগয়ায় মঠ, তাদের অত সব জিনিষপত্র, কোন অর্থের অভাব নেই, কষ্ট নেই—দেখে কাঁদতুম, আর ঠাকুরকে বলতুম, 'ঠাকুর, আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি অমন একটি থাকবার জায়গা হত'!"

তাঁর এই প্রাণের আকূতির কথা অন্য এক সেবক স্বামী ঈশানানন্দকেও বলেছেন: "আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো আজ তাঁর কৃপায় মঠ-টঠ যা কিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সংসার ত্যাগ ক'রে কয়েকদিন একটা আশ্রয় করে সব একসঙ্গে জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হ'ল। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 'ঠাকুর, তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তা হলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা ক'রে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার সব ভাব, উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ান দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠে।' তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এই সব করলে।"

শ্রীমায়ের এই আত্মকথনের উপর নির্ভর করে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে,

রামকৃষ্ণ সংঘ আসলে মায়ের স্বপ্নসম্ভব সন্তান। মা শুধু স্বপ্নই দেখেননি, ভাবী সন্তানের রূপ কল্পনা করেছেন, মনের গহনে তাকে লালিত করেছেন, নিরন্তর অশ্রু বিসর্জন করে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছেন। মায়ের এই কল্পনা-লালন এবং অশ্রু রূপ পরিগ্রহ করেছে নরেন্দ্রের কর্মৈষণায়, নিষ্ঠায়, একাগ্রতায়। নরেন্দ্র আপন আত্মার অঙ্গীকারে জানতেন শ্রীমায়ের অনুপ্রেরণা, আশীর্বাদ ও প্রার্থনার সম্মিলিত ফলশ্রুতি এই রামকৃষ্ণ সংঘ। তাই তাঁকে 'সংঘজননী' রূপে প্রণতি নিবেদন করেছেন। কেননা, 'সংগঠন-ব্যাপারে, যে নরেনের কৃতিত্বের অবধি নেই, সে নরেন জানতেন এই মহিমময়ী শ্রীমায়ের প্রজ্ঞাধারা সর্বদা সর্বথা অপ্রতিহত এবং তাঁর নিজের সমগ্র জীবনীশক্তি মাতৃনির্দিষ্ট অক্ষরেখায় বিধৃত ও নিশ্চিন্ত।' বিবেকানন্দ তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে এও দেখেছিলেন, অনাগত দিনগুলিতে শ্রীমা তাঁর 'লালন-ললিতা শক্তির মাধ্যমে এ সংঘকে পালন-বর্ধন' করবেন।

ঐ ১ মে, বলরামবাবুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত সভায় নরেন্দ্র ত্যাগী গুরুভাই ও গৃহী ভক্তদের সামনে যে আবেগমথিত অথচ ঋজু ভাষণ দিয়েছিলেন তা রামকৃষ্ণ মিশনের জন্মমুহূর্তের এক অবিস্মরণীয় নথি। সেই ভাষণে তিনি সংঘের ধাত্রীমাতা শ্রীমা সম্পর্কে বলেছিলেনঃ "মঠ ও মিশনের জন্য কিছু টাকা সংগৃহীত হয়েছে, আমাদের শ্রীশ্রীমা দেশে আছেন, তাঁর মাসিক হাত খরচা বাবদ স্থায়ী তহবিলের সুদ থেকে সর্বাগ্রে কিছু দেওয়া উচিত মনে করি, এ বিষয়ে আপনাদের কি মত?" ঐ প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন করলেন। তখন স্বামীজী বলছেন, তা হলে মাসে কত ধার্য করা যেতে পারে। উত্তরে অনেকে অনেক রকম বলেছেন—তিনি পাড়াগাঁয়ে থাকেন, ব্রাহ্মণের বিধবা, যা কিছু সামান্য পাঁচ সাত টাকা দিলেই হবে ইত্যাদি। এইরূপে তাঁদের আলোচিত হয়ে মাসিক মাত্র দশ টাকা পর্যন্ত ধার্য করার সম্মতি মিলল। তখন স্বামীজী একটু বিমর্ষভাবে বলতে লাগলেনঃ "সে কি ভাই, আমাদের সন্ন্যাস-জীবন, সন্ন্যাসীর তো 'করতলভিক্ষা তরুতলবাস', এই হল আমাদের জীবন। আর 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সব কিছু ত্যাগ করে তপস্যাই আমাদের ব্রত, এই হল আমাদের আদর্শ। আমরা সন্ন্যাসী হয়েছি, বেটা ছেলে, প্রয়োজনমত ভিক্ষে করে মঠ চালাতে পারব, শ্রীশ্রীমাকে হাত খরচা বাবদ মাসিক পঁচিশ টাকার কম দিতে পারব না। শ্রীশ্রীমাকে কি রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী বলে আমাদের গুরুপত্নী হিসাবে মনে কর? তিনি তা নয় ভাই, আমাদের এই যে সংঘ হতে চলেছে, তিনি তার রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সংঘজননী। এই বলে স্বামীজী শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে অনেক কথা বলতে থাকলে স্বামীজীর ঐ প্রস্তাব সকলে সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করলেন।" আবেগময় ভাষায় নরেন্দ্র সেদিন যা বলেছিলেন, তার সবটুকু পাওয়া যায়নি। সারদানন্দের স্মৃতি থেকে তা আর উৎসারিত হয়নি। তবে যেটুকু পেলাম, তাতে দেখতে পাচ্ছি, মাতৃপূজার জন্য নরেন্দ্র যে অর্ঘ্য প্রদান করেছেন তা অনন্য, আর সংঘজননীরূপে মাকে যে স্বীকৃতি দিয়েছেন তা সর্ব অর্থে যথার্থ।

শ্রীমায়ের লীলামাধুর্য আস্বাদকারী এক বিনম্র আলোচকের ভাষায়ঃ "অবতীর্ণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপন করতে এসে তাঁর যন্ত্ররূপে এই যে সংঘটিকে রেখে গেলেন, শ্রীমায়ের মাঝে বিকশিত ঈশ্বরের মাতৃভাবই সে সংঘটিকে লালন-পালন করে 'মানুষ' করে তুলেছিলেন। এটি কাব্য-কথা নয়, আক্ষরিকভাবে গদ্য-সত্য।"

'সংঘের দৈহিক, মানসিক, বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি-ঋদ্ধি-সিদ্ধি সব কিছুতেই শ্রীমায়ের অবদান অমেয়।'

সংঘ প্রতিষ্ঠা হল, কিন্তু তখনও তার কোনও স্থায়ী ঠিকানা নেই, নেই নিজস্ব জমি। অথচ শ্রীমা মানস-কল্পনায় ভাবী মঠের একটি ছবি এঁকে রেখেছেন। পরবর্তী কালে বেলুড় মঠের প্রসঙ্গে বলতেনঃ "আমি কিন্তু বরাবরই দেখতুম, ঠাকুর যেন গঙ্গার ওপার ঐ জায়গাটিতে—যেখানে এখন মঠ, কলাবাগান-টাগান—তার মধ্যে ঘর, সেখানে বাস করছেন।...

"একদিন নরেন এসে বললে, 'মা, এই ১০৮ বিল্বপত্র ঠাকুরকে আহুতি দিয়ে এলুম, যাতে মঠের জমি হয়। তা কর্ম কখনও বিফলে যাবে না। ও হবেই একদিন'।"

নরেন্দ্রের কী গভীর আত্মবিশ্বাস! আর এই 'অগ্নিময় আত্মবিশ্বাস' জানাচ্ছেন শ্রীমাকে। সংঘমাতৃকারূপিণী ছাড়া আর কেউ এই জ্বলন্ত বিশ্বাসের স্বরূপটি যে উপলব্ধি করতে পারবেন না! এই সামান্যদর্শনা, পরিপালয়িতা মা-ই যে একমাত্র জানেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে সংঘের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করাই নরেনের জীবনব্রত। আর নরেন্দ্র কেন ছুটে এসে মাকে বলছেনঃ 'ও একদিন হবেই,' কেননা তিনি যে মর্মে মর্মে অনুভব করেন, তাঁর স্বপ্ন ও কর্মের সকল 'চরিতার্থতার আশিস্-উৎস হচ্ছেন শ্রীমা।'

অবশেষে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বেলুড় মঠের জমি রেজিস্ট্রিকৃত হল। জমির বায়না করা হয়েছিল ৩ ফেব্রুয়ারি। নির্মীয়মান মঠে মায়ের শুভাগমন ৭ এপ্রিল। শ্রীমাকে পেয়ে সেদিন নরেন্দ্র আপ্লুত। এই নবলব্ধ ক্ষুদ্র জমিতে বিশ্বজননীকে কোথায় বসাবেন, কীভাবে আপ্যায়িত করবেন যেন ভেবে পাচ্ছেন না। এই মঠের তিনিই অধিষ্ঠাত্রী, তিনিই অধিকর্ত্রী। এই মঠের মৃত্তিকা আজ তাঁরই পূজায় কৃতকৃতার্থ হবে। এই পূজায় যেন কোনও ত্রুটি না হয়। তাই নরেন্দ্র স্বয়ং শ্রীমাকে 'মঠের নতুন জমিতে নিয়ে গিয়ে নববস্ত্র পরিধান করিয়ে চেয়ারে বসান এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে অশ্রুপূর্ণলোচনে করজোড়ে বলতে থাকেনঃ "মা, এতদিনে আজ আমার মাথায় যে বোঝা ছিল তা নেমে গেল—তোমাকে তোমার নিজের জমিতে এনে। এখন তুমি হাঁফ ছেড়ে চারিদিকে বেড়াও, ঘুরে ফিরে দেখ"।' মাও আনন্দে ঘুরে ঘুরে সব দেখে পূর্ণ তৃপ্তিতে বলছেনঃ "এতদিনে ছেলেদের একটা মাথা গোঁজবার জায়গা হল—ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।"

একেবারে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নরেন্দ্র এই কথাটি সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাশ্রিত এই মঠ তাঁর নয়, অন্য কারোরই নয়। এই মঠ মায়ের। মঠের ভূত-ভবিষ্যৎ মায়ের ইচ্ছাধীন। মঠ পরিচালনার ব্যাপারে শ্রীমায়ের নির্দেশই একমাত্র শিরোধার্য। এ সম্পর্কে নরেন্দ্রের মনে কখনও কোনও দ্বন্দ্ব, কুণ্ঠা, সংশয়, দোদুল্যমানতা ছিল না। স্বামী সারদানন্দ জানিয়েছেনঃ "মঠে প্রথম প্রথম কার্যধারা নিয়ে অনেক সময় মতের পার্থক্য হলে স্বামীজী মায়ের কাছেই তার সমাধান চেয়েছেন।...শ্রীশ্রীমা যে কোন সমস্যার সমাধান তৎক্ষণাৎ করে দিতেন—তাঁর যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা সকলেই দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করত।"

নির্দ্বিধায়, প্রশ্নাতীতভাবে শ্রীমায়ের একটি সিদ্ধান্ত নরেন্দ্র কিভাবে একবার মাথায় তুলে নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে সারদানন্দ বলেছেনঃ শ্রীশ্রীমা স্বামীজীর কাজের উদ্দাম

আবেগ যেন অনেক সময় রাশ টেনে ধরে নিয়ন্ত্রিত করতেন। কলকাতায় প্লেগ-মহামারীর সময় স্বামীজী নিবেদিতা প্রভৃতিকে নিয়ে সেবাকার্য আরম্ভ করলেন, কিন্তু কার্যের ব্যাপকতা দিন দিন বাড়তে থাকায় এবং সে পরিমাণ অর্থের সংস্থান না থাকায় স্বামীজী বিচলিত হয়ে পড়লেন, শেষ পর্যন্ত তিনি সেবাকাজ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বেলুড় মঠ বিক্রি করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই কথা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে উত্থাপন করায় তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তখন মায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি। নরেন্দ্র সেকথা জানতেন। তাই স্বামী শিবানন্দকে চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "মা ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে।... দাদা, রাগ ক'রো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়।...ঐ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া। মার হুকুম হলেই বীরভদ্র, ভূতপ্রেত সব করতে পারে।...দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ?' দাদা, ও ঐ যে বলছি, ওই খানটায় আমার গোঁড়ামি।...রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো, দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।"

গুরুভাইয়েরা যাতে শ্রীমাকে সাধারণ একজন নারী কিংবা তাঁদের গুরুদেবের সহধর্মিণীরূপে না দেখেন, সে সম্পর্কে নরেন্দ্রের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। একের পর এক চিঠি লিখে, অভিভাষণে, আপন আচরণে তিনি মায়ের স্বরূপটি অন্যদের অন্তর্লোকে উদ্ভাসিত করতে প্রয়াস করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্তান স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শ্রীমা সম্পর্কে বিবেকানন্দের সদা-সচেতন সেই মানসলোকের সংবাদ একটি ঘটনায় আমাদের জানিয়েছেন। এটি ঘটেছিল তাঁরই জীবনে। বিজ্ঞানানন্দের আত্মকথায়ঃ "আমি মা ঠাকরুণের কাছে বেশী যেতাম না। স্বামীজী কি করে তা জানতে পারেন। শ্রীশ্রীমা তখন বলরাম মন্দিরে। সেখানে স্বামীজী একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'পেসন, মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলে?' আমি বললাম—'না মশাই।' স্বামীজী—'সেকি? এক্ষুণ-ই যাও, মাকে প্রণাম করে এস'।"

"তাই শুনে আমি তো মাকে প্রণাম করতে গেলাম; মনে মনে ভাবছি—কোন প্রকারে ঢিপ্ করে একটা প্রণাম করে চলে আসব। মাকে প্রণাম করে উঠতেই স্বামীজী পেছন থেকে বলছেন—'সে কি পেসন,—মাকে এই করে প্রণাম করতে হয়? সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কর; মা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা।' বলেই তিনি সাষ্টাঙ্গ হয়ে মাকে প্রণাম করলেন।..."

প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা নরেন্দ্রের আর একটি পত্রের এই কথাগুলিঃ "মা-ঠাকুরানীকে তাঁহার জন্মজন্মান্তরের দাসের পুনঃপুনঃ ধূল্যবলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ দিবে—তাঁহার আশীর্বাদে আমার সর্বতোমঙ্গল।" মনে রাখতে হবে কাছে এসে কিংবা দূর থেকে মায়ের শ্রীচরণে নরেন্দ্রের এই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন ভক্তির আতিশয্য নয়, মায়ের প্রতি সন্তানের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ। মায়ের পায়ে সব কিছু উজাড় করে ঢেলে দেওয়ার মধ্যে যে অনির্বচনীয় আনন্দ আছে তার খোঁজ কজন জানে! যাঁরা জানেন, যাঁরা সেই আনন্দলহরীর চকিত স্পর্শ পেয়েছেন আপন অন্তরে, তাঁদের প্রতিও নরেন্দ্রের যেন কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাই দেখি, 'স্বামী নিরঞ্জনানন্দের

মায়ের প্রতি গভীর ভক্তির জন্যে তাঁর যে কোন ত্রুটি স্বামীজী উপেক্ষা করতে প্রস্তুত।' স্বামী শিবানন্দকে পূর্বোক্ত চিঠিতে তাই লিখছেনঃ 'নিরঞ্জন লাঠিবাজি করে, কিন্তু তার মায়ের উপর বড় ভক্তি। তার লাঠি হজম হয়ে যায়।' অন্যদিকে 'গিরিশচন্দ্র ঘোষের শ্রীমায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তির সংবাদ পেয়ে স্বামীজীর উল্লাসের শেষ নেই।' ঐ একই পত্রে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে লিখছেনঃ "গিরিশ ঘোষ মায়ের পূজা খুব করছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য।" 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির' লেখক অক্ষয়কুমার সেন বা তাঁর আদরের 'শাঁকচুন্নি' সম্পর্কে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেনঃ 'বলি শাঁকচুন্নির কোনও কথাই তো তোমরা লেখ না! সে গেল কোথা? মাকে ভক্তি করছে তেমনি কিনা?' নরেন্দ্র যেন উদ্বিগ্ন, শাঁকচুন্নি শ্রদ্ধাচ্যুত হয়নি তো! মাকে চিনতে পারাই শক্ত। তার ওপর আবার অনেকেই তাঁকে চেনার চেষ্টা করেনি। এই দুয়ের মাঝখানে শ্রীমায়ের স্বরূপ কিছুমাত্র উপলব্ধি করেছেন যাঁরা, তাঁদের সম্পর্কে নরেন্দ্রের যেন চিন্তার অন্ত নেই।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ একদা বলেছিলেনঃ "মা ঠাকরুন যে কি, তা একমাত্র স্বামীজীই বুঝেছিল! তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী, তা আর কেহ বোঝেনি।" অদ্ভুতানন্দজী মাকে কোন অর্থে লক্ষ্মীরূপিণী বলে মনে করেছেন, তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেয়ে আমরা বরং স্মরণ করব নরেন্দ্রের অনুভব। তিনি বিশ্বাস করতেন, মা হলেন 'জ্যান্ত দুর্গা'। শাস্ত্র বলছে, দুর্গা হলেন সেই দেবী যিনি ভগবতী কল্যাণী, যিনি এই জগতকে ধারণ করে রেখেছেন। একদিকে যেমন কল্যাণী ও জগদ্ধাত্রী, তেমনই জীবলোকের দুর্গতিনাশিনী। পরম মমতা ও করুণায় শ্রীমা সারদাও দেবী দুর্গার মতো স্মিত আননে সর্বংসহা মূর্তিতে মানুষের দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণা মোচনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। 'অন্ধকারে কীটের মতো কিলবিল করছে' এমন মানুষগুলির জন্য ঠাকুরের অমোঘ যে কল্যাণচিন্তা ছিল, সে কল্যাণ-সম্ভাবনাকে শ্রীমা রামকৃষ্ণ-সংঘমাতৃকারূপে নিজের অতন্দ্র সেবাশক্তি দ্বারা লালন-বর্ধন করে যুগধর্মরূপে এ ধরায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ গম্ভীর আবেগে বলতেনঃ "মনে রেখো, সুখে দৈন্যে, সম্পদে বিপদে, দুর্ভিক্ষে মহামারীতে, যুদ্ধে বিগ্রহে—সর্ব বিষয়ে মায়ের সেই করুণা, সেই অপার করুণা! জয় মা! জয় মা!"

শ্রীমায়ের এই কল্যাণময়ী, করুণাময়ী প্রতিমাটি নরেন্দ্র দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই মাকে 'জ্যান্ত দুর্গা' বলে ঘোষণা করতে তাঁর এতটুকু দ্বিধা হয়নি। স্বামী শিবানন্দকে চিঠিতে লিখছেনঃ "দাদা, বিশ্বাস বড় ধন, দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যেদিন বসিয়ে দেবে, সেই দিন আমি একবার হাঁপ ছাড়ব। তার আগে আমি দেশে যাচ্ছি না। যত শীঘ্র পারবে—। টাকা পাঠাতে পারলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি; তোমরা যোগাড় করে এই আমার দুর্গোৎসবটি করে দাও দেখি।"

শুনলে আশ্চর্য মনে হবে, কিন্তু একথা সত্য যে, নরেন্দ্র মনে প্রাণে চেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ সংঘের আগে হোক তাঁর 'জ্যান্ত দুর্গা'র, তাঁর 'মাতাঠাকুরানী'র মঠ। কেন মায়ের মঠ? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন এইভাবেঃ "আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তিহীন কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী ভারতে জন্মাবে।" অতএব "তাঁর [শ্রীমায়ের] মঠ প্রথমে [স্থূলাক্ষর স্বামীজীকৃত) চাই। রামকৃষ্ণ

পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে!... আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। সেইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে পারো কি?...দাদা, এই দারুণ শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার করে লড়াই করে টাকার যোগাড় করছি। মায়ের মঠ হবে।...আমাদের মঠের চিন্তা নাই, আমি দেশে গিয়ে সব ঠিকঠাক করব।"

আবার শুধু স্বামী শিবানন্দকে নয় অন্যত্রও তিনি লিখেছেনঃ "সেইজন্য আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের প্রথম উদ্যম, উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্ন নারীকুলের আকর স্বরূপ হইবে।" কিংবা "সন্ন্যাসীদের জন্য একটি এবং মেয়েদের জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই আমার মৃত্যু হলে, আমার জীবনব্রত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।"

এই আকাঙ্ক্ষাগুলি ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৮-এর মধ্যে নরেন্দ্র ব্যক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ আমেরিকা থাকাকালীন এবং পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসে। কিন্তু ঘটনাচক্রে ১৮৯৭-এ রামকৃষ্ণ সংঘ এবং ১৮৯৮-এ বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হলেও মায়ের মঠ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। এদেশে ফিরে আসার পর থেকে মায়ের মঠ প্রতিষ্ঠার চিন্তা নরেন্দ্রকে আকুল করে তুলেছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের কাছে সেকথা ব্যক্তও করেছিলেন। কিন্তু 'স্বামীজীর শারীরিক অবস্থা তখন মোটেই ভাল ছিল না এবং চিকিৎসকগণ তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছিলেন; কিন্তু ঐ চিন্তা স্বামীজীকে এমনভাবে আবিষ্ট করে রেখেছিল যে তা বাস্তবায়িত করার পথে যে কোনও প্রতিবন্ধকের, তা যতই দুরূহ হোক না কেন, তিনি সম্মুখীন হতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু স্বামী যোগানন্দের একটি ছোট্ট যুক্তিতে স্বামীজী শ্রীমায়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্ত্রীমঠ স্থাপনের পরিকল্পনাটি পরিত্যাগ করেন।' স্বামী যোগানন্দের উক্তিতে পাচ্ছিঃ "শেষে স্ত্রীমঠ আরম্ভের পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁকে বললামঃ 'সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্য যা তুমি ভাল মনে কর তা নিশ্চয়ই করবে; কিন্তু তোমার কাছে অনুরোধ, মাকে লোকসমক্ষে নিয়ে এসো না। তোমার কি মনে নেই, ঠাকুর আমাদের বলেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে সাধারণের কাছে প্রচার করলে তাঁর শরীর থাকবে না? ঠিক ঐ একই কথা মায়ের সম্পর্কেও খাটে।... তাই ভাই তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, মাকে তুমি এসবের মধ্যে এনো না।'... আমার কথা শেষ হতে না হতে স্বামীজী আমাকে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়ে সহাস্যে বললেনঃ 'মন্ত্রী, তুই আমাকে সত্যি একটি খুব মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিস এবং ঠিক সময়েই এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিস। মাকে আমি এসবের মধ্যে আনব না। তাঁর যেমন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, তিনি সেভাবেই তাঁর মিশন চরিতার্থ করবেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়ার আমরা কে? বরং তাঁর আশীর্বাদেই আমরা সবকিছু সম্পন্ন করতে পারি। আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি এবং অনুভব করেছি, তাঁর আশীর্বাদের শক্তি অসাধ্য সাধন করতে পারে'।"

শ্রীমায়ের 'মিশন চরিতার্থ' হয়েছিল ১৯৫৪ সালে 'শ্রীসারদা মঠ' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। স্বামীজীর পরিকল্পিত সন্ন্যাসিনী মঠ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা মর্মে মর্মে অবগত আছেন, কী অসাধারণ অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, তিতিক্ষা এবং ধৈর্যের ভিতর

দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তাঁরই নামাঙ্কিত মঠের প্রতিষ্ঠা হয়। নরেন্দ্রের মতনই শ্রীমা যেন জানতেনঃ 'ও হবেই একদিন।' তাই মায়ের মঠ নিয়ে নরেন্দ্রের তীব্র অভিলাষ, স্বপ্নময় এষণা সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হলেও মা তখন কোনও মন্তব্য করেননি।

নরেন্দ্র আমৃত্যু শ্রীমায়ের ও তাঁর মেয়েদের জন্য ভেবে আকুল হয়েছেন। স্বামী শিবানন্দকে লেখা বহু-উদ্ধৃত সেই চিঠিতে লিখেছেনঃ "প্রথমে মাতাঠাকুরানীর জন্য একটি জায়গা করবার দৃঢ় সঙ্কল্প করেছি...যদি মায়ের বাড়িটি প্রথমে হয়ে যায়, তাহলে আর আমি কোন কিছুর জন্য ভাবি না...মায়ের জমিটা যেমন করেছ, অমনি আমি হুপ্ করে আসছি আর কি। জমিটা বড় চাই, building আপাতত মাটির ঘর ভাল, ক্রমে ভাল building তুলব চিন্তা নাই।"

এই চিঠি নরেন্দ্র লিখছেন ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে। আবার ঐ একই বছরে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ "মা-ঠাকুরানীর জন্য জমি খরিদ করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিবে—অর্থাৎ বিল্ডিং আপাতত মাটির হউক, পরে দেখা যাইবে। কিন্তু জমিটা প্রশস্ত চাই। কি প্রকারে কাহাকে টাকা পাঠাইব, সমস্ত সন্ধান করিয়া লিখিবে।" কিছুদিন পরে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেনঃ "মা-ঠাকুরানীর জন্য একটা জায়গা খাড়া করতে পারলে তখন আমি অনেকটা নিশ্চিন্তি। বুঝতে পারিস? দুই তিন হাজার টাকার মতো একটা জায়গা দেখ। জায়গাটা বড় চাই। আপাতত মেটে ঘর, কালে তার উপর অট্টালিকা হয়ে যাবে। যত শীঘ্র পার জায়গা দেখ। আমাকে চিঠি লিখবে।... যত শীঘ্র পারো ঐ কাজটা হওয়া চাই। ঐটি হলে ব্যস্, আদ্দেক হাঁপ ছাড়ি। জায়গাটা বড় চাই, তারপর দেখা যাবে। আমাদের জন্য চিন্তা নাই, ধীরে ধীরে সব হবে। কলকাতার যত কাছে হয় ততই ভাল। একবার জায়গা হলে মা-ঠাকুরানীকে centre (কেন্দ্র) করে গৌর-মা, গোলাপ-মা, বেড়োল হুজুগ মাচিয়ে দিক।"

পুনরায় শশীকে ২২ অক্টোবর ১৮৯৪-এ লেখা আর একটি চিঠিতে নরেন্দ্র আগের কথাগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছেনঃ "পূর্বের পত্রে লিখিয়াছি যে, তোমরা মা-ঠাকুরানীর জন্য একটা জায়গা স্থির করিয়া আমাকে পত্র লিখিবে। যত শীঘ্র পারো।"

পরের বছর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে আবার একই কথা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলছেনঃ "মা-ঠাকুরানীর জন্য পত্রপাঠ জায়গা অনুসন্ধান করিবে।...একটা বড় জমি প্রথমে চাই; তারপর বাড়ী ঘর সব হবে। আমাদের মঠ (সন্ন্যাসীদের মঠ) ধীরে ধীরে হবে, ভাবনা নাই।"

"যার মনে সাহস, হৃদয়ে ভালবাসা আছে, সে আমার সঙ্গে আসুক; বাকি কাউকে আমি চাই না, মার কৃপায় আমি একা এক লাখ আছি—বিশ লাখ হব। আমার একটি কাজ হয়ে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত। রাখাল ভায়া, তুমি উদ্যোগ করে সেইটি করে দেবে—মা-ঠাকুরানীর জন্য একটা জায়গা। আমার টাকাকড়ি সব মজুত; খালি তুমি উঠে পড়ে লেগে একটা জমি দেখে শুনে কেনো। জমির জন্য ৩/৪ অথবা ৫ হাজার পর্যন্ত লাগে তো ক্ষতি নাই। ঘর দ্বার এক্ষণে মাটির ভাল। একতলা কোঠার চেয়ে মাটির ঘর ঢের ভাল। ক্রমে ঘর-দ্বার ধীরে ধীরে উঠবে।" মায়ের জন্য ব্যাকুল-প্রাণ নরেন্দ্র এই চিঠি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে।

শুধু গুরুভাই বা শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ভক্তদের কাছেই নয়, নরেন্দ্র ঠাকুরের গৃহী ভক্তদের কাছেও নিজ আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর আরব্ধ কাজটি কে করে দেবে সেটা বড় কথা নয়, আসলে কাজটি হওয়া চাই এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ১৮৯৫-এর ৯ ফেব্রুয়ারি বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে (এঁকে নরেন্দ্র আদর করে স্যাণ্ডেল বলে ডাকতেন) লেখা চিঠিতে সেই একই অনুনয়।ঃ "মা-ঠাকুরানীর জন্য জায়গা কিনে দিলে আমি আপনাকে ঋণমুক্ত মনে করব।... মা-ঠাকুরানীর জন্য জায়গা কিনলেই আমি নিশ্চিন্ত।"

যে কোনও কারণেই হোক, তাঁর জীবদ্দশায় নরেন্দ্র মায়ের জমি কিংবা বাড়ি কিছুই দেখে যেতে পারেননি। তাঁর অকস্মাৎ প্রয়াণ হয়তো এর একটা কারণ কিংবা ভারতে ফিরে আসার পর থেকে তিনি শত সহস্র কর্মধারায় যেভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাতে মায়ের মঠ স্থাপনের কাজটি তখন আর নরেন্দ্রের জীবনে প্রধানতম কাজ হয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। এর সঙ্গে ছিল তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের সমস্যা।

মায়ের জমি-বাড়ি সংক্রান্ত উদ্ধৃত চিঠিগুলির একটিতে বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠেছে একটি বাক্যঃ "মার কৃপায় আমি একা এক লাখ আছি—বিশ লাখ হব।" এ যে কত বড় আত্মপ্রত্যয়, তা ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না। মায়ের কৃপা-শক্তির উপর তাঁর কী নির্ভরতা! একথা ঘোষণা করতে তাঁর এতটুকু দ্বিধা নেইঃ "মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়।" সেই লক্ষ গুণ বড় কৃপার জোরে নরেন্দ্রের বিশ লাখ কেন, এক কোটি হওয়াও আশ্চর্যের কিছু নয়!

নরেন্দ্র বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেনঃ "আমি নিজে যা কিছু হয়েছি, ভবিষ্যতে পৃথিবী যা হবে, তার সবকিছুরই মূলে আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ।" এই বাক্যের শেষ দুটি শব্দ মুছে দিয়ে যদি লেখা হয় 'গুরুপত্নী শ্রীমা সারদা' তাহলে কি খুব অন্যায় করা হবে? সত্য বিকৃত করা হয়েছে বলা হবে কি? আমরা বিশ্বাস করি, হবে না। নরেন্দ্রের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের অধিষ্ঠান সদা সর্বদা তুল্যমূল্য। এক ও অভিন্ন। সেখানে বেশি-কম, কম-বেশি নেই। নরেন্দ্র যেমন ঠাকুরের 'জন্মজন্মান্তরের দাস', তেমনই মায়েরও 'জন্মজন্মান্তরের দাস'। বিখ্যাত 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে তাই লিখেছেনঃ 'দাস তোমা দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে।'

আজীবন নরেন্দ্র এই অনুভবে স্থির ছিলেন যে, শ্রীমা হচ্ছেন মহাশক্তিস্বরূপিণী। তাঁর কৃপাকটাক্ষে পৃথিবীতে যা কিছু অসম্ভব, তাই সম্ভব হয়ে উঠবে, মায়ের পবিত্রতার স্পর্শে দূর হবে অন্ধকারের কালিমা। তাঁর জীবনব্রতের পরিপূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটবে মায়ের কাজ শেষ হলে। এমনই তাঁর উপলব্ধি। এমনই নরেন্দ্রের সঙ্গে মায়ের নাড়ির সম্পর্ক। 'মা আছেন আর আমি আছি'—নরেন্দ্র তাই নির্ভীক। জীবন-যুদ্ধের সবচেয়ে অকুতোভয় সৈনিক যিনি 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' বলে একদিন সমগ্র মানবলোককে কম্বুকণ্ঠে ডাক দিয়েছিলেন। নরেন্দ্র জানতেন, তাঁর মাথার উপরে নিয়ত বর্ষিত হচ্ছে অভয়া শ্রীমায়ের বরাভয় আশীর্বাদ। নরেন্দ্র যা উপলব্ধি করতেন, তা-ই একদিন মা জনৈক ভক্তকে স্বমুখে বলেছিলেনঃ "ভয় কি, বাবা, সর্বদাই জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি, আমি মা থাকতে ভয় কি?"

জীবনশেষের কোনও একটি দিনে নরেন্দ্র শ্রীমায়ের চরণপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে

তাঁর প্রাণের নিগূঢ় কথাটি বলেছিলেনঃ "মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, আর দ্বিতীয় নেই।"

শ্রীমা সম্পর্কে নরেন্দ্রের এই হৃদয়-নিঙ্ড়ানো উক্তি যেন এক অলিখিত মহাকাব্যের প্রথম শ্লোক যা ব্যাখ্যার অতীত, যা কেবল বিনম্র অনুভবে সন্তানের অন্তর আলোকিত করে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও সমকালীন কলকাতা

নিশীথরঞ্জন রায়

স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযজ্ঞের পরিধি ও ব্যাপকতা তিনি যে স্থানটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে ব্যাপ্তিলাভ করেছিল শুধু গোটা ভারতবর্ষেই নয়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমেত সারা পৃথিবীর জনমানসের গভীরে। আজ থেকে একশ একত্রিশ বছর আগে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন দিশী কলকাতার পুরোনো সিমলা (সিমুলিয়া) পল্লীতে ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখার্জী লেনের পিতৃপিতামহের গৃহে। তাঁর কর্মচঞ্চল অথচ স্বল্পায়ু জীবনে মর্তলীলার অবসান ঘটেছিল (৪ জুলাই, ১৯০২) কলকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত তাঁরই পরিকল্পিত বেলুড় মঠে। জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান মাত্র উনচল্লিশ বছর।

যেসব মহাজীবনের আবির্ভাব ঘটেছিল এই শহরে—তাঁদের মধ্যে যাঁরা নিজগুণে অর্জন করেছিলেন বিশ্বব্যাপী খ্যাতি তাঁদের নিয়ে কলকাতাবাসীরা স্বভাবতই গর্ববোধ করে। তাঁদের মধ্যে কেউ বিশ্বকবি, কেউ স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক কিংবা দার্শনিক, কেউ সৃজনশীল শিল্পী, কেউ বা অধ্যাত্মপথের অভ্রান্ত দিশারী। স্বামীজী আত্মপরিচয় দিতেন রামকৃষ্ণ-শরণাগত ও তাঁরই বার্তাবহ বলে, পাশ্চাত্যে তাঁর পরিচয়—তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী, যাঁর গতিবেগ ঝড়ের গতিশীলতাকেও ছাড়িয়ে যায়—'Cyclonic monk'.

আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বামীজীর সমকালীন কলকাতা। নরেন্দ্রনাথের (স্বামীজীর সন্ন্যাস-পূর্ববর্তী নাম-পরিচয়) বাল্য ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছিল প্রথমে দত্তবাড়ির নিজস্ব পাঠশালায়—সেখানেই তাঁর হাতেখড়ি। অতঃপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-পরিচালিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউট-এ। শুনেছি ১৮৭১ সালে তাঁর ভর্তি হবার রসিদ-সমেত কার্ডটি নাকি এখনও রক্ষিত আছে। এ সংবাদটি দিয়েছেন বিদ্যাসাগর কলেজ শতবর্ষ স্মরণিকায় সুরেশ প্রসাদ নিয়োগী তাঁর একটি প্রবন্ধে। ঐ বছরে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল সাতশ আঠারো। প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রসন্ন চন্দ্র রায়। নরেন্দ্রনাথ ভর্তি হয়েছিলেন স্কুলের নবম ক্লাসে অর্থাৎ এখনকার হিসাবে class-II-তে। সরকারি রিপোর্ট অনুসারে বিদ্যালয়টি ছিল 'the largest school in Bengal, with the exception of the Scotch Missionary Schools'. এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বি. এ. পাশ করার পর ১৮৮৪ সালে নরেন্দ্রনাথ যখন এই স্কুলে অল্পদিনের জন্য শিক্ষকতা করছিলেন তখন ঠাকুর

রামকৃষ্ণদেব তাঁর সন্ধানে এই স্কুলের দ্বারপ্রান্তে এসেছিলেন। স্কুলে পড়বার সময়েই নরেন্দ্র বছর দুয়েকের জন্য আইনজীবী পিতা বিশ্বনাথের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশে রায়পুরে প্রবাসযাপন করেন।

পরবর্তী অধ্যায় কলেজ-জীবন—পুরোমাত্রায় কেটেছে শহর কলকাতায়। এই অধ্যায়ের আয়ুষ্কাল চার বৎসর।

নরেন্দ্রনাথের জীবনের পরবর্তী মহৎ অধ্যায়ের সূচনা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পবিত্র সান্নিধ্যলাভে (১৮৮১ সাল) এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণে। ১৮৮৬ সাল থেকে পরিব্রাজক জীবনের সূত্রপাত। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের শেষ ছাব্বিশটি বছরের অধিকাংশ কেটেছিল কলকাতা থেকে বহু দূরে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবং পশ্চিম ভূখণ্ডে—বিশেষত আমেরিকা আর ইউরোপে। তবু কলকাতাতেই তাঁর জীবনের আরম্ভ আর কলকাতার অনতিদূরে বেলুড় মঠে তাঁর মর্তজীবনের অবসান।

কলকাতার দুটি রূপই নরেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাল্যে ও কৈশোরে বিত্তশালী এতদ্দেশীয়দের সমাজজীবন—অর্থের সমারোহ তবু অর্থের প্রতি অনাসক্তি পুরোপুরি ছিল তাঁর পিতা ব্যবহারজীবী বিশ্বনাথের জীবন-পরিচর্যায়। পিতৃবিয়োগের পর তিনি তীব্রভাবে পেয়েছিলেন আর্থিক কৃচ্ছ্রতা আর অভাব-অনটনের নগ্ন পরিচয়। স্কুল, বিশেষত কলেজ-জীবনে শুধু বিত্তের প্রাচুর্যই তিনি লক্ষ্য করেননি, কলকাতার জীবনের স্পন্দন-বৈচিত্র্যও অনুভব করেছিলেন তাঁর জ্ঞানান্বেষী জিজ্ঞাসু মনে। একদিকে শরীরচর্চার নিয়মিত অভ্যাস, অন্যদিকে শহরে বিপ্লবধর্মী সংস্থা, ব্রাহ্মসমাজ, ফ্রী ম্যাশন লজ, থিয়োসফিস্ট এবং খ্রীস্টীয় সংস্থার সঙ্গেও তাঁর ঘটেছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। হিন্দুধর্মের সনাতন আচার-আচরণ সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন অল্পবয়স থেকেই। মা ভুবনেশ্বরী ছিলেন অতিশয় ধর্মপ্রাণা মহিলা, দেবদ্বিজে ছিল তাঁর অনমনীয় বিশ্বাস। খ্রীস্টান মিশনারিদের শিক্ষার প্রভাবও নরেন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন।

কলকাতায় তখনও অব্যাহত রয়েছে রেনেসাঁস গতি—যার মূলে ছিল অদম্য জ্ঞানস্পৃহা আর সংস্কারের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন যুক্তিনিষ্ঠ মানসিকতার চর্চা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পাশ্চাত্য দার্শনিক, সাহিত্যিক, ও চিন্তানায়কদের তাত্ত্বিক প্রভাব। পুরাতনকে বর্জন করা আর নতুনকে গ্রহণ করার মধ্যে আধুনিকতার প্রশ্রয় পাওয়া গেলেও পুরাতনের মধ্যে যা ছিল ভাল, সৎ এবং যুক্তিগ্রাহ্য তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনও সেদিন অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে পুরাতন বনাম নতুনের দ্বন্দ্বের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়নি সেযুগের চিন্তাধারা। প্রাচীনতার সমুদ্রমন্থনের ফলে উত্থিত হল অমৃতকুম্ভ। সে কুম্ভটি ভরাট ছিল আত্ম-আবিষ্কৃতির আবেগে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ নয়, প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে যা ছিল শ্রেয়স্কর তার পুনরুদ্ধার এবং তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনও সেদিন লাভ করেছিল সম-স্বীকৃতি। নরেন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনে যেমন তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন যুক্তির প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তেমনি অনুভব করেছিলেন পুরাতনের মধ্যে যেসব শাশ্বত সত্য আমাদের গোচরের অন্তরালে, তাদের যোগ্য স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত না করার প্রয়োজনীয়তা। প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে যুক্তির নিরিখে যাচাই করে আবিষ্কার করতে হবে প্রকৃত সত্যকে। আর সেই চিরন্তন নিত্য শুদ্ধ সত্যের মূল নিহিত রয়েছে ভারতীয়

দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশে, বেদান্ত গ্রন্থে, ঔপনিষদীয় তত্ত্বে। দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারে সেই চিন্তা, আচার-আচরণের মধ্যে যদি প্রতিফলন ঘটানো হয় সমন্বয়ধর্মিতার আদর্শ। এই সুমহান প্রত্যয়ের বীজ নরেন্দ্রনাথের মনে বপন করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব।

ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম প্রবক্তা রামমোহন যুক্তিবাদী ছিলেন। ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যেরা যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেশবাসীর প্রতিটি আচরণ ও চিন্তাধারাকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন এমন একটি স্তরে যেখানে যা যুক্তিগ্রাহ্য নয় তাকে যে কোনও মূল্যে বিসর্জন দিতে হবে। ব্রাহ্মসমাজের নেতারাও তখন সমাজসংস্কার এবং নারীজাতির অবস্থার উন্নয়নে ব্রতী। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একক চেষ্টায় প্রবর্তন করতে চাইছিলেন নারীজাতির উন্নয়ন, বিশেষত বালবিধবাদের পুনর্বিবাহ এবং গোটা নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাব প্রসার। এঁদের সকলেরই কর্মকেন্দ্র ছিল কলকাতা। এঁদের কার্যকলাপে রক্ষণশীল দল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। প্রগতিবাদী বনাম রক্ষণশীলদের এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত প্রগতিবাদীরাই জয়ী হলেন।

স্বামীজীর জন্মের আগে থেকেই শুধু সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনেই নয়, রাজনীতিক ক্ষেত্রেও শুরু হয়ে গিয়েছিল তৎপবতা। তখনকার যুগে জনগণের প্রতিনিধিমূলক যেসব সংস্থা গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের নাগরিক এবং শাসনতান্ত্রিক অধিকারের সম্প্রসারণ। ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কয়েক বছরের মধ্যেই এক উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল।

ততদিনে কলকাতার জনসমাজে জাতীয়তাবাদী আদর্শের উৎপত্তি এবং প্রসার ঘটতে শুরু হয়ে গিয়েছে। মেলাজাতীয় সংগঠন, সংবাদপত্র এবং সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ এবং আত্মানুসন্ধানের প্রচার চলছে বিপুল উদ্যমে। সামাজিক কুপ্রথা, কুসংস্কার এবং তথাকথিত ধর্মের অনাচার, শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা, পুরোহিতশ্রেণীর আচার-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া ক্রমশ শক্তিসঞ্চয় করে চলার ফলে বিজ্ঞানভিত্তিক সংস্থার পাশাপাশি গড়ে উঠছিল সমাজকল্যাণমূলক বহু স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন। উনিশ শতকের শেষাশেষি কলকাতায় এই ধরনের সংস্থা যে মাত্রায় গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের অন্য কোনও শহর তার কাছাকাছি যেতে পারেনি।

কলকাতার ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে প্রতিনিধিমূলক জাতীয় সম্মেলনের (National Conference) পরপর দুটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই শহরেই। এই সম্মেলনের জনপ্রিয়তা এবং জনসাধারণের মনে এর প্রভাব দেখেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে একীভূত হয়ে সমকালীন ভারতে সর্বাধিক শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণতি লাভ করে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কৌতূহল হওয়া সত্ত্বেও তাদের পথ অথবা কর্মসূচী অগণিত দরিদ্র নিরক্ষর ভারতবাসীর সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবার পুনর্বিবাহ সম্পর্কিত প্রয়াস কিংবা জাতীয়

কংগ্রেসের কর্মসূচী কলকাতার ছেলে নরেন্দ্রের মনে ঔৎসুক্যের মাত্রাতিরিক্ত সীমা স্পর্শ করেনি।

কলকাতার বহিরঙ্গের চিত্রটিও অপ্রাসঙ্গিক নয়। আমরা সকলে জানি যে কোম্পানির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সহ-অবস্থান করছিল দুটি কলকাতা—একটি সাহেব-অধ্যুষিত হোয়াইট টাউন, অপরটি নেটিভ অথবা ব্ল্যাক টাউন যার বাসিন্দা ভারতীয় জনগণ, যাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল বাঙালী। হোয়াইট আর ব্ল্যাক টাউনের অন্তর্বর্তী অঞ্চলটিকে বলা যেতে পারে ব্রাউন টাউন। এখানে এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের আগন্তুকদের সমাবেশ।

নরেন্দ্রনাথের পিতৃপুরুষ গুপ্তিপাড়া থেকে প্রথমে বসতি স্থাপন করেন গোবিন্দপুরে। কিন্তু কোম্পানির নতুন দুর্গ তৈরির সিদ্ধান্তগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দপুরের বাসিন্দারা সরে আসতে বাধ্য হলেন উত্তর কলকাতার সুতানুটি অঞ্চলে। দত্ত পরিবার চার-পাঁচ বিঘা জমি নিয়ে সিমলায় স্থাপন করলেন তাঁদের নতুন বসতি। ইতিমধ্যে হোয়াইট টাউনের জৌলুস ক্রমশ বাড়তে থাকে। এ অঞ্চলের পথঘাট, বাড়িঘর, স্থাপত্যকীর্তি দেখে অঞ্চলটিকে বলা হত 'City of Palaces'. কিন্তু সুতানুটির ছিরিছাঁদের কোনও বালাই ছিল না। অবশ্য ধনী লোকেরা বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে গড়ে তুললেন চকমিলানো বসতবাটী—একাধিক বৈঠকখানা, ঠাকুর ঘর, ঠাকুর দালান, অন্দরমহল, আউট হাউস, গোশালা, আস্তাবল, কোচোয়ান, বরকন্দাজ আর দরোয়ানের কুঠুরি।

স্বামীজীর মধ্যম অনুজ মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তাঁদের বাড়িতেই ছিল একটি পাঠশালা আর সেখানেই হয়েছিল নরেন্দ্রনাথের হাতেখড়ি। নরেন্দ্রনাথের বেশি ভাব ছিল কোচোয়ানের সঙ্গে আর অদ্ভুত টান ছিল হুঁকার প্রতি। খেলাধূলার তালিকায় ছিল কপাটি, লাটিম, মারবেল আর ব্যাটবল। এমনি তালিকা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' থেকেও। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন এগুলি ছিল কমজোরি খেলা। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ কুস্তি করতেন, ব্যায়ামও করতেন। ফলে অনেকসময় অত্যাচারী গোরা সৈন্যের দলও তাঁর কাছে হার মানত। তখনও কলের জলের ব্যবস্থা হয়নি, পানীয় জল আনা হত হেদুয়ার পুকুর থেকে। প্রত্যেক বাড়িতে থাকত একাধিক পাতকুয়া। স্নান সেরে নেওয়া হত পুকুর কিংবা পাতকুয়ার জলে।

কলকাতা শহর তখনও গ্রাম্যতা পরিহার করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, পল্লী আর শহর তখনও ভ্রাতা-ভগিনীর মতো হাত ধরাধরি করে চলছিল। তখনও কড়ি বদলে কেনাকাটা হত। ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গেলেও জুড়িগাড়ি চড়ে অনেকেই যাতায়াত করতেন। আমোদপ্রমোদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পুতুল নাচ, হাফ আখড়াই, সখের যাত্রা, চড়ক উৎসব, কাঁসারী পাড়ার সঙ আর নতুন আমদানি থিয়েটার।

নরেন্দ্রনাথের বাল্যকালীন উত্তর কলকাতার চালচলন সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার বর্ণনা অনেকখানি একই ধরনের। আসলে ইংরেজ-অধ্যুষিত অঞ্চলটি যত দ্রুতগতিতে উন্নতি আর জৌলুসের পথে পা বাড়াচ্ছিল, দিশী অঞ্চলের চেহারাটা অনেকখানি আগের মতই ছিল। অবশ্য ততদিনে চাকুরিজীবী এবং উকিল, এটর্নি, ডাক্তার কিংবা ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেড়েছে, পালকি, ঘোড়ার গাড়ির আমদানি ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে, সাধারণ মানুষের অর্থসম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনযাত্রার

মানও উন্নত হয়েছে। লেখাপড়ার ঝোঁকও দেখা যাচ্ছে তবু সাবেকী পল্লীজীবন অন্তর্হিত হয়নি। জোড়াসাঁকোর (ধরে নেওয়া যায় যে কোনও সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়িরও) ছাদে মেয়েদের আসর বসত। তার বর্ণনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"ছাদে মেলে দেওয়া মেয়েলি কাজে পাড়াগাঁয়ের একটা স্বাদ ছিল। সেই কাজগুলো সেই সময়কার যখন বাড়িতে ছিল ঢেঁকিশাল, যখন হত নারকেলকোটা, যখন দাসীরা সন্ধেবেলায় বসে উরুতের উপর সলতে পাকাত, আর প্রতিবেশীর ঘরে ডাক পড়ত আটকৌড়ির নেমন্তন্নে।...

"পাড়াগাঁয়ের আরও একটা স্থান ছিল চণ্ডীমণ্ডপে, ঐখানে গুরুমশায়ের পাঠশালা বসত। কেবল বাড়ির নয়, পাড়া প্রতিবেশীর ছেলেদেরও ঐখানে বিদ্যের প্রথম আঁচড় পড়ত তালপাতায়।...।"

রবীন্দ্রনাথের বাল্য এবং কৈশোরের দিনগুলি ছিল ছকে কাটা—তিনি ছিলেন ভৃত্য-রাজতন্ত্রের প্রজা, নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অত বাধ্যবাধকতা ছিল না। পিতৃহীন হবার পর থেকে তাঁকে মনে হত যেন বল্‌গা-ছেঁড়া টগবগে ঘোড়া। তখনকার জীবনে ছিল শুধু গতি, সেখানে স্থিতির কোনও অবসর ছিল না।

এখানে আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার—নতুন উঠতি শহরে নানাভাবে অর্থ-উপার্জনের সুযোগ যাঁরা করে নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই যাপন করতেন বিলাসী জীবন, নানাভাবে অর্থের অপচয় করতেন তাঁরা। এঁদের জীবনযাত্রা দেখেই 'বাবু কালচার' কথাটির উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু সকলের জীবনযাত্রার ধারা একরকম ছিল না, অর্থবান হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা অহেতুক বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন না, সদ্‌ভাবে অর্জিত অর্থ তাঁরা সদ্‌ভাবেই ব্যয় করতেন। নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন এই শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই অর্থকৃচ্ছ্রতার ফলভাগী হলেন জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ। তাঁর মনে যখন চরম অস্থিরতা তখন তিনি ছুটে গেছেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে। তারপর নরেন্দ্রনাথের জীবনে কি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এল তা সর্বজনবিদিত। ঠাকুরের দেহান্তের পর তিনি গ্রহণ করলেন পরিব্রাজকের জীবন। তখন তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হল ধনী-নির্ধন, কুলীন-অকুলীন-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর স্বদেশবাসীর সামগ্রিক জীবনের বঞ্চনা। শুধু কলকাতা কিংবা বাংলাদেশে নয়, তাঁর চিন্তারাজ্য জুড়ে ছিল গোটা ভারতবর্ষ। বিবেকানন্দের পর্যটন তাঁর ভারত-আবিষ্কারের নামান্তর।

পরবর্তী অধ্যায়ে ঐতিহাসিক শিকাগো যাত্রা। সেই অধ্যায়টির সূচনায় দক্ষিণভারত ও খেতড়ি-মহীশূরের সক্রিয় ভূমিকার তুলনায় কলকাতার স্থান ছিল নিতান্তই গৌণ। বিশ্বধর্মমহাসভা সম্পর্কে ব্রাহ্ম এবং খ্রীস্টান মিশন পরিচালিত সংবাদপত্রে যত বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হত কলকাতার সংবাদপত্রে গোড়ার দিকে তার অভাব ছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম নরেন সেন সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরার'। পরে 'বেঙ্গলী' এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা'ও ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ভাষণের বিস্ময়কর প্রভাব নিয়ে সংবাদ ক্রমশ প্রকাশ করতে শুরু করে। বিদেশে সাফল্য অর্জনের পর আমরা যোগ্যতার স্বীকৃতি দিই—এমন অভিজ্ঞতা শুধু স্বামীজীর ভাগ্যেই নয়, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও জুটেছিল। সাফল্যের সংবাদ পৌঁছবার পর থেকেই কলকাতাবাসীদের মধ্যে দেখা গেল অভূতপূর্ব

উৎসাহ, উত্তেজনা। বিবেকানন্দ-পরিকর কিরণ চন্দ্র দত্তের রচনা থেকে জানা যায় যে, শিকাগোর সাফল্য-গর্বে গর্বিত কলকাতার নাগরিকরা বাগবাজারের মদনমোহন জিউ-এর বিরাট নাটমন্দিরে এক অভিনন্দনসভার আয়োজন করেন (৩১ আগস্ট, ১৮৯৪)। মিরারের প্রতিবেদন অনুসারে এক সহস্র লোকের সমাগম হয়েছিল সেদিন। এরপর ঐ বছরের ৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউন হলে আয়োজিত হয় দ্বিতীয় অভিনন্দন সভা। ১৮৯৪ সালের অগস্টের আগে শিকাগোপ্রসঙ্গে কলকাতাবাসীদের নিরুত্তাপ ঔদাসীন্য নিয়ে দক্ষিণ ভারতের 'হিন্দু' পত্রিকায় কটাক্ষও করা হয়েছিল। স্বামীজী স্বদেশে ফিরে আসছেন এই সংবাদ পাওয়ার পর কলকাতা ঔদাসীন্য ছেড়ে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হল বিজয়ী সন্ন্যাসীকে যথাযোগ্য অভিনন্দন জানাতে। জাহাজে বজবজ পৌঁছে ট্রেনে যেদিন শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছলেন সেদিন এক বিরাট উন্মাদনা—ঘোড়ার বদলে যুবকরাই গাড়ি টেনে পৌঁছে দিল তাঁর গন্তব্যস্থানে (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭)। মিরার কাগজের হিসেব অনুযায়ী সেদিন স্টেশনে কুড়ি হাজার জনতার সমাবেশ ঘটেছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারি স্বামীজীকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো হল শোভাবাজার রাজবাড়ির বিস্তৃত প্রাঙ্গণে। ইতিপূর্বে কোনও একটি সভায় এত বেশিসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হয়নি। সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে স্বামীজী তাঁর নিজের নগরীটিকে কত ভালবাসতেন তার পরিচয় দিলেনঃ

"মানুষ তাহার অন্তরে সর্বদা একটি মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পায়—কে যেন দিবারাত্র তাহার কানে কানে বলিতে থাকে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। হে ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীর অধিবাসীগণ তোমাদের নিকট আমি সন্ন্যাসীভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্মপ্রচারকরূপেও নয়। তোমাদের নিকট পূর্বের ন্যায় সেই কলিকাতাবাসী বালকরূপে আলাপ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছা হয় এই নগরীর রাজপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের ন্যায় সরলপ্রাণে আমার মনের কথা সব খুলিয়া বলি।...পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরাজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, স্বামীজী! চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবের মুকুটধারী, মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্যভূমিতে ভ্রমণের পর আপনার মাতৃভূমি কেমন লাগিবে? আমি বলিতাম, পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম। এক্ষণে ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার নিকট পবিত্র, ভারত আমার নিকট ধর্মস্বরূপ।"

স্বামীজীর রচনায় বহু জায়গায় রয়েছে জন্মভূমি কলকাতাকে কত ভালবাসতেন তিনি, বাংলার যুবকদের উপর কতখানি ভরসা রাখতেন। দেশের যুবকসমাজের কাছে স্বামীজী যেমন তাঁর প্রত্যাশার কথা অকপটে বলেছেন, আবার এক শ্রেণীর যুবকদের তিনি বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধও করেছিলেন। সেকথা যুবকরা নিজেরাই দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করেছেন। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন কিংবা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে তিনি তেমন উৎসাহ বোধ করেননি—কেন করেননি সে সম্পর্কে তিনি একাধিক কারণও দেখিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ গড়ার কাজটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর পত্রাবলীতে এবং আরও অসংখ্য রচনায়। ফুটবল কিংবা ক্রিকেট খেলার মাঠের তুলনায় সেযুগের তরুণদের বেশি আকর্ষণ ছিল ব্যায়ামাগার

কিংবা কুস্তির আখড়ার দিকে। দিশী পাড়ায় কুস্তির আখড়া ছিল প্রচুর।

কলকাতার জৌলুসের প্রতি কোনও মোহ ছিল না স্বামীজীর। কলকাতার স্থাপত্যকীর্তি নিয়ে ইংরেজ ও ভারতীয় মহলে গর্ববোধের অন্ত ছিল না। স্বামীজী কিন্তু ঔপনিবেশিক স্থাপত্যশৈলীর কঠোর সমালোচক ছিলেন। অথচ ভারতীয় সঙ্গীত ও শিল্পকলার প্রশংসায় তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ। কলকাতার স্থাপত্য সম্পর্কে তাঁর প্রধান আপত্তি—এর পরিকল্পনায় উদারদৃষ্টির অভাব। স্বামীজীর বাণী ও রচনার দশম খণ্ডে (পৃঃ ৩৩৪) দেখিঃ

"লোকেরা বলে কলকাতা প্রাসাদপুরী। কিন্তু কীর্তিগুলি দেখলে মনে হয় যেন কতকগুলি বাক্স উপর উপর সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এগুলি কোন বিশেষ ভাবের দ্যোতক নয়। প্রকৃত হিন্দু স্থাপত্য রাজপুতানায় এখনও অনেক দেখা যায়। কোন ধর্মশালার দিকে তাকাইলে মনে হইবে, উহা যেন মুক্ত বাহু প্রসারিত করিয়া যাত্রীকে আহ্বান জানাইতেছে—তাহারা সেখানে আশ্রয় ও আতিথেয়তা লাভ করিতে পারে। উহার ভিতরে ও বাহিরে সে দেবতার সান্নিধ্য অনুভব করিবে। গ্রাম্য কুটির দেখিলেও তৎক্ষণাৎ উহার বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এবং বুঝিতে পাবিবে যে, সমস্ত কুটিরটাই মালিকের নিজস্ব আদর্শ এবং প্রকৃতির দ্যোতক। ইতালী ব্যতীত অন্য কোন দেশে আমি এই জাতীয় ভাবব্যঞ্জক স্থাপত্যশিল্প দেখি নাই।"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে কলকাতার স্থাপত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেব প্রতিক্রিয়া। সতেরো বৎসর বয়সে কিছুদিনের জন্য দাদা সত্যেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে আমেদাবাদ শহরে তিনি গিয়েছিলেন। কলকাতার স্থাপত্য তাঁব মন কাডতে পারেনি কিন্তু আমেদাবাদের স্থাপত্যকীর্তির প্রভাব তিনি অনুভব করেছিলেন গভীরভাবে। আমেদাবাদের তুলনায় কলকাতার স্থাপত্যে ঐতিহ্যের প্রভাব কোথাও খুঁজে পাননি তিনি। তাঁর নিজের কথায়ঃ

"কলকাতায় আমরা মানুষ, সেখানে ইতিহাসের মাথাতোলা চেহারা কোথাও দেখিনি। আমাদের চাহনি খুব কাছের দিকের বেঁটে সময়টাতেই বাঁধা। আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষেব ধনেব মতো মাটির নীচে পোঁতা।"

দুটি ক্ষেত্রেই কারণ ভিন্নতর কিন্তু প্রতিক্রিয়া একই।

স্বামীজীর সমকালীন কলকাতা সম্পর্কে আরও একটি কথা বলার আছে। এইসময়ে একযোগে যত মনীষী আবির্ভূত হয়েছিলেন, অন্য কোনও যুগে সে সমাবেশ ঘটেনি। স্বামীজীর সমসাময়িকদের মধ্যে ছিলেন রাজনারায়ণ বসু (কলকাতা এবং মফঃস্বল), দীনবন্ধু মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, মীর মশারফ হোসেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, জগদীশচন্দ্র বসু, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চিত্তরঞ্জন দাস, অরবিন্দ ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে কেউ সমাজসংস্কার, কেউ রাজনীতি, কেউ সাহিত্য, কেউ বিজ্ঞানচর্চা, কেউ বা শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপন-আপন প্রতিভার

স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ভারতের মূল সমস্যা যে দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা, এই বিষয়ে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা ছিল অন্য সকলের চেয়ে গভীর এবং ব্যাপক—একথা বলা বোধহয় অত্যুক্তি নয়। তাঁর এই চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিতে তিনি কাজ শুরু করেন কলকাতা থেকেই। এরই সাক্ষ্য বহন করছে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাভাবনার প্রয়োগের সূত্রপাত ঘটেছিল কলকাতাতেই। কলকাতা ছিল তখন রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা কর্মকাণ্ডের প্রধানকেন্দ্র। স্বামীজীর দৃষ্টি রাজনীতি নয়, ছিল মূলত মানবকল্যাণের দিকে। শিবজ্ঞানে জীবসেবাই তাঁর আদর্শ। এই সেবার সূত্রপাত কলকাতা শহরেই। এটি কলকাতাবাসীর গর্ব ও অহংকার।

স্বামীজীর অধ্যয়নের জগৎ

রবিন পাল

পরিব্রাজনের একটা সময় স্বামীজী এসেছেন মীরাটে। বই পড়ায় তাঁর খুব আগ্রহ। এক গুরুভাই বই নিয়ে আসেন স্থানীয় এক গ্রন্থাগার থেকে। কিন্তু ইয়া মোটা মোটা এক-একটা বই পড়া শেষ হয়ে যায় এক এক দিনে। পরের দিন আনা হয় নতুন বই। গ্রন্থাগারিকের মনে হল, স্বামীজী পড়েন না, পড়ার ভান করেন। গুরুভাইয়ের মুখে এমন সন্দেহের কথা শুনে স্বামীজী হাজির গ্রন্থাগারিকের কাছে। বললেনঃ 'যেসব বই নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সব কটি বই-ই আমি ভাল করে পড়েছি। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? পরীক্ষা করবেন?' গ্রন্থাগারিক প্রশ্ন করতে লাগলেন আর স্বামীজী উত্তর দিতে লাগলেন চট্‌জলদি। এমন গল্প আরও আছে। এইসব গল্প থেকে বোঝা যায়, তাঁর বই পড়ার আগ্রহ ছিল দুরন্ত, পড়তেন ঝড়ের গতিতে। আর তাঁর পড়ার বিষয় ছিল নানামুখী। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত—কোন্ বিষয়েই বা তাঁর আগ্রহ ছিল না? ইতিহাসের পাঠক জানেন, এই বিচিত্রমুখী বিদ্যার্চর্চা এবং শাণিত মনীষা ও নূতন অন্বীক্ষণ বহন করে ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানান্বেষণ প্রবৃত্তির পরিচয়।

সিপাহী বিদ্রোহের ছ'বছর পর স্বামীজী জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ হল ভারতবর্ষের পরিবর্তমান পর্ব, সমাজজীবনে যেমন উঠেছে পরিবর্তনের তরঙ্গ, মানসে আসছে নানা অস্থিতির আততি।

১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ হল ঔপনিবেশিক পর্ব, সচেতন ও বিবেকবান হৃদয়ে তখন জেগেছে ঔপনিবেশিকতা বিষয়ে বিরাগ, যদিও গড্ডল মানসিকতার পরিচয়ও ছিল যথেষ্ট। স্বামীজীর পঠন-চিন্তন-মননে যুগ, কাল, পরিমণ্ডলের প্রভাব ছিল অনিবার্য, যদিও তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অনন্যসাধারণ, মনন ও উপলব্ধি ছিল তীব্র, আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম আর স্বদেশবোধ ছিল আবেগে উদ্বেল, মানবতায় প্রদীপ্ত, জীবন সংরক্তায় প্রাণস্পর্শী। শ্রীযুক্ত বিনয় রায় ঠিকই বলেছেনঃ "He appeared at a time when India and the world were at crosswords— critically revaluating old values, searching for a way out of the old, the then existing order."[১]

এইসূত্রে বলা যায় বিবেকানন্দই প্রথম ব্যাপক জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করেন। ভারতের

ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক সংহতিবোধ উদ্দীপনে তাঁর প্রয়াস স্মরণযোগ্য। তাঁর স্বদেশপ্রেম ক্রিয়াশীল ও গতিশীল। তিনি বলেছেনঃ 'ওঠো জাগো,' বলেছেনঃ 'সংগ্রামই জীবন'। তাঁর জাতীয়তাবোধ মানুষকে ভুলে অসার ভাববিলাস নয়। জাতীয়জীবনে প্রাণশক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদান-প্রদানের কথা বলেন। ভারতীয় জনগণের উত্থানের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন যুবকদের। (দ্রষ্টব্য ঃ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫১)। সেই মানুষটির বিকাশের ক্ষেত্রে পড়াশোনার ভূমিকার সামান্য রূপরেখা রচনা করব।

জানা যাচ্ছে, ছোটবেলায় স্বামীজী দুটি বিষয় চর্চা করতে চাইতেন না। সে দুটি হল—গণিত ও ইংরেজী। তাঁর মন বলত গণিত 'মুদির দোকানের বিদ্যে'[২] আর ইংরেজী ম্লেচ্ছ ভাষা, ওটা পড়তে নেই।[৩] কলাবিদ্যামনস্কতা এবং ইংরেজীর বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য বুঝতে পারার অক্ষমতা যা তাঁর শৈশবে গুরুজনদের মধ্যে ছিল এ তারই প্রভাবে। সৌভাগ্য, এ ধারণা চিরস্থায়ী হয়নি। পরবর্তী কালে তিনি চর্চা করতে চেয়েছেন ফলিত গণিত আর ইংরেজী ভাষায় দখল তো হয়েছিল রীতিমত বিস্ময়কর। আর পাঁচটা শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ বাড়ির ছেলেদের মতো ছোটবেলায় তিনি রামায়ণ, মহাভারতের গল্প পড়েছেন আগ্রহ নিয়ে। দেবদেবীর স্তোত্র আবৃত্তি করতেন, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সব সূত্র করেছিলেন কণ্ঠস্থ। ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্ত যুগের একটা বৈশিষ্ট্য ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহ। প্রবেশিকা পাশের বহু আগেই তিনি পাঠ করেছিলেন ইতিহাসের অনেক বই। তাঁর বাবার ইতিহাসপ্রীতি সঞ্চারিত হয়েছিল ছেলের মধ্যে। ছোটবেলায় পড়েছেন মার্শম্যান, এলফিনস্টোন প্রভৃতির ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস। এ পাঠ অবশ্য তাঁর ইতিহাসচেতনা স্ফুরণে সাহায্য করেনি। কিন্তু আগ্রহ অব্যাহত ছিল বলেই পরে পড়েন—গ্রীনের ইংরেজ জাতির ইতিহাস, অ্যালিসনের ইউরোপের ইতিহাস, কার্লাইলের ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস এবং গিবনের বিখ্যাত বই—রোম সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংসের ইতিবৃত্ত। মহেন্দ্র দত্ত লেখেনঃ "(স্বামীজী) গিবন লইয়া পড়িতে বসিলেন। সকালে পড়িতে আরম্ভ করিলেন, মধ্যে দুপুরবেলা আধঘণ্টা—তিন কোয়ার্টার আহারাদি করিয়া লইলেন—আবার পড়িতে বসিলেন, সন্ধ্যা হইয়া গেল, প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে তিনদিনে চারখণ্ড গিবন পড়িয়া লইলেন।"[৪] জুনাগড়ে থাকার সময় খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে ইউরোপের মধ্যযুগ, গথিক গীর্জা, রাফায়েলের ছবি, ধর্মযুদ্ধের কথা এসেছে। অর্থাৎ এসব নিয়ে তিনি পড়াশোনা করেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন, সেকালে ইতিহাস রচনা ক্রমানুসারী হলেও তাতে সাধারণ মানুষের প্রাধান্য ছিল কম—রাজন্য, পুরোহিততন্ত্র এবং ধর্মভাবনার গুরুত্ব ছিল বেশি। বিশ্লেষণের ধরনও ছিল না সমাজতান্ত্রিক। এইখানে উল্লেখ করি, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, কার্লাইলের 'হিরো অ্যাণ্ড হিরো ওয়ারশিপ' এবং এমার্সনের 'রিপ্রেজেনটেটিভ' নিয়ে তর্ক করেছেন স্বামীজী। লণ্ডনে সন্ত্রাসবাদী নেতা ক্রপটকিন-এর সঙ্গে পরিচয়কালে সন্ত্রাসবাদী তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ তাৎপর্য নিয়ে তিনি কিছু ভেবেছিলেন, যার পরিচয় আছে 'Caste Culture & Socialism'-এ এবং অন্যত্র। যিনি ভবিষ্যতে ভারতীয় সমাজের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে সুচিন্তিত আলোচনা করবেন, পলিটিক্যাল ইকনমি, সমাজতত্ত্ব যে তাঁর কাছে আকর্ষণীয় হবে এটাই স্বাভাবিক। স্বামী বিবেকানন্দ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সময়টা ছিল ধর্ম নিয়ে ভাবনাতরঙ্গের

যুগ। আর ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব এতই সম্পৃক্ত যে মেধাবী মন দর্শনচর্চায় আকৃষ্ট না হয়ে পারত না। স্বামীজী পাশ্চাত্যশিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন, অবশ্য তৎকালীন কলকাতায় যতটা পাওয়া সম্ভব ছিল। ছাত্রজীবন থেকে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন দর্শনে, একটি দর্শন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত হন।[৫] এফ. এ. পড়ার সময় ন্যায়শাস্ত্রের যত ইংরেজী বই এখানে পাওয়া যেত, যেমন, হোয়ায়েটলি, জেভনস, মিল—এদের বই পড়েন। এফ. এ. পরীক্ষার পর পড়েন ডেকার্টের অহংবাদ, হিউম ও স্পেনসারের অজ্ঞেয়বাদ প্রভৃতি। জার্মান দার্শনিকদের প্রশংসা শুনেছিলেন বলে সময় করে নিয়ে কান্ট, ফিক্‌টে, হেগেল, শোপেনহাওয়ার-এর মতের সঙ্গে পরিচিত হন।[৬] বরানগর মঠ-স্থাপনার কালে তিনি পড়েছিলেন অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' বিষয়ে পাঠ দেন গুরুভাইদের। তিনি লকের দর্শনও বিশেষভাবে পড়েন। লক ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের বস্তুবাদী দার্শনিক। ইংলণ্ডে রাজনীতি ও সমাজজীবনে যে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রভাবে ঘটেছিল, লক তাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। লক বলতেনঃ "মানুষের মনের সব ভাবেরই মূল হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতা। এর প্রভাবে যেমন ইন্দ্রিয়গত ভাব জন্ম নেয়, তেমনি সৃষ্টি হতে পারে মনোগত ভাব-ও। বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা দেয় জ্ঞানের কাঁচামাল, তার ওপর মনের তুলনা, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় জ্ঞান।" লকের কাছে জ্ঞানের মূল প্রশ্ন হচ্ছে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন। স্বামীজীর চিন্তার সঙ্গে এ ধারণার কিছু কিছু মিল চোখে না পড়ে পারে না। লক মানুষের আদিম অবস্থা থেকে সভ্যতার উত্তরণের স্তরসমূহের ওপর আলোকপাত করেন এবং বলেন সরকারের কর্তব্য ব্যক্তির অধিকার রক্ষা, হরণ নয়। যদি রাষ্ট্র বা সরকার এ দায়িত্ব পালন না করে তাহলে নাগরিকের অধিকার থাকে সামাজিক ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটানোর। স্বামীজী চর্চা করেন প্লেটোর তত্ত্বও। মহেন্দ্রনাথ ও অভেদানন্দকে তিনি পড়িয়েছিলেন প্লেটোর 'ফিডন'। উবেরওয়েগের দর্শনের ইতিহাস, কান্টের লেখা এর আগেই পড়া হয়ে গিয়েছিল। একবার প্লেটো-র বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি গ্রীক ও জার্মান দর্শন শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে তুমুল আলোচনা করেছিলেন মহেন্দ্রনাথের কাছে। হারবার্ট স্পেনসার ছিলেন ইংলণ্ডের প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ মনোবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক। স্পেনসার বলেছিলেনঃ 'বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে আছে সীমাবদ্ধতা, তাই বিজ্ঞানের পক্ষে অস্তিত্বের রহস্য উদ্ধার সম্ভব নয়।' তিনি অবশ্য বস্তু ও গতির বিবর্তন স্বীকার করতেন। এই স্পেনসারের চিন্তায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু। উপেন্দ্রের ব্যবসার প্রয়োজনেই তিনি হারবার্ট স্পেনসারের 'এডুকেশন' বইটি অনুবাদ করে দেন।[৭] নিবেদিতাকে তিনি বলেছিলেন, দুঃখদারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামের কালে এই অনুবাদ তাঁকে করতে হয়েছিল। বইটি অনুবাদের প্রার্থনা জানালে স্পেনসার জানিয়েছিলেনঃ 'আপনার মতো ইংরেজী রচনা আমি ইতিপূর্বে তো দেখিনি, সুতরাং আপনার অনুবাদে আনন্দিত হব।' জনৈক বিদেশিনীর স্মৃতিকথায় আমরা পাই পাশ্চাত্য দর্শন ও বাইবেলে তাঁর অসামান্য অধিকারের কথা। সেখানে আসা বিদ্বজ্জনবর্গ যখন চ্যালেঞ্জের সুরে স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলতেন, জিজ্ঞাসা করতেন; তখন "In upholding his side of the argument he quoted English philosophers

and writers on religious subjects. Even the poets he seemed to know thoroughly, quoting Wordsworth and Thomas Gray..."[৮] গ্রীক সাহিত্য সম্পর্কে স্বামীজী ছিলেন সচেতন দৃষ্টির অধিকারী। গ্রীসের সাফল্যের ও সীমাবদ্ধতার হেতু যেমন তিনি চমৎকারভাবে দেখান, তেমনি গ্রীক মনের আনুগত্য স্বীকার করে ইউরোপীয় মন কিভাবে বস্তুবদ্ধ ও জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠেছে সেকথাও বলেন। মানবশরীরই গ্রীকের অর্চনার বস্তু, সেকথা যুবকদের শরীর গঠনপ্রসঙ্গে উচ্চারণের পিছনে কাজ করে যায়।

পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে যাঁর এই অসীম অধিকার তিনি যে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের একজন অভিজ্ঞ কাণ্ডারী হবেন এটাই স্বাভাবিক। রামায়ণ, মহাভারত, মুগ্ধবোধের বাল্যচর্চার কোন্ ফাঁকে ফাঁকে পড়া হয়ে গিয়েছিল নানা পুরাণ। কলেজে উঠেই প্রধান হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করেছিলেন এবং অনুশীলনের উপযোগী সংস্কৃত শিখেছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্পের পর কালীপ্রসাদ ও দুয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে শুরু করেন গভীরভাবে সংস্কৃত চর্চা। তখন সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত এই ষড়দর্শনে তাঁর পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছিল। গীতা, উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত—সবই মূল ধরে আলোচনা হত। স্বামীজী বরানগর মঠে সংস্কৃত চর্চার জন্য প্রমদাদাস মিত্রের কাছে চান কিছু সংস্কৃত বই, তার মধ্যে ছিল পাণিনির ব্যাকরণ। তিনি জয়পুরে এক সুপণ্ডিত বৈয়াকরণের কাছে পড়েছিলেন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী। পরিব্রাজক জীবনে গভীর যত্নে পড়েছেন পতঞ্জলির মহাভাষ্য। রাজযোগ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনাতে এই পাঠ সাহায্য করে। পোরবন্দরের বিখ্যাত বেদজ্ঞ শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গের কাছে তিনি পতঞ্জলির মহাভাষ্য পাঠ সমাপ্ত করেন। সে সময় স্বামীজীকে নানা স্থানে দেখা গেছে সংস্কৃতে কথা বলতে। পণ্ডিত বঙ্কীশ্বর শাস্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে সংস্কৃত ব্যাকরণে তিনি নিখুঁত জ্ঞানের অধিকারী। এই ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ছাড়া শাস্ত্রের গভীরে প্রবেশলাভ ছিল অসম্ভব।

আমাদের অবাক লাগে একথা শুনে যে তরুণ বয়সে স্নায়ু ও মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যপ্রণালী জানার জন্য বন্ধুদের সঙ্গে তিনি যেতেন মেডিকেল কলেজে। শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থপাঠেও করেন মনোনিবেশ। বরানগর মঠে থাকার সময় পড়েন ফিজিওলজি, প্যাথলজির বই। ডারউইন তো পড়া ছিলই, পড়েছিলেন পেস্তালাৎস্কির শিক্ষাতত্ত্বও। হয়তো এই বিষয় অনুধ্যান তাঁর কোনও তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটায়নি। কিন্তু এক সর্বতোমুখী, সামগ্রিক মনুষ্যত্ব রচনায় সাহায্য করেছিল নানাভাবে, একথা অস্বীকার করা যায় না। যৌবনে বিজ্ঞানচেতনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন গভীরভাবে ; ধর্মচেতনা ও বিজ্ঞানচেতনার এই সমন্বয় আরেকবার স্পেনসারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ধর্মভাবুক স্বামীজীর বিজ্ঞানপ্রীতি প্রকাশ পায় বিদ্যুৎবিজ্ঞানী নিকোলা টেস্‌লা-র সঙ্গে কথোপকথনে।

স্বামীজী ধর্মদর্শন ও ভারতীয় জীবনতত্ত্বের বিশিষ্ট প্রবক্তা হলেও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল ছোটবেলা থেকে। কথাবার্তায় পরিহাসে সাহিত্যপ্রসঙ্গ প্রায়ই ব্যবহৃত হত। পরীক্ষার বই পড়ার চেয়ে বাইরের বই পড়ার দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। তাই উপন্যাস, নাটক, মাসিক পত্রিকা, খবরের কাগজ যা পেতেন কিছুই বাদ দিতেন না। বিবেকানন্দের সহপাঠী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁকে দর্শনবিষয়ক বই ও শেলীর কাব্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। শেলীর রচনার তিনটি বিষয় তরুণ নরেন্দ্রকে আকৃষ্ট করে। তা

হল—প্রজ্ঞাময় সৌন্দর্যতত্ত্বের বন্দনা, নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বপ্রেমের তত্ত্ব এবং গৌরবদীপ্ত চিরশ্রেয় মানবসমাজের ভাবদর্শন। মহেন্দ্র দত্ত আমাদের জানান মিল্টনের লেখা ছিল নরেন্দ্রের খুব প্রিয়। তিনি মিল্টনের কাব্য থেকে মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতেন। 'সর্বাবয়ব বেদান্ত' বক্তৃতায় কবিতার ভাষাপ্রসঙ্গে অন্ধকার বর্ণনার তিনটি উদাহরণ তিনি উপস্থিত করেন। তা হল—(ক) ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে' (খ) কালিদাসের সূচীভেদ্য অন্ধকার এবং (গ) মিল্টনের 'No light but rather darkness visible'.[৯] শেক্সপীয়রের বইগুলোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল যথেষ্ট। আমেরিকায় বক্তৃতার সময় আমরা 'রোমিও জুলিয়েট' 'এ মিড সামার নাইটস ড্রিম' থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে দেখি। বায়রণ খুব বেশি পড়তেন, হয়তো তার উদ্দীপনাময়তার জন্য। বায়রণ তো সেখানে নবীনচন্দ্র এবং আরও অনেককে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন তাঁর বিশেষ প্রিয় কবি—"Wordsworth was to him the fixed star of the poetic firmament." প্রকৃতি থেকে প্রসঙ্গ নির্বাচন, অনাগারিক জীবনপ্রিয়তা, তাদের মর্যাদা ও স্থিতির কথাকে তুলে ধরা, vivid sensation-এর ধারক ভাষাকে কবিতার ভাষা করে তোলার অভীপ্সা স্বামীজীর মনে আনুকূল্য পায়। 'Tintern Abbey' (1798) কবিতায় কবির প্রকৃতি প্রেম কিভাবে sensuous animal passion থেকে moral influence-এর স্তর পার হয়ে শেষ পর্যন্ত mystical communion-এ পৌঁছায় তা পাঠক লক্ষ্য করেন। Michael কবিতায় প্রকৃতির যে আরোগ্যদাত্রী ভূমিকার কথা পাই, Lucy poems-এ প্রাত্যহিকের ভাষাকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার দেখি তা কি স্বামীজীও নানা জায়গায় নানাভাবে বলেননি ? শ্রীপ্রমথনাথ বসু লিখেছেন ঃ ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থকেই তিনি কাব্যগগনের ধ্রুবতারা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং উক্ত কবির উচ্চভাবপূর্ণ কবিতার অধিকাংশ স্থলই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। এই ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার সূত্রেই জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে এফ. এ. পড়ার সময় অধ্যক্ষ হেস্টির বাখ্যানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভাবে কবির ভাবসমাধির কথা শুনেছিলেন। অধ্যক্ষ হেস্টি বলেন ঃ 'চিত্তের পবিত্রতা ও বিষয়বিশেষে একাগ্রতা কোনও কোনও বিরল ব্যক্তিত্বের ভাবসমাধি ঘটায়।' উদাহরণ হিসেবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধির উল্লেখ করেন।[১০] বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' তাঁর ভালভাবে পড়া ছিল।

পরিব্রাজক জীবনে বেলগাঁওয়ের ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্র তাঁকে ডিকেন্সের 'পিকউইক পেপারস' থেকে একটানা দু-তিন পাতা মুখস্থ বলতে শুনেছেন। এছাড়া ডিকেন্সের অন্য কোনও উল্লেখ পাই না। জুল ভের্ন-এর কল্পবিজ্ঞান কাহিনী এবং কার্লাইলের Sartor Resartus পড়তে শেখান এই হরিপদবাবুকে। তৎকালীন ভারতবর্ষে জুল ভের্ন-এর এই সমাদর আমাদের রীতিমত বিস্মিত করে। টলস্টয় তাঁর শেষ জীবনে বিবেকানন্দের লেখায় যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সেকথা রোলাঁর সঙ্গে কথোপকথন বিবরণে দিলীপকুমার রায় উল্লেখ করেন তাঁর 'তীর্থঙ্কর' বইতে। আলেকজাণ্ডার শিফম্যান জানান টলস্টয় শঙ্করাচার্য, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ চিন্তাধারার গভীর অনুশীলন করেন। ১৮৯৬ সালে ডায়েরিতে তিনি নিউ ইয়র্কে দেওয়া বিবেকানন্দের বক্তৃতামালা পড়ে মুগ্ধতার কথা লেখেন। এছাড়াও বিবেকানন্দের নানা প্রবন্ধ পাঠে তাঁর ভাল লাগার কথা আমরা জানি।

কিন্তু বিবেকানন্দ কি টলস্টয় পড়োছলেন? তাঁর মৃত্যুর (১৯০২) পূর্বেই ওয়ার অ্যাণ্ড পীস (১৮৬২—৬৯), আনা কারেনিনা (১৮৭৫—৭৭), রেজারেকশন (১৯০০) বেরিয়েছে। যেটুকু জেনেছি, ইংরেজী ছাড়া, গ্রীক মহাকাব্য ছাড়া, জুল ভের্ন ছাড়া ইউরোপীয় সাহিত্য পড়া তাঁর সম্ভব হয়নি অথবা সম্ভব হলেও তার কোনও বিবরণ আমরা পাইনি। হার্ভার্ডের প্রখ্যাত অধ্যাপক আমেরিকান দার্শনিক উইলিয়ম জেমসের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয় মিসেস বুলের বাড়িতে। আহারের পর উভয়ের সুদীর্ঘ আলোচনা হয় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। যদি দর্শন ও অন্যান্য চিন্তার প্রাঙ্গণে তাঁর স্বচ্ছন্দ পাদচারণা না থাকত তাহলে এ কথোপকথন এগোতে পারত না। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন জেমস তাঁর 'The varieties of Religious Experience' এবং 'Pragmatism' বইতে।[১১]

এবার আসা যাক স্বদেশীয় সাহিত্যপ্রসঙ্গে। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসঙ্গ নানা সময় মেলে তাঁর কথাবার্তা ও লেখায়। রাধাকৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে তাঁকে নানা সময়েই ব্যাখ্যা করতে হয়েছে উদ্ধৃতি সহযোগে। মাতোয়ারা হয়ে যেমন গিরিশের বিল্বমঙ্গলের উন্মত্ত বাসনাব্যাকুল প্রেমার্তির গান গেয়েছেন, তেমনি গেয়েছেন জয়দেবের গীতগোবিন্দের গান। পারসীক কবিতার বিস্তৃত আলোচনা করতে গিয়ে বেপরোয়া উল্লাসে বলে ওঠেন: 'দ্যাখো যে মানুষ প্রেমসঙ্গীতের সমাদর করতে প্রস্তুত নয়, তার মূল্য আমার কাছে কানাকড়িও নয়।'[১] রাসলীলায় যখন কৃষ্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন তখন গোপীরা সুগভীর কৃষ্ণভাবনায় নিজেদের কৃষ্ণ বলে অনুভব করে। এই ভাবটি বোঝানোর সময় তিনি উদ্ধৃত করেন সুফী কবিতা। এখানে তাঁর কোনও অচ্ছুৎ মনোভাব ছিল না, বোঝা যায়। মধ্যযুগের আখ্যান কবিদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতেন কবিকঙ্কণকে। বরানগর মঠে থাকতে বিবেকানন্দ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর নানা সংস্কৃত বই পড়ে বুঝিয়ে দিতেন। বইগুলোর মধ্যে ছিল মৃচ্ছকটিক, অভিজ্ঞানশকুন্তল, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি। মাদ্রাজে থাকতেও আলোচনা করতেন কালিদাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, শেক্সপীয়র, বায়রণ, হেলেন, দ্রৌপদী ও পাণ্ডব নিয়ে। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য, সংস্কৃত কাব্য ব্যাখ্যানের প্রকৃতির কোনও বিবরণ আমরা পাই না।

তাঁর অল্পবয়সে বাংলা বইয়ের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তবে উল্লেখযোগ্য লেখার সঙ্গে তাঁর পরিচয় অবশ্যই ছিল। যুগসন্ধির কবি ভারতচন্দ্রের আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। স্বামীজী সদানন্দের সঙ্গে কৌতুকচ্ছলে এবং অন্যের সঙ্গেও বিদ্যাসুন্দর উদ্ধৃত করতেন, হীরা মালিনীর কথা নিয়ে কৌতুক করতেন, মানসিংহের যশোর যাত্রা অংশটি আবৃত্তি করতেন খুব সুন্দর করে। তবে এ কাব্যের দুর্নৈতিকতার কঠোর সমালোচনাও তিনি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বইপত্র তিনি পড়েছিলেন যত্ন করে। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষদের তিনি বঙ্কিমের বই পড়ার প্রেরণা দেন। সে কি বঙ্কিমের স্বাদেশিকতা ও উজ্জীবন মন্ত্রের জন্য? বঙ্কিমের দেশমাতৃকাবন্দনা, স্বদেশপ্রাণতা, উজ্জীবনের আহ্বান, পরানুকরণ বিষয়ে শ্লেষ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার সারাৎসার গ্রহণের ঔদার্য প্রভৃতির দিক থেকে এই দুই চিন্তানায়কের চিন্তনসাদৃশ্য কি চোখে পড়ে না? যদিও চলতিভাষা ব্যবহার, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, ধর্মীয়-মনোভাব বিষয়ে দুজনের বৈসাদৃশ্যও কম নয়। 'মেঘনাদবধকাব্য' ছিল স্বামীজীর একান্ত প্রিয়। কোনও হিন্দু গোঁড়ামি দ্বারা তিনি আক্রান্ত হননি, যা সমকালে

কোনও কোনও বিখ্যাত লোকেদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। তাঁর ভাষায়ঃ 'মেঘনাদবধকাব্য বাংলা ভাষার মুকুটমণি।' এ কাব্যের মতো দ্বিতীয় কাব্য বাংলা ভাষায় নেই। সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য পাওয়া যাবে না বলে তাঁর মনে হয়। মাইকেলের বিদ্রোহী মনোভাব, ধর্মনিরপেক্ষ স্বাদেশিকতাবোধ, পরানুকরণের পরিবর্তে পৌরুষ স্বামীজীর ভাল লেগেছিল। এই কাব্যে যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হবার পর শোকাকুলা মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছেন, শোকসংযত মহাবীর কিন্তু প্রতিবিধানে কৃতসংকল্প, সেই সপ্তম সর্গ তাঁর মতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ। লক্ষ্মণের কাপুরুষতা, বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলার সময় তাঁর মুখ ঘৃণা ও দুঃখে রক্তবর্ণ হয়ে উঠত। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ঠিকই বলেনঃ 'মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের বীররস স্ফুরণ উৎসাহ দেয় স্বামীজীকে।' তবে স্বামীজী এও বলেনঃ 'এর নতুন ছন্দ ওজস্বিনী ভাষা কি সাধারণে বুঝবে?' (স্বামী-শিষ্য সংবাদ, উত্তরকাণ্ড)। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র কথা তিনি প্রায়শই তুলতেন। একটু হাসিতামাসার কথা উঠলেই 'সধবার একাদশী' থেকে সংলাপ তুলে পরিহাস করতেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, দীনবন্ধু ও ঈশ্বরগুপ্ত নরেন্দ্রের গৌরমোহন মুখার্জির গলির বাড়িতে সর্বদা যাতায়াত করতেন। নরেন্দ্রনাথের এক ঠাকুর্দার সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্ত ভাই পাতিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'সবিতা সুদর্শন' কাব্যখানি তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন, ঐ ছন্দটি তাঁর ভাল লাগত। রামদাস সেনের 'ভারত রহস্য' গ্রন্থটিও তিনি পছন্দ করতেন। সমকালীন নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে স্বামীজীর ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। গিরিশের অধ্যাত্ম নাটকগুলি যা রামকৃষ্ণ প্রভাবে উদ্দীপিত, তাঁর ভাল লাগত। গিরিশের 'দক্ষযজ্ঞ', 'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধচরিত' নাটকের গান প্রায়ই গাইতেন। বিল্বমঙ্গল নাটকটি ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। বস্তুতপক্ষে অধ্যাত্ম-ভাবপ্রকাশে বিল্বমঙ্গলের সাফল্যের দিকেই তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা স্বামীজী নিশ্চয়ই পড়েছিলেন। তাঁর কয়েকটি গানের উল্লেখ আমরা সহজেই পেয়ে যাই। ডঃ কালিদাস নাগ বলেনঃ "রাজনারায়ণ বসুর মেয়ে লীলাদেবীর সঙ্গে সঞ্জীবনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের বিয়ে উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি', 'জগতের পুরোহিত তুমি', 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে' প্রভৃতি গান রচনা করে কয়েকজন গায়ককে তালিম দেন, যাদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন।"[১২] প্রবোধ সেন জানান, নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের যেসব গান প্রায়ই গাইতেন সেগুলি হল—আমরা যে শিশু অতি ক্ষুদ্র মন, গগনের থালে রবি-চন্দ্র-দীপক জ্বলে, তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ।[১৩] বৈষ্ণবচরণ বসাকের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ যখন 'সঙ্গীত কল্পতরু' সম্পাদনা করেন তখন সে বইতে তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এসব থেকে মনে হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর ভালমতই পরিচয় ছিল। রবীন্দ্র রচনাও তিনি পাঠ করেছেন, যদিও সেসব সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ আমাদের জানা নেই।

স্বামীজীর শিল্পবিষয়ক অধ্যয়নের দিকটি সুবিদিত নয়। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাঁর সমকালীন প্রত্নশিল্পবিশেষজ্ঞ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনার সঙ্গে তাঁর সবিশেষ পরিচয় ছিল। উড়িষ্যার ভাস্কর্যের সঙ্গে না হলেও দক্ষিণ ভারতীয়

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল নিবিড়। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দু ও মুঘল স্থাপত্যের তিনি করেছেন প্রভূত প্রশস্তি। নিবেদিতা তাঁর 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' বইতে স্বামীজী তাঁদের কিভাবে ভারতীয় শিল্পকীর্তি ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন বুঝিয়েছিলেন তা উল্লেখ করেছেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার শিল্প সম্পর্কিত অধ্যায়টি তাঁর ভালভাবে পড়া ছিল। ল্যুভরে গিয়ে (১৮৯৬) গ্রীক শিল্পকলার নিদর্শন যে পরীক্ষা করেছিলেন তার উল্লেখ আছে 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের পরিশিষ্টে অতিসংক্ষেপে। রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাতে স্বামীজী যেভাবে চিত্রবিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বলতে থাকেন, তা স্পষ্ট করে এ বিষয়ে স্বামীজীর আগ্রহ ও নিবিড় অধ্যয়ন। ত্রিবাঙ্কুরের রবিবর্মা ছিলেন সেকালের এক প্রখ্যাত ভারতীয় চিত্রকর। অনেকেরই হয়তো জানা নেই শিকাগো বিশ্বমেলায় (যার অন্তর্গত ধর্মমহাসভা) ১৮৯৩-তে তিনি দশটি ছবি পাঠান যা দর্শক কর্তৃক সমাদৃত ও পুরস্কৃত হয়। এই প্রখ্যাত চিত্রকরের ছবির সঙ্গে স্বামীজী যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। স্বামীজী মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এই ছবির দৃষ্টিনন্দনতাকে স্বীকার করেও এর কিছু ত্রুটির উল্লেখ করেন। রবিবর্মা স্বীকার করেন, স্বামীজী যে ত্রুটি দেখান তা ইতিপূর্বে কেউ দেখাতে পারেননি।

এই অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা থেকে আমরা বুঝতে পারি—(ক) স্বামীজীর পড়াশোনার বিষয় ছিল বহুমুখী যা উনিশ শতকী মনোভঙ্গিকে প্রকাশ করে। (খ) তিনি শুধু ধর্মের নয়, প্রহসনও পড়তেন, ফরাসী সঙ্গীত থেকে অয়েল পেন্টিং কোনও বিষয়ে তাঁর অনাগ্রহ ছিল না। (গ) যে রচনা বীর্যবত্তাসম্পন্ন, ওজোগুণময় সেটাই তাঁর বিশেষ ভাল লাগত। (ঘ) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোনও একটির প্রতি তাঁর অহেতুক অনুরাগ বা বিরাগ ছিল না। (ঙ) জ্ঞান ভক্তি কর্মের সমন্বয় যদি হয় তাঁর চলিষ্ণু জীবনের বৈশিষ্ট্য, এ প্রবণতা ধরা পড়েছিল তাঁর পঠনেও।

অগ্রজ নরেন্দ্রনাথ

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

নান্দী

তখন ১৮৯৬ সাল। ইংলণ্ডে মিস্ মূলারের বাড়িতে স্বামীজী অতিথি। সঙ্গে স্বামী সারদানন্দ ও মহেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু স্থানাভাবে তাঁর থাকার জায়গা হয়েছে পাশেই এক কটেজে।

একদিন দুপুর এগারোটা-বারোটা নাগাদ মহেন্দ্রনাথ সে বাড়ির উপরের ঘরে বসে চিঠি লিখছেন। এমন সময় ভেজানো দরজায় ঠক্ ঠক্ করে টোকা মারার আওয়াজ হল। স্বামীজী এসেছেন। মহেন্দ্রনাথ সসম্ভ্রমে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। স্বামীজী বললেনঃ 'বোস্ বোস্'। তারপর নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেনঃ 'কি রে, কী খেয়েছিস?' অর্থাৎ দুপুরের আহার। তারপর টুকটাক আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। মুখ বদলাবার জন্য মাঝে মাঝে ডিমের পোচ বা অমলেট খেতে বললেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, চুল সবকিছু এদেশে পরিষ্কার রাখা চাই। স্বামীজীর সবদিকে নজর। প্রশ্ন করলেনঃ 'স্নান করেছিস?'

বেচারি মহেন্দ্রনাথ। বিদেশে এসে থেকে তিনি তো অনেক কিছুরই থৈ পাচ্ছেন না। বললেনঃ 'কী করে নাইব, কল-চৌবাচ্চা যে নাই।' স্বামীজী হেসে ফেললেন। স্নেহের সে হাসি। তারপর বাথটবে স্নানের পদ্ধতিটা শিখিয়ে দিলেন।

যাবার আগে কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তার গলায় বললেনঃ 'আমি বোধহয় শীঘ্র লণ্ডনে চলে যাব, শরৎ-ও (স্বামী সারদানন্দ) সঙ্গে যাবে, তা তুই একা থাকতে পারবিনি?' দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নেমে গিয়েছিলেন নীচে। আবার কী মনে করে ফিরে এসে বললেনঃ 'চিঠি লেখা হলে ও বাড়িতে যাস্।'[১]

না, আমরা যে সন্ন্যাসী স্বামীজীকে চিনি তার সঙ্গে এই স্বামীজীকে যেন ঠিক মেলানো যাচ্ছে না। যে সময়ের কথা বলছি তার প্রায় বছর আড়াই আগে শিকাগোর মহাসভায় তাঁর বিপুল বিজয়ের সূচনা হয়ে গেছে। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে, তাঁর সঙ্গে অল্পক্ষণ কথা বলতেও তখন শিক্ষিত বিদেশী নারী-পুরুষদের কী আকুল আগ্রহ! সমগ্র আমেরিকা ইউরোপের বহু বিদ্বজ্জনের পরম শ্রদ্ধার আসনে তখন তাঁর স্থান।

কিন্তু এখানে স্বামীজীর অন্য রূপ। অন্য চেহারা। তাঁর যুবক ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত মাত্রই কিছুদিন হল সাগর পেরিয়ে কলকাতার চেনা-জানা জগৎ থেকে চলে এসেছেন খোদ ইংলণ্ডে। এখানে মহেন্দ্রনাথের আপনার জন বলতে ঐ এক স্বামীজী। তাঁকে এখানের পরিবেশে মানানসই করে তোলার দায়িত্ব স্বামীজীর আছে বৈকি।

তেজোদৃপ্ত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পরিচয় অতিক্রম করে তাঁর এ এক অন্য ভূমিকা। তিনি অগ্রজ।

মহেন্দ্রনাথ তাঁর 'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ' রচনায় মন্তব্য করেছেন : "মহাপুরুষের একটি প্রধান লক্ষণ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে—A great man is one who can transfigure himself into various forms." স্বামীজীরও বহু রূপের অন্যতম ছিল এই স্নেহশীল অগ্রজের রূপ।

অগ্রজ হিসেবে তাঁর এই যে ভূমিকা, তার অন্বেষণে আমরা দুটি ধারায় আলাদা-আলাদা ভাবে এগোব।

প্রথম ধারায় দেখে নেওয়া দরকার অগ্রজরূপে তিনি কেমন ভাবে নিজেকে ধরা দিয়েছেন। অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কে যাঁদের তিনি অগ্রজ তাঁরা তাঁকে কী চোখে দেখেছেন, কেমন স্বীকৃতি দিয়েছেন ইত্যাদি।

বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবীর মোট চার পুত্র ও ছয় কন্যা। এর মধ্যে এক পুত্র ও দুই কন্যা শৈশবেই মারা যায়। নরেন্দ্রনাথের দিদি হারামণি এবং দুই বোন কিরণবালা ও যোগেন্দ্রবালাও বেশি বয়স অবধি বাঁচেননি; যথাক্রমে বাইশ, ষোল এবং বাইশ বছর বয়সেই তাঁদের মৃত্যু ঘটে।[২]

সুতরাং নরেন্দ্রনাথের স্বামী বিবেকানন্দরূপে সামগ্রিক উত্তরণ দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন একমাত্র তাঁর এক দিদি স্বর্ণময়ী (অথবা স্বর্ণবালা) দেবী আর দুই ভাই মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ।

তাঁদের অগ্রজের সম্পর্কে মূল্যবান, তথ্যদীপ্ত আলোচনা করার যে সুযোগ এই দুই ভাই পেয়েছিলেন, সুখের কথা, তার সদ্ব্যবহার তাঁরা দুজনেই করেছেন পূর্ণ আন্তরিকতায় এবং কোনও সন্দেহ নেই, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে মেধা বা মনস্কতায় তাঁদের যোগ্যতাও প্রশ্নাতীত।

কোনকিছুকে সঠিকভাবে দেখতে গেলে একটা নূন্যতম ব্যবধান প্রয়োজন—নিকটজনের লেখা জীবনীমূলক রচনা সম্পর্কে এ এক বহু ব্যবহৃত বিরূপ মন্তব্য। কিন্তু সেই নিকট পর্যবেক্ষণে নৈকট্যের উষ্ণস্পর্শকে তো অস্বীকার করা যাবে না। একজন মানুষকে জানতে, বুঝতে, অনুভব করতে তার প্রয়োজনও অনেকখানি।

অগ্রজ হিসেবে স্বামীজীর এই যে রূপকে আমরা ধরতে চাইছি তাতে তাঁর এই দুই ভাইয়ের মূল্যায়ন আমাদের এক বড় অবলম্বন। তার ওপর ভরসা রেখেই এই অন্বেষণের প্রথম ধারা।

আর দ্বিতীয় ধারায় আমরা দেখব অগ্রজ হিসেবে স্বামীজীর ভূমিকা—বিপুল কর্মপ্রবাহে সদা ব্যস্ত থাকার মধ্যেও মা এবং ভাইদের প্রতি তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয়। সংসারের প্রয়োজনে তিনি কী ভেবেছেন, কতটুকু এগিয়ে আসতে পেরেছেন। অগ্রজ

নরেন্দ্রনাথের সে আর এক উজ্জ্বল রূপ।

মহেন্দ্রনাথের চোখে

'আমাদের ঠাকুরদালান উঠান হইতে এক মানুষ উঁচু ছিল। উঠান হইতে ঠাকুরদালানে উঠিতে ছয়টি ধাপ বা সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হইত। বীরেশ্বর রাজা হইয়া সকলের উঁচু ধাপটিতে বসিত এবং সম্পর্কে ও বয়সে বড় অপর ছেলেরা মন্ত্রী ও পারিষদ হইয়া তলার তলার ধাপে বসিত। কেহ রাজার সহিত এক আসনে বসিত না। একটি ছেলে চোর হইত এবং আর কতকগুলি ছেলে পাহারাওয়ালা হইত এবং আর আর ছেলেরা কোটাল ও অন্যান্য কর্মচারী হইত। আমি ঠাকুরদালানের পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতাম নিরপেক্ষ দ্রষ্টারূপে ও কে কোথায় লুকাইতেছে মাঝে মাঝে বলিয়া দিতাম।'[৩] মহেন্দ্রনাথ তাঁদের ছেলেবেলার রাজা-কোটাল খেলার স্মৃতিচারণ করেছেন।

তাঁর দাদা বীরেশ্বর বা বিলে এই খেলার সময় কেমন প্রকৃত রাজার মতো তেজোদৃপ্ত 'মহাগম্ভীর ও স্বতন্ত্ররূপ ধারণ' করত এবং তার চেয়ে সম্পর্কে ও বয়সে বড় অন্য ছেলেরা কেমন নির্দ্বিধায় কয়েক ধাপ নীচে থেকে তার নির্দেশ পালন করত, সে কথা মহেন্দ্রনাথ জীবন্তভাবে এঁকেছেন। তাঁর অগ্রজের অন্যকে পরিচালন করবার ক্ষমতা যে শৈশব থেকেই তৈরি ছিল তা এই খেলার বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট।

তাঁদের এই খেলার কথা শেষ করে মহেন্দ্রনাথ রহস্য করেছেনঃ 'আশ্চর্যের বিষয় যে খেলায় যে যেরূপ সাজিয়াছিল ভবিষ্যৎ জীবনে সেইরূপই হইয়াছিল।' অন্য সঙ্গীদের কথা আর জানা সম্ভব নয়, তবে এটুকু বলা যায়, অন্তত দুজনের ক্ষেত্রে একথা অবশ্যই সত্যি। একজন তো স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ। আর অপর জন মহেন্দ্রনাথ নিজে।

তাঁর অগ্রজের সমগ্র জীবনের যত ক্রিয়াকলাপের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী থেকেছেন, সর্বত্রই তাঁর ভূমিকা ঐ 'নিরপেক্ষ দ্রষ্টা'র। ঘটনার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত না করে একটু আলাদা থেকে তিনি তার বর্ণনা করে গেছেন। স্বামীজী সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথের যে অনুধ্যান তার বৈশিষ্ট্য বা ঐশ্বর্য এখানেই।

এই কষ্টসাধ্য নির্লিপ্তি আনা মহেন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কারণ তিনি মূলত দার্শনিক। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি তাঁর অগ্রজ এবং রামকৃষ্ণ-অনুগত অন্যান্য যুবকবৃন্দের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসেন। উচ্চশিক্ষার্থে তিনি বিলেত যান। সেখানে ব্রিটিশ মিউজিয়মে পড়াশোনা আর তাঁর দাদার বক্তৃতা ও আলোচনার নিয়মিত শ্রোতা হওয়া—এই ছিল তাঁর জ্ঞানার্জনের প্রধান সূত্র। এরপর তিনি পরিব্রাজকরূপে ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া মহাদেশে দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ করে যখন দেশে ফিরলেন, তার অল্পদিন আগেই বিবেকানন্দ দেহ রেখেছেন।

স্বামীজীর জীবনের যে যে পর্যায়কে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন সেগুলি পরবর্তী কালে অত্যন্ত সজীবভাবে ধরে রেখেছেন তাঁর বইগুলিতেঃ 'স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী', 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' এবং স্বামী সদাশিবানন্দ (হরিনাথ ওদেদার বা ভক্তরাজ)-এর স্মৃতিচারণ-নির্ভর 'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ'।

মহেন্দ্রনাথের জন্ম ১ আগস্ট, ১৮৬৯ অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের চেয়ে তিনি সাড়ে ছয় বছরের ছোট। তাই বালক নরেন্দ্রের বিষয় জানতে গেলে তাঁর মতো নির্ভরশীল জীবনীকার আর কোথায়?

'স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী' জানার প্রয়োজন শুধু কৌতূহল আর কৌতুকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মহেন্দ্রনাথের ভাষায় 'বালকই বৃদ্ধ হয়, শুধু একটা পালিশ করা হয় মাত্র।'

মহেন্দ্রনাথ এই বালক নরেন্দ্রের যে ছবি এঁকেছেন সে সম্পর্কে বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর মন্তব্য অত্যন্ত মূল্যবান: "বিদ্যালয়ে শিশু বীরেশ্বর তাহার বিদ্যাবত্তার, স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিতেছে, খেলাধূলায় তাহার নেতৃত্ব, কৃতিত্ব ও ব্যক্তিত্ব দর্শাইতেছে, গল্প বলার দক্ষতায় অপর সকলকে মোহিত করিতেছে, যাত্রাগান দেখিয়া অবিকল নকল করিয়া কৌতুকানন্দ দিতেছে, এইসকল শিশুচরিত্র এই গ্রন্থে অপরূপভাবে রূপায়িত হইয়াছে। তিনি (মহেন্দ্রনাথ) নানা ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহার পিতা, পিতামহ, মাতা, মাতামহী, প্রমাতামহী প্রভৃতির গুণাবলী ও চরিত্র তথা বংশের বিশেষ বিশেষ ভাবধারা কিরূপে শিশু বীরেশ্বরের চরিত্রে প্রতিজ্জীবিত হইয়াছিল ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, যাহা উত্তরকালে নানাকারণে বিশেষরূপে পরিবর্ধিত হইয়া বিবেকানন্দ-চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছিল।"[৪]

এখানে একটা কথা খুব স্পষ্ট, বিবেকানন্দের মতো এক যুগন্ধর প্রতিভার বাল্যজীবনী লিখতে বসে মহেন্দ্রনাথ তাতে কোনও অলৌকিকত্বের চমক দেখাতে চাননি। বাস্তবিক অগ্রজ সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক আলোচনাতেই এই বিষয়টি তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। তাঁর দাদাকে এক রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে, এই জাগতিক ধুলো-বালির উপর দাঁড়ানো চরিত্র হিসেবেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

হয়তো সেইজন্য, যুবক নরেন্দ্রনাথ যখন ঈশ্বরসন্ধানে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পেলেন এবং নানান দৈবী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একে অপরের অন্তরঙ্গ হলেন, স্বামীজীর জীবনের সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের কথা মহেন্দ্রনাথ তেমনভাবে আলোচনা করাব উৎসাহ দেখাননি যদিও মহেন্দ্রনাথও তখন কলকাতাতেই।

আবার বোধ হয় সেই একই কারণে, ঘরোয়া আলোচনায় কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর করা প্রচলিত অর্থে কিছু 'আল্‌গা-মন্তব্য'কে উল্লেখ করা থেকেও মহেন্দ্রনাথ নিবৃত্ত হননি। তিনটি উদাহরণ দিই।

প্রথমটি শিকাগো মহাসভায় ভারত থেকে যাওয়া বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধি ধর্মপাল সম্পর্কে, 'লোকটি লাজুক, ভালমানুষ কিন্তু লেখাপড়া বিশেষ জানে না। একটু হুজুক করিতে ভালবাসে।'[৫] দ্বিতীয়টি থিওজফিক্যাল সোসাইটির মিসেস বেসান্ট সম্পর্কে, 'যদি ইচ্ছা করি তাহলে এই রাত্রেই বেসান্ট ও সমগ্র কাশীবাসীরা এই চরণতলে আসিয়া পড়িবে।'[৬] তৃতীয়টি খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারক সম্পর্কে, 'আমেরিকার কারবারী লোকগুলো যেমন টাকা টাকা করে বেড়ায়, ওদেশের পাদরীগুলোও তেমনি শুধু টাকা রোজগারের ফন্দি করছে।'[৭]

কোনও সন্দেহ নেই, স্বামীজী তাঁর সর্বজনস্বীকৃত সৌজন্যবোধের কারণে কখনই ঘনিষ্ঠগোষ্ঠীর বাইরে বা জনসমাগমে এমন মন্তব্য করতে পারেন না। সেইসঙ্গে এ কথাও

সত্যি, মহেন্দ্রনাথ উদ্ধৃত তাঁর এইসব তাৎক্ষণিক, ঘরোয়া উক্তি আবেগ-উত্তেজনার প্রকাশে নেহাতই মনুষ্যজনোচিত।

তিনি জানেন, এইসব ছোটখাট দুর্বলতা স্বামীজীর মতো প্রতিভাকে কোনও মতেই আবৃত করতে পারে না, পরন্তু এ থেকেই সেই মহান পুরুষকে মাটির আরও কাছাকাছি আনা যায়, তাঁকে ছোঁয়া যায়।

মহেন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "বিবেকানন্দ আকাশ হইতেও পড়েন নাই বা একদিনেও তৈয়ার হন নাই। জীবনে উচ্চে উঠিতে হইলে ধাপে ধাপে উঠিতে হয়।... জীবনের পথ অতীব কণ্টকাকীর্ণ—দুর্গম ও অন্ধকারময়। প্রত্যেককেই এই পথ দিয়া চলিতে হয়। কিন্তু একাগ্রতা ও আত্মনির্ভরতা থাকিলে সাধারণ লোকও অনেক উচ্চে উঠিতে পারে।"[৮] মহেন্দ্রনাথের অগ্রজ-চিত্রায়ণের মূল সূত্রটি এখানেই রয়ে গেছে। আমাদের চেনা-জানা পরিবেশ থেকে স্বামীজীর সু-উচ্চ উত্তরণ তাঁর কাছে তাই এক প্রতিভাধর, একাগ্রচিত্ত মানুষের নানা বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রামের ফল।

কেমন সে বাধা-বিঘ্ন, কেমনই বা সে সংগ্রাম?—প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ তার বিশ্বস্ত বর্ণনা রেখে গেছেন।

যেমন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পরে নরেন্দ্রনাথসহ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সন্ন্যাসী যুবকেরা এক বিরাট বিঘ্নের সম্মুখীন হন। বাধা আসে মূলত দুদিক থেকে—অর্থনৈতিক এবং নৈতিক।

রামচন্দ্র দত্ত, সুরেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ যেসব গৃহী ভক্তেরা এতদিন কাশীপুর উদ্যানবাটীর খরচ চালাতেন, ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁরা আর অর্থ দিতে রাজি হলেন না। তাঁরা প্রস্তাব দিলেন নরেন্দ্র-শরৎ-শশী-রাখাল সব যে যার বাড়ি ফিরে যাক।[৯]

এইসব সন্ন্যাসী গুরুভাইদের সবচেয়ে বড় ভরসা নরেন্দ্রনাথের ওপর। তাই সবচেয়ে বড় ঝাপটা সইতে হয়েছিল তাঁকেই। মহেন্দ্রনাথ এইকালে খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাঁর অগ্রজকেঃ "এই সময়টা নরেন্দ্রনাথের মানসিক ও শারীরিক কষ্ট দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। গুরুভাইদের লইয়া উচ্চ উদ্দেশ্য করিয়া এক মঠ স্থাপন করিলেন। সেখানে মহাকষ্ট—অনাহার, অনিদ্রা, সকলেই বিবস্ত্র, বিকট, মলিন, পাংশুগুণ্ঠিত এবং রাত্রে শয়ন ধরণীতলে।"[১০]

শুধু আর্থিক নয়। এই মঠ-স্থাপন নিয়ে নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গী গুরুভাইরা নীতিগত কিছু বিতর্কেও জড়িয়ে পড়লেন। রামকৃষ্ণদেবের গৃহী ভক্তরা নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সাধনা, শাস্ত্রপাঠ ও পূজাপদ্ধতির সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। একটা তাত্ত্বিক বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

বিস্ময়ের কথা, এই বিরোধের প্রসঙ্গেও মহেন্দ্রনাথ আশ্চর্যরকম নিরপেক্ষ। তাঁর নিজস্ব সমর্থনও নিশ্চিতভাবেই ছিল তাঁর দাদার দিকে। কিন্তু তাই বলে রামচন্দ্র দত্তদের ভক্তিবিনম্র বিবেচনাকেও তিনি সমান গুরুত্ব এবং সহানুভূতিতে তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন। যেমন, এক জায়গায় তিনি রামচন্দ্রকে উদ্ধৃত করেছেনঃ "যখন তাঁকে [শ্রীরামকৃষ্ণদেব] দর্শন করা গেছে ও তাঁর কথা শুনা গেছে তখন আবার অন্য পড়াশুনার আবশ্যক কি? তিনি পূর্ণব্রহ্ম, অবতাররূপে আসিয়াছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে ও তাঁহার কথা শুনিলেই

সব হবে; তপ-জপ ও শাস্ত্র পড়ার আবশ্যক নাই।"[১১]

যাই হোক, একদিকে চরম আর্থিক দুরবস্থা ও অপর দিকে গৃহী ভক্তদের সঙ্গে মতানৈক্য। তার সঙ্গে আবার যুক্ত হল সাধারণ মানুষের বিদ্রূপ আর উপহাস। যেহেতু নরেন্দ্রনাথই সন্ন্যাসী যুবকদের প্রতিনিধিস্থানীয় তাই তিনিই এসবের লক্ষ্য হলেন সবচেয়ে বেশি। মহেন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, কেউ বা বলতঃ "নরেন পাগলা হয়ে গেছে; কি বলে, কি কয়, কথার মাথামুণ্ডু নেই। শঙ্কর, উপনিষদ, পঞ্চদশী—ও আবার কি সব জিনিস হল। ঠাকুরদেবতার কথা নয়, যত সব বাজে কথা।" কেউ বা শুভানুধ্যায়ীর মুখোশে ব্যঙ্গ করতঃ "তাইত হে, নরেন্দ্র পাগল হয়ে বেরিয়ে গেল। এমন গানটা মাটি করে গেল; এত বচ্ছর গানটা শিখে গলা সেধে সব মাঠে মারা গেল।"[১২]

মহেন্দ্রনাথ গভীর সহানুভূতিতে তাঁর দাদা ও গুরুভাইদের সে সময়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেনঃ "... জোয়ান বয়সে যদিও নূতন বৈরাগ্যে মহাকঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন কিন্তু শরীর তাহা সহ্য করিল না। অনেকেই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন এবং গৃহাদি ও পিতামাতার নানারকম কষ্ট ও অনুনয়বাক্যে অনেকেই তখন বাড়ি ফিরিয়া যাইতে স্থির করিলেন। সম্মুখে কোনও প্রত্যক্ষ জিনিস দেখিতে পাইতেছেন না, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, দুঃসহ কষ্ট দিবারাত্র সহ্য করিতেছেন, অনাহারে ও অনিদ্রায় জপধ্যান, এইজন্যই মনটা বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। শশী মহারাজ বলিলেন—নরেন, আর ত কষ্ট সহ্য কর্তে পারি না, সকলকে নিয়ে কি করলে?"[১৩]

নরেন্দ্রনাথ কিভাবে সবার মনকে আবার শান্ত করার চেষ্টা করলেন সে নাটকীয় ঘটনার কথাও মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ বললেনঃ 'শশী, একখানা বাইবেল দে।' চোখ বন্ধ অবস্থায় বাইবেলটি খুলে এক জায়গায় আঙুল রাখলেন নরেন্দ্রনাথ। চোখ খুলে দেখেন সেখানে লেখা রয়েছে, "No man, having put his hand to the plough, and looking back, is fit for the Kingdom of God." সবাই চমকে উঠলেন। যেন নতুন আশার পথ পাওয়া গেছে। নরেন্দ্রনাথ তাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিলেনঃ "ওরে, তিনি বলতেন খানদানী চাষা একক্ষেপ যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে সে কি দোকানপাট করে? না দ্বিতীয়বার চাষ করে?" আত্মবিশ্বাসী গলায় নরেন্দ্রনাথ বললেনঃ "অনেকবার জীবন ত গিয়াছে, অনেকবার জন্মেছি, মরেছি, আর একবার না হয় ইচ্ছা করে জীবনটা নাশ করি, ব্যর্থ করি। ডুবে দেখা যাক তলা জলের কত নীচেতে।"[১৪]

এই শেষ দেখবার মরিয়া মানসিকতা থেকেই বোধহয় তাঁর আমেরিকা যাওয়ার পরিকল্পনা। কারণ পরিব্রাজক অবস্থাতেও নরেন্দ্রনাথ শান্তি পাননি। এই সময়ের কথা অবশ্য মহেন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রায় কিছুই জানতে পারা যায় না। কিন্তু লণ্ডনে থাকাকালীন *ই. টি. স্টার্ডির কাছে করা স্বামীজীর স্মৃতিচারণ মহেন্দ্রনাথ নিজের ভাষায় উল্লেখ করেছেনঃ* "জীবন্ত মৃত্যু কাহাকে বলে তাহা তিনি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করিয়াছিলেন। নিজের অনাহার, *মাথা গুজিবার স্থান নাই, পথে পথে ভিক্ষা করিয়া পাগলের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন।...* কতকগুলি ছেলেকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া আনিয়া পথের ভিখারী করিয়াছেন, তাহারা খাইতে পাইতেছে কি না পাইতেছে বা তারা কি করিতেছে সেই এক ভাবনা। পিছনে

পুলিশের তাড়া। আবার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেখিতেছেন অন্নাভাবে সকলে হাহাকার করিতেছে। কি দুঃখ কষ্টেই না তাহারা দিন কাটাইতেছে।"[১৫]

মহেন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজের তখনকার মানসিক অবস্থাপ্রসঙ্গে বলেছেনঃ "সিংহকে শিকলে বাঁধিয়া বনের মধ্যে একটা গাছে আটকাইয়া রাখিলে তাহার যেমন মনের ভাব ও শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টা হইয়া থাকে স্বামীজীরও এই সময় মনের ভাব তদ্রূপ হইয়াছিল।"

এই শেকল ছেঁড়ার উদগ্র বাসনাতেই স্বামীজী বুঝেছিলেন বিদেশের উন্নত জাতির অর্থ ও স্বীকৃতিই একমাত্র তাঁদের সহায়ক হতে পারে। মাদ্রাজ থেকে আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারে শ্রীমা সারদাদেবীর অনুমতি চেয়ে তিনি এক চিঠি লিখলেন। 'যাওয়া কতদূর সম্ভব হইবে এবং যাইয়া কৃতকার্য হইতে পারিবেন কিনা সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ ছিল' আর বোধ হয় সেইজন্যই, 'স্বামীজী কথাটি অতি গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন।' মহেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই সকল কথা শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ, সান্যাল মহাশয় ও বর্তমান লেখক ব্যতীত আর কেহই জানিত না।'[১৬]

অনেক পরে ইংলণ্ডে থাকাকালীন একদিন স্বামীজী মহেন্দ্রনাথ এবং স্বামী সারদানন্দকে তাঁর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে বলেছিলেনঃ "ঐ যে বেদান্তের কথা আমি হেঁটে হেঁটে সমস্ত ভারতবর্ষের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে লোকদের বলছিলুম যদি তারা নেয়; কিন্তু নেওয়া তো চুলোয় গেল, উল্টে তারা আমায় বিদ্রূপ করতে লাগল। আমার মনে বড় লাগল। মনে করলুম, একটা স্বাধীন দেশে গিয়ে এইটা বলব; স্বাধীন দেশ না হলে এ ভাব নিতে পারবে না। দেখলুম, চিকাগোতে একটা সভা হবে, আমি তো চোঁ চোঁ দৌড়ে চিকাগোতে হাজির হলুম। তারাই তো প্রথম বেদান্তের ভাবটাব appreciate করলে; ভারতবর্ষ নিঝঝুম, তারা নিলে না।"[১৭]

স্বামীজীর দূরদৃষ্টি ধর্মমহাসভাতেই প্রমাণিত হল। কিন্তু সেই সম্মান অর্জন করাতেই তাঁর স্বীকৃতিপ্রাপ্তির সংগ্রাম শেষ হল না। বরং এক নতুনতর পরিস্থিতির বিরুদ্ধে এবার তাঁকে যুদ্ধে নামতে হল। আর বাধাবিঘ্নের সঙ্গে নিয়ত যোদ্ধৃরূপেই মহেন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজকে তুলে ধরতে চান। তাই এই সংগ্রামের বিষয়টি বিদেশে সংবর্ধনাপ্রাপ্তির চেয়ে মহেন্দ্রনাথের লেখায় অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে এই বাধার বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করে নিইঃ "ব্রাহ্মসমাজ ও থিওজফিকাল সোসাইটির যে প্রতিপত্তি পূর্বে আমেরিকায় ছিল, স্বামীজীর অকস্মাৎ অভ্যুদয়ে তাহা অনেকটা ম্লান হইয়া গেল; আবার ভারতীয় সমাজের কাল্পনিক কুৎসিত চিত্র আমেরিকান সমাজের সামনে তুলিয়া ধরিয়া এই অবনত বিধর্মীদের কল্যাণকল্পে মিশনারীরা অতি সহজে অর্থসংগ্রহের যে হীন উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতেও বিঘ্ন উপস্থিত হইল। অধিকন্তু স্বামীজী খোলাখুলিভাবেই মিশনারীদের প্রচারপ্রণালীর নিন্দা ও অর্থব্যয়ের তুলনায় তাহাদের সাফল্যের অকিঞ্চিৎকরতা দেখাইয়া মিশনারীদের অনেককে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। এই সমস্তের সম্মিলিত বেগ অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল।"[১৮] তাঁরা অপপ্রচার করতে আরম্ভ করলেন যে "তিনি কোনও সম্প্রদায় বা সমিতির মুখপাত্র নহেন, তাঁর প্রচারিত ভাবসমূহ হিন্দুদের নিকট অগ্রাহ্য। সুতরাং আমেরিকান সমাজে তিনি ভারতের প্রতিনিধি বা প্রবক্তারূপে স্বীকৃত হইতে পারেন না।"

সবচেয়ে দুঃখের কথা, এই অপপ্রচারের ঈর্ষাবশত বহু শিক্ষিত ভারতীয়ও গলা মেলালেন এবং ভারতবর্ষের তরফে তাঁদের বক্তব্য আমেরিকায় প্রকাশ হতে লাগল।

ক্ষুব্ধচিত্তে স্বামীজী মাদ্রাজে আলাসিঙ্গাকে লিখলেন অবিলম্বে সেখানে এক বড় সভার আয়োজন করতে, যেখানে প্রস্তাব নেওয়া হবে যে আমেরিকায় বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা সঠিক এবং সন্তোষজনক এবং সেই প্রস্তাবটি ধর্মমহাসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজ এবং আমেরিকার অগ্রণী সংবাদপত্র অফিসে পাঠাবার কথাও তিনি লিখলেন।

বাস্তবিক আলাসিঙ্গা এমন এক মহতী সভা করতে সমর্থও হয়েছিলেন এবং স্বামীজীকে সমগ্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী সমাজের সমর্থন-সূচক সেই প্রতিবেদন এক ব্যক্তি মারফৎ আমেরিকা পাঠাবার ব্যবস্থাও করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই অযোগ্য ব্যক্তির গাফিলতিতে এই সমস্ত প্রয়াস নষ্ট হয়ে গেল, স্বামীজীর কোনও সাহায্যে এল না। আশ্চর্য, এমন এক চরম হতাশার বর্ণনাতেও মহেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসুলভ কৌতুকীতে সজীব থেকেছেন, "... ব্যক্তিটি এমন অকর্মণ্য যে সেই কাগজখানি লইয়া নিজের টেবিলের টানার ভিতর পুরিয়া রাখিয়া দিলেন এবং মাসখানেক আর সে বিষয় উচ্চবাচ্চ করিলেন না। আলাসিঙ্গাও মনে করিয়াছিল যে অভিনন্দনটি সে নিশ্চয় পাঠাইয়া দিয়াছে কিন্তু সমস্তটাই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইয়াছিল।"[১৯]

অবশেষে স্বামী অভেদানন্দের উদ্যমে ১৮৯৪-এর সেপ্টেম্বরে টাউন হলে রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্বামী বিবেকানন্দকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে সর্বসম্মতিক্রমে অভিনন্দন জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় ও পূর্বপরিকল্পনামত তা আমেরিকায় পাঠানো সম্ভব হয়।

এই সভার জন্য প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আদায় করতে বহুক্ষেত্রে অসুবিধা ও বিরোধিতার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল। অথচ সভাটি সফল হওয়ার পরই গোটা পরিস্থিতিই বদলে গেল; মহেন্দ্রনাথ লিখছেনঃ "হাটে, বাজারে এমন কি গঙ্গার ঘাটে স্ত্রীলোকদিগের ভিতর বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর কথা আলোচনা হইতে লাগিল। একের বিজয় যেন সকলের বিজয় হইয়া উঠিল। একের গৌরব যেন সকলের গৌরব। এইরূপ ভাব আর কখন বাঙ্গালী জাতির ভিতর দেখা যায় নাই।"[২০]

বলে রাখা দরকার, সুদূরপ্রসারী প্রভাবশালী এই যে টাউন হলের সভা তার আয়োজনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা ছিল মহেন্দ্রনাথের। অগ্রজের কর্মযজ্ঞে এ তাঁর এক আন্তরিক এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

পাশ্চাত্যের কাছে মহান ভারতীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে স্বামীজীর যে সংগ্রাম, সেখানে কত খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর তাঁকে নজর রাখতে হত। মহেন্দ্রনাথ বিস্তারিতভাবে তা জানিয়েছেন। লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি স্বামী সারদানন্দ ও মহেন্দ্রনাথকে পরিচ্ছন্ন থাকা, টেবিলে খাওয়ার আদব-কায়দা ইত্যাদি ব্যাপারে বারবার সচেতন করে দিতেন।

এই সচেতনতার ফলও তিনি পেয়েছিলেন অবশ্যই। স্বামীজীর যে কোনও বিদেশী ভক্তের স্মৃতিচারণ পড়লেই দেখা যায় তাঁরা তাঁর পরিচ্ছন্ন পোশাক, বুদ্ধিদীপ্ত বাচন আর অভিজাত উপস্থিতির দ্বারা কতটা প্রভাবিত হতেন। মহেন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন যে স্বামীজীর "বক্তৃতার বক্তব্য বিষয় অনেক সময় শ্রোতারা ভুলিয়া যাইত; কেবলমাত্র সেই কণ্ঠস্বর

লোকে শুনিত এবং তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া থাকিত।"[২১] নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি। কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর মুগ্ধতার পিছনে স্বামীজীর বাহ্যিক রূপের যে এক বিরাট প্রভাব ছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

আর এই মুগ্ধতার পশ্চাতে অন্য এক বড় কারণ স্বামীজীর নিষ্পাপ কৌতুকবোধ। মহেন্দ্রনাথ তাঁর দাদাকে উদ্ধৃত করেছেন, 'Witticism is the sign of intelligence.' তিনি নিজেও প্রকৃতপক্ষে এই মতেরই সমর্থক তাই যথার্থ গুরুত্বে তিনি তাঁর অগ্রজের এই গুণটি তুলে ধরেছেন বিভিন্ন ঘটনার প্রাসঙ্গিকতায়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। জনৈক গাঁজাখোর ব্যক্তিকে বেদপাঠের ভঙ্গিতে 'কস্মিংশ্চিৎ বনে ভাসুরকো নাম সিংহঃ প্রতিবসতি স্ম' ইত্যাদি আউড়ে নরেন্দ্রনাথ তার পদ-লালিত্য ব্যাখ্যা করেছেন;[২২] মধুর ভজন শুনে আবেগ-উদ্বেল গোবিন্দ ডাক্তারের চোখে জল দেখে আত্মভাব সংবরণ করে বলছেন, 'তোর ত বড় পানসে চোখ'[২৩] আবার নিউ ইয়র্ক শহরের চীনাদের অনুকরণ করছেন, 'O me Melican Chinaman. Me eat polk, me eat blandy, me eat everything.'[২৪]

স্বামীজী তাঁর তেজোদ্দীপ্ত জ্ঞানোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে সচেতনভাবেই যেন কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রাখতে চাইতেন।

মহেন্দ্রনাথ মিস মূলারের বাড়ি থাকাকালীন একদিনের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সেদিন রবিবার। বেলা প্রায় দশটা। কিছুক্ষণ আগে স্টার্ডির সঙ্গে স্বামীজী 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' অনুবাদের কাজ কিছুটা করেছেন। আর ঘণ্টাখানেক পরেই ওপরের হলঘরে তাঁর দ্বিপ্রাহরিক ক্লাস আরম্ভ হবে। কিন্তু স্বামীজীকে দেখে আপাতত সেসব বোঝবার উপায় নেই। তিনি ডাইনিং হলে স্বামী সারদানন্দ ও ভাই মহেন্দ্রনাথেব সঙ্গে বসে রাস্তার লোকজন দেখছেন ও ঠাট্টা-মস্করা করছেন।

হাসিঠাট্টার মাঝেই "স্বামীজী ঘড়ি খুলিয়ে দেখিলেন যে বক্তৃতার আর চার-পাঁচ মিনিট সময় বাকী আছে। স্বামীজী ও সারদানন্দ স্বামী কৌতুক করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ির ধাপের দিকে চলিলেন। বর্তমান লেখকও পিছনে চলিলেন। তখনও দুজনে অল্পবয়স্ক ক্রীড়াপ্রিয় বালকের ন্যায় হাসিতামাশা হইতেছিল। ক্রমেই যখন স্বামীজী এক এক সিঁড়ি উঠিতে লাগিলেন তখন তাঁহার মুখের ভাব, চক্ষুর জ্যোতি ও গলার আওয়াজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইতে লাগিল। স্বতন্ত্র ব্যক্তি—মহাপ্রতাপশালী, সিংহবিক্রমী আর এক ব্যক্তি সহসা আবির্ভূত হইলেন।... স্বামীজী গম্ভীরভাবে পদবিক্ষেপ করিয়া একলাই উঠিতে লাগিলেন।"[২৫]

মহেন্দ্রনাথের স্বামীজী-অনুধ্যানে এই ঘটনার একটা প্রতীকী গুরুত্ব আছে। মহেন্দ্রনাথ নিজের চোখে গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের সদা-চঞ্চল বালকটিকে একটার পর একটা বাধা ডিঙিয়ে, একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙে সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে দেখেছেন। একই পরিবেশে প্রায় একই সঙ্গে তাঁদের বড় হয়ে ওঠা। তবু নরেন্দ্রনাথ যত একটু একটু করে উপরে উঠেছেন ততই একটু একটু করে বদলে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ শিখরে উঠে সূর্যের মতো তিনি একা, একক। তাঁর আশপাশের মানুষজন বিমূঢ় বিস্ময়ে আর বিনম্র শ্রদ্ধায় তাঁর দিকে তাকিয়ে।

মহেন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন। যতই তিনি ঘরোয়া নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হোন, যতই তাঁর লক্ষ্য থাক এক রক্ত-মাংসের মানুষকে উপস্থাপিত করার, তাঁকেও মন থেকে স্বীকার করতে হয়েছে সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর অগ্রজের দৈবী চরিত্রকে।

তাই আত্মমগ্ন অবস্থায় স্বামীজীর দীর্ঘক্ষণের পাদচারণ দেখে তিনি যখন তার সঙ্গে তুলনা টানেন কোনও এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে দ্বাদশ-নিদান উপলব্ধি করার পর সাত দিন ধরে ভগবান বুদ্ধের পাদচারণ বা 'চংক্রমণ'-এর[২৬] তখনও মহেন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না।

মনে হয়, সিঁড়ির ঐ সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়েই যেন স্বামীজী বলছেনঃ "ওরে আমি তো সেই পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম, একটা Vagabond, এখন দেখছি যে আর একটা জিনিস। বলি মগজ-বাবাজী, তোর পেটে এত ছিল রে...।"

আর মহেন্দ্রনাথ? তিনি কাছেই আছেন। 'নিরপেক্ষ দ্রষ্টারূপে।' দেখছেন, সত্যিকারের রাজার মতো ধীর, বলিষ্ঠ পদক্ষেপে তাঁর অগ্রজের উঁচু আসনে আরোহণ—যেমন সেই ছেলেবেলা থেকেই তিনি দেখে এসেছেন।

ভূপেন্দ্রনাথের চোখে

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অগ্রজের সম্পর্কে যে চর্চা করেছেন তা কিন্তু মহেন্দ্রনাথের চর্চা থেকে মানসিকতার দিক দিয়ে একেবারেই আলাদা শ্রেণীর। মহেন্দ্রনাথের আলোচনার মূলভিত্তি তাঁর নিজস্ব স্মৃতি আর অভিজ্ঞতা। অপরদিকে ভূপেন্দ্রনাথের আলোচনার ভিত্তি তাঁর গভীর বামপন্থী বিশ্বাস।

ভূপেন্দ্রনাথের জন্ম ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮০ অর্থাৎ স্বামীজীর থেকে তিনি প্রায় সাড়ে সতের বছরের ছোট। তাই তাঁর পক্ষে স্বামীজীর বাল্য বা কৈশোরজীবন সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতার প্রশ্নই ওঠে না। পরবর্তী জীবনেও কখনই স্বামীজীর খুব নিকট সান্নিধ্যে থাকার কোনও সুযোগ তিনি পাননি। তাই মহেন্দ্রনাথ যেমন তাঁর নিজের চোখে দেখা ঘটনাগুলি চলচ্চিত্রের মতো সাজিয়ে দিতে পেরেছেন, ভূপেন্দ্রনাথের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাঁর কাছ থেকে তাঁর অগ্রজ সম্পর্কে কোনও জীবন্ত স্মৃতিচারণ তাই আমরা পাইনি।

তার বদলে যা পেয়েছি তার গুরুত্বও অবশ্য কম নয়। তিনি তাঁর সময়ের প্রচলিত বিবেকানন্দ আলোচনা থেকে সরে এসে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর অগ্রজের মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন।

সেই মূল্যায়নের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে ভূপেন্দ্রনাথের সেই দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাসকে বোঝবার জন্য তাঁর জীবন সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা করে নেওয়া দরকার।

এক কথায় ভূপেন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয়, তিনি ছিলেন মার্ক্সবাদী, বহু-প্রতিভাধর বিপ্লবী। দেশে এবং বিদেশে তাঁর কর্মপ্রবাহ ব্যাপ্ত। প্রথম জীবনে 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রবন্ধ লেখার জন্য ১৯০৭ সালে তরুণ ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হয়। ভূপেন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয় পত্রিকা-সম্পাদক যিনি

স্বাধীনতাসংগ্রামের পক্ষে কলম ধরার জন্য কারাবরণ করেন। এরপর উচ্চশিক্ষা লাভ করতে তিনি আমেরিকা যান। সেখানে জার্মানীর সাহায্য গ্রহণ করে ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করতে যে 'বার্লিন কমিটি' বা 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কমিটি' গঠিত হয়, তিনি তার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালে মস্কোয় তৃতীয় আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। ১৯২৫ সালে দীর্ঘ ষোল বছর প্রবাসের পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং তারপর থেকে একদিকে বিভিন্ন কৃষক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠন ও অপরদিকে নানান তাত্ত্বিক বই রচনার মধ্য দিয়েই তাঁর বাকি জীবন কেটে যায়। সমালোচকদের মতে এই আন্দোলন এবং বই উভয়ই তাঁকে এদেশের এক প্রথমশ্রেণীর মার্ক্সবাদী প্রবক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ভূপেন্দ্রনাথ তাই যখন তাঁর অগ্রজ সম্পর্কে বিচার করতে বসেন, তখন সেই সময়ের নিরিখে একটু অন্য মনে, অন্য মাপকাঠিতে আমরা যে বিবেকানন্দের বিশ্লেষণ দেখব তা তো বলাই বাহুল্য।

এখনকার হিসেবেও তাঁর যাবতীয় বক্তব্যকে যে শিরোধার্য করা যাবে তা কখনই নয়। অনেক সময়েই তাঁর মতামত আমাদের বিশ্বাসকে আঘাত করবে, আমাদের ধারণাকে পীড়িত করবে, আমাদের যুক্তিকে অস্বীকার করবে কিন্তু তা নিয়ে উক্তি-প্রত্যুক্তিতে যাওয়ার প্রয়োজন এক্ষেত্রে কম। স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে তাঁর অনুজ ভূপেন্দ্রের চোখে ধরা পড়েছেন শুধু সেটি দেখাই আপাতত আমাদের উদ্দেশ্য।

জাতীয়তাবাদী, সামাজিক, ধর্মীয়, শিল্প-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানান দৃষ্টিভঙ্গিতে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজকে দেখেছেন এবং সবক্ষেত্রেই তাঁর অগ্রজের বক্তব্য ব্যাখ্যায় এবং তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি এমন এক বিবেকানন্দকে রূপ দিতে চেয়েছেন, অন্তত সেই সময়ে, বিবেকানন্দকে কেউই সেরূপে দেখেননি বা দেখতে চাননি।

সরাসরিই বলা যাক—ভূপেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দ হলেনঃ 'Vivekananda the Socialist'.

বস্তুত তাঁর অগ্রজ সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ প্রথম যে বই লেখেন এটি তারই শিরোনাম। নামকরণ থেকেই পরিষ্কার ভূপেন্দ্রনাথ কোন দৃষ্টিতে তাঁর দাদাকে দেখতে চেয়েছেন। এই বইটি রচনার আরও প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিক একটি কারণ অবশ্য ছিল। স্বামীজীর বাণী ও রচনা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কাছে বরাবরই এক শক্তিস্বরূপ বলে বিবেচ্য ছিল। সেই কথা মনে রেখেই ১৯২৮-২৯ সালে তাঁর সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে কর্মরত তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য ভূপেন্দ্রনাথ লেখেনঃ 'Vivekananda the Socialist'. গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বামীজীর কিছু উদ্দীপনাময় বাণী সংকলন করেই বইটির রূপ দেওয়া হয়। বইয়ের যাবতীয় লভ্যাংশ খুলনা জেলার 'খালিসপুর স্বরাজ আশ্রম'-এর কৃষি-তহবিলে জমা পড়ার ব্যবস্থা করা হয়।[২৭]

ভূপেন্দ্রনাথের এই বই লেখার উদ্দেশ্য যে সত্যিই সফল হয়েছিল তা তিনি নিজেই বলেছেনঃ "They [Youthful workers in the labour and peasant fields] found a support in him in their work as the national revolutionaries drew their inspiration from him in the former decades."[২৮]

ইঙ্গিতটা খুব স্পষ্ট। স্বাধীনতা-আন্দোলনে স্বামীজীর ইতিবাচক প্রভাব এক বহু-আলোচিত সত্য কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ বলছেন সে প্রভাব ছিল আগের আগের দশকে আর এই শতকের তৃতীয় দশকের শেষে স্বামীজীর বাণী কৃষক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেই বেশি প্রাসঙ্গিক— যদিও, ভুলে গেলে চলবে না, সেই সময়েই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তুমুল গতি প্রাপ্ত হয়েছেঃ ১৯২৮-এ সাইমন কমিশন ও তার বয়কট, ১৯২৯-এ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের দাবি, ১৯৩০-৩২-এ গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন। হয়তো ভূপেন্দ্রনাথ revolutionary বলতে শুধু সশস্ত্র আন্দোলনকারীদের কথাই বলতে চেয়েছেন। যাই হোক, কোন ধারায় স্বামীজীর প্রভাব তখন বেশি সে তর্ক অবান্তর। ভূপেন্দ্রনাথের 'Vivekananda the Socialist' যে তাঁর উদ্দেশ্যপূরণে সফল হয়েছিল, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সেই সঙ্গে অবশ্য পাঠক-প্রতিক্রিয়ার অপর মেরুর কথাও বলতে হবে। আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবেই মূলত পরিচিত বিবেকানন্দকে তাঁর ভাই এই যে এক অন্য চেহারায় আনতে চাইছেন, এ ব্যাপারটা অনেকেই পছন্দ করেননি। সে কথা ভূপেন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেনঃ "The name of the book provoked ridicule among some of the old folks who regarded Swamiji as only a mystic and a Hindu revivalist of the orthodox pattern.' [২৯]

তার জন্য কিন্তু বইটির জনপ্রিয়তা কমেনি। তখনকার 'ভারত' পত্রিকায় ভূপেন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। বেশি চাহিদার কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই বইয়ের সব কপি শেষও হয়ে যায়।

এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ভূপেন্দ্রনাথ এবার তাঁর অগ্রজের আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় 'Swami Vivekananda—Patriot Prophet.' পরে প্রায় একই বক্তব্যের ওপর একটি বাংলা বইও লেখেন। নাম 'স্বামী বিবেকানন্দ'।

এখানে ভূপেন্দ্রনাথ তিনটি ধাপে তাঁর আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

প্রথম ধাপে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উত্থানের প্রেক্ষাপটটি বোঝবার চেষ্টা করেছেন। প্রেক্ষাপট বলতে ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত উভয়তই। অর্থাৎ একদিকে যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পূর্বাপর গতির কথা ধরা হয়েছে, তেমনি নরেন্দ্রনাথের পারিবারিক ইতিবৃত্ত ও তাঁর বংশানুক্রমিক পরিচয়ও আলোচিত। এই ব্যক্তিগত ঘরোয়া পরিচয় দিতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের কথা এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা এসেছে। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথের সে বিবরণীতে আলাদা কোনও গুরুত্ব দিচ্ছি না কারণ তাঁর আলোচনার এই অংশটির তথ্যগত ভিত্তি সম্পূর্ণভাবেই তাঁর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি তাঁর স্মৃতিচারণমূলক অনুধ্যানে সেসব বিষয় আগেই জানিয়ে গেছেন। বইয়ের মুখবন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ সেকথা স্বীকারও করে নিয়েছেন।

যাই হোক, তাঁর আলোচনার দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে জাতীয়তাবাদ, সামাজিক, ধর্মীয়, সাহিত্য, শিল্প। এইরকম বিবেকানন্দ-প্রতিভার এক এক উজ্জ্বল দিক নিয়ে তাঁর নিজস্ব মূল্যায়ন।

আর তৃতীয় ধাপে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, জাতীয়তাবাদ, শিক্ষা এবং নারী উন্নয়ন সম্পর্কে স্বামীজীর বিভিন্ন মতামতের আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ।

এই সামগ্রিক প্রয়াসে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজের যে ছবি আঁকতে চেয়েছেন তা সংক্ষেপে বলতে গেলে তাঁর বইয়ের শিরোনামেরই পুনরুল্লেখ করতে হবেঃ Patriot Prophet.

'Patriot' অর্থাৎ দেশপ্রেমিক। এক্ষেত্রে ভূপেন্দ্রনাথের বক্তব্য স্পষ্ট। কিন্তু 'Prophet' ? 'Prophet' শব্দের একটি অর্থ 'ভবিষ্যদ্বক্তা।' আর অপর অর্থ 'জনগণকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত ভগবান কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি'—মানে আমাদের প্রচলিত অর্থে 'অবতার'। কিন্তু এই দ্বিতীয় অর্থটি কি এক্ষেত্রে আদৌ গ্রহণযোগ্য? সন্দেহটা এইজন্য যে গ্রন্থকারের নাম ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—যাঁর একনিষ্ঠ মার্ক্সবাদী বিশ্বাসের কথা আমাদের জানা আছে। সুতরাং 'ভবিষ্যদ্বক্তা'-র পরিচয়টিই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী আলোচনাতেও এ কথা পরিষ্কার হবে যে, ভূপেন্দ্রনাথ নিশ্চয় এই বিশেষণেই তাঁর প্রতিভাধর অগ্রজকে সম্মান দিতে চেয়েছেন।

কিন্তু সে কথা পরে। আগে ভূপেন্দ্রের চোখে তাঁর দাদার দেশপ্রেমিকের রূপটি কেমন দেখে নেওয়া যাক।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি 'দেশপ্রেমিক' আর 'স্বাধীনতাসংগ্রামী' কথা দুটি তখন প্রায় সমার্থক ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ নিজেও সে মানসিকতাকে এড়াতে পারেননি। ব্রিটিশ শাসন থেকে নিজের দেশকে উদ্ধার করার ব্যাপারে তাঁর অগ্রজের চেষ্টা প্রসঙ্গে কিছু অল্প-সমর্থিত তথ্য তিনি পেশ করেছেন।

তিনি বলেছেন স্বামীজীর হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পরিব্রাজনের পিছনে ছিল এক গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। তিনি নাকি ভারতের বিভিন্ন স্থানের রাজন্যবর্গকে ঐক্যবদ্ধ করে তাঁদের মিলিত শক্তিতে ব্রিটিশদের উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন এবং এই চেষ্টা ফলপ্রসূ করতে তিনি এমনকি বন্দুক-নির্মাতা হিরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গেও বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। এমন এক চমকপ্রদ তথ্যের উৎস হিসেবে ভূপেন্দ্রনাথ স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ শিষ্যা সিস্টার কৃস্টিনের কথা উদ্ধৃত করেছেন।[৩০] স্বামীজী অনেক পরে কথা প্রসঙ্গে কোনও এক সময় কৃস্টিনকে তাঁর পরিব্রজ্যার এমন এক গোপন লক্ষ্যের কথা বলেছিলেন। তাঁর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন, '...But I got no response from the country. The country is dead.' স্বামীজী তাঁর বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য কৃস্টিনকে জানিয়েছিলেন কিন্তু সিস্টার কৃস্টিন সেসব কথা ভূপেন্দ্রনাথকে জানাতে অস্বীকার করেন।

পরবর্তী কালে বেলুড়ে বিপ্লবী পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করের সঙ্গে কথাবার্তাতেও স্বামীজী তাঁর এই জাতীয় কর্মকাণ্ডের কথা বলেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন শৃঙ্খলমোচনের এই সংগ্রামে অন্য বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য নেওয়ারও কোনও প্রয়োজন নেই—ভূপেন্দ্রনাথ সেই আলোচনার কথা বলতে গিয়ে তাঁর দাদাকে উদ্ধৃত করেছেনঃ "I know several princes who can successfully carry on the revolution."[৩১]

দেশের পরাধীনতা মোচন করতে সশস্ত্র আন্দোলনে স্বামীজীর প্রয়াস ও সে কাজে

দেশীয় রাজাদের প্রতি তাঁর ভরসার প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ এই যেসব তথ্য-প্রমাণের কথা বলেছেন তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ঐতিহাসিকরা সংশয়ী হবেনই। তবে ভূপেন্দ্রনাথের সমর্থনে বলা যেতে পারে যে পুলিশী নথিপত্র থেকে একথা আজ প্রমাণিত, আমেরিকা যাত্রার আগে বিবেকানন্দের সঙ্গে পশ্চিম ভারতীয় রাজন্যবর্গের ঘনিষ্ঠতা তখনকার পুলিশপ্রধানও সন্দেহের চোখে দেখতেন।[৩২] তাছাড়া বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে স্বামীজীর নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন।[৩৩]

যাক সে কথা। দেশপ্রেমিক হিসেবে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেখানে স্বাধীনতাসংগ্রামে সরাসরি সামিল হওয়ার চেয়েও আরও গভীর এবং সুদূরপ্রসারী ক্ষেত্রে স্বামীজীর ভূমিকাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ভূপেন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, ভারতবর্ষে যত বিদেশী আক্রমণ হয়েছে তার মধ্যে ইংরেজরাই সবচেয়ে সার্থকভাবে অস্ত্রশক্তির তেমন ব্যবহার ছাড়াই ভারতের ওপর গভীর প্রভাববিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। অর্থাৎ শুধু রাজনৈতিক আধিপত্য নয়, ভারতের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, মূল্যবোধ ইত্যাকার যাবতীয় অন্দরমহলের মানসিক ঐশ্বর্যকে তারা নিজেদের ছাঁচে বদলে ফেলতে চেষ্টা করছিল, 'An attempt was made to anglicise India.' ভূপেন্দ্রনাথ Macaulay-কে উদ্ধৃত করে তখনকার ব্রিটিশরাজের মানসিকতাকে ধরতে চেয়েছেন ঃ "Boys black in face, living on the banks of the Ganges will read Shakespeare and Milton and will glory in our literature."[৩৪] ফলে ভারতীয়রা তাদের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে পারছিল না, নিজেদের হাতে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার পরিকল্পনা নিতেও তাদের ভরসা ছিল না। ইউরোপীয় সবকিছুই শ্রেষ্ঠ—এই ধারণাটাই বুঝি তাদের মোহগ্রস্ত করে রেখেছিল।

ভারতীয় জাতির উপর ব্রিটিশের এই যে 'intellectual conquest', ভূপেন্দ্রনাথ বলেছেন পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসে তাঁর অগ্রজই প্রথম তার উপর কার্যকর আঘাত হানলেন। স্বামীজী ভারতীয় যুবসমাজের মধ্যে স্বাজাত্যাভিমান জাগালেন, নিজের শেকড়ের প্রতি ফিরে তাকাতে বললেন, আপন ইতিহাস নিয়ে গর্ব করতে শেখালেন।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। স্বামীজীর এই জাতীয়তাবাদী ভূমিকার কথা বহু ভাবে বহু জন আলোচনা করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভূপেন্দ্রনাথ যখন তাঁর দাদার সম্পর্কে এই ধরনের আলোকপাত করছেন, তখন তা ছিল এক নতুন ভাবনা। তাছাড়া স্বামীজীর এই গভীর দেশানুরাগের কথা বলতে গিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ এমন কিছু বিষয়ের কথা এ প্রসঙ্গে টেনে এনেছিলেন যা আজও যথাযথ গুরুত্বে বিশ্লেষিত হয়নি।

যেমন নৃতত্ত্বের বিষয়টি। ভূপেন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ "The most unfortunate part of anthropology is that during its inception, it got enmeshed in national-chauvinism of each country."[৩৫] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও এই ধারাতেই সাদা চামড়ার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন এবং ভারতবর্ষের মতো পরাধীন দেশের সম্বন্ধে প্রায় মনগড়া বিরূপ মতবাদ প্রচার করেছেন। ভারতীয়দেরও নিরুপায় অবস্থায় সেই চিন্তাধারাই বিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 'Swami Vivekananda was the first Indian to raise his voice against this false foreign propaganda.'[৩৬]

আবার শিল্প-সংস্কৃতির বিষয়েও স্বামীজীর দেশপ্রেম ভূপেন্দ্রনাথ নজর করেছেন। রবিবর্মা তখনকার এক বিখ্যাত ইউরোপীয় ঘরানার ভারতীয় শিল্পী। কিন্তু দেশীয় কৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার জন্য স্বামীজী তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের কাছ থেকে শুনেছেন, আমেরিকা যাওয়ার আগেই মহারাষ্ট্রে পরিব্রাজক অবস্থায় পুণার এক ব্যারিস্টারের বাড়ি থাকাকালীন একদিন তাঁর অগ্রজ রবিবর্মার ছবির ত্রুটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছিলেন।[৩৭] তাঁর বিরূপ সমালোচনার মূল কারণ যে শিল্পীর পাশ্চাত্য অনুকরণের প্রয়াস তা বোঝা যায় স্বামীজীর লেখা থেকেও, '... বড় জোর ওদের (ইউরোপীয়দের) নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায় !!... ওসব রবিবর্মা-ফর্মার চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় !! বরং জয়পুরে সোনালী চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।'[৩৮]

আসলে ভূপেন্দ্রনাথ যেটা যথার্থভাবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, তা অবশ্যই নৃতত্ত্ব বা চিত্রশিল্প সংক্রান্ত কোনও বিক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই 'পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা'কে স্বামীজী আসলে সর্বক্ষেত্রেই আঘাত করতে চেয়েছেন এবং জাগাতে চেয়েছেন পরপদানত জাতির আত্মশক্তি। এখানেই স্বামীজীর দেশপ্রেমের বিশিষ্টতা।

আর এই আত্মশক্তি জাগানোর জন্য যে সমাজসংস্কার, সেখানেও স্বামীজী আনলেন সার্বিক উন্নতির বোধ। ভূপেন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর দাদা ব্যক্তিগত করুণ অভিজ্ঞতার কারণে বাল্যবিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁর দুই বোন শ্বশুরবাড়িতে অমানবিকভাবে অত্যাচারিত হয়ে অল্পবয়সে মারা যায়। কিন্তু তবু আলাদা আলাদা ভাবে কুপ্রথাগুলোকে আঘাত না করে তিনি সমস্যাটিকে মূল থেকে সমাধান করতে চাইতেন। তাই বিভিন্ন শাস্ত্রের বাণী উদ্ধার করে কোনও প্রথা রদ করার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন শিক্ষার প্রসার এবং অনুন্নত শ্রেণীর জাগরণঃ 'Educate the masses, give them their right.'

দেশের যথার্থ উন্নতি করতে স্বামীজী এই যে mass-এর উন্নতি বা শূদ্র জাগরণের কথা বলেছিলেন, ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহ বিশ্লেষণ করেছেন।

তিনি বলেছেন, রামমোহন রায় থেকে বিবেকানন্দ—ভারতীয় নবজাগরণের এই যে গুরুত্বপূর্ণ কাল, এখানেই ভারতীয় সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব এবং এই শ্রেণী ব্রিটিশ শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক ভ্রান্ত হতাশাবোধে আক্রান্ত ছিল। সিস্টার কৃস্টিনকে উদ্ধৃত করে তিনি জানাচ্ছেন যে এমনকি গোখেলের মতো মানুষও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।[৩৯]

আর এই বুর্জোয়া সম্প্রদায় জাতিগঠনের ক্ষেত্রে নীচু তলার মানুষদের প্রতি কখনই বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। লক্ষ্ণৌ চুক্তির সময় ১৯১৭ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা এক মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে ভূপেন্দ্রনাথ বলেনঃ 'They (bourgeois) discovered the nation to be living in land-lords' houses, Bar-Libraries and in Banks... and looked on the Indian world from that angle of vision.'[৪০]

এই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি তাঁর অগ্রজের নতুন চিন্তাধারার কথা বলেছেন : 'It was Swami Vivekananda that first broke the bound.' 'দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী'-র প্রতি স্বামীজীর সেই বহু আলোচিত উদাত্ত আহ্বানকে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব তাত্ত্বিক ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন : "It was he (Swami Vivekananda) who was the first person in the world to envisage a government of the toiling masses, and prophesied about the Proletarian Culture of the future."[৪১]

স্বামীজী পরিকল্পিত শূদ্র জাগরণ নিয়ে তো অনেক আলোচনাই হয়েছে কিন্তু এই দৃষ্টিকোণ থেকে, এই ভাষায় স্বামীজীকে আগে কেউ চিত্রায়িত করেনি। তিনি বারে বারে এই বিষয়টির ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন যে স্বামীজীর শূদ্ররাজ-প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী এমন এক সময়ে যখন "... the reader must realize that in so early a time a 'labour' or 'Social Government' anywhere in the West had been a pious wish only."[৪২]

ভূপেন্দ্রনাথ বলেছেন, স্বামীজী শূদ্র-অভ্যুত্থানের কথা যখন জানাচ্ছেন, রাশিয়ার লেনিন তখনও 'proletarian class-less state' প্রতিষ্ঠার কোনও ধারণা করেননি আর চীনে মাও-সে-তুঙয়ের তখনও জন্মই হয়নি। এমনকি ভূপেন্দ্রনাথ এ ধরনের মন্তব্যও করেছেন : "A Marxist will be amazed in seeing his ideas anticipated in the sayings of Swamiji. ... One will be surprised in reading that Swamiji has not only used Marx's phrase, that 'poor are getting poorer and the rich are getting richer' but he has also spoken about the 'proletarian culture'..."[৪৩]

বলতেই হবে, ভূপেন্দ্রনাথের এ ধরনের সিদ্ধান্তের মাঝে কিছু অতিশয়োক্তি আছে। নিজস্ব তাত্ত্বিক বিশ্বাসে অতিপৃক্ত থাকার কারণেই হয়তো তিনি তাঁর পরমশ্রদ্ধেয় অগ্রজের মধ্যে তাঁর নিজস্ব আদর্শের জীবন্ত রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন।

প্রকৃত ব্যাপ্ত প্রতিভা তো এমনই হয়। এক-এক পর্যবেক্ষকের কাছে, তাঁদের বোধ আর মানসিকতাভেদে, এক এক দ্যুতিতে দীপ্ত হয়। এ যেন পর্যবেক্ষকেরও এক ধরনের আত্মদর্শন। যেমন হয়েছে এক্ষেত্রে। স্বামীজী ধরা দিয়েছেন তাঁর অনুজ ভূপেন্দ্রনাথের কাছে কিছুটা অন্য চেহারায়, অন্য রূপে।

ভূপেন্দ্রনাথের চোখে তাঁর অগ্রজ এক আপাদমস্তক খাঁটি ভারতীয় পুরুষ, শত প্ররোচনা সত্ত্বেও যিনি তাঁর শেকড়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, চারদিকের হতাশার মধ্যেও যিনি বর্তমানের প্রতি আস্থাবান আর নিজের সময়ের থেকেও অনেক অনেক এগিয়ে যাঁর দূরদৃষ্টি। ভূপেন্দ্রনাথের অগ্রজের পরিচয় তাই, তিনি একজন 'Patriot' তিনি একজন 'Prophet'

দায়িত্বে-কর্তব্যে

'ও দাদা একটা গল্প বল না', মহেন্দ্রনাথ আবদার করলেন।

অমনি গল্প শুরু হল, 'এক ছাগল ছিল। সে একটা বাঁশের সাঁকো দিয়ে একটা নদী পার হচ্ছিল। নদীতে খানিকটা গেছে, দেখে না জলে আর একটা ছাগল।...'

গল্প শেষ হতে না হতেই সব ভাইবোনেরা বলে উঠল, 'ও দাদা, তোর গল্প যে বড় ছোট, ফুরিয়ে গেল। তুই আর একটা ভাল গল্প বল।'

অমনি দাদা আর একটা গল্প শুরু করলেনঃ 'একবার এক ব্যাঙের বাড়ি খুব যজ্ঞী। তা তাদের পয়সা ফুরিয়ে গেছে। ব্যাঙেদের কর্তা মশাদের বাড়ি গেল,' ইত্যাদি।

সময় তখন রাত্রি। খাওয়া-দাওয়া সেরে বড় ঘরে দুখানা তক্তপোষের ওপর দুখানা গদি পেতে সবাই মিলে শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বিছানার একধারে দাদা নরেন্দ্রনাথ শুয়ে শুয়ে গল্প শোনাচ্ছেন। তারপর মহেন্দ্রনাথ শুয়েছেন। তাঁর পাশে ছোট দুই বোন, তারপর তাঁদের দিদিমা বা ঝি-মা আর সবশেষে তাঁদের মা। ভূপেন্দ্রনাথের তখনও জন্ম হয়নি।[৪৪]

কোনও দিন আবার বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাই-বোনেরা বলত, 'ও দাদা, তুই আঙুল দিয়ে ছায়াবাজী করনা।'

ঘরে পিতলের পিলসুজের ওপর মাটির প্রদীপ জ্বলত টিম্ টিম্ করে। তার সামনে ভাইবোনদের খুশি করতে নরেন্দ্রনাথ দুহাতের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে দেওয়ালে ছায়া ফেলতেন। কখনও সেই ছায়া দেখে মনে হত উড়ন্ত বাদুড়, কখনও বা ছুটন্ত ঘোড়সওয়ার, কখনও বা দুর্গা-কার্তিক-সরস্বতী-লক্ষ্মী-গণেশ।[৪৫]

শুধু রাতের বেলা শোওয়ার সময়েই নয়। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন অফুরন্ত উৎসাহে সব সময়েই ভাইবোনদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ কোনও না কোনও ব্যাপারে মেতে থাকতেন, হয়তো সন্ধে বেলা একসঙ্গে পড়ছেন কিংবা ঠাকুরমাকে ঘিরে গান গাইতে গাইতে নাচানাচি লাফালাফি করছেন আবার কখনও বাড়ির ঠাকুরদালানে সবাইকে জুটিয়ে নাটক করছেন।

ভাইবোনদের প্রতি অগ্রজ হিসেবে তাঁর এই মানসিক নৈকট্য স্বামীজীর গোটা জীবনেই অপরিবর্তিত থেকে গেছে। ভাইয়ের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনায়, বোনের দুঃসংবাদে তাঁর প্রতিক্রিয়ায়, সংসারের আর্থিক সমস্যা-সমাধানে তাঁর প্রয়াসে তিনি প্রকৃতই দায়িত্ব-সচেতন এক অগ্রজ। তাঁর নিজের গেরুয়া বেশ বা দেশে-বিদেশে বিস্তৃত তাঁর বিপুল কর্মকাণ্ডের দায়ভার এক্ষেত্রে তাঁর কাছে বাধা হতে পারেনি।

স্বামীজী তখন আলমোড়ায় লালা বদ্রিসার বাড়িতে। শরৎ মহারাজও তাঁর সঙ্গে আছেন। এই সময় স্বামীজীর ছোট বোন যোগেন্দ্রবালা আত্মহত্যা করেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে খুব সম্ভব শ্বশুরবাড়িতে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে না পেরে তিনি এই মর্মান্তিক পথ বেছে নেন। মহেন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করে এই দুঃসংবাদটি শরৎ মহারাজের নামে আলমোড়ায় তাঁর দাদার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। প্রিয় বোনের এই মৃত্যু সংবাদ সেই দূর জায়গায় পেয়ে স্বামীজী অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়েন। তাঁর ধ্যাননিষ্ঠ মন অভাবনীয় আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়।

অগ্রজসুলভ দুর্বলতা যাতে তাঁর মহত্তর আদর্শের পথে বাধা হতে না পারে, তাই কঠোরভাবে তিনি শরৎ মহারাজকে নির্দেশ দিলেন—পরিব্রজ্যার মাঝে তিনি কখন কোথায় যাচ্ছেন, তা যেন বাংলাদেশে জানানো না হয়।[৪৬]

ভাইবোনদের প্রতি তাঁর এই কোমল অনুভূতি স্বামীজীর সারা জীবনেই অপরিবর্তিত ছিল। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীজী কাশীতে কিছুদিন ছিলেন। সেখানে তাঁর পরিচর্যা করতেন হরিনাথ ওদেদার বা স্বামী সদাশিবানন্দ। এই সময়েই হরিনাথ ওদেদারের ডাক্তার বড় ভাই হঠাৎ মারা যান। নিজের পরিবারের এত বড় দুর্যোগেও তাঁকে বাহ্যত নির্লিপ্ত দেখে স্বামীজী কাতরভাবে বলেছিলেনঃ 'আমার ভায়েদের যদি এমন হত আমার কিন্তু বড় কষ্ট হত।'[৪৭]

স্বামীজী লণ্ডনে থাকাকালীন একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তিনি যখন মহাবৈরাগ্যের সঙ্গে মাদ্রাজে অবস্থান করছেন তখন একবার তাঁর কাছে খবর গেল মহেন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে—স্বামীজী বলেছিলেন, এই খবর শুনে তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। বাইরে কিছু প্রকাশ না করলেও সান্যাল মহাশয় অথবা শরৎ মহারাজকে নিজের মনের অবস্থার কথা জানিয়েছিলেনঃ 'আমি অতি অকৃতী সন্তান, মাতার কিছু করিতে পারিলাম না, কোথায় তাহাদের ভাসিয়ে দিয়ে চলিয়া আসিলাম।'[৪৮]

তাঁর ভাইরা কে কী করছেন, কে কী করবেন সব ব্যাপারেই তিনি খেয়াল রাখার চেষ্টা করতেন। কখনও সহৃদয় পরামর্শে, কখনও স্পষ্ট নির্দেশে ভায়ের পথ ঠিক করে দিতে চাইতেন। তিনি যে অগ্রজ!

১৮৮৯-এর ৪ জুলাই তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে লিখছেনঃ "আমার মাতা ও দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি ফার্স্ট আর্টস পড়িতেছে। আর একটি ছোট, ইহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমনকি কখনও কখনও উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, হাইকোর্টে মোকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটীর অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মোকদ্দমার দস্তুর। কখন কখন কলিকাতার নিকট থাকিলে তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহংকারের বিকার স্বরূপ কার্য্যকরী বাসনার উদয় হয়। সেই সময় মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর।"[৪৯]

এই মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ঘর ছাড়বার অনিবার্যতা অবশ্যই তাঁর কাছে জয়ী হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে আশ্বাসও দিয়েছিলেন, 'মা বলে দিয়েছেন, তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।' 'তোদের' বলতে নরেন্দ্রনাথ ঘর ছাড়লে তাঁর মা-ভাই-বোনেদের। কিন্তু বৃহত্তর কর্মপালন করতে গিয়ে জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে সাংসারিক অকর্তব্যবোধ তাঁকে বারবার দুঃখ দিত।

তাঁর এই মানসিকতা ১৮৯৪-এর ২৯ জানুয়ারি হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লেখা চিঠিতে আরও স্পষ্টঃ "আপনি আমার দুঃখিনী মা ও ছোট ভাইদের দেখিতে গিয়াছিলেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। আপনি আমার একমাত্র কোমল স্থানটি স্পর্শ করিয়াছেন। আপনার জানা উচিত যে আমি নিষ্ঠুর পশু নই। এই বিপুল সংসারের আমার ভালবাসার পাত্র যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি আমার মা। তথাপি এ বিশ্বাস আমি দৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং এখনও করি যে, যদি আমি সংসার ত্যাগ না করিতাম তবে আমার মহান গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিরাট সত্য প্রচার করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,

তাহা প্রকাশিত হইতে পারিত না।"

স্বামী বিবেকানন্দ আসলে এক যুগান্তকারী প্রতিভা। আমাদের মন-মস্তিষ্ক, আমাদের বিধান-বিশ্বাস—সবকিছুকে তুমুল ঝাঁকুনি দিয়ে আমূল বদলে দিতে চেয়েছেন তিনি।

যেমন সন্ন্যাসী সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত যে ধারণা, জটাজূটধারী জগৎ-সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া দুর্গম পাহাড়ী গুহায় ধ্যান-গম্ভীর এক পুরুষ—সেই প্রচলিত বিশ্বাসকেও তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে বদলে দিয়েছেন। আর এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের এই অগ্রজের রূপ নিশ্চয় একটা বড় দিক। অনুগত শিষ্য অজিত সিং-কে স্বামীজী একসময় একটি পত্র দেন—'পত্রটি ব্যক্তিগত এবং গুরুত্বপূর্ণ'। তাঁর দুঃখিনী মা ও ভাইদের কথা তিনি বিশেষভাবে সেখানে উল্লেখ করেন। খেতড়িরাজ বোধ হয় সেদিন ঠাকুরের প্রতিনিধি হিসাবেই পারিবারিক দুশ্চিন্তার হাত থেকে তাঁকে মুক্ত করেছিলেন আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আমরা শুধু আলোচনার শেষে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য স্মরণ করি। খেতড়ির মহারাজাকে চিঠি লেখার কয়েকদিনের মধ্যেই ১৮৯৮ সালে ৯ ডিসেম্বর স্বামীজী তাঁর জীবনের অন্যতম 'দায়' বেলুড়ের গঙ্গাতীরে শ্রীরামকৃষ্ণের পূত অস্থি সংরক্ষণ ও মঠস্থাপন করেন।

এই আশ্চর্যরকমের বহুমুখী প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যই তাঁব অসাধারণত্ব সনাক্ত করে। তার তল পাওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। এক-এক আঁজলার রূপ দেখেই আমরা অভিভূত।

স্বামীজী ও তাঁর গুরুভ্রাতাদের সম্পর্ক

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বজবজ থেকে ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি সকালে একটি স্পেশাল ট্রেন এসে পৌঁছল শিয়ালদহ স্টেশনে—আমেরিকা ও ইউরোপ পর্যটন শেষ করে বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ফিরে এলেন তাঁর বাল্যের লীলাভূমি—কলকাতায়। প্রথমে শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ)। সেখানে প্রাথমিক অভ্যর্থনার পর তিনি পৌঁছলেন বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিবেকানন্দের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন পুষ্পমাল্য—স্বামীজী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেনঃ 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু'। ব্রহ্মানন্দও অনুরূপভাবে প্রতিপ্রণাম করে বললেনঃ 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা সমপিতা'।

তিরোভাবের দুদিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে একান্তে ডেকে বলেছিলেনঃ "দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধনভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।"[১] শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, ভালবাসার আকর্ষণেই এরা ঘর ছেড়ে এসেছে—ভালবাসাই সেই ঘর-ছাড়াদের একত্রে বেঁধে রাখতে পারে এবং নরেন্দ্রনাথই সে-ই আধার যার মধ্যে এই ভালবাসার বিকাশ হবে। বরানগরে একটি জীর্ণ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ—সকল ত্যাগী সন্তানকে একত্র করে নিরন্তর কৃচ্ছ্রসাধনা এবং সেইসঙ্গে ধ্যান, জপ, তপস্যার উন্মাদনা। মাঝে মাঝে কেউ কেউ মঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান তীর্থপর্যটনে অথবা নির্জন তপস্যায় কিন্তু আবার ফিরে আসেন বরানগর মঠেই—জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে কেন্দ্র করে চলে নানা পরিকল্পনা। নরেন্দ্রনাথ তখনও বিবেকানন্দ হননি কিন্তু নেতৃত্ব দেবার, সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখার ক্ষমতা তাঁর সহজাত। অন্যান্য গুরুপুত্রদের কাছেও শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশঃ 'নরেন শিক্ষে দিবে'।

কিন্তু শিক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য ধ্যান, জপ, অধ্যয়নই যথেষ্ট নয়, চাই ঠাকুরকে এবং তাঁর শিক্ষাকে হৃদয়ে গভীরভাবে ধারণ করার উপযোগী বাস্তব অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যই সংঘজননী সারদাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে নরেন্দ্রনাথ যাত্রা করলেন ভারত পরিক্রমায়। শ্রীমা কিন্তু তাঁকে একা ছেড়ে দিলেন না, অখণ্ডানন্দের হাতে নরেন্দ্রনাথকে সমর্পণ করে বললেন, 'বাবা তোমার হাতে আমাদের সর্বস্ব তুলে দিলুম।' গঙ্গাধর মহারাজ

এর আগেই তিব্বত, কাশ্মীর পর্যটন করে এসেছেন, যার জন্য স্বামীজীর 'গ্যাঞ্জেস' নতুন নাম পেয়েছেন 'বরফানী বাবা'। তাঁকে কখনও কখনও আদর করে বলেন 'তলোয়ার কা মাফিক নাকওয়ালা সাধু কাঁহাসে আয়ারে?' সেই গঙ্গাধরকে (স্বামী অখণ্ডানন্দ) পেয়ে স্বামীজীর আনন্দিত উক্তিঃ 'হাঁ, তোর মতন লোকই আমি চাচ্ছি যে আমার হিমালয় ভ্রমণের সঙ্গী হবে।'[২]

হিমালয়ভ্রমণ অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে ফিরে আসতে হল সমতলে কারণ শারীরিক অসুস্থতা—কখনও নিজের, কখনও সঙ্গী গঙ্গাধরের। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আমেরিকা থেকে প্রত্যাগমনের পূর্বে স্বামীজীর বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও পার্বত্যতীর্থদর্শন অসমাপ্ত থেকে গেছে কিন্তু আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারকার্যের শেষে তিনি স্বচ্ছন্দে পৌঁছেছেন অমরনাথে—সেখানেই তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি যার পরে মর্তভূমিতে তাঁর অবস্থানকাল সামান্যই।

কর্তব্যের কাছে সব মায়াবন্ধনই হার মানে। স্বামীজী বলেছিলেন, "গুরুভাইদের সঙ্গে থাকায় তপস্যার বিশেষ বিঘ্ন হচ্ছে। কারুর না কারুর অসুখ। তোদের মায়াও কাটাতে না পারলে সাধন ভজন হবে না।" তীব্র ক্ষোভে সেদিন ফেটে পড়েছিলেন অখণ্ডানন্দঃ 'তোমারই অনুরোধে আমি মধ্য এশিয়া দেখা বন্ধ রেখে বরানগর মঠে ফিরি, আর এখন তুমিই আমায় ত্যাগ করে যাচ্ছ?'

স্বামীজীর সাময়িক বিচ্ছিন্নতা যে তাঁর গুরুভাইদের কল্যাণের জন্যই সেটা পরে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু স্বামী অখণ্ডানন্দ তখন তা উপলব্ধি না করেই প্রবল শ্রদ্ধার আবেগে বলেছিলেনঃ 'তুমি যদি পাতালেও যাও আর যদি তোমাকে খুঁজে বের করতে না পারি তো আমার নাম গঙ্গাধর নয়।'[৩]

নরেন্দ্রনাথের অগোচরে, অখণ্ডানন্দ সত্যই তাঁকে অনুসরণ করেছেন, মাঝে মাঝে যখন উভয়ে মিলিত হয়েছেন তখন উভয়েই সমান আনন্দিত—শেষ পর্যন্ত স্বামীজীর সানুনয় অনুরোধে তিনি তাঁকে যেতে দিয়েছেন কিন্তু ছেড়ে দেননি।

॥ দুই ॥

গুরুভাইদের প্রতি স্বামীজীর বিশ্বাস কতখানি দৃঢ় ছিল এবং তাঁদের আনুগত্য ও ভালবাসার প্রতি তাঁর আস্থা কি পরিমাণ ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ম্যাকলাউডের কাছে লেখা নিবেদিতার একটি পত্রে।[৪] দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যভ্রমণকালে এডেনের অদূরে জাহাজে বসে তিনি নিবেদিতাকে যে কথা বলেছিলেন তার উল্লেখ করে নিবেদিতা লিখছেন, স্বামীজী বলেছিলেনঃ "যে ভালবাসার উপর তিনি পুরো নির্ভর করতে পারেন তা শিষ্যদের নয়—আজ যদি তিনি মদ্যপ হয়ে ওঠেন আতঙ্কগ্রস্ত শিষ্যরা তাঁকে পদাঘাতে বিতাড়িত করবে কিন্তু কিছু গুরুভাইয়ের (সকলে নয়) কাছে তিনি সেই আগের মতই থাকবেন। তিনি বলতেন, মনে রেখো মার্গট, আধ ডজন লোক যখন এইরকম ভালবাসতে শেখে তখনই জন্ম নেয় একটি নতুন ধর্ম, তার আগে নয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর ত্যাগী ভক্তগণ যে ধর্মচেতনার প্রবর্তন করেছেন তার মূলটি রয়ে গেছে এই ভালবাসার মধ্যে।

গুরুভাইদের প্রতি স্বামীজীর চিন্তা তাঁর পরিব্রাজকজীবনকে বার বার বিঘ্নিত করেছে,

তার প্রমাণ পাওয়া যাবে স্বামীজীর পত্রাবলীতে। গাজিপুর থেকে ৩ মার্চ ১৮৯০ স্বামীজী একটি চিঠিতে প্রমদাদাস মিত্রকে লিখেছেনঃ "কঠোর বৈদান্তিক মত সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নরমপ্রকৃতির লোক।... একটুতেই এলাইয়া যাই, কত চেষ্টা করি যে খালি আপনার ভাবনা ভাবি কিন্তু বারংবার পরের ভাবনা ভাবিয়া ফেলি। এবার বড় কঠোর হইয়া নিজের চেষ্টার জন্য বাহির হইয়াছিলাম—এলাহাবাদে এক ভ্রাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া ছুটিতে হইল। আবার এই হৃষীকেশের খবর—মন ছুটিয়াছে। শরৎকে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছি, আজিও উত্তর আইসে নাই।"[৫]

৩১ মার্চ পুনরায় প্রমদাবাবুকে লিখেছেনঃ "অভেদানন্দের রক্ত আমাশয় হইয়াছে। কৃপা করিয়া যদি তাঁহার তত্ত্ব লন এবং যিনি এ স্থান হইতে গিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে যদি মঠে ফিরিতে চান, পাঠাইয়া দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আমার গুরুভ্রাতারা আমাকে অতি নির্দয় ও স্বার্থপর বোধ করিতেছেন। কি করি, মনের মধ্যে কে দেখিবে। আমি দিবারাত্রি যে যাতনা ভুগিতেছি—কে জানিবে।"[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীর উপর গুরুভ্রাতাদের যে গুরুভার ন্যস্ত করেছিলেন সে সম্পর্কে স্বামীজী সর্বদাই সচেতন এবং আপন মুক্তির চেয়ে এই দায়িত্ব যে তাঁকে প্রতিনিয়ত কতখানি পীড়িত করেছিল তার প্রমাণ প্রমদাবাবুর কাছে লেখা ২৬ মে-র পত্রটিঃ "আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক লইতে রাজি।

"আমার উপর তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত। অবশ্য কেহ কেহ বেড়াইতে গেল সে আলাহিদা কথা কিন্তু সে বেড়ানো মাত্র, তাঁহার মত ছিল এই যে এক পূর্ণ সিদ্ধ তাঁহার ইতস্তত বিচরণ সাজে। তা যতক্ষণ না হয় একজায়গায় বসিয়া সাধনে নিমগ্ন হওয়া উচিত।"[৭]

স্বামীজী চেয়েছিলেন গুরুভাইদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং তার জন্য প্রমদাবাবুর সহায়তা কারণ তাঁর 'পশ্চিম দেশে (ভারতের)...মান সম্মান এবং আলাপও যথেষ্ট।' স্বামীজী লিখেছেনঃ "আমি প্রার্থনা করিতেছি যে যদি আপনার অভিরুচি হয়, উক্ত প্রদেশের আপনার আলাপী ধার্মিক ধনবানদিগের নিকট চাঁদা করিয়া এই কার্য নির্বাহ হওয়াকে আপনার উচিত কিনা বিবেচনা করিবেন।...আমি আপনার অনুমতি পাইলে ভবৎসকাশে উপস্থিত হইব এবং এই কার্যের জন্য আমার প্রভুর এবং প্রভুর সন্তানদিগের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত নহি।"[৮]

সম্ভবত প্রমদাবাবু এ প্রস্তাবে সম্মত হননি কারণ তাঁর কাছে লেখা পরবর্তী ৪ জুনের পত্রে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে জানিয়েছেনঃ 'আপনার পরামর্শ অতি বুদ্ধিমানের পরামর্শ তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে—খুব ঠিক কথা।'[৯]

এই পত্রটির পর থেকেই স্বামীজীর সঙ্গে প্রমদাবাবুর পত্রালাপে ছেদ পড়েছে কিন্তু প্রভুর সমাধিস্থল ও তাঁর সন্তানদের ব্যবস্থার উদ্যোগে ছেদ পড়েনি।

শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের আগে অথবা পরবর্তী কালে স্বামীজী ভারতের উন্নতির স্বার্থে সন্ন্যাসী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য অর্থসংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছেন। শ্রীমতী রাইট তাঁর মায়ের কাছে লেখা একটি পত্রে জানিয়েছেনঃ "তারপর জন (জন রাইট) তাঁকে

(স্বামীজীকে) চার্চে রবিবারের বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। সেখানে ওরা একটা পৌত্তলিক কলেজের জন্যে চাঁদা তুলল—সেটা কঠোরভাবে পৌত্তলিক নীতিতে চলবে।"[১০] এই 'পৌত্তলিক কলেজ' প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসীদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা—যে শিক্ষা লাভ করে তাঁরা বাংলা তথা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করবে—যে শিক্ষার মধ্যে থাকবে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ, ভূগোল, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মবিধি আবার তার সঙ্গে ধর্মচর্যা। পরবর্তী কালের চিঠিগুলিতে এই পরিকল্পনার কথা বার বার জানিয়েছেন স্বামীজী। ধর্ম সম্মেলনে সাফল্যের পর তিনি নিজেই অর্থ উপার্জনে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং তার জন্য নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। সংগঠন যে কি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেটা পাশ্চাত্য জগতে আরও ভাল করে উপলব্ধি করেছেন আর সেইসঙ্গে তাঁর গুরুভাইদের নিরাশ্রয় অবস্থা তাঁকে অবিরত বেদনায় তাড়িত করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গুরুভাইদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন—ভুলতে পারেননি গুরুর নির্দেশ। সে সময় যাঁরা তাঁকে দেশে ফেরার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেনঃ "যে মহাপুরুষ হুজুক সাঙ্গ করে দেশে ফিরে যেতে লিখেছেন তাঁকে বলো, কুকুরের মতো পা চাটা আমার স্বভাব নহে। যদি সে মরদ হয় তো একটা মঠ বানিয়ে আমাকে ডাকতে বলো। নইলে কার ঘরে ফিরে যাব। এদেশ আমার more (অধিক) ঘর—হিন্দুস্তানে কি আছে? কে ধর্মের আদর করে? কে বিদ্যের আদর করে? ঘরে ফিরে এস !!! ঘর কোথায়।"[১১]

প্রমদাবাবুকে লেখা পূর্বের পত্রখানির পাশাপাশি রেখে পড়লে স্বতই বোঝা যায় স্বামীজী বাঙালি তথা ভারতীয়দের মৌখিক আশ্বাস বা শুষ্ক সমাদরের উপর নির্ভর করতে পারেননি। 'ঘর' তৈরির (যা তাঁর গুরুভাইদের আশ্রয়স্থল হবে) ঐকান্তিক আগ্রহে 'হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করতে করতে অর্ধেক পৃথিবী প্রদক্ষিণ' করেছেন এবং তার জন্যই তাঁর আয়ুর সঞ্চয় অনেকাংশে ক্ষয়িত হয়েছে। ১৮৯৫-এ স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে লিখিত একটি পত্রে স্বামীজী যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সানুরাগ আনুগত্য প্রকাশ করেছেন তেমনি রামকৃষ্ণসন্তানদের প্রতি উদ্ঘাটন করেছেন তাঁর অকৃত্রিম বিশ্বাসঃ "এ দুনিয়া ঘুরে ঘুরে দেখেছি, তাঁর ঘর ছাড়া আর সব ঘরেই 'ভাবের ঘরে চুরি'। তাঁর জনের উপর আমার একান্ত ভালবাসা।... যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে—অন্য সকলকে আমি ভালবাসি।... আমি যে তাঁর জন ছাড়া আর কোথাও পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা দেখতে পাই না।"[১২] আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামীজীর চিঠিতে গুরুভ্রাতাদের অসুস্থতায় উদ্বেগ, তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে জানার আগ্রহ, কর্তব্য নির্দেশ (কোনও কোনও চিঠি মঠের সকল সন্ন্যাসীদের জন্য লিখিত) দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। মহাসমাধির কিছুদিন আগে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী বলেছিলেনঃ "এই সব ঠাকুরের সন্তান দেখছিস্—এরা সব অদ্ভুত ত্যাগী, এদের সেবা করে লোকের চিত্তশুদ্ধি হবে—আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হবে। 'পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' গীতার উক্তি শুনেছিস তো। এদের সেবা করবি, তাহলেই সব হয়ে যাবে।...

"ঠাকুর ওস্তাদ মালী ছিলেন কি না! তাই হরেকরকম ফুল দিয়ে এই সংঘরূপ তোড়াটি বানিয়ে গেছেন। যেখানকার যেটি ভাল সব এতে এসে পড়েছে... যারা সব

এখানে রয়েছে তারা এক একজন মহা সিংহ। আমার কাছে কুঁচকে থাকে বলে এদের সামান্য মানুষ বলে মনে করিসনি। এরাই আবার যখন বার হবে তখন এদের দেখে লোকের চৈতন্য হবে। অনন্ত ভাবময় ঠাকুরের অংশ বলে এদের জানবি। আমি এদের ঐভাবে দেখি। ঐ যে রাখাল রয়েছে, ওর মত spirituality (ধর্মভাব) আমারও নেই। ঠাকুর ছেলে বলে ওকে কোলে করতেন, খাওয়াতেন, একত্র শয়ন করতেন। ও আমাদের মঠের শোভা, আমাদের রাজা। ঐ বাবুরাম, হরি, সারদা, গঙ্গাধর, শরৎ, শশী, সুবোধ প্রভৃতির মতো ঈশ্বরবিশ্বাসী দুনিয়া ঘুরে দেখতে পাবি কিনা সন্দেহ। এরা প্রত্যেকে ধর্মশক্তির এক একটা কেন্দ্রের মতো। কালে এদের সব শক্তির বিকাশ হবে।"[১৩]

অন্য একদিন শরচ্চন্দ্রকে বলেছিলেন ঃ "ঠাকুর বলতেন, 'অবতারের সঙ্গে কালান্তরের সিদ্ধ ঋষিরা দেহধারণ করে জগতে আগমন করেন। তারাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ। তাদের দ্বারাই ভগবান কার্য করেন বা জগতে ধর্মভাব প্রচার করেন।' এটা জেনে রাখবি ভগবানের সাঙ্গোপাঙ্গ একমাত্র তারাই যারা পরার্থে সর্বত্যাগী। যারা ভোগসুখ কাকবিষ্ঠার মতো পরিত্যাগ করে 'জগদ্ধিতায়' 'জীবহিতায়' জীবনপাত করেন। ভগবান ঈশার শিষ্যেরা সকলেই সন্ন্যাসী।... History repeates itself যথাপূর্বং তথাপরং—এবারও তাই হবে। মহাসমন্বয়াচার্য ঠাকুরের কৃতী সন্ন্যাসী সন্তানগণই লোকগুরুরূপে জগতের সর্বত্র পূজিত হচ্ছে ও হবে।"[১৪]

॥ তিন ॥

শ্রীরামকৃষ্ণগত-প্রাণ শশী মহারাজ বিশ্বাস করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাস্থির পূজার মধ্যেই নিহিত আছে সিদ্ধিরূপ। তিনি স্বয়ং ভিক্ষা করে বরানগর মঠে নিত্য ঠাকুরের আনুষ্ঠানিক পূজাদি করতেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর এই নিয়েই মতবিরোধ। একদিন যখন বরানগর মঠে ঠাকুর ঘরে শশী মহারাজ পূজায় ব্যাপৃত তখন নরেন্দ্রনাথ সেই ঘরে ঢুকে তাঁকে ব্যঙ্গ করেন। শশী মহারাজ সেদিন নরেন্দ্রনাথের চুলের মুঠি ধরে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন।[১৫] আবার শশী মহারাজের একান্ত রামকৃষ্ণ-ভক্তির স্বীকৃতি জানাতে বরানগর মঠে সন্ন্যাস-নাম গ্রহণকালে নিজের জন্য 'রামকৃষ্ণানন্দ' নামের ইচ্ছাসত্ত্বেও শশী মহারাজের অধিকতর দাবি স্বীকার করে নিয়েছিলেন।[১৬]

শ্রীরামকৃষ্ণের এই আনুষ্ঠানিক পূজা সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কতটা আন্তরিক ছিল সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে একটি পত্রে স্বামীজী লিখেছেন ঃ "আরতি ও অন্যান্য বিষয়ে আপনি যাহা লিখিয়াছেন—ভারতের সর্বত্র প্রত্যেক মঠেই সে সকল প্রথা চলিত আছে দেখা যায় এবং গুরুপূজা সাধনার প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। ইহার ভালমন্দ দু'দিকই আছে সত্য কিন্তু একথাও স্মরণ রাখিবেন, আমাদের সম্প্রদায়ের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজের মতামত বা বিশ্বাস অন্যের উপর চাপাইবার কোন অধিকার আমরা রাখি না। যে গুরু আপনাদের ইতিহাসে বর্ণিত সমুদয় অবতার প্রথিত পুরুষগণ অপেক্ষা শত শত গুণে অধিক পবিত্র—সেই গুরুকে যদি কেহ আনুষ্ঠানিকভাবে পূজাই করে তবে

তাহাতে কি ক্ষতি হইতে পারে? যদি খ্রীস্ট, কৃষ্ণ বা বুদ্ধকে পূজা করিলে কোন ক্ষতি না হয় তবে যে পুরুষপ্রধান জীবনে চিন্তায় বা কর্মে লেশমাত্র অপবিত্র কিছু করেন নাই, যাঁহার অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত তীক্ষ্ণবুদ্ধি অন্যসকল একদেশদর্শী ধর্মগুরু অপেক্ষা উর্ধ্বতর স্তরে বিদ্যমান—তাঁহাকে পূজা করিলে কি ক্ষতি হইতে পারে?"[১৭] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য স্বামীজী স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক সঙ্গীত রচনা করে গেছেন, যা আজও সকল রামকৃষ্ণ সংঘে প্রতিদিন গীত হয়।

সেই শশী মহারাজই আবার জপধ্যান-নিরত সন্ন্যাসিগণের জন্য কতখানি ব্যাকুল ছিলেন সে সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথের সাক্ষ্যঃ "...(বরানগর মঠে) শৌচান্তে কেউ বা চান করে কেউ না করে ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসে জপধ্যানে ডুবে যেতুম।...শশী চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিয়েই থাকত এবং বাড়ির গিন্নীর মত ছিল। ভিক্ষাশিক্ষা করে ঠাকুরের ভোগরাগের ও আমাদের খাওয়ানো দাওয়ানোর যোগাড় ও-ই সব করত। এমন দিন গেছে যখন সকাল থেকে বেলা ৪/৫ টা পর্যন্ত জপধ্যান চলেছে। শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে কোনরূপে টেনে হিঁচড়ে আমাদের জপধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা! শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি।"[১৮] আবার স্বামীজীর নির্দেশে শশী মহারাজ সংগঠনেব কাজে মাদ্রাজে গিয়ে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণেব সকল সন্তানের দৃষ্টিতেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অভিন্ন—একই শক্তির দুইরূপ। কাশ্মীর থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামীজীকে লিখেছেনঃ 'এবার অমরনাথ দর্শনের পূর্বেই নরেন্দ্রনাথ দর্শন করিব।'[১৯] প্রসঙ্গক্রমে তিনি একদিন বলেনঃ 'এযুগে ঠাকুর স্বামীজীই প্রত্যক্ষদেবতা।' 'স্বামীজী তো একটা Principle (আদর্শ নীতি)-এর প্রতিমূর্তি! তিনি রক্ত-মাংসে গড়া ছিলেন না—আইডিয়া (ভাব) দিয়ে গড়া।'[২০]

স্বামী সারদানন্দ পুরীধামে শশী নিকেতনে বসে তাঁর উপলব্ধির শেষ কথা বলে গেছেন, 'স্বামীজীই তো একটা অবতার—ঠাকুরের কথা ছেড়েই দাও।'[২১]

বিজ্ঞানানন্দের দৃষ্টিতে 'স্বামীজী নিজেই একটি জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া ছিলেন। তিনি পৃথিবীর ও ভারতের স্থপতিবিদ্যার মূল রীতি, ধারাগুলির তত্ত্ব একদিন মুখে যা বর্ণনা করেন তা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই।'[২২]

শুধু তাঁরাই নন, শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সন্তানদের স্বামীজীর প্রতি আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত এবং সেই আনুগত্য জন্ম নিয়েছিল বরানগর মঠেই। স্বামীজীর পাশ্চাত্য বিজয়ের পরে নয়। পশ্চিমের দরজা যখন উন্মুক্ত হয়েছে তখন স্বামীজীর নির্দেশে অভেদানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ প্রমুখ গুরুভাইরা বেদান্ত প্রচারের কাজে বিভিন্ন সময়ে আমেরিকা, ইউরোপে অবস্থান করেছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দকে স্বামীজী আমেরিকা নিয়ে গিয়েছিলেন পাশ্চাত্য দেশে আদর্শ ব্রহ্মজ্ঞের নিদর্শন হিসাবে। দীর্ঘকাল স্বামীজীর সান্নিধ্যলাভের আশাতেই তাঁর প্রস্তাবে স্বামী তুরীয়ানন্দ এক কথায় রাজি হয়েছিলেন নির্দ্বিধায়। আমেরিকার প্রথম দুমাস তিনি 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম' গুরুভাইয়ের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে কাল কাটিয়েছেন কিন্তু স্বামীজী জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সন্তানই প্রবল শক্তির অধিকারী। তিনি নিজের ছায়ায় আচ্ছন্ন করে রেখে তাঁদের শক্তিকে খর্ব করতে চাননি। আমেরিকাবাসী শিষ্য-শিষ্যাদের কাছে তিনি বলেছিলেন, "আমার মধ্যে তোমরা ক্ষাত্রশক্তির বিকাশ দেখেছ। আমি তোমাদিগকে এমন

এক গুরুভাইকে পাঠাবো যিনি ব্রাহ্মণসুলভ গুণরাজির মূর্তবিগ্রহ। তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ। মানবজীবনে উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার বিকাশ কিরূপ হয় তাঁকে দেখলে বুঝতে পারবে।"[২৩]

আমেরিকায় দুমাস একত্র কাটাবার পর একদিন স্বামীজী বললেন, 'হরি ভাই, আমার তো আর টাকা-পয়সা নেই, সব ফুরিয়ে গেছে। তোমাকে খাওয়াতে পারব না, তুমি এবার পথ দেখ।'[২৪]

স্বামী তুরীয়ানন্দ আকস্মিক এই রূঢ় আঘাতে প্রথমে বিস্মিত ও বিমূঢ়—পরে খুঁজে পেলেন পথের নিশানা। তাঁর মনে পড়ল একবার মন্ট ক্লেয়ারের এক ভক্তিমতী মহিলা বলেছিলেনঃ "যদি কখনও আপনি আমার বাড়িতে এসে থেকে এ অঞ্চলে আধ্যাত্মিক প্রচারণার কাজ করেন, তাহলে আমি অত্যন্ত খুশি হব।" সামান্য তল্পিতল্পা বেঁধে স্বামীজীর আশ্রয় পরিত্যাগ করে তিনি চলে গেলেন মন্ট ক্লেয়ারে হুইলার দম্পতির আশ্রয়ে। ক্রমশ স্বামীজীর ছত্র-ছায়ায় লালিত ওষধি স্বয়ং মহীরুহে পরিণত হলেন। কিছুকাল পরেই স্বামীজী উপস্থিত হয়েছেন মন্ট ক্লেয়ারে। তুরীয়ানন্দজী তখন সে অঞ্চলে প্রচারণার কাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর কার্যাবলী ও প্রতিষ্ঠায় তৃপ্ত স্বামীজী বললেনঃ "দেখ হরি ভাই, তোমাকে কাজে নামাবার জন্যই কড়া কথা বলেছিলাম। এরা আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন কখনো দেখেনি, আমার কাছে শুনেছে মাত্র। তোমাকে ভারত থেকে আমেরিকায় নিয়ে এসেছি এইজন্য যে তোমার জীবন দেখে এরা বুঝবে আদর্শ হিন্দু সন্ন্যাসী কিরূপ। শুধু শোনা কথায় তো বিশ্বাস হয় না। তোমরা ঠাকুরের সন্তান—তোমাদের দেখলে মানুষের মনে ধর্মভাব জেগে উঠবে।"[২৫]

সারদানন্দ, অভেদানন্দ ও তুরীয়ানন্দের মনে প্রথমে দ্বিধা ছিল যে, বিবেকানন্দ যেভাবে পাশ্চাত্যবাসীর মনের উপর প্রভাববিস্তার করেছেন সেটা আর কারও পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু স্বামীজী জানতেন তাঁর সকল গুরুভাইয়ের মধ্যেই রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি শুধু পথ আবিষ্কার করেছেন, এই পথ ধরেই চলবে পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক অভিযান। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে যেমন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রবাহকে শুষ্ক হতে দেননি, তাঁর অবর্তমানেও যেন সেই ধারা থাকে অব্যাহতগতি।

॥ চার ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানদের মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে বাংলায় সমকালীন সমাজই তিনটি স্তরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই ত্রিস্তর সমাজের একটি অংশের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অমৃত আত্মস্থ করেছিলেন—বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশে ছিল সত্যকে জানার অদম্য সঙ্কল্প। কলকাতার সচ্ছল পরিবারের মানুষ হিসাবে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে এঁদের যোগসূত্র ছিল না। দ্বিতীয় স্তর থেকে এসেছিলেন গিরিশচন্দ্র (ইনি ত্যাগী সন্তান না হলেও শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে পেয়েছিলেন গৈরিক বস্ত্র—কিন্তু সংসারত্যাগের অনুমতি নয়। মঞ্চের মাধ্যমে লোকশিক্ষাবিস্তারের অভিপ্রায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ

তাঁর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেছিলেন)। গিরিশচন্দ্র পাশ্চাত্য সংস্কৃতির গরলটুকুই পান করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষাও কম ছিল না কিন্তু পাশ্চাত্য ভোগবাদের আকর্ষণে বিপথগামী, ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহহীন, অতিমাত্রায় দাম্ভিক ও উন্নাসিক। এই দাম্ভিকতা ও উন্নাসিকতাই প্রথম দুটি স্তর থেকে তৃতীয় স্তরকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। এই তৃতীয় স্তরে ছিল অগণিত সাধারণ মানুষ, স্বামীজীর ভাষায় যারা 'স্বজাতি-নিন্দিত, বিজাতি-বিজিত'। সমাজের এই স্তরেরই প্রতিনিধি লাটু মহারাজ। রাম দত্তের বাড়ির ভৃত্য আক্ষরিক অর্থেই নিরক্ষর। প্রথম দুটি স্তরের মানুষের কাছ থেকে তার পাওনা শুধুই উপেক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যে আসার পর প্রথম দিকে তিনি সকলের কাছেই লাটু বা লেটো—আর অন্যেরা তাঁর কাছে 'লোরেনবাবু' 'রাখালবাবু'। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু ধর্ম সমন্বয়াচার্যই ছিলেন না—তাঁর সামাজিক সমন্বয় ও সামঞ্জস্যবিধানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর ভক্তমণ্ডলী। তাঁর সংস্পর্শে তিনটি স্তরের পারস্পরিক দূরত্ব ঘুচে গেছে। যে নরেন্দ্রনাথ একসময় থিয়েটার যে ফুটপাথে পড়ে সে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতেন না তিনিই থিয়েটারের মঞ্চে অভিনয়ের পর উপবিষ্ট হয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন।

নরেন্দ্র-গিরিশ সম্পর্কটা ছিল অম্লমধুর। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্বন্ধে গিরিশ-প্রত্যয়কে কেন্দ্র করে উভয়ের বাদানুবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ রীতিমত উপভোগ করতেন। নরেন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের মন্তব্য থেকে আমরা জেনেছি সেগুলি ছিল False talk। প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে উত্তেজিত করে তাঁর মুখে রামকৃষ্ণস্তুতিই শুনতে চাইতেন অথচ বাহ্যিকভাবে তীব্র বিরোধিতার ভাবটি বজায় রাখতেন। গিরিশচন্দ্র পরবর্তী কালে বলেছেন : 'কি অশুভক্ষণে দু'জনে দেখা হয়েছিল—দেখা হলেই ঝগড়া কিন্তু ঝগড়া করে এত আনন্দ কখনও পাইনি।'[২৬] আর বিবেকানন্দ? নিজে হাতে গিরিশকে শিব সাজিয়েছেন কারণ ঠাকুর গিরিশকে বলতেন ভৈরবের অংশ। গিরিশের নাটককে (বিল্বমঙ্গল) আন্তর্জাতিক মানে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন—তাঁর নাটকের গান নরেনের সুখ-দুঃখের সাথী। পত্রাবলীর মধ্যে মাঝে মাঝেই গিরিশ-প্রসঙ্গ—তাঁর বিশ্বাসের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। সুরেন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর পর যখন রামকৃষ্ণ মঠের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে তখন শ্রীম ও গিরিশচন্দ্রই এগিয়ে এসেছেন অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। পাশ্চাত্য জগৎ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যখন বিবেকানন্দের কার্যপ্রণালীর সঙ্গে রামকৃষ্ণ ভাবধারার সম্পর্ক নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে তখন গিরিশ অকপটে ঘোষণা করেছেন, 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অভেদ।' "বিবেকানন্দ কার্য করিতেন, বলিতেন, তাঁহার গুরুর কার্য করিতেছেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দিহানচিত্ত পরমহংসদেবের ভাবের সহিত বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন—সম্পূর্ণ ভ্রম। এইমাত্র প্রভেদ, পরমহংসদেবের মহাজ্ঞান সাধারণের চক্ষে মহাভক্তি আবরণে আবরিত ছিল। বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান-আবরণে আবরিত। উভয়ের একই ভাব—কার্যে বিভিন্ন ভাবধারণ... জ্ঞান-ভক্তি এক—জ্ঞান বিবেকানন্দ, ভক্তি পরমহংস অভেদ।"[২৭]

রামকৃষ্ণ মিশন সংক্রান্ত কার্যাবলী শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবানুমোদিত কিনা এ বিষয়ে বিবেকানন্দের উপস্থিতিতেই কোনও কোনও রামকৃষ্ণসন্তানের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। স্বামী সারদানন্দ স্মৃতিচারণ করেছেন, "স্বামীজী থাকতে থাকতেই আমাদের ভিতর কেউ



শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী



ভগিনী নিবেদিতা



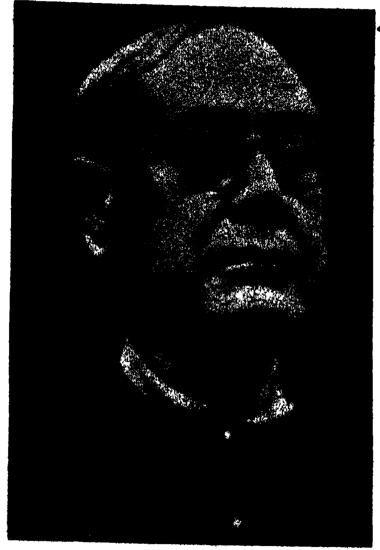
জে.জে গুডউইন



ভগিনী কৃস্টিন



মহেন্দ্রনাথ দত্ত



ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত



গুরুভাই ও স্বামীজীর শিষ্যবৃন্দ *দাঁড়িয়ে (বাঁদিক থেকে)*—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, নির্মলানন্দ, বিরজানন্দ, শিবানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অখণ্ডানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ, সারদানন্দ, সচ্চিদানন্দ, উপেন্দ্রমোহন দেব. *মাঝে উপবিষ্ট*—স্বামীজী ও নাদু *নীচে বসে*—সোমানন্দ, কল্যাণানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, আত্মানন্দ, সদানন্দ, সুরেশ্বরানন্দ, বোধানন্দ, নন্দলাল ব্রহ্মচারী, খেঁদা, প্রকাশানন্দ, ব্রজেন ও শুদ্ধানন্দ (বেলুড় মঠে গৃহীত, ১৯ জুন, ১৮৯৯)



মাদাব সেভিযাব



ক্যাপ্টেন সেভিয়ার

কেউ তাঁর কাজকর্ম অন্যভাবে দেখতে আরম্ভ করেন।... একদিন বলরাম বাবুর বাড়িতে যোগেন স্বামী [যোগানন্দ মহারাজ] প্রভৃতি ঐ কথা বলতে তিনি [স্বামীজী] অভিমান করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'আর শরীর রাখব না—ছেড়ে দেব' এই বলে নির্জনে বসে রইলেন। কারুর সঙ্গে কথাবার্তা নেই। শেষে মহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] আবার এসে তাদের বকাবকি করেন, 'সর্বনাশ, তোমরা এ কি করলে! এই পাগলে ক্ষ্যাপালে।' শেষে তিনিই ঠাণ্ডাঠুণ্ডি করেন।"[২৮]

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালেই লাটু মহারাজের শিক্ষা শুরু হয় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। নিরক্ষর হলেও ঠাকুরের প্রতি কথাই তিনি মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন, নরেন্দ্রনাথের আলোচনার প্রতিও ছিল তাঁর অখণ্ড কৌতূহল। শ্রুতির মাধ্যমেই তাঁর শিক্ষা অগ্রসর হয়েছে। অবশেষে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অন্যান্য ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গে তিনিও সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঠাকুরের কাছ থেকে গৈরিকবস্ত্র লাভ করেছেন। একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবৎপ্রেম, অন্য দিকে পরবর্তী কালে বিবেকানন্দের সাম্যদৃষ্টি লাটু মহারাজের চরিত্রে সম্পূর্ণতা দান করেছে। লাটু মহারাজ হয়ে উঠেছেন এক অপার বিস্ময়।

স্বামীজীর চিঠিপত্রে লাটু মহারাজের প্রসঙ্গ বার বার পাই কিন্তু লাটু সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে একদিনের ঘটনায়। কাশীপুরের বাগানে সেদিন বেদান্তগ্রন্থ পাঠ করছিলেন তিনি। (শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালে অথবা তার অব্যবহিত পরে)। পাঠ শেষ করে অন্য কথার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ বলেন, 'বেদান্ত আমি কি বলব? লেটো লোককে গিয়ে বলবে।' ঘটনাটি বর্ণনাপ্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ "এই কথা প্রথমে যেন অতি দাম্ভিকের উক্তির মতো বোধ হইতে লাগিল কিন্তু উত্তর কালে তাহাই হইয়াছিল, লাটুর মুখ দিয়া বেদান্তবাণী বাহির হইত আর অনেক শিক্ষিত পণ্ডিত লোক নিরক্ষর লাটুর মুখে সেই বাণী শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইত।"[২৯] আমার মনে হয়, বিবেকানন্দের এই কথার অন্য তাৎপর্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ ও রাখতুরামের মধ্যে কোনও ব্যবধান নেই কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সুগৃহিণীর মতো সকল সন্তানের জন্য পৃথক কর্মপ্রণালী নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে নরেন্দ্রনাথকে যেতে হয়েছিল বহির্বিশ্বে আর লাটু মহারাজের মতো ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল দেশীয় অগণিত সাধারণ মানুষের বৃত্তটি কারণ তাদের শিক্ষার জন্য তেমন মানুষ চাই যাঁরা আছেন মাটির কাছাকাছি, তাঁর প্রাণের ভাষা তাদের প্রাণকে স্পর্শ করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই তৃণমূল স্তর থেকে আহৃত।

॥ পাঁচ ॥

'বল—নরেন শিব! নরেন শিব! নরেন শিব!'—১৯১১ খ্রীস্টাব্দে শয্যাশায়ী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলছেন শিষ্য পুলিন মিত্রকে।[৩০]

কিন্তু শিব তো শুধু আশুতোষ নন—কখনও কখনও তাঁর রুদ্রমূর্তি। এই দুই বিরোধী ভাবের সমন্বয়েই ভারতীয় শিবচেতনা। নরেন্দ্রনাথ কখনও শিশু ভোলানাথ আবার কখনও তাঁর সংহার মূর্তি। বিশেষ করে শেষ জীবনে যখন তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছে—নানাবিধ

অসুস্থতায় জীর্ণ, তখনই গুরুভ্রাতা শিষ্য সেবকদের প্রতি মাঝে মাঝে ক্রোধে ফেটে পড়েছেন কিন্তু সেটা সাময়িক অবস্থামাত্র—পরক্ষণেই আবার নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন—আত্যন্তিক সহানুভূতিতে তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়েছে। ক্রোধের এই সাময়িক আক্রমণটা প্রধানত গ্রহণ করতেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেন, "কোন কারণে চটিয়া গিয়া স্বামীজী যখন অকথ্য গালিগালাজ করিতে থাকিতেন, কোমলপ্রকৃতি মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) উহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িতেন ; কখনো বা নিজের ঘরে দরজা ভেজাইয়া দিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতেন আর উত্তেজিত হওয়ার ফলে স্বামীজীর শরীর হয়ত আরও খারাপ হইবে ভাবিয়া চিন্তাকুল হইতেন। রাগ পড়িয়া গেলে স্বামীজী হয়ত ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতেন—কত কী বলিয়া মার্জনা চাহিতে লাগিলেন—রাজা ভিন্ন কেই বা তাঁহার বদমেজাজ সহ্য করিবে?"[৩১]

মাঝে মাঝে হত কৌতুক-কলহ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইচ্ছা করেই শুরু করতেন ঝগড়া। স্বামীজীর মটরু, হংসী, বাঘা প্রভৃতি জীবজন্তুরা মঠের বাগানের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করলেই—লেগে যেত উভয়ের ঝগড়া, অবশ্য তার মধুর পরিণতিতে বিলম্ব হত না।

নিজের সাময়িক উত্তেজনা যে স্বামীজীর কাছে কতখানি বেদনাদায়ক ছিল তার পরিচয় পাই একটি ঘটনায়। সে বছর (১৯০১ খ্রীস্টাব্দ) মঠে প্রতিমায় দুর্গাপূজা (স্বামীজীর জীবৎকালে সেই প্রথম ও শেষ দুর্গাপূজা)। শ্রীমা গিয়েছেন পূজায় যোগদান করতে। মহাষ্টমীর দিন সকলে কর্মব্যস্ত—স্বামীজী এসে শ্রীমাকে বললেন, 'মা আমার জ্বর করে দাও।' বলতে না বলতেই ধুম জ্বর। শ্রীমা রীতিমত আতঙ্কিত—এই বিরাট কাজের বোঝা এখন কি হবে! স্বামীজী বললেন : 'কোন চিন্তা নেই মা—আমি সেধে জ্বর নিলুম এইজন্যে যে, ছেলেগুলো প্রাণপণ করে খাটছে তবু কোথায় কি ত্রুটি হবে, আর আমি রেগে যাব, বকবো, চাই কি দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসবো, তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।' কাজকর্ম যথারীতি চুকলো। শ্রীমা গিয়ে নরেন্দ্রনাথকে বললেন, 'ও নরেন, এবার তাহলে ওঠ।' নরেন্দ্রনাথও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন ; সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ।

শাসন বা কলহের অন্তরালে যদি স্নেহের ফল্গুধারা প্রবাহিত থাকে তাহলে কোনও মতান্তরই মনান্তরে পরিণত হয় না। বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অপার্থিব স্নেহের উত্তরাধিকার। এই স্নেহ ও প্রীতির বারিসিঞ্চনে বরানগর মঠের শিশু বৃক্ষটি পরবর্তী কালে বিশ্বব্যাপী মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

ভালবাসার বন্ধনে যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম ভালবাসার শৃঙ্খলই তাকে অফুরান প্রাণ দান করেছে।

শিকাগো ধর্মমহাসভার পরিপ্রেক্ষিত, স্বামীজীর বহুমুখী কর্মোদ্যোগ এবং স্ত্রীমঠের পরিকল্পনা

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

একত্রিশ মে ১৮৯৩। দিনটি ঐতিহাসিক। বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়ল আমেরিকার উদ্দেশে। জাহাজের অন্যতম আরোহী স্বামী বিবেকানন্দ। উদ্দেশ্য—শিকাগোয় বিশ্বধর্মসভায় যোগদান। নানা চিন্তায় তাঁর মন ভারাক্রান্ত। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণান্তে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তা ছিল নিতান্তই বেদনাদায়ক। ভারতের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অজ্ঞান ও কুসংস্কারে তাঁর অন্তরাত্মা অতিশয় ব্যথিত, কাতর। সেইসঙ্গে ক্ষুদ্র আশা, ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি নিঃশেষ হয়নি। যে ভাবেই হোক সে শক্তি এখনও অক্ষুণ্ণ এবং তার বিনাশ নেই।

জাহাজ ক্রমে ক্রমে কলম্বো, মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং (চীন) প্রভৃতি অতিক্রম করে উপস্থিত হয় জাপানের নাগাসাকি বন্দরে। ছাত্রের উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে স্বামীজী প্রতিটি দেশ ও দেশবাসীকে পর্যবেক্ষণ করেন। বিশেষ করে জাপান তাঁকে মুগ্ধ করে।

সেখানে কয়েকদিন অতিবাহিত করে ইয়োকোহামা বন্দর থেকে স্বামীজী 'এম্প্রেস' জাহাজে জাপান ত্যাগ করেন। অবশেষে ২৫ জুলাই তিনি উপনীত হন আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ভ্যাঙ্কুবরে। বহু কষ্টে ৩০ জুলাই শিকাগো পৌঁছে জানতে পারলেন তখনও বিশ্বধর্মমহাসভার অনেক দেরি। উপরন্তু মহাসভায় প্রতিনিধিরূপে মনোনীত হওয়ার প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্র তাঁর সঙ্গে নেই এবং প্রতিনিধিত্বের জন্য আবেদনের সময়সীমাও অতিক্রান্ত। স্বামীজী হতাশ হলেও একেবারে আশা-ত্যাগ করলেন না। বিশ্বধর্মমহাসভা পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু ততদিন তাঁর পক্ষে শিকাগোয় অবস্থান আর্থিক এবং নানাবিধ সমস্যার জন্য সম্ভব ছিল না। তিনি সাময়িকভাবে শিকাগো ত্যাগ করে বস্টনে চলে যাওয়া স্থির করেন। এ সময় শ্রীমতী ক্যাথেরিন অ্যাবট স্যানবর্ণ নামক এক প্রৌঢ়া মহিলা তাঁকে ম্যাসাচুসেট্স্ প্রদেশের 'ব্রিজি মেডোজ' নামে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান।

এই সময়েই তাঁর পরিচয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জন হেনরি রাইটের সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেন। শ্রীযুক্ত জন রাইট স্বামীজীকে ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হওয়ার জন্যে এক পরিচয়পত্রও দেন। তাতে মহাসভার প্রতিনিধি-নির্বাচক-কমিটির সেক্রেটারিকে লেখেনঃ 'ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে আমাদের সকল অধ্যাপককে একত্র করলেও তাঁরা তাঁর সমকক্ষ হবেন না।'[১] স্বামী বিবেকানন্দ নির্ধারিত সময়ে শিকাগোয় ফিরে এসে দেখলেন ধর্মমহাসভার জেনারেল কমিটির চেয়ারম্যান রেভারেণ্ড জন হেনরি ব্যারোজের ঠিকানা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। ফলে শিকাগো সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্বামীজীকে অসম্ভব অসুবিধার সম্মুখীন

হতে হয়। এরপর কিভাবে তিনি শ্রীমতী হেলের সহায়তায় ধর্মমহাসভার অফিসে যান ও প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হন, সে অত্যাশ্চর্য কাহিনী সকলেরই জানা।

অবশেষে ১১ সেপ্টেম্বর অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত হলেন মহাসভার বিশাল মঞ্চে। স্বভাবতই তাঁর গৈরিক বসন, উষ্ণীষ, প্রদীপ্তনয়ন, সুন্দর উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ রাজকীয় দৃপ্তভঙ্গি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বামীজীর অবস্থা কিন্তু তখন প্রায় কুরুক্ষেত্রে বিচলিত অর্জুনের মতো। সকলেই বক্তৃতা তৈরি করে এনেছিলেন এবং সুন্দর বললেন অনেকেই। স্বামীজী লিখছেনঃ 'তাঁরা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করে এনেছিলেন। আমি নির্বোধ, কিছুই প্রস্তুত করিনি।'[২] অবশেষে তিনি দাঁড়ালেন। প্রচলিত রীতি 'Ladies and Gentlemen'-এর পরিবর্তে তিনি সম্বোধন করলেন 'Sisters and Brothers of America' বলে। এরপরে কয়েক মিনিটব্যাপী সম্মিলিত করতালিধ্বনিই কি তাঁর পাশ্চাত্যবিজয়ের সূচনা করেনি?

সিস্টার নিবেদিতা-প্রদত্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত মর্ম—তিনি যখন সেই মঞ্চে দণ্ডায়মান, তখন তাঁর সামনে ছিল এক চিত্র যা তারুণ্যপূর্ণ, উচ্ছল, আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বেল; অধিকন্তু অনুসন্ধিৎসু এবং সজাগ। "অপরদিকে তাঁর পশ্চাতে ছিল এক মহাসাগর—বহু যুগের অধ্যাত্মসাধনায় প্রশান্ত;... এমন একটি জগৎ যার আরম্ভ হয়েছে বেদ ও উপনিষদ থেকে...একটি শান্ত ভূখণ্ড গ্রীষ্মমণ্ডলের সৌরকরাচ্ছন্ন, যে-দেশের পথের ধূলি-কণা যুগ যুগ ধরে সাধুসন্তের পাদস্পর্শে পবিত্র, সংক্ষেপে তাঁর পশ্চাতে ছিল ভারতবর্ষ।"[৩]

বক্তৃতা দিতে উঠে স্বামীজী প্রাচীনতম সন্ন্যাসী-সমাজের পক্ষ থেকে সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন যে, তিনি এমন এক দেশের ধর্মসম্প্রদায় থেকে আগত যা কেবল সকল ধর্মকে সহ্যই করে না, সকল ধর্মকে সত্য বলে মনে করে। তারপর তিনি দুটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করেন। প্রথমটি—

'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।'[৪]

যার সরলার্থ—বিভিন্ন নদীসমূহের উৎস এবং গতি বিভিন্ন হলেও তাদের লক্ষ্যস্থল এক—সমুদ্র। সেইরকম সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের মত ও পথ বিভিন্ন হলেও গন্তব্যস্থল এক। দ্বিতীয় শ্লোকটি—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।'[৫]

—যিনি যে প্রকারে আমার উপাসনা করেন, আমি তাঁহাকে সেইরূপ ফলপ্রদান দ্বারাই অনুগৃহীত করি। হে পার্থ, বর্ণাশ্রমাদি-ধর্মনিষ্ঠ মনুষ্যগণ সকল প্রকারে আমার পথের অনুসরণ করেন। এক কথায় তিনি সেই অদ্বৈতবেদান্তেরই মহিমা ঘোষণা করলেন যা সকলকে গ্রহণ করে, কাউকে বর্জন করে না।

স্বামীজী এরপর আরও কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ কুয়োর ব্যাঙের গল্পটি বলেন। কুয়োর ব্যাঙ কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে, সাগর তার কুয়োর থেকে বড়। এ নিয়ে দুই ব্যাঙের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হয়। গল্পের শেষে স্বামীজী উল্লেখ করেন : "এইপ্রকার অনুদার ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ।... আপনারা যে আমাদের সংকীর্ণ মতগুলি খণ্ডনের চেষ্টা করছেন সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।"[৬]

মহাসভায় একটিমাত্র লিখিত যে ভাষণ তিনি পাঠ করেন, তা হল 'হিন্দুধর্ম'। একথা সত্য ধর্মমহাসভায় তিনি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতেই গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে 'হিন্দুধর্মে'র সংজ্ঞা কি ছিল? তিনি কিন্তু কোনও সঙ্কীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি ছিলেন না। স্বামীজীর মতে প্রাচীন বৈদিক ধর্মই 'হিন্দুধর্ম' নামে অভিহিত। কিভাবে সেই প্রাচীন বৈদিকযুগ থেকে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে আর্যধর্মের রূপান্তর ঘটল হিন্দুধর্মে তা ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়।

এই 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধটি যদি কেউ মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন, তাহলে দেখবেন সেই অনন্ত সত্তা অথবা এক মহাশক্তির কথাই বলা হয়েছে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদের কথা উল্লেখ করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন : "বেদ শব্দ দ্বারা কোন গ্রন্থবিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করে গেছেন, বেদ সেই সকলেরই সঞ্চিত ভাণ্ডারস্বরূপ।"[৭] এই চিরন্তন সত্যসমূহ যাঁদের নিকট প্রতিভাত হয়, তাঁরাই বেদবিদ্, মন্ত্রদ্রষ্টা বা ঋষি। তিনি অতি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন, যাঁদের বলা হত মন্ত্রদ্রষ্ট্রী। এই বক্তৃতাতেই স্বামীজী সকলকে সম্বোধন করে বলেন তাঁরা অমৃতের সন্তান। অমৃতত্বলাভে তাঁদের জন্মগত অধিকার। স্বামীজীর উক্তি : "তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্যভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। ...ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হয়ে তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করছ, ভ্রমজ্ঞান দূর করে দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির আনন্দময়।"[৮]

এখন প্রশ্ন তিনি এত বিস্তৃতভাবে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কেন বললেন? ভারতীয়দের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের নামে তখন খ্রীস্টান মিশনারি কর্তৃক যে অপপ্রচার চলেছিল সম্ভবত তার প্রতিবাদে তিনি হিন্দুধর্মের যথার্থ স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী ছিলেন। স্বামীজী এই প্রবন্ধে মূলত দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন—এক, সকল ধর্মই সত্য। দ্বিতীয়, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা প্রয়োজন। কারণ বেদোক্ত ধর্ম বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যেরই সন্ধান দেয়। পূর্বেই বলেছি স্বামীজী তাঁর আলোচনায় সেই এক অনন্ত সত্তারই আভাস দিয়েছেন। এক কথায় তিনি বেদান্তপ্রচার করেন।

২৭ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভার শেষ বক্তৃতায় সকলকে আহ্বান করে অপর ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং দ্বেষভাব পরিত্যাগ করতে অনুরোধ জানান এবং সর্বশেষে বলেন : 'Help and not Fight,' 'Assimilation and not Destruction', 'Harmony and Peace and not Dissension'[৯] ('বিবাদ নয় সহায়তা,' 'বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ' ; 'মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'।)

ধর্মমহাসম্মেলন শেষ হলে শিকাগো শহরে এবং অন্যত্রও স্বামীজীর চিত্রসহ তাঁর বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়। বিজয়লাভে কিন্তু স্বামীজীর আনন্দ ছিল না। সেই রাত্রে ধনী-গৃহের রাজোচিত পালঙ্কে তিনি গর্ব ও আনন্দ সহকারে নিদ্রা যেতে পারেননি। ভূতলে শয্যাগ্রহণ করে তিনি বালকের মতো কেঁদেছিলেন তাঁর দীনা ভারতমাতাকে স্মরণ করে।

মহাসভার পরে ২ অক্টোবর তিনি তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শ্রীযুক্ত রাইটকে এক পত্র দেন। ঐ পত্রে স্বামীজীর তৎকালীন মানসিকতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। স্বামীজীর ভাষায়ঃ "সেখানে তাঁদের সামনে দাঁড়াতে এবং বক্তৃতা দিতে আমার কী যে ভয় হচ্ছিল! কিন্তু প্রভু আমাকে শক্তি দিয়েছেন। ...যদি আমি সফল হয়ে থাকি, তিনিই শক্তিসঞ্চার করেছেন ও যদি আমি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে থাকি—তা যে হবো আমি আগে থেকেই জানতাম—তার কারণ আমি নিতান্ত অজ্ঞান।

"...প্রভু ধন্য, জয় হোক তাঁর, তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে ভারতের দরিদ্র অজ্ঞ এক সন্ন্যাসী এই মহাশক্তির দেশে পণ্ডিত ধর্মযাজকদের সমতুল্য গণ্য হয়েছে। প্রিয় ভ্রাতা, জীবনের প্রতিটি দিনে আমি যেভাবে প্রভুর করুণা পাচ্ছি, আমার ইচ্ছে হয়, ছিন্নবস্ত্রে ও মুষ্টিভিক্ষায় যাপিত লক্ষ লক্ষ যুগব্যাপী জীবন দিয়ে তাঁর কাজ করে যাই—কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর সেবা করে যাই।

"...আমি প্রভুর দ্বারা চালিত হয়ে এসেছি—...আমি এখন স্পষ্ট বুঝেছি যে, যিনি আমাকে হিমালয়ের তুষারশৈলে কিংবা ভারতের দগ্ধ প্রান্তরে পথ দেখিয়েছেন, তিনিই এখানে পথ দেখাবেন, সাহায্য করবেন।"

স্বামীজী কিন্তু তখনই ভারতে প্রত্যাবর্তন না করে তিন বৎসরেরও অধিক পাশ্চাত্যে অবস্থান করেন। তিনি বিত্তবানের গৃহে মর্যাদা সহকারে আমন্ত্রিত হয়েছেন আবার কখনও বা হোটেল থেকে বিতাড়িত হয়েছেন তাঁর বর্ণের জন্য। স্বামীজীর একান্ত অভিপ্রায় ছিল তিনি খ্রীস্টান মিশনারিদের বিকৃত প্রচার খণ্ডন করবেন। তাঁর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল কিছু অর্থসংগ্রহ করা যাতে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সফল হয়। তৃতীয়ত তিনি চেয়েছিলেন গভীরভাবে পাশ্চাত্যকে জানতে এবং তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালীর মর্মার্থ গ্রহণ করতে। স্বামীজী ছিলেন আদানপ্রদানে বিশ্বাসী। তাই নিঃসঙ্কোচে বলেছিলেনঃ "পাশ্চাত্যদেশ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। তাদের (পাশ্চাত্যদেশ) থেকে আমাদের শিল্পবিজ্ঞান—বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানসমূহ শিখতে হবে, আবার পাশ্চাত্যবাসীদের আমাদের কাছে এসে ধর্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষাও আয়ত্ত করতে হবে।"[১০]

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ঐ সময়ে এক আশ্চর্য আধ্যাত্মিকতার স্ফুরণ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে বক্তৃতাকালে তিনি সহজেই সকলের মন জয় করে নিতেন। সত্যই স্বদেশ-বিদেশের প্রভেদ তাঁর কাছে আর ছিল না। সকলেই ছিল তাঁর একান্ত আপনার। বক্তৃতাদান কালে একদিকে যেমন তিনি বাগ্মিতা ও প্রতিভার জন্য অভিনন্দন লাভ করেছেন, তেমনিই অনেক উদ্ভট প্রশ্নের সম্মুখীনও তাঁকে হতে হয়। ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার কি ভয়াবহ ও অতিরঞ্জিতই ছিল! আমরা অতীব কৃতজ্ঞ শ্রীমতী লুইস বার্কের কাছে যিনি মূল ঘটনার বহুদিন পরে ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'নতুন আবিষ্কার সমূহ' (New Discoveries) পুস্তকে নানাবিধ চিত্রসহ সেই বিকৃত তথ্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করেন।

সে সময়ে আমেরিকায় খ্রীস্টান মিশনারি কর্তৃক প্রচারিত ছিল—ডায়মণ্ড হারবারের কাছে যে গঙ্গা, যার প্রসার স্বতই বিশাল—যার অপর পারের তটরেখামাত্র দেখা যায়, তা শিশুদের কঙ্কালরাশিতে পূর্ণ! এ সম্পর্কে স্বামীজীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি একটু গম্ভীর হয়ে কৌতুকের ভঙ্গিতে বলেন, তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন তাঁকেও গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু এরকম এক হৃষ্টপুষ্ট শিশু কুমিরেরা গিলতে রাজী হল না।[১১]

এ ধরনের বহু প্রশ্নই তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করা হয়। ক্রমে ক্রমে তিনি আমেরিকায় বস্টন, অ্যানিস্কোয়াম, সালেম, ইভানস্টোন, ম্যাডিসন, মিনিয়াপোলিস, মেমফিস, ডেট্রয়েট প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। সর্বত্রই তিনি সাদরে অভ্যর্থিত হন। অসামান্য প্রতিভা ও অগ্নিময় বাগ্মিতায় সকলকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করে রাখার শক্তি তাঁর ছিল। আমেরিকা বাসকালে কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু তিনি লাভ করেন—যেমন হেল পরিবার, লায়ন পরিবার, লেগেট দম্পতি, মিস ম্যাকলাউড, মিসেস বুল ও আরও অনেকে। তিনি নিউ ইয়র্কে একটি বেদান্ত প্রচারকেন্দ্রও স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি একবার লণ্ডন ঘুরে আসেন।

এই বৎসরই শেষের দিকে শ্রীযুক্ত জে. জে. গুডউইন স্বামীজীর বক্তৃতার সাঙ্কেতিক লিপিকার (Stenographer) নিযুক্ত হন। পরে গুডউইন তাঁর কাজে আত্মনিবেদন করেন।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে এলিজাবেথ মার্গারেট নোবলের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ঘটে। প্রথম দর্শন ও বক্তৃতা শ্রবণেই মার্গারেট নোবল বিশেষ আকৃষ্ট বোধ করেন। কৌতূহলী হয়ে এক হিন্দু যোগীর দর্শন মানসে তাঁর আগমন। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে তাঁর মনে হয় এ যাবৎ যা কিছু তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট বলে মনে হয়েছে তা সবই এক ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ করতে পারেন এমন চিন্তাশীল ব্যক্তির দর্শন ইতিপূর্বে তাঁর জীবনে ঘটেনি।

স্বামীজী পুনরায় আমেরিকা চলে যান। ইতিমধ্যে মার্গারেটের মনোরাজ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মার্গারেট তাঁর বক্তৃতাগুলির উপর চিন্তা করতে লাগলেন। দীর্ঘ চিন্তার পর স্বামীজীর বক্তৃতা সম্বন্ধে তাঁর কাছে কতকগুলি বিষয় পরিস্ফুট হয়। মার্গারেট বিশেষ করে হৃদয়ঙ্গম করেন যে, মানবপ্রকৃতির মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা সুন্দর, স্বামীজী ধর্মের নামে তাকেই আহ্বান করেছেন।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আগমন লণ্ডনে। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিকতায় যে কয়জন ইংরেজ মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেভিয়ার দম্পতি তাঁদের অন্যতম। তাঁরা স্থির করেন ভারতের কাজে জীবন উৎসর্গ করবেন। ভারতে আগমনের পর তাঁরা হিমালয়ের ক্রোড়ে স্বামীজীর অভিপ্রায় অনুযায়ী মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করেন।

॥ দুই ॥

সেভিয়ার দম্পতি ও গুডউইন সহ স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন কালে কলম্বোয় উপনীত হন ১৫ জানুয়ারি ১৮৯৭। কলম্বো তখন ভারতের অঙ্গস্বরূপ। অতঃপর ভারতের মূল ভূখণ্ডে রামনাদ, মাদুরা, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ ও বক্তৃতা প্রদানের পর অবশেষে উপস্থিত হন কলকাতায় ১৯ ফেব্রুয়ারি। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তাঁকে শোভাযাত্রা

করে নিয়ে যাওয়া হয়। এক সপ্তাহ পর ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নাগরিকগণের পক্ষ থেকে শোভাবাজারের রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে বিদেশে বেদান্তপ্রচারে সাফল্য উপলক্ষে তাঁকে বিরাট সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উত্তরে স্বামীজীর বক্তৃতা ছিল অত্যন্ত মনোগ্রাহী।

১ মে ১৮৯৭ স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের বাগবাজারে বলরামবাবুর গৃহে এক সভায় আহ্বান করেন। সেখানে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের নামানুসারে সংঘের নামকরণ হয় রামকৃষ্ণ মিশন। মিশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সংক্ষেপে লোকসাধারণের সেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠা তারও পূর্বে। কাশীপুরে অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সে মঠের পত্তন করেন। স্বামীজীর প্রথম কর্তব্য হল এই সংঘকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সেইসঙ্গে সন্ন্যাসীদের নব আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। পুরাতন রীতি অনুসারে কেবল 'আত্মনো মোক্ষার্থং' নয়, সন্ন্যাসীদের সদা প্রস্তুত থাকতে হবে 'জগদ্ধিতায়' জীবন বিসর্জনে। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে বেলুড়ে নিজস্ব জমিতে মঠ (বর্তমান বেলুড় মঠ) প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ সময় স্বামীজী যে কয়টি সঙ্কল্প গ্রহণ করেন সবই এক কথায় বিস্ময়কর এবং বলা চলে বিপ্লবাত্মক। সাধু-সন্ন্যাসীর চির-আকাঙ্ক্ষিত ভগবৎ ধ্যান-ধারণায় তন্ময় হয়ে থাকার পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন তারা অজ্ঞ-আর্ত-দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় জীবন দান করুক। তাই প্রচলিত রীতি অনুসরণ না করে বলেনঃ "আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, আর্ত এরাই তোমার দেবতা হোক, এদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।"[১২]

স্বামীজীর এই ঘোষণা উপনিষদের সেই মহান সূত্রটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়—

'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।'[১৩]

—ব্রহ্মের সর্বত্র কর ও চরণ, সর্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্বত্র কর্ণ; তিনি সংসারের বস্তুমাত্রকেই ব্যাপ্ত করে বর্তমান আছেন। অর্থাৎ এক কথায় স্বামীজী অন্য কোনও দেবতা নয়, সেই বিরাটরূপী নরনারায়ণের পূজার কথাই বলেছিলেন। এটা ছিল তাঁর অনন্য উপলব্ধি। সেই বিরাটের অনুভূতি স্বামীজীর চিন্তায় কতদূর পরিব্যাপ্ত হয়েছিল তা ধারণা করা যায় তাঁর লেখা একটি পঙ্‌ক্তি থেকে—

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।।"[১৪]

ভারতের শ্রমজীবী বা শ্রমিক সম্প্রদায়কে সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানান স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নির্ভীক সম্ভাষণেঃ "ঐ যারা চাষাভূষা, তাঁতি-জোলা, ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল থেকে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না।... আমাদের গরীবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি নিঃস্বার্থতা,

কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী—তোমাদের প্রণাম করি।"[১৫] স্বামী বিবেকানন্দ দিব্যদৃষ্টিসহায়ে দেখেছিলেন শ্রমিক সম্প্রদায় বা জনসাধারণের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী এবং ভয়ঙ্কর সংক্ষোভ, ভীষণ আলোড়নের মধ্য দিয়ে গণ অভ্যুত্থান ঘটবে। জাতি বর্ণ সব একাকার হয়ে যাবে। বাস্তবিক বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের চোখের সামনে সে গণ অভ্যুত্থান ঘটছে—আর সত্যই তার রূপ ভয়ঙ্কর।

স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম ঘোষণা—নারীজাতির সামগ্রিক উন্নতি ব্যতীত ভারতের পুনর্জাগরণ অসম্ভব। যেসব মহাপুরুষগণ নারীজাতির শিক্ষার ও উন্নতির চেষ্টা করেছেন তাঁরা আমাদের নমস্য এবং ধন্যবাদার্হ। কিন্তু একমাত্র স্বামীজীর বাণীতেই আমরা মেয়েদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার কথা শুনতে পাই। স্বামীজীর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল শিক্ষালাভ করলে মেয়েরা নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করবে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ তাদের হাতেই থাকবে। বিস্মিত হই যখন দেখি বর্তমান যুগে শিক্ষিতা নারী কারও অপেক্ষা না করে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই স্থির করতে সক্ষম।

তৎকালীন ভারতে নারীজাতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও পুরুষশাসিত সমাজের পীড়নে তাঁরা ছিলেন মুখ্যত অন্তঃপুরচারিণী। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সে যুগে অকল্পনীয়। আমেরিকান নারীপ্রগতি খুব স্বাভাবিকভাবেই স্বামীজীকে তাঁর স্বদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বামীজী লিখছেনঃ "এ (আমেরিকা) যেন নারীগণের স্বর্গস্বরূপ। আমেরিকার নারী ও সাধারণ লোকের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করলে তৎক্ষণাৎ তোমার মনে এই ভাব উদিত হবে।" (২ নভেম্বর ১৮৯৩)

যে ভারত একদিন গার্গী, মৈত্রেয়ী, মদালসার মতো বিদুষী ও ব্রহ্মবাদিনীর জন্ম দিয়েছে, সেই ভারতে নারীর হীনদশা তাঁকে ব্যথিত করেছে। নারীজাতির উন্নতির জন্য তিনি শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে মেয়েদের মঠের পরিকল্পনা করেছেন, যেখানে শৈশবে বিধবা, অবিবাহিতা মেয়েরা চিরকুমারী ব্রত অবলম্বনে ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী তৈরি হবে। এরাই কালে মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং এদের দ্বারাই হবে ভারতে যথার্থ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার। ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংযম হবে এদের অলঙ্কারস্বরূপ, সেবাধর্ম হবে জীবনব্রত। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত ও ইচ্ছা তিনি গুরুভাইদের বিভিন্ন পত্রে জানান ও পরেও বিভিন্ন বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। শ্রীশ্রীমা তখন বর্তমান। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মহাসাধিকারা—যেমন গোলাপ-মা, যোগীন-মা, গোপালের মা, গৌরী-মা প্রমুখ। গৌরী-মা অসীম সাহসের সঙ্গে সেই যুগে মেয়েদের জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করেন যা 'সারদেশ্বরী আশ্রম' নামে পরিচিত। শ্রীশ্রীমার কাছে যেসব মহিলারা থাকতেন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল—সাধনভজন দ্বারা ঈশ্বরলাভ—সুতরাং বলতে গেলে সে গৃহের আবহাওয়াই ছিল মঠের মতো।

জানুয়ারি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে মার্গারেট নোবলের প্রথম আগমন ভারতবর্ষে। কলকাতায় তিনি শ্রীশ্রীমার নিকট অবস্থানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। আশ্চর্য, শ্রীশ্রীমাও তাঁকে সাদরে স্বগৃহে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭ শ্রীমতী ওলি বুলকে লেখেনঃ "সন্ন্যাসীদের জন্য একটি এবং মেয়েদের জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই আমার মৃত্যু হলে আমার জীবনব্রত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।" স্বামীজী আবার অন্যত্র বলছেনঃ "দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতে ঋষি মুখাগত ধর্মপ্রচার করলে আমি

দিব্যচক্ষে দেখছি, এক মহান তরঙ্গ উঠবে, যা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করে ফেলবে।"[১৬] ভারতের নারীসমাজের জাগরণকল্পে সেই সময়ে প্রয়োজন ছিল একজন প্রকৃত সিংহিনীর। উপরন্তু স্বামীজীর অভিপ্রায় ছিল সেযুগে মেয়েদের মধ্যে যিনি কাজ করবেন, তাঁর থাকা চাই পাশ্চাত্যের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা, সেইসঙ্গে থাকবে প্রাচ্যের নমনীয়তা, কোমলতা ও ধ্যানপরায়ণতা। সিস্টার নিবেদিতা লিখছেন স্বামীজী চেয়েছিলেনঃ "কর্মক্ষেত্র ব্যতীত তাদের কোন গৃহ থাকবে না, ধর্মই হবে তাদের একমাত্র বন্ধন এবং ভালবাসা থাকবে কেবল গুরু, স্বদেশ এবং জনগণের প্রতি।"[১৭] স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেট নোবলের মধ্যে সে তেজ ও আবেগ দেখতে পান। তিনি ছিলেন ভারত কল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সে সময়ে ভারতে স্ত্রীমঠ স্থাপনের অনুকূল আবহাওয়া ছিল না। তাই তার প্রথম পদক্ষেপস্বরূপ স্বামীজী নিবেদিতাকে দিয়ে কলকাতার বোসপাড়ায় এক বিদ্যালয় স্থাপন করান। এখান থেকে যেসব শিক্ষিকারা তৈবি হবেন তারাই পরবর্তী কালে কর্মিরূপে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়বেন।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর কালীপূজার দিন নিবেদিতার ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকার্য শ্রীশ্রীমা কর্তৃক সম্পন্ন হয়। ঠিক তার পূর্বদিন ১২ নভেম্বর শ্রীসারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নতুন জমিটিতে (বর্তমান বেলুড় মঠ) শুভ পদার্পণ করেন এবং ঐখানে তাঁর নিত্যপূজিত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিখানির পূজা করেন। প্রকৃতপক্ষে এই নবীন সন্ন্যাসী সংঘের নেত্রী ছিলেন শ্রীশ্রীমা। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি যে ক্রমবর্ধমান এক সন্ন্যাসিসংঘের নেতৃত্ব দিলেন একজন নারী। কি বিস্ময়কর! স্বামীজী থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য গুরুভ্রাতারা সকলেই তাঁকে স্থান দিয়েছিলেন সবার উপরে। শ্রীশ্রীমার নির্দেশ অমান্য করবার ক্ষমতা কারও ছিল না। আধুনিক শিক্ষাবিহীন কিন্তু আধ্যাত্মিকতার বলে কি উদার দৃষ্টিভঙ্গি! সত্যই তিনি ছিলেন সংঘজননী তথা বিশ্বজননী।

শ্রীশ্রীমা স্বামীজীর সমুদয় আদর্শকে কেবল সমর্থন করেননি, সম্প্রসারণও করেছিলেন। নিবেদিতার ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টির উপর তাঁর দৃষ্টি ছিল সদা জাগ্রত। একবার এক স্ত্রীভক্তের অবিবাহিত পাঁচটি কন্যার জন্য দুশ্চিন্তার কথা শুনে শ্রীশ্রীমা বলেনঃ "বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও—লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।"[১৮] ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে অফিসের হিসাব-নিকাশ অথবা দুর্ভিক্ষে জনসেবা, বই বেচা, হাসপাতাল চালানো ইত্যাদিতে সাধুদের ব্যস্ত থাকা নিয়ে কেউ অভিযোগ করলে তিনি বলেনঃ "ঠাকুর যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চলবে। মঠ এমনিভাবেই চলবে। এতে যারা পারবে না, তারা চলে যাবে।"[১৯] অথচ মঠ ছেড়ে কেউ চলে গেলে তাঁর মাতৃহৃদয় কতই না বিচলিত এবং প্রার্থনাশীল!

নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি কয়েক মাস পরীক্ষামূলক পরিচালনার পর সিস্টার নিবেদিতা হৃদয়ঙ্গম করেন ঐ বিদ্যালয়ের কার্য তখনই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন অর্থের। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে তিনি স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্যে গমন করেন অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ফিরে আসেন ফেব্রুয়ারি, ১৯০২।

ইতিমধ্যে সিস্টার নিবেদিতার চিন্তাজগতে এক রূপান্তর ঘটে গেছে। ভারতের ইংরেজ-অধীনতা তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর প্রাণের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল

ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হোক। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তদানীন্তন সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তাঁর কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। তিনি আশা করতেন ভারতে কোনও একদিন সশস্ত্র বিপ্লবের অভ্যুত্থান হবে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি যুবকদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দেন।

স্বামীজী নিবেদিতাকে যে পবিত্র ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন, কোনদিন তার থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। কেবল তাই নয়, স্বামীজী তাঁর উপর ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার যে-ভার অর্পণ করেন, সেটিও ছিল তাঁর জীবনব্রত। বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তিনি আজীবন স্কুলটির দায়িত্ব পালন করে যান। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তাঁর দেহত্যাগ হয়। নিবেদিতার বর্তমানে এবং তার পরেও স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত বহু মহিলাকর্মী স্কুলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের মধ্যে সিস্টার কৃস্টিন এবং সুধীরা দেবী অন্যতমা। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে সিস্টার কৃস্টিন স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হলে বিদ্যালয়ের সমগ্র দায়িত্ব সুধীরার উপর অর্পিত হয়। সুধীরা স্বামী সারদানন্দের সহায়তায় বহু আকাঙ্ক্ষিত আশ্রম বিভাগ ও ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীশ্রীমার মহাপ্রয়াণের পর আশ্রমবিভাগটি 'সারদা মন্দির' নামে অভিহিত হয়। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মিশন কর্তৃপক্ষ জমি ক্রয় করে বর্তমান বিদ্যালয় ভবনটির নির্মাণ করান। ভগিনী সুধীরার দেহত্যাগের পর নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও স্কুল ও আশ্রমের কাজের ধারা অব্যাহত থাকে। পরবর্তী কালে 'সারদা মন্দির' শ্রীসারদা মঠের সূচনারূপে পরিণতি লাভ করে। মনস্বিনী নিবেদিতার নিকট আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত সাধুসম্মেলনে তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ তাঁর ভাষণে সংঘ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির মহিলাকর্মীদের যথাযথ সুযোগ না দেওযার কথা উল্লেখ করে সকলকে তাঁদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনার আবেদন জানান। সেইসঙ্গে তিনি বলেনঃ "স্বামীজী একটি স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং তার প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন পুরুষের মঠ থেকে। স্বামীজী একাধিক পত্রে এবং আমাদের মঠের নিয়মাবলীতে এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বারবার ব্যক্ত করেছেন। তারপর অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্তপ্রায়। এখন আমাদের উচিত কাজটিকে আরম্ভ করে দেওয়া।"

কিন্তু তাঁর শুভ অভিপ্রায় সত্ত্বেও তা তখনি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ভারতীয় সমাজে পুরুষ-সম্পর্ক-বিবর্জিত সম্পূর্ণ স্বাধীন স্ত্রীমঠের পটভূমি হয়তো তখনও প্রস্তুত হয়নি।

অবশেষে বহুকাল পরে ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীমার জন্মশতবার্ষিকী বৎসরে ২ ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পিত স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত হয় গঙ্গার পূর্ব উপকূলে, দক্ষিণেশ্বরে। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ সারদা মিশন। শ্রীসারদা মঠের অছি পরিষদে এবং রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের পরিচালক সমিতিতে কোনও পুরুষ সদস্য নেই। একথা নিশ্চয়ই বলা চলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সন্ন্যাসিনী মঠ ভারতে এই প্রথম। বহু পূর্বে গৌরবময় বৌদ্ধযুগেও ভিক্ষুণীরা ছিলেন ভিক্ষুদের অধীন।

সারদা মঠ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ সরলাদেবীকে স্ত্রীমঠের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা ও অন্তরঙ্গ সেবিকা।

শৈশবে নিবেদিতার ছাত্রী সরলাদেবী পরে সিস্টার কৃস্টিন ও ভগিনী সুধীরার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং 'সারদা মন্দির'-এ আবাসিকরূপে বাস করেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁকে তন্ত্রমতে অভিষিক্ত করে নাম দেন শ্রীভারতী। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে দীর্ঘ সাতাশ বছরের একান্ত সাধন-ভজনের জীবন পরিত্যাগ করে কাশী থেকে তাঁকে চলে আসতে হয়। তিনিই শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা।

স্বামীজী একান্তভাবে চেয়েছিলেন ভারত চেতনার সঙ্গে বিশ্বচেতনার সম্মেলন। আমরা আশা করি তা একদিন অবশ্যই সম্ভব হবে কারণ স্বামীজী তাঁর প্রফেটিক দৃষ্টিতে দেখেছেনঃ "ভারত আবার উঠবে জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা নিয়ে নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা নিয়ে—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ সহায়ে; অর্থের শক্তিতে নয়, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে।"[২০]

ভারতের এক কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি'—। এই জাতির পুরুষ ও নারী উভয়ে মিলিত হয়ে সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে। পুরুষের বাহুবল বেশি কিন্তু নারীর মধ্যে যে মেধা, ধৃতি, কোমলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ আছে, তার ক্ষমতাও তুচ্ছ করবার মতো নয়। প্রয়োজন কেবল এই সদ্‌গুণগুলি বিকাশের।

আমাদের ভারতের মেয়েরা আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক শিক্ষিত এবং উন্নত। তবু তাদের অনেকের দৃষ্টি পাশ্চাত্যে। অপর পক্ষে পাশ্চাত্য থেকে বহু নরনারী ছুটে আসছেন ভারতে। কিন্তু কেন? কিসের আকর্ষণে? তাঁরা ভারতে আসেন শান্তির আশায়, আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধানে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে (আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া প্রভৃতি) প্রচারিত হয়ে চলেছে। কিন্তু তাকে ত্বরান্বিত করার ভার সমগ্র মানুষ জাতির উপর। কবে তার প্রকৃত রূপায়ণ ঘটবে যা হবে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকর, তা আমাদের জানা নেই। স্বামীজী কিন্তু ভারতের মেয়েদের উপর তাঁর বিশ্বাস হারাননি।

উপসংহারে যুগনায়ক বিবেকানন্দের প্রতি অন্তরের বিনম্র প্রণতি জানিয়ে তাঁর প্রেরণাপূর্ণ শাশ্বত বাণী উদ্ধৃত করিঃ "আমি পুরুষগণকে যা বলে থাকি, নারীগণকে ঠিক তাই বলব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধো, ভারতে জন্ম বলে লজ্জিত না হয়ে তাতে গৌরব অনুভব কর, আর স্মরণ রেখ, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হতে কিছু নিতে হবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের অপরকে দেবার জিনিস সহস্রগুণ বেশি আছে।"[২১]

দেশ পত্রিকার সৌজন্যে

স্বামী বিবেকানন্দের পথে নেতাজী সুভাষচন্দ্র

প্রণবেশ চক্রবর্তী

সেদিন যদি শ্রীরামকৃষ্ণের মানসসন্তান স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ঋষির মতই সন্ন্যাসপ্রার্থী সুভাষচন্দ্রকে ফিরিয়ে না দিতেন, তাহলে আজকের পৃথিবী হয়তো স্বামী বিবেকানন্দের সার্থক উত্তরসাধক হিসেবে আরেকজন মহান সন্ন্যাসীকে লাভ করত কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দ বুঝেছিলেন, এই মানুষটির মধ্যে আছে এক উজ্জ্বল নেতৃত্বের বিরাট সম্ভাবনা। দেশের স্বার্থে তাই সেদিন তিনি সুভাষচন্দ্রকে সন্ন্যাসদীক্ষা দেননি, ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

ঘটনাটা ১৯১৪ সালের। সুভাষচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

'ভারত-পথিক' গ্রন্থে (পৃঃ ৩৭) সুভাষচন্দ্র বসু লিখছেনঃ "১৯১৪ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার বন্ধু হরিপদ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে গুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় খরচের জন্য এক সহপাঠীর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিলাম। বন্ধুটি তার স্কলারশিপের টাকা থেকে আমাকে ধার দিয়েছিল, আমিও পরে আমার স্কলারশিপের টাকা থেকেই এই ধার শোধ করেছিলাম। বলা বাহুল্য, বেরিয়েছিলাম বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে, পরে পোস্টকার্ডে দু'লাইন লিখে খবরটা দিয়েছিলাম। লছমনঝোলা, হৃষীকেশ, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, বারাণসী, গয়া প্রভৃতি উত্তর ভারতের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব কটি তীর্থেই আমরা গিয়েছিলাম। হরিদ্বারে আমাদের আর একটি বন্ধু এসে দলে ভিড়ে পড়ল।" এই শুরু হল পরিব্রাজক সুভাষচন্দ্রের হিমালয়যাত্রা।

এ যেন স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই পরিব্রাজকবেশে আরেকজন ভারত পথিকের তীর্থযাত্রা। হরিদ্বারে তাঁদের সঙ্গে আরেক জন বন্ধু যোগ দেন, তিনি হলেন হেমন্তকুমার সরকার। তাঁরই লেখা 'সুভাষের সঙ্গে বারো বছর' (১৯১২-২৪) গ্রন্থে সেই সময়ের অনেক বিস্ময়কর তথ্য পাওয়া যায়।

পরবর্তী কালের 'দেশনায়ক' এবং দুর্গমের অভিযাত্রী 'নেতাজী' সেদিন তাঁর গুরু এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধানেই ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিলেন।

এই সময় ভারতের আশ্রমজীবন, ধর্মজীবন এবং সন্ন্যাসজীবন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অনেক বিচিত্র এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। 'ভারত-পথিক' গ্রন্থে (পৃঃ ৮৬) তিনি লিখছেনঃ "হরিদ্বারের একটি আশ্রমে আমাদের বেশ মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল। আশ্রমবাসীরা আমাদের সহজভাবে গ্রহণ করতে বেশ ইতস্তত করছিলেন, কারণ তাঁরা বুঝতে পারছিলেন

না আমরা বাস্তবিকই ধর্মভাবাপন্ন, না ধর্মের ছদ্মবেশে একদল বিপ্লববাদী বাঙালি যুবক।"

তিনি লিখছেনঃ "হরিদ্বারের একটি ভোজনালয়ে আমাদের খেতে দিতে আপত্তি জানাল। বাঙালিরা মাছ খায়, কাজেই তারা খ্রীস্টানদের মতই অপবিত্র—অতএব ভোজনালয়ে আর সকলের সঙ্গে বসে খাবার অধিকার তাদের নেই। আমাদের নিজের নিজের বাসনে ভোজনালয় থেকে খাবার নিয়ে এসে নিজেদের ঘরে বসে খেতে হত। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল ব্রাহ্মণ কিন্তু সেও এই ব্যবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। বুদ্ধগয়ায়ও একই ব্যাপার। বারাণসীর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের পরিচয়পত্র নিয়ে আমরা একটি মঠে আতিথ্যগ্রহণ করেছিলাম।"

এরকম কত অভিজ্ঞতাই সেদিন হয়েছিল তাঁর। হিন্দু সমাজব্যবস্থার মূল গলদগুলিই তাঁর চোখের সামনে যেন প্রকট হয়ে উঠেছিল।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তখন সন্ন্যাসী হওয়ার সঙ্কল্প মনে মনে লালন করছেন। এভাবে পরিব্রাজকের বেশে হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে বেরিয়ে পড়ার আগে তিনি আরেকবার সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করার জন্য নদীয়া জেলার শান্তিপুরে গিয়েছিলেন। মথুরার প্রসঙ্গে আসার আগে এখানে সেই কাহিনীটাও একটু স্মরণ করতে পারি।

সেটা ১৯১৩ সালের ঘটনা অর্থাৎ হিমালয় যাত্রার ঠিক এক বছর আগের ঘটনা। তখন কলেজে বড়দিনের ছুটি। সুভাষচন্দ্র লিখছেনঃ "১৯১৩ সালে শীতের সময় আমরা কলকাতা থেকে ৫০ মাইল দূরে হুগলি নদীর ধারে অবস্থিত শান্তিপুর নামে একটি জায়গায় গিয়ে কিছুদিন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী হয়ে বাস করেছিলাম। হঠাৎ একদিন পুলিশ এসে আমাদের আস্তানা খানাতল্লাসি করে সকলের নামধাম লিখে নিয়ে চলে গেল। ব্যাপারটা এর বেশি আর গড়ায়নি।"

সেদিন শান্তিপুরে তাঁর সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে হেমন্তকুমার সরকার, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং হরিপদ চট্টোপাধ্যায় পরবর্তী কালে স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। এঁরা সবাই 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের গ্রুপ' বলে নিজেদের উল্লেখ করেছেন। শান্তিপুরে বাসকালে শুধু গেরুয়া বসন পরে সন্ন্যাসীই হননি, চরম কৃচ্ছ্রসাধনও করেছেন। ডিসেম্বরের সেই শীতের শেষ রাত্রে উঠে গঙ্গার ঠাণ্ডা জলে আকণ্ঠ শরীর ডুবিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। শান্তিপুর থেকে যখন আবার কলকাতায় ফিরে এলেন, তখন তাঁরা সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'জীবনপ্রবাহ' গ্রন্থে (পৃঃ ১৯৩) লিখেছেনঃ 'তখন প্রত্যেকে যেন এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—সন্ন্যাসী হওয়ার জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞা সকলের চোখে মুখে।'

১৯১৪ সালে সন্ন্যাসী হওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু বেরিয়ে পড়েছিলেন হিমালয়ের পথে—আবার ফিরে আসি সেই প্রসঙ্গে। হরিদ্বার থেকে এলেন মথুরায়। সুভাষচন্দ্র 'ভারত-পথিক' গ্রন্থে (পৃঃ ৮৭) লিখছেনঃ "মথুরায় আমরা এক পাণ্ডার বাড়িতে উঠেছিলাম। একদিন সেখান থেকে নদীর ওপারে এক সাধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সাধুটি মাটির তলায় একটি ঘরে থাকতেন। তিনি আমাদের সংসারত্যাগ করার মতলব ছেড়ে বাড়ি ফিরে

যেতে উপদেশ দিলেন। একজন সন্ন্যাসী যে এই পরামর্শ কী করে দিতে পারে, তা ভেবে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম আমি, এখনও মনে পড়ে।"

বৃন্দাবন হয়ে সুভাষচন্দ্রেরা এলেন বারাণসীতে। এখানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দুটি শাখাকেন্দ্র পাশাপাশি অবস্থান করছে—একটি অদ্বৈত আশ্রম, অপরটি সেবাশ্রম। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় রাখাল এবং 'রাখাল মহারাজ' নামে সকলের পূজনীয়, যাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ ডাকতেন 'রাজা' বলে, তিনি ১৯১৩ সালে দুর্গাপূজা উপলক্ষে কাশীতে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে অযোধ্যায় এবং অযোধ্যা থেকে ফিরে আবার যখন কাশীতে আসেন সেই সময়ই সুভাষচন্দ্র বন্ধুদের নিয়ে এলেন কাশী মঠ ও মিশনে।

সুভাষচন্দ্র লিখছেনঃ "বারাণসীতে... স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদের সানন্দ অভ্যর্থনা জানালেন। স্বামীজী বাবাকে এবং আমাদের পরিবারের আরও অনেককেই ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। এখানে আমরা কয়েকদিন রইলাম।"

সেই সময়েই একদিন সুভাষচন্দ্র নিজের মনোগত বাসনা প্রকাশ করে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে সন্ন্যাস প্রার্থনা করেন। সুভাষের সঙ্গী হেমন্তকুমার সরকার 'সুভাষের সঙ্গে বারো বছর' (১৯৪৬, পৃঃ ৩৬) গ্রন্থে ঐ ঘটনার এক তথ্যনির্ভর বিবরণ দিয়েছেন।

সুভাষের প্রার্থনা শুনে সিদ্ধসাধক স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেই তরুণের তেজোদৃপ্ত মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সম্ভবত অনাগত ভবিষ্যতের এক মহান নায়কের আবির্ভাব লগ্নকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই সেদিন তিনি সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলেনঃ "সন্ন্যাস তাঁর ক্ষেত্র নয়, তাঁর জীবন ব্যয়িত হবে অনলস দেশসেবায়। ...অন্তরে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা থাকলেও দেশপ্রেমই হবে তাঁর জীবনের প্রধান প্রেরণা।"

স্মরণে রাখা প্রয়োজন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, তখন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের জীবনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা দেশসেবার প্রত্যক্ষ কোনও সম্ভাবনা দেখা দেয়নি, দেখা দিয়েছিল প্রবলভাবে আধ্যাত্মিকতার ভাব, দেখা দিয়েছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ। কিন্তু একজন মহাপুরুষ যে বাস্তব অর্থেই ভবিষ্যতকে দেখতে সক্ষম, সেটা এক্ষেত্রেও প্রমাণিত। কারণ এই ঘটনার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেশসেবা তথা রাজনীতির প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য সুভাষচন্দ্র সেদিন সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প ত্যাগ করে ঘরে ফিরে এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দেরই এক গুরুভাইয়ের নির্দেশে। এও এক অদ্ভুত যোগাযোগ। লক্ষ্য করার বিষয়, হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণের সময় যে সুভাষচন্দ্র সাধুসন্তদের ওপর বিশেষ শ্রদ্ধা বা আস্থাস্থাপন করতে পারেননি, তিনিই কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দের ঐশী ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে পরবর্তী কালে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন যে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কৃপা এবং পরামর্শেই তাঁর জীবনের গতি বদলে গিয়েছে (দ্রষ্টব্যঃ স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩২৭ ও ৩৩৫)। সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলীতেও (পৃঃ ৫৬) স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি সেই শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশিত। পরবর্তী কালেও সেই শ্রদ্ধা তাঁর অম্লান ছিল।

সন্ন্যাসী হওয়ার বাসনা যে তাঁর কত তীব্র ছিল তার প্রমাণ পাই বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে লেখা চিঠিতে (সুভাষের সঙ্গে বারো বছর)। সুভাষচন্দ্র লিখছেনঃ 'গৃহত্যাগ করতে হয়, তাও করব আনন্দের সঙ্গে।'

॥ দুই ॥

এই যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ার সঙ্কল্প, এই যে গৃহত্যাগের প্রত্যয়—সুভাষচন্দ্রের কাছে এটা কোনও আকস্মিক ঘটনা ছিল না। বরং তাঁর জীবনধারা অনুসরণ করেই আমরা জানতে পারি, হিমালয়-যাত্রার আগে থেকেই তাঁর জীবনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে সক্রিয় ছিল। আবার পরবর্তী পর্যায়ে জীবনের পূর্ণ দীপ্তিতে তিনি যখন ভাস্বর, যখন, তিনি সকলের প্রিয় নেতাজী সুভাষ—সেই মহাসন্ধিক্ষণেও তাঁর জীবনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল অম্লান।

আমরা সেই প্রথম পর্বের ঘটনাগুলি স্মরণ করতে পারি। স্মরণ করতে পারি স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিজয় সম্পন্ন করে বীরের বেশে ভারতে ফিরে এসেছিলেন ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে। আর ঐ বছরই জানুয়ারি মাসের ২৩ তারিখে সুভাষচন্দ্রের জন্ম। ১৯০২ সালেব জানুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র পাঁচ বছর বয়সে প্রথম স্কুল যেতে শুরু করেন, আর ঐ বছরই ৪ জুলাই স্বামীজী দেহত্যাগ করেন।

পনেরো বছরের কিশোর সুভাষের মানসিক অস্থিরতার কথা 'ভারত-পথিক' গ্রন্থে (পৃঃ ৪২-৪৩) সুভাষচন্দ্র স্বয়ং লিখেছেনঃ "এমন একটা আদর্শের প্রয়োজন তখন আমার ছিল, যার উপর ভিত্তি করে আমার সমস্ত জীবনটা গড়ে তুলতে পারব—সবরকম প্রলোভন তুচ্ছ হয়ে যাবে, এমন একটি আদর্শ খুঁজে বার করা সহজ ছিল না।"

তিনি যখন অস্থিরভাবে একটা আদর্শের সন্ধান করছিলেন, সেই সময় 'হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই' তিনি 'সমস্যার সমাধান খুঁজে' পেলেন। সুভাষচন্দ্র সেই প্রসঙ্গে লিখছেনঃ "আমাদের এক আত্মীয় (সুহৃৎচন্দ্র মিত্র) নতুন কটকে এসেছিলেন। আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর ঘরে বসে বই ঘাঁটছি, হঠাৎ নজরে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলোর উপর। কয়েক পাতা উল্টেই বুঝতে পারলাম, এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। বইগুলি বাড়ি নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয়মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল।" কেউ কেউ বলেন, সুভাষচন্দ্রের হাতে স্বামীজীর রচনাবলী প্রথম তুলে দিয়েছিলেন শিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র সেন।

সুভাষচন্দ্রের প্রথম জীবনে তাঁর প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাসের প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সুভাষ লিখছেনঃ "প্রধান শিক্ষক মশাই আমার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, নৈতিকবোধ জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—জীবনে এক নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু এমন আদর্শের সন্ধান দিতে পারেননি, যা আমার সমগ্র সত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এই আদর্শের সন্ধান দিলেন বিবেকানন্দ। দিনের পর দিন কেটে

যেতে লাগল, আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম। আমাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাঁর চিঠিপত্র এবং বক্তৃতা। তাঁর লেখা থেকেই তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম।"

সেই শুরু। তারপর সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন জুড়ে বিরাজ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। একটি পত্রে সুভাষচন্দ্র বলছেন, বিবেকানন্দের 'আইডিয়াল' হল আমার 'আইডিয়াল' (পত্রাবলী, পৃঃ ৪১)। স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করতে গিয়েই সুভাষচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'আত্মসংযম ছাড়া আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব।' স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'আত্মশক্তির উদ্বোধন করতে হলে চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন।' তাঁদের এই আদর্শকেই সুভাষ তাঁর জীবনের মূল আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন (ভারত-পথিক, পৃঃ ৬৬)।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে সন্ন্যাসী হতে দেননি, দেশসেবার জন্য চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর প্রতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ ছিলঃ 'প্রচলিত সন্ন্যাসজীবন নয়, অন্তরে বৈরাগ্য থেকে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করতে হবে তাঁকে' (চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ৭৮৪)। কিন্তু তাই বলে কি তিনি সন্ন্যাসী হওয়ার স্বপ্ন ত্যাগ করেছিলেন? সম্ভবত নয়।

কারণ কেমব্রিজ থেকে সুভাষচন্দ্র তাঁর এক বন্ধুকে ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ লিখেছেনঃ "আমাকে সন্ন্যাসী বলিলে আমি এখনও চটি না। আমি এখন সন্ন্যাসী নামের অযোগ্য হইতে পারি—কিন্তু সন্ন্যাসী বলিলে আমি এখন পূর্বের ন্যায় গৌরব অনুভব করি" (পত্রাবলী, পৃঃ ৯২)। আবার তিনি যখন আই. সি. এস থেকে পদত্যাগ করলেন, তখন (২২ এপ্রিল, ১৯২১) বন্ধু চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখলেনঃ "কী করব, এখনও ঠিক করতে পারিনি। একবার ইচ্ছে হচ্ছে মিশনে যোগ দেব।" (পত্রাবলী, পৃঃ ১১৫)

'সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন' গ্রন্থে সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন (পৃঃ ৫৫): "সুভাষচন্দ্রকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।...তাইতো সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় মাত্র আট মাসের চেষ্টায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েও নিজেকে বিদেশি শাসনের দাসত্বে আবদ্ধ করতে পারেননি। বাঙালীর সেই ঈপ্সিত পদ, অর্থ, সম্মান সব তিনি অবহেলায় এক মুঠো ধূলির মত পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন।"

॥ তিন ॥

সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন জুড়েই রয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই শুধু প্রথম পর্বেই নয়, তথাকথিত তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি লিখছেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী, তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাবে আমার জীবনের উন্মেষ। নিবেদিতার মতো আমিও মনে করি যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের (স্বরূপের) দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁহাকে আমি নিশ্চয়ই গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একান্ত অনুরক্ত থাকিব, একথা বলাই বাহুল্য।" (জাতীয় সমস্যায় স্বামী

বিবেকানন্দ, স্বামী সুন্দরানন্দ, পৃঃ ৮) প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্র শেষদিন পর্যন্ত অনুরক্তই ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতেও ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের জীবনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি। সেই ভয়াবহ দুর্যোগের দিনে এস.এ. আইয়ার ছিলেন সুভাষের সহকর্মী ও সহযাত্রী। তিনি 'আনটু হিম এ উইটনেস' নামে গ্রন্থে লিখেছেন (পৃঃ ২৬৮)ঃ সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর (আই. এন. এ) যখন সদর কার্যালয়, সেই সময় নেতাজী প্রায়ই রাত্রি গভীর হলে কাউকে জানতে না দিয়ে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে যেতেন এবং পট্টবস্ত্রে দেহ আবৃত করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রামকৃষ্ণ মন্দিরে ধ্যান করতেন।

'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ লিখেছেন (পৃঃ ৭৮৬)ঃ "অনেক সময় আবার রাত্রে খাওয়ার পর নেতাজী তাঁর নিজের গাড়িটি সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠাতেন তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্বরানন্দকে তাঁর বাসভবনে নিয়ে আসার জন্য এবং তিনি এলে তাঁর সঙ্গে একাকী দু-ঘণ্টা বা তারও বেশীক্ষণ ধরে নানা আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ করতেন। কোন কোন দিন তাঁদের আলোচনা মধ্যরাত্রি অতিক্রম করত।"

স্বামী ভাস্বরানন্দ ঐকালের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বিশেষ একটি দিনের বিবরণ দিয়েছেন। সেদিন ছিল জননী সারদামণির পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বিশেষ পূজা ও উৎসব। স্বামী ভাস্বরানন্দ মন্দিরে বিশেষ পূজায় ব্যস্ত ছিলেন হঠাৎই সেদিন মিশনে নেতাজীর আগমন হয়। মন্দিরে গিয়ে তিনি অনেকক্ষণ ধ্যানাবিষ্ট ছিলেন। যতক্ষণ মন্দিরে পূজা চলেছিল, ততক্ষণ তিনি সেখানেই ছিলেন। পূজার পর প্রসাদ গ্রহণ করে প্রায় এক ঘণ্টা তিনি স্বামী ভাস্বরানন্দের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেন। "তারপর একখানা 'চণ্ডী'র জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় মহারাজা তাঁর নিজের চণ্ডীখানি তাঁকে উপহার দিলেন। নেতাজী এতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।"

শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের আধ্যাত্মিক জীবন ও কর্মকাণ্ডের প্রতিই নয়, মিশনের সেবামূলক কাজকর্মের প্রতিও নেতাজীর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে নেতাজী তাঁর কর্মক্ষেত্র সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে সরিয়ে আনেন এবং রেঙ্গুনে এসেও তিনি স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ বজায় রাখেন। মিশনে তিনি প্রায়ই যেতেন এবং সেখানকার মন্দিরে গিয়ে ধ্যান করতেন। মিশনের কাজে আর্থিক সহায়তাও করতেন।

১৯৪৫ সালের ২৪ এপ্রিল—সেদিন রাত্রে শত্রু-কবলিত নেতাজীকে রেঙ্গুন ত্যাগ করতে হয়েছিল। ঠিক তার আগের দিন, অর্থাৎ ২৩ এপ্রিলের একটি মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। তিনি লিখেছেনঃ

"সেদিনটি ছিল সত্যিই এক বিচিত্র ও আশ্চর্য দিন। আত্মনিবেদনের এক অবিস্মরণীয় দিন। রেঙ্গুন ত্যাগের পূর্বাহ্ণ। আজীবনের স্বপ্ন ও আদর্শের গোটা আলেখ্য নিজের চোখের সামনে ভেঙে পড়ছে ঝুর ঝুর করে। সম্মুখে শুধু অন্ধকারের পারাবার। সেই চরম সঙ্কট-মুহূর্তে, রেঙ্গুন ত্যাগের পূর্বক্ষণে নেতাজী সামরিক পরিচ্ছদ খুলে পরেছিলেন পট্টবস্ত্র। শুচি-শুভ্র নির্বিকার যোগী একাকী চলে গিয়েছিলেন তাঁর আদর্শ পুরুষের, প্রাণদেবতার

সেবায়তনে রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দিরে। বসেছিলেন যুগঋষির মূর্তির সম্মুখে সমাহিত হয়ে। তদ্গত। তন্ময়। উজাড় করে দিয়েছিলেন নিজেকে। মহাপ্রয়াণের পূর্বাহ্নে কি নিজেকে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি? চিনেও কি ছিলেন? মৃত্যুই যে মরা নয়, একথা কি তাঁর মনে জেগেছিল?—কে জানে?"

জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতই যিনি ইতিহাসের বুকে দুগর্মের অভিযাত্রী, সেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনে অন্তরঙ্গ শেষ সম্বল ছিল একটি জপের মালা এবং একটি পকেট গীতা, আর চোখের সামনে ধ্রুবতারার মতো প্রোজ্জ্বল ছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধ্যানমূর্তি। তাই তো জীবন সংগ্রামের অগ্নিকুণ্ডে দাঁড়িয়েও তিনি ছিলেন অচঞ্চল, স্থির।

যারা গড়ে দিল পথ

প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা

কাহিনীর শুরু এই মহানগরীর উপান্তে। উনিশ শতকের সাতের দশকে রাসমণির কালীবাড়িতে ধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষিত সমাজের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। ধর্মের প্রবীণ ও নবীন প্রবক্তাগণ সকলেই সন্ধান করেছেন পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে সদা নিমগ্ন এই দেবমানব যে জগতের কল্যাণে নিত্য উন্মুখ সেকথা হয়তো অনেকেই বুঝেছিলেন কিন্তু একটা নতুন ধর্মপ্রবর্তনার কোনও পরিকল্পনা তাঁর মধ্যে আছে—এমন আভাসও কি মেলে কথামৃতে! প্রচারবিমুখ ঐ দেবমানবকে কেন্দ্র করে কোন মহাবিপ্লব আসতে চলেছে ভারতবর্ষের চিরাচরিত জীবনে—তাও সেদিন কারুর কল্পনায় আসেনি, সে বিপ্লবের চরিত্র ও পন্থা তো দূরের কথা! অথচ আমরা দেখছি সাধনার শেষে, বিভিন্ন প্রাচীন শাখার সমস্ত সাধককুলের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভাববিনিময়ের পরেও তিনি অপেক্ষা করছেন আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় লালিত ইয়ং বেঙ্গলদের জন্য। তারা সেদিন স্কুল-কলেজের ছাত্র, বেশির ভাগই ইংরেজী জানা কলকাতার প্রাণোচ্ছল যুবক ও কিশোর। উপমার রাজা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, তারা হল—সূর্যোদয়ের আগে তোলা মাখন, নতুন হাঁড়ি, সংসারের খোলা থেকে ছিট্‌কে আসা দাগহীন মল্লিকাফুলের মতো শুভ্র খই। এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ব্যতিক্রম বলতে পারি না। তার কারণ ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মাচার্যদের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটতে দেখি—তাঁরা অন্তরঙ্গ নির্বাচন করেছেন তরুণ সমাজ থেকে। আচার্য শঙ্করও পদ্মপাদ, তোটকাচার্য, হস্তামলক প্রভৃতি আজন্ম বৈরাগ্যবানদের নির্বাচিত করেছিলেন তাঁর প্রচারিত অদ্বৈত-বেদান্তের উত্তরসূরিরূপে। চৈতন্যদেব তীর্থযাত্রার পথে ভট্ট রঘুনাথ, রূপ সনাতন প্রভৃতিকে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বান ও আকর্ষণে হোমাপাখির শাবকের দল আধ্যাত্মিক রাজ্যের অনন্ত আকাশে ডানা মেলেছিলেন—তাঁদের লক্ষ্য ছিল একমাত্র 'ঈশ্বর'। তাঁদেরই দলপতি নরেন্দ্রনাথ।

ঈশ্বরোন্মাদ ঐ সাধুরা শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর বরাহনগর মঠে নরেন্দ্রের নেতৃত্বে ভূতপালানো কঠোর তপস্যায় মগ্ন। সংসারত্যাগের মহাসঙ্কল্পে দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ। ঐ শক্তিমানদের একত্র রাখার জন্য নরেন্দ্র শ্রীগুরুর কাছে দায়বদ্ধ হয়েছিলেন। নরেন্দ্রের ভাষায় 'তারা এক একজন মহাসিংহ', 'প্রত্যেকেই ধর্মশক্তির এক একটা কেন্দ্রের মতো'।

স্বামীজীর পাশ্চাত্যজয়ের কাহিনী আজ সুবিদিত কিন্তু অনেকেরই জানা নেই তাঁর গুরুভাইদের জয় করার সংগ্রাম যার অন্তরালে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের প্রকৃত জয়যাত্রার সূচনা। স্বামীজী একসময় তাঁর অন্তরঙ্গ সন্তান স্বামী স্বরূপানন্দকে বলেছিলেন ঃ "The national ideals of India are Renunciation and Service. Intensify her in those channels and the rest will take place."[১] ত্যাগ ও সেবার মূলমন্ত্রেই এক নতুন ধর্ম বিঘোষিত হল।

কিন্তু বৈরাগ্যপ্রবণ সমাজবিমুখ সন্ন্যাসজীবনের সঙ্গে সেবাধর্মের মিলন কোথায়! পাশ্চাত্য জয়ের পর নবীন সন্ন্যাসিসংঘের আদর্শ ও কর্মসূচীর বিন্যাসে পদে পদে বাধা এল গুরুভাইদের কাছ থেকেই। স্বামীজীর কর্মধারার সঙ্গে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও ভাবধারার মিল খুঁজে পেলেন না। প্রাচীনপন্থী ভক্তেরা অনেকে মেনে নিতে পারছিলেন না সমাজকল্যাণে সাধুসমাজের সেবামূলক কর্মপ্রচেষ্টাকে। সংঘাতই যখন আসন্ন তখন প্রাণের টান ও ভালবাসার জয় হল। আবেদন এল শুধু তিরস্কার ও অভিমানে নয়, আর্তির আকারে— "...ঠাকুরের কাজের জন্য আমি বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করে মৃতপ্রায় হয়েছি। তোমরা কি আমার এ কার্যে সাহায্য করবে না। কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে?"[২] এই উক্তির উপলক্ষ স্বামী তুরীয়ানন্দ হলেও সমস্ত গুরুভাইদের প্রতিই এ ছিল তাঁর একান্ত নিবেদন। নতুন যুগচক্র সচল হল—শক্তিমানরা তপস্যায় নয়, স্বামীজীর কথায় একেকটা স্থান জাগিয়ে, সেবাকার্যে ও প্রচারে ব্রতী হয়ে তাঁর অভিপ্রেত কার্যের সহায় হলেন। স্বামীজীর আকস্মিক তিরোধানের পরে সেই বিরোধিতার চিহ্নও ছিল না। তার স্থলে শুধুই আনুগত্য ও আনুগত্য, নেতার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা। স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে চলার উদ্যম। তাঁরাই হয়ে উঠলেন ত্যাগ ও সেবার ক্ষেত্রে প্রধান স্তম্ভ। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের বিপুল সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে ভালবাসা দিয়ে হৃদয় জয়ের এই কাহিনী। সাধকদের 'আত্মনো মোক্ষার্থং' থেকে 'জগদ্ধিতায়' নিয়ে আসার কথা। অন্যদিকে বিবেকানন্দও সেদিন অপেক্ষা করেছিলেন সেই যুবকদলের জন্য যারা একেবারেই নিজেদের 'শির' লুটিয়ে বীর সেনাপতির আজ্ঞাবহ সৈন্যদলের ভূমিকা নেবে। তাঁদেরই একজন ১৯৪৪ সালে স্মৃতিচারণ করে লিখছেন ঃ "তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত যুবকদের জন্য মাথা খুঁড়তেন, কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছেন—কিন্তু কম লোকেই তখন তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল।"[৩]

সাড়া দিয়েছিলেন হাজার হাজার যুবকের মধ্যে মুষ্টিমেয় কজন। আবার তাদের মধ্যেও ত্যাগব্রতী ছিলেন হাতে গোনা। 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' গ্রন্থে তাঁদের মধ্যে নির্বাচিত তেরো জনের জীবনী দেওয়া হয়েছে। সকলের জীবনের উপাদান পাওয়া যায়নি। 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের রচয়িতা উল্লেখ করেছেন মোট কুড়িটি যুবকের নাম। স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ তাঁর পূর্বোল্লিখিত পত্রে জানিয়েছেন, তাদের সংখ্যা দশ বারো জনের বেশি ছিল না। যাই হোক সেই স্বল্পসংখ্যক অগ্নিময় যুবকই স্বামীজীর ডাকে আক্ষরিক অর্থে 'বান্দা তৈয়ার' বলে দাঁড়িয়েছিলেন। হয়তো তখনও তাঁরা জানতেন না কী পরিমাণ আত্মত্যাগ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে। অনুধাবন করেননি একটা পুরো জাতির আত্মবিস্মরণকে কী সচেতন আত্মত্যাগে রূপান্তরিত করার সাধনায় তাঁরা সেদিন সংঘের বলি হতে চলেছেন।

সেদিন যেন এই বিবেকানন্দ-সন্তানগুলি সংঘের ভিত্তিতে শোণিত সিঞ্চন করে আত্মনিবেদন করলেন। অকালে যখন প্রতিশ্রুতিময় প্রাণগুলি একে একে ঝরে পড়ল, স্বামী সারদানন্দ লিখছেন একজনের স্মৃতিতর্পণেঃ "আরাধ্য দেবতার শ্রীপাদপদ্মে চিরানুরক্ত শিষ্যের এই হৃদয় শোণিত দান—এই প্রশংসা-স্বার্থ-বিরহিত প্রেমার্পণ...মানব তুমি কি বুঝিতে পারিবে?"[৪]

হয়তো সরাসরি সেই যুবকদের কথায় এলেই চলত, এতবড় ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাঁদেরই সমর্পণে বিপুল রামকৃষ্ণসৌধটি রূপ নিয়েছিল যা আজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনেরই ইতিহাস হয়ে রয়েছে। চিহ্নিত হয়নি ভারতের ধর্মেতিহাসে এক নবতম সংযোজনরূপে। অথচ তাঁদের প্রবর্তিত সেবা ও কর্মের সাধনা আজ অজ্ঞাতসারেই সমস্ত ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বিস্তারিত হয়ে চলেছে।

রিপন কলেজের ইংরেজীর সেই গম্ভীর অধ্যাপকের কাছে সেদিন কয়েকটি ছাত্র ধর্মজীবনের সন্ধান পেয়েছিল—'ছেলেধরা মাস্টার' আক্ষরিক অর্থেই এঁদের পাঠিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীদের কাছে। ধর্মলাভের প্রেরণায় অনেকেরই যাতায়াত ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছির বাগানবাড়িতে। স্বামীজী তখন পাশ্চাত্যে। সেই দলের মধ্যে সকলেই ছিলেন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া। প্রথম দিকের সেই ত্যাগব্রতী মুমুক্ষুদের নাম—কালীকৃষ্ণ বসু (স্বামী বিরজানন্দ), খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিমলানন্দ), হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বোধানন্দ), সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী শুদ্ধানন্দ), সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী প্রকাশানন্দ), গোবিন্দ শুকুল (স্বামী আত্মানন্দ)।

উত্তর ভারত পরিক্রমার কালে হাতরাশের স্টেশন মাস্টার শরচ্চন্দ্র গুপ্ত স্বামীজীর প্রথম শিষ্য। পাশ্চাত্যে যাবার আগেই তিনি স্বামীজীর চরণে আশ্রয় নিয়ে বলেছিলেনঃ 'আমি আপনার আদেশ পালন করতে সর্বদাই তৈয়ারী।'[৫] 'সরল আনন্দময় এই শিষ্যের অকপট আনুগত্যে গুরুর আনন্দের সীমা ছিল না—স্বামীজী নবীন শিষ্যকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করে নাম দিলেন সদানন্দ।' পরিব্রাজক স্বামীজীর অনুগমন করে তিনিই প্রথম তীর্থে তীর্থে যান এবং একবার সেই অবসন্ন শিষ্যের বোঝাও গুরু বহন করেছিলেন। পরবর্তী কালে আবেগভরে তিনি বলতেনঃ 'শুধু বোঝা নয়, আমার ভারী জুতাজোড়া পর্যন্ত মাথায় করে বইলেন। এমন না হলে কি আর তাঁকে গুরু করি?"[৬] পূর্বদৃষ্ট সাধক ও পরিব্রাজক স্বামীজীই পাশ্চাত্য থেকে ফিরে কলকাতার প্লেগের সময় সেবাকার্যের ভার অর্পণ করেছিলেন তাঁর এই অনুগত শিষ্যের ওপর। সেটা ১৮৯৮ সাল। কলকাতা মহানগরীর বস্তিতে বস্তিতে সেদিন স্তূপীকৃত জঞ্জাল পরিষ্কার করতে ঝাড়ু হাতে সন্ন্যাসী সদানন্দ নেমে পড়লেন। মূর্তিমান সেবা সদানন্দের প্রাণপাতী সেবাকার্যে সেদিন সহায়তা করেছিলেন নিবেদিতা, স্বামী আত্মানন্দ ও স্বামী নিত্যানন্দ। স্বামী শিবানন্দও এঁদের সহায়ক ছিলেন। স্বদেশী ও বিদেশী শিষ্য-শিষ্যারা এইভাবেই সেদিন গুরুর আদেশে সেবাকার্যের সূচনা করলেন—বেদান্তের উচ্চতম আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ শুরু হল। মিশনের সেবাকার্যের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয়। স্বামীজীর শরীর ত্যাগের পর নিবেদিতা ও সদানন্দ দুজনেই বেঁচেছিলেন মাত্র নয় বৎসর। ১৯১১ সালেই তিনি 'স্বামীজী স্বামীজী' বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নতুন ব্রহ্মচারীদের সন্ন্যাস দেবার আগে স্বামীজী সাধন ভজনের প্রতিশ্রুতি নেননি বরং বলেছিলেনঃ "খুব ভেবে-চিন্তে এপথে এগুবে,...তোমরা কি আমার আদেশ অম্লানবদনে মানতে পারবে? আমি যদি তোমাদের বাঘের সামনে বা বিষধর সাপের সামনে যেতে বলি, যদি বলি গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমীর ধরে আন, যদি বাকি জীবন আসামের চা-বাগানে কুলী হিসাবে কাজ করার জন্য বেচে দিই, অথবা যদি না খেয়ে মরতে বলি বা তুষানলে পুড়ে মরতে বলি—এই ভেবে যে এতে তোমাদের মঙ্গল হবে—তবে তোমরা আমার কথা তখনি মানতে রাজী আছ কি?"[৭] সন্ন্যাসগ্রহণে উৎসুক সেই ছেলেরা স্বামীজীর এই কথা শিরোধার্য করে আমৃত্যু সেই আনুগত্য রক্ষা করেছিলেন—সে এক উজ্জ্বল অধ্যায় যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কাম-কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শের সঙ্গে শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহান স্থায়ী সেবাকর্ম। অথচ সেই কর্ম ছিল 'প্রভুজনোচিত—স্বাধীন আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত সাত্ত্বিক বিলাস...প্রেমরসমণ্ডিত'।

আগেই বলেছি এইসব ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন স্বামীজী পাশ্চাত্যে যাবার আগে বা পর থেকেই মঠে যাতায়াত করছিলেন। শিকাগোয় তাঁর বিজয়বার্তা সমুদ্রতরঙ্গের আকারে অপর গোলার্ধে ভারতকে স্পর্শ করেছিল। যুবসমাজের চেতনায় অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলেছিল সে সংবাদ। ১৮৯৭ সালে কলকাতায় পদার্পণ করলেন স্বামীজী। যুবকের দল বাঁধভাঙা আবেগ, আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে তাঁকে বরণ করল। কেউ উদ্বুদ্ধ হল স্বদেশচেতনায়—ভারতমাতার চরণে তারাও আত্মবলি দিয়ে শহীদ হয়েছিল, কেউ বা তাঁকে ধর্মজীবনে গুরুরূপে গ্রহণ করল। তখন বিবেকানন্দকে নিয়ে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সমালোচনা ও প্রশংসার তুফান। সেই অবিসংবাদিত অধ্যাত্মপ্রতিভাকে সেদিন ধ্রুবতারারূপে নির্বাচন করে কয়েকজনই আত্মসমর্পণ করেছিলেন। হয়ে উঠেছিলেন বিবেকানন্দের প্রেরণায় ঘূর্ণায়মান প্রচণ্ড শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র। তাঁরা জীর্ণ সমাজের রাশি রাশি কুসংস্কারের সামনে তুলে ধরেছিলেন ত্যাগ ও সেবার নবীন তন্ত্র।

এইসব নবীন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ভারতে আচার্য বিবেকানন্দের দিনগুলি ছিল প্রেরণায় পরিপূর্ণ। যে আচার্য পাশ্চাত্যে বসে ভারতের হিমালয় ও একটি মঠের পরিবেশে মনে মনে চলে আসতেন—তিনি সেদিন সত্য সত্যই পুণ্যভূমি ভারতে ত্যাগী গুরুভাই ও সন্তানগণ পরিবৃত হয়ে অবস্থান করছেন। শুধু কাজের কথা নয়—এবার তিনি ব্যগ্র হয়েছিলেন ঐ তরুণদের সাধুজীবন সুগঠিত করতে। এক অভিনব ধ্যান শেখালেন তিনি শিষ্যদের। স্বামী শুদ্ধানন্দের স্মৃতিচারণে সেই কথা লিপিবদ্ধ আছেঃ "...এইরূপ ভাব যে, আমার নিকট হতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ যাচ্ছে—হৃদয়ের ভিতর হতে সমগ্র জগতের জন্য শুভকামনা হচ্ছে—সকলের কল্যাণ হোক, সকলে সুস্থ ও নীরোগ হোক...।"[৮] সর্বজনের কল্যাণেই এই প্রার্থনা। ধীরে ধীরে কর্মপন্থা গড়ে উঠতে লাগল। গুরুভাইদের দিয়ে তিনি প্রচারকার্য শুরু করলেন। কেউ কেউ গেলেন পাশ্চাত্যে, কেউ দক্ষিণ দেশে, কেউ বা আর্ত-পীড়িত মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

স্বামীজী তখন শিষ্যবাৎসল্যে করুণাময় অথচ যুগচক্র প্রবর্তনে উন্মুখ। কিশোর কালীকৃষ্ণ (স্বামী বিরজানন্দ) লিখেছিলেন ১৮৯৭ সালেঃ "সেই সম্মোহন চক্ষু—যার কথা শুনেছিলুম ও আমেরিকার কাগজে cutting-এ পড়েছিলুম! তাঁর সমস্ত শরীর দিয়ে যেন

একটা জ্যোতি বেরুচ্ছে। কী অপরূপ মূর্তি—একাধারে সৌন্দর্য ও মহাশক্তির খেলা, একটা nonchalant ভাব, a dazzling personality. আমার first impression—ভালবাসা, ভক্তি ও ভয়মিশ্রিত ভাব।"[৯] স্মৃতিচারণ করেও বলেছিলেন ঃ "তিনি যখন ভিতর বাড়ীর ছাদে কৌপীনমাত্র পরে আপনাব ভাবে বিভোর হয়ে সিংহের মতো ঘুরে ঘুবে পায়চারি করতেন তখন মনে হত যেন আধ্যাত্মিক জগতের নেপোলিয়ন, তাঁর পদক্ষেপে যেন দুনিয়াটা slipping from under his feet, যেন টলমল করছে। মনে হত যেন একটা মহাশক্তির স্ফুরণ অনবরত হচ্ছে ও ফেটে পড়ছে।"[১০]

প্রসঙ্গত বলা যায় পাশ্চাত্য শিষ্য ও শিষ্যাদের কাছ থেকে আমরা স্বামীজীর সম্বন্ধে বহু সংবাদ পাই। সে তুলনায এদেশে স্বামীজীর সন্তানরা তেমন কিছু লিখে যাননি। বিশেষ করে ভগিনী নিবেদিতার 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থখানি তাঁর অপূর্ব গুরুভক্তির স্বাক্ষব। নিবেদিতা ছিলেন জাত-লেখিকা। তাঁর কলমে স্বামীজীর ফুটেছিল এক অনন্য রূপ। স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের কাছে এ প্রসঙ্গে জনৈক আমেরিকান মহিলা ভক্ত প্রশ্ন তুলেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে স্বামীজী পাশ্চাত্য শিষ্যশিষ্যাদের সঙ্গেই আলাপ করেছেন—তাব কাবণ কি? স্বামী বিরজানন্দ জানিয়েছিলেন ঃ "স্বামীজীর প্রতি ব্যক্তিগত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-প্রদর্শনেব দিকেই আমবা বেশী নজব দিতাম, তাঁর ভাবগুলির কথা চিন্তা না করে তাঁব ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও সুখসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখতেই বেশী ব্যস্ত থাকতাম। যদি...যে সব ভারতীয় ব্রহ্মচাবী বা সন্ন্যাসীবা স্বামীজীব সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা নিত্য তাঁব অসংখ্য প্রসঙ্গ শুনে তাঁর কাছ থেকে শুনেছি বলে লিখে বাখতেন তাহলে তা দিয়ে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার ও স্বামীজীব বাণীকে বোঝাব ক্ষমতা অসম্ভবরূপে সমৃদ্ধ হত।...এমনি অযোগ্য শিষ্য ছিলাম আমরা।"[১১] পত্রটি তুললাম এইজন্য—এর প্রতি ছত্রে কী বিনয়, নম্রতা ফুটেছে! ভারতীয় রীতিতে গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক তো তা-ই! 'তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।' সেবা, প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্নের দ্বারাই তো ব্রহ্মবিদ্‌ গুরুকে প্রসন্ন করতে হয় এবং জ্ঞানলাভ তাঁদের কৃপায় সহজ হয়। তাই ভারতের সন্তানেরা সেই পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন এবং শ্রীগুরুর অপার কৃপায় তাঁদের চরিত্রের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। তাঁরা স্বামীজীর সব কথা লিখে রাখেননি ঠিকই কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনেই স্বামীজীর এক একটি বাণী মূর্তিময় হয়েছিল। 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' লিখে স্বামীজীর গৃহী সন্তান শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী আমাদের কাছে স্বামীজীর যে অনবদ্য আচার্যরূপটিকে প্রকাশ করেছেন তার কোনও তুলনা নেই। শাস্ত্রে স্বামীজীর কত অধিকার ছিল—বাণী ও রচনার ঐ অংশেই তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বামীজীর সন্তানদের সকলেই যেন তাঁর বহুমুখী দিব্য চরিত্রের একেকটি দিক। তাঁদের নিয়ে স্বামীজীর নির্দেশিত পন্থায় কীভাবে একটা আন্দোলন শুরু হল সেটির কথাই বলব।

প্রথমদিকে স্বামীজী ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহী হন কারণ তার মাধ্যমেই শ্রীবামকৃষ্ণের অভিনব জীবন ও ভাবধারা সহজে ছড়িয়ে পড়বে জনসাধারণের মধ্যে। দ্বিতীয় ছিল বক্তৃতাদির মাধ্যমে প্রচারকার্য। স্বামীজী নিজেই বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দকে ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন। যাবার আগে তাঁদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ

করেছিলেনঃ "বিশ্বাস কর, তাঁর শক্তি তোদের ভিতর সংক্রামিত হয়েছে। জানবি সংঘই ঠাকুরের সমষ্টি শরীর।"[১২] ধর্মীয় পরিমণ্ডলে সংঘের সূচনা করেছিলেন বুদ্ধদেব। আচার্য শঙ্করেরও ছিল অপূর্ব সংগঠন-প্রতিভা। স্বামীজী বর্তমান জগতে সংঘবদ্ধভাবে কর্মপ্রণালীর ওপর গুরুত্ব দেন। কারণ তখনও ভারতের সাধুসমাজ ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনায় একক জীবনের পক্ষপাতী। সমাজবিমুখ সেইসব শক্তিমানদের সঙ্গে সমাজের সংযোগ শক্তিসঞ্চার করবে, সাধারণ মানুষের জীবনে রূপান্তর নিয়ে আসবে। তাই শিক্ষা ও সেবার ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীদেব সংঘবদ্ধ কর্মসূচী প্রবর্তনে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। সনাতন সাধুজীবনকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁদের শক্তিকে তিনি জনকল্যাণে প্রয়োগ করতে চান। স্বামীজীর নির্দেশে হিমালয়ে অদ্বৈত আশ্রমের কর্মী হিসাবে যান বিরজানন্দ। স্বামীজীর শিষ্য স্বরূপানন্দ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। তিনি পূর্ব জীবনে একটি ইংরেজী মাসিকপত্রও সম্পাদনা করতেন। স্বামীজী এই ছেলেটিব পরম বৈরাগ্য দেখে চমৎকৃত হন। তাঁকে সন্ন্যাসদানের পর আনন্দে ধীরামাতা প্রভৃতির কাছে তিনি বলেছিলেনঃ "We have made an acquisition today." ছেলেটিকে তিনি রত্ন বলেই গণ্য করেন। নিবেদিতা তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "স্বামীজীকে বাদ দিলে স্বরূপানন্দ হলেন তিনজন বাঙালীব একজন, যাঁদের সঙ্গে পরিচয়ে আমি গর্বিত।"[১৩] স্বরূপানন্দের সম্পাদনায় 'প্রবুদ্ধ ভাবত' পত্রিকা নতুন কলেবরে আত্মপ্রকাশ করে। ক্যাপ্টেন সেভিয়াব ও মিসেস সেভিয়ারের আর্থিক শুধু নয়, সর্বপ্রকার সহায়তায় সম্পাদকীয় কার্যালয়, ছাপাখানা ইত্যাদি স্থাপিত হয় মায়াবতীর মতন হিমালয়ের বিজন বাজ্যে। একজন সন্ন্যাসী পত্রিকাব সম্পাদকরূপে বিদগ্ধসমাজে সেই প্রথম সুপরিচিত হলেন। স্বামীজী নিউ ইয়র্ক থেকে লিখেছিলেনঃ "স্বরূপকে বলবি আমি তার কাগজ চালানোতে বিশেষ খুশী। He is doing splendid work."[১৪] খগেনও (স্বামী বিমলানন্দ) ছিলেন মেধাবী ছাত্র, কালীকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু। স্বামীজী অদ্বৈত আশ্রমেব জন্য তাকেও মনোনীত করেন। তাঁর ইংরেজী ভাষায় অসাধাবণ দখল ছিল। তিনজন গুরুভ্রাতা একাগ্রনিষ্ঠায় হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে, শুধু তপস্যা নয়, স্বামীজীর কাজে মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন। মাদার সেভিয়ার ছিলেন তাঁদের মায়ের মতন এবং সম্পাদনার কাজে সহায়ক। প্রথমদিকে কালীকৃষ্ণ সারাদিন পরিশ্রম করতেন পাহাড়ী পথনির্মাণ করতে। তাঁদের কাছে প্রতিটি কাজই ছিল পূজার তুল্য। তিনি স্মৃতিচারণা করে বলেছেনঃ "খগেন (স্বামী বিমলানন্দ) হল সহকারী ম্যানেজার, স্বরূপানন্দ 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র সম্পাদক...আমার কাজ হল পি.ডবলু.ডি ডিপার্টমেন্ট—বাস্তা তৈবী, জঙ্গল পরিষ্কার এইসব।"[১৫] স্বামীজী মিস্টার সেভিয়ারের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ১৯০০ সালে মায়াবতীতে আসেন। তাঁদের কাজকর্মে তিনি প্রসন্ন হন। কালীকৃষ্ণ, ব্রহ্মচারী জ্ঞান ও খগেন এই সময়ে ঠাকুরের ছবি বসিয়ে ছিলেন একটি ঘরে। অদ্বৈতভাবের সেই কেন্দ্রে ঐ পূজার প্রবর্তন স্বামীজী অনুমোদন করেননি। তিনি স্বরূপানন্দ ও মাদারকে তিরস্কার করেন। ঐ আশ্রমে অদ্বৈতভাবেরই চর্চা হবে। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিমলানন্দ শ্রীমার মতামত চেয়ে চিঠি লেখেন যার বিখ্যাত উত্তরটি আজও বিস্ময় জাগায়ঃ "আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত, তোমরা যখন সেই গুরুর শিষ্য তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী।"[১৬] শ্রীশ্রীমা যে সর্বতোভাবে তাঁর নরেনের নতুন প্রবর্তনাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ শুধু নয়, প্রতিপদে সমর্থন করেন—তার একটি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া

গেল। আমাদের মনে রাখতে হবে অনেকেই তাঁরা মায়ের কাছে মন্ত্র দীক্ষা পেয়েছিলেন এবং স্বামীজীর আদেশ পালনে ছিলেন প্রাণপণ তৎপর। স্বামীজীর তিরোধানের পরও মায়াবতীর কাজ যখন পূর্ণমাত্রায় চলেছে আকস্মিকভাবেই স্বরূপানন্দের জীবনাবসান হয় নৈনীতালে। স্বামীজীর রচনাবলী প্রকাশের মালমশলা সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। এবার সেই গুরুভার গ্রহণ করলেন স্বামী বিরজানন্দ। তার সঙ্গে স্বামীজীর একটি ইংরেজী প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ রচনার দায়িত্ব। এক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে গেল, ঝাণ্ডা তুলে নিল অপর জন। স্বামীজীর কাজের এই পরম্পরা এঁরাই স্থাপন করে গেলেন। হিমালয়ের নিভৃত রাজ্যে ধ্যান ও তপস্যার জন্য ব্যাকুলতা স্বাভাবিক কিন্তু স্বামীজীর কর্মযজ্ঞ সম্পাদনে কালীকৃষ্ণ দিবারাত্র অমানুষিক পরিশ্রম করে একে একে তাঁর জীবনীগ্রন্থ ও রচনাবলী প্রকাশ করতে লাগলেন। সে এক মহান দায়। কালীকৃষ্ণ যেদিন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষতা থেকে বিদায় নিলেন সেদিন স্বামীজীর অনুরাগী ম্যাকলাউডের কাছ থেকে এল সেই বিখ্যাত চিঠিঃ "মায়াবতীতে অবিশ্রান্ত কর্মচক্রে কী নিষ্ঠার সঙ্গে তুমি কাঁধ পেতেছ।...কী গৌরবময় এই কাজ!...দেখতে চাই যে তাঁর (স্বামীজীর) একজন অন্তরঙ্গ সন্তান তাঁর প্রিয় হিমালয়ের কেন্দ্রে তাঁর আধ্যাত্মিক বাণী প্রচার করছেন...প্রিয় গুডউইনের কাছে আমরা যেমন স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি লিপিকরণের জন্য ঋণী তেমনি তোমার কাছে ঋণী সেগুলির মুদ্রণের জন্য। আর প্রিয় সেভিয়ারদম্পতি দিয়েছেন এই কাজে আর্থিক সহায়তা।"[১৭] স্বামী বিবেকানন্দের এই সুযোগ্য সন্তান জীবনের শেষপর্বে আসীন ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধ্যক্ষের গৌরবময় পদে। স্বামী বিমলানন্দও মায়াবতীর কর্মক্ষেত্রে দেহত্যাগ করেন। আজও সেই 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র কাজ অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে আসছে বিবেকানন্দ-তীর্থ মায়াবতী আশ্রমে।

বাংলাদেশে বাংলা পত্রিকার ভার পড়েছিল স্বামী শুদ্ধানন্দের ওপর। স্বামীজীর পরম স্নেহভাজন ছিলেন সুধীর মহারাজ। গুরুর কাছে শাস্ত্রপাঠের দুর্লভ সুযোগ তাঁর ঘটে। শ্রীগুরুর ভাব ও ভাষার সঙ্গে তিনি এমন একাত্ম হয়েছিলেন যে তাঁর অনুবাদগুলি মূল বাংলা রচনা বলেই বোধ হত। স্বামী শুদ্ধানন্দের অনুবাদ শুনে স্বামীজী প্রীত হন এবং বলেনঃ 'রাজযোগটা তর্জমা কর না।' গুরুর এই আদেশেই শিষ্যের মধ্যে নবীন শক্তির সঞ্চার হল। আশ্চর্য দক্ষতা ও নিষ্ঠায় তিনি অধিকাংশ গ্রন্থের অনুবাদ করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন সকলের কাছে। বাংলাদেশে 'উদ্বোধন পত্রিকা'র সম্পাদনা এবং স্বামীজীর রচনাবলী অনুবাদের মাধ্যমে তিনিই একটি ভাববিপ্লব নিয়ে আসেন। স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে শাস্ত্র ব্যাখ্যার অপূর্ব শক্তি তাঁর ছিল। একবার নবীন সাধুরা স্বামীজীর কাছে বেদান্ত অধ্যয়নে মগ্ন। সন্ধ্যারতির সময় আসন্ন। বাবুরাম মহারাজ সকলকে ডাকতে এলেন। সাধুরা অপ্রস্তুত। স্বামীজী সেদিন বাবুরাম মহারাজকে বললেনঃ "এই যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, এটা কি ঠাকুরের পূজা নয়? কেবল একখানা ছবির সামনে সলতেপোড়া নাড়লে আর ঝাঁঝ পিটলেই মনে করেছিস বুঝি ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়?"[১৮] প্রতিপদে স্বামীজীর কাছে শুদ্ধানন্দ কার্যকরী বেদান্তের পাঠ নিয়েছিলেন। সারারাত প্রুফ দেখে তিনি 'কালীপূজার আনন্দ' অনুভব করতেন। বলেছিলেনঃ "দেখ, স্বামীজীর কৃপায়, তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে আমি এইটুকুই বুঝেছি যে, আমাদের সব কর্ম—তা রিলিফই হোক,

স্কুল-কলেজেই হোক, বা ডাক্তারখানা-হাসপাতালই হোক, অথবা বক্তৃতা দেওয়া, ক্লাস করা, যাই হোক, সবই হচ্ছে ভগবদ্-উপাসনা—তাঁরই মহিমা প্রচার।"[১৯] স্বামীজীর ভাব তিনি গভীরভাবে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসিসন্তান যিনি বিশাল সংঘ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত পথে সংঘকে অভ্রান্তভাবে পরিচালনা করে সংঘের ইতিহাসে স্মরণীয় হন। তাঁর অনুপম জীবন ছিল স্বামীজীর বাণীর জীবন্ত ভাষ্য।

তাঁরই ছোট ভাই স্বামী প্রকাশানন্দ পাশ্চাত্যে আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে যান। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে তাঁরও জীবনের রূপান্তর ঘটে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁর বাচনভঙ্গি ও বক্তৃতার রীতিনীতি ছিল স্বামীজীরই মতো। তিনি ১৯০৬ সালে সানফ্রান্সিস্কো বেদান্তকেন্দ্রে প্রচারকরূপে যাত্রা করেন মূলত ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজকে সহায়তা করার জন্য। পরে তিনিই কর্মভার গ্রহণ করেন। অক্লান্তভাবে বেদান্তপ্রচারে ব্রতী প্রকাশানন্দ বলতেনঃ 'Now I must be up and doing to spread Swamiji's message all over California.'[২০] পদে পদেই তিনি স্মরণ করতেন স্বামীজীকে। বিদেশেই এই সন্ন্যাসিসন্তানের জীবনাবসান হল। স্বামী বোধানন্দ ছিলেন স্বামীজীর আরেকজন অনুগামী শিষ্য, যিনি তাঁর জীবনের গৌরবময় সময় অতিবাহিত করেন বিদেশে এবং সেখানেই বেদান্তপ্রচারে যুক্ত থাকেন। একবার তপস্যায় রত এই শিষ্যের আগমন শুনে স্বামীজী বলে পাঠিয়েছিলেনঃ 'তাকে আমার কাছে সোজা আসতে বলে দাও। আমি তাকে হৃষীকেশের বেশেই দেখতে চাই।' শিষ্য বোধানন্দকে রহস্য করে বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ "নিরক্ষর ঐ ব্রাহ্মণ-পূজারীর স্নেহের গোলাম হয়ে, দেখ আমার অমূল্য জীবনের কত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছি।"[২১] আবার শ্রীগুরুর শ্রীমুখে তিনিই শুনেছিলেনঃ "ঠাকুর অবতার ছিলেন কি তদপেক্ষাও বড় ছিলেন তা জানি না। তাঁকে বর্ণনা করবার চেষ্টা করলেই তাঁর মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়"[২২] গুরুর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য তাঁর পরম সম্পদ ছিল। আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারের ক্ষেত্রে স্বামীজীর এই শিষ্যেরও ছিল বিশেষ অবদান। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর শিষ্য পরমানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বামী অভেদানন্দের সহকারী হিসেবে তিনি আমেরিকায় প্রচারকার্যে ব্রতী হন।

স্বামীজী থাকতেই দুই স্থানে সেবাকার্যের সূচনা হয়েছিল। বাংলার বাইরে তাঁরই প্রেরণায় ঐ সেবাকার্য সম্পন্ন করেন সন্ন্যাসিসন্তানগণ। স্বামীজীর একেকটি আদেশ বা নির্দেশই ছিল তাঁদের প্রেরণার উৎস। গুরুর প্রতি অমেয় বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা সেবাকার্যে জীবনপাত করেছেন। কেদারনাথ মৌলিক ও চারুচন্দ্র দাস স্বামীজীর নরনারায়ণ সেবার আদর্শে বৃদ্ধ তীর্থযাত্রীদের মধ্যে কাজ শুরু করেন। তাঁদের সেই সেবাকাজের কথা শুনে স্বামীজী বড় প্রীত হয়ে বলেছিলেনঃ "ছোঁড়ারা কেউ কিছু করলে না। যাই হোক, তবু কাশীর ছেলেরা আমার spirit-এ কিছু কাজ করছে।"[২৩] কেদারনাথ স্বামীজীকে নয় মাস সেবার সুযোগ পেয়ে তাঁর ভালবাসায় মুগ্ধ হন। স্বামীজীর কাছেই সন্ন্যাস লাভ করেন। কাশীর অদ্বৈত-আশ্রমই তখন (কেদারনাথ) অচলানন্দের সাধন ও কর্মক্ষেত্র ছিল। সেবাশ্রমের কর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন উৎসাহ ও প্রেরণাস্বরূপ। ১৯০৮ সালে দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করে সেবাশ্রমের গৃহনির্মাণ কাজের দায়িত্ব বহন করেছিলেন আনন্দের

সঙ্গে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমেই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। তাঁর সঙ্গী ছিলেন চারুচন্দ্র যিনি উত্তরকালে স্বামী শুভানন্দ নামে পরিচিত হন। 'উদ্বোধনে' স্বামীজীর বাণী পড়ে তিনি মোহিত হন। আবেগে আনন্দে বলেছিলেনঃ "...ঐ শোন স্বামীজীর বেদান্তবাণী! ঐ যে সম্মুখে ব্যাধি-পীড়িত বুভুক্ষু দরিদ্রদের দেখছ, ওরাই আমাদের ঈশ্বর—আমাদের নারায়ণ—আমাদের শিব।"[২৪] অবিমুক্তপুরী কাশীর মহাতীর্থে অগণিত তীর্থযাত্রীর আনাগোনা। বহু অসহায় যাত্রী পথে পড়ে মৃত্যুবরণ করতেন। এই চারুচন্দ্র প্রভৃতি যুবকেরা চাঁদা তুলে সূচনা করলেন এক বিরাট সেবাযজ্ঞের। স্বামীজী তাঁদের সমিতির নাম দিয়েছিলেন—'Ramakrishna Home of Service.' চারুচন্দ্রকে স্বামীজী মন্ত্রদীক্ষা দান করেন এবং তাঁদের জন্য একটি আবেদন রচনা করে দেন। তার ফলে অনেকেরই দৃষ্টি ঐ সেবাকর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়। সেবাশ্রমটি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ক্রমে বৃহৎ আকার নিল। চারুচন্দ্রের সেবানিষ্ঠা ও পরিচালন শক্তি শতগুণে বর্ধিত হয়। বিশ বৎসর প্রাণপণ পরিশ্রম করে স্বামীজীর একটি ইচ্ছাকে রূপ দান করলেন তরুণটি অন্যান্য সহকর্মীদের সহায়ে। অবশেষে তিনি ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে সন্ন্যাস নিলেন—নাম হল স্বামী শুভানন্দ। এঁদের সকলের জীবনে একদিকে ঈশ্বরপবায়ণতা ও পরম বৈরাগ্যের সঙ্গে নিষ্কাম কর্মের ভাবটি যুক্ত হয়েছিল—যা তখনকার সাধুসমাজে বিরল।

উত্তরপ্রদেশের কনখলেও স্বামীজীর সন্তান কল্যাণানন্দ শুরু করেছিলেন নতুন কর্মযজ্ঞ। শ্রীবামকৃষ্ণ সাধুজীবনের বাস্তব দিকটি সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। সাধুরা টাকা নেন—এই অভিযোগ এসেছিল গৃহস্থ ভক্ত রাজেন্দ্র মিত্রের কাছ থেকে। করুণার মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণও সেদিন বলেছিলেনঃ "আমি ভাবি যে, সাধুদের কেউ টাকাপয়সা দেবে না তো খাবে কি করে? এখানে প্যালা দিতে হয় না—তাই সকলে আসে।"[২৪ক] পুরোনো মূল্যবোধের যে পরিবর্তন ঘটে গেছে তা তিনি জানতেন। অন্যদিকে স্বামীজীর সকল পরিকল্পনার অন্তরালেই ছিল শ্রীগুরুর অমোঘ ইচ্ছা। ভাবতপরিক্রমার পথে ঈশ্বরনির্ভর সাধুদের কষ্ট তিনি দেখেছিলেন। বিশেষ করে উত্তরাখণ্ডে অসুস্থ সাধুদের চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি কয়েকবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 'সখার প্রতি' কবিতায় লিখেছেনঃ

> অসহায় ছিন্নবাস পরে দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ
> ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে কী ধন করিনু উপার্জন।

তাঁর শিষ্য কল্যাণানন্দেব ছিল স্বতঃস্ফূর্ত সেবার ভাব। তাই স্বামীজী তাঁকে ডেকে বলেছিলেনঃ "দেখ্ কল্যাণ, হৃষীকেশ-হরিদ্বার অঞ্চলের অসুস্থ, রুগ্ন সাধুদের জন্য কিছু করতে পারিস্? তাঁদের দেখবার জন্য কেউ নেই। তুই গিয়ে তাঁদের সেবায় লেগে যা।"[২৫] অন্যদিকে মারাঠী শিষ্য নিশ্চয়ানন্দকেও বলেছিলেনঃ "দেখ নিশ্চয়, সাধু হয়ে অপরের গলগ্রহ হওয়া উচিত নয়।... তুমি কখনও যেন এমন কর না।... তৃষ্ণাতুরকে জলপান করালেও মহৎ কাজ হবে।"[২৬] স্বামী কল্যাণানন্দ গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে কনখলে কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁর সেই সেবাকার্যে স্বামী স্বরূপানন্দ ও স্বামী বিমলানন্দ প্রভৃত সহায়তা করেছিলেন। ঘুরে ঘুরে তিনি অসুস্থ সাধুদের চিকিৎসা করতেন। ভাড়া করা দু-খানি ঘরে অসুস্থ সাধুদের রেখে চিকিৎসা শুরু হয়। ক্রমবর্ধমান সেই সেবার কাজে

ক্রমে স্বামী নিশ্চয়ানন্দও যুক্ত হলেন। সেবার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করলেন নতুন ইতিহাস। স্বামীজীর নতুন প্রবর্তনা সার্থক হল। প্রায় সুদীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর আমৃত্যু কল্যাণানন্দ সেবার ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন। হৃষীকেশ অঞ্চলেও ঐ সেবাকার্যের বিস্তার ঘটে। সেবাকর্মের সূচনায় স্বামীজী কল্যাণানন্দের উদ্যমে খুবই আনন্দিত হন ও বলেনঃ "দেখ কল্যাণ... একদিকে ঠাকুরের মন্দির থাকবে—সাধু ব্রহ্মচারীরা ধ্যানধারণাদি করবে, তারপর যা ধ্যান করলে Practical field-এ তা কাজে লাগাবে।"[২৭] স্বামীজীর এই ইচ্ছার যথার্থ রূপ ফুটে উঠেছিল স্বামী কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দের জীবনে। সাধুসমাজে প্রথমদিকে তাঁরা সেবাকার্যের জন্য পরিচিত ছিলেন 'ভাঙ্গী সাধু' বলে। পরে প্রাচীন সাধুদের স্বীকৃতি আসে। তাঁর সহকর্মী নিশ্চয়ানন্দের জীবনও ছিল মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত। কনখল আশ্রমে একবার মাস্টার মহাশয় পুরোনো ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে বলেছিলেনঃ "দেখ নিশ্চয়, ঠাকুর বলতেন ঈশ্বরলাভই সাধুজীবনের উদ্দেশ্য। কাজকর্মই সাধুজীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়।"[২৮] উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ "দেখুন আমি স্বামীজীর গোলাম... তাঁর কাজ করাই আমার জীবনব্রত।"[২৯] এই দুই সাধুর জীবনেই নরনারায়ণ সেবার সাক্ষাৎ ফল দেখি। তাঁরা ঐ তপস্যার বলে অধ্যাত্মশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। কনখল থেকে আঠারো মাইল পথ হেঁটে প্রতিদিন তিনি হৃষীকেশের সাধুদের সেবা করে আসতেন—যা অসম্ভব মনে হয় এবং ভিক্ষান্নে উদরপূরণ করতেন। এই সাধুর দেহান্তে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেনঃ "রামকৃষ্ণ মিশনের এই সকল কর্মীরা ইষ্টকের পরিবর্তে নিজেদের অস্থি-কঙ্কাল দিয়া, চুন-সুরকীর পরিবর্তে মজ্জা দিয়া এবং জলের পরিবর্তে হৃদয় ও গাত্রের তপ্ত শোণিত দিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের হর্ম্য নির্মাণ করিয়াছিলেন।"[৩০] স্বামীজীর সকল সন্তানই হয়তো সক্রিয়ভাবে নরনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেননি বা সুযোগ পাননি। আত্মানন্দ প্রভৃতি সাধুরা স্থান জাগিয়ে সংঘে থেকেছেন। কিন্তু তাঁদের সকলেরই প্রেরণাপুরুষ ছিলেন স্বামীজী। স্বামীজীর ভাবাদর্শকে প্রচার ও সেবাকার্যেই নয়, সংঘের প্রতিটি কাজেই তাঁরা অগ্রণী হয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন সাধুসমাজে। প্রতিটি কর্ম হয়েছে উপাসনা। মানুষ হয়েছে সাক্ষাৎ নারায়ণ। এই নতুনধারার প্রবর্তনায় তাঁদের পাশে সর্বদাই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সারদানন্দ—প্রভৃতি সকলেই অপত্যস্নেহে স্বামীজীর এই সন্তানদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন। স্বামীজীর কাজ ও সাধনভজন তাঁদের কাছে আলাদা ছিল না। নিবেদিতা ও গুডউইন প্রসঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দ তাই কালীকৃষ্ণকে লেখেনঃ "বলিতে কি কালীকৃষ্ণ, আমি নিত্য উঁহাদের উদ্দেশ্যে ফুল দি, যেদিন পূজা করি। আমি জানি আমি স্বামীজীর এইসব ভক্তদের দাসানুদাস, গোলামের গোলাম।"[৩১]

মনে পড়ে স্বামীজীর এক যুগান্তকারী আশ্চর্য মন্তব্য। ভক্তিমতী প্রাচীন সাধিকা গোপালের মাকে দর্শন করে নিবেদিতা, ম্যাকলাউড প্রভৃতি স্বামীজীর কাছে ফিরেছেন। তাঁদের মুখে সব বর্ণনা শুনে স্বামীজী বলছেনঃ "আহা! তোমরা প্রাচীন ভারতকে দেখে এসেছ, উপাসনা ও অশ্রুবর্ষণ, উপাসনা ও রাত্রি জাগরণ—সে ভারত চলে যাচ্ছে, আর কখনো ফিরে আসবে না।"[৩২]

বাস্তবিক ভারতের ত্যাগতপস্যাময় ঈশ্বরীয় জীবন ঠিক অবিকলভাবে এই বর্তমান শতকে নিয়ে আসা সম্ভব নয়—একথা তিনি ইতিহাস অনুধ্যান করে বুঝেছিলেন। তমো

নিদ্রা থেকে প্রচণ্ড রজোগুণের মধ্য দিয়ে সত্ত্বগুণে অগ্রসর হওয়াই সাধনা। জীবনের প্রবল কর্মময়তার সঙ্গে ধ্যানের, ভক্তির সঙ্গে বিচারবোধের, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বাস্তব পটুতার সমাবেশ করা প্রয়োজন। তাঁর সেই নতুন কর্মচেতনার সূত্রপাত গুরুভাই ও সন্ন্যাসী সন্তানদের নিয়ে। এই নতুন পথেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্মরথ বাহিত হয়ে চলেছে। বনের বেদান্তকে ঘরে আনার সাধনা ছড়িয়ে পড়ছে বৃহত্তর সমাজের স্তরে স্তরে। সবশেষে বলি, মায়ের সেই অপূর্ব কথা যা রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের নতুন কর্মপ্রবাহকে দিয়েছে শক্তি ও সাহস। একবার তাঁর জনৈক সন্তান যখন সেবাশ্রম, হাসপাতাল চালানো, বই বেচা, হিসাবনিকাশ প্রভৃতি সাধুর পক্ষে সঙ্গত নয় বলে অভিযোগ করেন তখন শ্রীমা দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন ঃ "কাজ করবে না তো দিনরাত কি নিয়ে থাকবে? চব্বিশ ঘণ্টা কি ধ্যানজপ করা যায়।...মঠ এমনি ভাবেই চলবে। এতে যারা পারবে না তারা চলে যাবে।"[৩৩]

এই নবতম প্রবর্তনায় স্বামীজীর ত্যাগব্রতী শিষ্যদের অবদানের সীমা নেই।

বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা ঃ
স্নেহের উৎস ও করুণার ধারা

কবিতা সিংহ

তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রাচ্যের, অন্যজন প্রতীচ্যের, একজন পুরুষ অন্যজন রমণী। একজন ছিলেন সন্ন্যাসী অন্যজন সামাজিক। একজন ছিলেন আচার্য অন্যজন জিজ্ঞাসু। একজন স্থিতপ্রজ্ঞ, অন্যজন অস্থির এবং একজন মুক্ত মহাদেশিক, অন্যজন দ্বীপবদ্ধ। এইভাবে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্কের প্রথম সূচনা।

আমরা যখন এই সম্পর্কের গোড়ায় পৌঁছাতে চাই তখন আমাদের সাহায্য করে নিবেদিতারই কিছু লেখা, কিছু চিঠি এবং কিছু সমকালীন স্মৃতিচারণা। সেইসঙ্গে অবশ্যই স্বামীজীর কিছু চিঠিপত্র, মন্তব্য, কথোপকথন ও অন্যরচনা। এইসব উপাদান থেকে আমরা শেষপর্যন্ত যে নিবেদিতাকে পেয়ে যাই তিনি প্রকৃতই এক ভারতকন্যা। কেবল 'ভারতবন্ধু' বলে আখ্যা দিলে তাঁকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায় না।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই বলেছিলেনঃ 'ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যিই ভালবেসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়।' নিবেদিতাকে আমরা যখন তাঁর পূর্ণ বিভায় কিরণ ছড়াতে দেখি, তখন তিনি একা, স্বতন্ত্র. অনপেক্ষ এবং তাঁর 'প্রভু' স্বামী বিবেকানন্দ তখন আর এই মর্তভূমিতে নেই। নিবেদিতা তখন তাঁর বহুমুখী সেবাকর্মে একটা বহুতল হীরার মতো ঝল্‌সে উঠেছেন। তাঁর এক একটি তল যেন এক এক কর্মে কিরণ ঢালছে এবং সেই দীপ্তি সর্বদাই সমান উজ্জ্বল।

যদি আমরা এই হীরকের জন্মের উৎস সন্ধানে যাই, তাহলে দেখব যে, খনির অন্ধকারে নিকষ কালো কয়লার স্তরের মধ্যে, প্রবল চাপ ও তাপের ফলেই তার রূপান্তর ঘটে। ভঙ্গুর কয়লা থেকে সে বদলে যায় কঠিন হীরায়। তার ভিতরে হয় আগুনের আগমন। তার ভঙ্গুরতা বদলে যায় বজ্রের কাঠিন্যে।

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল তাঁর জন্মের আগেই তাঁর জননী মেরী নোবল কর্তৃক ঈশ্বরে নিবেদিতা ছিলেন। তাঁর যাজক পিতা তাঁর জন্য রেখে গিয়েছিলেন স্বাধীন পথে চলবার আশীর্বাদ। তাঁর পিতামহী তাঁকে দিয়েছিলেন এক সহজ ও খাঁটি সত্য ও ঈশ্বর-পরায়ণ জীবন। তাঁর মাতামহ তাঁর মধ্যে জ্বেলেছিলেন স্বাধীনতাসংগ্রামের গৌরব। তবুও মার্গারেট নোবল অনেক বিচ্ছেদ ও মৃত্যুর সাক্ষী হয়েছিলেন অল্প বয়সেই। পার্থিব আঘাত এবং

শোক মার্গারেটকে বিকল করতে পারেনি। বরং আরও বেশি আত্মস্থ এবং পরিণত মার্গারেট নিজেকে আরও গভীরভাবে ব্যাপৃত করলেন নানান কর্মপ্রয়াসে। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান পদ্ধতির চর্চায়, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সাহিত্যসেবায় তিনি নিজেকে আরও স্বশিক্ষিত এবং পরিশীলিত করতে লাগলেন। সেইসঙ্গে কখনও শ্রমিকদের মধ্যে সেবার কাজ এবং চার্চের সেবাকাজে অংশ নিতে লাগলেন। কিন্তু চার্চে কাজ করতে গিয়ে তিনি যখন দেখলেন দরিদ্র-সেবার নাম করে, কেবল যারা চার্চের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহী, শুধু তাদের কাছেই চার্চের দান ও দক্ষিণা পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তখন তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তিনি ধীরে ধীরে ধর্ম থেকে নয়, প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্না মার্গারেট এই সময়ে লণ্ডনের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'সিসেমি' ক্লাবেরও একজন সক্রিয় সদস্যা। সেই সূত্রে বার্নাড শ এবং হাক্সলির সঙ্গেও তাঁর আলাপ ছিল এবং তিনি তখন পত্রপত্রিকায় নানা বিষয়েই লিখতে শুরু করেছিলেন। এইসঙ্গে যদিও স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের মিশ্র রক্ত তাঁর মধ্যে প্রবাহিত তবুও, সাধারণভাবে আর পাঁচজন ইংরেজের মতো, নিজেকে ইংরেজ মনে করে মার্গারেট ইংলণ্ডের বিজয়গৌরবে গৌরবান্বিতা ছিলেন। মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, অনগ্রসর ও পদানত প্রাচ্য জাতিগুলির উপর ইংলণ্ডের আলোকপ্রাপ্ত প্রভাব অবশ্যই কল্যাণ ও মঙ্গলের সূচনা করবে। সুতরাং বলা যায়, এই সময়ের নিবেদিতা, সেই নিবেদিতা, যে খনির অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি না কাটা হীরার মতো, আবিষ্কার ও মণিকারের শল্যের জন্য অপেক্ষমাণা।

অপরদিকে আমরা দেখতে পাই এক কপর্দকশূন্য, পরিচয়হীন পরিব্রাজক ভারতীয় সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল আবির্ভাব। এক জগৎ-আলোড়নকারী বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অগ্ন্যুৎপাত। বিশ্বধর্মমহাসভায় একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত ভাষণেই আমেরিকা মহাদেশ ছাপিয়ে সারা বিশ্বে এক নতুন সাড়া জাগানো মানুষের অভ্যুত্থান এবং শেষ পর্যন্ত আমেরিকা মহাদেশ থেকে ইউরোপ মহাদেশে তাঁর আগমন এবং ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের এক সন্ধ্যায় একটি ঘরোয়া বক্তৃতার আসরে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলের স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম দর্শন। বিবেকানন্দের মুখের সঙ্গে বুদ্ধদেবের মুখের সাদৃশ্য দেখেছিলেন তিনি। মনে হয়েছিল রাফায়েলের আঁকা ম্যাডোনার কোলে শায়িত শিশু যীশুর সঙ্গে মিলে যায় তাঁর চেহারা। স্বামীজীর তিরোধানের পরে, জোসেফিন ম্যাকলাউডকে যেন শিহরিত কলমে লিখেছিলেন তিনিঃ "মনে করো সে সময়ে যদি স্বামীজী লণ্ডনে না আসতেন! জীবনটাই নিরর্থক হয়ে যেত। কারণ আমি সর্বদাই জানতাম যে আমি একটা সম্ভাবনার প্রতীক্ষায় আছি।"

নিরর্থক জীবন যে অর্থময় হয়ে উঠবে, 'সম্ভাবনা' যে সত্যই সম্ভবপর হয়ে উঠবে এই ভাবটিই হল খনির হীরকের কান্না। কিন্তু বেশিদিন সেই আর্তি তাঁকে বেদনা দেয়নি। তাঁর 'কাটাই' শুরু হয়েছিল। মণিকারের কঠিন শল্যের আঘাতে মূর্ত হয়ে উঠছিল তাঁর এক একটি তল এবং এ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল সেই ১৮৯৫ থেকে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুলাই-এর মধ্যে। গুরু শিষ্যাকে দান করেছিলেন তাঁর সমস্ত শিক্ষা। তাই আচার্যের তিরোধানের পরেই দেখি নিবেদিতার পূর্ণ আবির্ভাব। এক দশকেরও কম ছিল সে উপস্থিতি। কিন্তু তাতেই তার ফলবানতার কোনও পরিমাপ হয়নি আজও। বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ 'ওর স্বাধীনতায় কেউ হাত দিও না।' কারণ তিনি বুঝেছিলেন নিজের স্বাধীনতার উপযুক্ত

সদ্ব্যবহার অবশ্যই করবেন নিবেদিতা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঃ 'নিবেদিতা এখানে গুরুগিরি করতে আসেনি—জীবন দিতে এসেছে।' এই ভবিষ্যদ্বাণী নিবেদিতা নিজের জীবনে মূর্ত করে তোলেন। প্রতিবেশী ও সাধারণের শ্রদ্ধেয় এই নিবেদিতাকে যদি আমরা বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মনীষীদের চোখে দেখি তাহলে বুঝতে পারব যে নিবেদিতা কিভাবে ১৯০২-র পর এক ভারতপ্রবাহিণী সহস্রধারা হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীমা বলেছিলেন ঃ 'নরেনের বিদেশিনী শিষ্যাদের মধ্যে নিবেদিতার মত এমন শুদ্ধ-ভক্তিময়ী নারী আমি খুব কম দেখেছি।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ "বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। তিনি যখন বলিতেন 'our people' তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনি তো লাগে না। এ যদি একটি মাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন ঃ "অর্ধাহারে আজীবন তিনি আমাদের দেশের জন্য তিলে তিলে প্রাণ দিয়েছিলেন।...ভারতের কল্যাণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।"

রাসবিহারী ঘোষ বলেছিলেন ঃ 'ভারতের জাতীয় পুনরুত্থানের ইতিহাসে নিবেদিতার নামটি চিরস্মরণীয়।'

দিলীপকুমার রায় বলেছিলেন ঃ 'এত বড় স্রষ্টা গুরুর এত বড় দ্রষ্টা শিষ্যা আর হয়েছে বলে জানি না।'

অধ্যাপক বিনয় সরকার বলেছিলেন ঃ ভারতীয় নরনারীর অতীত, বর্তমান বিশ্লেষণ করা আর ভবিষ্যৎ বাতলানো তাঁর পক্ষে মুড়ি-মুড়কি খাওয়ার মত সোজা কাজ ছিল।... তিনি যুবক ভারতকে স্বদেশ নিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁর গবেষণা শক্তি, সংস্কৃতি বিশ্লেষণের কায়দা ও জীবন সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টি আর ইংরেজী রচনাকৌশল এই কারণে বহুসংখ্যক যুবা নিবেদিতার কাছে প্রেরণা পেয়েছিল।

এইসব মনীষী ও বিশিষ্টজনের মন্তব্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ থেকে দূরে সরে গিয়েও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ব্যাপক কার্যধারা থেকে আলাদা হয়ে যাননি। তিনি ছিলেন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'।

এবার আবার ফিরে আসি সেই বিন্দুতে যেখানে একটি হীরকের তক্ষণের আয়োজন চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দের অনেক শিষ্য-শিষ্যা ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সকলের জন্য স্বামীজীর বিধান এক রকমের ছিল না। আপন আপন প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী তাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের নিজস্ব নিদান।

লণ্ডনে আসার পর স্বামীজী একদিন মার্গারেটকে বলেছিলেন ঃ "I have plans for the women of my own country, in which you, I think, could be a great help to me." এই ক্ষুদ্র বীজটি উপ্ত করে দিয়ে স্বামীজী আর কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। কিন্তু মার্গারেট এরই উপর নির্ভর করে তখনই মনে মনে এই কাজে আত্মনিবেদন করে দিয়েছিলেন। কারণ সেই সময়ে মার্গারেটের মনের অনেক প্রশ্ন, অনেক সংশয় স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার মধ্য দিয়ে কেটে যাচ্ছিল বলে তিনি আপনা থেকেই হাল্কা বোধ করতে শুরু করেছিলেন। প্রচলিত ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, চার্চ, অজ্ঞেয়বাদ, অলৌকিক বা

অতিমানবিক কার্যকলাপ—এই সবকিছুর থেকে কত আলাদা বিবেকানন্দের সত্যানুসন্ধানের পথ, বেদান্তের সংজ্ঞায় 'মানুষের পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি।' যখন তিনি বিশ্বাস থেকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হলেন, তখনই তিনি তাঁর দ্বীপবদ্ধ সমাজসেবার ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে সেবার মূল অর্থটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন। সেবার মধ্যে কাউকে কৃতার্থ করে দেবার ভাবও নেই, নেই পুণ্য সঞ্চয়েরও। কারণ স্বামীজীর মতে অন্যের ভাল করতে গিয়ে মানুষ নিজেই ভাল হয়ে যায়।

এইভাবে সময় স্রোতের মতো বহে গেলেও নিবেদিতা কিন্তু ভারতে আসার সংকল্প থেকে বিচ্যুত হলেন না। নানান বাস্তব সমস্যার কথা স্মরণে রেখে স্বামীজী প্রথমে তাঁকে বলেছিলেন যে, লণ্ডনে বসেও ভারতের জন্য কিছু করা সম্ভব। কিন্তু শেষপর্যন্ত নিবেদিতার ঐকান্তিকতা দেখে তাঁকে বলতেই হল যে, "ভারতের জন্য, বিশেষতঃ, ভারতের নারী সমাজের জন্য, পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রয়োজন বেশি। একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ...তোমার শিক্ষা ঐকান্তিকতা পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে।... তুমি নিশ্চয় জেনো, যে, আমি আমরণ তোমাকে সাহায্য করব। তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ করো, আর নাই করো। বেদান্ত ত্যাগ করো আর নাই করো। মরদ কী বাত, হাথী কা দাঁত। তা একবার বেরিয়ে গেলে আর ভিতরে প্রবিষ্ট হয় না।"

তবু আমরা দেখি মার্গারেট প্রথম যখন ভারতে আসেন তখনই, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী তাঁকে ভারত-সেবিকার ভূমিকা দেননি। দীক্ষা দিয়েছেন। নাম দিয়েছেন, ব্রহ্মচর্য দিয়েছেন। স্কুলেরও উদ্বোধন হয়েছে কিন্তু সেভাবে তাঁকে ভারত-সেবায় নিয়োজিত করেননি। কারণ বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন প্রকৃত কাজে নামবার আগে এই বিশাল বৈচিত্র্যময় মিশ্র-সংস্কৃতির দেশ সম্বন্ধে নিবেদিতার একটা সুস্পষ্ট ধারণা হোক। একটি ভাষা, একটি ধর্ম, দু-একটি রাজনৈতিক দল এবং একটিমাত্র সংস্কৃতির দ্বীপ থেকে নিবেদিতা এসেছেন ভারতবর্ষের মতো এক আপাতবৈচিত্র্যের দেশে—যেখানে তাঁর পক্ষে হারিয়ে যাওয়া খুব সহজেই সম্ভব। তাই স্বামীজী চেয়েছিলেন আগে তাঁর গড়ন-পেটন সম্পূর্ণ সহিষ্ণু হোক। কেবল মানস-প্রস্তুতিই সব নয়, বাস্তবের কঠোর পরিচয়টিই হল আসল কথা। মাতৃদেহের গর্ভকলসে সুরক্ষিত ভ্রূণটি দশ মাস দশদিন ধরে যতই জন্মের পাঠ নিক না কেন, তার আসল পরীক্ষা তো কেবল ভূমিষ্ঠ হলেই। তার গ্রহণক্ষমতা, সহ্যক্ষমতা শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার ক্ষমতা এসব তো তখনই দেখে নেওয়া হয়। সেইজন্যই স্বামীজী মনে করেছিলেন হয়তো, যে, আগে শহর কলকাতা নয়, হিমালয়কে উপলব্ধি করতে হবে। জানা দরকার গঙ্গা কেন ভারতের কাছে কেবল ভৌগোলিক অর্থে একটি নদী নয়, সংস্কৃতির প্রাণধারা। তাই নিবেদিতাকে নিয়ে গিয়েছিলেন হিমালয়ের তীর্থপথে। শিক্ষা দিয়েছিলেন তিতিক্ষার। জীবনযাপনের সহজতা এবং কঠোরতার। বিশ্লেষণ করেছিলেন ভারতীয় সামাজিক, ধার্মিক এবং লৌকিক রীতিনীতির অন্তর্নিহিত দর্শন ও ইতিহাস। লোককথা, কিংবদন্তী, মহাকাব্য এবং উপনিষদ পুরাণের নানান কাহিনীর মধ্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন ভারতের সংস্কৃতির নিত্যবহমান প্রাণধারাকে। দেখিয়েছিলেন ভারতের দরিদ্র, নিরক্ষর জনগণের মধ্যে, বিশেষত নারীদের মধ্যে কিভাবে ওতপ্রোত হয়ে আছে সহজাত বিনয়, দয়া ও করুণা। কোনও আলোকপ্রাপ্ত

শিক্ষিত নারীর কথা না ভেবে প্রথমেই আলাপ করাতে নিয়ে গেছেন জননী সারদার সঙ্গে। কেবল ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও শিল্পকলার আলোচনাই নয়, শিষ্যাকে তিনি শুনিয়েছিলেন তাঁর নিজের গুরুর কথা। গুরুর সঙ্গে সংগ্রামের কথা। রামকৃষ্ণ-সারদার দাম্পত্যজীবনের কথা, নিজের গুরুভ্রাতাদের কথা, আলমবাজার মঠের কথা, ভারতের মহীয়সী নারীদের কথা, প্রাচীন সন্ত ও বুদ্ধের কথা, ধর্ম ও বিবাহবিষয়ক তথ্যাবলী, শোষণ ও রাজনীতির কূটকচাল এবং নিজের ঐশী উপলব্ধির কথাও। বলেছেন মৃত্যু, পুনর্জন্ম ও মুক্তি এবং নির্বাণ বিষয়ে ধ্যানধারণার কথা, 'হিন্দুধর্মের স্বরূপ' এমনকি 'ভারতের ভবিষ্যৎ' এবং নিজের জীবনের 'উদ্দেশ্যের কথা।' বলেছেন এগ্রেসিভ হিন্দুইজম ও ডাইনামিক রিলিজিয়ানের কথা। এইভাবেই গুরু, শিষ্যার ঝুলি ভরিয়ে দিয়েছেন তাঁর অকৃপণ অফুরান কৃপা-কণিকায়। এই দানের প্রক্রিয়া চলেছিল ১৮৯৫ থেকে ১৯০২-এর সময়কাল জুড়ে যখন ২ জুলাই-এর শেষ সাক্ষাৎকারে গুরু শিষ্যাকে শিখিয়েছিলেন কি করে, মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে হয় ও সেজন্য মহাতপস্যা ও ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা চাই এবং সেইসঙ্গে শেষবার শিষ্যার আহারের পর মহামতি 'ঈশা'র মতই ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু একথা ভাবলে ভুল হবে যে এই গড়ে নেওয়ার কালটি ছিল এক প্রাথমিক সমঝোতার ভিত্তির উপর। কারণ নিজের অজান্তেই নিবেদিতা তাঁর বিদেশী সংস্কার বা মনোধর্মের জন্য অথবা কারও উপরে তাঁর ইচ্ছা বা ব্যক্তিত্ব চাপিয়ে দেবার জন্য, স্বামীজীর কঠোর সমালোচনা ও বিরক্তির কারণ হয়ে উঠতেন। নিবেদিতা হয়তো সীমিতাকারে প্রত্যাশা করতেন কিছু কোমলতার, কিছু অধিকারবোধের কিংবা বিশেষ কল্যাণদৃষ্টির। স্বদেশ ও স্বজন ছেড়ে এতদূরে চলে এসেছেন, স্বামীজীর কাজে, এটাই স্বামীজীর প্রতি নিষ্ঠার প্রমাণস্বরূপ বলে মনে করতেন তিনি এবং সেজন্য মনে হত স্বামীজী তাঁর প্রতি কিছুটা উদাসীন। কিছুটা সুদূর। এই ফাঁক ও ফারাকগুলি জুড়ে দেবার জন্য বিবেকানন্দ কোনও বিশেষ মনোনিবেশ দেখাননি। আবার এমনও হতে পারে স্বাধীন জীবন শুরু করার আগে সম্পূর্ণ তৈরি সন্তানকে, মা-পাখিই তো ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে বাসা থেকে ফেলে দেয় কিংবা কলম লাগানোর জন্য যখন এক গাছের ডাল কেটে অন্য গাছে লাগানো হয় তখন কাঁচা অবস্থায় সেই জোড়ের মুখে একটা রক্ত-ব্যথাতুর যন্ত্রণা কিছু দিন তো জেগে থাকেই। কিন্তু গুরু সর্বদাই এক পা এগিয়ে শিষ্যার জন্য ভাবেন। তিনি জানেন এসব যন্ত্রণার পরেই আছে নিরাময় স্বাধীনতা আর অনপেক্ষতার অমৃত আস্বাদ।

তাই এইসব অবুঝ সময়ে নিবেদিতার অযাচিত উপদেশ দেবার চেষ্টাকে স্বামীজী অনধিকার চর্চা বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পরে নিবেদিতা নিজেই বুঝেছিলেন স্বামীজীকে কোনও উপদেশ দিতে যাওয়া কতখানি নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। অন্য এক চিঠিতে স্বামীজী তাঁর নিজের স্থিতি এবং শিষ্যদের স্থিতির মধ্যে কারও ব্যবহারিক তারতম্য বোঝাতে গিয়ে নিবেদিতাকে যা লিখেছিলেন তার অন্তর্নিহিত কথা অত্যন্ত সরল এবং সিধে।

"বড় অসুবিধা এই যে আমি দেখিতে পাই অনেকে তাহাদের সবটুকু হৃদয় দিয়াই আমাকে ভালোবাসা অর্পণ করে। কিন্তু প্রতিদানে কাহাকেও আমার সবটুকু দেওয়া চলে না। কারণ তাহা হইলে একদিনেই সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে। অথচ নিজেকে গণ্ডীর বাহিরে দেখিতে অনভ্যস্ত এমন লোকও আছে যাহারা প্রতিদানই চায়। কর্মের সাফল্যের জন্য ইহা আবশ্যক যে, যতবেশি সম্ভব আমাকে মনে প্রাণে ভালোবাসুক; অথচ আমাকে

সম্পূর্ণভাবে সকল গণ্ডীর বাহিরে থাকিতে হইবে। নেতা যিনি তিনি থাকিবেন সকল গণ্ডীর বাহিরে। ...আমার বিশ্বাস তুমি একথা বুঝিতে পারিতেছ। আমি চাহি না যে তিনি পশুর ন্যায় অপরের শ্রদ্ধাকে নিজের কাজে লাগাইবেন আর মনে মনে হাসিবেন। আমি যাহা বলিতে চাই, তাহা আমার নিজের জীবনেই পরিস্ফুট। আমার ভালোবাসা একান্ত আমার আপনার জিনিষ। কিন্তু তেমনই আবার প্রয়োজন হইলে বুদ্ধদেব যেমন বলিতেন, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আমি নিজহস্তে আমার হৃদয়কে উৎপাটিত করিতে পারি। প্রেমে আমি উন্মাদ। কিন্তু তাহাতে তিলমাত্র বন্ধন নাই।" সম্পর্কের এই অকপট বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ সাম্য এসেছে। স্বামীজী যে স্নেহের অফুরান উৎস তা নিবেদিতা সাক্ষাৎ জেনেছেন এবং জোসেফিন ম্যাকলাউডকে তা জানিয়ে, জোসেফিনকেও সেই স্নেহধারার সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছেন। কারণ এই জোসেফিনই দেখেছিলেন কি অপরিসীম বেদনায় নিবেদিতা নিষ্পেষিত হচ্ছিলেন এবং স্বামীজীর অসন্তোষের কারণ হচ্ছিলেন। আলমোড়ায় সেই সময় জোসেফিনের কাছ থেকে নিবেদিতার ঐ অবুঝ বেদনার কথা শুনে স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'তোমার কথাই ঠিক, আমি অরণ্যে যাচ্ছি, নির্জনবাসে। যখন ফিরে আসব, শান্তি নিয়ে আসব।' আকাশের দ্বিতীয়ার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেনঃ 'মুসলমানেরা দ্বিতীয়ার চাঁদকে বিশেষ সমাদরের চোখে দেখে। এস, আমরাও এই নবীন চন্দ্রমার সঙ্গে নবজীবন লাভ করি।' কথাগুলি শেষ হবার পর তিনি হাত তুললেন। সে মুহূর্তে বিদ্রোহী নিবেদিতা তাঁর পদপ্রান্তে নতজানু হলেন। স্বামীজী মন-প্রাণ দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। আর তিনি মাথা পেতে সেই আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। উপলব্ধি করলেন গুরুর মাহাত্ম্য। সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের অবসানে এল মিলনের ক্ষণ। সেই রাত্রে ধ্যানে নিবেদিতা অনুভব করলেন তিনি অনন্ত সত্তায় মগ্ন হয়ে গেছেন। কিন্তু কেবল গুরুর সঙ্গে বোঝাপড়াই নয়, অমিলের দ্বন্দ্ব নয়, চিন্তার এক প্রধান বিন্দুতে মেলবন্ধনও ছিল। নিবেদিতার সঙ্গে বিবেকানন্দের এবং রামকৃষ্ণের এই মেলবন্ধনের বিন্দুটি হল 'সত্য'।

নিবেদিতার কথায় হঠাৎ কবিতার কথা এসে গেল এইজন্য যে এই বিশ্বের সকল নন্দন শিল্পের সারৎসারে নিউক্লিয়াসের মতো বিরাজ করছে একটি কবিতার বোধ। কথাটা একটু বিশদ করে ভাবা যাক। যখনই আমরা একটি গান শুনি, নাটক দেখি, নৃত্যানুষ্ঠান বা চিত্রপ্রদর্শনী দেখি, কোনও সার্থক চলচ্চিত্র বা উপন্যাস আমাদের মনে দাগ কাটে তখনই যা আমাদের মনে ঘা জাগায় তা কিন্তু একটি অলিখিত হলেও কবিতার বোধ। তখন শিল্পী যাই হোন না কেন তিনি কবি হয়ে যান। আমাদের হাত ধরে ক্রান্ত বা সীমানা পেরিয়ে নিয়ে যান আরও উদার লোকে। তাই আমাদের শাস্ত্রে কবিকে বলে ক্রান্তদর্শী। আমাদের শাস্ত্রে তাই যিনি কেবল চরণ মিলিয়ে কবিতা লিখতে পারেন তিনিই কেবল কবি নন। যিনি বলেছেন পথ কেমন? পথ কী? পথের শেষে কি ধ্রুব? কোন সত্য? তিনিই কবি। 'ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। কবি সেই পথ দেখেছেন, পেরিয়েছেন, তাঁর চরণ তাই রক্তমাখা। তারপর জেনেছেন সেই সত্যকে।

সেই সুদূর ইংলণ্ডে বসে নিবেদিতা তাঁর শৈশবে সেই পথখানিকে দর্শন করেছিলেন তাঁর জাগ্রত-ধ্যানে, লিখেছিলেনঃ "In my childhood, as it seems to me, I was pushing on eagerly along a path of truth." এই যে path of truth,

সত্যের পথ, এই বিন্দুতে এসে ঘটে যায় মার্গারেটের সঙ্গে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মৌল মেলবন্ধন। তাই বলা যায় চেনার আগেই পরিচয়, জানার আগেই বুঝে নেওয়া। নিজের জীবনে 'সত্যকে' যে কিভাবে গৌরব দিতেন শ্রীরামকৃষ্ণ তা আমাদের সবারই জানা। তিনি বলতেন 'কলিযুগে সত্যই তপস্যা'। বিবেকানন্দ বলতেন সত্যই ধর্ম, সত্যই চরিত্র। এই সত্যের পথখানি কিন্তু কঠোর এবং রসশূন্য মনে করেননি তাঁরা। বিবেকানন্দ ছিলেন অপরিসীম ভালবাসার উৎস। এই নিবন্ধের একটু আগেই আমরা দেখতে পাই তিনি লিখছেন 'প্রেমে আমি উন্মাদ'। এই প্রেম তিনি বিলিয়েছিলেন বন্ধনহীন ঔদার্যে। কারণ তিনি কথামৃতে তাঁর গুরুভাইকে বলেছেন ঃ 'পরমহংস মহাশয় আমাকে প্রেম দিয়েছিলেন।' অথচ মাত্র কয়েকটি বছরই তো বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ-সঙ্গ এবং নিবেদিতার গুরু-সঙ্গ। পাঁচ বছর অথবা ছ'বছর এই তো সেই পুণ্য পরমায়ু। অথচ প্রেমের কি অফুরান নিত্যবহমান প্রবাহ, যা নরেন্দ্রকে বিবেকানন্দে পরিণত করে দেয় কিংবা মার্গারেটকে নিবেদিতায়!

জীবনের প্রথম দিকে নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধির ইচ্ছা জানিয়েছিলেন গুরুর কাছে। রামকৃষ্ণ তখন তাঁকে স্বার্থপর বলে তিরস্কার করেছিলেন। বলেছিলেন তাঁর জন্য রাখা আছে কাজ। পরে গুরুর তিরোধানের পর ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে বিবেকানন্দ কন্যাকুমারিকায় ধ্যানে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর জন্য আদিষ্ট কর্মকে। বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর গুরুর কোন কাজের জন্য তিনি বলিপ্রদত্ত। গভীর অভিনিবেশ এবং মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবল ক্ষমতায় তিনি ধরতে পেরেছিলেন প্রত্যেক জাতিরই একটি নিজস্ব মেরুদণ্ড থাকে এবং ভারতের মেরুদণ্ড হল ধর্ম। শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাই ভারতের যে ধর্মের কথা তিনি বলেছিলেন তা কোনও সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়, এক মহত্তর ভালবাসা ও আত্তীকরণের ধর্ম। সুদূর আমেরিকায় ভোগবিলাসের মধ্যে বসে সাফল্যের তুঙ্গে অধিষ্ঠিত হয়েও তিনি এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যাননি সেই কপর্দকশূন্য পরিব্রাজক সত্তাকে এবং তাঁর জননী ভারতবর্ষকে। তাঁর নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে যে অকপট ভারতপ্রেম, তার কাছে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি খণ্ড ভালবাসা এক অতি ক্ষণস্থায়ী ঘটনামাত্র। বিবেকানন্দ মানেই যেন বিরাটত্ব। বিবেকানন্দের জীবন, রচনা এবং তাঁর কার্যাবলী থেকেই প্রতিভাত হয় তাঁর বিরাটত্ব। তাই দেখি তাঁকে মাপতে গিয়ে ছোট হয়ে যায় সব প্রচলিত মাপকাঠি। প্রত্যক্ষ করি কি সুগভীর ভালবাসায় ও দরদে তিনি দেশবাসীর দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করেছেন। এই অসহায় জনগণকে ফেলে রেখে নির্বিকল্প সমাধি? না তার চেয়ে 'যদি পাঁচশো বার জন্ম নিতে হয় তাও শ্রেয়'।

নিবেদিতা এই নিঃস্বার্থ প্রতিদানহীন ভালবাসার চিদ্‌ঘন মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই 'The Master as I saw Him' গ্রন্থে লিখেছিলেন ঃ "When I addressed him as master, I had recognised the heroic fibre of the man and desired to make myself the servant of his love, for his own people."— আমি যখন তাঁর অন্তর্নিহিত বীরত্বের সন্ধান পেলাম, এবং অনুধাবন করতে পারলাম যে তিনি তাঁর দেশের মানুষদের কতখানি ভালোবাসেন আমি তখন তাঁর সেই ভালবাসার 'চাকর' হলাম আর তাঁকে ডাকলাম 'প্রভু' বলে।

এখানে অনুবাদের সময় মীরার সেই বিখ্যাত ভজনটিকে স্মরণে রেখেছি যার প্রথম ছত্রটি হল, 'ম্যায়নে চাকর রাখো জী।' তাই 'servant' শব্দটির অনুবাদে 'চাকর' শব্দটি

প্রযুক্ত হয়েছে। এখানেই বোঝা যায় কেন তিনি স্বামীজীকে কেবল teacher বা গুরু বলেননি। Master বা 'প্রভু' আখ্যা দিয়েছেন। স্বামীজীর ভারতপ্রেম নিবেদিতাকে এত আলোড়িত করেছিল যে তিনি বুঝেছিলেন স্বামীজীর কাছে গুরু, ইষ্ট এবং স্বদেশ এক হয়ে গিয়েছে। একবার তিনি শুনেছিলেন জোসেফিন ম্যাকলাউড কখনও স্বামীজীকে বলেছিলেনঃ 'স্বামীজী আপনার জন্য কিছু করতে চাই।' তখন স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'ভারতবর্ষকে ভালবাস।' স্বামীজী দেশের মানুষের এই অবর্ণনীয় অবস্থা দেখে বলেছিলেনঃ 'আগামী পঞ্চাশ বছর স্বদেশই তোমাদের একমাত্র আরাধ্য হউন।' তাই গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ-পথ হিসেবে নিবেদিতা ভারতসেবাকেই বেছে নিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের অনন্ত স্নেহ ও প্রেমই তাঁকে চালনা করেছিল। কারণ বিবেকানন্দই বলেছিলেনঃ 'প্রেমে আমি উন্মাদ। কিন্তু তাহাতে তিলমাত্র বন্ধন নাই।'

স্বামীজীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন নিবেদিতা। সেই চিঠিতে তাঁর খাঁটি ভারতীয় অর্থে গুরু-ইষ্টে নিবেদনের নিঃশেষ স্বীকৃতিটি লক্ষ্য করি। "আগে ভাবতাম ভারতবর্ষে মেয়েদের জন্য কাজ করতে চাই। কিন্তু এখন যেসব কাজ করতে চাই তা কেবল 'পিতার' অভিপ্রায় বলে। ...আমি জানি গুরুকে চিন্তা করার তত প্রয়োজন আর নেই। বিশেষ ঈশ্বরসাক্ষাতের পর গুরু ইষ্টে লীন হয়ে যান।" এই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পত্রে দেখতে পাই নিবেদিতা ভারতীয় রীতিতে প্রথমে গুরুর ধ্যান করে তা কিভাবে ইষ্টে মিলিয়ে নিচ্ছেন এবং তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে পিতা এবং পিতার ভালবাসার ভারতবর্ষ। অর্থাৎ গুরু, ইষ্ট ও ভারতবর্ষ! তাই আমরা যখন শেষ পর্যন্ত পেয়ে যাই শেষের নিবেদিতাকে তখন তাঁর উপলব্ধিতে গুরু, ইষ্ট ও ভারতবর্ষ এক হয়ে গিয়েছে এবং তাঁর অঞ্চল-ভরা গুরুর রেখে যাওয়া মহীরুহ প্রসবিনী চিন্তার বীজে চলেছে অশ্রুসজল সিঞ্চন। বেরিয়ে এসেছে তাঁর পূর্ণবিকশিত অন্তরের সৌন্দর্য তাঁর লেখনী মুখে। যখন আমরা তাঁর সেই অজস্র লেখা, বক্তৃতামালা এবং অন্যান্য রচনার পাতা উল্টোই তখনই ধরতে পারি এসব লেখার বিষয়বস্তু, লক্ষ্য এমনকি 'শীর্ষক' কার দেওয়া। রচনার অক্ষরমালায় কার অক্ষয় অর্চনা। বিষয়বস্তুর বিশেষত্বে কার স্মরণ-মনন? রাজনীতিতে, স্বদেশভাবনায় বিজ্ঞান, ইতিহাস সমাজনীতির চর্চায় নারী জাগরণের ক্ষেত্রে কার অনুপ্রেরণা তাঁর মধ্যে! নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রভাতবন্দনায় কার পূজায় মিলে গেছে রামকৃষ্ণ-বন্দনার সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত?

তাঁর প্রবন্ধমালার মধ্যে আছে 'Aggressive Hinduism', 'Dynamic Religion', হিন্দুনারীর আদর্শ, নারীজাতির আদর্শ, ভারতীয় নারী, ভারতীয় সমস্যা, ধর্ম শিক্ষায় কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতি, ভারতে ইংরেজের ব্যর্থতা, রামকৃষ্ণ সংঘ, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে চিন্তার প্রয়োগ, এশিয়ার জীবন, আধুনিক বিজ্ঞানে হিন্দুমন, খ্রীস্টধর্ম, ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা, স্বামীজী ও শিক্ষা, এশিয়ার মহাপুরুষগণ, আধুনিক চিন্তায় হিন্দুধর্ম, প্রাচীন ও নূতন এশিয়ার ঐক্য, শক্তিপূজা ইত্যাদি। এইসঙ্গে আছে তাঁর অজস্র ভাষণ এবং চিঠিপত্র।

ভাবতে অবাক লাগে, মনে হয় সত্যিই কি বোস পাড়া লেনের এক নগণ্য বাসভবনে যৎসামান্য আহারগ্রহণ করে এই ব্রহ্মচারিণী সারাদিন স্কুল ও সারারাত্রি লেখার কাজ করে, অনুবাদের কাজ করে প্রেরণা দিয়ে পরামর্শ দিয়ে, দরকার হলে কাগজ চালিয়ে, প্লেগের সেবা করে, দুর্ভিক্ষের সময় রিলিফের কাজ করে, বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে, সাহিত্যসূর্যকে

অনুবাদে সহায়তা করে, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলোচনা ও প্রতিবাদ করে, শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করে, অনিচ্ছুক ছাত্রীর পিতার পায়ে পর্যন্ত ধরে গুরু কৃপায় একা সংগ্রাম করে গেছেন!! আবার জননী সারদা, গোপালের মা, গোলাপ মা, যোগীন মা ও মায়ের বাড়ির অন্য মহিলাদের যথার্থভাবে জেনেছিলেন যে নারী, এদেশের নারীদের সামনে ধরেছিলেন শিক্ষার আলোকবর্তিকা তিনি কি কল্পকাহিনী? না বাস্তবের সত্য?

না সত্যই। কারণ ভারতের ইতিহাসে এমন নারীর আবির্ভাব বার বার হয়েছে সুজাতা আম্রপালির মধ্য দিয়ে, ধাত্রী পান্না, পদ্মিনীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে, সীতা, সাবিত্রী, মদালসা আবার মীরাবাঈ, ঝাঁসীর রানী ও অহল্যাবাঈ-এর চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

সেইজন্যই কি নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদের বলতেন: জপ করো! জপ করো! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন: 'যতদিন তুমি সর্বান্তঃকরণে মায়ের সেবা করবে, ততদিন তিনিই তোমাকে ঠিক পথে পরিচালনা করবেন।'

আবার তাঁর ইংলণ্ড পরিত্যাগের প্রাক্সন্ধ্যায় ব্রিটানীতে বিদায় আশীর্বাদ জানাতে এসে তিনি স্পষ্টতই নিবেদিতাকে নিবেদন করলেন মহামায়ার কাজে। বললেন: "এক অদ্ভুত রকমের মুসলমান সম্প্রদায় আছে শোনা যায়, তারা এত গোঁড়া যে প্রত্যেক নবজাত শিশুকে ঘরের বাইরে ফেলে রেখে বলে—যদি আল্লা তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন তবে তোমার মৃত্যু হোক আর যদি আলি তোমায় সৃষ্টি করে থাকেন তবে তুমি দীর্ঘজীবী হও! আজ রাত্রে কথাটা একটু উল্টে দিয়ে আমি তোমাকে বলতে চাই,—যাও কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দাও! যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকি—বিনষ্ট হও। আর যদি মহামায়া তোমায় সৃষ্টি করে থাকেন, সার্থক হও।" নিবেদিতা মহামায়াকে অবশ্যই ইষ্ট করেছিলেন, কিন্তু গুরুর চরণ থেকেও কখনও নিজেকে স্খলিত করেননি।

জীবনের শেষের দিকে রচিত 'The Master As I saw Him', গ্রন্থটি তাই কেবল গুরু-শিষ্যা সংবাদের একটি দলিলই নয়, সহৃদয়হৃদয়-সংবাদী সমালোচকদের মতে একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলেও পরিগণিত হয়েছে। জীবনের শেষ লেখা পুস্তিকায় নিবেদিতা বুদ্ধবাণীর অনুবাদ দ্বারা বিশ্বমৈত্রীর বাণী বিতরণ করেছিলেন। আমাদের খেদ এই, যে, নিজেকে লেখিকা বলে পরিচয় দিলেও, নিজের সম্পূর্ণ লেখার উৎসটিকে উজাড় করে দেবার মতো সময় বের করে নিতে পারেননি নিবেদিতা। যদি পারতেন তাহলে আলাদীনের রত্ন-গুহার মতো তাঁর হৃদয়ের ভাবময় রত্নরাজি এবং রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ সৃজিত ভারতকন্যা নিবেদিতার অপূর্ব ভুবনের আরও পরিচয় পেতে পারতাম আমরা, জানতে পারতাম এক অনঘ-সম্পর্কের মাধুর্যের কথা। ভাবতে গৌরব জাগে যে, শিষ্যার জীবৎকালেই গুরু তাঁর নামে সুন্দর একটি আশীর্বাদ, একটি বন্দনা-গান রচনা করে গিয়েছিলেন। এমন দৃষ্টান্ত এবং ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই তুলনারহিত—

"The mother's heart, the hero's will,
The sweetness of the southern breeze,
The sacred charm and strength that dwell
On Aryan altars flaming free.

All these be yours and many more
No ancient soul could dream before—
Be thou to India's future son
The mistress, servant, friend in one."

শহীদ গুডউইন

প্রব্রাজিকা ধ্যানপ্রাণা

মহাপুরুষসঙ্গ নিঃসন্দেহে ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। 'নারদীয়ভক্তিসূত্রে' মহাপুরুষসঙ্গ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ'। 'লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব'। মহাপুরুষের সান্নিধ্যলাভ দুর্লভ, অগম্য এবং অব্যর্থ, তা ভগবৎকৃপায় লভ্য।

মহৎসঙ্গ কিভাবে অপরের জীবনে রূপান্তর ঘটায়, নিয়ে আসে আমূল পরিবর্তন, তার এক প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই জোসিয়া জন গুডউইনের জীবনে। বিবেকানন্দরূপ পরশমণির পূতস্পর্শে খাঁটি ইংরেজ, বস্তুবাদে বিশ্বাসী যুবক গুডউইন পরিণত হয়েছিলেন বৈদান্তিক সাধকে।

স্বামীজীর বেশির ভাগ বক্তৃতাই ছিল প্রস্তুতিবিহীন। কিন্তু তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই অমূল্য। বিদেশী ভক্তেরা অনুভব করলেন সেই অমূল্য ভাষণ লিখে রাখার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। তাই একজন সাঙ্কেতিক লিপিকার নিযুক্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হল। ১৮৯৫ সালের ১২ ডিসেম্বর, নিউ ইয়র্কের দুটি সংবাদপত্র 'The Herald' ও 'The World'-এ প্রকাশিত হল ঃ "Wanted—a rapid shorthand writer to take down lectures for several hours a week. Apply at 228 West 39th Street."[১]

গুডউইনের পূর্বে আরও দুজন সাঙ্কেতিক লিপিকার স্বামীজীর কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রথম জন স্বামীজীর ভাষণের স্বতঃস্ফূর্ত দ্রুতগতিকে সাঙ্কেতিক লিপিতে ধরে রাখতে বিফল হন। দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বামীজীর বক্তৃতার উচ্চভাবের মর্মার্থ অনুধাবনে অক্ষম ছিলেন। তাই প্রয়োজন হল উভয় গুণে পারদর্শী উপযুক্ত সাঙ্কেতিক লিপিকারের। এইসময় দৈবের অমোঘ নির্দেশেই স্বামীজীর 'গণেশ'—গুডউইনের আগমন।

গুডউইনের জন্ম ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। স্বামীজীর সান্নিধ্যে তিনি যখন এলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ। এর আগের এগারো বছর কেটেছিল ঐ সাংবাদিকতারই কাজে। পিতা জোসিয়া গুডউইন ছিলেন দক্ষ দ্রুতলিপিকার এবং পত্রিকা-সম্পাদক। পিতৃসূত্রেই গুডউইনের স্বাভাবিক নৈপুণ্য ছিল সম্পাদনা ও সাংবাদিকতায়। গুডউইন জাতিতে ইংরেজ, আদিনিবাস ছিল ফ্রোম গ্রামে। তাঁরা মার্কুইস অব বাথের প্রজা। অল্পবয়সেই জোসিয়া জন গুডউইন সাংবাদিকতার কাজ আরম্ভ করেন কিন্তু তেমন সাফল্যলাভ করতে না পারায় মানসিক অতৃপ্তি নিয়ে বাথ থেকে বেরিয়ে পড়েন অস্ট্রেলিয়ায় জীবিকার সন্ধানে।

তারপর ঘটনাক্রমে উপস্থিত হন আমেরিকায়। দ্রুতলিপিকারের জন্য কর্মপ্রার্থীর বিজ্ঞাপন চোখে পড়তেই তিনি হাজির হলেন নিউ ইয়র্কের ২২৮ ওয়েস্ট, ৩৯তম স্ট্রীটে।

সেযুগে নিউ ইয়র্কে একজন সাঙ্কেতিক লিপিকারের বেতনের হার ছিল ১৫ থেকে ১৮ ডলার। এত টাকা খরচ করা ঐ সময়ে বেদান্ত কমিটির সভ্যদের সাধ্যাতীত। দ্রুতলিপিকার্যে সুদক্ষ ও বিচক্ষণ গুডউইন স্বল্প পারিশ্রমিকেই ঐ কার্যে নিযুক্ত হলেন। এর আগে আদালতের রিপোর্ট লেখা ও তিনখানি পত্রিকার সম্পাদনার কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন ঠিকই কিন্তু ব্যক্তিগতজীবনে যেন স্বাধীন উদ্দাম প্রবাহে ভেসে চলেছিলেন—যার পরিণামে তাঁর জীবনই ব্যর্থ হতে যাচ্ছিল। সেই চরম সঙ্কটমুহূর্তে স্বামীজীর দিব্য সান্নিধ্য ঘটল, মহত্তম এক মানববিগ্রহকে সেবা ও আত্মনিবেদনে জয় করে তাঁর গুডউইন নাম সার্থক করলেন ইংরেজ যুবক। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে শহীদের বেদী রচনা হল তাঁরই সমর্পণে—গুডউইন এক উজ্জ্বল ও মৃত্যুহীন প্রেরণা।

স্বামীজীর অহৈতুকী ভালবাসার বন্ধনে পড়েছিলেন গুডউইন। কথাপ্রসঙ্গে নিজেই বলেছেনঃ "অনেক জায়গায় ঘুরলুম, অনেক লোকের সঙ্গে মিশলুম—সকলেই কাজ করিয়ে নেয়, দামটা দেয় কিন্তু ভালবাসা কেউ দেয় না। অবশেষে আমেরিকায় স্বামীজীর কাছে জুটলুম। এখানেই প্রাণ থেকে একটা ভালবাসা দেখতে পেলুম। তাই রোজগারপাতি হোক না হোক, আটকে তো পড়ে আছি। জগৎ জুড়ে অনেক লোকের সঙ্গে, অনেক নামজাদা লোকের কাছে গিয়েছি, কিন্তু স্বামীজীর মত এমন একটা উচ্চতর লোক পাইনি। আপনার বলে টেনে নিতে এমন আর দুটি দেখি না।"[২]

প্রথম সাক্ষাৎকারেই স্বামীজী গুডউইনের অতীত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অনেক ঘটনাবলী বলে দিয়েছিলেন। এই ঘটনায় হতবুদ্ধি, বিস্মিত গুডউইন স্বামীজীর চরণে আত্মনিবেদন করেন। স্বামীজীর সান্নিধ্যে কয়েক সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হতেই গুডউইনের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন এল। পারিশ্রমিক হিসাবে অর্থগ্রহণ করতে তিনি অস্বীকৃত হলেন। সোজাসুজি বললেনঃ "If Vivekananda gives his life, the least I can do is to give my service."

কিন্তু গুডউইন দরিদ্র। বাড়িতে বিধবা মা ও অবিবাহিতা দুই বোন। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের কথা ভেবে সামান্য অর্থগ্রহণে সম্মত হলেন। মিসেস ওলি বুলকে এই প্রসঙ্গে একটি পত্রে লেখেনঃ "If I am to work for the Vedanta—and my wishes are all that way, I think I may say my heart is thoroughly in the work—I am afraid I shall have to accept bare living, but beyond that I would not consent to any arrangement."[৩]

বিবেকানন্দের মধ্যে গুডউইন দর্শন করেছিলেন তাঁর আরাধ্যদেবতা যীশুখ্রীস্টকে। ১৮৯৬, ৭ অক্টোবর, একটি পত্রে মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লেখেনঃ "Shall I shock you very much if I tell you that the Swami takes the place of Christ to me ? I think not, for you will understand what I mean."[৪] স্বামীজীই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-জীবনসর্বস্ব হয়ে উঠেছিলেন।

সাঙ্কেতিক লিপিকার হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার প্রায় দু মাসের মধ্যেই গুডউইন নিজের

সহজ-সরল ব্যবহার, বিচক্ষণতা, আনুগত্য ও সেবাপরায়ণতায় স্বামীজীর অন্তরঙ্গ, বিশ্বস্ত শিষ্যে পরিণত হন। ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিউ ইয়র্কে স্বামীজী কৃপা করে তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

ঐ বছরেই ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথিতে 'My Master' (মদীয় আচার্যদেব) নামে মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন। নিউ ইয়র্কে তখনকার মতো বক্তৃতাপ্রদান সমাপনান্তে ১৮৯৬, ৩ মার্চ, মঙ্গলবার, স্বামীজী ডেট্রয়েটে আসেন, সঙ্গে বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ শিষ্য গুডউইন। কৃস্টিন ও শ্রীযুক্তা ফাঙ্কি রিশিলিউ হোটেলে তাঁদের থাকবার ও স্বামীজীর ক্লাস নেবার সুব্যবস্থা করেছিলেন।

ডেট্রয়েটে স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল দু'সপ্তাহ থাকবেন, অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুদের জন্য দিনে দুটি করে ক্লাস নেবেন কিন্তু কৃপানন্দের (মিঃ ল্যাণ্ডসবার্গ) উদ্যোগে প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে স্বামীজীর ডেট্রয়েটে আগমনবার্তা প্রকাশিত হওয়ায় তখন সেখানে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়—বলা যায় সেটি বিবেকানন্দবিরোধী খ্রীস্টান মিশনারি ও বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের মধ্যে সংবাদপত্রকে মাধ্যম করে আসন্ন বিরোধের সূত্রপাত। ফলে স্বামীজী ডেট্রয়েটে যে ক্লাসগুলো অন্তরঙ্গ অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুদের নিয়ে করবেন স্থির করেছিলেন, বাস্তবে তা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। নিছক কৌতূহলী মানুষের ভিড়েই হলঘর পূর্ণ হতে লাগল। মিসেস ওলি বুলকে লেখা গুডউইনের একটি পত্রে তখনকার অপ্রীতিকর অবস্থার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছেঃ

"At the first, indeed, only one of his friends was present and the room was filled with strangers. It has been decided to overcome the difficulty, to give three public classes & to confine the remainder to his friends. The unfortunate part of the matter was that the Swami himself was very much upset at this miscarriage of intentions, but the rearrangement has put him more at ease."[৫]

কৃপানন্দ ক্রমে স্বামীজীর কাছ থেকে যেন সরে আসছেন তা অনুভব করতে লাগলেন। স্বামীজীর সান্নিধ্যে গুডউইনের আগমন এবং নিত্য কর্মদক্ষতার গুণে স্বামীজীর অশেষ আস্থা অর্জন—ক্রমশই কৃপানন্দকে ঈর্ষান্বিত করে তুলল। ডেট্রয়েটে কৃপানন্দের সৃষ্ট ঐ অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সম্বন্ধে গুডউইন মিসেস বুলকে লেখেনঃ "I am avoiding all unpleasantness with Kripananda, although I did once lose my temper and accuse him of self-advertisement."[৬]

ডেট্রয়েটে শেষ পর্যন্ত স্বামীজী দু-ভাগে ক্লাস নিতেন। প্রথমটি অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং দ্বিতীয়টি ছিল সর্বসাধারণের জন্য। সেখানে স্বামীজীর একদিনের সভাকে স্মরণ করে গুডউইন তাঁকে বলেনঃ "ড্রেটয়েটে আমাদের যা সভা হয়েছিল, সে সব্বার চেয়ে বড়, প্রায় ছয় হাজার লোকসমাগম হয়েছিল। সেদিন আপনার (স্বামীজীর প্রতি লক্ষ্য করে) অমানুষিক শক্তিতে কথা বেরিয়েছিল। আমি সেদিন আনন্দে পাগল

হয়ে গিয়েছিলুম।"[৭] স্বামীজীর কাজে নিবেদিতপ্রাণ গুডউইনের একমাত্র অবলম্বন তখন তাঁর গুরু। তাঁর আনন্দেই যেন গুডউইনের আনন্দ!

ডেট্রয়েট ত্যাগ করে গুডউইন স্বামীজীর সঙ্গে ট্রেনে বস্টনে উপস্থিত হলেন। বস্টনে মিসেস ওলি বুলের আতিথ্য গ্রহণ করেন স্বামীজী। সেখানে তিনি পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে বেশ আনন্দে দিন কাটান। বস্টন থেকে ড্রেটয়েটে শ্রীমতী ফাঙ্কিকে স্বামীজী লেখেনঃ "বস্টনে অত্যন্ত আনন্দে আছি। সবকিছু ভালভাবে চলেছে। মিঃ গুডউইন চিরউত্তম। আমরা এখানে সবাই বন্ধু।"[৮] স্বামীজীর উক্তিতে বোঝা যায় যে বস্টনে তাদের কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। প্রফেসর জন রাইট, যিনি স্বামীজীকে শিকাগো ধর্ম মহাসভায় উপস্থিত হতে সাহায্য করেন, তাঁর সঙ্গে বস্টনে পুনরায় মিলিত হয়ে স্বামীজী বিশেষ আনন্দিত হন। প্রফেসর রাইট ১৮৯৬-এর মার্চে তাঁর স্ত্রীকে একটি পত্র লেখেন—"বক্তৃতাদানে স্বামীজী অত্যন্ত সাফল্য অর্জন করেছেন। একটি যুবক সাঙ্কেতিক লিপিকার (গুডউইন) স্বামীজীর ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বস্তুবাদী থেকে বৈদান্তিকে পরিণত হয়েছে। সে দেশ-দেশান্তরে স্বামীজীকে অনুসরণ করে চলেছে।"[৯]

বস্টনে কদিন কাটিয়ে স্বামীজী ৩০ মার্চ, শিকাগো যাত্রা করেন। গুডউইন আরো দশ দিন মিসেস বুলের কাছে বস্টনে থেকে যান। তখনই মিসেস বুলের সঙ্গে গুডউইনের বন্ধুত্ব গভীরতা লাভ করে ও তা আমৃত্যু স্থায়ী হয়। মিসেস বুলকে লেখা গুডউইনের বিভিন্ন পত্র থেকে আমরা তৎকালীন পাশ্চাত্যে বেদান্ত আন্দোলনের বিভিন্ন সংবাদ পাই।

স্বামীজীর দিব্যসঙ্গ ও প্রেমে বাঁধা পড়েছিলেন গুডউইন ঠিকই, স্বামীজীর আনুগত্য স্বীকারও করেন কিন্তু মাঝে মাঝে স্বামীজীর প্রতি আচরণে তাঁর কর্তৃত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যেত। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক ছিল যে গুডউইন ১০ এপ্রিল বস্টন থেকে রওনা হয়ে নিউ ইয়র্কে স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হবেন। কিন্তু নিউ ইয়র্কে পৌঁছে গুডউইন দেখেন স্বামীজী তখনও শিকাগোতেই রয়েছেন। নিউ ইয়র্কে নানা কাজ পড়ে থাকা সত্ত্বেও স্বামীজীর শিকাগোতে অবস্থান গুডউইন মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না। অবিলম্বে তার পাঠালেন শিকাগোতেঃ "PLEASE SEND SWAMIJI TODAY LATEST—ENGAGEMENTS MADE"[১০]

ক্রমে গুডউইনের ইংরেজসুলভ কর্তৃত্ববোধকে অতিক্রম করতে লাগল স্বামীজীর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। তাই উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এমন এক সুদৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হল যা খুবই দুর্লভ। ১৮৯৬, ১৫ এপ্রিল স্বামীজী ও গুডউইন নিউ ইয়র্ক থেকে ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মাঝপথে গুডউইন বাথেস্টোনে মার সঙ্গে দেখা করতে চলে যান। স্বামীজী কাভেরশামে (caver-sham) মিঃ ই. টি স্টার্ডির বাড়িতে ওঠেন। এপ্রিল মাস থেকে সেখানে স্বামী সারদানন্দও অবস্থান করছিলেন, কয়েকদিন পরে গুডউইনও সেখানে আসেন। মে মাসে মিঃ স্টার্ডির ব্যবস্থানুসারে লেডি মার্গেসনের (Lady Margesson) একটি প্রশস্ত বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। স্বামীজী, স্বামী সারদানন্দ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, মিস হেনরিয়েটা মূলার, জন ফক্স এবং গুডউইন লেডি মার্গেসনের সেই বাড়িতে (৬৩ নং সেন্ট জর্জ রোড) বাস করতে লাগলেন। স্টাডি ও তাঁর স্ত্রী অন্যত্র থাকতেন। তবে স্টার্ডির বেশির ভাগ সময়ই কাটত এই বাড়িতে। বাড়িটির পাঁচতলায়

একটা লম্বা টানা ঘর ছিল। ছাদটা দুদিকে গড়ানো, ঘরটির মাঝখানে দাঁড়ালে ছাদ মাথায় ঠেকে না, তবে ধারে দাঁড়ালে মাথায় ঠেকে। একে বলা হত গ্যারেট (Garret), ঐ গ্যারেটে থাকতেন গুডউইন কিন্তু তার জন্য তাঁর মনে কোনও ক্ষোভ ছিল না। সারাদিন স্বামীজীর দিব্যসান্নিধ্য তাঁর মনকে এক উঁচু সুরে বেঁধে রাখত। স্বামীজীর সুখ-সুবিধা অন্বেষণেই তিনি সদা-সচেতন। তাছাড়া ঐ ঘরে রাতটুকু ছাড়া থাকবার তাঁর সময়ই বা কোথায়? দিনের বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হত স্বামীজীর ভাষণের সাঙ্কেতিক লিপিগ্রহণ ও তা টাইপ করার কাজে।

স্বামীজীর স্নেহচ্ছায়ায় আগমনের আগে গুডউইন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতকে সাময়িকভাবে বিস্মরণের জন্য জুয়া খেলা ইত্যাদির আশ্রয় নেন। নিজের পূর্বজীবনের প্রসঙ্গে গুডউইন স্বামী সারদানন্দ ও মহেন্দ্রনাথ দত্তকে একদিন বলেনঃ "আমি অনেক দেশ ঘুরেছি।... একবার অস্ট্রেলিয়া হতে জাহাজে করে আসছি। জাহাজে কোন কাজকর্ম নেই। দিনই বা কাটাই কি করে, রাতই বা কাটাই কি করে। কি আর করি, নাচতে শুরু করলুম, অর্ধেক রাত এই করে কাটালুম। দিনের বেলা তাস খেলে বাজি ধরে অনেক টাকা হেরে গেলুম।"[১১]

স্বামীজী জানতেন গুডউইনের জুয়ার নেশার কথা। তাই তিনি রসিকতা করে গুডউইনকে বলতেন: "ভুল করে তোমার নাম রেখেছিল গুডউইন, তোমার নাম হচ্ছে ব্যাড-উইন।" গুডউইন অমনি মাথা নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে বলতেনঃ "I am not Bad-win, but I am Good-win, Good-win."[১২]

স্বামীজীকে খুব অন্তরঙ্গভাবে দেখার সুযোগ হয়েছিল গুডউইনের। তাঁর কাছে স্বামীজী শুধু ঈশ্বর বা গুরুই ছিলেন না, একাধারে ছিলেন—'Friend, Philosopher and Guide'

গুডউইনের সরল স্বভাব স্বামীজীকে আনন্দ দিত। তাই মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে হাস্যপরিহাস করতেন। একবার দু'সপ্তাহ যাবৎ গুডউইন গোঁফ কামানোর সময় পাননি। একটু-একটু গোঁফ হয়েছে। সেই গোঁফে হাত বোলাতে বোলাতে গুডউইন বললেনঃ 'চিত্রকররা আমার গোঁফজোড়াকে মডেল বা আদর্শ করার জন্য দশ পাউণ্ড আমাকে দেবে।' স্বামীজীর সপ্রতিভ কৌতুকপূর্ণ উত্তরঃ 'হ্যাঁ, একজোড়া ঝাঁটার বেশ নমুনা হতে পারে।'[১৩] উপস্থিত সবাই হাসতে লাগলেন, গুডউইন অপ্রস্তুত।

আরেক দিনের ঘটনা—মিঃ স্টার্ডি কথাপ্রসঙ্গে বলেনঃ 'একটি লোক যদি ছোট ছেলেকে মারে আমার ভারি রাগ হয়।' শুনে গুডউইন বিশেষ কিছু চিন্তা না করেই হঠাৎ বলে উঠলেনঃ 'হ্যাঁ, মিঃ স্টার্ডি, যখন কোন মানুষ গাধাকে মারে, তখন আমি ভয়ানক রেগে যাই।' গুডউইনের বক্তব্য শুনে ব্যঙ্গচ্ছলে স্বামীজী স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, গাধাকে মারলে তোমার স্বজাতীয় প্রীতি উথলে ওঠে, তাই তোমার এত রাগ হয়।"[১৪] গুডউইন অপ্রতিভ।

স্বামীজী সব কাজে তাঁর এই শিষ্যের ওপর খুবই নির্ভর করতেন। প্রায়ই তিনি সস্নেহে মন্তব্য করতেন, 'My faithful Goodwin.' স্বামীজীর কোনও সুখ্যাতি বা সাফল্যে গুডউইন সাধারণত আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতেন কিন্তু এর ব্যতিক্রমও ছিল।

স্বামীজী মনের আনন্দে গুন-গুন করে বাংলা গান গাইতে থাকলে গুডউইনের পক্ষে সেই গানের মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না—তাই তাঁর পছন্দও হত না। কিন্তু স্বামী সারদানন্দের কাছে তিনি যেদিন শুনলেন যে স্বামীজী একজন বিশিষ্ট গায়ক এবং গায়ক হিসেবে কলকাতায় তাঁর বিশেষ খ্যাতি আছে, সেদিন আশ্চর্যান্বিত গুডউইন আনন্দে হাততালি দিতে দিতে বারবার বলতে লাগলেন ঃ "তা তো আমি জানিতাম না। স্বামীজী যে একজন বড় গায়ক, এই কথা এখন শুনিলাম। স্বামীজী খুব বড় দার্শনিক, খুব ভাল বাগ্মী, কিন্তু তিনি যে বড় গায়ক এই কথা আমি আদৌ জানিতাম না।"[১৫]

ভেবেচিন্তে বা আগের থেকে প্রস্তুত হয়ে বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস স্বামীজীর ছিল না। তাই বক্তৃতার আরম্ভে সেদিনকার বক্তৃতার বিষয় কানে-কানে বলে দিয়ে তাঁকে স্মরণ ও সচেতন করে দিতেন গুডউইন। কখনও স্বামীজী সাগ্রহে জানতে চাইতেন কি কথা সেদিন তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। শুনে গুডউইনকে বলতেন, "এসব লিখে রেখে দাও। আমার বেশ লাগছে।"[১৬] মহাপুরুষদের আচরণ সাধারণ মানুষের অবোধ্য। ধন্য স্বামীজী! ধন্য তাঁর আজ্ঞাবাহক শিষ্য গুডউইন!

গুডউইনের রাজভক্তি ছিল অসীম। সপ্তম এডওয়ার্ড তখন যুবরাজ। ডার্বি রেস খেলায় তাঁর 'পার্সিমন' নামক ঘোড়া জিতেছে। তাই ইংলণ্ডে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। গুডউইনও খুবই উত্তেজিত। তাঁর উত্তেজনা লক্ষ্য করে ব্যঙ্গচ্ছলে স্বামীজী মুখভঙ্গি করে 'পার্সিমন' কথাটি উচ্চারণ করতে যাচ্ছেন এমন সময়ে গুডউইন স্বামীজীর কাছে নতজানু হয়ে বসে যুক্তকরে বললেন ঃ "স্বামীজী, গুডউইন আপনার শিষ্য, আপনার ভৃত্য। কিন্তু রাজপরিবারের ওপর কিছু বলবেন না। এদেশে এটা বড় দূষণীয় মনে করে। আপনি আমার ওপর কৃপা করুন।"[১৭] রাজভক্ত গুডউইনের আর্তিতে স্বামীজী স্তম্ভিত। যে গুডউইন একজন পাকা 'র‍্যাডিকাল স্কুলে'র লোক, তাঁর রাজপরিবারের ওপর একি অচলা ভক্তি!

স্বামীজীর সঙ্গে প্রায়ই ইতিহাস, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে গুডউইনের আলোচনা হত। গুডউইন ইংরেজ। প্রবল ছিল তাঁব জাত্যাভিমান। স্বামীজীর প্রতি অপার ভক্তি সত্ত্বেও নিজের জাত্যভিমান বিসর্জন দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। একদিন স্বামীজীর মুখে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের কঠোর সমালোচনা এবং হিন্দুর বীরত্বের প্রশংসা শুনে গুডউইন সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানিয়ে বার বার বলতে লাগলেন ঃ "No Swami, your men do not know how to fight. We, the people are the best fighters. No Swami, you are a great man, no doubt, but your men do not know how to govern themselves. We, the British people are the men to govern India."[১৮] স্বামীজী সেদিন ভারতের মানুষের বীরত্বের কাহিনী বলে তাঁর কথার প্রতিবাদ করেছিলেন।

গুডউইনের আর্থিক অবস্থা কোনদিনই ভাল ছিল না, খেটে খাওয়া মানুষ তিনি। লক্ষ্য করলেন, মিঃ স্টার্ডি ও মিস মূলার তাঁর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাছাড়া স্বামীজী যে তাঁর সব কাজে গুডউইনের ওপর নির্ভর করতেন তাও মিস মূলার মন থেকে মেনে নিতে পারতেন না। একদিন সুযোগ পেয়ে গুডউইন স্বামীজীকে সব খুলে বললেন। উপযুক্ত কাজ তাঁর পক্ষে লণ্ডনে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে

না, তাই আমেরিকায় চলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গুডউইনের অনুপস্থিতিতে স্বামীজীর কাজে খুবই অসুবিধা হবে এই ভেবে স্বামীজীও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। স্বামীজীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে গুডউইন অপর এক প্রস্তাব দিলঃ "কেন স্বামী, আপনি এত চিন্তিত হয়েছেন? আমি না হয় বাইরে দু'তিন ঘন্টা কাজ করে নিজের খরচ চালিয়ে নেব। পাশের একটা বাড়িতে ঘরের বন্দোবস্ত করব। সেখানেই থাকা ও খাওয়ার ঠিক করব। আপনার লেকচারের সময় ও অবসর মতো এসে আপনার সব কাজ করে দিয়ে যাব। এখানে থাকা আর সুবিধে হচ্ছে না। আমার এখানে থাকা এদেরও পছন্দ নয়। ওদের মনের ভাব অন্যত্র চলে যাই।"[১৯] স্বামীজী সব শুনে চুপ করে রইলেন। এরপর একদিন সকালে গুডউইনকে ডেকে বললেন, স্বামী সারদানন্দ আমেরিকা যাচ্ছে। গুডউইন যেন তাঁর সঙ্গে যান। তাহলে স্বামী সারদানন্দেরও সুবিধা হবে।

বেদান্তপ্রচারের জন্য স্বামী সারদানন্দ গুডউইনের সঙ্গে ১৮৯৬, ২৭ জুলাই, আমেবিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হলেন ২ আগস্ট। আমেরিকায় থাকাকালীন পত্রের মাধ্যমে স্বামীজীর সঙ্গে গুডউইনের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ছিল। সুইজারল্যাণ্ড থেকে গুডউইনকে লেখা স্বামীজীর ৮ আগস্টের পত্রখানি অতুলনীয়। কৃপানন্দের অপ্রীতিকর আচরণ যা আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারের সাবলীল প্রবাহকে ব্যাহত করেছিল, সে সম্বন্ধে স্বামীজী অবহিত ছিলেন। ঐরূপ প্রতিকূল পরিবেশকে মানিয়ে চলার পথ নির্দেশনা রয়েছে বৈদান্তিক স্বামীজীর পত্রে। গুডউইনকে লিখছেনঃ "বিভিন্ন চিঠিতে কৃপানন্দের সম্বন্ধে অনেক কথা পড়েছি। আমি তার জন্য দুঃখিত।...তার ভাবে তাকে চলতে দাও, তার জন্য তোমাদের কারও উদ্বেগ অনাবশ্যক।...অটল ভালবাসা ও একান্ত নিঃস্বার্থভাবই সর্বত্র জয়লাভ করে। প্রত্যেক প্রতিকূল অবস্থায় বেদান্তীর উচিত নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করা, 'আমি এরূপ দেখি কেন? আমি কেন ভালবাসা দিয়ে এর প্রতিকার করতে পারি না'।"[২০]

লণ্ডনে গুডউইনের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড ৩ অক্টোবর, ১৮৯৬ শনিবার মিসেস ওলি বুলকে একটি পত্রে লেখেনঃ "I have been urging Mr. Goodwin to join the Swami in London at once that no word be lost of our great prophet... Mr. Goodwin seems to be peculiarly adapted to this work."[২১]

৭ অক্টোবর গুডউইন আমেরিকা ত্যাগ করলেন। এটিই তাঁর আমেরিকা থেকে শেষ বিদায়গ্রহণ। সোজা লণ্ডনে না এসে মাতৃভক্ত গুডউইন জননীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাথেস্টোনে যান এবং অক্টোবরের ২০ তারিখ নাগাদ লণ্ডনে পৌছান। ততদিনে স্বামীজী মার্গেসনের বাড়িটি ছেড়ে দিয়ে মিঃ স্টার্ডির সহযোগিতায় আরেকটি পাঁচতলার ফ্ল্যাটে ক্লাস নিতে শুরু করেছেন। ঐ ফ্ল্যাটেরই কাছাকাছি আরেকটি বাড়ি ভাড়া করে স্বামীজী ও স্বামী অভেদানন্দ রয়েছেন। গুডউইনও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মিসেস বুলকে লেখা ২১ অক্টোবরের পত্রে গুডউইন লিখেছেনঃ "The two Swamis are in a flat..., alone with myself as house-keeper, cook, ..."[২২]

গুডউইনের তখন প্রবল ব্যস্ততার মধ্যেই দিন কাটছে। তারই মধ্যে সময় করে

স্বামী অভেদানন্দকে লণ্ডনের দ্রষ্টব্য স্থান দেখানো, সংস্কৃতচর্চা ইত্যাদি চলতে থাকে। দুই সন্ন্যাসীর পূত সান্নিধ্যলাভে দার্শনিক নানা উচ্চ-চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গুডউইনও আনন্দিত। অবশ্য স্বামীজী ও স্বামী অভেদানন্দ যখন বাংলায় শাস্ত্রচর্চা করতেন তখন গুডউইন পড়তেন মুশকিলে। ১ নভেম্বর মিসেস বুলকে একটি পত্রে গুডউইন লেখেন: "I am writing this while the two Swamis are having a big discussion in Bengalee—12 midnight—which has already lasted over two hours on a sentence in the Brihadaranyaka Upanishad".[২৩]

স্বামী অভেদানন্দকে লণ্ডনে বেদান্ত প্রচারকার্যে নিযুক্ত রেখে স্বামীজী সেভিয়ার দম্পতিকে নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৬ ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং ২১ ডিসেম্বরের পর গুডউইনও লণ্ডন থেকে একাই ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। শেষবারের মতো জননীর সঙ্গে দেখা করে যাবেন—তাই গেলেন বাথেস্টোনে। সেখান থেকে নেপল্‌সে মিলিত হলেন স্বামীজীর সঙ্গে।

পথে এডেন বন্দরে জাহাজ এসে থামলে স্বামীজীরা নৌকাযোগে এডেন দেখতে যান। সেখানে অনেক ভারতীয়দের বাস। স্বামীজী দেখলেন, অনেকে কল্কেতে তামাক খাচ্ছে। স্বামীজীর তামাক-প্রীতি অসাধারণ, তিনি এক দোকানদারের কাছ থেকে কল্কে চেয়ে তামাক খেতে লাগলেন। ঐভাবে সাধারণের সঙ্গে মিশে তাঁকে তামাক খেতে দেখে ইংরেজ যুবক গুডউইনের আত্মসম্মানে বাধল, মুখে বিরক্তি ও অবজ্ঞার ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করে স্বামীজী গম্ভীরভাবে বললেন: "এই গরীব, দুঃখী লোকেরাই আমার জাতভাই। আমি যখন রম্‌তা সাধু-ভাবে ঘুরতাম তখন এই গরীব দুঃখীরাই আমার জীবনরক্ষা করেছিল। সহস্ররূপে এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তুমি যদি এদের ঘৃণা কর ও অবজ্ঞার চোখে দেখ, তাহলে আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আমার গরীব জাতভাইকে যে ঘৃণা করে তাকে আমি পছন্দ করি না। তোমরা জাহাজে করে নিজের দেশে চলে যাও। আমি একা ভারতবর্ষে যাব। আমি গরীব, গরীবদের সঙ্গে থাকব।"[২৪] স্বামীজীর মর্মস্পর্শী ঐ কথায় সেভিয়ার দম্পতি ও গুডউইন সহজেই অনুধাবন করলেন স্বামীজীর স্বদেশপ্রীতি কতখানি গভীর ও আন্তরিক।

১৮৯৭, ১৫ জানুয়ারি স্বামীজীর জাহাজ কলম্বোতে পৌঁছল। তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন স্বদেশবাসী। পাম্বান, রামেশ্বরম, রামনাদ হয়ে সদলবলে স্বামীজী মাদ্রাজ পৌঁছলেন। মাদ্রাজে নয় দিন অবস্থানের পর স্টিমারযোগে ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা। কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাড়িতে ক'দিন অবস্থানের পর স্বামীজী গুডউইনকে নিয়ে আলমবাজার মঠে এলেন।

আলমবাজার মঠে গুডউইন দেখলেন সকলেই মেঝেতে কম্বল পেতে শয়ন করেন এবং হাত দিয়েই খান। গুডউইনও নিজেকে সেভাবেই অভ্যস্ত করে তুললেন। তাঁকে এত কঠোরতা করতে নিষেধ করলে বলতেন, 'স্বামীজী যেরূপ কঠোর করেছিলেন, আমিও সেইরূপ করব।' একদিন গুডউইন রামতনু বসু লেনে স্বামীজীর মায়ের দর্শনার্থে যান। গুডউইনের মুখে ও হাতে মশা কামড়ানোর দাগ দেখে সস্নেহে ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার গায়ে যে মশার কামড়ের দাগ! মশারি টাঙ্গাও না কেন?'

গুডউইন জবাব দিলেন, 'স্বামীজী খালি কম্বলে পড়ে থাকেন। তাঁর মশারি নেই, তাঁকে মশা কামড়ায়, সেটিই আমার বিশেষ কষ্ট। তাতে আমার মনে আঘাত লেগেছে। আমার গায়ে কামড়ানোর জন্য বিশেষ চিন্তিত নই।' এইকথা শুনে তিনি বলতে লাগলেন 'আহা গুডউইনের কি গুরুভক্তি! নিজের দেহপাত করে গুরুসেবা করে।'[২৫]

গুডউইন সহজেই সকলের সঙ্গে মিশতে পারতেন। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগই তাঁকে ভারতীয় আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিকে সহজে গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল। ভারতের অনভ্যস্ত পরিবেশ ও আবহাওয়ায় যাতে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ না হয় সেদিকে স্বামীজীরও ছিল প্রখরদৃষ্টি। গুডউইন তখন স্বামীজীর সঙ্গে আলমবাজার মঠে আছেন। সেদিন জন্মাষ্টমী। জন্মাষ্টমীর দিন উপবাসপালন ভারতীয়প্রথা। মঠের অন্যান্যদের সঙ্গে গুডউইনও সেদিন উপবাসী। স্বামীজীর তা কর্ণগোচর হতেই 'গুডউইন কোথায়' বলে স্বামীজী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। গুডউইনও তৎক্ষণাৎ স্বামীজীর সামনে এসে গরুড় পাখির মতো হাঁটু ভেঙে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। স্বামীজী সস্নেহে ভর্ৎসনার সুরে বললেনঃ "তুই নাকি উপোস করেছিস? কে করতে বললে? তোরা বড় জ্বালালি। এত বাড়াবাড়ি সইবে কেন?"

একদিন স্বামীজী, গুডউইন আরও কয়েকজন আলমবাজারে লোচন ঘোষের ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে গেছেন। গুডউইন আগে স্নান করে এক কমণ্ডলু জল ও স্বামীজীর জুতো নিয়ে ঘাটে অপেক্ষা করছেন। স্বামীজী স্নান করে ঘাটের সিঁড়িতে উঠলেন। তখন ভাঁটা থাকায় স্বামীজীর পায়ে কাদা লেগে গেল। গুডউইন তা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে কমণ্ডলুর জল দিয়ে স্বামীজীর পা ধুয়ে দিলেন, নিজের উত্তরীয় দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে জুতো পরিয়ে দিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ গুডউইনের এরূপ বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা ও সর্বোপরি গুরুভক্তির কথা স্মরণ করে বারবার বলতে লাগলেনঃ "গুডউইনের কি গুরুভক্তি! এইটি দেখবার এবং শেখবার বিশেষ জিনিস। যে ইংরাজ এদেশে রাজত্ব করছে, সেই ইংরাজ স্বামীজীর পা ধুয়ে দিচ্ছে ও স্বামীজীকে জুতো পরিয়ে দিচ্ছে।"[২৬]

গুরুগতপ্রাণ গুডউইন সুযোগ পেলেই নিজেকে স্বামীজীর সেবায় নিযুক্ত রাখতেন। নীলাম্বরবাবুর বাগানে একদিন গঙ্গায় স্নান করে স্বামীজী উঠে এসেছেন। গুডউইনের ইচ্ছে স্বামীজীর পা মুছে দেয়। কানাই মহারাজ, সুরেন মহারাজ তোয়ালে দিয়ে স্বামীজীর মাথা মুছিয়ে দিচ্ছিলেন। অন্তর্যামী গুরু শিষ্যের অন্তরের ইচ্ছের কথা অনুধাবন করলেন সহজে। পা দুটি বাড়িয়ে দিয়ে সস্নেহে বললেন গুডউইনকে— 'sit down and rub it'[২৭] শিষ্যের আন্তরিক ইচ্ছা গুরু এভাবেই পূর্ণ করেন।

নিজেকে সবরকম পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলার অসাধারণ ক্ষমতা গুডউইনের ছিল। স্বামীজীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল বলেই ভারতে এসে ভারতীয় হয়ে ওঠার এক বিশেষ প্রযত্ন তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে। স্বামীজীর সঙ্গে ১৮৯৬ সালে কলকাতায় আসার পর একদিন স্বামীজীর দিদিমা ও মার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ৭, রামতনু বোস লেনের বাড়িতে যান। ভারতীয় প্রথানুসারে তাঁদের চরণস্পর্শ করে ভূমিষ্ঠ প্রণতি নিবেদন করেন। স্বামীজীর দিদিমা অত্যন্ত রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের বাল্যবিধবা। সেযুগে হিন্দুর কাছে বিদেশীরা 'ম্লেচ্ছ' বলে পরিগণিত। তাই ম্লেচ্ছ গুডউইন দিদিমার চরণস্পর্শ করায় গুডউইন ফিরে গেলে, তিনি স্নান করলেন। এদিকে তখন শীতকাল। আগে একবার স্নান করেছিলেন।

ফলে দ্বিতীয়বার স্নান করায় তিনি বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে গুডউইন নিত্য গঙ্গাস্নান করেন এবং তিনি নিরামিষাশী তখন অনুশোচনা করে বৃদ্ধা বলতে লাগলেন গুডউইনের মতো একজন 'বৈষ্ণবকে' এভাবে হেয় করায় তাঁকে ব্যাধির প্রকোপ সহ্য করতে হ'ল।[২৮]

১৮৯৭, ৭ মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য আবির্ভাব উৎসবে দক্ষিণেশ্বরে গুডউইন স্বামীজীর ইচ্ছা অনুযায়ী শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে ভাষণ দেন। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল সেই দিনে গুডউইনকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করা। তখন তা করা সম্ভব হল না। কিন্তু মনে মনে তিনি সেই ইচ্ছা পোষণ করতেন। জুন মাসে স্বামীজী শ্রীমতী মেরী হলবয়েস্টারকে একটি পত্রে গুডউইনকে সন্ন্যাসপ্রদানের ইচ্ছে প্রকাশ করে লেখেন ঃ "You ought to have seen (Goodwin) in his Indian clothes. I am very soon going to shave his head and make a full-blown monk of him."[২৯] কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুডউইনের সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষাগ্রহণ বাস্তবায়িত হয়নি।

স্বামীজীর সঙ্গে ৮ মার্চ গুডউইন দার্জিলিং যাত্রা করেন। স্বামীজী স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গিয়েছিলেন। তাই কিছুদিন দার্জিলিং-এ অবস্থান করেন। গুডউইন আলমবাজার মঠে ফিরে এলেন। এপ্রিল মাসে তিনি স্বামী শিবানন্দ ও অন্যান্যদের সঙ্গে দেরাদুনে যান। তাঁর এই ভ্রমণের ব্যয়ভার মঠ থেকেই বহন করা হয় কিন্তু সেই কৃচ্ছ্রতার দিনে মঠ থেকে ব্যক্তিগত সুখসুবিধার জন্য অর্থগ্রহণের ব্যবস্থা গুডউইনের পছন্দ হয়নি। কিছু অর্থসাহায্য প্রার্থনা করে মিসেস ওলি বুলকে লেখেন ঃ "I am naturally bound when the Swami sends me about from place to place, to rely on the funds of the Math for travelling expenses, I hardly like this... I should be very glad if you would let me have a little money for this purpose but only for this reason."[৩০]

ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশে ম্লেচ্ছদের প্রতি কিছুসংখ্যক ভারতবাসীর অস্পৃশ্যতার ভাব গুডউইন স্বচক্ষে দেখে মর্মাহত হন। তাঁর ক্ষোভের প্রকাশ দেখতে পাই শ্রীমতী বুলকে লেখা একটি পত্রে ঃ "There are a few strong sterling spirits here, but the many are hopelessly weak, and have no idea of religion outside of hard & fast observances in the kitchen. It is astonishing to a European."[৩১]

গুডউইন স্বামীজীকে ভালবেসেছিলেন ঠিকই কিন্তু স্বামীজীর ভারতকে প্রাণের সঙ্গে বোধ হয় গ্রহণ করতে পারেননি। সেযুগের রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজের অবহেলা, অবজ্ঞা সহ্য করেও স্বামীজীর কাজে নিবেদিতপ্রাণ ভগিনী নিবেদিতা, কৃস্টিন, জোসেফিন ম্যাকলাউড, সেভিয়ার দম্পতি—ভারতকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। হয়তো তার অন্যতম কারণ গুডউইন অপেক্ষা তাঁদের পরিণত বয়স ও বুদ্ধি, বিচারসম্মত ভাবাবেগ ও মননশীলতা।

স্বামীজীর ইচ্ছা গুডউইন মাদ্রাজে গিয়ে একটি ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তাই ১৮৯৭-এর জুলাই মাসে হঠাৎ তাঁকে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দিলেন। ১০ জুলাই একটি পত্রে সে সংবাদ নিবেদন করেন স্বামীজী শ্রীমতী জোসেফিন ম্যাকলাউডকে ঃ "Goodwin

has gone to work in Madras on a paper to be started there soon."[৩২] কিন্তু নতুন কোনও ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশনার পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত সফল হল না। গুডউইন 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার কাজে নিযুক্ত হলেন এবং নবপ্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ মঠের নানা কাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে সাহায্য করতে লাগলেন। স্বামীজীরও একান্ত ইচ্ছা 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকাটি একটি উচ্চমানের বহুল প্রচারিত পত্রিকায় রূপান্তরিত হোক। তাই তাঁর ইচ্ছার বাস্তব রূপায়ণের জন্য 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আপন মতপ্রকাশ করে গুডউইন ১৮৯৭, ১৯ জুলাই শ্রীমতী ওলি বুলকে একটি পত্র লেখেন— "...There have three general objections found, both by readers and those who have been asked to become readers. I say this from experience. I have had in trying to obtain subscribers. They are as follows :

1) The paper is altogether Hindu, and therefore, in a way, alien to Western readers. It wants local colouring.

2) It is too small for the subscription.

3) It is too scholarly."[৩৩]

গুডউইন চেয়েছিলেন 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় স্বামীজীর একটি করে বক্তৃতা প্রকাশ হয়। নিউ ইয়র্ক, বস্টন, লণ্ডন, কলকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণীও যেন তাতে সংযুক্ত থাকে। ফলে, তাঁর মতে পত্রিকাটি একাধারে স্থানীয় ভাবানুগ হবে এবং পত্রিকার উঁচু সুর বজায় রেখে সহজ সরলভাবে বেদান্তের মহান ভাবসমূহও প্রচার করা সম্ভব হবে। তাই আরও লিখেছেন "...This, I think, will give the required local colouring, and meet the first objection, at the same time, that without the intellectual tone of the paper it will give Vedantic teaching in the marvellously simple and easily understood manner of which Swamiji is facile princeps the master."[৩৪]

কিন্তু 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার কাজটি নানা কারণে গুডউইনের পক্ষে চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হ'ল না। ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আলাসিঙ্গা। স্বাধীনচেতা গুডউইন কর্মক্ষেত্রে সর্বদা স্বমতকে বজায় রেখে চলতে যেন একটু অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছিলেন। তাছাড়া রক্ষণশীল দক্ষিণ-ভারতীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে চলাও তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল। তাঁর সদা হাস্যোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল যেন ম্লান হয়ে আসছিল। ব্যবহারে প্রকাশিত হচ্ছিল অকারণ অপ্রসন্নতা। মাদ্রাজে থাকাকালীন গুডউইন 'The Madras Mail' নামে একটি ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতেন। সেই পত্রিকার ইংরেজ সম্পাদকের সঙ্গে ক্রমে তিনি পরিচিত হন এবং কিছু কিছু অর্থাগমও তাঁর হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই 'The Madras Mail' নামক পত্রিকার পরিচালনার কাজে নিযুক্ত হলেন। এই প্রসঙ্গে —১৬ ডিসেম্বর মিসেস বুলকে লেখেন: "...I have joined the staff of the Mail. They asked me to several times, & as they allow me perfect liberty

to make the Swamiji's work my first interest, and as also, it will enable me to keep myself here, and help my mother out, I joined."[৩৫]

নভেম্বর মাসে গুডউইন মাদ্রাজ থেকে স্বামীজীর সঙ্গে জম্মু ও পরে লাহোরে যান। লাহোরেই গুডউইন স্বামীজীর ভাষণের শেষ সাঙ্কেতিকলিপি গ্রহণ করেন। শ্রীগুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গুডউইন ফিরে গেলেন মাদ্রাজে। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সেই শেষ ভ্রমণ ও সাক্ষাৎ।

মাদ্রাজে অনভ্যস্ত খাদ্য ও প্রখর রৌদ্রতাপে স্বাস্থ্যবান ইংরেজ যুবক গুডউইনের ক্রমশ শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছিল। অতিরিক্ত গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে তিনি গেলেন উটকামণ্ডে, সেখানকার 'The Mail' সংবাদপত্রের কার্যালয়ে নিযুক্ত হলেন। উটকামণ্ডে থাকাকালীন ক্রিকেটপ্রিয় গুডউইন দুদিন বৃষ্টিতে ভিজে খেলা দেখেন। ফলে জ্বরে আক্রান্ত হন। নিজের সুখসুবিধার প্রতি সর্বদাই উদাসীন ছিলেন। অবহেলার দরুন জ্বর প্রবল হল। অবশেষে ১৮৯৮, ২ জুন উটকামণ্ডে স্বামীজীর বিশ্বস্ত শিষ্য গুডউইন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আলাসিঙ্গা তারযোগে এই দুঃসংবাদ স্বামীজীর কাছে পাঠালেন। ৮ জুন গুডউইনের মৃত্যুর বিস্তৃত সংবাদ দিয়ে একটি পত্রও স্বামীজীকে লেখেনঃ "Poor Goodwin has passed from our midst and we one and all feel exceedingly sorry. When you sent him down here you asked me to put up with his bad temper and pull on with him smoothly. I did all I could to please him and work with him and I believe he had not much to complain against me. We grew to be fast friends and I grieve over his death all the more. He did splendid work for the Ramakrishna Mission and peace [be] to his soul."[৩৬]

স্বামীজী তখন আলমোড়ায়। তাঁর কাছে পৌঁছাল সেই-দুঃসংবাদ। গুডউইনেব মৃত্যুসংবাদ শুনে স্বামীজী বারবার বলতে লাগলেন—"পুত্রশোক কি ভয়ঙ্কর! এখন বুঝিতে পারিতেছি পুত্রশোক কি? গুডউইন চলিয়া গেল; আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া গেল বোধহয় মা'র ইচ্ছা নয় যে আমি আর কাজ করি।"[৩৭]

ভগিনী নিবেদিতা গুডউইনের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে একটি পঙ্‌ক্তি রচনা করে স্বামীজীকে দেখালে স্বামীজী সেটিকে একটি নতুন কবিতায় রূপান্তরিত করলেন—সেই কবিতায় ছিল বিশ্বস্ত শিষ্য গুডউইনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম প্রেম ও আশীর্বাদ—

"চল আত্মা শীঘ্র গতি, তারকাখচিত তব পথে।
ধাও হে আনন্দময়, যেথা নাহি বাধে মনোরথে;
—টুটেছে বন্ধন তব, পেয়েছ যে আনন্দ-সন্ধান।
জন্মমৃত্যুরূপে যিনি, তার সাথে হলে এক প্রাণ,
তুমি যে সহায় ছিলে, স্বার্থত্যাগী চির এ ধরায়
আগে চল, সংসার-সংগ্রামে আনো প্রীতির সহায়।"

কবিতাটি স্বামীজী, শোকসন্তপ্তা গুডউইন-জননীর নিকট পুত্রের স্মৃতিচিহ্ন ও সান্ত্বনাবাক্যস্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন। আরও লিখলেন—"গুডউইনের ঋণ অপরিশোধনীয়, আর যাঁরা মনে করেন, আমার কোন চিন্তা দ্বারা তাঁরা উপকৃত হয়েছেন তাঁদের জানা উচিত যে, তার প্রত্যেকটি কথা শ্রীমান গুডউইনের স্বার্থলেশহীন অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকাশিত হতে পেরেছে। তার মৃত্যুতে আমি একজন অকপট বন্ধু, ভক্তিমান শিষ্য ও অদ্ভুত কর্মীকে হারিয়েছি। সে জানত না, ক্লান্তি কাকে বলে। পরার্থে যাঁরা জীবনধারণ করেন, এরূপ লোক জগতে অতি অল্প। সেই অত্যল্প সংখ্যারও আর একটি হ্রাস পেল।"[৩৮]

ঐ পত্র পেয়ে গুডউইনের শোকসন্তপ্তা জননীও তাঁর পুত্রের জীবনে স্বামীজীর প্রভাবকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে পত্র লিখেছিলেন।

গুডউইনের ভারতীয় অনুরাগীদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ একটি স্মৃতিস্তম্ভ ১৯৬৭ সালে উটকামণ্ডে স্থাপিত হয়। স্মৃতিস্তম্ভের চারিদিকে স্বামীজীর রচিত 'Requiescat in pacc' কবিতাটি গুডউইনের প্রতি তাঁর ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ লিখিত রয়েছে।

গুডউইনের সাঙ্কেতিকলিপিতে স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর কয়েকটি খণ্ডের মতো উপকরণ লিপিবদ্ধ ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, গুডউইনের মৃত্যুর পর সেসব লিপির সন্ধান না জানায় আলাসিঙ্গা গুডউইনের রাখা কাগজপত্র বিদেশে তাঁর জননীর ঠিকানায় প্রেরণ করেন। ভগিনী নিবেদিতা ইংলণ্ড বাসকালে গুডউইন-জননীর বহু অনুসন্ধান করে বিফল হন—পুত্রের অবর্তমানে দরিদ্র জননী জনারণ্যে কোথায় মিশে গিয়েছিলেন—নিবেদিতা তাঁর খোঁজ পাননি। ফলে সেই অমূল্যধন হারিয়ে যায়।

কিন্তু গুডউইনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতার ফলেই স্বামীজীর বিশ্ব-আলোড়নকারী অমূল্য বক্তৃতাবলীর অধিকাংশের সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পেরেছি। স্বামীজীর এই মহৎ কর্মযজ্ঞে তিল তিল করে নিজ জীবন আহুতি দিয়েছিলেন—এই ইংরেজ যুবক গুডউইন। রামকৃষ্ণ আন্দোলনে এক উৎসর্গীকৃতপ্রাণ অনন্য শহীদরূপে গুডউইন চিরস্মরণীয়।

অদ্বৈতের প্রেরণায় সেভিয়ারদম্পতি

প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণা

"হিমালয়ের মনোমুগ্ধকর নির্জনতায় গ্রীষ্মের প্রসন্ন উজ্জ্বল সকাল। বাগানে বসে প্রকৃতির এই আশ্চর্য শোভা দেখছিলাম; আমার চাবদিকে নানা রঙের নানা আকারের অজস্র ফুলের সমারোহ। বাইরের পৃথিবীর কোনও কলরব এখানে পৌঁছায় না—এখানে সবই শান্ত, চিরসুন্দর। বেঁচে থাকার এক তীব্র আনন্দ ছাড়া সে মুহূর্তে আমার মনে দ্বিতীয় কোনও চিন্তা ছিল না। একভাবে বসে বসেই যেন হাল্‌কা এক স্বপ্নের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি—সামনে চিরতুষারাবৃত উত্তুঙ্গ হিমালয়। দেখে মনে হয়, দ্যুলোকস্পর্শী দুগ্ধশুভ্র জ্যোতির্ময় মন্দিরশ্রেণী নিঃসীম শূন্যে সারিবদ্ধভাবে সাজানো বয়েছে। কী সে রাজকীয় মহিমা! ...অপরূপ পরিবেশ—দিব্য পরিমল মৃদুসঞ্চারী, গোলাপেব কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমরের গুঞ্জন চেতনাকে যেন আচ্ছন্ন কবে দেয়। যুগ যুগ ধরে কত মুনি-ঋষি হিমালয়ের এই জনহীনপ্রদেশে উচ্চ চিন্তার স্রোতে নিরন্তর অবগাহন করেছেন—পৃথিবীর শোক-জরা তাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি। বিশ্বজগতেব রহস্য উন্মোচন করে তাঁরা সিদ্ধকাম হয়েছেন।...

"চিন্তার গভীরে হারিয়ে গিয়েছিলাম হঠাৎ কানে এল অতি মৃদুস্বরে ফুলেরা নিজেদেব সুবাস ছড়িয়ে পরস্পরকে সম্বোধন কবে কী যেন বলে চলেছে।

"কান পেতে শুনি, তাদের আলোচনার বিষয় 'সূর্য উপাসনা' এবং ফুলের দলে কারাই বা সে উপাসনায় অগ্রণী! প্রত্যেকেই যেন স্বপক্ষ সমর্থনে তৎপব, নিজের গুণ সম্পর্কে প্রত্যেকেই সচেতন।

"সকলের কথা বলা শেষ হলে বাগানেব ঠিক মাঝখানে পিতৃপ্রতিম বৃদ্ধ দেওদার, এতক্ষণ যে সূর্যের দিকে মাথা তুলে উপাসনার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল, তার শাখাপ্রশাখায় কাঁপন জাগিয়ে ফুলেদের উদ্দেশে ধীরে ধীরে বলল: 'তোমরা কেন মিছিমিছি নিজেদের গোঁড়ামি প্রকাশ করছ? এই ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে সামান্যতম মতবিরোধও বেমানান। আমার কথা শোন, প্রত্যেকেই আমরা সেই মহান সূর্যের কাছ থেকে রূপ বল, গুণ বল, সবকিছুই পেয়েছি। তিনি আমাদের সকলের মধ্যে বহুরূপে বহুভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—এতো তাঁরই অনুপম সৃষ্টি। সূর্যদেবের প্রসাদপূত এই বাগানে যদি শুধু এক ধরনের ফুলই ফুটত, তাহলে কি তাঁর মহিমা বৃদ্ধি পেত! প্রতিদিন সেই অংশুমালী সূর্যদেব নানা রঙের নানা আকারের ফুল-ফল-পাতাগুলিকে তাঁর

আলোকসম্পাতে আশীর্বাদ করে যান। আমরাও ধন্য, যে যার সাধ্যমত বিকশিত হয়ে তাঁর আনন্দবর্ধন করি। সূর্যের ভালবাসা আমাদের কর্মের প্রেরণা, তাঁর মহিমাকে উপলব্ধি করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। সূর্যের কৃপা আমাদের শক্তি, তাঁর উপস্থিতি আমাদের শ্রেষ্ঠ আনন্দ।' ঋষিতুল্য দেওদারের কথা শেষ হলে ফুলেরা তাঁকে সমর্থন জানাল, হিমালয়ের বুকে নেমে এল গাঢ়তর শান্তির আশ্বাস।"

'Advaitin' ছদ্মনামে ১৮৯৯-এর মে মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় এই অসাধারণ রম্যরচনাটি প্রকাশিত হয়। লেখিকার প্রকৃত নাম শার্লট এলিজাবেথ সেভিয়ার। সাহিত্যকর্মেই নয়, তাঁর সমগ্র জীবন ছিল মহান ভাবগ্রহণের কাহিনী—সূর্যসদৃশ পরমাত্মাকে গ্রহণের মানসতা।

আমেরিকা থেকে লণ্ডনে বেদান্তপ্রচারে এসেই স্বামীজী বুঝেছিলেন এদেশে তাঁর কাজ আরও বেশি সফল হবে। ইংরেজরা সঙ্কল্পে বজ্রদৃঢ়, বাস্তববাদী ও কর্মঠ। অভিজাত ও শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় জীবনযাত্রা ও দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ১৮৯৬-এর গ্রীষ্মে দ্বিতীয়বার লণ্ডনে এসে স্বামীজী জ্ঞানযোগের নিয়মিত ক্লাস শুরু করলেন। মায়াবাদ ও বেদান্ত সম্পর্কে স্বামীজীর মনোজ্ঞ আলোচনা ছিল অসাধারণ। সেভিয়ার দম্পতি ঐ ক্লাসেই নবীন আচার্যের কাছে প্রথম শুনলেন অদ্বৈত বেদান্তের কথা। তাঁদের মনে হলঃ "This is the man and this is the philosophy that we have been searching in vain all through our life."[১] পূর্বপরিচিত বন্ধু মিস ম্যাকলাউডকে ক্যাপ্টেন সরাসরি প্রশ্ন করলেনঃ 'এই তরুণ হিন্দু যোগীকে কি আপনি চেনেন? এঁর কথা শুনে এঁকে যা মনে হচ্ছে, ইনি কি তাই?' উত্তর এল, 'নিশ্চয়ই'। মধ্যবয়সী ভিক্টোরীয় মানুষটি সাগ্রহে বলে উঠলেনঃ 'তাহলে তো এঁরই অনুসরণ করা উচিত। এঁরই সাহায্যে সত্যলাভ করতে পারব।'

জীবনে শুভক্ষণের যোগাযোগ আকস্মিকভাবেই আসে কিন্তু সে সুযোগ গ্রহণ করে একটি ভাবের রূপায়ণে নিজেকে উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

ক্যাপ্টেন তাঁর কর্মজীবনে একটানা পাঁচ বছর ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে, ভারতবর্ষ তাই তাঁর অপরিচিত নয়। অবসরগ্রহণের পর থেকে হ্যাম্পস্টেডের নিজস্ব ভবনে অধ্যয়নে ও উচ্চচিন্তায় দিন অতিবাহিত করতেন। তাঁর যুক্তিবাদী মন জীবনজিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজত—চার্চের ধর্মীয় গতানুগতিকতা সে অন্বেষাকে তৃপ্ত করতে অক্ষম।

অযথা সময়ক্ষেপ ইংরেজদের ধাতে সয় না। যা সত্য বলে জেনেছি তাকে জীবনে লাভ করাই তো পৌরুষ! ক্যাপ্টেন স্ত্রীর কাছে প্রস্তাব রাখলেনঃ 'আমি যদি এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করি, তোমার কোনও আপত্তি আছে?' উত্তর এল প্রতিপ্রশ্নের আকারে। '—আমিও যদি এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করি, তোমার কোনও আপত্তি আছে?' হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন, সকৌতুকে বললেনঃ 'হতেও পারে।' সেযুগে স্বজাতির উপহাস অগ্রাহ্য করে কোনও 'নেটিভ'-এর শিষ্যত্বগ্রহণ এবং সত্যলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সর্বস্ব অর্পণ বড় সহজ ছিল না কিন্তু সেভিয়াররা সেই বিরল দৃষ্টান্ত যাঁরা বিশ্বাস করতেনঃ 'সব ছোড়ে সব পাওয়ে।' পরিচিত পৃথিবীকে পশ্চাতে রেখে আচার্যের আহ্বানে তাঁরা এসেছিলেন ভারতবর্ষে। সে

আহ্বান ছিল যুগপৎ প্রেম ও প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ। ব্যক্তিগত পরিচয়ের প্রথম দিনটিতেই স্বামীজী মিসেস সেভিয়ারকে মাতৃসম্বোধন করে বলেনঃ 'আপনার কি ভারতবর্ষে যেতে ইচ্ছে হয় না? যদি সেদেশে আসেন, আমার শ্রেষ্ঠ অনুভূতি আপনাকে দেব।' সে অঙ্গীকার উভয়তই রক্ষিত হয়েছিল। সম্পদ, গৃহসুখ সেভিয়ারদের আত্মনিবেদনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেনি, হিমালয়ের নিভৃত আশ্রমে অদ্বৈতানুভবের সাধনায় তাঁরা সার্থক হয়েছিলেন।

বিদেশে প্রচারের কাজে সহায়করূপে স্বামী সারদানন্দ ও অভেদানন্দ এসেছিলেন ১৮৯৬ সালের এপ্রিল ও আগস্ট মাসে। সুযোগ্য গুরুভ্রাতাদের সহযোগিতায় স্বামীজী স্বস্তিবোধ করলেন। গত দু বছর ক্রমাগত বক্তৃতা ও ক্লাসের অমানুষিক পরিশ্রমে ক্লান্ত স্নায়ুগুলিকে বিশ্রাম দেওয়া খুবই জরুরি ছিল। ইংরেজ বন্ধুদের পক্ষ থেকে সেভিয়াররা প্রস্তাব আনলেন, জনকোলাহল থেকে দূরে তুষারাবৃত আল্পস্-এর পার্বত্যভূমিতে কিছুদিন নির্জনবাসের। সানন্দে সম্মত হলেন স্বামীজী। স্থির হল সেভিয়ার দম্পতি ও মিস মূলার তাঁর সঙ্গী হবেন। বলা বাহুল্য, ভ্রমণের ব্যয়ভার সানন্দে বহন করেছিলেন সেভিয়াররা। সে যাত্রায় সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানীর বিভিন্ন শহর, গ্রাম, উপত্যকায় দীর্ঘভ্রমণে সবশুদ্ধ দু হাজার মাইল অতিক্রম করেছিলেন তাঁরা। গবেষক-সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যাত্মানন্দের মতে আজকের মূল্যসূচকে সেভিয়ার দম্পতি ও স্বামীজীর আনুমানিক ব্যয় হয়েছিল চার থেকে পাঁচ হাজার ডলার। কিন্তু খরচের বিপুল অঙ্ক সেভিয়ারদের উদার মনে কোনও ছায়াপাত করত না। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভ্রমণের সব দায় থেকে স্বামীজীকে মুক্ত রাখা।

মানুষ চিনতেন স্বামীজী। বুঝেছিলেন সেভিয়ারদের আনুগত্য, সহানুভূতির সবটাই অকৃত্রিম। নিশ্চল দীপশিখার মতো আপন শুদ্ধতায় তা চিরদীপ্র। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁদের অন্তরঙ্গতার উৎস ছিল গভীর অন্তর্লোকে। বহুকাল পরে ইংরেজী জীবনীগ্রন্থের অন্যতম সম্পাদকরূপে মাদার সেভিয়ার সেই প্রথম পরিচয়প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত ও সংযত মন্তব্য লিখেছিলেনঃ "From that day they looked upon the Swami not only as their Guru but as their own son."[২] আজীবন এই যুগ্মভাবই নিঃসন্তান সেভিয়ারদের কাছে প্রিয়তম আচার্য ও পুত্ররূপে স্বামী বিবেকানন্দকে বরণীয় করেছিল।

প্যারিসের লিওঁ স্টেশন থেকে জেনেভাগামী ছোট দলটি যাত্রা করেছিল ১৮৯৬-এর ২০ জুলাই। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে তাঁরা দেখেন, সেখানে তখন বেশ জমকালো এক শিল্পপ্রদর্শনী চলেছে। গ্রীষ্মাবকাশে শৈলশহর জমজমাট। স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা যে হোটেলে উঠলেন তার সামনেই বিশাল লেমাঁ লেক। অদূরে আল্পস্-এর তুষার শৃঙ্গগুলি রৌদ্রকিরণে সমুজ্জ্বল। লেমাঁর 'সুইমিং পুল'-এ নিত্য স্নান, মেলাপ্রাঙ্গণে যথেচ্ছ ভ্রমণ—বিশেষত বেলুনে আকাশচারী হওয়ার আনন্দ বিবেকানন্দকে যেন কৈশোরের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে দিয়েছিল। মাদার সেভিয়ারের সাবধানবাণী উপেক্ষা করে তিনি বেলুনে চড়লেন—একা নয়, গোটা দলটিকে নিয়ে। সদ্যোত্তীর্ণ মনোরম সন্ধ্যায় শান্ত বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীর মাটি ছেড়ে বহু উর্ধ্বে উঠে গেল বেলুনটি—ফিরেও এল নির্বিঘ্নে। প্রসঙ্গত বলা চলে, এটা বিমান চলাচল ব্যবস্থার প্রাক্ পর্যায়ের ঘটনা। রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার শেষে ছোট ছেলের মতন বিবেকানন্দ আবদার করতে লাগলেন আরেকবার আকাশ-ভ্রমণের। পরবর্তী কোনও নির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকায় সেদিন আর ঐ ইচ্ছা পূরণ সম্ভব হয়নি কিন্তু ভ্রমণসঙ্গীদের নিয়ে 'গ্রুপ

ফটো' তোলার সংবাদ পাই ১৯৭৩-এর 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামী বিদ্যাত্মানন্দের প্রবন্ধ থেকে। নিঃসন্তান সেভিয়ার দম্পতি বিবেকানন্দের এই প্রাণচঞ্চল বালমূর্তি বোধ হয় কোনও দিন ভুলতে পারেননি!

তাঁদের জন্য অপেক্ষা করেছিল আরও বিস্ময়। বিবেকানন্দ ব্যক্তিত্বের হীরকদ্যুতির বিচ্ছুরণ প্রতিক্ষণে অনন্য। জেনেভা থেকে ছাপ্পান্ন মাইল দূরে 'শামোনি'। চারিদিকে তার অভ্রভেদী মঁ ব্লাঁ পর্বত। সেই রমণীয় উপত্যকায় পৌঁছে আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন স্বামীজীঃ 'আমরা যেন বরফের রাজ্যে ঢুকে গেছি—চলো আজ সবাই মিলে মঁ ব্লাঁ পাহাড়ে চড়ি।' কিন্তু টেলিস্কোপে দুর্গম মঁ ব্লাঁকে কাছ থেকে দেখে উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম এবং দক্ষ গাইড ছাড়া সে সাধ যে পূর্ণ হওয়ার নয় তা বুঝে নিতে তাঁর দেরি হল না। স্থির হল, পর্বতারোহণের পরিবর্তে তাঁরা গ্লেশিয়ার পেরুবেন।

কিন্তু বিবেকানন্দের ভ্রমণের উদ্দেশ্য তো পার্বত্যপথে চড়াই-উতরাই নয়। তুষারাবৃত আল্পসের বুকে প্রতিমুহূর্তে তিনি স্মরণ করতেন দেবতাত্মা হিমালয়কে—স্বরূপ আস্বাদনের অতলান্তে মগ্ন হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর সহজাত। আচার্যের সেই আন্তর চাহিদাকে তৃপ্ত করতে সঙ্গীরা এগিয়ে চললেন 'সাস-ফী' উপত্যকার উদ্দেশ্যে। ছোট্ট গ্রাম 'সাস-ফী'। জার্মান ভাষায় সে নামের অর্থ 'গবাদি পশুচারণভূমি'। 'সাস-ফী' থেকে আল্পস্-এর তুষারাবৃত এগারোটি শৃঙ্গ এবং একাধিক গ্লেশিয়ারের শোভা দেখবার মতো। আবার এখানকার সবুজ মখমলের মতো ঘাসে ঢাকা সমতল জমিতে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণেরও সুযোগ। তুষারধবল গিরি উপত্যকায় একাকী ঘুরে বেড়াতেন স্বামীজী, কখনও মগ্ন হতেন অধ্যয়নে অথবা গভীর ধ্যানে। জ্যোতির্ময় প্রাচ্য ঋষির দুর্লভ সান্নিধ্য সঙ্গীদের কাছে কত পবিত্র ছিল তারই পরিচয় মাদার সেভিয়ারের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় লিপিবদ্ধঃ "There seemed to be a great light about him, and a great stillness and peace. Never have I seen the Swami to such advantage. He seemed to communicate spirituality by a look or with a touch. One could almost read his thoughts which were of the highest, so transfigured had his personality become !"[৩]

সেভিয়াররা এতকাল অদ্বৈতের দার্শনিক উদারতাকেই বড় করে দেখেছিলেন, স্বামীজীর নিরন্তর দিব্যসান্নিধ্যে তাঁরা অনুভব করলেন দর্শনকে জীবনে রূপায়ণ করাই লক্ষ্য। স্বামীজীর বহুদিনের ইচ্ছা 'সাস-ফী'-র শান্ত পরিবেশে যেন নির্দিষ্ট আকার নিল। ভারতবর্ষে ফিরে হিমালয়ে তিনি আশ্রমস্থাপন করবেন, যেখানে প্রত্যেকে অদ্বৈতভাবে সাধন করার সুযোগ পাবে। প্রাচী-প্রতীচীর অনুগামী শিষ্য ও ভক্তেরা একত্রে বাস করবেন সেখানে। ভারতীয় ছেলেরা উপযুক্ত শিক্ষান্তে বিদেশে যাবে বেদান্তপ্রচারের কাজে, পাশ্চাত্যের শিষ্যেরা ধ্যান ও অধ্যয়নাদির সঙ্গে দুঃস্থ ভারতবাসীর সেবাকেও সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করবে। এই অভিনব পরিকল্পনার রূপায়ণে সেভিয়াররাই তাঁর শ্রেষ্ঠ সহায় হতে পারেন।

মাত্র কয়েকটি বাক্যে যে উদার ভাব স্বামীজী শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত করলেন তার আবেদন অপরিসীম। সেভিয়ারদের মনে হল, এ যেন জীবনদেবতার সুস্পষ্ট আহ্বান! আবেগে উত্তেজনায় ক্যাপ্টেন বললেনঃ 'আহা তা যদি করা যায় কী অপূর্ব হবে স্বামীজী।

এমন একটি মঠ করতেই হবে।'

'সাস-ফী'-তে দু সপ্তাহ নির্জনবাস স্বামীজীকে দ্বিগুণতর উৎসাহে কর্মজীবনে ফিরিয়ে দিল। সেখান থেকে তিনি ভারতপ্রেমী দার্শনিক পল ডয়সনের আমন্ত্রণে জার্মানীর কিয়েল শহরে এলেন এবং এরপর পুনরায় লণ্ডনে। পরবর্তী দুই মাস যেন অস্বাভাবিক দ্রুততায় অতিক্রান্ত হল।

বিগত কয়েকমাসের অভিজ্ঞতায় স্বজন ও সমাজের বন্ধন সেভিয়ারদের কাছে চিরদিনের মতো শিথিল হয়ে গিয়েছিল। মহান আচার্যকে অনুগমন করে ভারতবর্ষে যাওয়ার সঙ্কল্পে এখন তাঁরা অবিচল। এদিকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন যত আসন্ন হতে লাগল স্বামীজীও অকৃপণ দানে শ্রোতাদের ভরিয়ে তুললেন—শেষ পর্বের ক্লাসগুলি ছিল অসাধারণ। স্থির হল, ইতালী ঘুরে নেপল্‌স থেকে স্বামীজী ভারতগামী জাহাজে উঠবেন। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় তাঁর সঙ্গী সেভিয়ার দম্পতি; গুডউইন নেপল্‌স থেকে সেই দলে যোগ দেবেন।

স্বামীজীর কাছে পাশ্চাত্যের ভক্তেরা জানতে চেয়েছিলেনঃ "বিলাসবৈভব ও পার্থিব শক্তিতে পূর্ণ পাশ্চাত্যসমাজে প্রায় চার বছর বাস করার পর ভারতবর্ষে ফিরে যেতে কেমন লাগছে?" স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দেনঃ "এদেশে আসার আগেও ভারতকে ভালবাসতাম কিন্তু এখন আমার কাছে ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকণাও পবিত্র, ভারতের বাতাস কী শুদ্ধ—আমার কাছে ভারত আজ পুণ্যভূমি, তীর্থস্বরূপ।"

যাত্রাপথে ইতালীর মিলান, ফ্লোরেন্স, রোম ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানগুলি গভীর আগ্রহ নিয়ে স্বামীজী ঘুরে দেখলেন। দেশাচার ও চিন্তাধারার বৈচিত্র্য তাঁকে আনন্দ দিত। সেই ভূয়োদর্শনের সরস অভিজ্ঞতা তিনি নিজেই 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

ডিসেম্বরের শেষে নেপল্‌স থেকে জলপথে ভারতবর্ষ যাত্রা—পথে এডেন বন্দরে জাহাজ থামলে যাত্রীরা ভূমিতে অবতরণ করলেন। ঐ সময়ের এক কৌতুকাবহ ঘটনা স্বামীজীর স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি গভীর ভালবাসার পরিচায়ক। বন্দরে নেমে পরস্পর কথালাপের অবকাশে সঙ্গীরা দেখলেন স্বামীজী তাঁদের মধ্যে অনুপস্থিত। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর সবিস্ময়ে তাঁরা বিবেকানন্দকে আবিষ্কার করলেন—তিনি তখন নিশ্চিন্ত সুখে এক দরিদ্র ভারতীয় পানওয়ালার দোকানে বসে তারই ব্যবহৃত হুঁকায় ধূমপান করছেন, সেইসঙ্গে চলেছে অন্তরঙ্গ ভাববিনিময়। ক্যাপ্টেন ঠাট্টার সুরে বললেনঃ 'Now we see ! It was this then that made you run away from us so abruptly !'[৪] কিন্তু সেই আপাতপরিহাসের অন্তরালে তাঁরা গভীরতর সম্ভ্রমবোধে আপ্লুত হলেন। বিবেকানন্দ ব্যক্তিত্বের এ এক স্বতন্ত্র পরিচয়। ভুবনবিখ্যাত এই সন্ন্যাসী তাঁর 'দরিদ্র মূর্খ কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত' দেশবাসীকে যে আক্ষরিক অর্থেই ভ্রাতৃজ্ঞান করেন, ঘটনাটি তারই অসামান্য দৃষ্টান্ত।

দীর্ঘ পনেরো দিন সমুদ্রযাত্রার পর উষার অস্পষ্ট আলোকে দিগ্‌বলয়ে দেখা দিল সিংহলের ক্ষীণ তটরেখা। স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা তখনও অনুমান করতে পারেননি, কী বিপুল উৎসাহ নিয়ে ভারতবর্ষের হাজার হাজার মানুষ প্রিয় আচার্যকে অভ্যর্থনা জানাতে উদ্‌গ্রীব। শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি থেকে শুরু করে জেলে-মাল্লা পর্যন্ত সকলেই তাঁর

দর্শনপ্রত্যাশী। সেই অভূতপূর্ব উত্তেজনা ও প্রাণাবেগ লাজুক ক্যাপ্টেনকেও অভিভূত করেছিল। কলম্বোর জাফনায় প্রায় চার হাজার সুশিক্ষিত ব্যক্তির সামনে স্বামীজীর দেড় ঘণ্টা ভাষণের পর শ্রোতারা এই অনুগামী ভিক্টোরীয় মানুষটিকে তাঁর ভারতে আগমন ও ভারতীয় ভাবাদর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলতে অনুরোধ জানান। ক্যাপ্টেনের সপ্রতিভ উত্তর তাঁদের সন্তুষ্ট করে।

দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন শহরে বিপুল অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে স্বামীজী প্রায় সর্বত্রই নবীন উদ্দীপনার বাণী শোনালেন। কিন্তু সেই অবিরাম বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকার তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যকে দুর্বলতর করে তুলল। তাই স্থির হল মাদ্রাজ থেকে জলপথে তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। চিকিৎসকের নির্দেশ ছিল স্বামীজীকে পথিমধ্যে যেন ডাব দেওয়া হয়। সেই সংবাদ শ্রবণে অত্যুৎসাহী ভক্তেরা জাহাজে এত প্রচুর পরিমাণে ডাব তুলে দিল যে অনভিজ্ঞ মাদার সেভিয়ার সভয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'স্বামীজী, এ কি মালজাহাজ নাকি যে এরা নারকেল তুলে দিচ্ছে!' স্বামীজী সহাস্যে আশ্বাস দিলেনঃ 'না না... ওগুলো আমারই জন্য।'[৫] বলা বাহুল্য, সেই পর্বতপ্রমাণ ডাবের অধিকাংশই সহযাত্রী ও সুহৃদ্‌বর্গের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল।

দাক্ষিণাত্যের একাধিক রাজ্যে স্বামীজীর অভ্যর্থনা ও বক্তৃতাপর্বের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এই সেভিয়ার দম্পতি। কিন্তু কোনও দিনই তাঁরা পাদপ্রদীপের সম্মুখে আসেননি। নীরবে স্বামীজীর অনুসরণ, দীর্ঘযাত্রাপথে স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীদের ব্যয়ভার বহন এবং সেইসঙ্গে সামান্যতম সেবার সুযোগে সহজ প্রসন্নতা সেভিয়ার দম্পতির অসাধারণ মর্যাদাবোধ ও শিষ্টাচারজ্ঞানকে প্রমাণ করে।

জাহাজ বজবজ পর্যন্ত এলে স্পেশাল ট্রেনে স্বামীজীকে শিয়ালদহ স্টেশনে আনা হয়। কলকাতা সেদিন আবেগে উত্তাল। জনস্রোতের মধ্যে স্বামীজীর ঘোড়ার লাগাম খুলে দিয়ে ছাত্রেরা গাড়ি টেনে নিয়ে চলল। গৌরবের সেই মুহূর্তে স্বামীজীর পাশে বসে মাদারও নিশ্চয় আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন অথবা তাঁর মানসপটে চকিতে ভেসে উঠেছিল মাত্র কয়েকমাস আগের অভিজ্ঞতা—তুষারধবল 'সাস-ফী'র চিরমৌন উপত্যকায় 'আত্মারাম আত্মরতি' অদ্বৈতসিংহের নিঃশব্দ পাদচারণ-দৃশ্য! জনহীন প্রদেশ অথবা জনাকীর্ণ সভা—সর্বত্রই বিবেকানন্দ এক অনতিক্রম্য ব্যক্তিত্ব।

মঠ তখন আলমবাজারে। স্বামীজীর সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় গুরুভাইরা উদ্‌গ্রীব। তাঁকে ঘিরে কৌতূহলী শ্রোতাদেরও অবিরাম প্রশ্ন। স্থির করা হল—দিনের বেলায় স্বামীজী কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে থাকবেন, দিনান্তে গুরুভাইদের সঙ্গে ফিরে যাবেন মঠে। সেভিয়াররা থাকতেন কাশীপুরের বাগানে। প্রতিদিন ঐ বাড়িতেই স্বামীজী মধ্যাহ্নভোজন এবং বিকেলে চা-পান করতেন। শীলেদের ঐ বাগানে মাদারকে স্বামীজীর সেবাস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হত। এই অন্তরঙ্গ সেবাটুকু স্নেহময়ী মাদারকে কতটা তৃপ্তি দিয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। মধ্যে মধ্যে আলমবাজার মঠেও ইউরোপীয় শিষ্যেরা আচার্যসকাশে উপস্থিত হতেন। গুরুভাইদের মধ্যে মুণ্ডিতমস্তক কাষায়ধারী যতিশ্রেষ্ঠের সে আর এক রূপ।

আসন্ন গ্রীষ্মে সেভিয়ারদের পক্ষে কলকাতায় বাস সমীচীন নয়—স্বামীজী তাই

শীতপ্রধান দার্জিলিঙ শহরে তাঁদের পাঠিয়ে দেন। নিজেও ভগ্নস্বাস্থ্যের উদ্ধারমানসে গুরুভাইদের সঙ্গে কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে আসেন। মাসাবধি দার্জিলিঙে কাটিয়ে স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হওয়ায় তিনি দলবলসহ কলকাতায় ফিরে গেলেন কিন্তু সামান্য ঐ একমাসের বিশ্রাম তাঁর অসুস্থ শরীরের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। পাশ্চাত্যে বহু প্রতিকূল অভিজ্ঞতা, অবিরাম বক্তৃতা ও ক্লাসের ফলে মাত্র চৌত্রিশ বছরেই শরীরে তাঁর নানা উপসর্গসহ ডায়াবেটিস দেখা দেয়। তাই স্থির হল সমগ্র গ্রীষ্ম ঋতুই তিনি আলমোড়ায় পর্বতরাজের কোলে কাটাবেন। আলমোড়ার সৌন্দর্যনিকেতনে এসে স্বামীজীর মনে হিমালয়ে আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা আবার প্রবল হয়ে ওঠে। আলমোড়াবাসীদের অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি বলেনঃ "যদি ভারতের ইতিহাস হইতে হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। অতএব এখানে একটি কেন্দ্র চাই-ই চাই। এই কেন্দ্র কর্মপ্রধান হইবে না—এখানে নিস্তব্ধতা, শান্তি ও ধ্যানশীলতা অধিকমাত্রায় বিরাজ করিবে।"[৬]

স্বামীজীর সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন হল অভাবনীয়রূপে। ১৮৯৬-এর জুলাই মাস থেকে সংঘের ইংরেজী মুখপত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত' মাদ্রাজী ভক্ত রাজম আয়ারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। কিন্তু মাত্র দু বছর পর ১৮৯৮-এর মে মাসে আয়ারের আকস্মিক প্রয়াণে পত্রিকাটি বন্ধ হবার উপক্রম হয়। ঘটনাচক্রে ঐসময় ভারতাগত মিস ম্যাকলাউড, মিসেস বুল ও নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে আলমোড়ায়। সেভিয়াররাও তখন পঞ্জাব ও উত্তরভারত ভ্রমণ শেষে আলমোড়া শহরের 'থম্পসন হাউসে' বাস করছেন। স্বামীজী গুরুভ্রাতা প্রেমানন্দসহ সেভিয়ারদের অতিথি হলেন। ঐসময় তাঁর মনে একটা পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। সন্ন্যাসিসন্তান স্বামী স্বরূপানন্দের সম্পাদনা এবং সেভিয়ারদের ব্যবস্থাপনায় পত্রিকাটি আলমোড়ার ঐ 'থম্পসন হাউস' থেকেই আপাতত প্রকাশিত হতে পারে।

সেভিয়ারদের পক্ষে স্বামীজীর অনুরোধই আদেশ। সানন্দে তাঁরা সম্মত হলেন। স্বরূপানন্দও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় আগস্ট মাসে আলমোড়ার 'থম্পসন হাউস' থেকে মাসিক 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর পুনর্মুদ্রণ শুরু হল।

পত্রিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রার্থনা করে স্বামীজী 'The Awakened India' নামে একটি কবিতা লিখে দিলেন। আচার্যের অজস্র আশীর্বাদ স্বরূপানন্দ ও সেভিয়ারদের দুরূহ কাজে শাশ্বত প্রেরণা হয়ে রইল। হিমালয়ের আশ্রমকে ঘিরে নীরব ধ্যানতন্ময়তা ও ভারতবাসীর কল্যাণসাধনের মহান অভিলাষের কথা সেভিয়াররা 'সাস-ফী'তে স্বামীজীর কাছে শুনেছিলেন। আলমোড়া শহরের ব্যস্ত ক্যান্টনমেন্টে তার রূপায়ণ সম্ভব নয়। স্বরূপানন্দসহ সেভিয়াররা তাই আলমোড়া জেলাতেই আরও নির্জন কোনও পাহাড়ের সন্ধানে রইলেন। তাঁরা জানতেন সত্যসঙ্কল্প স্বামীজীর স্বপ্ন সার্থক হবেই। আকস্মিকভাবেই শুনলেন 'মায়ীপট' নামে একটি গোটা পাহাড় পাওয়া যেতে পারে। জমিটি ইতিপূর্বে সেনাবাহিনীর প্রাক্তন জেনারেল মিঃ ম্যাকগ্রেগরের চা-বাগান ছিল। ১৮৯৯-এর ১৯ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি দিবসে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা স্বামীজীর সেই মহতী ইচ্ছাকে সার্থক করল।

॥ দুই ॥

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম স্বামীজীর অভিনব গবেষণাগার। অদ্বৈতসাধনাকে বিচিত্র কর্মময়তার সঙ্গে যুক্ত করে তিনি যেন পরীক্ষা করতে চাইলেন, বাস্তব জীবনে উভয়ের মিলন সম্ভব কি না। তাঁর সমীক্ষার আরও এক লক্ষ্য—প্রাচ্য ও প্রতীচীর শিষ্যদের জীবনচর্যা থেকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে বাদ দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক অদ্বৈত ভূমিতে মহাসমন্বয়সাধন।

নবীন কেন্দ্রের উচ্চতম আদর্শকে স্বামীজী স্বয়ং এক আপোষহীন প্রস্তাবরূপে পরিচয়পুস্তকে (Prospectus) গ্রথিত করালেন ঃ

> "অদ্বৈতই একমাত্র মতবাদ যাহা মনুষ্যকে তাহার স্বাধিকার প্রদান করে এবং তাহার সমস্ত পরাধীনতা, তৎসংশ্লিষ্ট সকল কুসংস্কার দূর করিয়া আমাদিগকে সর্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা ও কার্য করিবার সাহস প্রদান করে, পরিশেষে উহাই আমাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে সহায়তা করে।
>
> "দ্বৈতভাবের দুর্বলতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া এতদিন এই মহান সত্য প্রচার করা সম্ভব হয় নাই। এই কারণে আমাদের ধারণা—এই ভাব মানব-সমাজের কল্যাণে সম্যক প্রচারিত হয় নাই।
>
> "এই মহান সত্যকে ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীন ও পূর্ণতর প্রকাশের সুযোগ দিয়া মানব-সমাজকে উন্নত করিতে আমরা হিমালয়ের এই ঊর্ধ্বপ্রদেশে—যেখানে ইহা প্রথম উদ্গীত হইয়াছিল—এই অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করিতেছি।
>
> "এখানে সমস্ত কুসংস্কার এবং বলহানিকারক মলিনতা হইতে অদ্বৈতভাব মুক্ত থাকিবে, আশা করা যায়। এখানে শুধু 'একত্বের শিক্ষা' ছাড়া অন্য কিছুই শিক্ষা দেওয়া বা সাধন হইবে না। যদিও আশ্রমটি সমস্ত ধর্মমতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তবুও ইহা অদ্বৈত—কেবলমাত্র অদ্বৈতভাবের জন্যই উৎসর্গীকৃত হইল।"[৭]

আশ্রমের কর্মিরূপে এলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেই আদর্শের রূপায়ণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। মায়াবতীর এই আশ্রম ক্যাপ্টেন ও তাঁর কবিত্বপ্রিয় সহধর্মিণীর জীবনগতিরও আমূল রূপান্তর ঘটাল। উদ্দেশ্যের একতানতা সৈনিকের গতি অব্যাহত রাখে—'ধর্মপথের কর্মঠ সৈনিক' বিবেকানন্দের এই 'অগ্রগামী মরিয়া দল'-ও আদর্শের রূপায়ণে প্রাণপাত করতে প্রস্তুত। আশ্রমের অন্যতম সদস্য কালীকৃষ্ণের (পরবর্তী কালে মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ, শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ) স্মৃতি ঃ

"তখন নীচের বাংলোতে সকলে থাকতুম। আশ্রমের ম্যানেজার ছিলেন ক্যাপ্টেন সেভিয়ার। খগেন (স্বামী বিমলানন্দ) হল সহকারী ম্যানেজার এবং স্বরূপানন্দ 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র সম্পাদক। বুড়ো বাবা (স্বামী সচ্চিদানন্দ) construction (বাড়ীঘর তৈরি,

মেরামত প্রভৃতি)-এর ভার নিলেন। আমার কাজ হল পি. ডবলু. ডি. ডিপার্টমেন্ট—রাস্তা তৈরি, জঙ্গল পরিষ্কার এইসব।

"সকালে চা খেয়ে সকলে কাজে বেরতুম, কুড়ুল কোদাল দা প্রভৃতি নিয়ে। ২/৩ ঘণ্টা hard work চলতো। খুব খিদে পেত। মাদার-এর আলমারি থেকে চুরি করে খেতুম। লোহাঘাটে তখন জঙ্গল, কিছুই পাওয়া যায় না। খাওয়াদাওয়ার বড় কষ্ট ছিল। যা হোক, আমরা সকলেই খুব আনন্দে ছিলুম এবং কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করতুম না।"[৮]

মায়াবতী আশ্রম সমতল থেকে ৬,৮০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। নিকটবর্তী রেল স্টেশনের দূরত্ব ষাট মাইল। সভ্যজগতের সঙ্গে ডাক মাধ্যমে যোগাযোগ অথবা চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা সময়সাপেক্ষ ছিল। আশ্রমবাসীরা কিন্তু এই অসুবিধাগুলিকে তপস্যাবোধে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। নবীন জীবনচর্যায় প্রৌঢ় সেভিয়ার দম্পতিরও অপরিসীম উৎসাহ। দুজনেই আশ্রমের কাজে সারাদিন পরিশ্রম করতেন। সেনাবাহিনীর একদা ক্যাপ্টেন এখন অদ্বৈত আশ্রমের ম্যানেজার। পরিধানে তাঁর এলামাটিতে ছোপানো সামান্য বস্ত্র। আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পূর্বজীবনের সঙ্গে এই স্বেচ্ছাবৃত কৃচ্ছ্রতার কোনও যোগ ছিল না। আশ্রমের সকলে তাঁকে 'পিতাজী' সম্বোধন করতেন—এমনকি মাদার-ও। সরল অমায়িক পিতাজীব কড়া নজর ছিল ব্যয়সঙ্কোচের দিকে অথচ সাবধানতা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে বড়রকমের খরচপত্র এড়ানো ছিল কঠিন। পিতাজীকে এই নিয়ে চিন্তিত দেখলে বুদ্ধিমতী মাদার নিজের ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে কৌশলে অর্থসাহায্য করে আশ্রমের আয়-ব্যয়ের সমতা রাখতেন। তাঁদের পরস্পরের প্রতি সংসারবন্ধনহীন নির্মল ভালবাসা দেখে মনে হত যেন প্রাচীন ভারতের তপোবনবাসী কোনও ঋষিদম্পতি!

এদেশে আসার আগে থেকেই ক্যাপ্টেন ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। আশ্রমবাসীরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য শহরে পাঠাতে চাইলে বলতেনঃ 'জীবনে কোথাও একটানা ছয় মাসের বেশি থাকিনি। এবার স্থির করেছি মায়াবতী ছেড়ে নড়ব না।' পুরোনো রোগ অবহেলায় ক্রমে দুরারোগ্য হয়ে উঠল। সেই অসহ্য যন্ত্রণার মুহূর্তে তাঁকে সামান্যতম আরাম দেওয়ার কোনও উপায় ছিল না। অবশেষে ডাক্তারের পরিবর্তে এক কম্পাউণ্ডারকে পাওয়া গেল কিন্তু অবস্থা তখন আয়ত্তের বাইরে।

মাদার সেভিয়ারের চোখের সামনে তাঁর মহাপ্রাণ স্বামী বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারালেন। শোকাহত আশ্রম সদস্যেরা তাঁদের প্রিয় পিতাজীকে শেষবারের মতো সাজিয়ে দিলেন মাল্যচন্দনে। 'হরি ওঁ তৎ সৎ' মন্ত্র তাঁর বড় প্রিয় ছিল। ব্রহ্মচারীদের বেদধ্বনির মধ্যে ব্রাহ্মণবাহিত তাঁর পূতদেহ মায়াবতী পাহাড়েরই নিম্নতম প্রান্তে নিয়ে আসা হল। সেখানে ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী মৃদু কলতানে বয়ে চলেছে—লতায় পাতায় ঢাকা বড় শান্ত নির্জন সেই স্থান। পিতাজীর ইচ্ছানুসারে তাঁর দেহ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হল—মায়াবতীর মাটিতে মিশে রইল প্রথম শহীদের পার্থিব দেহাবশেষ।

প্রিয়তম আচার্য তখন বহুদূরে মধ্যপ্রাচ্যের কায়রো শহরে। ক্যাপ্টেনের দেহাবসানের কথা যেন কোনও অদৃশ্য উপায়ে তিনি অনুভব করলেন। ভ্রমণ অসমাপ্ত রইল, ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন স্বামীজী। ৯ ডিসেম্বর রাত্রে বেলুড় মঠে ফিরে শুনলেন প্রায় দেড়মাস আগে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার দেহ রেখেছেন। গভীর বিষাদের সঙ্গে মিস ম্যাকলাউডকে

লিখলেনঃ "পরশু রাত্রে (বেলুড়ে) পৌঁছেছি। হায়! তাড়াহুড়ো করে এসেও ফল হল না। কিছুদিন আগেই বেচারা ক্যাপ্টেন দেহত্যাগ করেছেন।" ২৬ ডিসেম্বরের অপর এক পত্রে সেই অন্তরবেদনা আরও স্পষ্ট হলঃ "ইংলণ্ডের সর্বোত্তম শোণিতধারায় ভবিষ্যৎ ভারতের চারা গাছটিকে মহামায়া যেন বারি সিঞ্চিত করছেন—মহামায়ারই জয় হোক।"

অদ্বৈত আশ্রম এবং পত্রিকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও স্বামীজীর দুশ্চিন্তা ছিল। সেভিয়ারদের অর্থানুকূল্যেই মায়াবতীর জমি এবং প্রেস কেনা হয়। এখন স্বামীর অবর্তমানে নিঃসঙ্গ মাদার কি তাঁর পূর্বজীবনে ফিরে যাবেন অথবা কঠিনতর সংগ্রাম স্বীকার করে হিমালয়ে অদ্বৈত সাধনার অঙ্কুরটিকে বর্ধিত হবার সুযোগ দেবেন? স্বামীজীর মনে সেই সংশয় বার বার জেগেছিল।

স্থির করলেন স্বয়ং মায়াবতীতে যাবেন। অসুস্থ শরীর, ডিসেম্বরের শেষে হিমালয়ের শীতও দুঃসহ তবু সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হল না। আচার্যের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততায় যাঁরা চিরদিন নিঃশব্দে সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন তাঁদেরই একজন আজ মায়াবতীর পুণ্যভূমিতে দধীচির মতো নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে মাদারের কাছে প্রিয়তম আচার্য ও পুত্ররূপে বিবেকানন্দের উপস্থিতিই পরম কাম্য। স্বামীজী তাই সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে ৩ জানুয়ারি ১৯০১ মায়াবতীতে পৌঁছলেন। এসে দেখেন মহীয়সী মাদার 'বৈধব্যের শুভ্রতা'য় আরও শান্ত আরও শুদ্ধ হয়েছেন। স্বামীর আরব্ধ ব্রতে তাঁরও সমান দায়—আবেগমুক্ত সেই নারী দুঃসহ শোককে সংযত করেছেন আত্মানুভূতির সাধনায়। মাদারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ধীরামাতাকে স্বামীজী জানালেনঃ 'মিসেস সেভিয়ার খুব দৃঢ়চিত্ত মহিলা এবং খুব শান্ত ও সবলভাবে শোক সহ্য করে নিয়েছেন।'

স্বামীজীর মায়াবতী আগমন আশ্রমবাসীদের জীবনে সর্বোত্তম অধ্যায়। আশ্রমের পাহাড়ের নীচে খাদের কাছে যাত্রীদল যখন পৌঁছেছে, আশ্রমের ঘড়িতে তখন বারোটা বাজার শব্দ হল। সে সময় স্বামীজীর উত্তেজনা ছোট শিশুকেও হার মানায়। মধ্যাহ্নভোজনের শুরুতেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর ইচ্ছায় তাড়াতাড়ি একটা ঘোড়ায় উঠলেন। স্বামী স্বরূপানন্দ ডায়েরীতে লিখেছেনঃ "Temperature 40° in the morning. Swamiji arrived first after we had taken the morning meal, accompanied by Gobin Lal Shah after 12 before one o'clock. He looked very much pulled down."[৯]

শরীর অবসন্ন হলেও স্বামীজী তৃপ্ত। বহুদিনের সাধ হিমালয়ের আশ্রম সার্থক রূপ নিয়েছে। আচার্যকে অভ্যর্থনা জানাতে আশ্রমবাসীদের উৎসাহেরও অন্ত ছিল না। আশ্রমের প্রবেশদ্বারটি ফুল ও চিরহরিৎ পাতায় সুনিপুণ হাতে সাজানো হয়েছে— দুপাশে মঙ্গলকলস। স্বামীজীও অনেকদিন পর মাদার এবং বিরজানন্দ প্রমুখ ত্যাগী সন্তানদের একত্রে দেখলেন। মাত্র পনেরোটা দিনে আশ্রমবাসীদের ধ্যানগম্ভীর জীবনকে হাসি-গল্প, রঙ্গরসিকতা—সেইসঙ্গে নিরন্তর উচ্চ আলোচনা ও চিন্তায় ভরিয়ে দিলেন। এরই মধ্যে সকলে মিলে উঠলেন আশ্রমের অদূরবর্তী ধরমগড় পাহাড়ে। কাছাকাছি পাহাড়গুলির মধ্যে এটিরই উচ্চতা সর্বাধিক—এখান থেকে কেদার-বদরী, ধবলগিরি, অন্নপূর্ণার চিরতুষারাবৃত আদিগন্ত শোভা পরম রমণীয়। স্বামীজী তখনই স্থির করেন একটি ধ্যানের কুঠিয়া সেখানে বানাতে হবে।

আবার হ্রদের ধারে পায়চারি করতে করতে সহজ আনন্দে বলতে লাগলেনঃ "কাজকর্ম সাঙ্গ করে এখানে চলে আসব। কেবল লিখব, আর এই হ্রদের ধারে ছোটবেলার মতো মনের আনন্দে শিস দিয়ে বেড়াব।" এমন সরল প্রাণবন্ত উক্তি বিবেকানন্দের পক্ষেই সম্ভব। তাঁর দিব্যসান্নিধ্য মাদার ও আশ্রমবাসীদের জীবনে আবার উৎসাহ নিয়ে এল। ১৩ জানুয়ারি স্বামীজীর আটত্রিশতম জন্মতিথি আশ্রমবাসীরা খুব উপভোগ করেছিলেন, পরদিন ছিল প্রয়াত পিতাজীর ছাপ্পান্নতম জন্মদিন। স্বামীজীর জন্য বিরজানন্দ একদিন হ্রদের বরফ দিয়ে তৈরি করলেন এক চাঙ্গড়া আইসক্রীম। সকলেই খেয়ে খুব তারিফ করতে লাগলেন। আশ্রমবাসীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল প্রতি সন্ধ্যায় ফায়ার প্লেসের সামনে বসে স্বামীজীর মুখে অদ্বৈত আশ্রমের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী সম্পর্কে নির্দেশগ্রহণ। আশ্রমের আদর্শ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য মাদার ও স্বরূপানন্দকে তিনি বিশেষভাবে সাবধান করে দিলেন। দ্বৈতভাবের উপাসনা—এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণের পটে ধূপ-দীপ পুষ্পনিবেদনও যে অদ্বৈতভাবনার পরিপন্থী এ সম্পর্কেও আশ্রমবাসীদের সতর্ক হতে হবে। আমরা জানি, স্বামীজীর সেই শাস্ত্রানুগ চিন্তা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদাদেবীরও সমর্থন লাভ করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্গুণ সত্তাকে স্বীকার করলে যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার ন্যূনতা প্রদর্শন হয় না সে বিষয়ে শ্রীশ্রীমার ঐতিহাসিক মন্তব্যঃ "আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত—তোমরা সেই গুরুর শিষ্য তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী।"

স্বামীজী সদলবলে যেমন এসেছিলেন, দু সপ্তাহ পর তেমন ফিরেও গেলেন। হিমালয়ের স্তব্ধতায় দেওদারশ্রেণী সাক্ষী হয়ে রইল সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলির।

॥ তিন ॥

আচার্যের মহান প্রেরণা নিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে পথ চললেন মায়াবতীর কর্মী দল। ধ্যান, অধ্যয়ন ও কর্মের ত্রিধারাকে তাঁরা অদ্বৈতের খাতে প্রবাহিত করলেন। সেইসঙ্গে ছিল আর্তনারায়ণের সেবা, দরিদ্র পাহাড়ীদের কল্যাণসাধন। কিন্তু আরও বড় এক চ্যালেঞ্জ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করেছিল।

১৯০২-এর ৪ জুলাই প্রিয়তম নেতার মহাপ্রয়াণে শোকে স্তব্ধ হল মায়াবতী। মাদার সেভিয়ারের মতো সেদিন যাঁরা স্বামীজীকেই আদর্শ করে এদেশে এসেছিলেন, ভারতের কাজে নিজেদের তিল তিল করে নিবেদনের ব্রত নিয়েছিলেন তাঁদের পক্ষে ঐ আকস্মিক দুঃসংবাদ ছিল নিদারুণ। মাত্র দু বছরের ব্যবধানে স্বামী ও পুত্রপ্রতিম আচার্যের জীবনাবসান 'মাদার'-কে আরও অন্তর্মুখ করে তুলল। স্বামীজী তো তাঁকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন! 'একত্বের শিক্ষা'ই যে সেই 'শ্রেষ্ঠ সম্পদ' দিনে দিনে সে বোধ তাঁর স্বচ্ছ হল। বুদ্ধিমতী মাদার জানতেন আশ্রম প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে ক্যাপ্টেন ও তাঁর আর্থিক অবদান থাকলেও প্রেরণা স্বামীজীর। ব্যক্তিগত অধিকারের সামান্যতম দাবিকে মুছে দিয়ে ১৯০৩ সালে তিনি আশ্রমের দায়িত্ব সংঘ পরিচালিত 'ট্রাস্ট বোর্ড'-এর হাতে তুলে দিলেন।

স্বামীজী ও অদ্বৈত আশ্রমকে কেন্দ্র করে সিস্টার নিবেদিতা, কৃস্টিন প্রমুখ বিদেশী

ভক্তদের সঙ্গে মাদার সেভিয়ারের এক অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। চিঠিপত্রে সব সময় সই করতেন 'Old Mother'. পর পর কয়েকটি আঘাত মিসেস সেভিয়ারের শরীর ও মনকে কতদূর অবসন্ন করেছিল ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩-এর পত্রে সিস্টার নিবেদিতা তার বিবরণ দিয়েছেন ঃ "Christine arrived Friday and today Mrs. Sevier and Miss Bell. I do hope the grandmother will arise up in a week or two a new woman. She is utterly worn out, and it is that dreadful form of nerve-prostration that makes one both restless and talkative and mentally active. I am trying Bovril and good food on her and Christine too."[১০]

সে যাত্রায় সিস্টারের স্নেহযত্ন মাদারকে দু মাসের মধ্যেই সুস্থ করে তোলে। মাসখানেক বিশ্রামের পর থেকেই আশ্রমের কাজকর্মের কথা ভেবে তিনি হিমালয়ে ফিরে যাবার জন্য উন্মুখ হন। ৩ মার্চ, ১৯০৩-এর চিঠিতে সিস্টার লিখেছেন ঃ "It has suddenly grown hot and I fear Mrs. Sevier will go. It has been so pleasant to have her here, but the other day Swarup turned up, and I don't feel that she has rested since. She is almost as responsible as if she were at Mayavati."[১১]

কলকাতার দুঃসহ তাপের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে সিস্টার নিবেদিতা ও কৃস্টিন একাধিকবার হিমালয়ের আশ্রমে গিয়েছিলেন। মাদার ছিলেন তাঁদের সকলের প্রিয় 'the same cheery little image of hospitality as ever.'

পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে সুদূর মায়াবতী থেকে চিঠিপত্রে তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮৯৯-এর ৩১ জানুয়ারি নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির সাপ্তাহিক সম্মেলনে মিস ম্যাকলাউড ভারতবর্ষের বিষয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। 'Brahmavadin' পত্রিকার সূত্রে সেই সংবাদ পাওয়া মাত্র সুদূর মায়াবতী থেকে 'জো'-কে উৎসাহ দিয়ে মাদার লিখলেন ঃ "I can well understand how pleased the ladies and gentlemen were to have first hand accounts of places and people in India."[১২]

বিদেশী ভক্তগোষ্ঠী শুধু নয় বহু বিশিষ্ট ভারতীয়ের সঙ্গেও আশ্রমের পক্ষ থেকে অথবা ব্যক্তিগতসূত্রে তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আচার্য জগদীশ বসু ও তাঁর সহধর্মিণী অবলা বসু (মাদার যাঁকে সস্নেহে 'শকুন্তলা' নামে ডাকতেন), সস্ত্রীক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও অনেকে। মাদারের ব্যক্তিত্বে এমন এক আকর্ষণ ছিল যা সহজে ভোলা যেত না। প্রাক্ বিবাহিত জীবনে সরলাদেবী চৌধুরাণী মায়াবতী ভ্রমণে যান। 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন ঃ "আলমোড়া পাহাড়ের উপর বিবেকানন্দ আশ্রমের অধিনেত্রী মিসেস সেভিয়ার একবার বলেছিলেন—আর কিছু না, শুধু যদি জাতীয় গান গেয়ে গেয়ে ফেরো তুমি ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, সমগ্র দেশকে মাতাতে পার। সে কথাটা আমার মনে লেগেছিল। অনেক সময় ভেবেছিলুম, একটি চারণ দল গড়ে ঘুরে ঘুরে গেয়ে গেয়ে দেশকে জাগ্রত করব।" কলকাতায় এলে মাদারও পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন। প্রসঙ্গত মনে পড়ে স্বামী বিরজানন্দের সঙ্গে মাদারের বোলপুর শান্তিনিকেতন

আশ্রম দর্শন, কবিগুরু ও এণ্ডরুজ সাহেবের সহৃদয় সৌজন্যলাভের কথা।

ভারতবর্ষের ঐক্য, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার দায়িত্ব ছিল অপরিসীম। পত্রিকার সম্পাদনা কাজে স্বামী স্বরূপানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন মাদার সেভিয়ার। 'Advaitin', C.E.S. প্রভৃতি ছদ্মনামে পত্রিকার একাধিক সংখ্যায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হত। ১৯১৩ সালে 'The Land of the Mummy' শিরোনামে এমনই একটি ধারাবাহিক রচনায় তাঁর নৈর্ব্যক্তিক কবিমনের প্রকাশ পাঠককে বিস্মিত করে। কায়রোর অদূরবর্তী দিগন্তপ্রসারী মরুভূমির বুকে আসন্ন সন্ধ্যায় ঐতিহাসিক পিরামিডের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: "To see the glory of the sunset at Cairo this is the best position. From the ramparts of the Citadel I watched the sunset bathing the Pyramids in a purple and gold light throwing a glamour over the Western plain, with splashes of intense colour and softer shades melting away into deepest shadows. To witness this scene is to see a dream become materialised."[১৩]

হৃদয় ও মস্তিষ্কের সুষম বিকাশ তাঁকে অসাধারণ করেছিল। অন্যতম আশ্রমসদস্য স্বামী অতুলানন্দ মাদারের প্রসঙ্গে ১৯০৭-এর মে মাসে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "Mrs. Sevier is 'Mother' (as she is called) and a very exceptional woman. The more I know of her, the more I admire her. With a very sweet, loving nature she combines great strength, tact, and wisdom." মাদারের প্রসঙ্গে বহু বছর পরেও স্বামী অতুলানন্দ মন্তব্য করেছেন: "Miss MacLeod and Mrs. Sevier,... both have the capacity to rise above the personal aspect and are not so easily swayed by praise and blame." (Almora, April 5, 1925).[১৪]

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের গৌরবময় অধ্যায় স্বামীজীর 'কমপ্লিট ওয়ার্কস্' প্রকাশনা এবং প্রাচী-প্রতীচীর ভক্তদের তথ্য অবলম্বনে সম্পূর্ণ জীবনী রচনা। এই দুরূহ কাজে সম্পাদক স্বামী বিরজানন্দকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন মাদার সেভিয়ার। স্বামীজীর সুললিত ভাষা যাতে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ থাকে মাদারের অভিনিবেশ ছিল সেইখানে আর স্বামী বিরজানন্দ চাইতেন রচনার ভাবগত শুদ্ধি। গুরুগতপ্রাণ দুই অসম বয়সী মানুষ কী অপরিসীম নিষ্ঠায় সামান্য এক হ্যাণ্ডপ্রেসকে অবলম্বন করে বিপুলায়তন গ্রন্থাবলী একে একে প্রকাশ করেছিলেন সেকথা ভাবলে বিস্ময় জাগে।

নিঃসন্তান মাদারের স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ প্রকাশিত হত সেবা ও দয়ার আকারে। তাঁর একটা নিজস্ব জগৎ ছিল যেখানে আশ্রমের সাধু কর্মী থেকে সামান্য পাহাড়ী কুলি-মজুরেরও অবাধ প্রবেশাধিকার। সামান্য এক আলমারি ওষুধ নিয়ে গরিব গ্রামবাসীদের সাধ্যমত সাহায্য করতেন, কালে সেই নিঃস্বার্থ উদ্যোগ 'মায়াবতী চ্যারিটেবল্ ডিসপেন্সারি'র রূপ নেয়।

বৃদ্ধ বয়সেও সূর্যোদয়ের পর থেকেই তাঁকে আশ্রমের কোনও কাজে ব্যস্ত থাকতে

দেখা যেত। ফুল-ফল-সবজি বাগান নিয়মিত দেখাশোনা করতেন, ফলন অপর্যাপ্ত হলে দরিদ্র মানুষদের মধ্যে অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। বাগানে তাঁর পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনামাত্র আশ্রমের গরুগুলি কোনও এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত, নিজের হাতে তাদের তরকারির খোসা খাওয়াতেন। টাট্টু ঘোড়া মঙ্গল, ছাগল ছানা আর আদরের পোষা ভুটিয়া কুকুর 'গ্লামা' তাঁর স্নেহের রাজ্যে অনেকটাই জুড়ে থাকত।

তীক্ষ্ণ বিচারবোধ তাঁকে স্বাধীন স্বাবলম্বী করেছিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে শ্বাপদসঙ্কুল নির্জন পরিবেশে 'নিজের বাংলো'তে তিনি একাই থাকতেন। আহার্যও প্রস্তুত করতেন নিজের হাতে। ব্যক্তিগত সেবাগ্রহণে 'আশ্রমপীড়া' যাতে না হয় সেদিকে তাঁর চিরদিনই সতর্ক দৃষ্টি ছিল। বৈচিত্র্যহীন সেই নিঃসঙ্গজীবনে স্বামীজীর অক্ষয় স্মৃতি ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। জিজ্ঞাসু কোনও ব্যক্তিকে একসময় বলেছিলেন ঃ 'যখন মন ভারাক্রান্ত হয় আমি স্বামীজীর কথা ভাবি।'

বৈকালিক চা-পর্বে আশ্রমের কোনও না কোনও সদস্য তাঁর সঙ্গে যোগ দিতেন, কলকাতা থেকে সাধুরা এলে মাদারের অতিথিসৎকারে ত্রুটি হত না। সামান্য আয়োজন কিন্তু আন্তরিকতাটুকু অসাধারণ। অভ্যাগতদের মনে সেটিই স্থায়ী দাগ রাখত। মাদারের অকুণ্ঠ দয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে স্বামীজী একসময় লিখেছিলেন ঃ

"মিসেস সেভিয়ার নারীকুলের রত্নবিশেষ ; এত ভাল, এত স্নেহময়ী তিনি। সেভিয়ার দম্পতিই একমাত্র ইংরেজ যাঁরা এদেশীয়দের ঘৃণা করেন না।" অন্যত্রও লেখেন ঃ "ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারের কথা মনে পড়ে—শীতের সময় তাঁরা আমাকে বস্ত্র দিয়েছেন, আমায় নিজের মার চেয়েও যত্নে আমার সেবা করেছেন, ক্লান্তি ও দুঃখের দিনে আমার সমব্যথী হয়েছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই পাইনি। সেই মিসেস সেভিয়ার মানমর্যাদার পরোয়া করেননি বলেই আজ হাজার হাজার লোকের পূজনীয়া।"[১৫]

মাদারের কাছে স্বচ্ছন্দবোধ করতেন বলেই বোধহয় স্বামীজী ও গুরুভাইরা প্রয়োজনে তাঁর অর্থসাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হতেন না। এমনকি শ্রীশ্রীমাকেও মাদার একসময় আর্থিক সহায়তা করেছিলেন। ১৬ নভেম্বর ১৮৯৯-এর পত্রে স্বামী সারদানন্দ মিসেস বুলকে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন ঃ

"You know perhaps Mrs. Sevier used to contribute Rs. 800/- yearly to our Holy Mother. She has written lately, she will have to help a poor sister besides meeting expenses at Mayavati, which has increased a great deal. She has reduced her contribution to Rs. 300/- annually, which with the Rs. 300/- that you are sending and the little which are given by some of the gentlemen here, while Mother is at Calcutta—will be just sufficient to meet her expenses while she returns."[১৬]

শ্রীশ্রীমার সঙ্গে মাদারের সাক্ষাৎ পরিচয়ের কোনও বিবরণ আমরা পাই না। কিন্তু মাদারের উদার ও স্নেহময় প্রকৃতির কথা সন্ন্যাসিসন্তানদের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা নিশ্চয়ই

অবহিত ছিলেন। স্বামী বিরজানন্দকে তিনি লেখেনঃ

"তুমি মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে মিসেস সেভিয়ারের কাছে আছ শুনিয়া পরম সন্তোষ হইয়াছি। মিসেস সেভিয়ার মাতাকে আমার বিজয়ার আশীর্বাদ দিবে।"

কট্টর অদ্বৈতবাদী হলেও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি মাদারের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। নিজেই বলতেনঃ "Of all the perfect men that have appeared on earth I consider him the greatest."[১৭]

স্বামীজী একসময় মাদার ও স্বামী স্বরূপানন্দকে অদ্বৈত আশ্রমের আদর্শে বজ্রদৃঢ় থাকার প্রেরণা দিয়েছিলেন, দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন এই বৃদ্ধা নারী। আটষট্টি বছর বয়সে সেই মহান কর্তব্য থেকে স্বেচ্ছায় তিনি অবসর নিলেন।

১৯১৫ সালে মাদারের মায়াবতী থেকে বিদায় গ্রহণের এক মর্মস্পর্শী ছবি এঁকেছিলেন স্বামীজীর মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত। ঘটনাক্রমে তিনি তখন আশ্রমের অতিথি। ভাবুক মহেন্দ্রনাথ লেখেনঃ "মাদার সেভিয়ার যখন শ্যামলাতালের দিকে চলিলেন—ঝাড়ুদার, মহবুব ঈশাই সেই তালে শ্যামলাতালের দিকে গেল।" তার বউ ঘোমটা দিয়ে মাদারের জন্য চোখের জল মুছত। আর বলত, "মেরা নসিব টুট গিয়া—অর্থাৎ কপাল ভেঙ্গেছে।"[১৮]

কিন্তু দক্ষ বাজনদার জানেন কোন পর্যায়ে গিয়ে থামতে হবে। মাদার সেভিয়ারের সেই অন্তর্দৃষ্টি ছিল। আশ্রমসদস্য স্বামী অতুলানন্দ মাদারের সেই ভাবকে ভাষায় রূপ দিয়েছেনঃ "Everybody, myself included, thought that the place would go to pieces if Mrs. Sevier left. But I now believe that it will go on just as well and, perhaps better without her. This does not mean anything unkind to Mrs. Sevier. You know what I think of her. She made the place. No one else could have done it. But there is a time for everything and everybody, a time that we must step aside and let others take our place. And if we do not step aside then we are pushed aside. That is all there is about it. I mean, a higher power or the law or the Lord, whatever it be, simply removes us and replaces us."[১৯]

দীর্ঘ সতেরো বছর পর ইংলণ্ডে ফিরে গিয়েও বৃদ্ধা সেভিয়ারের দায়িত্ব যেন শেষ হল না। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলেছে। অসুস্থ বোনের সংসারে তাঁকেও পরিশ্রম করতে হত। কিন্তু ধ্যানের মায়াবতীকে তিনি কোনও দিনই ভোলেননি। আশ্রমের জন্য নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন, বড়দিন বা বিশেষ উপলক্ষে অতি স্নেহের সাধু-সন্তানদের কাছে উপহার পাঠাতেন। শোনা যায় ক্রমে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে, স্মৃতিভ্রংশও হয়েছিল। তিরাশি বছর বয়সে হৃদ্‌রোগে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁরই বিশেষ ইচ্ছায় হিন্দুরীতিতে দেহ সৎকার করা হয়। শোকবার্তায় কোনও এক মহিলা মাদারের নীরব সাধনপূত জীবনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে লেখেনঃ 'Mrs. Sevier never preached religion, she lived it.'[২০]

অদ্বৈতসূর্যের সহস্র কিরণধারায় অভিষিক্ত অনন্যা সেই নারী জীবনে লাভ করেছিলেন 'বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ সম্পদ'—একত্বানুভূতি।



প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনসেতু বিবেকানন্দ। সেদিন আমেরিকায় নারী-আন্দোলন কোন পর্যায়ে! বিশ্বমেলায় নারীদের ভূমিকাই বা কি! বিবেকানন্দ সেদিন পূর্ণমুক্তির কোন বার্তা বহন করলেন! কী বিপুল প্রাণাবেগ নিয়ে পাশ্চাত্যের মেয়েরা এসেছিল সেই তরুণ ভারতীয় আচার্যের কাছে! বিখ্যাত অপেরা শিল্পীর জীবনেই বা ঘটেছিল কোন রূপান্তর! ভারতের নারীর জীবনে কেমন করে এল বন্ধনমুক্তির আহ্বান!

সেতু

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

কঠোপনিষদে 'সেতু' বলে গভীর অর্থবহ একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যা ভবসাগরের পারে নিয়ে যায় অর্থাৎ যা মানুষকে মুক্তি দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দকে কি এই অর্থে 'সেতু' বলা যায়? রবীন্দ্রনাথ অবশ্য স্বামীজীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতু বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে স্বামীজী এ দু'ভূখণ্ডের মধ্যে মিলন ঘটাতে চেষ্টা করেছেন। ইংলণ্ডের কবি কিপলিঙ-এর মতে এ দুই ভূখণ্ড কিছুতেই মিলতে পারে না। তাহলে প্রায় সমসাময়িক ভারতীয় কবি কেন স্বামীজীকে এই মূল্যহীন সম্মান দিলেন?

কিন্তু এই সম্মান কি স্বামীজী দাবি করতে পারেন না? স্বামীজী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে সব এক, দুই বলে কিছু নেই। দুই যদি দেখি, তা অজ্ঞানতা। ব্যবহারিক অর্থে দুই আছে, বহু আছে কিন্তু তা যেন এক মাটি দিয়ে তৈরি বহু রকমের পাত্র। থালা, বাটি, গেলাস ইত্যাদি। সত্তা এক, কিন্তু নামরূপের বৈচিত্র্য দিয়ে সত্তা আড়াল পড়ে গেছে। নামরূপই প্রাধান্য পেয়েছে। বস্তু বা ব্যক্তি যাই হোক, তাকে চিনি নাম ও রূপ দিয়ে, তার সত্তা চোখে পড়ে না। যেহেতু আমরা বহু দেখি, তাই মিল বা অমিল, রাগ বা বিরাগ, তাই দল, সম্প্রদায়, জাতি, তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা কর। অর্থাৎ যার অদ্বৈতবুদ্ধি; সে সর্বত্র এক দেখে, দুই দেখে না। শ্রীশ্রীমা বলতেন: 'কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।' এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে শেষ পর্যন্ত আমি দেখব, একা আমিই সর্বভূতে এবং সর্বত্র বিরাজ করছি। আমিই সব হয়েছি। আমিই চোর, আমিই পুলিশ, আমিই হাকিম। আমি যেন বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছি। এক আমিই সব হয়েছি বুঝতে পারলে সংঘর্ষ থাকে না, থাকে প্রেম-প্রীতি, শান্তি, আনন্দ।

স্বামীজী তাঁর গুরুর কৃপায় এই অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করে আঁচলে বেঁধে নিয়ে তথাকথিত 'বিদেশে' গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিদেশে যাবার প্রাক্‌কালে স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে তাঁর বক্তব্য স্মরণযোগ্য। স্বামীজী বলেছিলেন: "হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথা বোধ করতে শিখেছি।" তাঁর হৃদয়টা শুধু বড় হয়ে গিয়েছিল, তা নয়, তিনি

নিজেই 'বড়' হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই ছোট একটি ধূলিকণা, আবার তিনিই হিমালয়, তিনিই সব। তিনি অখণ্ড এক সত্তা যা বিভিন্ন নাম ও রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই 'এক' জ্ঞান যে সত্য, তা তিনি পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে ভালভাবে বুঝতে পারলেন। তিনি দেখলেন মানুষ এক, পৃথিবী এক, আপাতদৃষ্টিতে তাদের মধ্যে যতই বৈচিত্র্য থাকুক। বোধহয় এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেলেন যখন ট্রেনের পরিচয়ে মিস স্যানবর্ন তাঁর বাড়িতে যেচে আশ্রয় দিলেন। এই মহিলার মাধ্যমেই তাঁর হার্ভার্ডের অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে পরিচয় এবং অবশেষে শিকাগোর ধর্মমহাসভায় স্থানলাভ। এই মহিলার স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়বত্তা নিশ্চয়ই তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে পরোপকারবৃত্তি মানুষের স্বভাবসুলভ সংস্কার, কোনও বিশেষ এক দেশ বা জাতির নিজস্ব নয়। তাঁর এই ধারণা আরও দৃঢ় হল যখন মিসেস হেল তাঁকে সন্তানরূপে পরিবারভুক্ত করলেন। বার বার কত মানুষের, কত পরিবারের প্রীতি ও শুভেচ্ছা পেয়েছেন। যেমন আমেরিকায়, তেমনি ইংলণ্ডে। আবার দুর্ব্যবহার যে পাননি তাও নয়। মানুষ এক জায়গায় তাঁর প্রাণরক্ষা করেছে, আর এক জায়গায় তাঁর প্রাণ কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছে। যেমন সর্বত্র হয়। অদ্বৈতবাদী তিনি, উভয়েই তাঁর কাছে সমান। মানুষ এক, পৃথিবী এক, সবকিছু এক—তাঁর এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করে দিল পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা। প্রথমে হয়তো পাশ্চাত্য সম্বন্ধে সন্দেহ, অবিশ্বাস ছিল কিন্তু পরে পাশ্চাত্যকে ভালবেসে ফেললেন।

পাশ্চাত্যের সংঘবদ্ধতা, কর্মদক্ষতা, স্ত্রীস্বাধীনতা, শ্রমশীলতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতি গুণ তাঁকে মুগ্ধ করল। সেদেশের ধনসম্পদও তাঁকে বিস্মিত করল। কিন্তু তাদের জীবনদর্শন তাঁর ভাল লাগেনি। পাশ্চাত্যের জীবনদর্শন কি? আপাতদৃষ্টিতে সে জীবনদর্শন ইন্দ্রিয়সুখ। অতীন্দ্রিয় সুখও যে সুখ, বস্তুত অতীন্দ্রিয় সুখই প্রকৃত সুখ, তার কোনও প্রকাশ সেদেশের দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাওয়া যায় না। সপ্তাহে একদিন চার্চে যাওয়া, সে যেন অনেকগুলি অভ্যাসের মধ্যে অন্যতম। স্বামীজী পাশ্চাত্যকে ভালবেসেছিলেন, তার প্রচুর সম্ভাবনা আছে জেনে। তাই ব্যথিত হয়েছিলেন এই রুচিবোধের স্থূলতা দেখে। তিনি চেয়েছিলেন ভারতের ধর্মচিন্তা পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়ুক। কিন্তু তিনি এও চেয়েছিলেন যে পাশ্চাত্যের গুণগুলি ভারত গ্রহণ করুক।

বস্তুত তিনি বুঝেছিলেন পাশ্চাত্যের যেমন ভারত থেকে অনেক কিছু শেখবার আছে, ভারতও তেমনি পাশ্চাত্য থেকে অনেক কিছু নিতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' দারিদ্র্য, বর্ণবৈষম্য, অশিক্ষা, নারীজাতির প্রতি অবহেলা, সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শোষণনীতি, ভারতকে দুর্বলতম দেশ বলে চিহ্নিত করে রেখেছিল। স্বামীজী তাই পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে ভারতবর্ষে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন। দেশে শিল্পবিস্তার হবে, সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নত হবে—এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। ভারতের উচ্চ চিন্তা যেমন আছে তেমন থাকবে। এ এক অমূল্য সম্পদ। এ বড় গর্বের ধন ভারতের। এক কথায় এই সম্পদকে স্বামীজী 'সত্য' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। স্বামীজী বলতেনঃ ভারত মরে গেলে পৃথিবী থেকে সত্য মুছে যাবে, যত উচ্চ চিন্তা মুছে যাবে। তাই ভারতের বেঁচে থাকা দরকার শুধু নিজের প্রয়োজনে নয়, বিশ্বের জন্যও। এই বেঁচে থাকার জন্যে তার পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানও প্রয়োজন। ভারত

পাশ্চাত্যকে দেবে আধ্যাত্মিক সম্পদ যা সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস, আর তার বিনিময়ে পাশ্চাত্য ভারতকে দেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যা দিয়ে ভারতের মানুষ ভালভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে। এই আদান-প্রদানের মাধ্যমেই পাশ্চাত্য বাঁচবে, ভারতও বাঁচবে।

এক কথায় স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। শুধু পরা বিদ্যায় মানুষ বাঁচতে পারে না, তেমনই শুধু অপরা বিদ্যা দিয়েও মানুষ বাঁচতে পারে না। পরা ও অপরা একই সত্যের এপিঠ আর ওপিঠ। স্বামীজী যেমন আধ্যাত্মিক সম্পদ চেয়েছিলেন, তেমন জাতির অভ্যুদয়ও চেয়েছিলেন। এ-দুয়ের মিলনের মধ্যেই মানুষের মুক্তি। স্বামীজী কঠোপনিষদের সেই 'সেতু'—যে সেতু মানুষের মুক্তিদাতা।

শতবর্ষ পূর্বের এক অসামান্য প্রতিবেদন

রচনা ও ভাবানুবাদঃ গীতা চৌধুরী

ভূমিকা

[উনিশ শতকে শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের বিপুল সাফল্যের কাহিনী সর্বজনবিদিত। কিন্তু ঐ ধর্মমহাসভা যে বিশ্বমেলার অন্তর্গত, তার বহুমুখী উদ্যোগের কথা—বিশেষ করে মহিলা-ভবনের প্রসঙ্গ আজও অনেকেরই অজানা।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশ বৎসরপূর্তি উপলক্ষে আমেরিকার শিকাগো শহরে বিপুল উদ্যমে আয়োজিত হয় বিরাট এক বিশ্বমেলা—World's Columbian Exposition. এই বিশ্বমেলারই একটি অঙ্গ বিশ্বধর্মমহাসভা—World's Parliament of Religions—লেক মিশিগানের তীরে, Hall of Columbus-এ অনুষ্ঠিত হয় এই ধর্মমহাসভার অধিবেশন। পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে বিশ্বসমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হন পৃথিবীর বহু বিশিষ্ট ধর্মমতসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ। এঁদের অন্যতম হলেন 'দৈবনির্বাচিত' হিন্দু প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কণ্ঠনিঃসৃত বিদ্যুদ্‌বাণী সেদিন স্তম্ভিত করেছিল পাশ্চাত্য দেশবাসীকে। মুহূর্তে তারা চিনে নিল তাঁকে, বরণ করে নিল বিশ্বাচার্যের পদে। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে সেদিনের নবীন সন্ন্যাসীটি এক মহাবিস্ময় আর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে নবীন সভ্যতার পীঠস্থান আমেরিকা তেমনি এক আশ্চর্য দেশ। পাশ্চাত্যের জাগতিক সমৃদ্ধিতে বিমুগ্ধ বিবেকানন্দ কিন্তু ভোগবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সম্পর্কে সে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিতে বিস্মৃত হননি। 'ঈর্ষা-দ্বেষ, অপ্রেম, অক্ষমার পরিণাম সংঘাত ও সংহার। শুধু অক্রোধ ও অবিরোধই আনে ঐক্যবোধ ও পরিণামে শাশ্বত শান্তি'—পাশ্চাত্যকে তিনি শোনালেন প্রাচ্যের এই অমৃত বাণী। আহ্বান জানালেন বিশ্ববাসীর কাছে, মুক্ত মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে এসে মানুষে মানুষে মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করতে এবং সেই সেতুবন্ধ রচনার পথে প্রথম পদক্ষেপটি করলেন তিনি স্বয়ং—সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে 'ভগিনী ও ভ্রাতা' সম্বোধন করে। সেই সম্বোধনসূত্রে গ্রথিত হল সমস্ত হৃদয়—বসুধা হল কুটুম্ব আর বিশ্ব হল 'একনীড়'।

সেদিনের অপর এক বিস্ময়—অপার এক বিস্ময়—আমেরিকার নারী। শিক্ষিত, স্বাধীন, স্বনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়ে সুস্থিত, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আমেরিকার মহিলারা স্বামীজীর মনে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করেন। স্বদেশে নারীর এই শক্তিময়ী রূপটি তিনি প্রত্যক্ষ করেননি—দেখেছেন নারীর চরম দুর্দশার রূপ। ১৮৯০ সালে তাঁর প্রিয় ভগিনী যোগেনবালা নিজহাতে, আপন বিপন্ন অস্তিত্বের অবসান ঘটান। এই শোকাবহ ঘটনাটি স্বামীজীর মনে গভীর রেখাপাত করে এবং পরবর্তী কর্মপরিকল্পনায় এই ঘটনার ছায়াপাতও লক্ষণীয়। বস্তুত তিনি অনুভব করেন—ভারতীয় মেয়েদের এই দুর্গত, হীন ও অসহায় অবস্থার কারণ যথার্থ শিক্ষার অভাব। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমে

নারীকল্যাণ সাধন তাঁর কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ বলেই গণ্য হয়। ঠিক তিন বৎসর পর, ১৮৯৩ সালে আমেরিকায় তিনি প্রত্যক্ষ করলেন শক্তিরূপিণী নারী—তাঁর ভাষায় 'সাক্ষাৎ জগদম্বা।' পরবর্তী কালে আমেরিকার নারীদের সম্পর্কে তাঁর উক্তি উল্লেখযোগ্য। জনৈক গুরুভ্রাতাকে এক পত্রে তিনি লেখেনঃ 'এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা। এদের পূজা করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।'

ফিরে আসি বিশ্বমেলাপ্রসঙ্গে—বিশ্বমেলা-প্রাঙ্গণে। লেক মিশিগানের তীরে সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিশাল এই মেলাটি বাস্তবিকই বিশ্বের বিস্ময়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়যাত্রার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আলোয় আলোকময় মেলাপ্রাঙ্গণ। উনিশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মানুষ যত উন্নতি করেছে তার যাবতীয় নিদর্শন মিলবে এই মেলাপ্রাঙ্গণে। টেলিফোন, ফনোগ্রাফ, বৈদ্যুতিক আলো, বিদ্যুৎ-চালিত রেলইঞ্জিন, 'Ferris wheel'—সবই আছে এখানে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে মেলাপ্রাঙ্গণ পরিক্রমা করেন স্বামীজী। ঘুরে ঘুরে শুধু দেখা—তাতেই কেটে যায় দশটি দিন। সবচেয়ে বড় বিস্ময় 'মহিলা-ভবন'। সুপ্রশস্ত এই ভবনটির স্থাপত্য পরিকল্পনা থেকে শুরু করে শিল্পসামগ্রীর বিন্যাস—আদ্যন্ত সবই মহিলাদের স্বহস্ত-নির্মিত। শুধু শিল্পচেতনা নয়, নারীর সংগঠন ক্ষমতারও পরিচয় পেলেন স্বামীজী এই প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে। পাশ্চাত্যের জাগতিক সাফল্যের মূল রহস্যটি তাঁর কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন, এদেশ নারীকে যথোচিত মর্যাদা দিয়ে, শিক্ষার সুযোগ দিয়ে তার অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়েছে। তাই পাশ্চাত্যের এই বিপুল ঋদ্ধি। তিনি যে বিশ্বাস করতেন, যে দেশ যে সমাজ নারীকে সম্মান দিতে জানে না, তার অধঃপতন অনিবার্য! শিক্ষার যাদুস্পর্শে জেগে উঠেছেন পাশ্চাত্যের নারী—তাঁর নিজের দেশের নারীদের জন্যও চাই এই স্পর্শ—চাই শিক্ষা, চাই স্বাধীনতা—পূর্ণ স্বাধীনতা। বেদান্ত বলে, আত্মিক স্তরে নারী ও পুরুষে কোনও ভেদ নেই। তাই বৈদান্তিক বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন সর্বপ্রকার বিদ্যার অর্জনে ও প্রয়োগে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। মহিলা-ভবনে স্বাধীন আমেরিকান নারীদের উদ্যম তাঁকে বিস্মিত করেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধর্মমহাসভা শুরু হবার প্রায় সাড়ে চার মাস আগে মেলাপ্রাঙ্গণে মহিলা-ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয় এবং ধর্মমহাসভা চলাকালীন ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ শিকাগোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবিসম্বাদী সম্রাজ্ঞী, মহিলা-ভবনের পরিচালিকা-পর্ষদের সভানেত্রী শ্রীমতী পটার পামার স্বামীজীকে ঐ ভবনে ভারতীয় নারীদের বিষয়ে বক্তৃতাদানের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। স্বামীজী ঐ সভায় সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ ভাষণে এক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন, 'পূর্ণ নারীত্বের আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা।'

মহিলা-ভবন রূপ নেওয়ার নেপথ্য ইতিকথা এবং তার দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে উদ্বোধন অনুষ্ঠান সভায় শ্রীমতী পটার পামারের ভাষণ এবং কয়েকজন মহিলা বক্তার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ভাষান্তরে **'History of the World's Fair' by Truman Benjamin (New York 1916)** গ্রন্থের প্রতিবেদন থেকে তুলে ধরছি। একশ বছর আগে আমেরিকার নারীসমাজের স্বাধীনভাবনা ও বৈপ্লবিক চেতনার অভিব্যক্তি আজকের নারীকেও বিস্মিত করে। পটার পামারের ভাষণ নারীমুক্তির এক ঐতিহাসিক সনদ। সেক্ষেত্রেও একই জিজ্ঞাসা—'কেন নাহি দিবে অধিকার'?]

মহিলা-ভবন ও তার উদ্দেশ্য

মহিলাদের উপর যে গুরুদায়িত্ব ১৮৯৩ সালের Columbian Exposition-এ অর্পণ করা হয়, পূর্ববর্তী কোনও প্রদর্শনীতে তা হয়নি। নারীর ভাগ্যে এমন সম্মানলাভের

ঘটনা এর আগে কখনও ঘটেনি। মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে পুরুষের অবদানের পাশে নারীর অবদানের স্থান করে দেওয়া—পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে সঙ্গত কাজ হয়েছে। নারীমুক্তির ফলে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে সুফল ফলেছে তার প্রদর্শন ও পুরুষের অবদানের সঙ্গে তার তুলনা খুবই প্রাসঙ্গিক। Philadelphia-র শতবার্ষিকী এবং New Orleans-এর 'তুলা-শতবার্ষিকী' (Cotton Centennial) উপলক্ষে আয়োজিত দুটি প্রদর্শনীর সাফল্যের ব্যাপারেও মহিলাদের সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। 'মহিলাবিভাগ' নামে একটি পৃথক বিভাগ গঠন করে, মহিলারা তাঁদের হাতের কাজের উৎকৃষ্ট নমুনা—যতটা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল, প্রদর্শন করেছিলেন। মহিলাবিভাগটি সংযোজনের ফলে প্রদর্শনীর আকর্ষণ এত বৃদ্ধি পায় যে পরবর্তী কালে এ জাতীয় প্রদর্শনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ স্বীকৃতিলাভ করে। আমেরিকার চারশত বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে 'পরিচালিকা-পর্ষদ' নামে একটি সংস্থা গঠন এরই ফলশ্রুতি।

পূর্ববর্তী প্রদর্শনীগুলি যদিও সফল হয়েছিল, তবু এক্ষেত্রে অর্থাৎ ১৮৯৩ সালের Columbian Expostion-এ পৃথক কর্মপন্থা নিরূপণ করা আবশ্যক বলে বিবেচিত হল। পরিচালিকা-পর্ষদ স্থির করলেন, পূর্বতন পদ্ধতি বর্জন করে নূতন পদ্ধতি গঠন ও নূতন উপযোগিতা সৃজন করবেন। মূল মেলাপ্রাঙ্গণে না করে, একটি পৃথক ভবনে মহিলাদের শিল্পকৃতি প্রদর্শন করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনও কোনও মহল থেকে ঘোর আপত্তি ওঠে। তাই এই সিদ্ধান্ত। আপত্তি তোলেন চারুশিল্প ও কারুশিল্পে সুদক্ষ মহিলার দল। তাঁরা বলেন স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সবার শিল্পকৃতি পাশাপাশি প্রদর্শন করা হোক। তাঁরা আশঙ্কা করেন যে প্রতিযোগিতা যদি শুধু মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয় তাহলে নিকৃষ্টমানের শিল্পকৃতিও অযথা প্রশংসিত হতে পারে—এ তাঁদের অভিপ্রেত নয়। তাঁরা চান প্রদর্শনীটি যখন আন্তর্জাতিক, তখন মূল্যায়নও হোক আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর লক্ষ্য হল উৎকৃষ্টতম কৃতির সম্মানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন ও বাণিজ্যিক চাহিদা বৃদ্ধি। ক্ষুদ্র পরিসরের প্রতিযোগিতায় তা সম্ভব নয়।

এই দাবির ফলে প্রতিটি বিভাগেই মহিলাদের শিল্পকৃতি প্রদর্শিত হয়। বহু কালের ধারণা, শিল্পক্ষেত্রে মহিলাদের উল্লেখযোগ্য কোনও অবদান নেই; প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিল্পী তাঁরা নন, স্থায়িভাবে কাজে যুক্তও নন; তাঁদের কাজ তেমন মূল্যবান নয় এবং প্রদর্শনীতে যোগ দেবার অধিকারটুকু যে তাঁরা পেয়েছেন সেই যথেষ্ট। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করাই ছিল উদ্দেশ্য। প্রদর্শনীটি নারীর যুগব্যাপী অব্যাহত কর্মধারার ইতিহাস ও শিল্পক্ষেত্রে তার গুরুত্ব-নির্ণয়ের এক প্রয়াস। প্রয়াস সার্থক হলে গণচেতনা জাগবে—একই কাজের জন্য মহিলা কর্মী ও পুরুষ কর্মীর অসম পারিশ্রমিক নির্ধারণ করার অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ গড়ে উঠবে। মহিলা-ভবনটি মহিলাদের শিল্পকৃতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে গঠিত একটি অতিরিক্ত কর্মকেন্দ্র (agency)। এর সৃষ্টির মূলে রয়েছে প্রতিভাময়ী নারীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা। প্রদর্শনী চলাকালে মহিলারা যাতে সবরকমের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে। একাধিক মহিলাস্থপতির পরিকল্পিত নকশা থেকে নির্বাচন করা হয়েছে এই ভবনের স্থাপত্য-পরিকল্পনা। দৈর্ঘ্যে চারশ ফুট ও প্রস্থে দুশ ফুট এবং দু লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মিত এই ভবনে প্রবেশের জন্য আছে জলপথ ও

স্থলপথ। বৃহৎ বর্তুলাকার ভবনটি ঘিরে প্রদর্শনী কক্ষ। কক্ষটিতে প্রদর্শিত নারীহস্তের উৎকৃষ্ট মানের শিল্পকৃতি।

প্রাসাদ-শীর্ষের উদ্যান ও যে স্তম্ভটির উপর উদ্যানের ভর সেই স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ নারীমূর্তি—সবই এক নারীর শিল্পভাবনার ফলিত রূপ। ভবনচূড়ার মূর্তি, প্রাচীরগাত্রের চিত্রাবলী, প্রাচীরের তলদেশে খোদিত অলঙ্করণ, দ্বারদেশের কারুকার্য, কারুকার্যশোভিত বিচিত্র বস্ত্রাবরণ সবই নারীহস্তের নির্মিতি। প্রতিটি বস্তু নারীর কর্মশক্তি ও কল্পনাশক্তির সাক্ষ্যবাহী।

সামাজিক সংযোগের প্রধান কেন্দ্রটি এই ভবনে। পাঠাগার, সমিতিকক্ষ ও সুপ্রশস্ত সভাকক্ষ-সম্বলিত এই ভবন। আছে আরও কয়েকটি কক্ষ যা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত—নারীপ্রণীত পুস্তকের পুস্তকাগার, পেশায় নিযুক্ত নারীদের পেশাসংক্রান্ত দস্তাবেজখানা (record room), শিশুমহল, আদর্শ পাকশালা, হাসপাতাল, ধাত্রী-প্রশিক্ষণালয়। সূচীশিল্প ইত্যাদির কক্ষও আছে।

এখানে প্রদর্শিত যাবতীয় বস্তু নারীহস্তের শিল্পকৃতি। কোথাও পুরুষের হস্তক্ষেপ নেই। নারীর সৃজনী শক্তি ও কর্মশক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা এতে দূর হবে বলে আশা করা যায়। অধিকাংশ ক্ষণই গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকার ফলে ও শিক্ষণলাভের সুযোগের অভাবে নারীকে যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তা তাঁরা অতিক্রম করতে সক্ষম, তাও প্রমাণিত হবে।

আদিম সমাজে নারীই প্রথম শিল্পসৃষ্টি করেছিল বলে শোনা যায়। পুরুষ যখন যুদ্ধ ও পশুবধে ব্যস্ত, নারীই তখন গৃহরচনা করে ও শস্য চূর্ণ করে, পশুচর্ম পরিস্রুত করে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে। সূচ, সুতো, মাকু—বয়নশিল্পের ও সূচীশিল্পের যাবতীয় সরঞ্জাম তারই সৃষ্টি। নারীই প্রথম কুম্ভকার। হাঁড়ি-কুড়ি, ঝাঁপি-ঝুড়ি ও সেগুলির অলঙ্করণ—সবই নারীর হাতের এবং এই প্রদর্শনীতে সবকিছুই স্থান পেয়েছে।

এখানে দেখা যাবে প্রাচীন যুগের Sappho ও Hypatia ও অন্যান্য মহিলাদের প্রতিকৃতি এবং (সেকালের) বয়নশিল্পের অবশিষ্ট নমুনা; অঙ্কন, lace ও পর্দার কাজ ইত্যাদির নমুনা। Flanders-এর Matilda-কৃত পুরাকালের পর্দা; Strasburg গির্জার জন্য Sabina ও Steinbach-কৃত মূর্তির অনুকৃতি শিল্প নিদর্শনের অন্যতম। এখানে আছে মঠাধ্যক্ষা Herrad-এর সেই (বিখ্যাত) গ্রন্থ যাতে সমকালীন জ্ঞানের যাবতীয় সম্ভার বিধৃত। আর আছে নারীপ্রণীত গ্রন্থের সুদীর্ঘ এক তালিকা। প্রদর্শনীটি এতই বিস্তৃত যে এটি বিশেষ ফলপ্রসূ হওয়াই স্বাভাবিক। জনমানসে আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টির বিচারে অধিক গুরুত্বের দাবি রাখে এমন-সব প্রদর্শনীর কাছাকাছি এই প্রদর্শনীটির স্থান নির্দেশ করা যায়।

শিল্পকৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পরিবেশন করেছে Great Britain, America ও Germany। England, Scotland, Ireland ও Wales-এর মহিলারা যে যে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত রয়েছেন, তার পরিচয় মিলবে Great Britain-এর শিল্পকৃতিতে। উল্লেখযোগ্য শিল্পনিদর্শন হল রাজনন্দিনী Louise ও Royal School of Needlework-কৃত embroidery গুলি। এই রয়্যাল স্কুলের পৃষ্ঠপোষকতা করেন স্বয়ং

মহারানী ভিক্টোরিয়া ও Tankerville-র Countess, মহারানীর কাটা সুতোয় বোনা table napkin, Kate Greenaway ও Gertrude Bradley-র আঁকা ছবি, রাজদুহিতা Helena-এর হাতের এমব্রয়ডারী করা টেবিল-ঢাক্‌না এবং Schleswig-Holstein-এর রাজকন্যা Victoria-র জন্য মহারানীর নিজের হাতে প্রস্তুত বেতের টুপী এই প্রদর্শনীর শিল্প-নিদর্শনের অন্যতম। ইংলণ্ডের lace অতি উৎকৃষ্ট মানের ও সেখানকার চিত্রও অসংখ্য।

শ্রীমতী পটারের নিজস্ব অফিসকক্ষটি মহিলা-ভবনের অন্যতম অসাধারণ ও আকর্ষণীয় কক্ষ। এই কক্ষের একটি ইতিহাস আছে। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে নিউ জার্সির মৎস্যজীবী মহিলাদের শিল্পকৃতি। এগুলির বিন্যাস করা হয়েছে Newark-আগত শ্রীমতী Charles W. Compton-এর তত্ত্বাবধানে। ইনি হলেন নিউ জার্সির lady alternate দের অন্যতম। একাজে শ্রীমতী Compton বিশেষ আগ্রহী এবং উল্লেখ করা প্রয়োজন যে (প্রদর্শনী সংক্রান্ত ব্যাপারে) মাস কয়েক আগে তিনি শিকাগোতে আসেন। প্রদর্শনীপ্রাঙ্গণে স্থান প্রার্থনা করে আবেদন জানালে কর্তৃপক্ষ তাঁর জন্য স্থান সঙ্কুলান করতে পারলেন না। তখন তিনি শ্রীমতী পটারের শরণাপন্ন হলেন। শ্রীমতী পটারকে তিনি মৎস্যজীবী মহিলাদের জীবনের করুণ কাহিনী শোনান এবং মেলাপ্রাঙ্গণে স্থান পেলে তাঁদের যে কতখানি উপকার হবে, তাও বলেন। তাঁদের সম্বৎসরের বঞ্চনার কাহিনী, বিশেষ করে শীতসমাগমে জলেস্থলে যখন হিমস্পর্শ তখনকার অশেষ দুর্গতির কথা, শ্রীমতী পটারের হৃদয় স্পর্শ করে। তিনি বলেন: "স্থান হবে বৈকি! প্রয়োজন হলে আমার নিজস্ব কক্ষে স্থান দিতে হবে।" প্রেসিডেন্টের অফিসকক্ষে মাছধরার জাল, মাছের চুপড়ি ইত্যাদি প্রদর্শনের প্রস্তাবে পরিচালিকা-পর্ষদের অনেকেই আপত্তি জানান, তবু কাজ এগিয়ে চলল। প্রদর্শনীকক্ষের অলঙ্করণ করা হল ছোটবড় নানা মাপের মাছধরার জাল ও মাছের চুপড়ি দিয়ে। ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল বিশাল এক মাছধরার জাল আর মঞ্চের স্থান নিল শ্রীমতী পটারের desk-এর উপর বিস্তীর্ণ সুবিশাল এক জাল (casting net)। মৎস্যজীবী মহিলাদের জীবনচিত্র তুলে ধরা হল পুতুলের সাহায্যে। নিউ জার্সি আর Salem County থেকে মহিলারা পাঠালেন ঔপনিবেশিক আমলের কতক আসবাব।

মহিলা-ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

নারীকল্যাণকল্পে ১ মের অপরাহ্নে মহিলা-ভবনটি উৎসর্গ করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি দর্শকের মনে বিপুল আনন্দ ও উল্লাসের সঞ্চার করেছিল। বিশ্বমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনও অনুষ্ঠানে এত আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা যায়নি। মহিলা-ভবনের নিজস্ব প্রধান কক্ষেই ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা অতি সঙ্গত হয়েছে। ভবনটিতে পদার্পণ করা মাত্র দৃষ্টি নন্দিত হবে কক্ষের প্রাচীরসজ্জা দেখে। উনবিংশ শতাব্দীর মহিলাশিল্পীর প্রশংসনীয় শিল্পকৃতি দিয়ে প্রাচীরগাত্র সুশোভিত। কক্ষটি দৈর্ঘ্যে (ও প্রস্থে) বিশাল ও কক্ষের স্তম্ভগুলির গায়ে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য। (নয়ন-নন্দন দৃশ্য) আরও আছে—পশ্চিম দিকের প্রবেশ দ্বারের কাছে platform-এর উপরে রয়েছে সারি সারি ফুলের গাছ, পাম জাতীয় গাছ ও টবে পোঁতা নানা রকমের ফুলগাছ। প্রতিটির বিন্যাস অতি শোভন। তারই

উপর শোভা পাচ্ছে Spain ও America-র বিচিত্র বর্ণশোভিত পতাকা। উত্তর-দক্ষিণে দর্শকের আসনের মাঝে মাঝে স্তম্ভগুলির ফাঁকে ফাঁকেও রয়েছে পাম। আর আসন থেকে হাস্যোদ্ভাসিত মুখে তাকিয়ে আছেন উৎসুক দর্শকের দল। 'Hall of Honour'-এর উত্তরপ্রান্তে জড়ো হয়েছেন গায়কগোষ্ঠী—এঁরা পরিবেশন করবেন সমবেত সঙ্গীত, এই উপলক্ষে গীত হবে শুধুই মহিলা সঙ্গীতকারের রচিত গান। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করার জন্য শ্রীমতী পটার উঠে দাঁড়াতেই কক্ষটি ভরে উঠল দর্শকের ভিড়ে। পরিচালিকা-পর্ষদের প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী পটারকে দেখে তাদের সে কি আনন্দ! করতালি দিয়ে হর্ষধ্বনি করে, সাদা রুমাল দুলিয়ে তারা আনন্দ প্রকাশ করল। আসনে বসতেই গুচ্ছ গুচ্ছ (American beauty rose) গোলাপের আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়ে গেলেন শ্রীমতী পটার। তাঁকে খুশি করতে এগিয়ে এলেন একজন, সরিয়ে দিলেন সেই গোলাপের রাশ আর পামগুলি—অমনি দ্বিগুণ উৎসাহে হর্ষধ্বনি করে উঠল দর্শকের দল।

Pennsylvania টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সভানেত্রী পটার, টেবিলের উপরে Washington রাষ্ট্রীয়ভবন থেকে আনা Yew কাঠের তৈরি ব্লক, সোনার পেরেক আর Colorado-র রূপোয় তৈরি রত্নপেটিকা। বাঁদিকে Mexican Onyx-র তৈরি ছোট একটি টেবিলের উপরে রয়েছে সেই হাতুড়িটি—চামড়ার একটি খাপে ঢাকা।

শ্রীমতী পটারের পিছনের আসনে বসা দেশী (অর্থাৎ আমেরিকান) ও বিদেশিনীদের বর্ণাঢ্য সাজসজ্জা ও প্রসাধন যেন সভার অঙ্গে উজ্জ্বল আনন্দের স্পর্শ বুলিয়ে দিল। সেই মহিলামণ্ডলীতে উপস্থিত Veragua-র Duchess মাননীয়া Maria del Pilar Coloney Aguielera, Mme, Mariotti, Lady Aberdeen, শ্রীমতী Bedford Fenwick প্রমুখ বহু বিশিষ্ট মহিলা।

অনুষ্ঠান শুরু হয় Germany-র Weimar অঞ্চলের Frau Ingeborg von Bronsart-এর পদযাত্রা সঙ্গীত দিয়ে। এটি গাইলেন Theodore Thomas-এর গায়কদল। প্রার্থনা-সঙ্গীতে ছিলেন কুমারী Ida Hutton এবং Ellicot বিরচিত নাটকের ভূমিকা-সঙ্গীতে লণ্ডনের কুমারী Frances, পরে কবিতা পাঠ করলেন Chicago বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত W. E. Wilkinson-এর কন্যা কুমারী Flora Wilkinson. কবিতাটির মর্মার্থ হল—"অতীতের মহীয়সী মহিলাদের স্মরণ করি আর স্বাগত জানাই আমরা তাঁদের এই মহিলা-ভবনে। স্মরণ করি স্পেনের রানী ইসাবেলাকে—'রানী' বলে নয়, 'নারী' বলে। অবশেষে নারী পেল তার ভবিষ্যৎ-রচনার অধিকার, ছাড়পত্র মিলল সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্পের রাজ্যে প্রবেশের। এ অধিকার অর্জন আনন্দের ও গৌরবের। আবার এর দায়ও অনেক, সে কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।"

পটার পামারের ভাষণ ও কয়েকজন মহিলাবক্তার ভাষণাংশ

আশা পূরণের লগ্ন সমাগত। দীর্ঘ দুটি বৎসরেরও বেশি দিন ধরে লালিত আশা ধীরে ধীরে স্পষ্ট অবয়ব ধারণ করে অবশেষে বাস্তবের রূপ নিল। আজ মেলাপ্রাঙ্গণ উন্মুক্ত হল। আমাদের প্রয়াসের ফলিত রূপ আজ বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচনের অপেক্ষায়। এই

রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে রাজ্যপর্ষদের এবং বিদেশের কর্মতৎপর বহু সমিতির সক্রিয় সহযোগিতায়। মহিলা-ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে সেইসব পর্ষদ ও সমিতির মাননীয় প্রতিনিধিরা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন। তাঁদের স্বাগত জানাবার সম্মানলাভে পর্ষদ ধন্য।

আমরা অতিক্রম করে এসেছি অজানা-অচেনা পথ। যাত্রাপথে ক্লান্তিকর বিলম্ব ঘটেছে, (নৈরাশ্যের) কালো মেঘ আমাদের পথ আচ্ছন্ন করেছে। মনে ভয় জেগেছে বুঝি আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবু এগিয়ে চলেছি বিবাদ-বিসংবাদ এড়িয়ে, শান্তি রক্ষার মানসে সবার তুষ্টির চেষ্টা করেছি যাতে আমাদের নামে বৈরিতার কোনও অভিযোগ না ওঠে। অবশ্য আমাদের কাজে স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি সারা বিশ্বের মহিলাদের কাছ থেকে। তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি আমাদের কর্মভার অনেকখানি লাঘব করেছে—আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনেক বিস্ময় সঞ্চিত হয়েছে। জানলাম জাত-ধর্মে, ভাষায়, রাষ্ট্রব্যবস্থায়, রুচি-প্রকৃতিতে ও বাহ্য আচরণে ভিন্ন মানুষ, তার ভাবনায় অভিন্ন। আর এই জানা—এই গভীর উপলব্ধিই হল আমাদের অন্যতম বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। সভ্য জগতের মানুষ আজ একই ভাবনায় ভাবিত—একই সমস্যার সমাধানে নিরত। সমস্যার সমাধানকল্পে নানা তত্ত্বের উদ্ভাবন হয়েছে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল—এগুলির সাফল্য বা ব্যর্থতা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শিল্প ও সমাজসংক্রান্ত বিষয়গুলি। তাই আজ পৃথিবীর সর্বত্র সর্বস্তরের মানুষ—ছাত্র, শ্রমিক, রাজনীতিক, আর্থ-রাজনীতিক ও মানবদরদী—এসব বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও বিচার বিবেচনা করছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পায়নের দৌলতে ভোগ্য পণ্য সুলভ হয়েছে সত্য কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান আশানুরূপ উন্নত হয়নি। জীবন-সংগ্রাম আজও সুকঠিন। জনাকীর্ণ শিল্প এলাকা, কলকারখানা ঘিরে ঘন জনবসতি, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রাণধারণের প্রাণান্তকর প্রয়াস, মনুষ্যত্বের পক্ষে গ্লানিকর পরিবেশে বাস—সর্বত্র সেই একই চিত্র। অধিকাংশ সমস্যার সমাধানে সামন্ত যুগ থেকে আমরা বিশেষ এগিয়ে নেই—এ যেন প্রগতিগর্বে গর্বিত বর্তমান যুগের প্রতি তিরস্কারের এক তীব্র তর্জনী।

শ্রমিকের, বিশেষত নারী ও শিশু-শ্রমিকের পারিশ্রমিকের উপর এর প্রভাবটুকু বাদে এসব গুরুতর বিষয় আমাদের আলোচনার পরিসরভুক্ত নয়। নারীর অধিকারের প্রতি বহু যুগের নীরব উপেক্ষা, নারীর স্বনির্ভরতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে চরম প্রতিকূলতাই হল সমাজের সবচেয়ে বড় অবিচার, সবচেয়ে নিষ্ঠুর অন্যায়। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করা নারী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান কঠিন। কর্মক্ষেত্রে অদক্ষতা বা অযোগ্যতার কারণে কর্মচ্যুতির আশঙ্কা উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান। তাছাড়াও, শিল্পসংস্থার কাজে নারীদের নিযুক্তির ব্যাপারে সামাজিক সমর্থনের অভাব স্পষ্টতই নারীর জীবনসংগ্রাম কঠিনতর করে তুলেছে।

নারীর যথার্থ স্থান গৃহে। গৃহের আঙ্গিনা অতিক্রম করে, পুরুষের পাশে স্থান করে নেবার বাসনা, পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে শিল্পোদ্যোগে যোগ দিয়ে স্বাধীন উপার্জনের চেষ্টা নারীসুলভ তো নয়ই, বরং অকল্যাণকর—রক্ষণশীলদের এই মনস্তত্ত্ব নারী-স্বার্থের প্রতিকূল।

নারীর প্রয়োজন ও তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে উৎপাদনকারীরা নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেন ও তাদের শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা দেন না। ফলে উৎপাদনকারীর হাতে আসে প্রচুর মুনাফা আর নারী হন তার লোভের শিকার। তবু যে হতাশায় ভেঙ্গে না পড়ে, অনশন-অর্ধাশন বরণ করে নিয়েও অনেকে সম্মানজনক পেশা আঁকড়ে রয়েছেন, এ তাঁদের অনমনীয় দৃঢ়তা ও নৈতিকতার পরিচায়ক। এঁরাই হলেন জীবনসংগ্রামের প্রকৃত বীরাঙ্গনা—চরম প্রতিকূল পরিবেশে, পরম নিষ্ঠা ও ধৈর্য সহকারে যে শিল্পসামগ্রী তাঁরা উৎপাদন করেছেন নানা কর্মশালায় ও কল-কারখানায়, সেগুলি আমরা সগর্বে প্রদর্শন করছি এই বিশ্বমেলায়।

পর্ষদের কাছে বারে বারে প্রশ্ন তোলা হয়েছে পেশার প্রয়োজনে গৃহাঙ্গন ছেড়ে, কর্মজগতে নারীর প্রবেশ সঙ্গত কিনা—এ বিষয়ে পর্ষদের কি অভিমত। প্রশ্নকর্তা বিগত যুগের নারী-ত্রাতা বীরপুরুষের বিরল প্রতিভূ। নারীকে এঁরা দেখেন স্বপ্নময় কাব্যিক দৃষ্টি দিয়ে—এঁদের দৃষ্টিতে নারী সংসারের পবিত্র বেদীতে অধিষ্ঠিতা দেবী, সংসারে যাঁর অসীম ও সুমহান প্রভাব। হায়, কবে বিলীন হয়েছে সে কাল! তাহলে আমাদের বলতেই হয়, যে নারী একটি সুখের সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রীর ভূমিকা পালন করছেন তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য সম্পাদন করছেন এবং কোনও কলকারখানা বা অন্য কোনও কর্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রলোভনে তিনি প্রলুব্ধ হবেন না। কিন্তু এঁদের মতো ভাগ্যবতী সংসারে কজন? আদর্শবাদীরা সম্ভবত দৈনন্দিন জীবনে শুধু এঁদেরই সংস্পর্শে এসেছেন। চোখ মেলে তাকালে এঁরা দেখতে পেতেন, জানতে পারতেন পৃথিবীর অগণিত সাধারণ শ্রমিক ও নারী-শ্রমিকের (শোচনীয়) অবস্থা। তাঁরা জেনে অবাক হতেন যে স্বভাবে কোমল রমণীকুলের অনেকেই এমন আদর্শ (বাসযোগ্য) পরিবেশে বাস করেন না—তাঁদের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, তাঁরা সবাই সংসারসাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী নন। কোনও পুরুষের সবল, সপ্রেম বাহুর বেষ্টনে তাঁরা বেষ্টিত নন—রূঢ় বাস্তবের পরুষ স্পর্শ থেকে তাঁদের আবৃত করে রাখে না কোনও পুরুষহস্ত। তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবকে মেলানো যায় না আর যায় না বলেই হয়তো তাঁরা ক্ষমা করবেন অনাথা সন্তানবতী সেই নারীদের যাঁরা সন্তানের মুখে অন্ন জোগাবার দায় অস্বীকার না করে, কর্মশালার দ্বারে এসে দাঁড়ান কর্মপ্রার্থী হয়ে। মার্জনা মিলবে হয়তো মদ্যপের ও অন্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রীদেরও। উপার্জন করতে না পারলে যে এঁদের অনাহারে মৃত্যু অবধারিত। এঁদের উপার্জনের প্রয়োজন এতই স্পষ্ট, এতই জরুরি যে এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা যায় না। উপার্জন ভিন্ন উপায়ান্তর নেই এঁদের—হয় উপার্জন, নয় অনশন। শিল্পসংস্থায় সর্বত্র মহিলাকর্মীরা নিযুক্ত রয়েছেন অবমাননাকর নিম্নমানের কাজে। এঁদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়, ফলে উৎপাদনকারীদের লাভের পরিমাণও নেহাৎ মন্দ নয়।

সুতরাং কল্পনার জগৎ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বাস্তবের মুখোমুখি হতে হবে ও বাস্তবের মোকাবিলা করতে হবে। সমাজে মহিলাদের স্থান ও তাঁদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কোনও সঠিক, সঙ্গত ও সার্বিক ধারণা আমাদের নেই। তাই জনমানসে মহিলাদের অধিকার, তাঁদের দায়-দায়িত্ব, তাঁদের স্বনির্ভরতার প্রয়োজন, পরিবার প্রতিপালনের দায়ে তাঁদের শরিকানা ইত্যাদি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলবার চেষ্টা আমরা করছি—এই

মেলার মাধ্যমে। পরিচালিকা-পর্ষদ কর্মরত মহিলাদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণে উদ্যোগী হয়েছেন। এই উদ্যোগ সফল হলে, ভর্তা (স্বাভাবিক প্রতিপালক) বা স্বামীর মৃত্যুতে অকস্মাৎ যাঁদের স্বনির্ভরতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে শুধু তাঁদেরই নয়—মজুর-মিস্ত্রি, কারিগর ও নানা শিল্পে রত স্বামীদের সঙ্গে সমান তালে কাজ করে পরিবার প্রতিপালন করে চলেছেন যেসব স্ত্রী, তাঁদের সংখ্যাও জানা যাবে।

নারীকে কর্মজগতে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চান যাঁরা, তাঁরা (প্রধানত) দুটি শ্রেণীভুক্ত। উভয় শ্রেণীই নিজ মতের সপক্ষে আপাত অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন। প্রথম শ্রেণী হলেন আদর্শবাদী—এঁদের মতে নারীর কর্মক্ষেত্রের পরিধি গৃহ-পরিসরের মধ্যে, নারী সযত্নে পালনীয়া ও রক্ষণীয়া। এ মতের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। অপর শ্রেণীর মত হল, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়োগের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেবে, পরিবার প্রতিপালনের জন্য যেটুকু উপার্জন পুরুষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, তাও হ্রাস পাবে এবং তাঁদের কর্মক্ষমতাও হ্রাস পাবে। এঁদের অধিকাংশই হলেন কলকারখানায় কর্মরত পুরুষ আর কতক আর্থ-রাজনীতিক। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তি-সঙ্গত বলে মনে হলেও, মত দুটির কোনটিই বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া যায় না। আমরা প্রশ্ন তুলব—নিজস্ব সম্পত্তির অধিকারিণী নন বা উপার্জনক্ষম, পরিবার প্রতিপালনে ইচ্ছুক, প্রেমময় স্বামীর সোহাগিনী স্ত্রী নন, এমন অগণিত অনাথা ও অভাগিনী নারীর তাহলে কি গতি হবে? পৃথিবীর সম্ভবত তিন-চতুর্থাংশ নারীর স্বার্থ সেক্ষেত্রে ক্ষুণ্ন হবে। তাঁরা কি তাহলে উপবাস বা আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন? স্বাধীন উপার্জনের পথ রুদ্ধ করে দিলে, তাঁদের জন্য আর কোন পথই বা খোলা থাকে?

আমাদের প্রাচ্যদেশীয় প্রতিবেশীরা পরিস্থিতির পর্যালোচনায় যে পরিমাণ যুক্তি-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন আমরা ততখানি পারিনি। পরিস্থিতির মোকাবিলায়ও তাঁরা সমান সুযুক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং (ক্ষেত্রবিশেষে) প্রয়োজনবোধে বীরোচিত ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধাবোধ করেননি। কোনও কোনও (প্রাচ্য) দেশ সমস্যার সমাধান করে নিয়েছেন বহুবিবাহ প্রথার মাধ্যমে। এই প্রথা অনুসারে, একজন পুরুষ যত সংখ্যক স্ত্রীর ভরণ-পোষণে সক্ষম তিনি তত সংখ্যক বিবাহে অধিকারী। আবার কোনও কোনও দেশে সদ্য-বিধবাদের স্বামীর সঙ্গে সহমরণের প্রথা প্রচলিত আছে। চীনদেশ সতর্কতামূলক একটি ব্যবস্থা নিয়েছে—সেদেশে কন্যাসন্তানের সংখ্যাধিক্য হলে তাদের সলিল সমাধি দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ব্যবস্থা বরং কম নিষ্ঠুর, এতে তবু যুক্তি আছে। কিন্তু যে ব্যবস্থায় কন্যাসন্তানের বাঁচার অধিকার স্বীকার করে নিয়েও তার উপার্জনের অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে চির দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতে বাধ্য করা হয়, তাতে যুক্তি কোথায়? নারী বলে তার উপার্জনের অধিকার কেড়ে নিতে হবে? এ যে ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথারই সমতুল্য। এক্ষেত্রে স্ত্রীজাতি নিম্নবর্ণ আর পুরুষ হলেন উচ্চবর্ণ। এই উচ্চবর্ণের ভুক্তাবশিষ্টে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণধারণের জন্যই কি নারী-জন্ম? আজন্ম দারিদ্র্যভোগের দুর্ভাগ্য কেন মেনে নেবে তারা? এক পক্ষ আরোপ করেছে ও অপর পক্ষ মেনে নিয়েছে এ ব্যবস্থা বিধির অমোঘ বিধান জেনে!

পৃথিবীর অপর প্রান্তে বালবিধবা ও আরও কত শত হতভাগিনীদের প্রতি যে নির্মম অন্যায় অবিচার হয়ে চলেছে তা শুনে আমরা শিহরিত হয়ে উঠি আর আমাদের নিজ

দেশে, নিজ সমাজে আমাদের নিজেদের আচরণে যে ক্রটি ও অসঙ্গতি রয়েছে তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। এগুলি বড়ই কাছের কি না! আবেগসর্বস্ব তত্ত্ব-বিলাসীদের উচিত ছিল তত্ত্বালোচনা কমিয়ে (কর্মে নিযুক্তির ক্ষেত্রে) শর্তাদি স্থির করা ও সেগুলি প্রয়োগ করা। সহায়সম্বলহীন নারীর সুরক্ষার ব্যবস্থা করার মতো—নারীর আত্মবিকাশ ও আত্মরক্ষার পথনির্দেশ করার মতো যথেষ্ট সময় ও সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন। নারীর দাবি শুধু পথের ইঙ্গিত, শুধু পথ চলার অধিকার, তার বেশি কিছু নয়। যে ব্যবস্থায় বিপুলসংখ্যক অসহায়া নারীকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়ে মুষ্টিমেয় সুরক্ষিত ভাগ্যবতীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়, তার প্রতি আমাদের তিলমাত্র শ্রদ্ধা নেই। এ মতবাদের ক্রটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা নিয়ে, শুধু সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসে নয়, কালকারখানায় সর্বত্র নির্ভীক, নিঃসঙ্কোচ আলোচনার একান্ত প্রয়োজন। যতক্ষণ আমরা তা না করতে পারছি, ততক্ষণ এ আলোচনা মুলতুবি থাক।

আবেগসর্বস্বের দল আবার সোচ্চার হবেন। তাঁরা প্রশ্ন করবেনঃ 'নারী কি তবে পূজার বেদী ছেড়ে নেমে আসবেন বাস্তবের কঠিন ভূমিতে?' আমাদের উত্তরঃ 'আসবেন বৈকি! হাজারবার আসবেন।' অনুসন্ধান করে যদি দেখা যায় বাস্তবিকই কেউ পূজার বেদীতে আসীন, তাকেও আমরা স্বেচ্ছায় বলবঃ 'নেমে আসুন, এসে দাঁড়ান আপনার অভাগিনী ভগিনীদের পাশে, ওদের সাহায্য করুন উঠে দাঁড়াতে।' মুষ্টিমেয় মহিলার জন্য পূজাবেদী প্রতিষ্ঠার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি কাম্য সমগ্র নারীজাতির স্বাধীনতা ও তাদের প্রতি সুবিচার। অনুমতি দিলে বলি, ব্যক্তিগতভাবে আমি নারীপূজার মতবাদে বিশ্বাসী নই। কারণ প্রকৃত নারীপূজার বাস্তব দৃষ্টান্ত কখনও আমার চোখে পড়েনি আর তাছাড়া যাঁরা এ মতবাদের সমর্থক তাঁদের মনোগত অভিপ্রায় সম্পর্কে আমি যথেষ্ট সন্দিহান। এ নীতি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বা বন্ধুতে বন্ধুতে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক সূচিত করে না। তাঁদের স্থান হবে পাশাপাশি, তাঁরা একে অন্যকে সাহায্য করবেন নিজস্ব গুণ, ক্ষমতা বা দক্ষতা দিয়ে—তাঁরা হবেন পরস্পর-পরস্পরের পরিপূরক। পুরুষ স্বভাবত নারী সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন আর নারীর মনেও আছে পুরুষের শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা। এ ধারণা আবহমানকালের—সচেষ্টভাবে এর সংরক্ষণের কোনও প্রয়োজন নেই।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে, সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কারণে, যদি স্থির করা হয় যে নারীকে শিল্পক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা হবে যাতে শিল্পজাত লভ্যাংশ পুরুষেরই হস্তগত হয়, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, নারী ও শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায় তবে কার? সাম্য ও ন্যায়ের নীতি অনুসারে সে দায় অবশ্যই পতি বা পিতার এবং তাঁদের অবর্তমানে সে দায় রাষ্ট্রের—শিশু ও নারীকে সসম্মানে ও স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার দায় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রতেই বর্তায়। এই শ্লথ, বিলম্বিত ন্যায়নীতি যদি স্বীকৃত হয় তবু এযুগের আধুনিক নারী প্রসন্নমনে তাকে স্বাগত জানাবেন বলে মনে হয় না। কারণ স্বাধীনতার স্বাদ তাঁরা জেনে গেছেন এবং স্বেচ্ছায় সে স্বাধীনতা তাঁরা ত্যাগ করবেন না। অসহায়, পরনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার সাধ আর তাঁদের নেই। আত্মশক্তির সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন এবং সে শক্তির চর্চা করে ও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তাঁরা আনন্দ পেতে চান। তাঁদের এই মানসিকতা আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা আধুনিকযুগ ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ও ব্যক্তিত্ববিকাশের অধিকার দানে আগ্রহী। অকৃপণ প্রকৃতির অজস্র দান নারীর ভাগ্যেও

জুটেছে। বিধিদত্ত সেই দানের, নারীর অন্তরে সুপ্ত সেই গুণাবলীর চর্চা করে নারী যাতে সুখী হন তার সুযোগ করে দেওয়াই—নারীর জন্য শিক্ষা ও শিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেওয়াই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে অজ্ঞতা অমার্জনীয়। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির অপচয় পরিণামে ব্যয়বহুল। এ অপচয় কিছুতেই আমাদের সইবে না।

তাই, আমরা চাই নারীর জন্য সুশিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। নারীকে আপন ভাগ্য জয় করে নেবার অধিকার দিতে হবে যাতে সুদিনে, দুর্দিনে সে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করে চলতে পারে। শুধু কলকারখানার কাজের জন্য বা বৃত্তিগত শিক্ষার জন্য নয়, প্রধানত পরিবারে তার ভূমিকা—গৃহে কর্ত্রীর ভূমিকা পালনের জন্য নারীকে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে। গার্হস্থ্যজীবনে কর্ত্রীর ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুতিই হল নারীর সকল কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এর জন্য চাই উচ্চতম ও মহত্তম শিক্ষা। এযুগে যুক্তিবিহীনা, অমিতব্যয়িনী, স্বেচ্ছাচারিণী গৃহিণী বা জননীর কোনও স্থান নেই। এযুগ যুক্তিবাদের যুগ। স্ত্রীরূপে ও জননীরূপে তার ভূমিকা পালনের দায় নারীর হাতে ন্যস্ত। সে দায়িত্বপালনে প্রস্তুত নারীর কাছে কোনও পাঠক্রমই অতিরিক্ত গুরুভার বলে মনে হবে না।

নারী তার কর্মকুশলতার পরিচয় না দেওয়া পর্যন্ত—বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সাফল্যের স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত তার যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন হবে না, একথা উপলব্ধি করেই আমরা তার শিল্পদক্ষতার ও নানাবিধ কাজে তার পারদর্শিতার নমুনা তুলে ধরেছি এই মেলাতে। আমরা বিশ্ববাসীর মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে চাই যে ক্ষমতা বা দক্ষতার ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষে কোনও ভেদ নেই। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে মানুষ বিভিন্ন ক্ষমতার অধিকারী। প্রয়োজনের তাগিদে নারীর শক্তির যেটুকু বিকাশ ঘটেছে তাতেই প্রমাণ মিলেছে যে পুরুষের চেয়ে নারী, ভ্রাতার চেয়ে ভগিনী কোনও অংশেই কম নন। গুণ বা ক্ষমতা উভয়েরই সমান এবং অনুরূপ সুযোগ, উৎসাহ ও আনুকুল্য পেলে উভয়েই সমাজে সমান প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারেন এবং সমান প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন।

শিল্পকৃতির মূল্যায়নে পর্ষদ আবেগকে প্রশ্রয় দেয়নি। নারী বলে তাদের শিল্পের অতি-মূল্যায়ন হয়েছে, এমন যেন কেউ মনে না করেন। আমরা স্বেচ্ছায় স্বীকার করছি যে সভ্যতার অগ্রগতিতে—শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে নারীর চেয়ে পুরুষের অবদান অনেক বেশি। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য ছিল পুরুষের কুক্ষিগত। এসব ক্ষেত্রে তার দায়িত্বপালনের জন্য পুরুষ নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছে সযত্নে। ফলে গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এবং ভাবসম্পদের ভাণ্ডারে তার অবদান নিঃসন্দেহে নারীর তুলনায় ঢের বেশি। তবু কিছুসংখ্যক প্রতিভাশালিনী নারীজন্ম-জনিত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে, বিশ্বের সম্পদ-ভাণ্ডারে নিজস্ব অবদান রেখে গেছেন, আপন মূল্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন পৃথিবীর বুকে। মানবকল্যাণে তাঁদের অবদান অতুলনীয়।

নবনির্মিত মহিলা-ভবনটি নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন। স্থানাভাবে সেখানে দেশবিদেশ থেকে প্রেরিত অপূর্ব শিল্পকৃতির সবগুলি প্রদর্শন করা গেল না—এ আমাদের বড় রকমের একটি আক্ষেপ। প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত শিল্পকৃতির গুণমানের উৎকর্ষ থেকেই বোঝা যাবে কোন মানের শিল্প-সামগ্রী আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। মেলার আয়োজনে বিদেশের

সহযোগিতা কামনা করে নিমন্ত্রণ পত্র যখন আমরা পাঠাই, সদ্য-নিযুক্ত প্রতিনিধিরা সন্দেহের হাসি হেসে বলেছিলেন (বিশেষ কিছু প্রত্যাশা না করতে): 'ওদেশে মহিলারা এ ধরনের কাজ করেন না, ওঁরা আমাদের সাহায্য করবেন না, সামাজিক কাজের বাইরে অন্য কোনও কাজে মহিলাদের যোগ দেওয়া ওসব দেশে রীতি-বিরুদ্ধ।' কিন্তু আমাদের সংক্ষিপ্ত ও আনুষ্ঠানিক চিঠির জবাবে তাঁদের কাছ থেকে যে সাড়া পেলাম, তাঁদের হাতের কারিগরী কাজের যে নমুনা তাঁরা পাঠালেন তারপরে আর কোনও ব্যাখ্যারই প্রয়োজন রইল না। তাঁরা তৎক্ষণাৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়ে গেলেন। বুদ্ধিমতী ও হৃদয়বতী মহিলাদের সুষ্ঠু সমিতি গড়ে উঠল—অসহায়া, অভাগিনী ভগিনীদের চিন্তা ভুলে, এঁরা শুধু আপন সুখে সুখী হয়ে থাকতে পারলেন না। মেলার কাজে ওঁরা আমাদের সাহায্য করেছেন, আমাদের কাজের প্রশংসা করেছেন আর পাঠিয়ে দিয়েছেন ওঁদের সংগৃহীত বিপুল শিল্পসম্ভার। প্রধানত সূক্ষ্ম lace, কারণ ওঁরা বুঝতে পেরেছেন যে ওঁদের দেশের মহিলাদের হস্ত-শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের নূতন সুযোগ এখানে মিলবে। রাশিয়ার মহিমময়ী সম্রাজ্ঞীর ও ইটালির রানীর এই ছিল আন্তরিক উদ্দেশ্য। এঁরা উভয়েই প্রগতিবাদী—নিজ নিজ দেশে নারীকল্যাণ সাধনে তাঁদের প্রয়াসেই তার প্রমাণ মেলে। তাঁদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের দেশের কৃষক রমণীদের হস্তশিল্পের বিপুল-সম্ভার প্রেরণ করেছেন। রানী Margherita-র নিজ হাতে বোনা lace এই মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

আমাদের দেশে পরিসংখ্যান যতটা জনপ্রিয়, ইউরোপে ততটা নয়। তবু বেলজিয়মের মহিলাসমিতি আমাদের অনুরোধে, ওঁদের দেশের শিল্পসংস্থা ও নারীদের অবস্থা সম্পর্কিত পরিসংখ্যানমূলক তথ্য পরিবেশন করে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন। সমিতির প্রেরিত প্রতিবেদনগুলি সুসম্পর্ক, তালিকা (chart) ও বর্ণনার (monograph) আকারে সেগুলির পরিবেশনা সুশোভন এবং নিজস্ব ব্যক্তিগত চেষ্টায় সংগৃহীত সামগ্রীর বিবরণ অনুপুঙ্খ। এমন মূল্যবান তথ্যসম্ভার ওঁদের দেশে আগে কখনও সংগৃহীত হয়নি। সংগৃহীত তথ্যের পরিমাণ সমিতির সদস্যদেরই বিস্মিত করেছে।

প্রবল-প্রতাপান্বিতা ইংলণ্ডের রানী নিজহস্তের শিল্পকৃতি প্রেরণ করেছেন ও জানিয়েছেন যে মেলা ইত্যাদিতে যদিও তিনি সাধারণত আগ্রহী নন, তবু এগুলি তিনি প্রেরণ করেছেন পর্ষদের কাজে তাঁর সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ। ইংলণ্ডের সমিতির তালিকাভুক্ত বিষয় ও প্রদর্শনীয় বস্তুর অন্যতম হল নারীশিক্ষার জন্য সনির্বন্ধ এক আবেদন—এর তাৎপর্য গভীর।

স্পেনের রানীর অস্থায়ী প্রতিনিধি (Queen Regent) প্রেরণ করেছেন সেদেশের প্রয়াত এক রাজার স্মৃতি-বিজড়িত কয়েকটি বস্তু—যেহেতু প্রয়াত সেই রাজার নাম আমাদের মার্কিন মুলুকের আবিষ্কর্তার নামের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার চেষ্টায় প্রাচ্যদেশও পিছিয়ে নেই। তাদের সাহায্যের পরিমাণ অবশ্য অল্প এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা বেসরকারি। কোনও কোনও দেশে মহিলারা সবে জানতে পেরেছেন যে নারীর জন্য পূর্ণতর বিকাশের সুযোগ ও কর্মক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা রয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে। তাঁদের কাছ থেকে আমরা অতি করুণ, মর্মস্পর্শী

চিঠি পেয়েছি। জাপান আমাদের পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে অবিলম্বে আন্তরিক সাহায্য করেছে—তা সম্ভব হয়েছে জাপানের বুদ্ধিমতী ও উদার মনোভাবাপন্ন সম্রাজ্ঞীর সুপরিচালনার গুণে। শ্যামদেশের রানী বিশেষ প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের নেতৃত্বাধীনে তিনি যেন জেনে যান পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নারীর জন্য শিক্ষা ও শিল্পক্ষেত্রে কি কি সুযোগ রয়েছে—শ্যামদেশে সেইসব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যাতে সেদেশের নারীদের উন্নতিবিধান করা যায়।

শুধু শিল্পসামগ্রীর বিনিময় নয়, ভাববিনিময়ের মাধ্যমে বিশ্বমেলার দ্বারা উপকৃত হবেন বিশ্বের নারীসমাজ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট মহিলারা এই প্রথম একই উদ্দেশ্যে একত্র হয়ে কাজ করলেন, প্রতিষ্ঠিত কোনও সংযোগ-মাধ্যমের সহায়তায়। এই সহানুভূতি ও ভাববিনিময়ের ফল হবে দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী। মহিলাসমিতিগুলি সরকারের স্বীকৃতি ও অনুমোদন-প্রাপ্ত বলে সরকারি কার্যালয়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত ও মর্যাদামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সমিতির কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে, তাঁদের প্রয়াস সফল হয়েছে এবং যে পরিস্থিতিতে তাঁরা তাঁদের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন তা প্রতিবেদনে নথিভুক্ত করা হবে। এই প্রতিবেদন প্রতিটি দেশের জাতীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হবে জনগণের দলিলস্বরূপ। জনসমক্ষে, নারীর স্বার্থে নারীর ভাষণ এই প্রথম—একথা স্মরণ রেখে ও বর্তমান দায়িত্ব ও প্রয়োজন উপলব্ধি করে, আমরা প্রতিটি বর্ণ উচ্চারণ করব বিশেষ বিচার-বিবেচনা করে। আমাদের নির্বাচিত শব্দ হবে প্রত্যয়িত ও সুবিবেচনাপ্রসূত যাতে নূতন সুদিনের বার্তাবাহী বলে তা সংরক্ষিত হয় ভাবী কালের উদ্দেশ্যে। যে সুন্দর, সুরম্য ভবনে আমরা সম্মিলিত হয়েছি, আমরাই তার স্বত্বাধিকারী। ভবনটির সূক্ষ্ম কারুকার্য ও স্থাপত্য সৌকর্যে আমরা হৃষ্ট—স্থপতিকে জানাই আমাদের হার্দ্য সম্বর্ধনা।

শুধু হাত দিয়ে নয়, তাঁদের প্রতিভা দিয়ে, অন্তর দিয়ে, তাঁদের সর্ব সত্তা দিয়ে যেসব শিল্পী ও স্থপতি এ ভবনের অলঙ্করণ ও শোভা সম্পাদন করেছেন তাঁদের জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। পৃথিবীর সকল প্রান্তের মহিলারা এর জন্য শ্রম ও প্রতিভা বিনিয়োগ করেছেন। এরই জন্য তন্তুবায় বুনে তুলেছেন সূক্ষ্মতম বসন। প্রাচ্যদেশের কিশোরী কন্যা তাঁর হাতের সূচে ফুটিয়ে তুলেছেন অপূর্ব নকশা, lace বোনায় নিপুণারা আপন আসনে একাগ্র হয়ে বসে, নিবিষ্ট মনে বুনেছেন অতি সূক্ষ্ম lace। অন্তরে যে ছবি প্রকাশের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে, তুলির টানে তাকে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন চিত্রশিল্পী। যে মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য এ ভবনটি নির্মাণ করা হল, তা সার্থক করে তোলার জন্য সকলের সর্ব প্রয়াস ধন্যবাদার্হ। কমিশনের বাগ্মী সভাপতি বিগত অক্টোবরে সুবিশাল প্রদর্শনী-ভবন উৎসর্গ করেছেন মানবকল্যাণে, আর আজ এই মহিলা-ভবন আমরা উৎসর্গ করলাম ভাবী কালের উন্নতমনা, সুমহতী নারীকুলের উদ্দেশে। আমাদের বিশ্বাস এতেই হবে ভবনটির সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার।

প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে সমাপ্ত হয় শ্রীমতী পটার পামারের ভাষণ। শ্রীমতী Ralph Trautmann (পর্ষদের সহ সভানেত্রী) সমগ্র মহিলাসমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে উদ্দীপনাময় ভাষণের জন্য অভিনন্দন জানালেন। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে শ্রীমতী পামারের হাতে তুলে দেওয়া হল সোনার পেরেক। ওয়াশিংটনের মহিলাদের প্রতীকী উপহারস্বরূপ

কাঠের ব্লকটি সামনে রাখা ছিল। সকলেরই উদ্বেগ, রূপার হাতুড়িটি শ্রীমতী পামার নিজের আঙুলেই বসাবেন না তো! লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে পেরেকটি অবিলম্বে ব্লকে গেঁথে যাবার কথা। সভামধ্যে শত শত মহিলা রুদ্ধশ্বাস—উত্তেজনার সে এক চরম মুহূর্ত। শ্রীমতী পামার দর্শকদের দিকে একবার তাকিয়ে সহাস্যে হাতুড়ি তুললেন। প্রথম আঘাতেই পেরেকটি ব্লকের মধ্যে অনেকটা ঢুকে গেল। উল্লাসে ফেটে পড়ল সবাই। পরিচালিকা-পর্ষদের সদস্যরা উদ্বেল আনন্দে উঠে দাঁড়িয়ে রুমাল ওড়াতে লাগলেন। পর পর কয়েকটি আঘাতে কাঠের ব্লকে পেরেক সম্পূর্ণ গেঁথে গেল। প্রতীকী অনুষ্ঠানটি অবিশ্বাস্য তৎপরতায় সার্থক করলেন শ্রীমতী পামার—নারীকণ্ঠের উচ্চ হর্ষধ্বনিতে সভা মুখরিত হল।

এরপর Theodre Thomas-এর গায়কদল আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত শুরু করেন। প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করে সম্পূর্ণ হল ঐতিহাসিক মহিলা-ভবনের শুভ উদ্বোধন।

সেদিনের সভায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন Germany-র প্রতিনিধি শ্রীমতী Kaselowsky। রাশিয়ার রাজকুমারী Schachoffsky-এর বক্তৃতার মর্মার্থ হল, আমেরিকার নারী আজ নারীজাতির মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আগ্রহী রাশিয়ার মহিলারা। তাঁদের শিল্পপ্রয়াস আমেরিকার মতো অতটা না হলেও যথেষ্ট ব্যাপক। বেশ কিছুসংখ্যক মহিলা শিল্পে উদ্যোগী হয়েছেন। আপাতত তাঁদের সমস্যা, কৃষক রমণীর কর্মসংস্থান। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাশিয়ার নারী যথেষ্ট উন্নত। ১৮৭২ সাল থেকেই তাঁরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। সাত শতাধিক মহিলা-চিকিৎসক চিকিৎসার মাধ্যমে সমাজসেবা করে চলেছেন। রাশিয়ায় বসবাসকারী মুসলমানের সংখ্যা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ (স্মরণ রাখতে হবে এই পরিসংখ্যান শতবর্ষ আগেকার) এবং পঁচাত্তর লক্ষ মুসলমান মহিলা চিকিৎসার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভর করেন এই মহিলা-চিকিৎসকদের উপর—পুরুষ-চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা তাঁরা করান না। সুতরাং তাঁদের দেশে মহিলা চিকিৎসকের বিশেষ চাহিদা।

ইতালির Duchess di Brazza স্বয়ং উপস্থিত হতে পারেননি—Mme. Mariotti আসেন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে। তিনি শোনান তাঁর স্বদেশ ইতালিতে নারীর আত্মোন্নতির প্রয়াসের কথা। তিনি বলেন, কোনও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তাঁদের দেশের মহিলাদেব যোগদান এই প্রথম।

ইংলণ্ডের আধিকারিক (Commissioner) শ্রীমতী Bedford Fenwick জানান তাঁর দেশের মহিলাদের সামাজিক অবস্থার কথা।

Lady Aberdeen শোনান Scotland ও Ireland-এর মহিলাদের সমাচার। সেখানকার কৃষক রমণীর বোনা lace-এর তিনি অত্যন্ত সুখ্যাতি করেন এবং বলেন যে প্রদর্শনীতে সেগুলি স্থান পাওয়াতে ভবিষ্যতে তাঁদের অনেক সুযোগ লাভের সম্ভাবনা দেখা দিল।

সমাপ্তি ভাষণে বলা হয়, প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক হয়েছে। সার্থকতা শুধু শিল্পসামগ্রীর প্রদর্শনে নয়, প্রদর্শনী সার্থক এই কারণে যে এখানে একদিকে যেমন নারীর বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত, অপরদিকে তেমনি তার সমস্যাগুলি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার সুযোগও মিলেছে।

স্বামীজীর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ বেদান্তপ্রচারব্রতী আমেরিকান নারী

প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা

॥ এক ॥

আমেরিকার সহস্রদ্বীপোদ্যান স্বামীজীর দিব্যস্মৃতিপূত পবিত্রতীর্থ। এখানে কয়েকজন অধ্যাত্মপিপাসু নর-নারী আচার্য বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করে ধন্য হয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালে তাঁদের মধ্যে পাঁচজন নারীকে তিনি ব্রহ্মচর্যব্রতে ও একজনকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন। সাত সপ্তাহ ধরে এই নারীদের তিনি উচ্চ অন্তর্মুখ অধ্যাত্ম-জীবনযাপনের শিক্ষা দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অভয়ানন্দ (শ্রীমতী মেরী লুইস), ব্রহ্মচারিণী হরিদাসী বা যতিমাতা (শ্রীমতী এলেন ওয়াল্‌ডো) এবং ব্রহ্মচারিণী কৃস্টিনের (শ্রীমতী কৃস্টিনা গ্রীনস্টাইডেল) নাম উল্লেখযোগ্য। স্বামীজীর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ এই বিদেশিনী শিষ্যারা তাঁর ভারত প্রত্যাবর্তনের পর বেদান্তপ্রচারে অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করে নারীসমাজের 'দৃষ্টান্তস্বরূপ' হয়েছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা ঐসব নারীদের প্রসঙ্গ নিয়ে।

যতিমাতা তাঁর ব্রহ্মচর্য-অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করে লিখেছিলেনঃ "সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল নিতান্তই সাদামাটা। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্বলিত পবিত্র হোমানলে পুষ্পাহুতি নিবেদিত হল।" তিনি আরও লিখেছেনঃ "ঐদিন যাঁরা ব্রহ্মচর্য গ্রহণে ব্রতী হন তাঁদের মধ্যে দুজন আজ লোকান্তরিত। একজন স্বামীজীর পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের বাস্তব-রূপদানের ইচ্ছায় ভারতেই অবস্থান করছেন।...অন্যেরা একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গত দশ বছর যাবৎ বেদান্তপ্রচারের কাজটিকে অব্যাহত রেখেছেন।"[১] ১৯০৫ সালে যখন পূর্বোক্ত কথাগুলি লেখা হয়, তখন সহস্রদ্বীপোদ্যানে যাঁরা স্বামীজীর সান্নিধ্যে বাস করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কৃস্টিনই ছিলেন একমাত্র আমেরিকান মহিলা যিনি তখন সুদূর ভারতবর্ষে স্বামীজীর কাজে ব্যাপৃত। এই বিদেশিনী শিষ্যাদের কাছে স্বামীজীর সান্নিধ্য দুর্লভ সুযোগ বলে গণ্য হলেও, তাঁর শিষ্যা হওয়া খুব সহজ ছিল না। তিনি তাদের আবাল্যপোষিত সংস্কার, বিশ্বাস এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ববোধের ধারণাগুলি কঠোর আঘাতে চূর্ণ করতেন। বিশেষ করে নির্মূল করতে চাইতেন সেই ভ্রান্ত ধারণা যে জগৎ সুন্দর ও মঙ্গলময়। তাদের সমস্ত ভ্রান্তিবোধকে নস্যাৎ করতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন।

কৃস্টিন লিখেছেনঃ "তিনি মুখে কখনও 'অকপট হও' 'সত্যবাদী হও' অথবা 'একনিষ্ঠ হও' ইত্যাদি না বলেও আমাদের মনে ঐ গুণগুলি আয়ত্ত করার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা

জাগ্রত করতেন। কীভাবে তা করতেন! সেটি কি তাঁর নিজেরই অকপট, সত্যসন্ধী, চিরবিশ্বস্ত চরিত্রের প্রভাব—যার সান্নিধ্যে আমরাও মেতে উঠতাম! তিনি বলতেনঃ 'দ্যাখ, আমি যদি কোনও ভুল করি, আমি কখনও তা গোপন করব না। বরং বাড়ির মাথায় উঠে চিৎকার করে তা সবাইকে জানাব।' দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেনঃ 'নিজের পায়ে দাঁড়াও।' 'শক্তি! শক্তি চাই' !!"

শিষ্যাদের প্রত্যেকের শিক্ষার জন্যই স্বামীজী নির্বাচন করেছিলেন একেক পদ্ধতি। তাদের আহার, অভ্যাস, কথাবার্তা, সাজপোশাক—সবের ওপরেই স্বামীজীর কড়া নজর ও শাসন ছিল। যে তাঁর কাজ করবে তার পবিত্রতা, শিষ্যোচিত আনুগত্য ও ভক্তি চাই। তিনি তাদের বলতেনঃ "আমাকে কয়েকটি পবিত্র ও নিঃস্বার্থ পুরুষ ও নারী দাও—গোটা দুনিয়াটা আমি ওলট-পালট করে দেব।"

ভারত ও আমেরিকা—দুই দেশে কাজ করার জন্য আমেরিকার মেয়েদের ট্রেনিং-এর প্রয়োজন। সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজী যাঁদের শিক্ষা দেন, তাদের মধ্যে কৃস্টিন ভারতে এবং অভয়ানন্দ আমেরিকায় কাজ করবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। স্টেলা ভারতে কাজ করবে কিংবা ভারতে একবার অন্তত যাবে—এমন আশা তিনি পোষণ করতেন। কিন্তু যতদূর জানি, তার ভারতে আসা হয়ে ওঠেনি। অভয়ানন্দ চার বছর একভাবে আমেরিকায় কাজ করার পর ভারতে যায়—যদিও সেখানে স্বামীজীর বেদান্ত প্রচারকার্যে তার কোনও ভূমিকা ছিল না। যতিমাতার কর্মক্ষেত্র ছিল আমেরিকা—সেকথা সে নিজেও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত।

যেসব মহিলারা আমেরিকায় স্বগৃহে স্বামীজীকে অতিথিরূপে আশ্রয় দেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন সমাজের উঁচুতলার মানুষ। নারীদের মধ্যে তখন সবে জাগরণ দেখা দিয়েছে; সংস্কার আন্দোলনে তাঁরা তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছেন। স্বামীজীর পরিচিত বৃত্তে অনেক মহিলাই ছিলেন যাঁরা নারীর ভোটদানের অধিকার বিষয়ে সোচ্চার দাবি জানাতেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হতেও তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতাদানে অগ্রণী হন এবং শিক্ষকতাকে অনেকেই জীবিকারূপে গ্রহণ করেন। স্বামীজী এঁদের কাছে মাতৃভাবের মহান আদর্শকে সু-উচ্চ মহিমায় স্থাপন করতেন। ঈশ্বরকে জগন্মাতারূপে আরাধনা এবং স্বদেশ বা বিদেশে সর্বত্র সকল নারীর মধ্যে জগন্মাতাকে দর্শন করা স্বামীজীর আদর্শ ছিল। মায়ের এবং মাতৃজাতির প্রতি তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতা বহুক্ষেত্রে প্রকাশ পেত। তাই জনৈক গুরুভাইকে চিঠিতে তিনি লিখছেনঃ "মায়ের মঠের জন্য জমি কেনার অর্থ সংগ্রহ না করে দেশে ফিরছি না।" সহস্রদ্বীপোদ্যানে তিনি স্পষ্টভাষায় একদল মহিলাকে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানে উদ্যোগী হবার কারণ বর্ণনা করে বলেন, ঈশ্বরকে অনন্তশক্তিস্বরূপিণী জগন্মাতাজ্ঞানে পূজা করা উচিত। ঐ প্রকার উপাসনাই পবিত্রতা আনবে, আমেরিকায় প্রচণ্ড শক্তির উন্মেষ হবে। এদেশে কোনও মন্দিরে পুরোহিতের অত্যাচার নেই, গরিব দেশগুলোর মতো এখানকার মানুষ ক্লেশভোগ করে না।...আমাদের বেদান্তী হতে হবে এবং ঐ চিন্তা জীবনে আচরণ করে দেখাতে হবে। এমনকি জনসাধারণ পর্যন্ত বেদান্তকে গ্রহণ করবে। (বর্তমান পৃথিবীতে) স্বাধীনতার মাতৃভূমি আমেরিকাতেই এর বাস্তবায়ন

সম্ভব। ভারতবর্ষে এই উচ্চ চিন্তাগুলি বুদ্ধ শঙ্করের মতন মুষ্টিমেয় মহাপ্রাণ অভ্যাস করেছেন এবং কার্যে পরিণত করেছেন কিন্তু জনসাধারণ এই ভাব ধারণ করতে সক্ষম হয়নি।...এই নতুন যুগে জনগণ বেদান্তের আদর্শে জীবনযাপন করবে এবং তা আসবে নারীগণের দ্বারা।

জগতের চিন্তাপ্রবাহগুলিকে স্বামীজী এক নতুন খাতে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। বেদান্তের আলোকে আধ্যাত্মিকতার যে বিকাশ ঘটবে তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ—সবকিছুর ভেদবৈষম্যকে ম্লান করে দেবে—সমস্ত ভেদবুদ্ধির প্রাচীরগুলোকে ধূলিসাৎ করবে। মিসেস ওলি বুলকে একসময় তিনি লেখেন—তিনি নিজেই এই ভেদগুলোর জড় মেরে ছাড়বেন! স্বামীজী আমেরিকান পুরুষদেরও শিক্ষা দিতেন তবু আমেরিকার মেয়েদের আন্তরজীবন গঠনে তাঁর মনোযোগ ছিল বেশি কারণ তাঁরাই সমাজকে ধরে রেখেছিলেন। স্বামীজীর হাতে অঢেল সময় ছিল না। তিনি শুধু দৃষ্টান্তস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। হাতের কাছে যাদের পেয়েছিলেন তাদের থেকে উন্নতস্বভাব অধিকারীর জন্য অপেক্ষা করার সময় তাঁর ছিল না এবং সবচেয়ে বড় কথা—শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপক শিক্ষাদানের অবকাশও তাঁর ঘটেনি।

গ্রীনএকারে ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মকালে স্বামীজী একদল আগ্রহী অকপট তরুণ শিক্ষার্থীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, পরের বছরেও গ্রীনএকারে ক্লাস নেবার জন্য তাঁকে আহ্বান জানানো হয় কিন্তু তিনি সম্মত হননি। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল 'কয়েকজন প্রকৃত যোগী তৈরী করার উপযুক্ত ক্ষেত্র ঐ মেলাভূমি নয়।' তাঁর ঐ যোগীদের—বিশেষত মহিলাযোগীদের তিনি শিষ্যা-জ্ঞান করতেন, মাতা বা ভগিনী নয়! সহস্রদ্বীপোদ্যানে যাঁদের স্বামীজী শিক্ষাদান করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে মিস ম্যাকলাউড পরবর্তী কালে বলতেনঃ "তারা ছিল তাঁর শিষ্যা কিন্তু আমি কখনই তাঁর বন্ধু ছাড়া আর কিছু ছিলাম না। কিন্তু কী অমূল্য সম্পদই না তিনি তাদের দিয়েছিলেন! ঐ দিনগুলির মতন আর কোথাও কখনও তিনি নিজের অন্তর উজাড় করে দেননি।"

স্বামীজী চেয়েছিলেন তিনি আমেরিকা ছেড়ে চলে আসার পরেও তাঁর কাজ অব্যাহত রাখবে তাঁর কর্মীরা যাঁদের তিনি স্বয়ং শিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করে দেবেন। ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে মিস ডাচার তাঁকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। স্বামীজীর জন্য বাড়ির একদিকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে থাকার মতন ব্যবস্থা করে দেন। যে কোনও সময় ঐ বাড়িতে তাঁর শিক্ষার্থীদের গড় সংখ্যা ছিল বারো। প্রতিদিন সকালে দু'ঘন্টা ক্লাস হত। গৃহস্থালীর কাজ শেষ করে আসবে ভেবে তাদের জন্য স্বামীজী আলাদা করে অপেক্ষা করতেন না। আবার বিকেলেও ক্লাস হত এবং সে ক্লাস চলত অনেক রাত অবধি। একবার আচার্য ও শিষ্যারা এতই উচ্চভাবে তন্ময় ছিলেন যে কোথা দিয়ে সারারাত কেটে গিয়ে পরদিন সকাল হয়ে গিয়েছিল—তা জানতেও পারেননি। মিস ওয়াল্‌ডো বলতেনঃ "স্বামীজী একটা মহান—অতিমহান কাজ করে গেছেন যার প্রভাব তাঁর নিজের দেশের মানুষের জীবনে হবে সুদূরপ্রসারী। একই সঙ্গে তাঁর ইউরোপীয় ও আমেরিকান বন্ধুদের জীবনে তা গভীর পরিবর্তন নিয়ে আসবে।" পরবর্তী কালে তিনি সিস্টার দেবমাতাকে বলেনঃ "স্বামীজীর সান্নিধ্য এত দীর্ঘকাল লাভ করেও কখনও মনে হয়নি ত্যাগব্রতধারণের কথা, কখনও গভীরভাবে ভাবিনি তাঁকে অনুসরণ করে ভারতে যাব। আমার মনে হত আমি আমেরিকারই।

যদিও তাঁর জন্য না করতে পারি, এমন কিছুই ছিল না।”

স্বামীজীর আগ্রহে মিস ওয়াল্‌ডো বা যতিমাতা জনসভায় বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। তাঁর বক্তৃতা শুরু হবার অল্পদিনের মধ্যেই মিস ফিলিপ্‌স মিসেস বুলকে লেখেনঃ “স্বামী বিবেকানন্দ আমায় লিখেছিলেন যে আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার ততদিন সার্থক হবে না, যতদিন না আমেরিকানরা নিজেরাই এই বেদান্তের বাণীপ্রচারে উদ্যোগী হয় এবং তাঁর গুরুভাইদের থেকে শিষ্যস্থানীয়দের কেউ সাফল্য অর্জন করলে তিনি আরও বেশি গর্ব অনুভব করবেন। মিস ওয়াল্‌ডোকে কাজ শুরু করার জন্য তিনি সবচেয়ে জোরালো ভাষায় পীড়াপীড়ি করেন। শেষমেষ অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিস ওয়াল্‌ডো সম্মত হন। আমি এইসঙ্গে ‘নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনে’ তাঁর প্রথম বক্তৃতা সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাও পাঠালাম। বক্তৃতার পর ঘণ্টাখানেক প্রশ্নোত্তর চলে এবং মনে হল শ্রোতারা আলোচনা ছেড়ে বাড়ি ফিরতে খুবই অনিচ্ছুক ছিল।

“ ..মিঃ ও মিসেস এডওয়ার্ড মোরান—যাঁর স্টুডিওতে, তোমার হয়তো মনে আছে, আমরা কিছু সময় কাটিয়েছিলাম, মিস ওয়াল্‌ডোর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, বিশেষত তাঁর স্বচ্ছ ভাষায় যুক্তিপূর্ণ উপায়ে গোটা বিষয়টা উপস্থাপনের জন্য। যদিও ঐদিনের আবহাওয়া ঝড়বৃষ্টির জন্য প্রতিকূল ছিল, তবু উৎসুক শ্রোতাদের সমাবেশে ঘর ভরে ওঠে।”

ঐসময়কার সংবাদপত্রে মিস ওয়াল্‌ডোর মূল ভাষণটি প্রকাশিত হয়। উক্ত ভাষণের অনুবাদ কৌতূহলী পাঠকদের জন্য বর্তমান প্রবন্ধে সংযোজন করা হল।

বেদান্তদর্শন

মিস ওয়াল্‌ডো প্রদত্ত ভাষণ

(বেদান্ত সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনাঃ উক্ত দর্শনে আস্থাবান ব্যক্তিরা মনে করেন যে বেদান্ত সব ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ হবার যোগ্য।)

মিস মেরী ফিলিপ্‌সের ১৯ ওয়েস্ট থার্টিয়েথ স্ট্রীটের আবাসে ছাত্রদের এক বিশাল সমাবেশে মিস এলেন ওয়াল্‌ডো বেদান্তদর্শন সম্পর্কে তাঁর প্রথম ভাষণ দেন। ঐটি ছিল উক্ত দর্শন-বিষয়ক ধারাবাহিক বক্তৃতাবলীর শুভারম্ভ। স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি সম্প্রতি এদেশে বেদান্তপ্রচার করেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্রী মিস ওয়াল্‌ডো। স্বামীজীরই নির্বন্ধাতিশয়ে মিস ওয়াল্‌ডো নিজ আচার্য কর্তৃক আরব্ধ কর্মে আপনাকে নিযুক্ত করেছেন। অতএব মিস ওয়াল্‌ডোর এই প্রথম ক্লাসটি বিশেষ কৌতূহল সঞ্চার করেছিল সেইসব শ্রোতাদের মনে যাঁরা প্রাচ্য চিন্তা ও দর্শনগুলির সঙ্গে বহুদিন যাবৎ পরিচিত হতে আগ্রহী। তাঁর ভাষণের কিছু উল্লেখযোগ্য অংশের উদ্ধৃতিঃ

“পাশ্চাত্যে বেদান্তদর্শনের মহান সত্যগুলি উপস্থাপনের প্রয়াস দেখে একথা যেন মনে না করা হয় যে কোনও নতুন সম্প্রদায় বা নতুন চার্চ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা আগ্রহী। তা করলে এই অত্যুত্তম বেদান্তদর্শনকে—যে দর্শন বর্তমান তথা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর যে কোনও ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ, যার বনিয়াদ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তাকে সঙ্কীর্ণ করা হবে। এক

বিশ্বজনীন ধর্ম ও নৈতিক আদর্শকে এই দর্শন উপস্থাপন করতে চায়। মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, বেদান্ত তারই নামে আবেদন রাখে।

"এই দর্শনের মূল শিক্ষা—প্রতিটি জীবাত্মা স্বরূপত ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মসত্তাকে ক্রমে অনুভব করতে হবে। সেই অপরোক্ষ-অনুভূতি ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বনেও হতে পারে—সেটি কাম্য এবং তা বাস্তবায়িত হতে বাধ্য। বেদান্তের দৃষ্টিতে কোনও জীবাত্মাই 'বিতাড়িত' নয়, পাপী নয়। একথা প্রায়ই বলা হয় যে বেদান্ত জ্ঞানলাভের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে এবং আমরা সচরাচর যাকে সমাজে 'নীতি' বলে মানি তাকে উপেক্ষা করে। আমার মনে হয়, এটা দেখানো যেতে পারে যে এই প্রতিবাদের মূলে জ্ঞান সম্পর্কে এক ভ্রান্ত ধারণা—কারণ 'পরা' জ্ঞানের অপর নাম মুক্তি অথবা জীবের ব্রহ্মাববোধ।

"যে 'পরা'জ্ঞানে সর্ববন্ধনমুক্তি ঘটায় তার সঙ্গে বহির্জগতের তথ্যভিত্তিক সাধারণ বা বহুবিচিত্র বিষয়ের পুঁথিগত জ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই। এই জ্ঞানের অর্থ মানুষের যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান, যার ইঙ্গিত আছে সেই প্রাচীন প্রবাদবাক্যে: 'নিজেকে জান'। হাজার হাজার বছর আগে যাঁরা সেই প্রবাদবাক্যকে জীবনে চরিতার্থ করেছিলেন সেইসব প্রাচীন ঋষি ও সত্যদ্রষ্টা পুরুষদের মহান উপলব্ধির প্রকাশ এই বেদান্তদর্শন, আজও যা অতি যত্ন ও সতর্কতায় সংরক্ষিত। ঋষিরা আমাদের বলেন: 'আমরা যা উপলব্ধি করেছি তা তোমরাও উপলব্ধি করতে পার কারণ একই আত্মা সর্বভূতে অনুস্যূত এবং সকলের পক্ষেই আত্মদর্শন সম্ভব।'

"পাশ্চাত্যের ধর্মশাস্ত্রে যে অর্থে 'পাপী' শব্দ ব্যবহৃত সেই অর্থে 'পাপী' বলে কাউকে কি চিহ্নিত করা যায়? প্রত্যেকেই চলেছে ক্রম-উত্তরণের পথে কারণ 'শিব' বা মঙ্গলই প্রত্যেকের স্বরূপ। যাকে আমরা পাপী বলি, বেদান্ত তার আচরণকে প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পক্ষে ভ্রান্ত প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করে। একথা অবশ্য মনে করবেন না যে বেদান্ত এই মতের দ্বারা পাপাচরণকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানায়। অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই এই দর্শন শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণকে পরিহার করে। বেদান্তদর্শনের প্রতিটি মৌলিক চিন্তা মানুষকে শুভপথে পরিচালিত করতে আগ্রহী।

"একইভাবে বলা চলে যে, বেদান্তে অন্ধবিশ্বাসের স্থান নেই। কেবলমাত্র সেই প্রাথমিক দৃঢ় বিশ্বাসটুকু দরকার যাকে আশ্রয় করে এই দর্শনে প্রবেশকারী ব্যক্তি তার অকপট অনুসন্ধান অব্যাহত রাখতে পারে। মানুষের যুক্তির কাছেই এর আবেদন এবং প্রত্যেকেই এই দর্শন-প্রচারিত সত্য নিজ জীবনে পরীক্ষা করে দেখতে পারে। শুধু ঐজন্য তার আন্তরিক প্রচেষ্টা চাই। ভারতবর্ষে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ সর্বজনগৃহীত সিদ্ধান্ত, যার প্রভাবে এই ধারণা জন্মায় যে, মুক্তিলাভের ইচ্ছা বিলম্বে জাগ্রত হওয়া খুবই দুঃখের কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এর অনিবার্য পরিণাম 'বিনাশ'। এমন নয় যে এই একটি জন্মই মানুষকে দেওয়া হয়েছে এবং এজন্মে যার মোক্ষলাভ হল না সে চিরতরে বিনষ্ট হবে। যে অতি দুর্বল এবং যারা এখনও পার্থিব ভোগসুখেই সন্তুষ্ট, বেদান্ত তাদের দোষারোপ করে না। শুধু স্নেহময়ী জননীর মতন তাঁদের উদ্দেশ্যে বলে: 'ধীরে ধীরে তুমিও বুঝতে শিখবে, তুমিও বড় হবে এবং তখন শিশুর খেলনার মতো এই তুচ্ছ ভোগ্যবস্তুর প্রতি বালসুলভ আকর্ষণ সহজেই ত্যাগ করতে পারবে।'

"একথাও মনে করা উচিত নয় যে বেদান্তের শিক্ষা খ্রীস্টধর্মের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন। বাস্তবে ঠিক তার বিপরীত। আমরা যীশুখ্রীস্টের যে কোনও শিক্ষা যদি বেদান্তের আলোকে বিচার করি তাহলে দেখব যীশুর উপদেশাবলীর সঙ্গে বেদান্তদর্শন কী আশ্চর্যভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে।

"ঈশ্বর এক, সে যে নামেই তাঁকে আমরা ডাকি না কেন অথবা যে পথেই তাঁকে সন্ধান করি না কেন, পরিশেষে আমরা একই লক্ষ্যে পৌছাব। বেদান্তদর্শনের একটি মহৎ অবদান এই যে, উক্ত দর্শন কারও ভাব নষ্ট করে না, কোনও ধর্মকে নিন্দা করে না, কাউকে বলে না যে তুমি মন্দ এবং মাত্র একটি পথই সকলের অনুসরণযোগ্য ও সঠিক।

"বেদান্তদর্শন বিষয়ে এই ধারাবাহিক বক্তৃতাগুলিতে অমূর্ত তাত্ত্বিক দিকের কথা আমরা বেশি আলোচনা করব না, আমরা চেষ্টা করব তার প্রাণবন্ত সজীব দিকটির কথা বলতে, বেদান্তদর্শনের প্রয়োগ বা ব্যবহারপ্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করতে, যেখানে সর্বভূতে প্রেম-প্রীতির কথা বলা হয়েছে, যেখানে আমরা নিজেদের মহত্তম স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হই, আমাদের ক্ষুদ্র সত্তা নিঃস্বার্থচিন্তায় ক্রমপ্রসারতা লাভ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেতন-অচেতন সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত হয়, একাত্মতা অনুভব করে।"

স্বামীজী তাঁর প্রত্যেক শিষ্যাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন নিজস্বভাবে বেদান্তপ্রচার করতে। যদিও তিনি কখনই আচার্যের দায়িত্ব ত্যাগ করেননি, তবু কারও চিন্তায় বাধা দেওয়া তাঁর স্বভাব ছিল না। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া বেদান্তজ্ঞানকে প্রত্যেকে নিজের বোধ ও সাধ্য-অনুসারে ব্যাখ্যা করেছেন। যতিমাতা ১৮৯৭-এর ১১ এপ্রিল স্বামী সারদানন্দকে এক পত্রে লেখেনঃ

> "ক্লাসগুলি ভালভাবেই চলেছে আর লোকে আমায় অনেক সাধুবাদ জানাচ্ছে, প্রশংসা করছে। কিন্তু এসবই যেন আরও বেশি করে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমি এ সম্মানের ধারে কাছে যাবারও যোগ্যতা রাখি না। আমার উন্নতি মনে হয় এই বিচারে নির্ণীত হবে—'লক্ষ্য থেকে এখনও আমি কতদূরে আছি।' দিনে দিনে আরও বুঝছি, আমার কত অসম্পূর্ণতা! আমি কে যে শিক্ষা দেব! বিশেষ করে সেই আমি, যে সবেমাত্র অধ্যাত্মপথে হাঁটতে শুরু করেছি! আমি কত নির্বোধ যে একসময় ভাবতাম, একদিন যে মহান ভাব পেয়েছিলাম তার দ্বারা অন্যকে সাহায্য করব! কিন্তু হায়, সেই উচ্চ ভাব অন্যের কাছে যথাযথ উপস্থাপনে আমি কত অক্ষম!!
>
> "আমার বিশ্বাস—স্বামীজী মানুষের মন থেকে এ ধারণা মুছে দিতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন যে একমাত্র অদ্বৈততত্ত্ব বেদান্তের প্রতিপাদ্য। তাঁর মতে, বেদান্ত বলতে ত্রয়ীকেই (অন্যত্র যতিমাতা যাদের দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত-অদ্বৈত নামে উল্লেখ করেছেন) বোঝায়। স্বামীজীকে বহুবার এই ধরনের চিন্তা প্রকাশ করতে দেখেছি। স্বামীজীর মাদ্রাজ-বক্তৃতাতেও এই মতের সমর্থন মিলবে। মিসেস বেশান্ত একবার আমায় বহুক্ষণ ধরে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে বেদান্ত হল যুক্তিগ্রাহ্য একটি দার্শনিক শাখা যার আবেদন প্রধানত বুদ্ধির কাছে এবং উক্ত দর্শনের যুক্তিগুলি এমন সতর্কতার সঙ্গে বিন্যস্ত যে মানুষের

মনে যতপ্রকার প্রতিবাদ উঠতে পারে, তার কোনটিরই সাধ্য নেই যে ঐ দুর্লঙ্ঘ্য যুক্তিকে অতিক্রম করে। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এই দর্শন কোনভাবেই প্রয়োজনে আসে না। মিসেস বেশান্তের কাছে বেদান্ত শুধু মস্তিষ্কের খোরাক, হৃদয়ের নয়। বেদান্ত শুধু শুষ্কবিচার, বিমূর্ত চিন্তার সমষ্টি—প্রেম-প্রীতি-সহানুভূতির প্রাণদায়ী জীবনরসে তা সঞ্জীবিত নয়। এইপ্রকার ধারণা. কিন্তু অনেক শিক্ষিত মানুষের মনেই বদ্ধমূল, বিশেষত যাঁরা প্রাচ্যদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন।

"এই কারণেই আমি রামানুজভাষ্যের একটি অনুবাদগ্রন্থ সংগ্রহ করতে চাই যেটা হয়তো দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যাবে। আমার উদ্দেশ্য হল একথা প্রমাণ করা যে বেদান্ত শুধু অদ্বৈতচিন্তাশ্রয়ী নয়, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতচিন্তাকেও সে স্বীকার করে। একথা অনস্বীকার্য যে, সাধারণ পাশ্চাত্যবাসীর মন বিশিষ্টাদ্বৈত-ভাবনাকে ধারণ করতে অধিক সমর্থ।

"আমার অসংখ্য ত্রুটি সত্ত্বেও আমার দ্বারা অন্তত বেদান্তের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে না—এ আমার একান্ত বিশ্বাস।

"আশা করি গুডউইন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব প্রসঙ্গে আপনাকে লিখিত বিবরণ পাঠাবে এবং আপনিও আমাদের ভারতবর্ষের সব খবর দিয়ে, বিশেষত স্বামীজী মহারাজের সব খবর দিয়ে লিখবেন। লোকে যদি আমায় পছন্দ করে তবে জানবেন তার একমাত্র কারণ আমি সেই ভাবই শিক্ষা দিই যা সমগ্র জগতের জন্য মহান বার্তারূপে তিনি দিয়ে গেছেন।"

॥ দুই ॥

থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজী বেদান্ত প্রচারকার্যের জন্য যে সকল মহিলাদের শিক্ষা দেন, তাঁদের মধ্যে মিস ওয়াল্‌ডো (ব্রহ্মচারিণী যতিমাতা) ছিলেন যেমন নম্রস্বভাবা, অপরদিকে স্বামী অভয়ানন্দ তেমনই মেজাজী। অভয়ানন্দের পূর্ব নাম মেরী লুইস। জন্ম প্যারিসে। তাঁর ছিল অসাধারণ স্বাধীনতাপ্রিয়, নির্ভীক ব্যক্তিত্ব। এই গুণগুলি তাঁকে সন্ন্যাসজীবনের উপযুক্ত করেছিল। আবার ঐ একই গুণের স্থূল ও ভারসাম্যহীন বহিঃপ্রকাশ তাঁকে স্বামীজীর বন্ধুবর্গ ও পাশ্চাত্য শিষ্যমণ্ডলীর কাছে অপ্রিয় করে তুলেছিল।

মেরী লুইসের ভাগ্যাকাশে প্রথম থেকেই শনির দৃষ্টি! জীবনের বহু উত্থানপতনের সঙ্গে তাঁর নিজের বিচিত্র ভ্রান্ত ধারণা, সেইসঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির পর্ব। শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা থেকে তিনি বহু দূরে সরে গেছেন, এমনকি বিরোধিতাও করেছেন। তবুও আজ শতাব্দীর ব্যবধানে দাঁড়িয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে গিয়ে মনে হয়, পাশ্চাত্যে স্বামীজীর বৈদান্তিক ভাবপ্রচারের কাজে এঁদের প্রত্যেকেই যেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন। সেক্ষেত্রে স্বামীজীর কাজে এঁদের প্রত্যেকেরই অবদান অনস্বীকার্য।

পাশ্চাত্যে বেদান্ত আন্দোলনের সেই আদিপর্বে মূলধারা অনুবর্তনের পরিবর্তে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কাই ছিল বেশি। বেদান্তের আদর্শ পাশ্চাত্যবাসীদের পক্ষে

খুবই নতুন। সে আদর্শ অনুসরণের জন্য কোনও নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ বা পথ ছকে দেওয়া ছিল না। কারণ স্বামীজীর দীক্ষিত ঐ মানুষগুলিই ছিলেন পাশ্চাত্যে বেদান্তভাবপ্রচারে অগ্রগামী দল—তাঁদেরই দায় ছিল প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ রচনার।

আরও একটি মস্ত অসুবিধা হল—ব্যক্তিগতভাবে এঁরা স্বামীজীর সান্নিধ্য খুব অল্পদিনের জন্য পেয়েছিলেন। স্বামীজী সেই লেলিহান অগ্নি যা স্পর্শমাত্রে চারপাশের সবকিছুকে গ্রাস করে। অনুগামীরা তাই তাঁরই তেজে তেজোময় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা যে যেভাবে স্বামীজীকে বুঝেছেন তা নিয়েই মেতে উঠেছেন, দেশকাল বা নিজের সামর্থ্য বিচার করেননি।

স্বামীজী প্রত্যেক অনুগামীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন যাতে সে তার নিজের বিচারবুদ্ধি ও মানসিক প্রবণতা অনুসারে আপন পদ্ধতিতে কাজ করার সুযোগ পায়। সুতরাং বহুক্ষেত্রেই বেদান্তের আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রবণতা, গ্রহণক্ষমতা ও বিচিত্র কল্পনার মিশ্রণ ঘটত, যার ফলস্বরূপ বেদান্তের নামে কতকগুলো উদ্ভট ধারণা গড়ে ওঠাও অসম্ভব ছিল না। যা হোক, বর্তমান রচনায় আমরা অভয়ানন্দ চরিত্রের সদর্থক দিকটির ওপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব। স্বামীজী স্বয়ং তাঁর জীবদ্দশায় এক নারীকে সন্ন্যাসদান করেছিলেন—এ এক মহান ঐতিহাসিক সত্য এবং কেবলমাত্র সেই কারণে স্বামীজীর মৌলিক অবদান সম্পর্কে আগামী প্রজন্ম যখন গবেষণা করবেন তখন নিঃসন্দেহে এই দৃষ্টান্তটি আপন গৌরবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৮ জুলাই, ১৮৯৬ অভয়ানন্দ মিসেস বুলকে পত্রে লেখেন: "প্রবল বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও বিগত বৎসরে আমি সন্ন্যাসিনীর কঠোর দায়িত্বপালন করেছি—আমার কাজই আমার সাহস ও পরিশ্রমের নিদর্শন হয়ে রইল।"[১]

১৮৯৫ সালের ২৩ জুলাই থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে মিস ডাচারের কটেজ থেকেই স্বামীজীর অন্যতম শিষ্যা রুথ এলিস এক পত্রে লেখেন: "সে বড় আবেগপ্রবণ এবং তার প্রতি কোনপ্রকার কটাক্ষ না করা হলেও অকারণ সন্দেহে হঠাৎ হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তার মধ্যে বহু দুর্লভ সদ্‌গুণ আছে। তার কাছে আমার অনেক প্রত্যাশা। সে সহজেই সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে—সম্ভবত ঐ কাজটি তার জন্যই নির্দিষ্ট। মনে হয়, সন্ন্যাসদীক্ষার পর থেকে তার রুক্ষ স্বভাবে ঈষৎ কোমলতার সঞ্চার হয়েছে। আমার ধারণা স্বামীজী তার ওপর সন্তুষ্ট।"[২]

সিস্টার কৃস্টিনও স্মৃতিচারণ করেছেন: 'এক হিসেবে এই ক্ষুদ্র দলটির মধ্যে তিনি ছিলেন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব।' আরও লিখেছেন: "লম্বা শরীরের হাড়গুলো বেশ চওড়া, মহিলাটির বয়স প্রায় পঞ্চাশ। এতই পুরুষালি যে তিনি ছেলে না মেয়ে তা দুবার চোখ রগড়ে বুঝে নিতে হবে। একমাথা ছোট ছোট তারের মতো চুল—এমন এক যুগে, যখন 'বব্‌ড হেয়ারে'র প্রচলন হয়নি। পুরুষের মতন হাবভাব, গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং এমন পোশাক যা ভারতবর্ষে সাধারণত পুরুষরা ব্যবহার করে—এসব কারণে মানুষের কিছুটা বিভ্রান্তি ঘটা স্বাভাবিক। বড় গলায় তিনি বলতেন, তাঁর হল সর্বোচ্চ দর্শনের পথ অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ। পূর্বজীবনে তিনি অতিকট্টর চরমপন্থীদের মুখপাত্র ছিলেন এবং এক ধরনের বাগ্মিতাও তাঁর ছিল, বলতেন: 'বক্তৃতামঞ্চে আমি চৌম্বকশক্তি বিস্তার করি।' আত্মম্ভরিতা এবং ব্যক্তিগত

উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁকে স্বামীজীর শিষ্যা হবার এবং বৈদান্তিক আন্দোলনে কর্মী হবার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করেছিল।"[৩]

'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড'ও লিখেছেঃ "এই ভদ্রমহিলা ভুলবশত নিউ ইয়র্কে স্বামীজীর ক্লাসে যেতেন। ৭ জুলাইয়ের আগে ইনি থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে পৌঁছান, ইনি আসার পর থেকেই স্বামীজী বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্য পড়াতে শুরু করেন। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইনি স্বয়ং তাঁর ১৭৯ ওয়েভারলি প্লেস, গ্রীনউইচ ভিলেজে ক্লাস নিতে শুরু করেন।"

২১ অক্টোবর, ১৮৯৫ সালে কৃপানন্দ মিসেস বুলকে লিখেছেনঃ "গতরাত্রে আমি অভয়ানন্দের সঙ্গে দেখা করেছি। সে এখন নিজের বাড়িতে সাংখ্যদর্শনের ওপর ক্লাস নিচ্ছে। আট-ন'জন শ্রোতা উপস্থিত থাকে। ওর নিজের ওপর বেশ বিশ্বাস আছে।"

একইভাবে ২৭ অক্টোবর মিসেস বুলকে কৃপানন্দ আরেকটি পত্রে লেখেনঃ "অভয়ানন্দ খুবই উন্নতি করেছে। আমি চলে আসার পর ও নিশ্চয় ভালভাবে হিন্দুদর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। খুবই আনন্দের কথা যে ও ধ্যানের অভ্যাসও রেখেছে যা ওর মতন উচ্ছল, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, সদা ভাসমান এক ফরাসী মহিলার পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য।"[৪]

নভেম্বর মাসে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির ক্লাসগুলি কৃপানন্দের পরিচালনাধীন হয়। তার আগে প্রতি বুধবার অভয়ানন্দ সোসাইটিতে ক্লাস নিতেন।

ইতিমধ্যে স্বামীজীর অনুপস্থিতির সময় অভয়ানন্দ বেদান্তপ্রচার ও অনুগামী-সংগ্রহের কাজে উঠে পড়ে লাগেন। আমরা যতদূর জানি তিনি দুজন মহিলাকে ব্রহ্মচর্য এবং একজনকে সন্ন্যাসও দেন। [অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'সমকালীন' গ্রন্থে, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩০৪ একাধিক সন্ন্যাসিসন্তানের নামোল্লেখ করেছেন।] অভয়ানন্দ মিসেস বুলকে চিঠিতে লিখেছেনঃ "আমি খুবই পরিশ্রম করছি। প্রচারের কাজ, সেইসঙ্গে ক্লাস নেওয়া, বক্তৃতা দেওয়া এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে লেখালেখি অব্যাহত রয়েছে।"

অভয়ানন্দ অহংকারী এবং অল্পেই মানুষকে ভুল বুঝতেন। তাঁর ক্লাসে শ্রোতার সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় তিনি রীতিমত ক্ষেপে উঠে বেদান্ত সোসাইটির সদস্যদের দোষারোপ করতে ছাড়েননি। ২২ নভেম্বর, ১৮৯৫-এ যথেষ্ট উষ্মাপ্রকাশ করে মিসেস বুলকে চিঠিতে জানান যে বেদান্তপ্রচারে স্বেচ্ছাবৃত আচার্যের ভূমিকাগ্রহণে তাঁর তৎপরতাকে কৃপানন্দ কটাক্ষ করেছেন। অভয়ানন্দের ভাষায়ঃ "সোসাইটির কর্মকর্তাদের যদি কোনও সাধারণ বুদ্ধি থাকত তাহলে তাদের একথা বোধগম্য হত যে, কোনও নতুন ভাব প্রচারের কাজে কর্মকর্তাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সভায় সশরীরে উপস্থিত থাকা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তারা যেভাবে আমার বাড়িকে এড়িয়ে চলে তাতে মনে হয় এ স্থান যেন মহা অকল্যাণকর।... আপনি জানেন, বর্তমানে আমার বাড়ি যে জায়গায়, তা কখনই মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে না। নিউ ইয়র্কের লোকেরা আঁকাবাঁকা গলিপথ পেরিয়ে এ বাড়ি সহজে খুঁজেই পায় না। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক থেকে ফিরে অবধি আমি এ বাড়ি ছাড়তে চাইছি কিন্তু আমাকে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে।"[৫]

অভয়ানন্দ স্বয়ং স্বামীজীর কাছেও অভিযোগপত্র পাঠান। প্রত্যুত্তরে স্বামীজী তাঁকে সন্ন্যাসীর আচরণ ও চিন্তা কী ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখেন।

১৮৯৫-এর ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী যখন আবার নিউ ইয়র্কে ফিরে আসেন তখন অভয়ানন্দ তাঁকে একবার দর্শন করতে যান। এরপর অবশ্য তিনি স্বামীজীর ক্লাসে আসাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। এইসময় একদিন স্বামীজী নিজে যতিমাতাকে (মিস ওয়াল্‌ডো) নিয়ে গ্রীনউইচ ভিলেজে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

১৮৯৬ সালের প্রথমে অভয়ানন্দ বেডফোর্ড অ্যাভিনিউ, ব্রুকলিনের বাড়িতে উঠে আসেন। সেখানে নিয়মিত ক্লাস নিতেন, শনিবার সন্ধ্যায় 'অদ্বৈত কংগ্রিগেশনে' (নামকরণ তাঁরই) বক্তৃতাও থাকত। ৩১ জানুয়ারি, ১৮৯৬ ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকায় সোসাইটির তরফ থেকে সংবাদ প্রকাশিত হয়ঃ

"আমাদের দুই নতুন সন্ন্যাসী অভয়ানন্দ ও কৃপানন্দ বর্তমানে আচার্যদেবকে তাঁর মহান ব্রতসাধনে বিশেষ সাহায্য করতে অগ্রসর। অভয়ানন্দ ব্রুকলিনে ক্লাস নেন। শ্রোতা অনেক। কৃপানন্দ বেদান্ত সোসাইটির প্রধান কার্যালয়ে রাজযোগ ও ভক্তি সম্পর্কে নবাগতদের শিক্ষা দেন।"[৬]

স্বনামধন্য 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় ২০ মার্চ, ১৮৯৬-এ একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। সন্ন্যাসগ্রহণের পর বছর না ঘুরতেই অভয়ানন্দ প্রবল উৎসাহে জনশিক্ষার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কিন্তু এই জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণাই ছিল অস্পষ্ট। প্রবন্ধটি তাঁর বিচিত্র ধারণার সাক্ষ্য দেয়ঃ

স্বামী অভয়ানন্দ নামে জনৈকা বর্ষীয়সী সন্ন্যাসিনী ব্রুকলিনে বাস করেন। তিনি ভারতবর্ষের সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ভুক্ত। 'স্বামী' শব্দের অর্থ সন্ন্যাসী। 'অভয়' শব্দে ভয়শূন্যতা এবং 'নন্দ' শব্দে পরম সুখকে বোঝায়। সুতরাং এই নামের প্রকৃত অর্থ—'যিনি ভয়শূন্য ও আনন্দস্বরূপ।' গতকাল সেন্ট-ফেলিক্স স্ট্রীটের বাসভবনে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন 'নিউ ইয়র্ক টাইমসে'র জনৈক প্রতিনিধি। অভয়ানন্দের পরিধানে ছিল অতি সাধারণ পরিচ্ছদ। যখন বক্তৃতার জন্য তিনি বাইরে যান তখন হলদে রঙের আলখাল্লা পরেন। হলুদ রং হল সূর্যের প্রতীক।

স্বামী অভয়ানন্দ বলেনঃ "গত জুলাই মাসে আমি সন্ন্যাসগ্রহণ করি। স্বামী বিবেকানন্দ নামে হিন্দু সন্ন্যাসী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে আমায় সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেছেন। সেই সময় থেকে আমি ইহজগতের সবকিছু ত্যাগ করেছি এবং অতীত জীবনও বিস্মৃত হয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, আমি জন্মমৃত্যুহীন। এ জগতে আমরা চিরকাল বাস করতে আসিনি। কোনও স্মৃতিকে ধরে রাখার বাসনাও আমাদের নেই। সন্ন্যাসের পর যে নবজন্ম লাভ হয়েছে তার সঙ্গে আমার পূর্বজীবনের কোনও সাদৃশ্য নেই। আমরা স্ত্রী-পুরুষের দেহগত, জাতিগত অথবা অন্য কোনও জাগতিক বৈষম্যে আস্থাশূন্য। আমরা শুধু সর্বব্যাপী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। পরব্রহ্মে কোনও লিঙ্গভেদ নেই। ইংরেজীতে তাই ব্রহ্ম অর্থে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গের পরিবর্তে ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়।

"আমি হিন্দুধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসী। আমরা বেদান্ত নামে ভাববাদী আস্তিক্যদর্শন প্রচার করি। বৌদ্ধদের জড়বাদী নাস্তিকদর্শন আমাদের জন্য নয়। আমাদের দার্শনিক মন উপনিষদাশ্রয়ী এবং আচার্য শঙ্করের মতন মহান ব্যক্তি এর প্রতিষ্ঠাতা।

"আচার্য শঙ্কর খ্রীস্টীয় সপ্তম (?) শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধের জন্মের সত্তর (?) বছর পর আবির্ভূত। বৌদ্ধদের বিশ্বাস শঙ্করাচার্য বুদ্ধেরই নব অবতার। কারণ মাত্র ষোল বছর বয়সে শঙ্কর যে ভাষ্য লেখেন—এ পর্যন্ত প্রকাশিত দার্শনিক গ্রন্থগুলির মধ্যে তা সর্বোত্তম। সাধারণ শিশুর পক্ষে ঐ প্রকার অল্প বয়সে অসাধারণ মনীষার অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। অতএব আমরাও বিশ্বাস করি এসব ক্ষেত্রে পুনর্জন্মবাদকে স্বীকার করলেই সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

"আমাদের বিশ্বাস, প্রতিটি ধর্মই সত্য এবং যে যে ধর্মভুক্ত তার জন্য সেই ধর্মমতই শ্রেষ্ঠ। তা সত্ত্বেও বলব, মতবাদের ঊর্ধ্বে এমন কোনও অনুভূতির জগৎ আছে যার সন্ধান আমরা প্রকৃত অধিকারীকে দিতে চাই।

"চারটি 'দর্শন' বিষয়ে আমি ক্লাস নিয়ে থাকি—'কর্মযোগ' অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মবিষয়ক দর্শন, 'ভক্তিযোগ' অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেমভক্তির দার্শনিক ব্যাখ্যা, 'রাজযোগ' অর্থাৎ মনস্তত্ত্ববিষয়ক দর্শন এবং 'জ্ঞানযোগ' যা শ্রেষ্ঠ দর্শন। সপ্তাহে তিন দিন নিজের বাড়িতেই আমি ক্লাস নিই। প্রয়োজনে ছাত্রদের বাড়িতেও ক্লাস হয় এবং প্রতি রবিবার সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতার আয়োজন থাকে। ছাত্রছাত্রী ও শ্রোতার সংখ্যা নেহাৎ মন্দ নয়। তবে শ্রোতাদের অধিকাংশই মহিলা। ক্লাসে যোগদানেচ্ছুদের কাছ থেকে টাকাকড়ি নেওয়া হয় না কারণ আমরা সন্ন্যাসী। স্বেচ্ছায় যে যা দেয়, তাতেই আমার চলে যায়। আমি যদি এখন ভারতবর্ষে থাকতাম তাহলে (সন্ন্যাসীর রীতি অনুসারে) ভিক্ষাপাত্র হাতে সকলের দ্বারে ঘুরতাম। যেহেতু এদেশে ঐ প্রথা অনুমোদিত নয়, সেইজন্য নিজের ঘরেই একটা ছোট বাক্স রেখেছি, যাদের ইচ্ছা ঐ বাক্সে কিছু পয়সা ফেলে যায়। তা থেকে কখনও বেশ পর্যাপ্ত আহারের ব্যবস্থা করা চলে। আবার কোনদিন কিছুই জোটে না। অবশ্য এরজন্য আমার চিন্তা নেই। জীবনে যা স্বাভাবিকভাবে আসে তাকেই আমি স্বাগত জানাই এবং এ জীবনে যা কিছু প্রাপ্তি হয়েছে, সে সবের জন্যই আমি কৃতজ্ঞ।"

"আমি মানবপুত্র যীশুর বাণী প্রচার করি। আমরা প্রত্যেকেই এক একজন খ্রীস্ট এবং জীবনের ক্রুশদণ্ডে সমর্পিত।"

ক্রমশ অভয়ানন্দের মনে সংশয়ের কালো মেঘ জমা হতে থাকে। সেই সংশয় নিরসনের জন্য তিনি স্থির করেন ভারতবর্ষে যাবেন। ১৮৯৯-এ ভারতে তাঁর প্রথম পদার্পণ। ভারতবর্ষে তাঁর আগমন প্রথম দিকে স্বামীজীর ভাবপ্রচারে সহায়তাই করেছিল। অনেকেরই মনে হয়েছিল স্বামীজী যে কী অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী তা প্রমাণ করে অভয়ানন্দের মতন খ্রীস্টান মহিলার হিন্দুধর্মগ্রহণ—এ যেন মিশনারিদের হাতে হাজার হাজার হিন্দুর ধর্মান্তরিত হওয়ার বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ।

১৮৯৮-এর মার্চ মাসে 'মারাঠা' পত্রিকায় 'স্বামী অভয়ানন্দ' শিরোনামে দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

"আমাদের মধ্যে সম্প্রতি এক আমেরিকান সন্ন্যাসিনীর আগমন ঘটেছে। এরজন্য স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ কারণ তিনি ভারতবাসীর চিন্তাক্ষেত্রে এক নতুন দিশার সন্ধান দিয়েছেন। আমাদের হিন্দুধর্মের রত্নপেটিকায় আজও অমূল্য রত্ন রক্ষিত আছে, শুধু প্রয়োজন সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সেই ধর্মীয় দর্শনকে লোকচক্ষুর গোচরে

আনা।... আমরা যেন কখনও না বলি যে ভারতবর্ষ এক অধঃপতিত জাতি।...আশা করব এই আমেরিকান সন্ন্যাসিনী ভারতবর্ষের সকল মহাবিদ্যালয়গুলিতে স্বল্পকালের জন্য হলেও পদার্পণ করবেন। অবশ্যই তা কলকাতায় আচার্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে সর্বত্রই তিনি সাদর অভ্যর্থনা লাভ করবেন এবং তাঁর ঐ সফব এক মহান উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে পরম সহায় হয়ে উঠবে।"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অভয়ানন্দ সেই আশা পূরণ করতে পারেননি। ১৮৯৯ সালের মে মাসে কলকাতায় যখন কাঠফাটা রোদ তখন তিনি এই শহরে আসেন এবং অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। অভয়ানন্দের সংশয় ও উচ্চাশা পরবর্তী কালে তাঁকে স্বামীজীর বেদান্তভাবনা থেকে বহু দূরে নিয়ে গিয়েছিল। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে ঐ প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী অভয়ানন্দ বেদান্ত আন্দোলনের সংস্রব ত্যাগ করে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত হন।

॥ তিন ॥

স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসার আগে কৃস্টিনের জীবনে কোনও আনন্দ ছিল না—সেই উদয়াস্ত পরিশ্রম আর কঠোর সংগ্রামই হয়তো তাঁকে উত্তরকালে এক উপযুক্ত কর্মী করে তুলেছিল। ভারতবর্ষ ও আমেরিকায় স্বামীজীর ভাবাদর্শে যাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন ভগিনী কৃস্টিন সেই প্রথমসারির সেবাব্রতীদের অন্যতম। কৃস্টিনের বয়স যখন মাত্র সতেরো তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়, সেই থেকে ডেট্রয়েটের একটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজে তিনি যুক্ত হন। পাঁচটি ছোট বোন ও মায়ের খাওয়া-পরার সব দায়িত্বই ছিল তাঁর ওপর। রুক্ষ কঠোর বাস্তবের সংঘর্ষে কৃস্টিন তাই হয়ে ওঠেন প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্না, স্বাধীনচেতা এক নারী যদিও বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রার মধ্যে অন্তহীন অবসাদ সময়ে সময়ে তাঁকে যেন গ্রাস করে ফেলত। ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মেরী ফাঙ্কির স্বভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। মেরী আশাবাদী। মেরীর গভীর বিশ্বাস পরশমণির ছোঁয়া তাঁর জীবনকেও একদিন সবুজ-সতেজ করে তুলবেই। সেই আশা নিয়ে একপ্রকার ফাঙ্কিরই আগ্রহাতিশয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪-এ কৃস্টিন এসেছিলেন স্থানীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চে এক ভারতীয় যোগীর বক্তৃতা শুনতে।

পরবর্তী কালে আমেরিকান শ্রোতাদের কাছে দুর্জয় শীতের সেই প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে কৃস্টিন বলেছিলেনঃ "সেই রাতের কথা কখনও ভুলব না। মনে হয়েছিল এমন এক মানুষকে আমরা সাক্ষাৎ দেখছি যাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচিত পৃথিবীর কোনও মানুষেরই তুলনা চলে না। এর আগেও অনেক সদাশয়, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্যে আমরা এসেছি কিন্তু তাঁরা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র হলেও মানুষই ছিলেন, বড়জোর বলব সূক্ষ্মতর বোধবুদ্ধিযুক্ত মানুষ। কিন্তু এই প্রথম আমরা এমন একজনকে দেখলাম যিনি আধ্যাত্মিকতা বলতে আমরা যা বুঝি সেসব ধারণাকেও অতিক্রম করে গেছেন।"

স্বামীজীর সম্পর্কে ভগিনী কৃস্টিন 'Reminiscences' লিখেছিলেন কিন্তু সেই স্মৃতিচারণের বাইরেও ক্লাস ও বক্তৃতার মধ্যে প্রায়ই তিনি স্বামীজীর প্রসঙ্গ করতেন। উত্তর

ক্যালিফোর্ণিয়ার বেদান্ত সোসাইটিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০ কৃস্টিন স্বামীজীর প্রসঙ্গে বলেনঃ "তিনি এক প্রচণ্ড শক্তি। কারও কারও কাছে সে শক্তির সান্নিধ্য ছিল দুঃসহ কারণ তার প্রাবল্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমিত্বে গড়া দুর্বল ব্যক্তিত্বগুলি অচিরেই ভূমিসাৎ হত। তিনি যেন সাক্ষাৎ 'রুদ্র', মুহূর্তে যিনি মায়াপাশ ছেদন করেন। সাধারণ মানুষ তো সেই নির্মায়িক অবস্থাকে স্বীকার করতেই ভয় পায়। তবে জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিবলে যাঁরা সেই শক্তির পদতলে শিক্ষার্থীর মতো আত্মসমর্পণ করেছিলেন তাঁদের পুরোনো সংস্কারের জট-গুলো স্বামীজীই খুলে দিয়েছিলেন, সেইসব সংস্কার যাদের প্রভাবে মানুষের 'ক্ষুদ্র আমিত্ব' মাথা চাড়া দেয়।"...

সেই প্রথম বক্তৃতা শোনার পর পরবর্তী ছয় সপ্তাহে স্বামীজী যতগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সব কয়টিতেই কৃস্টিন ও মেরী উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী ডেট্রয়েট ছাড়ার প্রায় দেড় বছর পর তাঁরা যখন শুনলেন স্বামীজী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে একদল অনুগামীসহ নির্জনবাস করতে যাচ্ছেন তখন হাজার মাইল পেরিয়ে তাঁরা দুজনে 'আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভের' উদ্দেশ্যে সেখানে এসে পৌঁছালেন।

গ্রীষ্মাবকাশের সেই 'আধ্যাত্মিক শিবিরে' প্রত্যেক শিক্ষার্থীই স্বামীজীকে খোলাখুলি প্রশ্ন করতেন—গোটা পরিবেশটাই ছিল কৃত্রিমতাবর্জিত, সহজ, স্বাভাবিক। একমাত্র কৃস্টিনই থাকতেন নীরব—স্বামীজীর সান্নিধ্যে মনের মধ্যে জমে থাকা সংশয় যেন নিজের থেকেই সরে যেত। কৃস্টিন বলতেনঃ "তাঁর বক্তৃতার প্রথম কয়েকটি বাক্য শোনবার পর সমস্ত ব্যাপারটাই হয়ে উঠত 'ধ্যানের' বিষয়—সেখানে 'শ্রবণে'র ভূমিকা গৌণ।" থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজীর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিমুখী। জিজ্ঞাসু মানুষদের ভববন্ধন থেকে মুক্ত করার শিক্ষা যেমন দিতেন তেমনই চাইতেন পাশ্চাত্য জগতে বিশেষত আমেরিকায় প্রচারকাজের জন্য তাঁদের গড়ে তুলতে। নিজের ঘরের সামনে বারান্দায় সকলকে ডাকতেন একেকটি বিষয়ে বক্তৃতাদানের জন্য। তাঁরা যাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখেন তার জন্য উৎসাহও দিতেন। কৃস্টিন মন্তব্য করেছেনঃ "তিনি কি বুঝেছিলেন যে তাঁর উপস্থিতিতে আমরা যদি 'আত্মসচেতনতা'র ভাবটি জয় করতে পারি এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বিবেকানন্দের সামনে নিজেদের বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হই, তাহলে কোথাও কোনও শ্রোতৃমণ্ডলী আর আমাদের উদ্বেগের কারণ হবে না!! বাস্তবে কিন্তু সেই বক্তৃতাদানের মুহূর্ত ছিল এক কঠিন পরীক্ষা—তার হাত থেকে কেউই অব্যাহতি পেতেন না—প্রত্যেকেরই পালা আসত।" অবশ্য যে দুই-একজন খুবই ভীতু-গোছের ছিলেন তাঁরা ঐদিন ক্লাসে মুখই দেখাতেন না!

কোনও কোনও দিন ধ্যানের পর স্বামীজী শিক্ষার্থীদের বলতেন প্রশ্ন করতে এবং তাদেরই একজনকে নিযুক্ত করতেন উত্তরদানের কাজে। নিজে প্রত্যেকের প্রশ্ন ও উত্তর নিবিষ্টচিত্তে শুনতেন, প্রয়োজন হলে দুরূহ বিষয়ে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে সংশয়ের অবসান ঘটাতেন।

এই থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কেই স্বামীজী কৃস্টিনের কাছে ভারতীয় নারীদের শিক্ষাপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। স্বামীজী তাঁকে ভারতবর্ষের মেয়েদের শিক্ষাদানব্রতে যোগদানের আহ্বান জানানোয় কৃস্টিন খুবই আনন্দিত হন কিন্তু সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ

হতে আরও কয়েক বছর কেটে যায়—জননীর মৃত্যুর পর ছোট বোনেরা সাবালিকা হয়ে যতদিন না সংসারের হাল ধরছে ততদিন কৃস্টিনের ছুটি মেলেনি।

কৃস্টিন কলকাতায় পৌঁছলেন ১৯০২ সালের এপ্রিলে। ঐ সময় মাত্র কয়েকবার তিনি স্বামীজীর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পান। আসন্ন গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতায় কৃস্টিনের শারীরিক কষ্ট যাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে স্বামীজী তাঁকে হিমালয়ের কোলে মায়াবতীতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে জুলাই মাসে কৃস্টিন স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের সংবাদ পেলেন। কলকাতায় ফিরে গুরুদত্ত গুরুদায় কাঁধে তুলে নিয়ে স্ত্রীশিক্ষার কাজে তিনি নিজেকে সর্বতোভাবে যুক্ত রাখেন। বারো বছর একটানা পরিশ্রমের পর প্রধানত স্বাস্থ্যোদ্ধারের ইচ্ছায় কৃস্টিন আমেরিকায় নিজের বোনেদের কাছে ফিরে আসেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেইসময় প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয় এবং কৃস্টিনকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের সকল প্রয়াস স্থগিত রাখতে হয়। ১৯১৪ থেকে ১৯২৪—এই দশ বছর এবং ১৯২৮ সালের বসন্তকাল থেকে ১৯৩০-এর মার্চে দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত বেশ কয়েকবছর আমেরিকায় বাসকালে কৃস্টিন সেখানে নিয়মিত ক্লাস নিতেন। ১৯২৭ সালে স্বামীজীর সম্পর্কে 'Reminiscences' লেখাও শুরু করেন—স্বামীজীর মহান শিক্ষা যাতে বৃথা না যায় তার প্রতি সদা-সচেতন কৃস্টিন তাঁর দীর্ঘ অবকাশকে ভরিয়ে রেখেছিলেন নানা গঠনমূলক কাজ, প্রচারব্রত এবং লেখালিখিতে। ডেট্রয়েটের কিছু ভক্ত তাঁর কাছে নিয়মিত আসতেন—স্বামীজীর ভাবে তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য ক্লাস শুরু হয়। এইসব ক্লাসে বেদান্তের উচ্চ তত্ত্বগুলি তিনি ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর সেই বক্তৃতার প্রসঙ্গে কোনও এক মহিলা-শ্রোতা লিখেছিলেনঃ

"নির্ভুল তাঁর উচ্চারণ, অদ্ভুত সুসংহত কণ্ঠস্বর, সুপ্রাচীন কোনও দেবালয়ের পূজারিণীর মতো তাঁর আকৃতি... তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন ভারতকে জানতে ও ভালবাসতে। আর আলোচনার প্রধান বিষয় একটিই ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেকথা গীতামুখে অতি সুন্দরভাবে বলেছেনঃ 'আমি সর্বচরাচর ব্যাপ্ত করে আছি।' একথাটিই নানা বাস্তব ঘটনা ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে এমনভাবে বোঝাতেন যে শুনলে সেই ধারণার পুরোপুরি বিশ্বাসী না হয়ে উপায় ছিল না।"

সিস্টার কৃস্টিন তাঁর শ্রোতাদের বলতেনঃ "এটি এক মস্ত ভুল ধারণা যে ভাগ্যের ফেরে আমরা চাই বা না চাই, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি এবং জীবনে যেসব ঘটনা ঘটে যায় তার জন্য আমরা কোনও ভাবেই দায়ী নই। এই ভ্রান্ত ধারণার জন্যই মানুষ নিজেকে মুক্ত করার উদ্যোগ নিতে ভয় পায়—ভাবে, তার দুঃখদুর্দশা, সংসারবন্ধন সবই বুঝি ভাগ্যের বিড়ম্বনা। কিন্তু এ এক চরম ভ্রান্তি। আমাদের ভাগ্যের টানা-পোড়েন আমরাই নিজে হাতে বুনে চলেছি, আমরাই আমাদের নিয়ন্তা।"

কৃস্টিন ছিলেন শিক্ষাবিদ্। তাঁর মতে পাশ্চাত্যের পুরোনো শিক্ষাপদ্ধতি মনের প্রশিক্ষণের ওপর এতকাল গুরুত্ব দিয়ে এসেছে কিন্তু আজ স্বামী বিবেকানন্দ এক নতুন আলো জগতকে দিতে এসেছেন যা জীবনের সব স্তরে, সব ক্ষেত্রে অভিনব ভাবসঞ্চার করবে। মানুষ যদি দেবস্বরূপ হয় তবে তার শিক্ষাপদ্ধতিও এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত যাতে তার অন্তর্নিহিত দেবত্ব-প্রকাশের পথ সে খুঁজে পায়।

শিক্ষার্থীদের তিনি বলতেনঃ 'এস আমরা এক নতুন শিক্ষাদর্শ গ্রহণ করি—যেখানে

আমাদের ধারণাগুলি হবে আরও উদার এবং বহুমুখী। শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন আনা চাই।'

স্বামীজীর আদর্শে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি যদি গ্রহণ করা হয় কৃস্টিনের মতে সেই শিক্ষাপদ্ধতি থেকে জন্ম নেবে এক নতুন প্রজন্ম—মহান ঐশী শক্তিতে ঋদ্ধ নরনারীকে নিয়ে গড়ে উঠবে নতুন এক শ্রেণী। "এতে সবই হবে। শিশুদের জন্য স্কুল, বিধবাদের বাসস্থান, সেবাকেন্দ্র, যতভাবে সেবা ও কাজ করার প্রয়োজন সবই এর দ্বারা সম্ভব হবে। জীবনের প্রতিটি স্তর নতুন জীবন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশে নতুনভাবে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠবে।"...

"আমাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, নারীশিক্ষা সম্পর্কিত স্বামীজীর চিন্তাগুলিকে সঠিকভাবে যদি কার্যকর করা হয়, তাহলে এমন এক শ্রেণীর (আদর্শ) নারী গড়ে উঠবে জগতের ইতিহাসে যাদের তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রাচীন গ্রীসের নারীরা যেমন শারীরিক দিক দিয়ে প্রায় নিখুঁত ছিলেন এই নারীরা তেমনি বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে তাদের পরিপূরক হবেন—করুণাময়ী, প্রেমময়ী, কোমলতায় পূর্ণ, সহিষ্ণুতার মূর্তি, হৃদয়বত্তা ও বুদ্ধিমত্তায় মহান; তবে সবচেয়ে মহান আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে।"

ভগিনী কৃস্টিন উদাত্তকণ্ঠে বলতেন ঃ "তোমরা সবাই জান ভারতবর্ষ অনেকের কাছে এক প্রবল আকর্ষণ কিন্তু কিসের সেই আকর্ষণ যা বিদেশীদের সেদেশে যেতে অনুপ্রাণিত করে? সে কি শুধু ছবির মতো সুন্দর পল্লীগ্রামের শ্যামলশোভা অথবা তাজমহলের শুভ্রজ্যোতি যা বিমুগ্ধ দর্শকের কাছে স্বর্গসুষমার আভাস দেয়! হতে পারে কারও কাছে ভারতবর্ষের গিরিগুহায় গোপন কন্দরে যে অপূর্ব ভাস্কর্য যুগ যুগ ধরে রক্ষিত আছে তারই প্রবল আকর্ষণ, আবার কেউ হয়তো সেই দ্যুলোকভেদী শুভ্রতুষারকিরীটী হিমালয়ের টানে ভারতবর্ষে যান।

"কিন্তু আমার বিশ্বাস এর চেয়েও মহত্তর কোনও আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণ—সেই মহার্ঘ্য বস্তু স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বহন করে আনলেন। আপন দেবত্বের—আত্মার অনন্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডারের সন্ধান তিনি জগতকে দিয়ে গেলেন—সেটিই তাঁর দিব্যবাণীর শ্রেষ্ঠ অবদান। সে বাণী জগৎসমক্ষে উদারহৃদয়ে যখন তিনি বিতরণ করেছেন তাঁর প্রবল শক্তির কথা মানুষ ভুলে গেছে—দেখেছে শুধুই স্নেহ—সর্বপ্লাবী অপার করুণা।

"ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবিদ্যা যুগ যুগ ধরে সেদেশেই সুরক্ষিত ছিল, তা শুধু যোগ্য অধিকারীকেই দেওয়া হত। বিবেকানন্দ সেই অধ্যাত্মমঞ্জুষা উন্মুক্ত করে দিলেন বিশ্ববাসীর জন্য।

"আত্মজ্ঞানদানে প্রবুদ্ধ আচার্য বললেন ব্রহ্ম অসীম, আনন্দস্বরূপ। নামরূপের দ্বারা সীমিত কোনও বস্তু শাশ্বত আনন্দ দান করতে পারে না। ভারতবর্ষের উপনিষৎ এই ব্রহ্মের কথাতেই পূর্ণ। আহা, পাশ্চাত্যের কাছ থেকে এই অমৃত কতদিন সরিয়ে রাখা হয়েছিল। অবশেষে এলেন সেই অপরিচিত দিব্য পুরুষ যিনি অতি সরল ভাষায় আশ্বাস দিয়ে বোঝালেন ঃ 'তুমি নিজেকে যা ভাব, তা তুমি নও, তুমি তো খণ্ড সসীম ব্যক্তিমাত্র নাও, তুমি অনন্ত অখণ্ড অসীম'।"

"তিনি আরও বললেন, আত্মাকে জানার জন্য কোনও কঠোর তপশ্চর্যার প্রয়োজন নেই, তুমি শুধু কায়মনোবাক্যে নিজের স্বরূপকে জানতে চাও।

"ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ আত্মানুসন্ধানের পথ যার জানা আছে।

"স্বামীজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁর দিব্যবাণী আমার পক্ষে কোনও দিনই ভুলে থাকা সম্ভব নয়। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বপ্রচারই তাঁর সেই বাণী। আর সে বাণী যে কণ্ঠস্বরকে আশ্রয় করে ধ্বনিত হত তা-ও অবিস্মরণীয়। এমনই সে কণ্ঠস্বর যা শ্রোতাকে কোন অবচেতন বিরহের তলদেশে যেন নিয়ে যায় আর সে বোধ তীব্রতম হয়ে উঠলেই পুনরুত্থান ঘটে চেতনার স্তরে। প্রাচীন কালে 'বুদ্ধঘোষ' নামে এক ব্যক্তি ছিলেন—'বুদ্ধঘোষ' শব্দের অর্থ বুদ্ধের কণ্ঠস্বর। আমার ভাবতে ভাল লাগে যে স্বামীজী ছিলেন ভারতমাতার বাণীমূর্তি।

"কোনও ব্যক্তি আপন স্বরূপ সম্পর্কে যত সচেতন হয় তার আকর্ষণী শক্তি তত বৃদ্ধি পায়। স্বামীজীর মতো মহান ব্যক্তি যিনি স্ব-স্বরূপকে জেনেছিলেন তাঁর ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি প্রযোজ্য। আমি তোমাদের কাছে তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা বলতে চাই কিন্তু 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' যিনি তাঁকে কি বাক্যে প্রকাশ করা যায়? আমরা শুধু হৃদয়ে তাঁর ধ্যান করতে পারি। শুধু একটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করব—যে বিষয়টি তাঁর প্রত্যেক জনসভায় কোনও না কোনও ভাবে তিনি প্রকাশ করতেন...আমাদের সমগ্র সত্তা সেই ভাবকে যতক্ষণ না আশ্রয় করে—আমি-ই সেই সৎ-চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'।"

এইভাবে স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানে বাসকালে কয়েকজন শিষ্যাকে বিশেষভাবে শিক্ষিত করেছিলেন এবং নারীশিক্ষার দায়িত্ব যাঁরা নেবেন তাঁদের অনুসরণযোগ্য পথনির্দেশও দিয়েছিলেন। সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিতা এই আমেরিকান মেয়েরা পরম আগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন বেদান্তপ্রচারের মহান ব্রত।

ক্যালিফোর্ণিয়ার এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় ও স্বামীজীর সান্নিধ্যে স্বর্ণময় মুহূর্ত

মেরী লুইস বার্ক

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য সফরকালে ১৯০০ সালের গোড়ার দিকে স্বামীজী সানফ্রান্সিস্কোয় আসেন। এবার তাঁর বিদেশে আসার প্রধান কারণ হৃতস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য বেশ কিছুকাল জনকোলাহল থেকে দূরে বিশ্রামলাভ। সুতরাং আমেরিকায় পৌঁছেই প্রথমে বন্ধু লেগেটদের নিউ ইয়র্কস্থিত গ্রামীণ তালুকে প্রায় দশ সপ্তাহ বিশ্রাম নেন তারপর আবার শুরু হয় বক্তৃতা ও শিক্ষাদানপর্ব। ঐ উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে আমেরিকার পশ্চিমভাগে তিনি উপস্থিত হন—প্রথমে দক্ষিণের লস এঞ্জেলসে এবং পরে ফেব্রুয়ারির শেষদিকে সানফ্রান্সিস্কোয়।

দক্ষিণ ও উত্তর উভয় ক্যালিফোর্ণিয়ায় তখন এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা স্বামীজীর জন্য কিছু করতে পারলে কৃতার্থ হতেন—তাঁর কাজের সহায়তা, তাঁর প্রয়োজন অনুসারে যাবতীয় বন্দোবস্ত এইসব ভক্তেরাই করতেন। অথবা বলতে পারি, স্বামীজীর ক্ষেত্রে এমনটি সর্বদাই ঘটত। বিশেষ করে পাশ্চাত্যেই এটি বেশি ঘটত কারণ স্বদেশের চেয়ে সেই বিদেশ-বিভুঁইয়েই তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন ছিল বেশি। প্রথমবার পাশ্চাত্য সফরকালে—ধর্মমহাসভার আগে ও পরে প্রতি পদক্ষেপে অত্যাশ্চর্যভাবে তাঁর সাহায্য জুটেছে, প্রয়োজনে কোথা থেকে এমনসব মানুষ এসেছেন যাঁরা, ঠিক যেমনটি হলে কাজটি সুসম্পন্ন হয়, সেভাবেই সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এভাবেই দুর্গম পথও সুগম হয়েছে, অসম্ভব ব্যাপারগুলিও সহজ হয়ে গেছে। চিন্তা করলে মনে হয়, গোটা ব্যাপারটাই যেন এক সুপরিকল্পিত নাটক—যার শুরু থেকে শেষ অবধি সবটাই আগে থেকে নিপুণভাবে লেখা হয়ে গেছে, ধীরে ধীরে এক-এক দৃশ্য মঞ্চস্থ হচ্ছে মাত্র।

এ নাটকের অন্যতম আকর্ষণ, এর প্রধান ভূমিকা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। স্বয়ং জগজ্জননী আগাগোড়া এর পরিচালনা করেছেন বলেই বোধহয় মেয়েরা এখানে অগ্রাধিকার লাভ করেছে; গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভূমিকা পুরুষদের জন্যও অবশ্যই ছিল তবু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মহিলারা—স্বামীজীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার অধিকারী মহিলারাই ছিলেন নাটকটির প্রধান কুশীলব।

প্রথমবার ধর্মমহাসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় পদার্পণ করে অবধি যেসব মহীয়সী নারীর সাহায্য তিনি লাভ করেন তাঁদের সম্পর্কে অনেকেই শুনেছেন কিন্তু

দ্বিতীয় সফরকালে যেসব মহিলা পরম উৎসাহের সঙ্গে তাঁর কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, তাঁদের কথা এখনও বিশেষ আলোচনা হয়নি। ঐ মহিলারাও কিন্তু তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে একপ্রকার ঈশ্বরচালিত হয়েই যথাকালে যথাস্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্বামীজী নিজেও উপলব্ধি করতেন যে একটি পরিকল্পনা রূপ নিতে শুরু করেছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় তিনি একবার বলেছিলেনঃ "এদেশে আমি যত বেশিদিন বাস করছি, ততই মনে হচ্ছে, পাশ্চাত্যে এসে এমন কিছু ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটছে যাঁরা আমার অন্তরঙ্গ। আর আমার ওপর ন্যস্ত কর্মে সহায়তা করার জন্যই তাঁরা এখানে রয়েছেন।"[১] ক্যালিফোর্নিয়ার মহিলাদের, বিশেষত সানফ্রান্সিস্কোর মেয়েদের কথাই এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য মীড ভগিনীদের অন্যতমা শ্রীমতী অ্যালিস হ্যান্সবরোর নাম। স্বামীজীকে তিনি সর্বাধিক সাহায্য করেন। লস এঞ্জেলসে উপস্থিত হওয়ার অল্পকাল পরেই এঁর সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ঘটে। স্বামীজী সানফ্রান্সিস্কোয় আসার বছর দুই আগে শ্রীমতী হ্যান্সবরো বেশ কিছুদিন ধরে আলাস্কা ভ্রমণ করছিলেন। সেই সময় তাঁরই অনুরোধে বিদায়কালীন উপহার হিসাবে তাঁকে কেউ স্বামীজীর 'রাজযোগ' এবং 'কর্মযোগ' বই দুটি দেন। সুদূর উত্তরাঞ্চলে টানা দুবছর বাসকালে তিনি ঐ বইগুলি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন এবং আলোচিত প্রসঙ্গে মনন করতে করতে তাঁর ধারণা হয় যে বইদুটির বিষয়বস্তু অভিনব এবং এমন বই যিনি লিখেছেন তিনিও নিশ্চয়ই এক মহান পুরুষ। এভাবেই স্বামীজী পশ্চিম উপকূলে আসার বহুপূর্বেই সেখানকার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। আলাস্কা থেকে শ্রীমতী হ্যান্সবরো ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যে স্বামীজী দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলসে উপস্থিত হন।

ঘটনাক্রমে কুমারী ম্যাকলাউডের মাধ্যমে শ্রীমতী হ্যান্সবরো স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হলেন। ছোট বোন হেলেনকে নিয়ে তিনি একদিন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এলে স্বামীজী তাঁদের একটি ক্লাসের ব্যবস্থা করতে বলেন। সুযোগ পাওয়ামাত্র তাঁরা পরম উৎসাহে লস এঞ্জেলসেরই এক হলে তিনটি ধারাবাহিক ক্লাসের বন্দোবস্ত করে ফেললেন। স্বামীজী পরে এই মীড ভগিনীদের প্যাসাডেনার ছোট্ট বাড়িটিতে অতিথিরূপে বাস করেন। বর্তমানে তীর্থসদৃশ ঐ বাড়ি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বেদান্তকেন্দ্রের অন্তর্গত আর স্বামীজী যে ঘরে থাকতেন সেটি এখন উপাসনার জন্য ব্যবহৃত।

লস এঞ্জেলসে এবং প্যাসাডেনায় স্বামীজী অনেকগুলি মূল্যবান ভাষণ দেন, বহু ঘরোয়া ক্লাসও নেন। পরে তিনি অন্য শহরে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে থাকেন। ঐসময় একদিন সকালে স্বামীজী শ্রীমতী হ্যান্সবরোর সঙ্গে যখন প্রাতরাশে বসেছেন তখন নিজের থেকেই হ্যান্সবরো বলে ওঠেনঃ 'স্বামীজী, আমার মনে হচ্ছে আপনি চান যে আমি সানফ্রান্সিস্কোয় যাই।' মনের মতো কোনও প্রস্তাব শুনলে স্বামীজীর আয়ত চোখদুটি উৎসাহে জ্বলজ্বল করত। এখনও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলঃ 'হ্যাঁ, আমি অবশ্যই চাই।' পরে অ্যালিস হ্যান্সবরোর দুই বোন তাঁকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেন এই ভেবে যে হ্যান্সবরোর বয়স কম (তখন সম্ভবত বিশের কোঠার শেষদিক অথবা সবেমাত্র তিরিশ পেরিয়েছেন)—ঐ কাজে অভিজ্ঞতাও নেই। বোনেদের পরামর্শে হ্যান্সবরোকে ইতস্তত করতে দেখে স্বামীজী বললেনঃ 'যখন তুমি একটা কাজ করবে বলে ভাব, তখন কোনও

বাধা এলেও আর নিবৃত্ত হবে না। নিজের বিবেকের কথা শুনবে, অন্যের নয় এবং তারপর সেই বিবেকের পরামর্শ অনুসারেই চলবে।' স্বামীজীর উৎসাহলাভ করে হ্যান্সবরো আগেই সানফ্রান্সিস্কো রওনা হয়ে গেলেন স্বামীজীরই অগ্রবর্তী প্রতিনিধিরূপে। এরপর স্বামীজী সেখানে সপ্তাহখানেকের মধ্যে উপস্থিত হন—১৯০০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।

ঐ সপ্তাহটিতে শ্রীমতী হ্যান্সবরো যথাসাধ্য কাজ করেছিলেন। সানফ্রান্সিস্কোর দুটি 'হোম অব ট্রুথে'র একটিতে তিনি গিয়ে থাকতেন, সেখানে তিনি স্বামীজীরও থাকার ব্যবস্থা করেন। ('হোম অব ট্রুথ' ছিল এক ধর্মীয় সংস্থা। এঁরা প্রচার করতেন যে জগতের সব অশুভই হল মায়া আর যা কিছু শুভ তা ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি। সেইসঙ্গে তাঁরা এ শিক্ষাও দিতেন যে মানুষ হল আত্মা। এই সংস্থার সদস্যেরা বেদান্তদর্শন ও স্বামীজীর ভাবাদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁকে ঐ সমিতির পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।) স্বামীজীর বক্তৃতার জন্য শ্রীমতী হ্যান্সবরো আরও একটি হল ভাড়া করেন, স্থানীয় সংবাদপত্রে বক্তৃতাব বিষয়ে বিজ্ঞাপনও দেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটি সহজে দৃষ্টিগোচর হওয়ার মতো ছিল না। যাই হোক, তবু কাজ তো শুরু হয়েছিল। পরে স্বামীজী সানফ্রান্সিস্কোয় অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন—অ্যালিস হ্যান্সবরোই সেগুলির যাবতীয় বন্দোবস্ত করতেন, সবদিকে নজর রাখতেন এবং বক্তৃতাশ্রবণে নিজেও উপকৃত হতেন।

কিন্তু 'হোম অব ট্রুথে' স্বামীজী তত স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছিলেন না। কারণ সেখানে সর্বদাই লোকের ভিড়। অভ্যাগতদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য কিংবা নিজের খুশিমত চলাফেরার উপযোগী কোনও জায়গা সেখানে নেই। এই 'হোম অব ট্রুথে'র নেতা বা শিক্ষক ছিলেন শ্রী ও শ্রীমতী বেঞ্জামিন অ্যাসপিন্যাল নামে এক দম্পতি। শ্রীমতী হ্যান্সবরোর চেয়ে বয়সে এঁরা বড় এবং সম্ভবত অনেক বেশি অভিজ্ঞ। এই শ্রীমতী অ্যাসপিন্যালই দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ায় সংঘটিত মায়ের লীলায় ক্রমে আর এক প্রধান অংশগ্রহণকারিণীরূপে পরিচিত হবেন। স্বামীজীর আগমনের সপ্তাহখানেক পরে তিনি শ্রীমতী হ্যান্সবরোকে একদিন জোর দিয়ে বলেন, 'দেখো, এই মানুষটি যাতে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন তেমন একটি জায়গা আমাদের দেখতেই হবে।' তাই এমিলি অ্যাসপিন্যাল এবং অ্যালিস হ্যান্সবরো দুজনে মিলে সানফ্রান্সিস্কোর খবরের কাগজগুলি দেখতে দেখতে বিজ্ঞাপনে টার্ক স্ট্রীটে একটি ফ্ল্যাটের খোঁজ পান। বাড়িটি যথেষ্ট বড়, আলোবাতাসযুক্ত এবং মোটামুটি সুন্দর। স্থানটি ছিল শহরের সুগম স্থানে এবং আবাসিক এলাকার মধ্যে। স্বামীজী খুশি হলেন। এমিলি অ্যাসপিন্যাল তখন 'হোম অব ট্রুথে'র বাড়ি ছেড়ে স্বামীজী এবং শ্রীমতী হ্যান্সবরোর সঙ্গে ঐ বাড়িতে চলে যাবার জন্যে স্বামীকে রাজি করাতে তৎপর হন। তিনি স্বামীকে বললেনঃ "বেঞ্জামিন, তুমি তো জানো, 'হোম অব ট্রুথে' আমরা শুধু 'ট্রুথ' বা সত্যের কথা আলোচনাই করি—এখনও 'ট্রুথে'র সন্ধান পাইনি!" ভদ্রলোকটিরও এরপর আর কিছু বলার ছিল না। অতএব এমিলি অ্যাসপিন্যাল তাঁর ব্যাগ গুছিয়ে চলে এলেন টার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে আর রইলেন স্বামীজীর আবাসের তত্ত্বাবধায়িকারূপে। স্বামীজী পরে তাঁকে বলতেন, 'যদি তুমি উচ্চতম পর্বতশীর্ষেও থাকতে, তবু তোমায় আমার যত্ন নেবার জন্য সেখান থেকে নেমে আসতেই হত।' এমিলিও গম্ভীরভাবে উত্তর দিতেন, 'সে আমি জানি, স্বামীজী।'

সম্ভবত ১৯০০ সালের মার্চে তাঁরা টার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন, আর

সেখান থেকেই স্বামীজীর সানফ্রান্সিস্কোর কাজের প্রকৃত সূচনা হয়। যদিও স্বামীজী তাঁর গ্রন্থগুলির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়ার সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন তবু সানফ্রান্সিস্কোয় এখন যেসব ভাষণ তিনি দিলেন তা শ্রোতাদের মধ্যে অধিকতর আগ্রহের সঞ্চার করল এবং স্বামীজীকে তাঁরা ক্লাস নিতে বিশেষ অনুরোধ জানালেন। এই ফ্ল্যাটে তাই তিনি সকালে এবং কখনও কখনও বিকেলেও ক্লাস নিতেন। শ্রীমতী হ্যান্সবরো বৈষয়িক দিকটির ব্যবস্থা চালাতেন আর ঘরোয়া ব্যাপারে দেখাশোনা করতেন শ্রীমতী অ্যাসপিন্যাল।

টার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে বাসকালে প্রধানত রাজযোগের ক্লাস নেওয়া ছাড়াও স্বামীজী অনেকের সঙ্গে নিশ্চয় ব্যক্তিগতভাবেও সাক্ষাৎ করতেন। তবে এঁদের মধ্যে মাত্র দুজনই সেইসব অপূর্ব, জীবন-পরিবর্তনকারী আলাপের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের অন্যতম হলেন ফ্রাঙ্ক রোডহ্যামেল নামে এক তরুণ। আমি মনে করি, তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তাঁর উদ্ধৃতি থেকেই সবচেয়ে ভালভাবে জানা যাবে। তিনি যা লিখেছেন তা এইঃ "সেই মহান সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যলাভের স্মৃতি আজও সুস্পষ্টভাবে আমার মনে গাঁথা আছে। যে প্রভাব ও প্রেরণা সেদিন পেয়েছি—তাকে জীবনের মহত্তম অভিজ্ঞতা বললেই ঠিক বলা হয়।

"তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে যে আনন্দময় অভিঘাত লাভ করি, তার প্রভাব থেকে আমি কখনও পুরোপুরি মুক্ত হইনি। ধূসর রঙের ড্রেসিং গাউন পরে একটি চেয়ারে আসন করে বসে তিনি পাইপে ধূমপান করছিলেন। বড় বড় চুলগুলি তাঁর মুখের উপর অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে ছিল। সেই বাড়ির সামনের ঘরে রাজযোগের ক্লাস হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো মিনিট পর পর্যন্ত আমাদের সাক্ষাৎকারটি চলেছিল। ক্লাসের ব্যবস্থাপক এক ভদ্রমহিলা (নিঃসন্দেহে শ্রীমতী হ্যান্সবরো) ঐ ঘরে ঢুকে আমাদের আলাপের মাঝখানে বাধা দিয়ে বিস্মিত উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'একি স্বামীজী, আপনি যোগ ক্লাসের কথা একেবারে ভুলে গেছেন? পনেরো মিনিট সময় পেরিয়ে গেছে! আর ঘরভর্তি লোক বসে আছে।' স্বামীজী তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'ও হো; আমায় মাপ কর। এখনই চল আমরা বাইরের ঘরে যাই।' আমরা হলের মধ্যে দিয়ে সামনের ঘরে ঢুকলাম। তিনি তাঁর শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে ঐ ঘরে এলেন। আমরা যে ঘরে আগে বসেছিলাম সেটি ও এই সামনের ঘরের মাঝখানে ছিল স্বামীজীর ঘর। আমি আসন নেবার আগেই তিনি এ ঘরে এসে গেছেন এবং সবিস্ময়ে দেখি ইতিমধ্যেই পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো এবং সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ পরা। সে ঘর থেকে এলোমেলো চুল আর ঘরোয়া পোশাক পরা অবস্থায় তাঁর ঘরে ঢোকার পর একটি মিনিটও কেটেছে কিনা সন্দেহ। তাও তিনি বেশ ধীরে-সুস্থে সামনের ঘরে এলেন, বক্তৃতা দেবার জন্য প্রস্তুত। তীব্রগতিতে নিখুঁত কাজ করার এমন আশ্চর্য দক্ষতা ছিল তাঁর।"

সবকিছুই চলছিল স্বামীজীর নিয়ন্ত্রণে। একদিন শ্রীমতী হ্যান্সবরো রান্নাঘরের কাজে খুব ব্যস্ত, ক্লাসে যেতে পারবেন না। তিনি স্বামীজীর জন্য পুষ্টিকর একটি সুপ তৈরি করছিলেন—সেটি ঘণ্টা কতক ফোটা চাই। স্বামীজী ক্লাসে যাবার আগে রান্নাঘরে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি ক্লাসে যাবেন কিনা। শ্রীমতী হ্যান্সবরো জানালেন আগে

থেকে কাজগুলি ঠিকমত গুছিয়ে রাখেননি বলে তাঁকে রান্নাঘরেই থাকতে হবে। স্বামীজী বললেন, 'বেশ, ঠিক আছে। আমি তোমার জন্য ধ্যান করব।' বহু বছর পরে শ্রীমতী হ্যান্সবরো স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, "যতক্ষণ ক্লাস চলেছিল আমি অনুভব করেছিলাম যে সত্যিই তিনি আমার জন্য ধ্যান করেছেন। আর জান কি, আমি সর্বদাই অনুভব করি যে তিনি এখনও আমার জন্য ধ্যান করেন।"

সেদিনের ব্যাপারে স্বামীজী তাঁকে কিছু ভর্ৎসনা করেননি। কিন্তু অন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে—ভালভাবে কাজের পরিকল্পনা না করা অথবা ছোটখাট বিষয়ে কোনও অবহেলার জন্য তিনি তাঁকে বকতেন। টার্ক স্ট্রীটে বাসের প্রথম থেকেই শ্রীমতী হ্যান্সবরো বুঝেছিলেন যে স্বামীজীর খুঁটিনাটি সব বিষয়ে কত নজর। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় বাথটবের ব্যাপারটি। সেটি ছিল দস্তা দিয়ে তৈরি (তখনও সাধারণের ব্যবহারের জন্য চীনেমাটির টবের প্রচলন হয়নি) এবং তাকে পরিষ্কার করা খুবই অসুবিধাজনক। শ্রীমতী হ্যান্সবরো বলেছেনঃ "টবটিকে প্রত্যহ আমায় দেখেশুনে রাখতে হত। স্বামীজী আমায় নিয়মিত জিগ্যেস করতেন—আমি সেটি ভাল করে ধুয়েছি কিনা। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন ভীষণ খুঁতখুঁতে এবং ঠিক কাজটি আদায় করে নিতে পারতেন। আর এতকাল পরে এখন আমার মনে হয়, ঐ টবের জন্য যা কিছু করেছি, তাতে টবের চেয়ে আমারই ভাল হয়েছে। স্বামীজী ওটি নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ রাগারাগি করতেন। একদিন আমি তিনবার করে টবটি সাফ করেছি। তৃতীয়বারের পরও তিনি অভিযোগ করলেন—সেটি নিশ্চয়ই ভাল করে ধোওয়া হয়নি। তখন আমি বললাম, 'বেশ স্বামীজী, আমি বাথটবটি তিন-তিনবার মেজেছি, তাতেও যদি এতে স্নান করতে না পারেন, তবে মনে হয় আপনাকে স্নান না করেই থাকতে হবে।' তখন তিনি ক্ষান্ত হলেন আর স্নানও সেরে নিলেন।"

তাঁর স্মৃতিকথায় অন্য এক সময় তিনি বলেনঃ "উনি আমাকে প্রায়ই বকাঝকা করতেন। সর্বদাই কাজের খুঁত ধরতেন আর কখনও কখনও তাঁর ব্যবহার খুবই রূঢ় মনে হত। স্বামীজী রাগ করে বলতেন, 'মা কতকগুলো নির্বোধকে পাঠিয়েছেন আমার সঙ্গে কাজ করতে'।" কিন্তু প্রচণ্ড ধমক দেবার পর তিনি আবার শ্রীমতী হ্যান্সবরোর খোঁজ করতেন এবং 'তুমি কি করছ'—এই কথাটি এমন কোমল স্বরে, এত শীতলভাবে বলতেন যেন মনে হত তখন তাঁর মুখের তাপাঙ্কে মাখন বা মধু দিলেও গলবে না।

স্বামীজী ছিলেন করুণার প্রতিমূর্তি। এমনকি তাঁর ভর্ৎসনাতে করুণারই প্রকাশ ছিল। তিনি বলতেন, 'যাদের আমি সবচেয়ে ভালবাসি, তাদেরই বেশি বকি।' কিন্তু বকুনি-বিধ্বস্ত শ্রীমতী হ্যান্সবরো তখন ঐ কথাগুলি শুনে ভাবতেন, 'এ হল ক্ষমা প্রার্থনার একটা দুর্বল প্রচেষ্টা।' পরে অবশ্য তিনি স্বামীজীর কথার সত্যতা ঠিকই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলতেন, 'স্বামীজী যদি আমার প্রতি এমন কৃপাময় না হতেন তবে কখনই এত করে শাসন করতেন না।' অ্যালিস হ্যান্সবরো স্মৃতিচারণ করে আরও বলেছিলেন, একবার সানফ্রান্সিস্কোয় থাকাকালে তাঁর মন খুবই ব্যাকুল হয়েছিল নিজের ছোট্ট মেয়ে ডরোথিকে কাছে পাওয়ার জন্য প্যাসাডেনায় যেতে। তিনি স্মৃতি মন্থন করে বলেনঃ "আমি শেষ পর্যন্ত লস এঞ্জেলসে যাব মনঃস্থ করলাম। দিন ঠিক করে ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে ট্রেন ধরবার জন্য প্রস্তুত। হঠাৎ কোথা থেকে আমি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'তুমি যেতে পাবে

না। যাবার চেষ্টাও করবে না।' কোনও অজ্ঞাতকারণে আমি তখন যেন একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়লাম। এমন অবস্থা হল যে মেঝেতেই শুয়ে পড়তে হল। মনে হল একটু কিছু খাই কিন্তু নড়তেও পারলাম না আর সুটকেসগুলোর দিকে তাকাতেই পারছিলাম না। তাই বাধ্য হয়েই ভেবে নিলাম আমার তবে যাওয়া হবে না। কিন্তু স্বামীজী আমাকে কিছুই তো বলেননি! আমি জানি না, সেদিন আমি কার কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম।"

তিনি কি করেই বা যাবেন? তিনি যে তখন ঐ স্থান ছেড়ে কোথাও যেতে পারেন এমন কথা তো জগজ্জননীর নাটকের পাতায় লেখা ছিল না! শ্রীমতী হ্যান্সবরো যে শুধু স্বামীজীর বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করতেন তা তো নয়, একাধারে তিনি ছিলেন স্বামীজীর সচিব, কোষাধ্যক্ষ, হিসাব-রক্ষক ও তহবিলদার। একটি ছোট কালো সুটকেস নিয়ে তিনি ঘুরতেন। তার মধ্যে কাজ সম্পর্কিত যাবতীয় জিনিসপত্র অর্থাৎ নোটবই, বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু, সংগৃহীত অর্থ বা টিকিট বিক্রির টাকা ইত্যাদি থাকত। স্বামীজীর শ্রোতাদের কাছে শ্রীমতী হ্যান্সবরো ছিলেন অতি পরিচিত মূর্তি। এক মহিলা তাঁর সম্বন্ধে একটু তির্যক মন্তব্য করেছিলেন, 'ঐ যে, স্বামীজীর পিছনে কালো সুটকেস হাতে সদা ধাবমান মহিলা!' কিন্তু ঐ কালো সুটকেসে থাকত স্বামীজীরই উপার্জিত অর্থ। শ্রীমতী হ্যান্সবরো পরে কোনও সময় ঐ টাকা ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়ে সেগুলিকে কুড়ি ডলারের সোনার খণ্ডতে পরিণত করে নিতেন। আর ঐ সোনার খণ্ডগুলি রাখতেন একটি টি-পটে, সেটি ভরে গেলে ফ্ল্যাটের আরও নানা পাত্রে রেখে দিতেন। বক্তৃতাসভার প্রবেশমূল্য হিসাবে স্বামীজী নিতেন পঞ্চাশ সেন্ট (তিনদিনের একটি ধারাবাহিক বক্তৃতামালার জন্য এক ডলার)। বাড়ি ভাড়া দেওয়া ও মুদির জিনিস কেনার জন্যই এই অর্থসংগ্রহ। স্বামীজী এও আশা করতেন এভাবে তাঁর ভারতীয় কাজের মতো যথেষ্ট টাকা যোগাড় যদি নাও হয় তবে অন্তত তাঁর দেশে ফেরার পথ-খরচটা উঠুক। যেসব ক্লাসে তিনি গভীরভাবে আধ্যাত্মিক উপদেশাদি দিতেন সেগুলির জন্য কোনও প্রবেশমূল্য ছিল না। শ্রীমতী অ্যাসপিন্যাল মনে করতেন তাঁর কোনও বক্তৃতার জন্য প্রবেশমূল্য গ্রহণ না করা উচিত। 'হোম অব ট্রুথে'র নীতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী তিনি বলতেন, 'ভগবান ঠিকই ব্যবস্থা করবেন।' আর স্বামীজী রহস্য করে বলতেনঃ 'মহাশয়, ভগবান সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। আমি চেষ্টা করছি তাকে সরল করতে।'

সানফ্রান্সিস্কোয় থাকার সময়ে স্বামীজী কেব্‌ল কারে শ্রীমতী হ্যান্সবরোর সঙ্গে শহরের আশে পাশে বেড়াতেও যেতেন। স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেনঃ "ক্লাস না থাকলে তিনি দিনের বেলায় প্রায়ই বাইরে যেতেন। স্বামীজী ভালবাসতেন আমার সঙ্গে বাজারে যেতে। কোনদিন হয়তো মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বাইরে যেতেন অথবা কোনদিন গোল্ডেন গেট পার্কে গিয়ে একটু ঘোড়ায় চড়ে আনন্দ পেতেন।" অনেক সময় তাঁরা সমুদ্রতীরের বিখ্যাত ক্লিফ্ হাউসেও যেতেন। কোনও কোনও সময় স্বামীজী যেতেন চায়না টাউনে; সেখানকার চীনারা তাঁকে ভারতাগত মহাত্মা জেনে সমাদর জানাত। তাঁকে পেয়ে তারা যেমন খুশি হত—তিনিও তাদের কাছে গিয়ে তেমনি আনন্দ পেতেন।

দিনের বেলার এমনসব ঘোরাঘুরি বাদে, কোনও দিন বক্তৃতা না থাকলে কদাচিৎ তিনি নৈশাহার করতে বাইরে যেতেন। আবার সভা থাকলেও বক্তৃতার শেষে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে কাছাকাছি কোনও আইসক্রীমের দোকানে গিয়ে জলযোগ করতেন।

স্বামীজী আইসক্রীম খুব ভালবাসতেন, বিশেষ করে চকোলেট আইসক্রীম। আর বলতেন সেটি নাকি তাঁর গাত্রবর্ণসদৃশ। শ্রীমতী হ্যান্সবরো নন, শ্রীযুক্ত অ্যালেন নামে এক যুবক এ বিষয়ে একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। ইনি অকল্যাণ্ডে প্রথম স্বামীজীর ভাষণ শোনেন এবং পরবর্তী দীর্ঘজীবনে তিনি বৈদান্তিকই ছিলেন। মিঃ অ্যালেন লিখেছেনঃ "স্বামীজী আমাদের আটজনকে আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে আইসক্রীম খাবার জন্য। আমরা দোকানে ঢুকে সবাই আইসক্রীমের অর্ডার দিলাম। কিন্তু পরিবেশনকারিণী মেয়েটি নিয়ে এল নটি আইসক্রীম সোডা। আমরা কেউ সেটা পছন্দ করি না, স্বামীজীর তো কথাই নেই। মেয়েটিকে তার ভুল ধরিয়ে দেওয়া হলে সে জানায় যে সে সোডার বদলে আইসক্রীমই এনে দেবে। এই বলে সে যেই আনতে যাচ্ছে তখন দোকানের ম্যানেজার তাকে থামিয়ে বদমেজাজী মন্তব্য করতে থাকলে স্বামীজী বলে ওঠেন, 'দেখুন, ও বেচারিকে ধমক দেবেন না। যদি তা করেন তবে আমি একাই সব কটা সোডা খেয়ে নেব'।" মিঃ অ্যালেন জানাননি যে স্বামীজী সেদিন শেষপর্যন্ত আইসক্রীম পেলেন কিনা। তবে সন্দেহ নেই যে তিনি পেয়েছিলেন আর মেয়েটিও আর বকুনি খায়নি। আর এও নিশ্চিত যে স্বামীজী শ্রীমতী অ্যালেনের দিকে ফিরে সহর্ষে বলে থাকবেন (যেমন তিনি আইসক্রীম খেতে গেলে অনেক সময়ে বলতেন)ঃ 'এ হল দেবতাদের ভোগ, বুঝলেন মহাশয়া, দেবতাদের ভোগ।'

শ্রীমতী হ্যান্সবরো এবং শ্রীমতী অ্যাসপিন্যাল সানফ্রান্সিস্কো বাসকালে বৈষয়িক কাজের সব দেখাশোনার ভার নেওয়ায় স্বামীজীর স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল এবং তিনিও খুব উচ্চভাবে থাকতেন। তাঁর মন বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করত; কখনও অতি গভীরে, একেবারে ব্রহ্মসমীপে, এমনকি তাঁর চিরবাঞ্ছিত ব্রহ্মচৈতন্যে মগ্ন হবার মতো অবস্থায়। আর সেই উচ্চভাবের দীপ্তি এইসব ছোটখাট ঘটনার মধ্যে দিয়ে বিকিরিত হয়ে সেগুলিকে আলোকিত করে তুলত। সেই আলোকরশ্মি প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিতে চিরদিনের মতো ভাস্বর হয়ে আছে। ছোট ছোট ব্যাপার, যেমন, তাঁর একটি কথা, কোনও একটি ভঙ্গি, একটু হাসি বা এমনকি এতটুকু ভ্রূকুঞ্চন—তা সবই মহান ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠত, কেননা তাদের পিছনে ছিল সেই এক বিবেকানন্দরূপ মহান জ্যোতি। সানফ্রান্সিস্কোয় প্রদত্ত সব ভাষণে, তাঁর ঘরোয়া ক্লাসগুলিতেও নিশ্চয়ই ঐ মহান আলোকের অপূর্ব উদ্ভাস থাকত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সানফ্রান্সিস্কোর বক্তৃতা ও ক্লাসগুলি ছিল বিবেকানন্দের মহত্তম বাণীর প্রচার—তিনি নিজেই এমন কথা বলতেন বলে শোনা যায়।

উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়ায় স্বামীজী যেসব অতি মূল্যবান ও সুউচ্চ আদর্শ প্রচার করেছিলেন, সেগুলির বিষয়ে এখানে অন্তত আমি বলার চেষ্টা করব না যদিও ঐসব ভাষণ ও শিক্ষাদানের জন্যই তাঁর এই সফর এত স্মরণীয় হয়ে আছে। বরং আমি সেইসব অর্থাৎ ঐ বাথটব বা আইসক্রীমের মতো ছোটখাট ঘটনার কথাই বলব কারণ এরাও প্রকাশ করেছে স্বামীজীরই মহিমাকে।

টার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে স্বামীজী শ্রীমতী হ্যান্সবরো এবং শ্রীমতী অ্যাসপিন্যালসহ একমাসের কিছু বেশি সময় বাস করেছিলেন। এপ্রিলের ১১ তারিখে তাঁরা সবাই চলে যান অ্যালামিডার 'হোম অব ট্রুথে'। স্থানটি হল সানফ্রান্সিস্কো উপসাগরের তীরে একটি

শহর। প্রশস্ত লন এবং বাগানে ঘেরা 'হোম অব ট্রুথে'র (অ্যালামিডা) এই ভিক্টোরীয় রীতির বাড়িটি ছিল বিশাল। স্বামীজী আমন্ত্রিত হয়ে এখানে এসে বাস করেন এবং বাইরের সভাগৃহগুলিতে ভাষণ দান করেন।

টমাস অ্যালেনের পত্নী এডিথ অ্যালেন এই সময়কার কথা কিছু কিছু বলেছেন। তিনি আগেই সানফ্রান্সিস্কোয় স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে তিনি তখন বড় অসুখী, তাই স্বামীজী তাঁর প্রতি ছিলেন খুবই সদয়। রান্নাঘরের কাজে স্বামীজী তাঁকে সাহায্য করতেন, মধ্যাহ্ন আহার তৈরির ফাঁকে ফাঁকে এই মহিলার সঙ্গে তিনি বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন। শ্রীমতী অ্যালেন পরবর্তী কালে বলতেনঃ "আমার কাছে তিনি ছিলেন স্বয়ং করুণা। অনেকেই দেখি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভয় উদ্রেককারী বিপুল শক্তির দিকেই বেশি জোর দেয়। কিন্তু তাঁর স্বভাবের অপর একটি দিক হল, তাঁর মহান ভালবাসা। তিনি যেন এক অতি কোমলস্বভাবা স্নেহময়ী মা।" স্বামীজী যখন অ্যালামিডায় আসেন তখন শ্রীমতী অ্যালেন ওখানেই থাকতেন। তাই প্রায় প্রত্যহই তিনি তাঁকে দেখতে যেতেন। তিনি স্মৃতিচারণ করেছেনঃ "স্বামীজী ছিলেন বহুমুখী ব্যক্তিত্বের মানুষ। তিনি কখনও বেদান্তকেশরী, কখনও আবার একটি সরল শিশুমাত্র। আমার কাছে তিনি সর্বদাই ধৈর্যশীল এবং স্নেহবৎসল পিতামাতার মতো। তাঁর কাছে কোনও কিছুরই মর্যাদা এত সামান্য ছিল না যাকে তিনি তুচ্ছজ্ঞান করবেন। এমন ভালবাসা ভাবা যায়! আমাকে তিনি তাঁকে 'স্বামী' (স্বামীজী) সম্বোধন না করে ভারতে শিশুরা যেমনটি বলে থাকে সেইরকম 'পিতাজী' বলে ডাকতে শিখিয়েছিলেন।"

ঐ সময়ে স্বামীজী তাঁকে অনেক কিছু বলেছিলেন, সেসব তিনি তাঁর অবশিষ্ট জীবনে মনে রেখেছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ 'এই মাটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন একটি পিঁপড়ের চেয়ে যদি আমি নিজেকে বড় মনে করি, তবে আমি মূর্খ।' অথবা "উদারমনা হও, সর্বদা উভয় দিকই দেখতে হবে। যখন আমি উচ্চভাবে থাকি তখন বলি 'শিবোঽহং, শিবোঽহম্'। কিন্তু যখন পেটব্যথা করে তখন বলি 'মাগো, আমায় দয়া কর'।"

অ্যালামিডা 'হোম অব ট্রুথে' অবস্থানকালে অনেক অসামান্য ঘটনার মধ্যে এক দিনের কথা বলা যায়। প্রাতরাশের পরে স্বামীজী শ্রীমতী হ্যান্সবরো, শ্রীমতী অ্যাসপিন্যাল এবং ঐ হোমের দুটি নেতার সঙ্গে বসে আছেন—তখনই ব্যাপারটা ঘটে। শ্রীমতী হ্যান্সবরো তাঁর স্মৃতি থেকে বলেছেন, সেদিন স্বামীজী তাঁর আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁদের কাছে অনেক কথা বলেছিলেন, অনেক গল্পও শুনিয়েছিলেন। এদিনটির অসাধারণত্ব এই যে—স্বামীজী বলে চলেছেন—আর তাঁর শ্রোতাদের স্থান-কালের বোধ পুরোটাই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। একথা বোঝাতে গিয়ে শ্রীমতী হ্যান্সবরো বলেনঃ "আমরা কেউ আমাদের চেয়ার ছেড়ে উঠিনি। স্বামীজী যখন থামলেন, তখন বিকেল পাঁচটা বাজে। পরে ঐ বাড়ির দুটি কাজের মহিলা আমাদের বলেছিলেন যে টেবিল পরিষ্কার করার জন্যে, রান্নাঘরের দিক দিয়ে তাঁরা খাবারঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছেন দু-দুবার। কিন্তু তাঁরা দরজা খোলা পাননি। তাঁরা ভেবেছিলেন আমরাই হয়তো এভাবে দরজা বন্ধ করেই বসেছি অতএব আমাদের বিরক্ত করা ঠিক হবে না। এমনকি যখন স্বামীজী তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করলেন তখন একমাত্র শ্রীমতী অ্যাসপিন্যালই একটু কিছু খাওয়ার কথা ভেবেছিলেন।"

স্বামীজী তাঁদের যেন অন্য এক জগতে নিয়ে গিয়েছিলেন—যেখানে তিনি স্বয়ং নিত্যস্থিত—সেই দুরধিগম্য নৈর্ব্যক্তিক সত্তার প্রবেশদ্বারে। তখন তিনি তাঁর সহজাত অতীন্দ্রিয় চেতনার জগতেই বিচরণ করছেন। কিন্তু আমরা সেই নৈর্ব্যক্তিক অবস্থায় পৌঁছানো দূরের কথা, চিন্তা করতেও ভয় পাই। টমাস অ্যালেন তাঁর স্ত্রীসহ অ্যালামিডায় ছিলেন। একবার যখন তিনি স্বামীজীকে সাদর সম্ভাষণ করে সোচ্ছ্বাসে বলেন, 'স্বামীজী, আমরা আপনাকে এই অ্যালামিডায় পেলাম।' স্বামীজী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'না, মিঃ অ্যালেন, আমি অ্যালামিডায় নেই, অ্যালামিডাই রয়েছে আমার ভিতরে।' তিনি বোধহয় তখন আপন সর্বব্যাপী সত্তাকেই দিবারাত্র অনুভব করতেন।

সানফ্রান্সিস্কো থেকে অ্যালামিডায় আসার কিছু পরেই লিখিত স্বামীজীর একটি বিখ্যাত চিঠি থেকে আমি একটু উদ্ধৃতি দেব। এটি যেন অ্যালামিডা থেকে নয়, লেখা হয়েছে সেই অপর লোক থেকেইঃ "বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে। রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান! 'যাই, প্রভু যাই।'...

"আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশি; এত যে কষ্ট পেয়েছি, তাতেও খুশি; জীবনে যে বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুশি। আবার এখন যে নির্বাণের শান্তিসমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি তাতেও খুশি। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না অথবা এমন বন্ধন আমি কারো কাছ থেকে নিয়েও যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক অথবা দেহ থাকতেই মুক্ত হই—সেই পুরোনো 'বিবেকানন্দ' কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে—আর ফিরছে না।...

"এ অবস্থায় জগতটা রয়েছে কিন্তু সেটাকে সুন্দরও মনে হচ্ছে না, কুৎসিতও মনে হচ্ছে না।... আহা, এ যে কি আনন্দের অবস্থা! যা কিছু দেখছি, শুনছি, সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্ছে, কেননা নিজের শরীর থেকে আরম্ভ করে তাদের সকলের ভিতর বড় ছোট, ভালমন্দ, উপাদেয়-হেয় বলে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চনীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে। ওঁ তৎ সৎ।"

এর পরের পাঁচ-ছটি সপ্তাহও স্বামীজী ক্যালিফোর্নিয়া ছেড়ে যাননি। কিন্তু এখানে থাকাকালেই, বিশেষত আমার মনে হয় সানফ্রান্সিস্কোয় অবস্থানের সময়ই তিনি জীবনের অন্ত্যপর্বে প্রবেশ করেছিলেন। বিশ্বজননী যে তাঁর এই নাটকে শ্রীমতী হ্যান্সবরো এবং শ্রীমতী অ্যাসপিন্যালকে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য পছন্দ করে নিয়েছিলেন, এটা তাঁরা তখন হয়তো জানতেন না। স্বামীজীকে সাহায্য করার জন্য, তাঁর কাজের (বাণীপ্রচার) ছোট-বড় বাইরের (বৈষয়িক) ঝামেলা থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্যই তাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন। অতএব এভাবে ভারমুক্ত হওয়া মাত্রই তাঁর মন আপন অনন্তলোকে যেন ডানা মেলেছিল।

স্বামীজীর সঙ্গে এই ছোট দলটি সানফ্রান্সিস্কো থেকে অ্যালামিডা অভিমুখে যখন রওনা হচ্ছেন, তখন স্বামীজী শ্রীমতী হ্যান্সবরোকে বলেন, 'সত্যি, তুমি দৈত্যের মতো খেটেছ।' একথার চেয়ে আর কোনও শব্দসমূহ শ্রীমতী হ্যান্সবরোকে এতবেশি খুশি করতে পারত না।

প্রতিবন্ধী সেই মেয়েটি

প্রব্রাজিকা বরদাপ্রাণা
(সারদা কনভেন্ট, সান্টা বারবারা, ইউ.এস.এ)

তার পুরো নাম ছিল আইডা মেরিল উইঙ্কলি অ্যানসেল—নিউ ইয়র্ক শহরে জন্ম। পিতামাতার একমাত্র সন্তান আইডা—স্বভাবটি ভারি শান্ত, তাকে নিয়ে কারও কোনও সমস্যাই ছিল না। মাত্র দুবছর যখন বয়স, সেসময় আইডাকে বস্টনে এক বান্ধবীর কাছে রেখে নিজের স্বাস্থ্যের কারণে আইডার মা ক্যালিফোর্ণিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। এদিকে সেই ছোট্ট আইডাকে ঘিরে ক্রমে বেশ উদ্বেগ-আশঙ্কা দেখা দিল। কোমরে এক অসহ্য যন্ত্রণা বাড়তে বাড়তে শেষে পঙ্গু করে দিল আইডাকে। রোগ তো শুধু শরীরে নয়—শিশুর আনন্দময় জগৎ ধীরে ধীরে মুছে গেল তার জীবন থেকে, দুঃসহ এক বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রতিবন্ধী আইডার জীবনকে যেন দুর্বহ করে তুলল। আট বছরের অসুস্থ মেয়েকে নিজের কাছে এনে রাখলেন মা। চিকিৎসার জন্য অনেক ডাক্তার-বদ্যি দেখালেন কিন্তু কোনও সুরাহাই হল না। ক্যালিফোর্ণিয়ায় এসে পড়াশোনা এগিয়েছিল মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, সেইসঙ্গে আইডা শিখেছিল শর্টহ্যাণ্ড আর টাইপিং। শেষ পর্যন্ত সানফ্রান্সিস্কোয় 'হোম অব ট্রুথে' মিস লিডিয়া বেলের কাছে এল আইডা। মিস বেলের সূত্রেই ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটল। 'হোম অব ট্রুথে' মিস বেল তখন ভগবদ্গীতার ক্লাস শুরু করেছেন। নিঃসঙ্গ আইডা মিস বেলের স্নেহ-সহানুভূতির স্পর্শে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর বিশেষ অনুগত ভক্ত হয়ে পড়ল।

এমন সময় এল এক সাড়া জাগানো 'খবর'—স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতার জন্য সানফ্রান্সিস্কোয় আসছেন। 'হোম অব ট্রুথে' খবরটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার যেন ঝড় বয়ে গেল। স্বামীজীর প্রথম ভাষণ শোনার সৌভাগ্য যেদিন হল, তার একুশ বছরের বিষণ্ণ জীবনে সেইদিনটি এক পরম আশীর্বাদ! অভিভূত হলেন আইডা। 'স্মৃতিকথা'য় লিখে রেখেছেনঃ 'তাঁকে মনে হয় যেন কোন সুদূরের পার হতে আসা এক জ্যোতির্ময় পুরুষ।'[১] এরপর সেই ঐশী মানুষটি সানফ্রান্সিস্কো, ওকল্যাণ্ড, অ্যালামিডায় যত ভাষণ দিলেন অসুস্থ শরীরের বাধাকে উপেক্ষা করে কী এক মুক্তির আনন্দে তার প্রত্যেকটিই শুনতে গেলেন আইডা। সেই বক্তৃতা শোনার তিন সপ্তাহ পরেই কী জানি কেন আইডার মনে হল তার অধীত শর্টহ্যাণ্ড-বিদ্যাটি কাজে লাগিয়ে স্বামীজীর উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গগুলির নোট রাখলে কেমন হয়! অবশ্যই সে নোট শুধু তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে—সুদূর ভবিষ্যতে প্রাচ্যের

মহান ঋষির উদারতম বাণীর অনুধ্যান করে তিনি নিজেই যাতে উপকৃত হন। স্বপ্নেও ভাবেননি যে একদিন ঐ নোটগুলির জন্য আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের শত শত ভক্ত উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করে থাকবে।

কাজে নেমে আইডা দেখলেন সাধ তার যত বড়, সাধ্য তত নয়। মিস বেলের ভাষণ দ্রুতলিপিতে ধরে রাখার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বেই ছিল—কিন্তু সে তো খুব সহজ কাজ। মিস বেল বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হয়ে ধীরে সুস্থে নিজের বক্তব্য উপস্থাপনা করতেন। সত্যি বলতে কি, তাঁর প্রত্যেকটা শব্দই আইডা নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারত।' আর স্বামীজী! তাঁর তো কোনও পূর্ব প্রস্তুতি নেই, দিব্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি যখন হাজার হাজার শ্রোতার সামনে চিন্তাজগতের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতেন তখন তাঁর সেই দ্রুত, সুপ্রযুক্ত শব্দগুলিকে হুবহু ধরে রাখার ক্ষমতা বেচারা আইডার ছিল না। উত্তরকালে নিজেই বলেছেনঃ "মিনিটে ৩০০ শব্দ লিখতে পারে এমন কোনও দক্ষ দ্রুতলিপিকার ছাড়া সে দুর্বার শব্দস্রোতকে কে ধরে রাখবে। আমার লেখার গতি তখন এর অর্ধেকও নয়। আর সেই অপূর্ব বাগ্মিতার সঙ্গে ছিল স্বামীজীর ভাষণদানের ভঙ্গি। বক্তৃতার মধ্যে মধ্যে তিনি নাটকীয় ভঙ্গিতে যেসব গল্প বলতেন, সেগুলি উপভোগ করতে গেলে লেখার গতি আপনা থেকেই শ্লথ হয়ে আসত, নিবিষ্টচিত্তে সেই বক্তৃতার সবটুকু মাধুর্য অনুভব করাতেই তখন শ্রোতাদের পরিতৃপ্তি।"[২]

ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীজী তিনটি বক্তৃতা দেন ও কয়েকটি ক্লাস নেন। ৪ মার্চ থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় হয় সানফ্রান্সিস্কোয়, নয়তো ইস্ট বে-তে স্বামীজীর বক্তৃতা থাকত। একাদিক্রমে বক্তৃতা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে, স্বামীজী জনাকয়েককে নিয়ে ঘরোয়া ক্লাস শুরু করেন। মিস অ্যানসেল ২৬ মার্চের সকালের ক্লাসে যোগ দিয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে সেদিনই তিনি আরও বেশি মনোযোগী ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত দ্বিপ্রাহরিক ক্লাসে যোগদানের আহ্বান পান। এই দুপুরের ক্লাসে যোগ দিয়ে স্বামীজীকে আরও অন্তরঙ্গ পরিবেশে দেখার সুযোগ পেলেন আইডা। যাঁরা আগে এসে পৌঁছতেন, তাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয় করে নিয়ে নানা গল্প ও পরিহাস করতেন। ক্লাসে ধ্যানের জন্য নির্দিষ্ট সময় থাকত এবং স্বামীজী অল্পস্বল্প প্রাণায়ামও শেখাতেন। পরবর্তী ঘণ্টা চলত প্রশ্নোত্তর পর্ব।

একরাত্রে, স্বামীজীর বক্তৃতার আগে 'হোম অব ট্রুথে' তাঁর জন্য এক নৈশভোজ আয়োজিত হয়। মিস অ্যানসেল সহ আরও কিছু ছাত্রছাত্রী এতে যোগদান করেন। শ্রীমতী সি. ডাবলিউ স্টীল বিভিন্ন পদ রান্না করেছিলেন। খাবারের সঙ্গে স্বামীজীকে কিছু খেজুর জাতীয় সুস্বাদু ফল খেতে দেন শ্রীমতী স্টীল। স্বামীজী সেগুলি খুব তারিফ করে খেয়েছিলেন। ঐদিন পরে শ্রীমতী স্টীল স্বামীজীকে বক্তৃতার জন্য অভিনন্দিত করলে স্বামীজী উত্তরে বললেনঃ 'মহাশয়া! এ আপনারই খেজুরের কল্যাণে সম্ভব হল।'[৩]

ক্যালিফোর্নিয়ায় কয়েক মাস কাটিয়ে শিকাগোর উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে স্বামীজী স্থির করলেন আলামিডার ক্যাম্প টেলরে কিছুদিন বিশ্রাম নেবেন। "প্রকৃতপক্ষে জায়গাটির নাম ক্যাম্প আর্ভিং কিন্তু পার্শ্ববর্তী ক্যাম্প টেলর জনসাধারণের কাছে বেশি পরিচিত ছিল। ক্যাম্প আর্ভিং ছিল মিঃ জুলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ১৯০০ সালের বসন্তে

মিঃ জুল মিস লিডা বেলকে ঐ ক্যাম্প কিছুদিনের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। স্বামীজী ২ মে ক্যাম্প টেলরে উপস্থিত হবার পূর্বেই মিস বেলের পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, তার মধ্যে মিস আইডা অ্যানসেলও ছিলেন, সেখানে হাজির হন। স্বামীজীর সঙ্গে অ্যালামিডার ক্যাম্পে এক অন্তরঙ্গ পরিবেশে একত্র বাসের সুযোগ লাভ এঁদের জীবনে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

ঐ ক্যাম্পে একটি পাকশালা, একটি খাবার ঘর, স্বামীজীর জন্য নির্দিষ্ট একটি তাঁবু ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি তাঁবু ছিল। রেডউড গাছের ছায়াঘেরা এক টুক্‌রো ছোট জমি ব্যবহৃত হত ক্লাসঘর বা উপাসনালয় হিসেবে। স্বামীজী শিবিরবাসিনীদের বলতেনঃ 'কল্পনা কর, তোমরা যেন অরণ্যচারী ভারতীয় যোগী, অদূরে প্রবাহিতা ছোটনদীটি যেন মা গঙ্গা।'

প্রথম রাত্রেই ধুনির আগুন ঘিরে বসা সকলকে স্বামীজী শেখালেন কীভাবে ধ্যান ও জপ করতে হয়। নদীর দিকে মুখ করে উচ্চকণ্ঠে তিনি বারবার বলতে লাগলেনঃ 'হর হর ব্যোম ব্যোম।' কখনও সখনও ধুনির চারপাশে বসে স্বামীজীর মুখে শুকদেব বা ব্যাসের গল্প শুনতেন এঁরা।

সেই প্রথম রাত্রির কথা মনে করতে গিয়ে মিস অ্যানসেল বলেছেনঃ 'কী বলেছিলেন তিনি হুবহু মনে নেই। কিন্তু যখনই আমার সে কথা মনে পড়ে, আমি যেন অনুভব করতে পারি সেই রাত্রির ধ্যানের সুমহান শক্তি এবং শান্তির কথা।'[৪] উপস্থিত ব্যক্তিদের মতে, স্বামীজীকে ক্যাম্প টেলরে দেখে মনে হত যেন পরম আনন্দে আছেন।

যদিও ক্যাম্প টেলরে স্বামীজী এসেছিলেন বিশ্রামের উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু সারাটি সকাল তিনি ছাত্রদের সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনের আলোচনায় এবং তাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেই কাটিয়ে দিতেন। সর্বদা তিনি বলতেন, জগন্মাতা সর্বভূতে এবং সর্বজীবে বিরাজিত। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রত্যেকের মধ্যে সেই আদ্যাশক্তি জগজ্জননীকেই দেখতে হবে।

ক্যাম্পের দিনগুলি ছিল নিজস্ব ছন্দে বাঁধা। প্রতিদিন প্রাতরাশের পর সকাল দশটা, সাড়ে দশটা নাগাদ মিস বেলের তাঁবুতে ধ্যানের আসর বসত, সেইসঙ্গে চলত ধর্মপ্রসঙ্গ। স্বামীজী শিবিরবাসিনীদের শুধু উচ্চচিন্তার রাজ্যে উন্নীত করাতেন না, ক্লাসের পর ভারতীয় ব্যঞ্জন রেঁধেও খাওয়াতেন। দুটি পাথর নিয়ে দেখাতেন কিভাবে ভারতে মশলা বাটা হয়। মিহি করে গুঁড়ানোর ফলে রান্নায় ঝাল হত খুব। স্বামীজী কিন্তু এর ওপরও লঙ্কা চিবিয়ে খেতেন। একদিন তিনি মিস অ্যানসেলকে একটি কাঁচা লঙ্কা চেখে দেখতে বলেন। বলেন এটি খেলে নাকি তার খুব উপকার হবে। স্বামীজী-প্রদত্ত কোনও কিছু যে ফেরানো অসম্ভব তা ভালই জানা ছিল মিস অ্যানসেলের। কাজেই বস্তুটি গলাধঃকরণ করতে হল—এর ফল হল দুর্বিষহ। কিন্তু স্বামীজীর কাছে গোটা ব্যাপারটা বেশ মজার মনে হল। সারা দুপুর তিনি খবর নিতে লাগলেনঃ 'কি গো তোমার উনুনের কি অবস্থা!'[৫] মিস অ্যানসেল পরবর্তী কালে ব্যাপারটিকে খুব গুরুত্ব দিতেন। স্বামীজী বোধহয় আইডার মনে কোনও গভীর দাগ ফেলতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত মিস বেলের প্রতি আইডার অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা সম্পর্কে তাকে সচেতন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কারণ যাই হোক, স্বামীজী চাইতেন আইডার নিজস্ব বিচারক্ষমতা জেগে উঠুক। একদিন মিছরি তৈরি শেখাতে শেখাতে

বললেনঃ 'চিনি যত পাক করবে ততই সাদা হবে।'[৬] এর মধ্যে দিয়ে তাঁর খাঁটি বা নিখাদ হয়ে ওঠার সম্পর্কিত যে অন্তর্নিহিত বাণীটি উচ্চারিত হল, তা আইডা সারাজীবন মনে রেখেছিলেন।

ঐদিনগুলিতে মিস অ্যানসেলের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল সন্ধ্যাকালে ধুনির সামনে বসে ধ্যান ও সৎপ্রসঙ্গের আসর। স্বামীজী ধ্যানের জন্য এক একটি বিষয় স্থির করে দিতেন। যেমন, 'অবিচলিত এবং নির্ভীক হও' অথবা 'চিন্তা কর—আমিই সচ্চিদানন্দ'।

এক বিশেষ সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিস অ্যানসেলকে স্বামীজীর দুদিন আগে ক্যাম্প টেলর ছেড়ে যেতে হয়। পরবর্তী কালে তিনি এব জন্য অনেক দুঃখ করেছেন। ক্যাম্প থেকে যাওয়ার সময় স্বামীজী তাঁকে রেল লাইনের খাড়া সিঁড়িতে উঠতে সাহায্য করেছিলেন এবং হাত নেড়ে গাড়ি থামিয়ে ঐ গাড়িতে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

৩০ মে পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ সানফ্রান্সিস্কোয় থাকেন। প্যারিসে যাবার আগে তিনি ভগবদ্গীতার ওপর তিনটি বক্তৃতা দেন। শেষ বক্তৃতায় শ্রোতাদের বলেনঃ এরপর ভারতবর্ষ থেকে তিনি এমন এক গুরুভাইকে পাঠাবেন যিনি আচার-আচরণে যথার্থ ব্রাহ্মণ। স্বামীজী যে আদর্শের কথা তাঁদের এতদিন শুনিয়েছেন, ঐ সন্ন্যাসী হবেন তারই মূর্ত উদাহরণ।

স্বামীজীর সেই বহুপ্রশংসিত গুরুভাই হলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। সানফ্রান্সিস্কোয় তাঁর আগমন ১৯০০ সালের শেষার্ধে। আইডাকে তিনি দীক্ষা দেন—তার নাম হয় উজ্জ্বলা। অবশ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রায়ই তাকে স্নেহভরে 'বেবী' বলে ডাকতেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আইডাই তখন বয়সের বিচারে সর্বকনিষ্ঠা।

সানফ্রান্সিস্কো থেকে অনেক দূরে অসমতল প্রত্যন্ত প্রদেশের পাথুরে জমিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁর অনুগত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'শান্তি আশ্রম' গড়ে তোলেন। শান্তি আশ্রমের দিনগুলো ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। দৈহিক আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে তুরীয়ানন্দ তাঁর শিষ্যস্থানীয়দের ভারতবর্ষের কঠোর সংযত আশ্রমজীবনের সনাতন ধারায় অভ্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। গুরুর সান্নিধ্যে আইডা তাঁর আশৈশব লালিত ভীরুতা, দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে শিখলেন। শান্তি আশ্রমে গৃহস্থালীর নানা দায়িত্ব, বিশেষত স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে সেবা করার কিছু দুর্লভ সুযোগ আইডাকে দেওয়া হয়।

১৯০২-এর মাঝামাঝি স্বামীজীকে দেখার প্রবল আগ্রহ নিয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে কলম্বোয় পৌঁছে শুনলেন, স্বামীজী দেহত্যাগ করেছেন। এতদিন স্বামীজীরই আগ্রহে তুরীয়ানন্দ বিদেশে প্রচারের কাজ করতেন, তাঁর অবর্তমানে আমেরিকায় আর ফিরে গেলেন না কিন্তু চিঠিপত্রে ভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। এমনই এক চিঠিতে তাঁর পঙ্গু কন্যাটিকে উৎসাহ দিয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ লিখেছিলেনঃ "তোমার জন্য আমার স্নেহ ও আশিস সর্বদা থাকবে।... চরৈবেতি, বেবী, এগিয়ে চল। কোথায় কীভাবে আছ তা নিয়ে চিন্তা করো না, মাকে স্মরণ করো সর্বদা, সর্বত্র, সর্বভূতে। বাইরের বিষয় নিয়ে তোমার কি কাজ?"[৭] অন্য এক চিঠিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ উজ্জ্বলার কাছে জানতে চেয়েছেন যে সে ততদিনে মাখন হয়েছে কিনা। একদা উজ্জ্বলাকে তিনি দুগ্ধ মন্থন করতে করতে বর্জ্য থেকে আলাদা হয়ে খাঁটি মাখন কীভাবে উঠে আসে তার প্রণালী শিখিয়েছিলেন—আইডা নিজেও ঐরকম খাঁটি মাখন হয়ে উঠুক

এই ছিল তার জন্য গুরুর প্রার্থনা ও আশীর্বাদ।

আইডা সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারিণী যিনি স্বামীজীর তিন গুরুভাইকে দেখেছিলেন। নিউ ইয়র্ক থেকে স্বামী অভেদানন্দ মাঝে মাঝে পশ্চিম উপকূলে বক্তৃতা সফরে আসতেন। ১৯০৩ সালে স্বামী তুরীয়ানন্দের পর সানফ্রান্সিস্কোয় বেদান্তপ্রচারের দায়িত্বে এলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। সম্ভবত তাঁরই নির্দেশে হরিদাস নামে এক ভক্ত উজ্জ্বলাকে আজীবন দেখাশোনা করার ভার গ্রহণ করেন। হরিদাস অতিবিশ্বস্ততার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করতেন।

১৯৪৩ সাল নাগাদ আমার উজ্জ্বলা ও হরিদাসের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। তাঁরা হলিউড বেদান্ত মন্দিরে বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। উজ্জ্বলা ছিলেন মধুরস্বভাবা এবং অমায়িক; এছাড়া তাঁর মধ্যে ছিল পরকে আপন করার শিশুসুলভ গুণ। দেহবৈকল্য সত্ত্বেও তিনি ছিলেন খুবই তেজস্বিনী।

চল্লিশের দশকে স্বামী অশোকানন্দ উজ্জ্বলাকে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলি তাঁর শর্টহ্যাণ্ড নোট থেকে পুনরুদ্ধার করতে উৎসাহ দান করেন। কিন্তু নোটগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বেশ অসম্পূর্ণ ছিল। তাই উজ্জ্বলা স্বামী অশোকানন্দকে অনুরোধ করেন অনুলিখনগুলির সম্পাদনার ভার নিতে। অশোকানন্দ সম্মত হন। এভাবে মোট ষোলটি বক্তৃতা সম্পূর্ণ করা গিয়েছিল।

হরিদাসের মৃত্যুর পর ১৯৫০ সালে উজ্জ্বলাকে স্বামী প্রভবানন্দ হলিউড বেদান্ত সোসাইটিতে স্থায়িভাবে বাস করার আমন্ত্রণ জানান। তাঁর বয়স তখন সত্তরের কোঠায়। সিস্টার ললিতার (মীড ভগিনীদের অন্যতমা, পূর্ব নাম ক্যারী মীড ওয়াইকফ) ব্যবহৃত ঘরটিতে উজ্জ্বলাকে থাকতে দেওয়া হয়। সিস্টার ললিতা স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদধন্যা।

জন ইয়েল (পরে যিনি স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ নামে সুপরিচিত) অফিস সংক্রান্ত কাজকর্মে ব্যাপৃত রাখতেন উজ্জ্বলাকে। ছোটবেলায় উজ্জ্বলার স্বপ্ন ছিল নাম করা লেখিকা হওয়ার—সে বাসনা তাঁর পূর্ণ হয় স্বামীজীর দুর্লভ কিছু ভাষণ, পত্ররচনা এবং স্বামীজী ও তাঁর গুরুভ্রাতাদের পুণ্যস্মৃতিকে আশ্রয় করে।

উজ্জ্বলা এক অমূল্য উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তাঁর পত্রাবলী, তাঁর স্মৃতিলিখন এবং স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ প্রদত্ত বহু বক্তৃতার অনুলিখনগুলির মাধ্যমে। তিনি ছিলেন এক অত্যুৎসাহী পত্রলেখিকা। তাঁর, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লেখা এবং তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া পত্রগুলি থেকে শান্তি আশ্রম সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়, সেগুলি আমেরিকায় রামকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে প্রামাণ্য ইতিহাস।

আশ্রম-সদস্যা উজ্জ্বলা সেই বৃদ্ধবয়সেও ছিলেন শিশুর মতো প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ। তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল চকোলেট অথবা সুস্বাদু কোনও মিষ্টি। বাইরে থেকে দেখলে তাঁর আধ্যাত্মিক গভীরতা পরিমাপ করা সহজ ছিল না।

অন্যদিনের মতো সেদিনও আশ্রমিকরা সমবেত হয়েছিলেন স্বামী প্রভবানন্দের ঘরে। নানাপ্রসঙ্গের মধ্যে স্বামী প্রভবানন্দ হঠাৎ প্রশ্ন করলেনঃ 'উজ্জ্বলা, তুমি কি এখন মাখন হয়েছ?' আত্মপ্রচারে চিরবিমুখ উজ্জ্বলা সহসা সপ্রতিভ উত্তর দিলেনঃ 'হ্যাঁ'। সেই

রাতেই ঘুমের মধ্যে 'ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক' হয় উজ্জ্বলার। পরদিন ক্ষীণভাবে বাহ্যসংজ্ঞা ফিরে আসে কিন্তু অপরাহ্নে ঊনআশি বছরের বৃদ্ধা উজ্জ্বলা মৃদুকণ্ঠে বলে ওঠেনঃ 'মা'—সেইসঙ্গে চোখের দুইপ্রান্ত দিয়ে গড়িয়ে পড়ে প্রেমাশ্রু।

স্বামী তুরীয়ানন্দ একসময় তাঁকে বলেছিলেনঃ 'তুমি যা চাইবে, তাই পাবে। জগতের ভোগসুখ চাও তো তাই জুটবে আর যদি জগন্মাতাকে চাও তাঁকে লাভ করবে।' গুরুগতপ্রাণ উজ্জ্বলা অন্তরে শিশুর সারল্য নিয়ে এই কথাগুলিই বোধ হয় বিশ্বাস করে এসেছিলেন, তাই পৃথিবীর খেলাঘর ছেড়ে ক্লান্ত পঙ্গু মেয়েটি ফিরে গেল 'মায়ের' কোলে—স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইদের আশীর্বাদপূত জীবন তো ব্যর্থ হবার নয়!

স্বামীজীর স্নেহধন্য অ্যালেন দম্পতি

প্রব্রাজিকা জ্ঞানদাপ্রাণা

স্বামী বিবেকানন্দের দিব্যবাণী শ্রোতার মনে কী গভীর আলোড়ন তুলত তার আভাস দিতে পারেন শুধু তাঁরাই যাঁরা তাঁর দুর্লভ সান্নিধ্যে এসেছেন, স্বকর্ণে শুনেছেন তাঁর মুখনিঃসৃত অমৃত স্বরলহরী। এমনই এক বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন অ্যালেন দম্পতি—টম অ্যালেন ও এডিথ অ্যালেন। পরবর্তী কালে আমেরিকার ভক্তমণ্ডলীতে তাঁরা পরিচিত ছিলেন অজয় ও বিরজা নামে। টম অ্যালেনের আদি নিবাস স্কটল্যাণ্ড। পেশায় মেরিন ইঞ্জিনীয়র টম তরুণ বয়সে ছিলেন বৃটিশ সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মচারী। ১৯০০ সালে স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁর বয়স ছত্রিশ। সানফ্রান্সিস্কো শহরে Risdon Iron & Locomotive Works-এ ড্রাফট্‌সম্যান হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর স্ত্রী এডিথ জাতে ইংরেজ, বয়স পঁয়ত্রিশ। স্বামীজীর সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয় তখন তিনি খুবই অসুস্থ—দেহে-মনে ক্লান্ত ও অবসন্ন। এডিথ কোনও এক সময়ে গুপ্ত অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও বিদ্যার চর্চায় আকৃষ্ট হন। তারই পরিণতিতে ঐ হতাশা ও স্বাস্থ্যভঙ্গ। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের দু-বছর পরে তোলা একটি ছবিতে কিন্তু তাঁকে দেখি চিন্তাভারমুক্ত, কিছুটা আত্মমগ্ন, এক সুন্দরী তরুণীরূপে যাঁর মুখে ক্লান্তি বা অবসাদের কোনও চিহ্নই নেই।

স্বামীজীর প্রথমবার মার্কিনদেশ সফরের সময় তাঁর সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ এঁদের হয়নি। ধর্মমহাসভায় তিনি যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তা এঁরা শুনেছেন, তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বের কথাও অগোচর নেই। ইতিমধ্যে 'রাজযোগ' বইখানাও তাঁরা পড়ে ফেলেছেন এবং স্বাভাবিক কারণেই স্বামীজীর সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। তাই ১৯০০ সালে যখন খবর এল স্বামীজী লস্ এঞ্জেলস থেকে সানফ্রান্সিস্কো আসছেন—এডিথ ও টম প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে রইলেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ওকল্যাণ্ডে ইউনিটেরিয়ান চার্চে স্বামীজীর বক্তৃতা—ব্যবস্থাপনায় আছেন ঐ চার্চেরই যাজক Benjamin Fay Mills. বিষয়—বেদান্তদর্শন ও খ্রীস্টধর্মের সাদৃশ্য। মিঃ অ্যালেন সেই সভায় এলেন উৎসুক শ্রোতা হিসাবে। স্বামীজীর বক্তৃতা তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধ করল। বুঝলেন, বক্তার মুখনিঃসৃত প্রতিটি বাক্যই আপন অন্তরের উপলব্ধ সত্য। আবিষ্টের মতো বাড়িতে ফিরলেন—মুগ্ধতার ঘোর তখনও কাটেনি। অসুস্থ এডিথ স্বাভাবিক কৌতূহলে স্বামীকে প্রশ্ন করলেন—'কেমন লাগল বক্তাটিকে? মানুষটি কেমন?' 'মানুষ নন, দেবতা, সাক্ষাৎ দেবতা'—জবাব দিলেন টম।

বিস্মিত এডিথ জানতে চাইলেন—এমন কী শুনেছেন টম যে তিনি এত অভিভূত! টম তাঁকে শোনালেন স্বামীজীর মুখে শোনা দু-একটি আশ্চর্য উক্তি। একটি হল—'ভাল আর মন্দ—দুটি একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ, হোম অব ট্রুথ-এ আমরা শিখেছিলাম সবই ভাল, মন্দ কোথাও নেই'। অপরটি হল—'গরু মিথ্যা কথা বলে না কিন্তু গরু গরুই থাকে। মানুষ মিথ্যা বলে, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়, অর্থাৎ মানুষের অনন্ত সম্ভাবনা।'

এরপর সানফ্রান্সিস্কো উপকূলে যত সভায় স্বামীজী বক্তৃতা করেছেন সব কটিতেই উপস্থিত ছিলেন টম। শুধু বক্তৃতা শোনাই নয়, সভার আয়োজনে, শ্রোতাদের কাছে স্বামীজীকে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও তিনি পালন করেছেন সক্রিয় ভূমিকা। সেবার ৫ মার্চ ঐ শহরের Union Square Redman Hall-এ স্বামীজীর বক্তৃতা। বিষয়—ভারতীয় দর্শন। মঞ্চে ওঠার আগে স্বামীজী মিঃ অ্যালেনকে বললেন—ভারত সম্বন্ধে বলতে শুরু করলে তাঁর সময়ের জ্ঞান থাকে না, সুতরাং মিঃ অ্যালেন যেন যথাসময়ে তাঁকে সচেতন করে দেন। রাত আটটা থেকে দশটা—টানা দু-ঘণ্টা বক্তৃতা চলল, তারপরেও থামার লক্ষণ নেই। অগত্যা হলের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পকেটঘড়ির চেন ধবে পেণ্ডুলামের মতো দোলাতে লাগলেন মিঃ অ্যালেন যাতে ইঙ্গিত পেয়ে স্বামীজী থামেন। স্বামীজী কিন্তু শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেনঃ "দেখুন দেখি! আমার বক্তৃতা এখনও শুরুই করিনি, আর ওরা কিনা ঘড়ি দুলিয়ে আমাকে থামবার ইঙ্গিত করছে!" এই কথা বলে বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন। মিঃ অ্যালেন লক্ষ্য করতেন স্বামীজী যেন সময়ের অতীত ভূমিতে বিচরণ করছেন। ওকল্যাণ্ড থেকে ফেরবার পথে রাত হলে পা চালিয়ে ট্রেন ধরার জন্য তাঁর কোনও তাড়া ছিল না। ধীর রাজকীয় মহিমায় হাঁটতে হাঁটতে বলতেন—"পরে আরেকটা ট্রেন আছে না?"

স্বামীজীর আকর্ষণে নিজের দৈহিক অসুস্থতা উপেক্ষা করেই মিসেস অ্যালেন ৫ মার্চের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সভায় বসে ভাবছিলেন—'এসে বোধ হয় ভুলই করলাম'। এমন সময়ে মঞ্চে স্বামীজীর আবির্ভাব, মুগ্ধ অ্যালেন স্মৃতিচারণ করেছেনঃ "তিনি এসে দাঁড়ালেন, সেকি দিব্যকান্তি! মুখে স্বর্ণাভ দ্যুতি, মাথায় ঢেউ খেলানো ঘন কালো চুলের রাশ—চুল তো নয়, যেন সাগরের ঢেউ থমকে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাঁর চোখ, কী অপরূপ! দু-ঘণ্টা ধরে তাঁর বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে হল, কখন যেন তাঁর সঙ্গে আমরাও পৌঁছে গেছি তাঁর আপন দেশ, তাঁর অতি প্রিয় স্বদেশ ভারতবর্ষে। ভারতের মাটিতে পা না দিয়ে ভারতের মর্মবাণী বোঝা খুবই কঠিন। তাই বোধহয় বাক্যের তরণীতে আমাদের পৌঁছে দিলেন তাঁর স্বদেশে। বক্তৃতার পর আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। দু-একটা বাক্যবিনিময়, তার বেশি নয়। তাঁর সান্নিধ্যে এত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে কোনও কথাই বলতে পারিনি। এর পরের বক্তৃতার শেষে দূরে বসে তাঁকেই দেখছিলাম, এমন সময়ে তিনি চোখ তুলে তাকালেন, দেখলেন আমাকে। ইশারায় কাছে ডেকে বললেন—'কিছু বলবে বুঝি! তাহলে এসো আমার ওখানে, টার্ক স্ট্রীটে। ওখানেই বলবে, কি তোমার প্রশ্ন...।' আমার মনে তখন অনেক প্রশ্ন, অনেক সংশয়। মনে বড় অশান্তি। কি কি প্রশ্ন করব ভাবতে ভাবতেই সারারাত কেটে গেল।"

গুপ্তবিদ্যার প্রয়োগে ব্যর্থ অ্যালেন হয়ে পড়েছিলেন হতাশা ও স্নায়বিক দুর্বলতার

শিকার। গুপ্তবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এই পরিণামের আশঙ্কা আছে বলে স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশবাসীকে সর্বদাই সতর্ক করে দিতেন। ওয়াশিংটন হলে অ্যালেনকে দেখামাত্রই তাই স্বামীজী বুঝতে পারেন কি তার ব্যাধি। তিনি তাঁকে দেখা করতে বলেছিলেন। পরদিন সকাল ন-টায় টার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে হাজির হলেন অ্যালেন। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হবে না বলে জানানো হল তাঁকে। না, তিনি দমবার পাত্রী নন। স্বামীজী নিজেই তাঁকে আসতে বলেছেন—সুতরাং অনুমতি মিলল। সামনের ঘরে জানলার পাশে বসে আছেন তিনি—এমন সময়ে স্বামীজী এলেন—পরনে মেটে রংয়ের লম্বা ওভারকোট, মাথায় কালো পাগড়ি, গুন্‌গুন্‌ স্বরে শ্লোক আবৃত্তি করছেন। স্বামীজী শ্রীমতী অ্যালেনের বিপরীত দিকে একটা চেয়ার টেনে বসলেন—বসে বসেও অনুপম ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে চলেছেন। আবৃত্তি শেষ হতেই শ্রীমতী অ্যালেনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন—'এবার বলুন, মাদাম, আপনার কথা।' বলবেন কি, কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। সে কান্না আর থামে না। কেঁদে কেঁদে অবশেষে যখন থামলেন, স্বামীজী তাঁকে বললেন—পরের দিন ঠিক ঐ সময়ে আবার দেখা করতে। ফেরার পথে হল এক অদ্ভুত অনুভূতি। মনে হল আনন্দের সাগরে তিনি ভাসছেন—সব সমস্যা তাঁর মিটে গেছে, মিলে গেছে সব প্রশ্নের উত্তর। আনন্দে তখন তাঁর হৃদয় এতই বিহ্বল যে পথের নুড়ি-পাথর সবকিছুই মনে হচ্ছে মণিমাণিক্য। প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর এই পরম প্রাপ্তি।

পরের দিন সকালে তো বটেই, সম্ভবত তার পরেও দু-একবার অ্যালেনের স্বামীজীর সঙ্গে নিভৃত সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছিল। স্বামীজী সেই সময় তাঁকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়ে ধন্য করেন। তাঁর নিজের ভাষায়ঃ "তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে ধ্যান করতে হয়, শিখিয়ে দিয়েছিলেন কিছু সহজ প্রাণায়ামের প্রণালী। তবে যখন-তখন যেখানে সেখানে সেগুলি অভ্যেস করতে বারণ করেছিলেন।" কিছুদিনের মধ্যে অন্যান্য মহিলারা টার্ক স্ট্রীটের বাড়িটির সন্ধান পেয়ে গেলেন—আলাপ-আলোচনায় বিশেষ আগ্রহী সেইসব মহিলাদের জন্য সকালের দিকে স্বামীজীকে ক্লাস খুলতে হল—এইভাবে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সুযোগ ফুরিয়ে গেল বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শ্রীমতী অ্যালেন। কথাবার্তার বিশেষ সুযোগ না মিললেও স্বামীজীর পূত সান্নিধ্যলাভে তিনি কখনই বঞ্চিত হননি। সানফ্রান্সিস্কোতে একমাস এবং অ্যালামিডায় আরও একমাস—তিনি স্বামীজীর দিব্যসান্নিধ্য লাভ করেছিলেন যা তাঁর দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তোলে—বলতে গেলে তাঁর নবজন্ম হয়। মধ্যাহ্ন আহারে অবশ্যই তাঁর ডাক পড়ত। স্বামীজী নিজেই রান্নায় লেগে যেতেন, তাঁর রান্নার যোগাড়ে ফাই-ফরমাস খাটার অনুমতি পেতেন অ্যালেন। "টার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে রান্নাঘরে বসে তাঁর মুখে শুনেছি কত কথা!" বলেছেন এডিথ। "কখনও তিনি দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করছেন, কখনও বা আবৃত্তি করছেন গীতার শ্লোক। তাঁর মুখে শুনেছি গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের সেই শ্লোক যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—ভগবান সর্বজীবের হৃদয়ে বাস করেন—(ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি)। আরও কত কথা শুনেছি তাঁর মুখে...'কুম্ভকার যেমন কুম্ভ গড়ে তেমনি তিনি গড়েছেন আমাদের' ... 'এ যেন পাশার ঘুঁটি ফেলা—বারে বারে ফিরে ফিরে আসে একই নকসা। যা কিছু ঘটছে তা আগেও ঘটেছে বহুবার, ঘটবে আবার, ঘটবে বারবার। আমরা কি-ই বা করতে পারি মাদাম'।"

১৯০৮ সালে ৭ এপ্রিল বান্ধবী আইডা অ্যানসেলকে লিখছেন শ্রীমতী অ্যালেন—"একবার টার্ক স্ট্রীটের বাসায় সকালের ধ্যানের ক্লাসে প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করে দিলেন স্বামীজী। আমি অজ্ঞ, মূঢ়—তাই আমার ধ্যানের সময়কার সব অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছি। এমন বকলেন স্বামীজী মনে হল যেন এক টন ইট মাথায় চাপিয়ে দিলেন। খুব দুঃখ হল—ভাবলাম আর কখনও যেন এমন প্রশ্ন না করি। সেই সন্ধ্যায় রেডম্যান হলে বক্তৃতার পর স্বামীজী বসে আছেন অন্য সঙ্গীদের অপেক্ষায়, আমি দূরে দাঁড়িয়ে। আমায় তিনি ডাকলেন, কাছে যেতেই হেসে বললেন, 'এই ধরনের প্রশ্ন যদি কিছু করতে চাও, করবে একান্তে। আজ সকালে যদি তোমার সব প্রশ্নের জবাব দিতাম তাহলে, অধিকারী নির্বিশেষে, উপস্থিত সবারই সেই একই অনুভূতি হয়ে যেত। তাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে।' এই সময়ে তিনি বলতেন, 'আবার আসতে হবে আমাকে, গুরুদেব (শ্রীরামকৃষ্ণ) ইঙ্গিত দিয়েছেন আসতে হবে আবার'। আমি বললাম, 'তিনি বলেছেন বলেই আসতে হবে?' উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, মাদাম, ওঁদের শক্তি এমনই প্রবল'।"

১৮৯৭ সালে ভারত-প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীকে যে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়, সেকথা শুনেছিলেন শ্রীমতী অ্যালেন। তিনি সে বিষয়ে জানতে আগ্রহী হন—কিন্তু স্বামীজী সেসব কথা এড়িয়ে সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'ভারি বোকা বোকা লাগছিল।'

নামযশের ভার যেমন সইত না তাঁর, তেমনি সইত না বস্তুর ভার। সামান্য পোশাক আর কিছু বইপত্র রাখার ছোট একটা ট্রাঙ্ক—তাতেই বিব্রত বোধ করতেন। বলতেনঃ 'আমি সন্ন্যাসী, এসব আমায় সাজে না।' তারপর 'সন্ন্যাসীর গীতি' থেকে আবৃত্তি করতেন—

'সুখতরে গৃহ করো না নির্মাণ,
কোন্ গৃহ তোমা ধরে, হে মহান?
গৃহ-ছাদ তব অনন্ত আকাশ,
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস।'

তিনি বলতেনঃ "ভারতবর্ষে অতি সামান্য সম্বল নিয়েও দিন কাটানো যায়, যা হোক করে চলে যায়। কিন্তু এখানে চলতে হয় তোমাদের দাবি মেনে।"

এপ্রিল মাসে স্বামীজী যখন অ্যালামিডায় এলেন শ্রীমতী অ্যালেনের তখন খুব সুবিধে হল কারণ তিনি সে সময় ওখানকারই বাসিন্দা। প্রায় প্রতিদিনই স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হত। সেই সময়ে বিভিন্ন কাজে নানাভাবে তিনি সাহায্য করতেন স্বামীজীকে। রবিবারের অপরাহ্ণে স্বামীজী আহার প্রস্তুত করতেন নিজের হাতে, আর কি সৌভাগ্য শ্রীমতী অ্যালেনের যে তিনি আস্বাদন করতেন সেই দেবভোগ্য আহার।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে এডিথ অ্যালেন কুমারী অ্যানসেলকে (উজ্জ্বলাকে) লিখছেনঃ "অবশেষে পাওয়া গেল অ্যালামিডার 'হোম অব ট্রুথ'-এর সেই নকসাখানি। ঐ X চিহ্নিত ঘরখানি ছিল স্বামীজীর শোবার ঘর—বসার ঘরের লাগোয়া। ঐ ঘর আর হলঘরের মাঝখানে কোনও দরজা ছিল না—আমি খুব ভাল করে চিনি ঐ ঘরগুলি, কারণ (পরে) আমি ওখানে থেকেছি। অজয় (টম) থাকত শোবার ঘরটিতে আর আমি বসার



মিস্টার টমাস জে অ্যালেন



মিসেস এডিথ বি অ্যালেন



মিস আইডা অ্যানসেল (উজ্জ্বলা)

এমা—কাবমেনেব ভূমিকায়



এমা কালভে





ফ্রাঙ্ক লেগেট



বেসি লেগেট



হলিস্টার



ফ্রান্সেস ও অ্যালবার্টা



স্বামী বিবেকানন্দ, ১৯০০

ঘরে।... দিনের বেলা স্বামীজী এসে বসতেন ঐ ঘরের লাউঞ্জে, পরে আমি যখন ঐ বাড়িতে বাস করি, তখন স্বামীজীর বসা ঐ লাউঞ্জে কত বসেছি, শুয়েছি। মনে পড়ে ঐ বাড়িতে তিনটি রবিবারের অপরাহ্ণে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর নিজের হাতে রান্না করা dinner খেয়েছি।"

রবিবার সকালে স্বামীজী বাজার করতে যেতেন শহরে—China Town-এ। তাঁর সঙ্গে যেত শান্তি (শ্রীমতী হ্যান্সবরো)। ফিরে এসে শান্তি ক্লান্ত হয়ে পড়ত। তখন তাকে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে স্বামীজী এসে ঢুকতেন রান্নাঘরে—রান্নার ফাঁকে ফাঁকে চলত নানা রকমের আলাপ-আলোচনা। গ্যাসের উনুনে রান্না করতেন তিনি, ফ্রেঞ্চ উনুনও ছিল একটা—কিন্তু সেটা তিনি কখনও ব্যবহার করেননি।

একদিন বিরাট এক সান্ধ্যভোজের আয়োজন হয়েছে—শ্রীমতী অ্যালেন প্রস্তাব করলেন সুপ্রশস্ত ঐ রান্নাঘরটিতেই ভোজটি পরিবেশন করা হোক। স্বামীজী সম্মত হলেন না কারণ (খাবার) ঘরটি ছিল অসম্ভব রকমের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

কুমারী অ্যানসেলকে অ্যালেন লিখছেনঃ "স্বামীজীকে যে আমি শ্রদ্ধা করেছি, ভালবেসেছি তার কারণ তো একটা নয়, অনেক। তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য মানুষ—একাধারে গম্ভীর, রাশভারি আবার সুরসিক ও কৌতুকপ্রিয়। এক কথায়, তিনি ছিলেন যোগচতুষ্টয়ের সমন্বয়স্বরূপ। সবার সব চাহিদা মেটাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। এমন বিষয় ছিল না যাতে তাঁর আগ্রহের অভাব—তাঁর কাছে কোনও বিষয়ই তুচ্ছ নয়।...ব্যক্তিনির্বিশেষে সবার বক্তব্যই তাঁর কাছে সমান গুরুত্ব পেত। আর আমার কাছে তিনি ছিলেন স্নেহময় ক্ষমাশীল পিতা।"

এত যে অন্তরঙ্গতা তবু তাঁর নাগাল মিলত না। তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত, নির্বিকার—কাছে থেকেও দূরে। এই দূরত্ব অতিক্রম করার সাধ্য ছিল না অতি অন্তরঙ্গেরও।

একদিন শ্রীমতী অ্যালেনকে নিয়ে স্বামীজী গেলেন বাজারে, আচার কিনতে। ফেরার পথে পাত্র থেকে গড়িয়ে খানিকটা রস স্বামীজীর হাতে পড়ে যায়। উনি তৎক্ষণাৎ সবটুকু রস চেটেপুটে খেয়ে নিলেন। এই 'মর্যাদাহানিকর' আচরণে বিমূঢ় অ্যালেন চেঁচিয়ে উঠতেই স্বামীজী বললেনঃ 'তোমরা বাইরের দিকটাতে নজর দাও বড় বেশি, বাইরের পারিপাট্য বজায় রাখতেই সারাক্ষণ ব্যস্ত—কিন্তু আসল তো হল ভেতরটা।'

এমনিভাবে সামান্য ব্যাপারকে উপলক্ষ করে কত উপদেশ দিয়েছেন তিনি! তাঁর সঙ্গে কথা বলা মানেই কিছু-না-কিছু শেখা। একবার মিঃ অ্যালেনকে তিনি বলেনঃ 'যদি দেখ কারোর মুখ গোমড়া তাহলে জানবে তার ভিতরে ধর্ম-টর্ম কিছু নেই, থাকলে থাকতে পারে পেটব্যথা'—(এই লঘু কথার ছলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রকৃত ধার্মিক সদানন্দময়)। রান্নাঘরে কাজ করতে করতে চলত তাঁর অমূল্য উপদেশ বিতরণ। একদিন আমাকে বলছিলেনঃ 'মেঝেতে হাঁটছে ঐ যে পিঁপড়েটা, ওর চাইতে যদি নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করি, তবে আমি অজ্ঞ। অহঙ্কার ত্যাগ করতে শেখ, মাদাম, নিরভিমান হতে শেখ।' আরেকদিন বললেনঃ 'বিচার করবে দুদিকের কথা শুনে...।' তাঁরই মুখে শুনেছিলামঃ 'নিজেকে কোনও কিছুতে না জড়িয়ে শুধু সাক্ষী হয়ে থাকতে শেখ।'

স্বামীজীর কোনও কথা শুনে শ্রীমতী অ্যালেন হয়তো বলে উঠলেনঃ 'আমি তা

মনে করি না।' অমনি হেসে স্বামীজী বলতেনঃ 'তুমি তা মনে কর না? তা বেশ।' সব ব্যাপারে মতে না মিললেও স্বামীজীর সব কথা তাঁর মনে গাঁথা হয়ে যেত। পরে, জীবনের অনেক সঙ্কটময় মুহূর্তেই সেই কথাগুলো স্মরণ করে অনায়াসে তিনি বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছেন।

শ্রীমতী অ্যালেন স্বামীজীর প্রসঙ্গে বলেছেনঃ 'তাঁকে আর কতটুকু বুঝেছি আমরা। চিনতে পারিনি ঐশী সত্তার প্রকৃত স্বরূপ।' বাহ্যদৃষ্টিতে চিনতে না পারলেও, অন্তরে অন্তরে তিনি তাঁকে চিনেছিলেন ঠিকই। তাঁর অন্তর কি না চিনে পারে সেই স্বামীজীকে যিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন দেহ ও মনের সুস্থতা! সেই স্বামীজী যিনি প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর মনের অনুচ্চারিত সকল প্রশ্নের উত্তর জুগিয়েছিলেন, সব সংশয়ের নিরসন করেছিলেন নীরবে!

অনেকে অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামীজীকে দেখেছেন। কেউ দেখেছেন তাঁর বিপুল কর্মশক্তি, কেউ বা তাঁর অধ্যাত্মজ্ঞান আর ধর্মপ্রাণতা। শ্রীমতী অ্যালেন উপলব্ধি করেছেন তাঁর স্নেহময় সত্তা। ক্যালিফোর্ণিয়া ছাড়ার আগে শ্রীমতী অ্যালেনকে তিনি দিলেন অযাচিত আশ্বাসঃ 'যদি কখনও বিপদে পড়, আমাকে স্মরণ করো; যেখানেই থাকি না কেন, সাড়া দেব।'

মিঃ অ্যালেন জাহাজ তৈরির একটা Company-তে কাজ করতেন, তাই জাহাজ তৈরির ও ভাসানোর জায়গায় তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন যে তিনি কখনও জাহাজ ভাসানো দেখেননি। শুনে মিঃ অ্যালেন তাঁর জন্য অনুমতি পত্র সংগ্রহ করলেন। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে স্বামীজী লক্ষ্য করলেন ভিন্ন একটা জায়গা থেকে ভাসানো দেখা যাবে আরও ভাল কিন্তু ওখানে যেতে হলে চাই বিশেষ অনুমতিপত্র। প্রবেশপথে পাহারায় রত দুজন রক্ষী। ওদের গ্রাহ্য না করে, ওদেরই সামনে দিয়ে স্বামীজী সটান উঠে গেলেন সেই প্ল্যাটফর্মে। বাধা দিল না কেউ।

একবার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে স্বামীজী গেছেন এক Ice cream parlour-এ অর্ডার দেওয়া হয়েছে Ice cream-এর, আর ভুল করে পরিচারিকাটি নিয়ে এসেছে Ice cream soda. ঐগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যখন মেয়েটি, তাকে দাঁড় করিয়ে খুব বকলেন দোকানের মালিক। স্বামীজীর ভারি কষ্ট হল মেয়েটির জন্যে। দোকানের মালিককে তিনি বললেনঃ 'বকো না ওকে। যদি বকো আমি একাই সব Ice cream soda খেয়ে নেব।'

একবার অ্যালামিডার প্রখ্যাত শিল্পী পি. নীলসন কয়েকজন বন্ধুসহ স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান চিনা টাউনের এক রেস্তোরাঁয়। বিশেষ অতিথিদের আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে রাঁধুনী স্বয়ং এসে দাঁড়াল তাঁদের সামনে। তাকে দেখামাত্র স্বামীজীর খাওয়ার ইচ্ছে ঘুচে গেল, প্রবৃত্তি হল না সে খাবার মুখে তোলার। পরে জানা গিয়েছিল সে রাঁধুনীটি খুব নির্মল চরিত্রের লোক ছিল না।

আরেকবার এক French রেস্তোরাঁয়ও ঘটে অনুরূপ ঘটনা। সেই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেনঃ 'আমি যে সেই বুড়োর (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের) মতো হয়ে যাচ্ছি। এবার দেখছি আমায় কাঁচের কেসে থাকতে হবে।'

ছবি তোলার ব্যাপারে স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। একবার মিঃ চার্লস্ নীলসনের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে গেছেন স্বামীজী—আহারের পর গৃহকর্তা তাঁর একটি ছবি তুলতে চাইলেন, স্বামীজী প্রথমে তেমন গরজ দেখালেন না। কিন্তু দ্বিতীয়বারের অনুরোধ তিনি ঠেকাতে পারলেন না। ছবি তোলা হল পরপর দুখানা। এই দ্বিতীয় ছবিখানাতে শ্রীমতী অ্যালেনের মতেঃ 'তোমরা সব পাবে'।

হোম অব ট্রুথ-এ আরেক সন্ধ্যা—লতাপাতায় ঘেরা বারান্দায় বসে আছেন স্বামীজী, ভক্ত, বন্ধু পরিবৃত হয়ে। সেদিন ছিল ইস্টার সানডে। চারধার জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে থেকে থেকে। স্বামীজীর মাথায় কোনও টুপি ছিল না, কেউ একজন মনে করিয়ে দিতে বললেনঃ 'হ্যাঁ, নিয়ে এস তো সেই লাল টুপিটা।' এটা হল কানঢাকা, ফ্ল্যাপওয়ালা লাল সেই টুপীটা। গল্প হচ্ছিল, গল্পচ্ছলে স্বামীজী বলছিলেন তাঁর প্রথমবারের মার্কিন দেশ সফরের কাহিনী। ছোট মাপের জুতো পরে পায়ের নিদারুণ অবস্থা ও চিকিৎসকের কাছে যাওয়া ইত্যাদি কথা বলতে বলতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেনঃ 'উঃ, লাগছে, আমার পায়ে ভীষণ লাগছে।' শ্রোতারা অনুমান করলেন কতই না কষ্ট হয়েছিল তাঁর। পুরোনো সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়েও সেই যন্ত্রণার স্মৃতি ফিরে এল—যদিও সবই বলছিলেন কৌতুকচ্ছলে রসিয়ে রসিয়ে।

সেই বৈঠকেই একজন উৎসুক শ্রোতা স্বামীজীকে অনুরোধ করলেন 'ত্যাগ' সম্পর্কে কিছু বলতে। মৃদু হেসে স্বামীজী বললেনঃ 'ত্যাগের তোমরা কি বোঝ বাছা!' অভিমানভরে শ্রোতা বললেনঃ 'কেন, আমরা কি ত্যাগ সম্পর্কে কিছু শোনারও অধিকারী নই?' মুহূর্তকাল নীরবতার পর শুরু হল তাঁর বলা—উদ্দীপনাময় ভাষায় তিনি তাদের শোনালেন ত্যাগ সম্পর্কে অনেক কথা, শিষ্যত্ব সম্পর্কেও বললেন কতক কথা যা ছিল পাশ্চাত্যদেশবাসী সেই শ্রোতাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা। প্রসঙ্গত তিনি বলেনঃ 'যদি আমার শিষ্য হতে চাও তাহলে আমার সব আদেশ পালন করতে হবে বিনা প্রশ্নে—এমন কি কামানের গোলার সামনে যদি দাঁড়াতে বলি তোমাদের, সে আদেশও পালন করতে হবে নির্দ্বিধায়।'

সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারতেন স্বামীজী—এ এক অসাধারণ ক্ষমতা। সবার জন্যে ছিল তাঁর অপার ভালবাসা আর অগাধ সহানুভূতি। তিনি বলতেনঃ 'কাউকে দোষ দিও না; যে যা করে, ভাল ভেবেই করে—আপন বুদ্ধিবিবেচনা অনুযায়ী ভাল মনে করেই করে, তাই বলি দোষ দিও না কাউকে। আর, শিখি তো আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই, সবাই তাই শেখে। আগুনে যে হাত দেয়, তার হাত তো পুড়বেই।'

স্বামীজীর সমধিক সহানুভূতি ছিল তাদের প্রতি, যারা সচেষ্ট, উদ্যমশীল, চঞ্চল, প্রাণোচ্ছল—যারা চলার পথে বারেবারে ভুল করে, তবু যাদের চলার বিরাম নেই। আর নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম সেইসব 'ভাল মানুষের দল' যারা ভুল করার ভয়ে পথ চলতে ভুলে গেছে—তাদের তিনি দেখতেন কৃপার দৃষ্টিতে।

শ্রীমতী অ্যালেনের স্মৃতিকথায় আছে একবার বক্তৃতামঞ্চ থেকে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে মেঘমন্দ্রস্বরে স্বামীজী উচ্চারণ করলেনঃ 'ওঠ, জাগো, অভীষ্ট লাভ না করে ক্ষান্ত হয়ো না (উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত)।' তৎক্ষণাৎ হলে যেন বিদ্যুৎ চমক খেলে গেল।

১৯০০ সালের এপ্রিল মাসে অ্যালামিডায় Tucker Hall-এ স্বামীজী বক্তৃতা করেনঃ 'The Ultimate Destiny of Man' সম্পর্কে। অদ্বৈত-ভাবরাজ্যের সোপানগুলি একে একে পার হয়ে, অবশেষে এসে পৌঁছলেন সেই চিত্তভূমিতে যেখানে আত্মা আর ব্রহ্ম একীভূত। সেই উচ্চ ভাবভূমিতে আরূঢ় স্বামীজী নিঃসংশয়িত উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ 'আমিই ঈশ্বর।'

আরও একবার নিজ দেবমহিমার ইঙ্গিত তিনি করেছেন উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়ায় এক ছাত্রীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে। ছাত্রীটি আক্ষেপ করছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কালে জন্মাননি বলে, নিজ চোখে তাঁকে দেখেননি বলে। স্বামীজী বলে উঠলেনঃ 'আমাকে তো দেখছ তুমি।'

স্বামীজী Camp Irving-এ বাস করেছিলেন দু'সপ্তাহ কাল। ঐ দুটি সপ্তাহেরই শনি ও রবিবার অ্যালেন দম্পতি তাঁর পূত সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের দীক্ষা স্বামীজীর কাছে নয়, তাঁরা দীক্ষিত হন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কাছে আর স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁদের নাম দেন—'অজয়' ও 'বিরজা'। এই তিনজন শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদের সান্নিধ্যে অতিবাহিত দিনগুলি এঁদের জীবনে ছিল অবিস্মরণীয়।

১৯৪৭ সালে উজ্জ্বলাকে লিখছেন বিরজাঃ 'তুমি বলছ স্বামীজীর কাছে থাকার সুযোগ আমি বেশি পেয়েছি। তুমিই বা কম পেলে কিসে? তুমি থাকনি ক'সপ্তাহ তাঁর সঙ্গে ক্যাম্প টেলারে?...তিনি কেন আমাকে এত কৃপা করলেন আমি বুঝে উঠতে পারি না আজও। তিনিই আমাকে ডেকেছিলেন তাঁর টার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে। নইলে সাধ্য কি আমার, যে তাঁকে ডাকি!'

অর্ধ শতাব্দী কাল পরে, ১৯৫০ সালে, ইংরেজী কথামৃত পড়ে শ্রীমতী অ্যালেন লিখছেনঃ 'ঠাকুর না কি নরেনকে দেখলে বিহ্বল হয়ে পড়তেন। আর আমরা! তাঁর সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয়, তাও জানতাম না। কি নির্বোধই না ছিলাম আমরা!'

অ্যালেনের আরেকখানি পত্র—'স্বামী নিখিলানন্দ বলেন স্বামীজীকে একটিবারও যে দেখেছে, সেই ধন্য—তাহলে আমরা? আমরা তো তাঁকে কতবার দেখেছি, কতবার শুনেছি তাঁর বক্তৃতা! তুমি তাঁর সঙ্গে থেকেছ ক্যালিফোর্ণিয়ায় আর আমি খেয়েছি তাঁর নিজের হাতের রান্না। আমি কি পাপী! তবে পাপী বলিই বা কি করে? সাক্ষাৎ ভগবানকে যে দেখেছে, সে কি পাপী হতে পারে?'

স্বামীজী ছিলেন এই অ্যালেন দম্পতির হৃদয় জুড়ে। মিঃ অ্যালেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন বেদান্ত-অনুরাগী, ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ ভক্ত। আর শ্রীমতী অ্যালেন ঘুরে ফিরে আমাদের স্মরণ করিয়েছেনঃ 'ওঃ স্বামীজীকে দেখা, স্বামীজীর সান্নিধ্য পাওয়া সে কি দুর্লভ অভিজ্ঞতা।'

এমা কালভেঃ দীপ্ত হোমশিখা

ঝর্ণা চৌধুরী

"Sweetness and strength, high tragedy and mirth
And but one Calve on the singing earth."

তখন দিনান্তবেলা, গোধূলি আলোয় মার্সাই শহরের কর্মব্যস্ত পথ ধরে চলেছেন এক মধ্যবয়সী অভিজাত রমণী। চোখদুটি সুদূরের স্বপ্নে বিভোর—অন্তর ভাবতন্ময়। হঠাৎ তাঁর মনে হল, চলমান জনতার মধ্য থেকে কে যেন আসতে চাইছে তাঁর কাছে। সঠিক কিছু বুঝে ওঠার আগেই মৃদুস্পর্শে তাঁকে সজাগ করে কার কণ্ঠস্বর যেন ধ্বনিত হল, 'মন্ত্রটা মনে রেখো, ভুলে যেও না।' সচকিতে চারিদিকে তাকালেন তিনি—ঐতো অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে কে যেন ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে চলে গেল। সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে স্পষ্ট কিছুই বোঝা গেল না—সত্যিই কি কেউ এসেছিল তাঁর ধ্যানের মন্ত্রটিকে স্মরণ করিয়ে দিতে অথবা এ শুধু তাঁরই অবচেতন ব্যাকুলতার চেতন-উদ্ভাস মাত্র! কিন্তু ব্রোঞ্জের ঘণ্টাধ্বনির মতো গভীর-গম্ভীর স্বরের রেশ যে এখনও সক্রিয় রয়েছে শ্রবণে, সান্নিধ্যের উত্তাপ অনুভূতিতে এখনও নিবিড়!

তারপর আর একদিন প্যারীতে ঐ রমণীরই বাসভবনে দেখা করতে এসেছেন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মাদাম ভার্দো। আলাপচারিতার মাঝে কখন নিঃশব্দে নেমে এল সন্ধ্যা। বিদায় নিতে হবে এবার, চলে যাবার আগে মাদাম তাঁর সুধাকণ্ঠী বন্ধুর গান শুনতে চাইলেন। কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যার এই নম্র, শান্ত, বিশুদ্ধ মুহূর্তে তিনি যে প্রতিদিন তাঁর গুরুর দেওয়া মন্ত্রটির ধ্যানেই নিবিষ্ট থাকেন। তবু বিমুখ করতে পারলেন না প্রিয়বান্ধবীকে। গুরুপ্রদত্ত ধ্যানের মন্ত্রটিকেই সুর দিয়ে গাইতে শুরু করলেন—'ওঁ হরি ওঁ তৎ সৎ', 'অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।' নিবিড় গভীর সুরের মধুর ধ্বনি ক্রমশ মন্ত্রটিকে ঘিরে ঘিরে ভাবরসের এক বলয় রচনা করতে লাগল। মনে হল যেন সে সুর জগৎ পরিপ্লাবিত করে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সমস্ত পরিবেশকে। সন্ধ্যার সুগম্ভীর উদার আকাশের তলে সেই ধ্যানমগ্না সাধিকার সমগ্র সত্তার গভীরতম প্রদেশ থেকে উত্থিত মন্ত্রধ্বনি স্পন্দিত ও অনুরণিত হয়ে এক নিবিড় বাতাবরণ রচনা করল।

যাঁকে কেন্দ্র করে এমন দুটি ঘটনার বর্ণনা আমরা পাই, তিনি যে একজন সামান্যা নারীমাত্র নন—একথা নিশ্চিত। কারণ ঘটনাদুটির অতীন্দ্রিয়তা প্রমাণ করে যে এমন দিব্যানুভূতিসমৃদ্ধ জীবনের অধিকারিণী যিনি, পরিচিত বাস্তব সংসারের বাইরে তিনি এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যালোকের (mystic world) সন্ধান পেয়েছিলেন এবং এ পৃথিবীতে তাঁর

আগমন ঈশ্বরের কোনও নিগূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধ করার অধিকার নিয়ে।

এই অসামান্যা নারীই মাদাম এমা কালভে—উনিশ শতকের শেষে ইউরোপের সঙ্গীত জগতের স্বর্ণযুগে 'Prima Donna'—'সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী'রূপে যশের তুঙ্গ শিখরে অধিষ্ঠিত হয়ে যিনি সমগ্র পশ্চিম ভূখণ্ডের কলারসিক মানুষের হৃদয়ের রানী ও 'রাজা বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী'[১] হয়ে উঠেছিলেন। আর সারাজীবন যে অমৃতমন্ত্র হৃৎপদ্মের গোপন মধুকোষে ধারণ করে রেখেছিলেন, গুরুর দেওয়া সেই মন্ত্রটিই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের দ্বার উন্মোচন করে তাঁকে আত্মস্বরূপ উপলব্ধির পথে অগ্রসর করেছিল।

এই ভাবময়ী নারী, তাঁর পবিত্র অন্তরের উচ্ছ্বসিত ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য যাঁর চরণে নিঃশেষে অর্পণ করে ধন্য হয়েছিলেন, তিনি তাঁর গুরু, তাঁর পিতা—প্রদীপ্ত সূর্যের মতো ভাস্বর, জ্যোতির তনয়, সত্যভৃৎ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। সেই মহৎ সঙ্গ ও আশ্রয়লাভ করে নিখিল বিশ্বের নৈরাশ্যপীড়িত, অবমানিত বহু প্রাণের মতো কালভেও তমিস্রা রজনীর পরপারে পেয়েছিলেন আলোকোজ্জ্বল দিবসের দেখা।

মাদাম এমা কালভে ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাময়ী অপেরা গায়িকা। শুধু সঙ্গীত নয়, নৃত্য এবং অভিনয়েও ছিল তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা। এই মনস্বিনী নারী একাধারে বিদুষী এবং রূপসী। তাঁর গুণের প্রশংসা করে স্বামীজী বলেছেনঃ "কালভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চা করেন তা নয়, বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন।"[২] লিজেল রেমঁ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, স্বামীজী প্যারিসে 'কারমেনের' ভূমিকায় কালভের অনবদ্য অভিনয় দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কালভে সম্পর্কে তাই তাঁর সশ্রদ্ধ উক্তি পাই 'পরিব্রাজকের' পাতায়ঃ "বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা! অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা আর দৈবী কণ্ঠ—এসব একত্র সংযোগে কালভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়া করেছে।"[৩]

১৮৫৮ সালে মতান্তরে ১৮৬২-তে, দক্ষিণ ফ্রান্সের পর্বতবেষ্টিত সূর্যকরোজ্জ্বল উপত্যকায় এমা কালভের জন্ম। বড় সুন্দর দক্ষিণ ফ্রান্সের এই পার্বত্যভূমি। জনসংকুল পৃথিবীর কর্ম-কোলাহল থেকে দূরে, বিচিত্র বর্ণে চিত্রিতকূট পাহাড়শ্রেণী আর নিবিড় সবুজে শোভাময়ী অরণ্যের অপরূপ সৌন্দর্যকে প্রাণভরে ভালবেসেছিলেন কালভে। বস্তুত সেখানকার অমিত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা উন্মুক্ত প্রকৃতির মতই ছিল তাঁর অন্তরটি। জন্মসূত্রে তিনি স্বাধীন এবং বীর রুথেনিয়ান উপজাতির প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী। তাদের উষ্ণ আবেগময় শোণিত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত ছিল। পূর্বপুরুষদের মতো তাই তিনিও ছিলেন নির্ভীক, আপন কর্তৃত্বের ইচ্ছাধীন, ঐতিহ্য-অনুগত, ধর্মপ্রাণ ও মরমী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অত্যন্ত আবেগধর্মী রোম্যান্টিক এবং সূক্ষ্ম সংবেদনশীল শিল্পিসুলভ মানসিকতা। পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন কালভের জন্মভূমির প্রতিও ছিল দুর্বার আকর্ষণ। আত্মজীবনীর পাতায় তাঁর এই স্বদেশপ্রাণতার উল্লেখ তিনি নিজেই করেছেনঃ "My roots are in the past, I am part of that earth, those rocky mountains, that burning southern sky. Elsewhere I am in exile. I must return to that small spot of land, my 'little country' on the mountainside, if I am to keep well, if I am to maintain my happiness, my courage and my voice !"[৪]

দৈবী প্রতিভা নিয়ে পৃথিবীতে তাঁর আগমন। তাই সঙ্গীত ও নৃত্যের, সুর ও ছন্দের প্রতি ছিল তাঁর আশৈশব প্রবল আকর্ষণ যা অজ্ঞাতসারে তাঁকে তাঁর অভীপ্সিত লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর করে দিয়েছে। অন্তরে অনুভব করেছেন নিরন্তর কোনও এক অদৃশ্য শক্তির প্রবল তাড়না। হৃদয়ের গভীরে সেই প্রেরণা অতি বাল্যকাল থেকেই তাঁকে ঘোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করার শক্তি যুগিয়েছে এবং সেই কঠিন দুঃখ-দারিদ্র্যই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে আরও উন্নত, আরও মহৎ করতে সাহায্য করেছে। "দুঃখ দারিদ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই! সে শৈশবের অতি কঠিন দারিদ্র্য দুঃখকষ্ট—যার সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করে কালভের এই বিজয়লাভ, সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে।"[৫] বস্তুত ঈশ্বরের দেওয়া দুঃখের পাথেয় সম্বল করে জীবনপথে যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। সারাটি জীবন ধরে দুঃখের কি বিচিত্র রূপই না প্রত্যক্ষ করেছেন এবং জীবন সায়াহ্নে সেই দুঃখেরই 'অসীম পাথার' পার হয়ে 'সকল সুখের সার'কে খুঁজে পেয়েছিলেন কালভে।

আত্মজীবনীতে কালভে নিজের পরিচয় দিয়েছেন কৃষককন্যা বলে। তবে বর্তমান গবেষকদের মতে কালভের শৈশব জীবনের এই বর্ণনাটি বিতর্কিত।[৫ক] পরিবারের অষ্টমসন্তান, তাঁর পিতা স্ত্রী ও তিন মাসের শিশুকন্যাকে নিয়ে সৌভাগ্যের সন্ধানে মাতৃভূমি ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন স্পেনে এবং ভাগ্য বদলের নিত্য নতুন পন্থা আবিষ্কারের প্রয়াসে বৃথাই কালক্ষয় করেছিলেন কিন্তু নিজ পরিবারকে সচ্ছলতায় প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হননি কোনদিনই। সুতরাং স্বল্পবিত্ত, উপার্জনে অক্ষম পিতামাতার জ্যেষ্ঠা কন্যা কালভে জ্ঞানোন্মেষ হওয়া অবধি বাস্তবের নির্মম ও কঠোর রূপকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। তাঁর মা ছিলেন দৃঢ়চেতা, সাহসিনী, বুদ্ধিমতী ও ব্যক্তিত্বশালিনী। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারিণী। ফ্রান্সের পুরোনো দিনের গান, লোকসঙ্গীত, রাখালিয়া গান তিনি অতি সুমিষ্ট স্বরে গাইতেন। একথা কালভে তাঁর আত্মজীবনীর পাতায় উল্লেখ করেছেন। এমনকি তাঁর মায়ের সঞ্চয়ে প্রায় দুশ'টি এমন গান ছিল তাও তাঁরা হিসাব করে দেখেছিলেন। কালভে যে তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা উত্তরাধিকার সূত্রে মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। সংসার-তরণীর হাল শক্ত হাতে ধরে এই মা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন। প্রধানত মায়ের প্রেরণা ও প্রভাবেই কালভে দুঃখজয় করার শক্তি লাভ করতে সমর্থ হন। অবশেষে অভাবের তাড়না যখন অসহনীয় হয়ে উঠল তখন, মাত্র সাত বছর বয়সে মা তাঁকে পাঠাতে বাধ্য হলেন কনভেন্টে, উদ্দেশ্য সন্ন্যাসিনী হবার পাঠ গ্রহণ করা। বালিকা এমার মনে, মঠের ধর্মীয় এবং mystic পরিবেশ এমনই গভীর প্রভাব ফেলেছিল যে, সন্ন্যাসিনীর জীবনই যে একমাত্র বরণীয় জীবন একথা ভাবতে সেই ছোট্ট মেয়েটি সেদিন একটুও ইতস্তত করেনি। শৈশবে রোপিত এই ভক্তির বীজ হৃদয়ের গভীর স্তরে সংগুপ্ত থেকে জীবনের আর এক পর্বে কিভাবে তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাকে পুষ্ট ও বিকশিত করে তুলেছিল, তার সাক্ষ্য পরবর্তী কালে তাঁর ধর্মজীবনে উত্তরণের ইতিহাসেই নিহিত আছে। সেই বালিকা বয়স থেকেই এমার সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মনের ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে। কোনও এক রহস্যময় দৈবীশক্তির স্ফুরণ তখন থেকেই যেন লক্ষ্য করা যায়। পিসিমার খামারবাড়িতে প্রকৃতির সান্নিধ্যে ছুটি

কাটাতে যেতেন। ঐ দিনগুলির মধুর স্মৃতি তাঁর কাছে চির অমলিন ছিল। দিগন্ত প্রসারিত সবুজ শস্যক্ষেত, শ্যামল শোভায় ভরা উন্মুক্ত প্রকৃতি, নীলকান্ত মণির মতো গাঢ় নীল আকাশ, দূরে পটে আঁকা ছবির মতন পর্বতশ্রেণী তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। নীরব প্রকৃতির গোপন অন্তঃপুর থেকে উত্থিত সুরের রহস্যময় গুঞ্জনধ্বনি আপন আত্মায় উপলব্ধি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হয়ে বসে থাকতেন—সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটায় রাঙানো আকাশের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। ঘরে ফেরা মৌমাছিদের গুনগুনানিতে শুনতে পেতেন স্তোত্রপাঠের মধুর সুর। দূর থেকে ভেসে আসা রাখালিয়া গান হৃদয়ে এক নতুন ভাবের তরঙ্গ জাগাত। পিসি ও তাঁর আবাল্য-সহচরী মার্গারিদোর অপরিসীম ভালবাসায় ভরা এই পরিবেশেই তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন এক অনির্দেশ্য ব্যাকুলতায়, আবেগ প্রকাশের পথ খুঁজে ফিরতে লাগল। স্কুলে ফিরে এসে সহপাঠিনীদের কল্পনার রঙিন সুতোয় বোনা কাহিনী শোনাতেন, কখনও বা শোনাতেন গান—সে গানের বিষণ্ণ মধুর সুরের ইন্দ্রজালে, তারা অজ্ঞাত দুঃখভারে পীড়িত হৃদয়ে অশ্রুবিসর্জন করত। আর এমা তাদের অশ্রুজল দেখে সুখে গর্বে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতেন, তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিকে তিনি কেমন স্বচ্ছন্দে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারছেন এইভেবে। আরও বড় হয়ে মঠের কোনও এক পর্বদিনে, মান্য অতিথিদের উপস্থিতিতে বন্দনাগীতি গেয়ে শোনানোর ভার পেলেন যেদিন, সেদিন মেয়েটির ভাবগম্ভীর, দেবদুর্লভ কণ্ঠস্বর ও মুখমণ্ডলের অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি দেখে অবাক বিস্ময়ে বিশপ মঠের অধ্যক্ষা মাতাজীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেনঃ "What a lovely, what an unusual voicc ! And her face is extraordinarily expressive ! She is an artist !"[৬]

তাঁর শিল্পিসত্তার প্রথম স্বীকৃতি বিশপের এই উক্তি কালভেকে বিহ্বল করে দিল। অজানা এক নতুন জীবনের আহ্বান তাঁকে চঞ্চল করে তুলল। পঞ্চদশী এমার প্রাণ জেগে উঠেছে—এবার এল তাঁর শিল্পিসত্তার উন্মেষলগ্ন।

কালভের প্রেরণাদাত্রী মা উপলব্ধি করলেন কন্যার ভিতরে রয়েছে যে অগ্নিকণা, তাকে প্রজ্বলিত করে তোলার দায়িত্ব প্রধানত তাঁরই। তাই কনভেন্টের জীবনকে বিদায় জানিয়ে, কিশোরী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে নিঃসম্বল মাতা এলেন শিল্প ও সংস্কৃতির পীঠস্থান প্যারী শহরে, তাঁর আশা প্রতিভাময়ী কন্যাকে বিকশিত হবার সুযোগ হয়তো এই শহরই দিতে পারবে। এই সাহসিনী রমণী শিশুসন্তানদের নিয়ে প্যারীর মমার্ত অঞ্চলে নিম্নবিত্তদের পাড়ায় বাসা বাঁধলেন এবং অচেনা, অপরিচিত শহরের পথে পথে কন্যার হাতটি ধরে উপযুক্ত শিল্পী-গুরুর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন একটিই প্রার্থনা নিয়ে, কন্যার প্রতিভা আছে কিনা বিচার করে তাঁরা তাকে বিকশিত হবার সুযোগ দিন। ভবিষ্যতে তাঁর কন্যা যে খুব বড় শিল্পী হবেন এই প্রত্যয়ে স্থিরনিশ্চয় হয়ে তিনি তাঁদের বলতেন, কন্যার ভবিষ্যৎ উপার্জন থেকেই তিনি গুরুদক্ষিণা শোধ করবেন। বিত্তহীন মাতার কি বিচিত্র আবেদন! অবশেষে সুযোগ এল—পেলেন শিক্ষাগুরু। বিখ্যাত অপেরা গায়ক (Tenor) জুল প্যুজে সম্মত হলেন শিক্ষাদান করতে। শুধু তো সঙ্গীতই নয়, অপেরা গায়িকাকে নৃত্য, গীত, অভিনয় এই তিনটি বিষয়েই যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে হয়। শুরু হল কালভের সাধনা—শীতে, বর্ষায়, অনাহারে, অর্ধাহারে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে, উপেক্ষা আর অবমাননা

সহ্য করে ক্ষীণকায়া ভীরু মেয়েটি গভীর নিষ্ঠা নিয়ে গুরুর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতে লাগল।

তিন বছর পরে, গুরুর নির্দেশে প্রথম মঞ্চাবতরণ করলেন অষ্টাদশী এমা। মায়ের হাতে এনে দিলেন জীবনের প্রথম উপার্জন মাত্র পঞ্চাশটি ফ্রাঁ। কিন্তু কি গর্ব কি আনন্দ সেদিন তাঁর! সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মাতোয়ারা, গায়িকা জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে তিনি তখন বিভোর—"আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া/আকুল পাগল পারা/কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া/রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া/রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া/দিব রে পরাণ ঢালি।"

ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠান করার ডাক আসতে লাগল একের পর এক। সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস জাগতে শুরু করল। উপলব্ধি করলেন আরও বড় হতে হবে, আরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এই সময়েই আর এক অসামান্যা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীকে পেলেন শিক্ষিকারূপে, মাদাম লাবার্দো—যাঁর কাছ থেকে শুধু অভিনয়ই শিখলেন না—যিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে তাঁকে এক মহৎ শিল্পীতে রূপান্তরিত করলেন।

তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। স্বপ্ন, সাধ পূরণের জন্য শুধুই এগিয়ে চলা—উত্থান, উত্থান আর উত্থান। অপেরার দলের সঙ্গে ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন শহরে পরিভ্রমণ করে, সঙ্গীতের সুরমূর্ছনায়, নৃত্যের লীলায়িত ভঙ্গিমায়, সর্বোপরি, বিখ্যাত নাটকের ক্লাসিক চরিত্রগুলির বাস্তব রূপায়ণে, নাট্যরসপিপাসু দর্শকের হৃদয়ে ভাবের তুফান জাগাতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলি, বিরহিনী ওফেলিয়া, ফাউস্টের মার্গারিটা, প্রেমিকা জুলিয়েট, কৃষক কন্যা সানটুৎসা, এলমা, জিপসি কন্যা কারমেন পূর্ব অভিনেত্রীদের গৌরবকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল। বিশেষত কারমেনের চরিত্রের জীবন্ত রূপ, তার সরলতা, সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা, প্রেম-প্রতিহিংসা এমন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতেন তিনি যে মঞ্চে অবতীর্ণা কন্যাকে দেখে তাঁর মা-ও সবিস্ময়ে বলে উঠতেনঃ "তুই কে? তোকে তো আমরা চিনতে পারি না!" অভিভূত দর্শকমণ্ডলী বিস্মিত হয়ে বলতঃ "She is on fire ! See the smoke."[৭]

প্রসন্ন হাস্যে ভাগ্যদেবী যশের মুকুট দিলেন পরিয়ে। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সম্মান, সমাদর এল এবং অবশ্যই এল অর্থ, প্রচুর অর্থ। তথাকথিত সুখের উপকরণে ভাণ্ডার গেল ভরে। স্বামীজী লিখেছেনঃ "এঁর গীতের এত সমাদর যে, এঁর তিন লক্ষ, চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে।"[৮] অতি দরিদ্র যে বালিকাটি একদিন পাহাড়চূড়ায় ক্যাব্রিয়ার প্রাসাদের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধনেত্রে স্বপ্নের ঘোরে বলে উঠেছিলঃ 'ঐ প্রাসাদ একদিন আমার হবে' এবং সঙ্গিনীদের কাছে উপহাসের পাত্রী হয়েছিল, ভাগ্যের খেলায় সেই প্রাসাদ সত্যসত্যই কালভের নিজস্ব হল। আর সম্মান, সমাদর, খ্যাতি তাঁকে এনে দিল 'অদৃশ্য অমূল্য উপহার।' সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, অভিজাত সম্প্রদায়, বিদগ্ধমণ্ডলী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, ক্ষেতে কাজ করা কৃষক, কয়লাখনির মজুর কে না অভিভূত হয়েছে তাঁর অভিনয় দেখে! মহারানী ভিক্টোরিয়া, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিনেত্রী, তাঁর কিন্নরকণ্ঠের গীত শ্রবণে এতদূর বিমুগ্ধ ছিলেন যে প্রতিবৎসরই উইণ্ডসর প্রাসাদে এবং পল্লীভবন বালমোরালে কালভেকে আমন্ত্রণ করতেন গান শোনাবার জন্য। কালভের

প্রতি ছিল তাঁর অসীম স্নেহ। রাজসভার আদব-কায়দার নিখুঁত ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অত্যন্ত সরলপ্রকৃতির এই প্রতিভাময়ী মেয়েটি যখন সভাসদদের বিরক্তির কারণ হতেন তখন মায়ের মতো স্নেহ দিয়ে স্বয়ং মহারানী তাঁর ত্রুটিগুলি ঢেকে দিতেন। কালভেকে তিনি এতখানিই ভালবাসতেন যে, রাজবাড়ির ভাস্করকে দিয়ে তাঁর মর্মর মূর্তি নির্মাণ করিয়ে, রাজকীয় সংগ্রহশালায়, রাজপরিবারের সদস্যদের মূর্তির সঙ্গে তা রেখে দিয়েছিলেন। রাশিয়ার সম্রাট-সম্রাজ্ঞী তাঁকে সংবর্ধিত করেছেন বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, তুরস্কের সুলতান কালভের প্রবাদপ্রতিম চরিত্র 'কারমেনে'র অভিনয়ের খ্যাতি শুনে তাঁকে দরবারে আহ্বান করে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। তৎকালীন বিদগ্ধ কবি, সাহিত্যিকেরা ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ, অনুরাগী ভক্ত। ভ্যার্লেন, অস্কার ওয়াইল্ড, ম্যাসনে, আলফঁস দোদে, মিস্ত্রাল—তাঁর প্রতিভার কাছে সকলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছেন। "Your voice is sword, a leaping flame." "You came down from the mountains like a torrent."[৯] "You evoke all your race in your singing. Your mountains and your wide, high plains live again in the sound of your voice, pure and luminous like golden honey !"[১০]

কালভে সম্বন্ধে তাঁদের উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের অভিব্যক্তি এইসব উক্তির মধ্য দিয়েই প্রকাশিত। শিল্পী জীবনের পরম সার্থকতার আনন্দ ও গৌরবে তাঁর জীবন তখন কানায় কানায় পূর্ণ।

শিল্পী এমা কালভে যথার্থই সুরলোকের অপ্সরা-শিরোমণি উর্বশী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন কিন্তু মানবী এমা—তিনি তো এই মাটির পৃথিবীর রক্তমাংসে গড়া এক নারী। তাঁর হৃদয়ের সংগোপন বাসনার কেন্দ্রভূমিতে ছিল মায়া মমতায় ভরা একটি ছোট সুখের স্বর্গ গড়ে তোলার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। রঙ্গমঞ্চের জীবনই তো সব নয়—সে জীবনের যশ-খ্যাতি, সম্মান-সমাদর তাঁকে গৌরব দিয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণতা কোথায়? তাই একান্ত বাঞ্ছিত স্বামী এবং দেবশিশুর মতো সন্তান নিয়ে সুখের সংসারে নারীর চিরন্তন মহিমাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন তিনি। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁর এই সরল অথচ তীব্র ইচ্ছাটুকু কি নির্মমভাবেই না ব্যর্থ হল। তাঁর প্রেম হল রূঢ়তায় প্রত্যাখ্যাত—বুকভাঙা আঘাতে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেলেন তিনি। আত্মধিক্কারে ভরে উঠল অস্থির মন। নীরস, আনন্দহীন শিল্পের জগৎ সরে গেল দূরে। এক সর্বগ্রাসী হতাশা আর বুভুক্ষু অতৃপ্তি তাঁকে ঘিরে ধরল। নিজের প্রতি দুরন্ত অভিমান, দিনরাত আত্মহননে প্ররোচিত করতে লাগল তাঁকে। তিনি তখন জলের শহর ভেনিসে। নীরব নিশীথে, নিঃসীম অন্ধকারে, আকাশের নীচে হ্রদের অতল কালোজলে মরণের আহ্বান শুনতে পেলেন। সে ডাকে সাড়া দেবার পূর্বমুহূর্তে কোনও এক সঙ্গিহীন মাঝির কণ্ঠের দূরাগত সুরের ধ্বনি মর্মবীণায় তীব্র ঝঙ্কার তুলে তাঁর শিল্পিসত্তাকে জাগিয়ে দিল। বিষাদভরা উল্লাসে উচ্চকিত হয়ে ছুটে এলেন জনহীন সেই হ্রদের তীরে। কিনারায় বাঁধা একটি গণ্ডোলা নিয়ে নিঃশব্দে ভেসে গেলেন বহুদূরে—কণ্ঠে তুলে নিলেন গান। "Ah ! To sing ! To sing once more before I died."[১১] সমাপ্তির প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে, বেদনার সূচীমুখ কন্টক হৃদয়ে বিদ্ধ করে, জীবনের শেষ সঙ্গীতের সুরমূর্ছনায় জলস্থল, আকাশ বাতাস কান্নায় ভরিয়ে দিলেন

সুরসম্রাজ্ঞী। ক্লান্ত, আর্ত, মরণাহত নাইটিঙ্গেল আপন অজ্ঞাতে রক্তঝরা গানে গানে বিষাদময় আনন্দের রক্তগোলাপ ফুটিয়ে তুললেন। কতক্ষণ যে পার হয়ে গেল! সম্বিত ফিরে এল যখন, চমকে উঠলেন তিনি—বহু মানুষের নিঃশব্দ তরণী এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাঁকে। ভক্তদের এড়িয়ে চুপিচুপি পালিয়ে এসে বাঁচলেন তিনি। তাঁর গান তাঁকে মরণের দ্বার থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। না, সকলকে এড়াতে পারেননি তিনি। পরদিন অনুরাগী এক দম্পতি একগুচ্ছ ফুলের সঙ্গে তাঁদের অভিনন্দন পাঠিয়ে দিলেনঃ "From Paul and Jeanne...to whom you have given an unforgettable night. May the blessings of God be upon you, you who are the bearer of the 'Fire Divine'."[১১]

কালভে প্রাণপণে ভুলতে চাইলেন সব ব্যথা-যন্ত্রণা, ফিরে আসতে চেষ্টা করলেন পুরোনো জীবনের আশ্রয়ে। কিন্তু আবার এল উন্মত্ত সর্বনাশা ঝড়। শান্তি পাবার সকল প্রয়াস মুহূর্তে ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে গেল। একটি সাত বছরের শিশুকন্যা ছিল তাঁর। তাকে বুকে নিয়ে জীবনের ব্যর্থ বাসনার আঘাত ভুলে, ভালবাসায় ভরা প্রহর কাটানোর আনন্দে তন্ময় হয়ে থাকতে চাইতেন তিনি। কিন্তু বিধাতার খেয়ালী খেলায় সে ইচ্ছাটুকুরও অপমৃত্যু ঘটল কি নিদারুণভাবে! তিনি শিল্পী—মঞ্চের ডাকে তাঁকে সাড়া তো দিতেই হবে। তাই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে শিকাগোয় এলেন 'কারমেন' অপেরায় অভিনয় করতে। নয়নের মণি আদরিণী কন্যাটিকে বান্ধবীর কাছে রেখে দিলেন। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সেদিন অনুষ্ঠানে যেতে তাঁর মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু শিল্পীর জীবন ব্যক্তিগত সকল সুখদুঃখের ঊর্ধ্বে। অপেরার এক একটি পর্ব অভিনয় করতে করতে ক্লান্তি ও অবসন্নতায় ভেঙে পড়ছেন তিনি। অথচ পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়ানো মাত্র কি এক রহস্যময় দৈবীশক্তির প্রেরণা অনুভব করছেন হৃদয়ে আর তারই আচ্ছন্নতায় পর্বের পর পর্বে সঙ্গীতের মধুর সুরে, নৃত্যের লীলায়িত ভঙ্গিমায় এবং অভিনয়ের মনোহারিত্বে দর্শকচিত্তকে আবেগে ব্যাকুল-বিহ্বল করে তুলছেন। অভিনয় শেষে তাদের আত্মহারা অভিনন্দনের মধ্য দিয়ে ফিরে এলেন সাজঘরে—বাড়ি যেতে হবে। অনেকক্ষণ যে দেখেননি আদরের কন্যাটিকে। কিন্তু একি সহকর্মীরা এমন স্তব্ধ, নিশ্চুপ হয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কেন? পেলেন উত্তর—হতভাগিনী কালভে যতক্ষণ 'কারমেন' অভিনয় করছিলেন মঞ্চে—তাঁর কন্যাটি ততক্ষণে বন্ধুর অসাবধানতায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করেছে। তীক্ষ্ণ শেলের আঘাতে বিদীর্ণ হল বক্ষ। মাতৃহৃদয় হাহাকার করে উঠল—একি অমারাত্রির দুঃস্বপ্ন! উন্মত্ত হয়ে ভাবলেন—রূপহীন, রসহীন, ছন্দহীন এই বিবর্ণ জীবনে তাঁর কি প্রয়োজন? এ কি বিচিত্র লীলা বিধাতার। তাঁর ব্যক্তিজীবনের কামনা-বাসনা, চাওয়া-পাওয়ার প্রদীপগুলি এমনি ভাবেই কি একটি একটি করে নিভিয়ে দিতে হয়! মরুভূমির শূন্যতা নিয়ে কি করে বাঁচবেন তিনি? তাই আবার আত্মহননের চেষ্টা, আবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসা।

কালভের জীবন এমনি করেই শেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু পথিক কি জানে, পথের বাঁকে বাঁকে কোন রহস্য তার জন্য অপেক্ষা করে আছে? জীবনদেবতা মৃদু হেসে আর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। এই মহাসংকটক্ষণেই, কালভের জীবনে গুরুরূপে,

পিতারূপে এক অলোকসামান্য মহাপুরুষের আবির্ভাব।

সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন এক তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসী। আমেরিকার বিদগ্ধ পরিমণ্ডলে আধ্যাত্মিকতার নতুন বাণী শুনিয়ে তুমুল আলোড়ন তুলেছেন। তাঁর সুদৃঢ় অথচ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, দেবপ্রতিম বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতি, বক্তব্যের অভিনবত্ব, অগ্নিময়ী বাণীর ওজস্বিতায় বিমুগ্ধপ্রাণ, বিশিষ্ট কিছু নরনারী ভিড় করেছে তাঁর চারিপাশে। তাঁদেরই একজন, কালভের এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী তাঁকে নিয়ে এলেন স্বামীজীর কাছে। বন্ধুর আগ্রহে এলেন অনেক অনীহা নিয়ে। তাঁর ক্ষতবিক্ষত, যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ে এক অপরিচিত হিন্দুযোগী কি শান্তির প্রলেপ দিতে পারবেন? আত্মজীবনীতে প্রথম সাক্ষাৎকারের বর্ণনাটি কালভে দিয়েছেন এইভাবে ঃ "যখন আমি ঘরে ঢুকলাম, তিনি বসেছিলেন ধ্যানের আসনে, পরিধানে সন্ন্যাসীর কাষায়বস্ত্র, মাথায় উষ্ণীষ। ধ্যাননিমীলিত দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ।" কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, আহত অভিমানে, তিনি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ করছেন তখনই শুনতে পেলেন স্বামীজীর কণ্ঠস্বর—কি অপূর্ব সেই স্বর! গির্জার ঘন্টাধ্বনির মতো গভীর গম্ভীর সুরের তরঙ্গ যেন মুহূর্তে তাঁর সমস্ত মনকে উন্মুখ করে তুলল। কালভেকে উদ্দেশ করে স্বামীজী বলে উঠলেন ঃ "My child, what a troubled atmosphere you have about you ! Be calm ! It is essential."[১৩] তারপর কালভের জীবনের যন্ত্রণা, উদ্বেগ, অবসাদ, সমস্যা ও সংকটের কথা ধীরস্থিরভাবে বলে যেতে লাগলেন। সবিস্ময়ে কালভে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, যা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত, গোপন, তার কথা তিনি কেমন করে জানতে পেরেছেন? যেমন করে মা তাঁর অবুঝ শিশুকে বুঝিয়ে দেন তেমনি করেই স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন ঃ "No one has talked to me...I read in you as in an open book."[১৪] তিনি তাঁকে আরও বললেন, জীবনের ব্যথাযন্ত্রণা সাময়িক—সব ভুলতে হবে। ব্যক্তিগত দুঃখশোকের মধ্যে স্বেচ্ছানির্বাসন নয়, দুঃখের আবর্তে তলিয়ে যাওয়া নয়, পিছনের দিকে তাকিয়ে অশ্রুবিসর্জন নয়। তিনি শিল্পী তাই তাঁর যথার্থ মুক্তি শিল্পের জগতেই। সকল আবেগকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুক্ত করে দেওয়াই তাঁর কর্তব্য। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের উন্মোচন ঘটবে এ পথেই। সেই মুহূর্তে কালভের মনে হল, তাঁর উত্তপ্ত, শোকগ্রস্ত, মোহাচ্ছন্ন মস্তিষ্ক যেন স্বামীজীর বাণীর যাদুস্পর্শে পবিত্র, শান্ত, স্নিগ্ধ, শীতল হয়ে উঠল, জুড়িয়ে গেল তাঁর সকল জ্বালা। ফিরে এলেন তিনি অন্য মানুষ হয়ে। পরবর্তী কালে এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেছেন ঃ "আমার সব ব্যথা যেন জুড়িয়ে গেল তাঁর কথালাপে ও স্নেহস্পর্শে। তাঁর কথাই ছিল আমার কাছে একমাত্র অমৃত আর মুগ্ধ হতাম তাঁর মাতৃসম্বোধনে।"[১৫]

কালভে স্বামীজীকে পেলেন পরিত্রাতারূপে। তাঁর জন্মান্তর ঘটল। তিনি তাঁকে 'Mon Piere'—'আমার পিতা' বলে উল্লেখ করতেন। তাঁর গভীর বিশ্বাস স্বামীজীর পবিত্রতা, চারিত্রিক দার্ঢ্য, সুমহান ব্যক্তিত্ব, সর্বোপরি তাঁর সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তিই তাঁকে আশু পতনের হাত থেকে পরিত্রাণ করেছে। কালভের আরও একটি প্রত্যয় ছিল যে, তাঁর গুরু ঈশ্বরপুত্র, ঈশ্বর-সান্নিধ্য ধন্য। স্বামীজীর কাছে তিনি পেয়েছিলেন অভয় মন্ত্র 'Life is courage'. ত্যাগের আদর্শে, প্রেমের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন তিনি। মানবসেবার ব্রত গ্রহণ করে ভুলতে পেরেছিলেন নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ। স্বামীজী তাঁর অন্তরের সুপ্ত

ধর্মবোধকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন—যে ধর্ম বিশ্বজনের কল্যাণকর্মে নিজেকে স্বচ্ছন্দে আহুতি দিতে পারে। তিনি তাঁকে শিখিয়েছিলেন প্রাণায়ামের কতকগুলি পদ্ধতি যার মধ্য দিয়ে বায়ুতরঙ্গে ভাসমান অদৃশ্য দৈবীশক্তিকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করা যায়। আর শিখিয়েছিলেন ধ্যানের নিবিষ্টতায় একাগ্র তন্ময় হয়ে আত্মস্বরূপ উপলব্ধির উপায়। স্বামীজীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন উপনিষদের অভীঃমন্ত্র ও প্রার্থনা।

কালভে তাঁর আত্মজীবনীর একটি অধ্যায়ে, 'Order of the Vedantas', গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বামীজীর স্মৃতিচারণ করেছেন। তাঁর ডায়েরি বা তাঁর বান্ধবীদের লেখা থেকে জানা যায় যে বিবেকানন্দ তাঁর জীবনে ঈশ্বরপ্রেরিত এক মহান পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্বামীজী যখন আস্তিক্যবাদ, অমরত্ব, জন্মান্তর, অদ্বৈতানুভূতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন, তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে তা শুনতেন। নিঃসংশয় হবার জন্য প্রশ্ন করতেন, স্বমতে স্থির থাকতে চাইতেন আর তাঁর গুরু কেমন সুন্দরভাবে ছোট ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে তাঁর সকল সন্দেহ, সংশয় ঘুচিয়ে দিতেন। স্বামীজীর সঙ্গ কালভে পেয়েছিলেন খুব অল্প দিনের জন্যই। তাঁর সঙ্গে সদলবলে গ্রীস, তুরস্ক, মিশর পরিভ্রমণের স্মৃতি তাঁর জীবনের অক্ষয় সম্পদে পরিণত হয়েছিল। সে ভ্রমণকে তিনি বর্ণনা করেছেন এক অবিস্মরণীয় তীর্থযাত্রা বলেঃ 'What a pilgrimage it was!'[১৬] কালভের ডায়েরির একটি অংশ থেকে সেই যাত্রার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়ঃ "আমার জীবনের পরম ধন এইসব মুহূর্তগুলি। স্বামীজীর কাছটিতে বসে থাকতে পারলে মন অধ্যাত্মপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়। তখন মনে হয় নিবিড় আধ্যাত্মিক আবহে জীবনধারণ করছি। প্রতিটি মুহূর্তই ভাবসমৃদ্ধ। হিন্দু পুরাণ থেকে শুরু করে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সব তাঁর মুখে মুখে ফিরছে। আবার কখনও বা শিশুর মতো সদাহাস্যময়। কখনও হাসছেন, ঠাট্টা করছেন, সরস কথায় পরিবেশ হালকা করে দিচ্ছেন। সেসব কথা আর মুহূর্তগুলো যেন হীরের টুকরো।...আর কি গভীর মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর। যেন চেলোর বাদন। গম্ভীর, ভরাট।...শুধু কানে শোনা নয়, সেসব যেন হৃদয়ের কথাও।"[১৭] সেই কটি দিনের অবিস্মরণীয় সান্নিধ্য পেয়ে কালভে তাঁর গুরুকে চিনেছিলেন অসাধারণ প্রজ্ঞাবান ঋষিরূপে। গ্রীস দেশে Elusis-এ মন্দিরগুলির বেদীতে বেদীতে প্রাচীন দিনের গ্রীসীয় ধর্মানুষ্ঠানের রহস্য যখন ব্যাখ্যা করতেন স্বামীজী কিংবা মিশরে বিশাল Sphinx-এর ছায়ায় অন্ধকার রাতের তারার আলোয় বসে প্রাচীন মিশরীয় ইতিহাস বর্ণনা করতেন, তন্ময় হয়ে যেতেন তাঁরা—ভুলে যেতেন কখন বা কোথায় যেতে হবে তাঁদের। এমনই একদিন পথ ভুলে এসে পড়েছিলেন কায়রোর এক নিষিদ্ধ পল্লীতে। চারিদিকের মলিন পরিবেশ, কটু গন্ধ। অমার্জিত কিছু রমণীকে দেখামাত্রই তাঁরা সচেতন হয়ে দ্রুত স্বামীজীকে সেখান থেকে সরিয়ে আনতে চাইলেন। কিন্তু যেই স্বামীজীর নজর পড়ল তাদের ওপর, সবাইকে বিস্মিত করে তিনি এগিয়ে গেলেন মেয়েগুলির দিকে। করুণার অশ্রু ঝরে পড়ল দু'চোখ ছাপিয়ে। গভীর ব্যথায় বারবার বলতে লাগলেনঃ "হা ঈশ্বর! তোমার সন্তান এরা, অথচ এদের দেবত্ব এমন দীনতার আবরণে আবৃত কেন—আহা কে এদের পথ দেখাবে।" গভীর লজ্জায় নুয়ে পড়ে মেয়েগুলি তখন হাত দিয়ে মুখ ঢেকেছে, কেউ বা তাঁর বসনপ্রান্ত চুম্বন করে ক্ষমা চাইছে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে কালভের মনে হয়েছে স্বয়ং যীশুখ্রীস্ট যেন তাদের উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত

হয়েছেন—করুণায় বিগলিত হৃদয় 'মানবের দেবতারূপে'।

এই তীর্থভ্রমণেই স্বামীজীর সঙ্গে কালভের শেষ দেখা। মিশর থেকেই তিনি ফিরে আসেন ভারতে আর তার কিছুদিন পরেই হয় তাঁর দেহাবসান। কালভে তাঁর গুরুকে দেখার সুযোগ আর পাননি। কিন্তু মহাপ্রয়াণের দীর্ঘদিন পরে প্রাচ্যদেশ ভ্রমণকালে কালভে ভারতে এসেছিলেন, গুরুর স্মৃতিপূত বেলুড় মঠ দর্শনের বাসনা নিয়ে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর। আত্মজীবনীতে সেই দিনটির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেনঃ "His mother took me there."[১৮] ভাবতে বিস্ময় জাগে বৃদ্ধা মমতাময়ী মাতা সন্ন্যাসী-পুত্রের অন্তিম স্মৃতিভূমিতে তীর্থদর্শনে চলেছেন অনুরাগিণী এক বিদেশিনী কন্যার হাতটি ধরে পথনির্দেশ করে। এই মহিমময় দৃশ্য বোধকরি ভারতবর্ষের এই পুণ্যভূমিতেই দেখা সম্ভব। স্বামীজীর কক্ষে, উদ্যানভূমিতে, তাঁর সমাধি-মন্দিরে স্মৃতিভারাতুর হৃদয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন কালভে। তাঁর সমাধিস্থলে নীরব অশ্রুজলের অর্ঘ্য নিয়ে বহুক্ষণ গুরুর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন তিনি। পরে ঠাকুরঘরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির সম্মুখে নতজানু হয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। পূজনীয় স্বামী সারদানন্দের কাছে শুনতে চাইলেন সেই বৈদিক মন্ত্রটির আবৃত্তি, যে মন্ত্র তাঁর গুরুর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন একদিন। স্বামী সারদানন্দের কণ্ঠে উচ্চারিত 'অসতো মা সদ্‌গময়' মন্ত্রটির সুললিত আবৃত্তির শুদ্ধ ধ্বনিমাধুর্যে তিনি ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন—এ যে তাঁরই হৃদয়ের অনুক্ষণ অনুধ্যানের বাণী। স্বামীজীর স্মৃতিপূত সেই পুণ্যস্থলে এসে তিনি স্বতঃই আনন্দবিহ্বলা হয়ে পড়েছিলেন। তিনি স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে সেদিন ঠাকুরকে তাঁর মাতৃভাষায় দুটি গানও শুনিয়েছিলেন। তৎকালে উপস্থিত শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন তাঁর স্মৃতিকথায় সেই ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেনঃ "যদিও সে সঙ্গীতের অর্থ আমাদের অবোধ্য, কিন্তু কি মধুর স্বরলহরী, যেন হঠাৎ হাজার বুলবুল ঝঙ্কার দিয়ে উঠল...যেন সে স্বরলহরী মঠের স্নিগ্ধ গম্ভীর বায়ুস্তরকে কম্পিত করে, আন্দোলিত করে, এক আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত করলে।"[১৯]

অপরাহ্ণে মঠাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামীজীর অপরাপর গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণ গঙ্গাতীরে মঠপ্রাঙ্গণে মাদামকে ভারতীয় রীতি অনুযায়ী সাদর আপ্যায়ন জানান। স্বামীজীর ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। শান্তচ্ছন্দে প্রবাহিত ভাগীরথীর তীরে, শ্যাম শষ্পাচ্ছাদিত উদ্যানভূমিতে, সুস্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত আসন্ন সন্ধ্যার পটভূমিতে, সন্ন্যাসিবৃন্দ আয়োজিত ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের সুরমূর্ছনা শুনতে শুনতে ভাবময়ী মাদাম কালভে যেন এক মায়াময় কল্পলোকের সন্ধান পেয়েছিলেন। একটি শান্ত রমণীয় সন্ধ্যা পরম শান্তিভরে উপভোগ করেছিলেন সেদিন। তারই স্মৃতি আমৃত্যু উজ্জ্বল হয়েছিল তাঁর হৃদয়ে—পরবর্তী কালে জীবনীগ্রন্থে লিখেছেনঃ "These beings, pure, beautiful and remote, seemed to belong to another universe, a better and wiser world."[২০]

স্বামীজীর আশীর্বাদে কালভে নবজীবন লাভ করেছিলেন। অবশিষ্ট জীবনে তাই তিনি মানবকল্যাণ কর্মকে দেবসেবারূপে গ্রহণ করে যেখানেই দেখেছেন অসহায়, দুঃখী, দুর্বল মানুষ যন্ত্রণায় কাতর, তাঁর সংবেদনশীল মন তাদের সেবা করার, সান্ত্বনা দেবার

প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। সেবার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর ঈশ্বরকে পেয়েছেন। পৃথিবী জুড়ে যখন প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে, তখন স্বদেশপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হৃদয়ে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার মহান ব্রতধারী সৈনিকদের সাহায্যের জন্য তহবিল গঠনের কাজে নেমেছেন—সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করে। এই রকমই এক অনুষ্ঠানে প্রায় দশ হাজার দেশবাসীর সমাবেশে ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত 'Marseillaise' গাইতে গাইতে ভাবের আবেগে সেই উত্তাল জনতাকে আপ্লুত করে, অশ্রুজলে প্লাবিত করে এক অসাধারণ ইতিহাস রচনা করেছিলেন তিনি। নিজে ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী, তাই সংকটকালে দেশরক্ষার তাগিদে নিজের যতটুকু সাধ্য তাই নিয়েই কাজ শুরু করেছিলেন, স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলেন যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবার ভার। তাঁর সুধাকণ্ঠের গান শুনিয়ে সৈনিকদের ব্যয়ভার বহনের জন্য হাজার হাজার ডলার সংগ্রহ করেছেন। আহত সৈনিকদের সেবা করতে গিয়ে শোকে দুঃখে কাতর হয়েছেন, যুদ্ধের বীভৎসতায় শিউরে উঠেছেন। মা যেমন অপার স্নেহে আপন সন্তানের সেবা করেন তেমনিভাবে হাসপাতালের কক্ষে কক্ষে ঘুরে সেবা দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে কখনও বা মধুঝরা কণ্ঠের গান শুনিয়ে তাদের ব্যথা বেদনা দূর করার চেষ্টা করেছেন। সবচেয়ে দুঃখ পেয়েছিলেন মহাযুদ্ধের শিকার অন্ধ যুবকদের দেখে। সুস্থ সবল তরুণেরা শুধুমাত্র দর্শনেন্দ্রিয় হারিয়ে কি অসহায়, পরমুখাপেক্ষী হয়ে দিনযাপন করছে—তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। এদের স্বাভাবিক এবং সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। অনাথ আশ্রমের কন্যাদের কাছে আবেদন করলেন এঁদের বিবাহ করে সুন্দর সংসার গড়ে তুলতে। স্বয়ং আয়োজন করে বিবাহ দিয়েছেন। পাত্রপাত্রীদের সম্মতিক্রমে নিজের হাতে তাদের সুখের নীড় বেঁধে নিজের জীবনের স্বপ্ন-সাধ পূর্ণ করেছেন অপরের জীবনে। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে এসেছেন তাঁদের ঘরসংসার। দেবশিশুর মতো সন্তানকে বুকে নিয়ে সুঠাম স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মনিপুণা স্ত্রীর সাহচর্যে অন্ধ পিতার পরিতৃপ্ত মুখচ্ছবি অন্তরাল থেকে দেখে এসে কি আনন্দেই না বুক ভরে উঠেছে তাঁর! কোনও এক ধনীর প্রাসাদে গান শোনাবার আমন্ত্রণ পেয়ে, সেখানে উপস্থিত হয়ে যেই শুনেছেন, গৃহকর্ত্রীর অসুস্থ, পঙ্গু ছেলেটি গান শুনতে ভালবাসে কিন্তু ওঠবার ক্ষমতা নেই তার—অমনি পথশ্রান্তি ভুলে, অন্যান্য অতিথিদের কথা ভুলে, অসুস্থ ছেলেটির রোগশয্যার পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নৃত্য-গীত অভিনয়ে মনোরঞ্জন করেছেন। হৃতসর্বস্ব, দুঃখিনী মাতার মৃত পুত্রের শেষ স্মৃতিচিহ্ন একমুঠি খেলাঘরের ধূলি এনে সান্ত্বনা দিয়েছেন হতভাগিনী জননীকে। বিপন্ন পীড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি—নিঃশব্দে বাড়িয়ে দিয়েছেন সেবার হাতদুটি। এদের মধ্যে দিয়েই কালভে ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছিলেন।

শেষ জীবনে কালভে তাঁর প্রাসাদ দুর্গ ক্যাব্রিয়ারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গীত শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর ভাষায় সেই 'Young Song Bird'-দের নিয়ে পরম আনন্দে সময় কাটাতেন। গান শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্মশিক্ষাও দিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর জীবন, তাঁর কণ্ঠস্বর ঈশ্বরেরই দান। দেবতার আশীর্বাদ না পেলে জীবনে কোনকিছুই লাভ করা যায় না। সেইসব ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের তিনি প্রাণায়াম করতে শেখাতেন, উপনিষদের শ্লোক সুর দিয়ে গাইতে শেখাতেন। শিল্পী হতে গেলে

ঈশ্বরের অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন—এই প্রত্যয় তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতেন তিনি। বালিকা বয়সে কালভের হৃদয়ে ধর্মের যে দীপটি প্রজ্বলিত হয়েছিল—সেই অনির্বাণ আলোকবর্তিকা তাঁর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের শত আলোড়নেও নির্বাপিত হয়নি। শেষ জীবনের দিনগুলি তারই উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়ে উঠেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ কালভের সারা জীবনের সংগ্রামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন ঃ "কালভে...মহীয়সী মহিলা। সাইক্লোনের মুখে দাঁড়িয়ে বিশাল পাইনগাছ লড়াই করে যাচ্ছে। মহান দৃশ্য।"[২১] জীবনে যে দুঃখের নির্মম রূপ দেখেছিলেন, স্বামীজীর শরণ নিয়ে সেই দুঃখকেই অমৃত করে নিতে পেরেছিলেন, তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মন সংবেদনশীল, পরদুঃখকাতর হয়ে উঠতে পেরেছিল। কালভে সত্যই ছিলেন 'bearer of the Fire Divine', পূত হোমাগ্নিশিখা হৃদয়ে ধারণ করে তিনি জীবনপথ পরিক্রমা সাঙ্গ করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল এই যে ঈশ্বরই তাঁর জীবন ও তাঁর কর্মের একমাত্র নিয়ামক। তাঁর দেওয়া কর্তব্যপালনেই কালভের একমাত্র অধিকার—তাই ঈশ্বরের কাজে জীবন সঁপে দিয়ে পরম শান্তি পেয়েছিলেন তিনি। আর কালভেব আধ্যাত্মিক জীবনের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে যাঁর কৃপায়, সেই গুরুব প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। স্বামীজীব প্রতি পরম ভক্তিতে তাই তিনি বলেছেন ঃ "a noble being, a saint, a philosopher and a true friend. ...He opened up new horizons before me, enlarging and vivifying my religious ideas and ideals, teaching me a broader understanding of truth. My soul will bear him an eternal gratitude."[২২]

এই বিদেশিনী নারীর সংগ্রামের অসামান্য শক্তি ও সাহস, স্বামীজীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। বাস্তবিক ভিতরে বাইরে দিবারাত্র এই অপার সংগ্রামই ছিল তাঁর ঈশ্বরের পূজা। জীবনেব প্রথম পর্বে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে ছিল তাঁর অক্লান্ত সংগ্রাম, পরবর্তী পর্বে স্বামীজীর শরণে এসে আন্তর সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন জীবনবাসনার নির্মোক ছিন্ন করে—নির্মোহ হয়ে শুধু দিনযাপন আর প্রাণধাবণের বহু ঊর্ধ্বে উত্তরণের সে সংগ্রামে তিনি জয়ী হয়েছিলেন তাঁর গুরুর আশীর্বাদে।

এমা কালভে ছিলেন দীর্ঘায়ু—নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বহন করেছেন গুরুর দেওয়া অভয় মন্ত্র 'Life is courage'—এই শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে। জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে তাঁর বড় সাধের, বড় গর্বের 'Cabrier' প্রাসাদটি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছেন শুধু বেঁচে থাকার পাথেয় সংগ্রহ করতে। তবুও জীবনযুদ্ধে অপরাজিতা অশীতিপর বৃদ্ধা অপেরার দল নিয়ে আমেরিকা যাবার পরিকল্পনা করেছেন। যদিও তা বাস্তবে পরিণত করতে পারেননি। এইভাবেই স্বামীজীর অনুপ্রেরণা এসেছে তাঁর জীবনে কোনও অদৃশ্যলোক থেকে। এমা কালভের জীবনের আর একটি চমকপ্রদ ঘটনা থেকেও আমরা জানতে পারি, কিভাবে দেহাবসানের বহু কাল পরে অলক্ষ্যে থেকেও স্বামীজী তাঁর এই অভিমানী কন্যার ব্যথিত হৃদয়ের আর্তিতে সাড়া দিয়েছিলেন। বৃদ্ধা কালভের নিঃসঙ্গ জীবন যখন অর্থের অভাবে বিপন্ন, তখন সেই দুঃসময়ে; পরম ক্ষোভে আক্ষেপ করেছেন মাদাম ভার্দোর কাছে ঃ 'আমি যে মনে প্রাণে তাঁরই কন্যা অথচ স্বামীজী আমার জন্যে কেন কিছুই করলেন না!' দুঃখতাপে ব্যথিতচিত্তে সন্তানই তো পারে প্রিয়তম পিতার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগের

বাণী উচ্চারণ করতে। সাহায্য এসেছে অভাবিত ভাবে। ১৯৪০ সালে, জোসেফিন ম্যাকলাউড মাদাম দ্রিনেত ভার্দোকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন Maurice Bagley গীত-বিতানের তরফ থেকে সুরসম্রাজ্ঞী এমা কালভের জন্য মাসিক পঞ্চাশ ডলার বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাঁকে সেই টাকা পাঠানো হল। স্বামীজীর অদৃশ্য ইঙ্গিত কি কোথাও কাজ করেছিল ? জীবনের শেষদিন পর্যন্ত, কালভের কাছে পরম সম্পদরূপে ছিল স্বামীজীর শিকাগোয় তোলা একটি ছবির বিবর্ণ হয়ে যাওয়া প্রতিলিপি আর ডায়েরির কিছু ছিন্নপত্র যাতে বিভিন্ন সময়ে স্বামীজীর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী বড় যত্নে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তিনি। এগুলি ছিল তাঁর গোপন বৈভব। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় বেদনা, তিনি তাঁর গুরুর, যে গুরু তাঁর অস্তিত্বের মর্মমূলে শক্তি ও প্রেরণার উৎসস্বরূপ ছিলেন, যাঁর কথা সর্বসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে পারলে তিনি ধন্য হতেন—নিজের কণ্ঠরোধ করে সে প্রসঙ্গ তিনি হৃদয়ের নিভৃতে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। মেরী লুইস্ বার্ক তাঁর 'Swami Vivekananda in America : New Discoveries' গ্রন্থে কালভের এই মর্মযন্ত্রণার বিবরণ দিয়েছেন। কালভে তাঁর বান্ধবী মাদাম ভার্দোর কাছে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন কেন তাঁর আত্মজীবনীতে খুব সংক্ষিপ্ত একটি অধ্যায়ে স্বামীজীর কথা উল্লেখ করেছেন। একজন ভারতীয় হিন্দুযোগীকে তিনি তাঁর গুরু, তাঁর পিতা বলে মনে করেন—একথা প্রকাশিত হলে ধর্মযাজকেরা তাঁকে তাঁর স্বদেশভূমিতে তাঁর জনক-জননীর পাশে অন্তিম বিশ্রামের শয্যাটুকু রচনা করতে বাধা দেবেন। তাঁর শেষ কামনা ছিল মৃত্যুর পর তিনি যেন প্রিয় জন্মভূমির মাটিতে পিতামাতার সমাধির পাশে একটু স্থান পান। তার জন্য একখণ্ড ভূমিও তিনি ক্রয় করেছিলেন। মৃত্যুর পর প্রিয়সঙ্গ লাভের এই বাসনা থেকে বঞ্চিত হবার চিন্তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল তাঁর পক্ষে। তবু সত্য প্রকাশ না করতে পারার যন্ত্রণায় বিক্ষত হৃদয় নিয়ে অশীতিপরা বৃদ্ধা মৃত্যুর পদধ্বনি শোনার আশায় প্রহর গুনেছেন।

১৯৪২—এমা কালভের জীবনপথ পরিক্রমা সাঙ্গ হল। সকল সুখ-দুঃখের হল সমাপন। এল পরিপূর্ণ শান্তি। ১৯৫৮ সালে তাঁর জন্মের শতবর্ষপূর্ণ হয়। অনুরাগী ভক্তের দল সমাধি ভূমির ওপর নির্মাণ করলেন তাঁর স্মৃতিবেদী, যার শীর্ষে স্থাপিত হল সুরসম্রাজ্ঞীর আবক্ষ মূর্তি। তার নীচে গানের দুটি কলি—যে গান তিনি অজস্রবার গেয়েছেন 'Faust'-এর মার্গারিট চরিত্র অভিনয় কালে। অভাগিনী মার্গারিট নিজের সন্তানকে হত্যার অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। কারাগারে এ গানটি গেয়ে তিনি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। মনে হয় নিজের কন্যার অপমৃত্যুর জন্য এমা সারাজীবন বিবেকের কাছে নির্মমভাবে নিজেকে অপরাধী করে রেখেছিলেন। তাঁর শেষ শয্যার উপর ঐ গীতিটি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল বোধ করি এই কারণেই। স্মৃতিবেদীর সব নীচে কালভে রচিত আত্মজীবনীর শীর্ষনাম খোদিত করা হয়ঃ 'under every sky sang I'—গানে গানে সারা আকাশ ভরিয়ে দেবার অঙ্গীকার নিয়ে পৃথিবীতে যিনি এসেছিলেন—জীবনের আনন্দ-বেদনার পালা সাঙ্গ করে অবশেষে তাঁর ছুটি মিলল।

স্বামীজীর অন্তরঙ্গ লেগেট পরিবার

প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণা

॥ এক ॥

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা পদার্পণের পর শতাব্দী অতিক্রান্ত। বিশ্বজুড়ে ধর্মমহাসভায় তাঁর আবির্ভাবের শতবর্ষ উদ্‌যাপন, চিন্তার জগতে এক নতুন মাত্রার সংযোজন করেছে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করে অনুশীলন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানসিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মেষ হয়ে চলেছে। শতবর্ষ পূর্বে প্রফেট-প্রদত্ত সেই চিন্তার খোরাক হিমালয়সদৃশ, যার মূল্যায়ন ও আত্তীকরণ চলবে সহস্র বছর ধরে। বিশ্ব-আলোড়নকারী এই অবদান রেখে যেতে পাশ্চাত্যে স্বামীজী কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর সেই সংগ্রামের পশ্চাতে আছে কত জননী, ভ্রাতা ও ভগিনীর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রচেষ্টা। সেই বিশাল ইতিহাসেব সামান্য অংশই উদ্ঘাটিত। সম্প্রতি কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থে বহুমূল্যবান তথ্য যুক্ত হলেও, বহু তথ্যই এখনও অজ্ঞাত রয়েছে। যেটুকু জানা গেছে, সেটুকুও কম বিস্ময়কর নয়। কত মানুষ ব্যক্তিগতভাবে বা পারিবারিকসূত্রে এই দিব্য পুরুষের সংস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছেন, কত মহাপ্রাণ হয়েছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের ধারক ও বাহক, আবার কতজন নীরবে এই ধারাকে পুষ্ট করেছেন। প্রফেটের পাদস্পর্শে বিদেশের স্থানগুলি হয়ে উঠেছে তীর্থ আর বিবেকানন্দ-স্পর্শমণির স্পর্শে মানুষ হয়েছে সোনা। যে কয়েকটি পরিবার স্বামীজীর পাশ্চাত্যজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে লেগেট পরিবার অন্যতম। এই পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে স্বামীজীর বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। আজও এই পরিবারের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের সংযোগ অব্যাহত। লেগেট দম্পতির দৌহিত্রী লেডি চ্যাটারিস ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মা ফ্রান্সেস লেগেটের মৃত্যুর পর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের এক সন্ন্যাসীকে লিখিত পত্রে প্রকাশ করেন তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ঃ "আপনি বলেছেন, গত বিরাশি বছর রামকৃষ্ণ সংঘের সঙ্গে আমাদের পরিবারের যোগ অবিচ্ছিন্ন রয়েছে, সে কথা সত্য। সে যোগ যেন কখনও বিচ্ছিন্ন না হয়।"[১]

॥ দুই ॥

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড ও তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী মিসেস বেসি স্টার্জিসের জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়। এই শুভদিবসেই তাঁদের

জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের উদার অভ্যুদয়। এরপর বিবেকরবি আর অস্তমিত হয়নি। তাঁর দিব্যবিভায় তাঁদের সমগ্র জীবন আলোকিত ছিল, বিশেষ করে জোসেফিনের। লেগেট পরিবারের ক্ষেত্রেও ঐ দিনটিকে বিবেকানন্দ-বোধনের পুণ্যক্ষণ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ উইলিয়ম স্টার্জিসের বিধবা পত্নী বেসি এই বৎসরেই মিঃ ফ্রাঙ্ক লেগেটের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। জোসেফিন ম্যাকলাউডও এই পরিবারের একজন অন্তরঙ্গ পরিজন হয়ে যান। পরবর্তী কালে জোসেফিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বহু মানুষের কাছেই স্বামীজীকে ও তাঁর মহৎ ভাবরাজিকে পৌঁছে দিয়েছিলেন, এমনকি লেগেট পরিবারেও তিনিই ছিলেন বিবেকানন্দ-যোগসূত্র। প্রথম দর্শনেই স্বামীজী ছিলেন জোসেফিনের দৃষ্টিতে সত্যদ্রষ্টা পুরুষ। স্মৃতিচারণকালে জোসেফিন লেখেনঃ "সেদিন তিনি ঠিক কি বলেছিলেন আজ আমার মনে নেই, কিন্তু যা কিছু বলেছিলেন সব কথাই সেদিন সত্য বলে আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁর প্রথম বাক্যটি সত্য ছিল, দ্বিতীয় বাক্যটি সত্য, তৃতীয় বাক্যটি আরও সত্য। এই সাক্ষাৎকারের পর সাত বৎসর ধরে তাঁর বাণী শুনেছি এবং যা কিছু শুনেছি সে সবই সত্য। সেই দিনের, সেই বিশেষ মুহূর্ত থেকে জীবন আমার কাছে তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তিনি সকলকে এই সত্য উপলব্ধি করিয়েছেন যে 'তোমরা সকলে অনন্তের মধ্যে অবস্থান করছো, এই অনন্তের পরিবর্তন নেই, পরিণাম নেই'।"[২]—জো সেই লগ্নেই দ্বিজত্ব লাভ করেন—তাঁর নবজন্ম হয়।

সমগ্র শীতকাল সাগ্রহে দুই ভগিনী স্বামীজীর ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত হতেন। তাঁদের জন্য স্বামীজীর সম্মুখে দুটি আসন নির্দিষ্ট থাকত। পূর্বেই জোসেফিনের ধ্যানের অভ্যাস ছিল এবং ভগবদ্গীতার সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন যা স্বামীজীর মতো মহাশক্তিধর পুরুষকে চিনে নিতে তাঁকে সাহায্য করে। বেসি তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর যেসব কাগজের টুকরো বা খাম রাখতেন তাতেই স্বামীজীর কথা লিখে নিতেন, শুধু কাগজে নয় মনেও তা খোদাই হয়ে যেত। সংগৃহীত বাণীর মধ্যে ছিলঃ

"Religion is the knowledge of transcendental faith through the transcendental faculties of man. Transcend the limitations of the sense."

'Learn to seek beauty in variety.'

"He is my love. He is my child. Don't frighten me by making Him too big, the Creator of the Universe."[২ক]

একদিন স্বামীজী এই ভগিনীদ্বয়কে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কি দুই বোন?' উত্তর এল, 'হ্যাঁ'। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি খুব দূর থেকে আস?' তারা উত্তর দিল, 'না খুব দূর নয়, হাডসনের উত্তরে তিরিশ মাইল দূর থেকে আসি।' 'এতদূর! খুব আশ্চর্যের কথা তো।'—স্বামীজীর সঙ্গে এভাবেই তাদের প্রথম বাক্যালাপ। কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বনিয়াদ গড়ে উঠতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁদের।

পরবর্তী বসন্তকালে এক সন্ধ্যায় ভগিনীদ্বয় ও আমেরিকার বিখ্যাত ধনী মিঃ ফ্রাঙ্ক এইচ. লেগেট নিউ ইয়র্কে ও ওয়ালড্রফ হোটেলে আহারে ব্যস্ত ছিলেন। আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ভগিনীদ্বয় হঠাৎ সচকিত হয়ে বললেন, 'আমাদের এখনই উঠতে হবে।' বিস্মিত

ফ্রাঙ্ক কারণ জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর এলঃ "আমরা ভারতীয় যোগী স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনতে যাব—যিনি ধর্মমহাসভায় বিদ্যুৎশিহরণ সৃষ্টি করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিভূত করেছিলেন এবং এখন একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি।" সমগ্র শীতকালই যে তাঁরা স্বামীজীর অমৃতবাণী শুনে সঞ্জীবিত—সেকথা তাঁরা এতদিন প্রকাশ করেননি ফ্রাঙ্কের কাছে। একথা শুনে ফ্রাঙ্ক সাগ্রহে তাঁদের সঙ্গে হোটেলের সন্নিকটে তাঁর ক্লাসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হলেন। ক্লাস সমাপ্তির পরই মুগ্ধ ফ্রাঙ্ক স্বামীজীর সঙ্গে করমর্দন করে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি আমাদের সঙ্গে নৈশাহারে যোগদান করবেন?' স্বামীজী সম্মতি জানালেন। এই প্রথম সামাজিকভাবে তাঁদের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হল। অচিরেই এই আলাপ পরিণত হল প্রগাঢ় বন্ধুত্বে। পরবর্তী কালে এঁরা তিনজনই হয়েছিলেন স্বামীজীর মতাদর্শের সমর্থক ও অনুরাগী ভক্ত। পাশ্চাত্যে বেদান্তপ্রচার কার্যে তাঁদের বিশিষ্ট ভূমিকাও ছিল।

॥ তিন ॥

বেসি ও জোসেফিন, জন ডেভিড ম্যাকলাউড ও মেরী অ্যানী ম্যাকলাউডের কন্যা। ধর্মপ্রাণ ডেভিডের দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হত প্রার্থনায়। বংশানুক্রমে ম্যাকলাউড পরিবাবের মধ্যে সঞ্চারিত ছিল অসাধাবণত্বের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। তাঁদের এই জীবনচেতনাকে 'ম্যাকলাউড স্পিরিট' বলে অভিহিত করা হত। এই চেতনায় তাঁরা প্রতিকূল সর্ব অবস্থাকেই সানন্দে বরণ করে নিতে পারতেন আর শ্রেষ্ঠত্বের আশায় ছুটে চলতেন কার্য থেকে কার্যান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। ডেভিডও কোথাও সুস্থির থাকতে পারতেন না—ভ্রমণে তাঁরও প্রবণতা ছিল। তাঁদের পাঁচটি সন্তানও পাঁচটি বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করে। সন্তানদের নামকরণও হয় বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামানুসরণে। বেসি জন্মগ্রহণ করেন Cincinnati Ohio-তে ১৮৫৩ সালে। তাঁর নাম রাখা হয় ইংলণ্ডের রানীর নামে আর জোসেফিন ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে এলগিন (Elgin, Illinois)-এ নেপোলিয়ান-পত্নী সম্রাজ্ঞীর নামানুসারে তাঁরও নাম হয়। বেসি ও জোসেফিন দুজনের জীবনেই পূর্বোক্ত 'ম্যাকলাউড স্পিরিট' নিজস্ব ধারায় ফুটে ওঠে।

বেসির প্রথম বিবাহ হয় চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর থেকে তিরিশ বছরের বড় বিপত্নীক ব্যবসায়ী উইলিয়ম স্টার্জিসের সঙ্গে। বেসি ভালবেসেছিলেন বৃহৎ পৃথিবীর 'জীবন'কে—স্টার্জিস ছিলেন সেই জীবনের পথে তাঁর সহযাত্রী। জীবনের অন্তিমপর্বে যখন হঠাৎ মিঃ স্টার্জিসের ব্যবসার ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটে, সংকট মুহূর্তে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি ও সান্ত্বনা দিয়ে সংগ্রাম করতে প্রেরণা দেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না এই মহিলা। কিন্তু ঐ বিপর্যয়ের পরিণতিস্বরূপ বিফলমনোরথ স্টার্জিসের মৃত্যু হয়। এই সময় তাঁদের কন্যা অ্যালবার্টা ষোড়শী তরুণী আর পুত্র হলিস্টার মাত্র চোদ্দ বছরের কিশোর।

উইলিয়ম স্টার্জিসের বন্ধু, ধনী ফ্রান্সিস বা ফ্রাঙ্ক লেগেট অপরূপ সুন্দরী আন্নাকে বিবাহ করেন। কিন্তু পুত্র অ্যালবার্ট জন্মাবার পরেই তরুণী পত্নীর মৃত্যু হয়। অ্যালবার্টও ফ্রাঙ্কের জীবনের সব আলো নিভিয়ে মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। ফ্রাঙ্ক এই মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন মাত্র আঠাশ বছর বয়সে। অতি আপনজনের

মৃত্যু তাঁকে ক্রমে অন্তর্মুখ করে তুলল। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে নিঃসঙ্গ বিপত্নীক জীবন কাটাবার পর তিনি বন্ধু স্টার্জিসের জীবনের শেষ বিপর্যয়ে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামরতা মহিমময়ী মিসেস স্টার্জিসকে দেখে মুগ্ধ হন। স্টার্জিসের দেহান্তের পর বেসির সঙ্গে ফ্রাঙ্কের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং ফ্রাঙ্ক তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। অভিজাত ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ পঞ্চাশ-উত্তীর্ণ সুদর্শন ফ্রাঙ্কের প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি জানালেন বেসি।

ইতিমধ্যে স্বামীজীর দ্বারা মিঃ লেগেট এতই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে প্যারিসে তাঁদের বিবাহ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে স্বামীজীকে বিশেষ অনুরোধ জানান। ঐ উপলক্ষে ফ্রাঙ্ক ও স্বামীজী ১৭ আগস্ট ১৮৯৫, নিউ ইয়র্ক থেকে প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করেন। ঐশ্বর্যের ইন্দ্রপুরী প্যারিসে বিলাসবহুল বিশাল 'হোটেল কন্টিনেন্টালে' ওঠেন তাঁরা। ৯ সেপ্টেম্বর এপিসকোপাল চার্চে প্রাচ্যের ঋষি বিবেকানন্দ ফ্রাঙ্ক ও বেসির বিবাহের একজন সাক্ষী হলেন। স্বামীজী এই দম্পতিকে 'স্বর্গীয় দম্পতি' বলতেন। অ্যালবার্টাকে চিঠিতে লিখেছেন ঃ "মিঃ লেগেট একজন ঋষি...তোমার মা হলেন একজন আজন্ম সম্রাজ্ঞী, তাঁর ভিতরে ঋষির হৃদয়।"[২৯] স্বামীজী প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ফ্রাঙ্কের ভিতর ঋষি-মনের সন্ধান পেয়েছিলেন আর ফ্রাঙ্ক বুঝলেন স্বামীজীই ঋষির চিরন্তন আদর্শ। তিনি দেখলেন জ্যোতির তনয়ের মধ্যে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। ফলে দুই বিপরীত মেরুর মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের দৃঢ় সেতু সৃষ্টি হল। একজন তদানীন্তন আমেরিকান কালচারের প্রকৃষ্ট প্রতিনিধি, সফল ধনী ব্যবসায়ী ও রক্ষণশীল মধ্যবয়সী, অপরজন হিন্দু সন্ন্যাসী, সম্বলহীন, বয়সে তরুণ, সেবা ও ত্যাগের আদর্শে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ। স্বামীজী মিঃ লেগেটকে আদর করে ডাকতেন 'ফ্রাঙ্কিনসেন্স' বলে। মিসেস লেগেটকে সম্বোধন করতেন 'মা' বলে।

॥ চার ॥

প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়েও 'ঋষি' ফ্রাঙ্ক ছিলেন 'নির্জনতাপ্রিয়'। বিলাসের বন্যা যেখানে, সেখানেও ফ্রাঙ্ক সংযত। ব্যবসাসংক্রান্ত প্রয়োজনে কর্মচঞ্চল নিউ ইয়র্ক শহরে তাঁকে থাকতে হত কিন্তু সামান্য অবকাশ পেলেই তিনি বিশ্ব প্রকৃতির আনন্দ নিকেতনে চলে যেতেন। ভালবাসতেন গ্রামগঞ্জের নিরহঙ্কার মানুষের সঙ্গ, পাখির কাকলি, ধাবমান অশ্বের গলদেশে দোদুল্যমান ঘণ্টার দূর থেকে ভেসে আসা ঠুনঠুন ধ্বনি। তাই তাঁর বাসভবন যেমন ছিল কর্মব্যস্ত নিউ ইয়র্কে তেমনি আবার শান্ত গ্রামের মধ্যে ক্যাটস্‌কিল পাহাড়ের পাদদেশে হাডসন নদীর তীরে 'রিজলি ম্যানরে'। আলস্টার কাউন্টিতে পঞ্চাশ একর জমির মধ্যে সেই সুরম্য প্রাসাদটি ছিল ফ্রাঙ্কের গর্ব। আর ছিল নিউ হ্যাম্পশায়ারের জনবিরল পার্সিগ্রামে বনরাজি-পরিবেষ্টিত ক্রিস্টিন হ্রদের ধারে নির্জন 'fishing camp'. অন্যদিকে, 'আজন্ম সম্রাজ্ঞী' মিসেস লেগেটের তীব্র আকর্ষণ ছিল সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র প্যারিসের প্রতি। তাই মিঃ লেগেটকে প্যারিসের সম্ভ্রান্ত পল্লী 'প্লাস দি জেতাৎ ইনি'-র ছয় নম্বরের প্রাসাদোপম ভবনটিকে কিছুদিনের জন্য নিজস্ব করে নিতে হয়। বিভিন্ন পরিবেশে লেগেট পরিবারের এই চারটি বাসস্থানে স্বামীজী কিছুদিন করে অবস্থান করেছেন, কোথাও আবার একাধিকবার। আমরা দেখেছি অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী স্বামীজীর

নব নব রূপের প্রকাশ। কোথাও তিনি চিরন্তন ঋষি, কোথাও প্রফেট, কোথাও প্রতিভার দ্যুতি বিচ্ছুরণকারী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্, আবার কখনও পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গে নিছক আমোদে মেতে ওঠা দিব্য শিশু। লেগেট পরিবারের সদস্যেরা স্বামীজীর এই বহুমুখী ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন পরিবেশে দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

নিউ ইয়র্কে দীর্ঘকাল কর্মব্যস্ত স্বামীজী ১৮৯৫-এর জুনের প্রথমভাগে মিঃ লেগেটের আমন্ত্রণে বিশ্রামের আশায় পার্সির 'মেইন ক্যাম্প' ভবনে উপস্থিত হলেন। বেসি ও জোসেফিন মিঃ লেগেটের অতিথিরূপে তখন ঐ গৃহে ছিলেন। স্বামীজী অসীম আনন্দে দশদিন কাটিয়েছেন এখানে। শ্রীযুক্তা বুলকে ক্যাম্প পার্সি সম্বন্ধে ৭ জুন ১৮৯৫ পত্রে লেখেনঃ "আমি জীবনে যে সকল সুন্দরতম স্থান দেখেছি এটি তাদের অন্যতম। কল্পনা করুন, চারিদিকে বিশাল বনরাজি সমাচ্ছন্ন পর্বত ও তার মধ্যে একটি হ্রদ আর সেখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই! কি মনোরম, কি নিস্তব্ধ, কি শান্তিপূর্ণ! নগরের কোলাহল থেকে দূরে, আমি যে এখানে কি আনন্দ পাচ্ছি, তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন। এখানে এসে আমি যেন নবজীবন লাভ করেছি। আমি একলা বনের মধ্যে যাই, আমার গীতাখানি পাঠ করি এবং বেশ সুখেই আছি।"

সহস্রদ্বীপোদ্যান থেকে বেসিকে লিখছেনঃ "পার্সিতে যে আনন্দ দিনগুলি কেটেছে, তার দিকে আমি সর্বদাই ফিরে তাকাই এবং এই ব্যবস্থার জন্য মিঃ লেগেটকে সর্বদাই ধন্যবাদ জানাই।"[৩] এই সময় পার্সিতে মিঃ লেগেটের সঙ্গে বেসির বাগ্‌দান সম্পন্ন হয়।

কর্মকোলাহল থেকে দূরে পার্সির অরণ্যে স্বামীজীর মন একবার নির্বিকল্প সমাধিতে লীন হয়ে গিয়েছিল। জোসেফিনের স্মৃতিকথানুসারেঃ "এক প্রভাতে আনন্দের সঙ্গে বেসিকে ভাল ব্রেকফাস্ট তৈরির আবেদন জানিয়ে স্বামীজী একাকী ভ্রমণে বেরুলেন। অনেকক্ষণ পরও স্বামীজীকে না ফিরতে দেখে বেসি তাঁর সন্ধানে গেলেন। একটু পরেই কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে জানালেন, 'স্বামীজী মারা গেছেন'। জো ছুটে গিয়ে দেখেন হ্রদের তীরে একটি বৃক্ষের নীচে নিস্পন্দ স্বামীজী সমাসীন। মিঃ লেগেট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, চোখদুটি অশ্রুভারাক্রান্ত। সংযতস্বভাব ফ্রাঙ্কও বিচ্ছেদের ব্যথায় অভিভূত। স্বামীজীর পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী জো ঐ সময় তাঁকে স্পর্শ করতে বারণ করলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর দেহে প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল। সমাধিব্যুত্থিত-নেত্রে সম্মুখে সকলকে দেখে পরিস্থিতি বুঝে নিলেন, মুহূর্তের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে বললেনঃ 'মাদার, চলুন, চলুন, উঃ খিদেয় মরে যাচ্ছি।'

এখানেই আবার দেখি, বালকস্বভাব বিবেকানন্দ নৌকা চালানোর কলাকৌশল রপ্ত করতে মহাব্যস্ত। দাঁড় চালানো শিক্ষা করতে গিয়ে প্রায় উল্টে ফেলেন নৌকা, পাটাতনে মাথা ঠুকে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ান শিশুসুলভ উচ্ছলতায়। কখনও বা বনের মধ্যে মনের আনন্দে গান গেয়ে ওঠেন। পার্সিতে বার্চ বৃক্ষ দেখে স্বামীজীর প্রাচীন ভারতে মন চলে যায়। বৃক্ষের ছাল থেকে পুঁথি রচনা করার চিন্তা মনে উদিত হওয়ামাত্র জো ও বেসির জন্য ভূর্জপত্রে কয়েকটি শ্লোক লিখে দেন। সেখান থেকে তাঁর অতি প্রিয় হেলভগিনী মেরীকেও ভূর্জপত্রের ওপর চিঠিতে লেখেনঃ "ভারতবর্ষে যাবতীয় পবিত্র লিপি এই

ভূর্জপত্রে লেখা হয়। আমিও সংস্কৃতে লিখলামঃ উমাপতি (শিব) সর্বদা তোমাকে রক্ষা করুন।"[৪]

॥ পাঁচ ॥

মিঃ লেগেটের বিশাল জমিদারি বিলাসবহুল 'রিজলি' তিনবার স্বামীজীর পাদস্পর্শে পবিত্র হয়েছে, পরিণত হয়েছে 'বিবেকানন্দ তীর্থে'। প্রথমবার, ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে নিউ ইয়র্কের ক্লাস থেকে অল্পদিনের ছুটি নিয়ে মিঃ লেগেটের সঙ্গে যান। স্বামীজী পত্রে লেখেনঃ "এই অল্প ভ্রমণে উপকার হয়েছে, সেখানকার পল্লী ও পাহাড়গুলি—বিশেষত মিঃ লেগেটের নিউ ইয়র্ক প্রদেশের পল্লীভবনটি আমার খুব ভাল লেগেছিল।"[৫] দ্বিতীয়বার, বড়দিনের সময় যান নবদম্পতি বেসি ও ফ্রাঙ্কের অতিথিরূপে। রিজলিতে স্বামীজীর দিব্যসান্নিধ্যে উভয়েই ভরপুর হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীজীর কণ্ঠ-উৎসারিত অমৃতধারায় অবগাহন করে তাঁরা ধন্য, পরিপূর্ণ। সসম্ভ্রমে ফ্রাঙ্ক ১৮৯৬, ৬ জানুয়ারি জোকে লিখেছেনঃ "এক রাত্রে রিজলিতে আমরা সকলে বিবেকানন্দের নিঃস্বনে একেবারে স্তম্ভিত, বাক্‌রুদ্ধ। আড়াই ঘন্টা ধরে তিনি বলে গেলেন। তেমন চিন্তার ঐশ্বর্যপ্রকাশ আমি কোনো শরীরী মানুষে দেখিনি। আমাদের হৃদয়ে তিনি অনপনেয় ছবি এঁকে গেছেন, যা জীবনান্ত পর্যন্ত আমাদের শান্তি ও সান্ত্বনা দেবে।"[৫ক] স্বামীজী ফ্রাঙ্কের মনকে যেমন উত্তরণের আলোকিত পথে নিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি আবার শরীর মন দৃঢ় রাখার জন্য যোগাসনের শিক্ষাও দিয়েছিলেন। এই শিক্ষার সময় এক কৌতুককর ঘটনায় দেখা যায় স্বামীজী মিঃ লেগেটের সঙ্গে কতটা অন্তরঙ্গ ছিলেন। মিস ম্যাকলাউড একদিন মিঃ লেগেটের পড়ার ঘরের দরজা খুলে বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখেন লেগেট শূন্যে ভাসমান—ভূমিশয্যায় শায়িত স্বামীজী পদদ্বয় ঊর্ধ্বমুখী করে লেগেটকে ধারণ করে রয়েছেন। পাজামা জানু পর্যন্ত গুটিয়ে এসেছে। ম্যাকলাউড কিছু বোঝার আগেই লেগেট আছড়ে পড়লেন। মেয়েদের সম্মুখে পাজামার ঐ অবস্থিতিতে সঙ্কুচিত স্বামীজী একলাফে উঠে ছদ্মক্রোধে জো-কে ধমকে বললেনঃ 'পুরুষমানুষের বৈঠকখানার দরজায় ধাক্কা না দিয়ে ঢুকেছো কেন?' তারপরেই হেসে বললেনঃ 'ফ্রান্সিসকে তুলে ধরতে হবে।' ফ্রাঙ্কের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার আর একটি চিত্র পাই জো-কে লিখিত স্বামীজীর পত্রেঃ "...আমার কথা শুনে ফ্রাঙ্ক বললেনঃ 'আমি তো একটি ফনোগ্রাফ কিনে দিতে পারি। জো যা বলে আমি তাই করি।' তাঁর অন্তরে একটা কবিত্ব প্রচ্ছন্ন আছে দেখে সুখী হলাম।" (নিউ ইয়র্ক, জুন ১৮৯৫)

ফ্রাঙ্ক গভীর ভালবাসার সঙ্গে বলতেন, 'স্বামীজী আমার দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, কারণ অন্য যে কোনও ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁর সহজ বুদ্ধি অধিক।' একজন ভদ্রলোককে প্রদেয় শ্রেষ্ঠ উপহার হিসাবে তিনি স্বামীজীকে উপহার দেন 'এ থাউজেণ্ড সিগারস'। স্বামীজী জানতেন ফ্রাঙ্ক ভালবাসার গভীরে পৌঁছতে জানেন। তিনি বেসিকে লিখছেনঃ "লেগেটের মতো মানুষদের ভালবাসার দ্বারাই জগৎ সর্বদা আরো ভাল হবার দিকে যাচ্ছে।"[৬] প্রেম চরম অবস্থায় দিব্য আধারে কোন রূপ পরিগ্রহ করে তার ছবি ফ্রাঙ্কের কাছে তুলে ধরলেন মূর্তিমান প্রেম স্বামীজীঃ "কখন কখন আমার এক ধরনের ভাবাবেশ হয়—মনে হয়,

জগতের সবাইকে সব জিনিসকে আশীর্বাদ করি, সব জিনিসকে ভালবাসি, আলিঙ্গন করি। তখন দেখি—যাকে মন্দ বলে, সেটা একটা ভ্রান্তিমাত্র। প্রিয় ফ্রান্সিস, এখন আমি সেইরকম ভাবের ঘোরে রয়েছি, আর তুমি ও মিসেস লেগেট আমায় কত ভালবাসো ও আমার প্রতি তোমাদের কত দয়া, তাই ভেবে সত্য সত্যই আনন্দাশ্রু বিসর্জন করছি।"[৭] চিঠির শেষে আরও লেখেনঃ "এত বড় মজার জগৎ! আর সকলের চেয়ে মজার লোক তিনি—সেই অনন্ত প্রেমাস্পদ প্রভু!... আমি এতদিনে দু-একটা বিষয় শিখেছি। শিখেছি যে, ভাব, প্রেম, প্রেমাস্পদ এ সকল যুক্তিবিচার, বিদ্যা-বুদ্ধি, বাক্যাড়ম্বরের বাইরে—ও সব হতে, অনেক দূরে। ওহে 'সাকি', পেয়ালা পূর্ণ কর—আমরা প্রেমমদিরা পান করে পাগল হয়ে যাই।"[৮]

স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার আমেরিকা পৌঁছান তখন তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা অবনতির পথে। বন্ধুরা শঙ্কিত; লেগেট দম্পতি স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানালেন রিজলিতে বিশ্রামের জন্য। নিউ ইয়র্কে পৌঁছে স্বামীজী ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রথমে লেগেট দম্পতির আবাসস্থলে গেলেন এবং অবিলম্বে দেড়শত মাইল দূরে নির্জন পল্লীনিকেতন রমণীয় 'রিজলি ম্যানর'-এ উপনীত হলেন। এটি তাঁর তৃতীয়বার রিজলিবাস। ঐ গৃহে একটানা দশসপ্তাহ অবস্থান করে রিজলিকে তিনি করে তোলেন 'ঈশ্বরের নিকেতন'। অনেকগুলি বাসগৃহ ছিল রিজলির বিশাল জমিতে। স্বামীজী ও স্বামী তুরীয়ানন্দ থাকতেন 'লিটল কটেজে'। কিছুদিন পর স্বামী অভেদানন্দও দশদিনের জন্য তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। রিজলির এই গ্রীষ্ম ঋতুটি অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল। লেগেট দম্পতির একমাত্র কন্যা ফ্রান্সেস তাঁর রচিত 'Late and Soon' গ্রন্থে এই গ্রীষ্মটিকে 'দি গ্রেট সামার' বলে চিহ্নিত করেন।

লেগেট পরিবার আন্তরিকতা, অতুলনীয় আতিথেয়তা ও সেবা দিয়ে স্বামীজীর মনের মতো পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন রিজলিতে। তাঁরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করতেন স্বামীজীর ক্লান্ত দেহ ও মনের জন্য কী প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতাপূর্ণ রুচিকর হাল্‌কা পরিবেশ দরকার। মিস ম্যাকলাউড লিখেছেনঃ "আমাদের পরিবারের ঐ ভাবটি স্বামীজীকে তখন আমাদের খুব কাছের মানুষ করে দিয়েছিল। হয়তো তিনি কয়েকদিন কোনো কথাই বললেন না। কখনো আবার দিবারাত্র অনর্গল কথা বলছেন। আমরা তাঁর মনের ভাব বুঝে চলতাম। ওঁকে গম্ভীর দেখলেও নিজেদের কাজে এমন ব্যস্ত ও আনন্দের ভাব দেখাতাম যে তাঁর মনের ওপর কোনো চাপ পড়ত না।"[৯] স্বামীজীও পত্রে লিখছেনঃ 'আমি যেন একেবারে নিজের মতন আছি।' 'দিব্য বালক'টিকে মিসেস লেগেট স্নেহময়ী জননীর মতো রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। আহারের সময়েও স্বামীজী বসতেন মিসেস লেগেটের পাশে যাতে ইচ্ছামত ধূমপান ও পাদচারণ করার স্বাধীনতা পান। স্বামীজীকে খাবার টেবিলে ধরে রাখতে চাইলে মিসেস লেগেট বলতেন, 'এবার আইসক্রীম দেওয়া হবে', তৎক্ষণাৎ নিতান্ত বালকের মতো অসীম আগ্রহে বসে পড়তেন বহু প্রত্যাশার আইসক্রীমের জন্য।

কোনও কোনও সন্ধ্যায় রিজলির হলে ফায়ার প্লেসের কাছে বসতেন স্বামীজী। তাঁর ভাষণ যেন অলৌকিক হয়ে উঠত, শ্রোতারা বিস্মৃত হতেন বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। অভিভূত মিসেস লেগেট রিজলি থেকে লিখছেনঃ "এখন আমরা এমন কিছু মূল্যবান বস্তু লাভ করছি যা কেবল স্বামীজীই দিতে পারেন।... এই দিনগুলি অমূল্য।" ফ্রান্সেস লেগেট

'Late And Soon' বইটিতে তাঁর মায়ের রিজলিতে 'স্বামীজীর স্মৃতি' প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "...তারপরে হল-ঘরে সে রাত্রির মতো শেষ সমাবেশ,...স্বামীজীর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত ধ্বনিতরঙ্গ ঝিঁঝির সুরের সঙ্গে মিলেমিশে অখণ্ড ধারায় প্রবাহিত—কোনো প্রশ্নে প্রতিবাদে যাকে বিচলিত করতে কেউ সাহস করে না। তারপর নিঃশব্দে সকলে একে একে প্রস্থান করে শয়নকক্ষের দিকে। বিশাল ভাবী ঘটনার পূর্বচ্ছায়া পড়েছে সেখানে, এমন একটি শক্তিশালী আন্দোলনের রথচক্র ঘুরতে শুরু করেছে, যা ওখানে উপস্থিত মানুষগুলির ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে, কেননা—স্বয়ং ঈশ্বর নেমে এসে কথা বলছেন তাদের সঙ্গে।"[১০] স্বামীজী বাস্তবিকই এই সময় সর্বদাই যেন ভবিষ্যদ্রষ্টা ঋষির মতন দিব্যদর্শনে ভরপুর। রিজলিতে বেসির আমন্ত্রণে আগত ভগিনী নিবেদিতাও লেগেট পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ঐ বন্ধুত্ব চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল।

মিঃ লেগেট তাঁর গর্বের রিজলিতে বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে এতগুলি মানুষের সমাবেশে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। লেগেট দম্পতি 'তখন তাদের যুগ্ম জীবনে আনন্দের সন্ধান ও তারুণ্যের নবায়নে উৎসাহী।' স্বামীজী এই দম্পতির উদ্দেশ্যে কয়েক ছত্র কবিতা লেখেন ঃ

"শঙ্খবৃত্তে আবর্তিত যে জীবন,
পার হল আরো এক বৃত্তাংশ পথ
... ...
যার 'পরে লাগে নাই কালের প্রতাপ
নব তারুণ্যে সে দিয়েছে ফিরে—
সেই ক্ষণ, অনাবিল, সত্যে ও শুভে।।"[১১]

১৮৯৯ নভেম্বরের মাঝামাঝি রিজলির স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলি শেষ হয়।

॥ ছয় ॥

রিজলির 'গ্রেট সামাবের' মহান সমাবেশটির পরিসমাপ্তির কয়েকদিন আগে লস এঞ্জেলস থেকে অজ্ঞাতনামা মিসেস ব্লজেটের এক পত্র আসে যে ম্যাকলাউডদের বহুদিন ধরে নিরুদ্দিষ্ট জ্যেষ্ঠভ্রাতা টেলর তাঁর গৃহে শয্যাশায়ী—মৃত্যু আসন্ন। সংবাদ পাওয়া মাত্র মিস ম্যাকলাউড ক্যালিফোর্ণিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। 'অলৌকিক কাণ্ড'! মুমূর্ষুর শিয়রে স্বামীজীর বিরাট ছবি। কিছুদিনের মধ্যে টেলর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। টেলরের মৃত্যুর কয়েকদিন পর মিসেস ব্লজেটের আমন্ত্রণে স্বামীজী লস এঞ্জেলস যান এবং ওখানে ক্লাস নিতে শুরু করেন। জো এখানে মিসেস মেল্টন নামে এক 'Magnetic Healer'-এর সন্ধান পান। স্বামীজীর চিকিৎসাও ঐ মহিলা শুরু করেন। বেসির হাঁটুতে যন্ত্রণা হচ্ছিল তাই তাঁকেও এই চিকিৎসার জন্য মিসেস ব্লজেটের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। দুই বছর পূর্বে একটি পিন ঢুকে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল বেসির হাঁটুতে, এক আশ্চর্য উপায়ে মরচে পড়া পিনটিকে বার করে আনেন মিসেস মেল্টন। এর পরেই ভগিনীদ্বয়ের

পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত হয়ে ওঠেন তিনি।

॥ সাত ॥

ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে বেদান্ত সমিতিটি আইন অনুসারে রেজিস্ট্রি করা হয়। সমিতি নবরূপ ধারণ করার পর মিঃ লেগেট পরিচালক কমিটির সভাপতি হন। তিনি ছিলেন হৃদয়বান ও বেদান্তানুরাগী। স্বামীজী লিখেছেনঃ "বেদান্ত সোসাইটির জন্য মিঃ লেগেট চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন জেনে আমি খুবই আনন্দিত। সত্যিই তিনি এত সহৃদয়।"[১২] বেদান্ত প্রচারের উৎসাহে তিনি ও স্বামীজীর অপর বন্ধুগণ নিউ ইয়র্কের কাজে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হলে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে তাঁদের মতানৈক্য ঘটে। ফলে ১৯০০ সালে মিঃ লেগেট সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। স্বামীজী তাঁর ১৮ এপ্রিলের স্মরণীয় পত্রে ম্যাকলাউডকে লেখেনঃ "মিঃ লেগেট সভাপতির পদ ত্যাগ করেছেন শুনে বড়ই দুঃখিত হলাম।"

ঐ ঘটনার পরেও মিঃ লেগেটের বেদান্তের প্রতি অনুরাগ কিন্তু হ্রাস পায়নি। ওদেশে স্বামীজীর বই প্রকাশের অধিকাংশ দায়িত্ব নিতে হয়েছে তাঁকে। স্বামীজী তাঁর রচিত যত 'প্যাম্ফ্লেট' বিক্রির 'Copyright', 'Power of Attorney' মিঃ লেগেটকে উইল করে দিয়েছিলেন। স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের কথা অনুধাবন করে খ্রীস্টান মিশনারিদের জন্য বছরে হাজার ডলারের অনুদান তিনি বন্ধ করে দেন।

॥ আট ॥

কৃষ্টির কেন্দ্রভূমি প্যারিসে প্রথম এবং শেষ দুবারই স্বামীজী এই লেগেটদের সাহচর্যে এসেছিলেন। শেষবার গিয়েছিলেন ১৯০০ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন—'কংগ্রেস অব দি হিস্ট্রি অব রিলিজিয়ন'-এর আমন্ত্রণে। মিস ম্যাকলাউড লিখছেনঃ '১৯০০ সালের শেষের দিকে মিঃ লেগেট এবং আমার বোন উৎসাহ করে এই প্রদর্শনীর ব্যাপারে প্যারিসে একটি বাড়ি নিলেন। তিনমাস স্বামীজী প্যারিসে ছিলেন। তার মধ্যে কয়েক সপ্তাহ এই বাড়িতে অবস্থান করেন। তিনি মিঃ লেগেট, অ্যালবার্টা ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রফেসর প্যাট্রিক গেডেসের সঙ্গে প্রদর্শনী দেখতে যেতেন। স্বামীজীর ভাষায় এই 'মহাপ্রদর্শনী পুঞ্জীকৃত ভাবরূপ স্থির সৌদামিনী'—যেন, 'অপূর্ব ভূস্বর্গ সমাবেশ'। মিসেস লেগেটের নিমন্ত্রণে ও আন্তরিক আতিথেয়তায় দেশবিদেশের খ্যাতনামা গুণিজনের, রাজাধিরাজদের সমাবেশ হত 'প্লাস দি জেতাৎ ইনি'-র ৬ নম্বরের প্রাসাদোপম লেগেট ভবনে। স্বামীজীর শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে এই গুণিজন সমাহারের এক অপূর্ব চিত্র পাওয়া যায়ঃ "মিঃ লেগেট প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁর প্যারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনাদি ব্যপদেশে নিত্য নানা যশস্বী ও যশস্বিনী নরনারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন।... কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক...ভাস্কর, বাদক—প্রভৃতি নানাজাতির গুণিগণসমাবেশ মিঃ লেগেটের আতিথ্য-

সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্বত নির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষী-মনঃসংঘর্ষ-সমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ—সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখত।"[১৩] এইসব সম্মিলনে স্বামীজী 'সর্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী বিদগ্ধ নাগরিকদের মতো বাক্যদ্যুতি বিকিরণ করতে পারতেন, চূড়ান্ত বক্রোক্তি-কুশলীর সঙ্গে সমকক্ষতায় সমর্থ ছিলেন, পরাভূত করতে পারতেন সর্বপ্রধান পণ্ডিত ও মনস্বীদের।' মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস লেগেটের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল স্বামীজীর সঙ্গে পৃথিবীবিখ্যাত লোকেদের পরিচয় করিয়ে দেন। তাই তাঁর ভবনে সমবেত হয়েছিলেন ডিউক অব নিউ ক্যাসল, প্রিন্সেস ডেমিডফ, বৈজ্ঞানিক হিরাম ম্যাক্সিম, দার্শনিক ক্রপট্‌কিন, স্যার উইলিয়ম জেমস্ ইত্যাদি বহু গুণিজন। কিন্তু মিসেস লেগেট বলেছেন ঃ "আমি যত বিখ্যাত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে কেবল দুজন মানুষ নিজেদের মর্যাদা সর্বাংশে রক্ষা করেও প্রথম আলাপেই অপরকে সম্পূর্ণ মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারতেন, তাঁদের একজন হলেন—জার্মান সম্রাট কাইজার, দ্বিতীয় জন স্বামী বিবেকানন্দ।"[১৪] প্যারিসে শরবনে স্বামীজী 'প্যুভি দ্য শ্যাভানে'র ম্যুরালের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছেন শুনে মিসেস লেগেট পত্রে আবেগের সঙ্গে লেখেন ঃ "শরবনে স্বামীজী! আ—হাঃ! 'প্যুভি দ্য শ্যাভানে'কে পশ্চাৎপটে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি—তেমন একটি ফটোর জন্য আমি কী না দিতে পারি।"

স্বামীজী যখন প্যারিসে তখন মিঃ লেগেট মিসেস লেগেটকে নিয়ে গেলেন জার্মানীতে পায়ের চিকিৎসার জন্য। অসুস্থা 'মা' কে আনন্দ দিতে প্যারিসে তাঁদেরই বাড়ি থেকে মজাদার এক চিঠি লেখেন কল্পিত এক পার্টির (congress of crank) বর্ণনা দিয়ে। স্বামীজী জানতেন মিসেস লেগেট ধনশালী ব্যক্তি ও গুণিজনের এইরূপ সমাবেশে বাস্তবিক আনন্দলাভ করেন। চিঠিটি পত্রজগতে কৌতুকরসের এক বিশিষ্ট নিদর্শন।

॥ নয় ॥

এরপর আর স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি লেগেট দম্পতির। ১৯০২-এ স্বামীজীর দেহত্যাগের পর ফ্রাঙ্ক লিখেছেন ঃ 'এ জীবনে তাঁর মতো আর কাউকে দেখবো না।' বেসিও স্বামীজীর মহাপ্রয়াণপ্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "কী অপূর্ব! শেষ দিনটি আসছে, তার বিষয়ে তিনি পূর্ণ সচেতন, অথচ কোনো মানুষকে সে বিষয়ে কথাটি বলা নয়—এমন জিনিস কল্পনা করতে পার? বিবাহ কিংবা জীবনের অন্য বড় ব্যাপারের জন্য নিজেকে সযত্নে, এমনকি সুগভীর সুগম্ভীরভাবে প্রস্তুত করা কাকে বলে আমরা জানি—কিন্তু চরম বৃহৎ পদক্ষেপটির জন্য নিজের সমস্ত চৈতন্যকে ঘনীভূত করা, এ জিনিস কেবল তাঁরই। কী ঘটবে—তার পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তিনি—ঈশ্বরের আবির্ভাব ছাড়া তিনি আর কি?"[১৫]

স্বামীজী এই দম্পতিকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেছিলেন কিনা অজ্ঞাত কিন্তু দিয়েছিলেন শাশ্বত আশ্রয়—তাঁরাও চিরকালের জন্য ছিলেন স্বামীজীরই। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই মিস ম্যাকলাউডের জীবন বিবেকানন্দকেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছিল—তখন তিনি বিশ্বনাগরিক—বিবেকানন্দের বাণীবাহী 'প্রফেটেস'। বেসি স্বামীজীর দ্বারা প্রভাবিত

হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু জোর করে স্বামীজী-প্রদর্শিত পথে জীবনের গতি সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। ফ্রাঙ্কও তাঁর নিজের বৃত্তটিকে অতিক্রম করতে পারেননি। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে অবস্থানকালেই তিনি অনুভব করেন পত্নীর প্রিয় সোসাইটি-জীবন তাঁর জন্য নয়। তিনি ভালবাসতেন আমেরিকাকে, অ্যাংলো-স্যাকস্‌ন আমেরিকানদের গুণ ও শক্তি তাঁকে আনন্দ দিত। ইংলণ্ড, প্যারিসের অভিজাত পরিবেশ থেকে দূরে, এমনকি স্ত্রী-কন্যাসহ আপন পরিবার থেকে দূরে আমেরিকায় প্রবল কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিন কেটে যেত—অন্তরে ছিলেন নিঃসঙ্গ, উদাসীন। এইসময়ে তিনি মনপ্রাণ ঢেলে দেন তাঁর আটশ কর্মীর বিশাল ব্যবসায়। ফ্রাঙ্ক যে অধিক অর্থ-উপার্জনে অত্যুৎসাহী ছিলেন তা নয়, নিজের হাতে গড়া বিপুলায়তন ব্যবসার প্রতিটি কাজেই তাঁর নির্দেশ আকাঙ্ক্ষিত ছিল।

অন্যদিকে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত 'ম্যাকলাউড স্পিরিট' বেসির মনোজগতে এনেছিল শ্রেষ্ঠ, সুন্দরতম সবকিছুর জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং বেসি লণ্ডনে, প্যারিসে তাঁর ঐশ্বর্যবিকাশ ও আতিথ্যের দ্বারা সোসাইটির সংবাদপত্রগুলিতে চাঞ্চল্যকর সংবাদের উৎস হয়ে দাঁড়ালেন। প্রকাশিত হল ঃ "এতাবৎ অজ্ঞাত মিসেস লেগেট লণ্ডন সোসাইটিকে জয় করে ফেলেছেন—রাজা এডওয়ার্ড থেকে তাঁর সর্বশেষ কোটিপতি প্রজা পর্যন্ত।" এ ধরনের সংবাদপ্রচারে মিসেস বেসি লেগেট তৃপ্ত হতেন, পুলকিত হতেন। এইভাবে বেসির হৃদয়ে ফ্রাঙ্ক মর্যাদার অক্ষয় আসনে আসীন হলেও উভয়ের দূরত্ব ক্রমশ বর্ধিত হতেই থাকে। কিন্তু জ্যোতির তনয়ের সান্নিধ্যের ফল ফল্গুধারার মতন উভয় জীবনেই ছিল অব্যাহত—তাঁদের বেঁধে রেখেছিল অদৃশ্যসূত্রে। মিস ম্যাকলাউড অ্যালবার্টাকে লিখছেন ঃ "আমরা সকলেই স্বামীজীকে চিনেছিলাম এবং ভালবেসেছিলাম—তুমি এবং হলি, একইভাবে মাদার (মিসেস লেগেট), ফ্রান্সি (মিঃ লেগেট) এবং আমি, এই ক্ষেত্রটিতে আমরা সবাই আনন্দে একত্রে রয়েছি—অন্য ক্ষেত্রগুলিতে যতই পৃথক হই না কেন। আমাদের দেখা সর্ববৃহৎ সমন্বয়ের ক্ষেত্র তিনিই—অন্তর্ভুক্ত আমরা সকলেই।"[১৬]

সপ্তাহশেষে নিভৃতে অবসর কাটিয়ে মিঃ লেগেট রিজলি থেকে ফেরার পথে ফেরীঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় ২৯ আগস্ট ১৯০৯-এ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে অ্যাম্বুলেন্সে তিনি দেহত্যাগ করেন। কর্মচারীরাই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছিল।

আকস্মিক মৃত্যুর জন্যই হোক বা বেসির সঙ্গে ইদানীং মানসিক দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণেই হোক ফ্রাঙ্ক কোনও উইল করে যাননি। উইল না থাকায়, প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তাঁর বারো বছরের নাবালিকা কন্যা ফ্রান্সেস দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির অধিকারিণী হয়, মিসেস লেগেট এক তৃতীয়াংশের। এই ঘটনা সামাজিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, বেসিও বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু স্বামীজীর প্রভাব ও শিক্ষা রূঢ় বাস্তবকে শান্তভাবে মেনে নিতে তাঁকে সাহায্য করেছিল এবং জো-ও তাঁর স্বভাবসুলভ ভূমিকায় বেসিকে দুর্দিনে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছিলেন। চিরদিন জো লেগেট পরিবারের অন্তর্ভুক্তই ছিলেন কিন্তু মিঃ লেগেটের মৃত্যুর পর মিসেস লেগেট তাঁর ওপর যেন অধিক নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন।

স্বামীজীর ভাবপ্রচারে মিঃ লেগেটের ছিল অসীম আগ্রহ। মৃত্যুর মাত্র একবছর

পূর্বেও স্বামীজীর পত্রাবলীর সংকলন ও প্রকাশনে নিবেদিতাকে তিনি কত উৎসাহ দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা থেকে নিবেদিতার পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারেও তাঁর উৎসাহ ছিল। ভারতবর্ষে নিবেদিতার স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক কর্ম-পরিকল্পনাতেও মিঃ লেগেটের ছিল আন্তরিক উৎসাহ, আশ্বাস ও সাহায্য।

স্বামীজীও খুবই ভালবাসতেন এই পরিবারটিকে। দেহত্যাগের মাত্র দুদিন পূর্বেও স্বামীজীর আলোচনায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছিল লেগেট পরিবার। তিনি স্মরণ করেছিলেন তাঁদের অশেষ গুণের কথা। বলেছিলেনঃ 'মিঃ লেগেটের মত কোন মানুষ কখনো ভালবাসেনি।' এই সূত্রে বেসির অসুখের জন্য মিঃ লেগেটের গভীর দুঃখ ও বেদনার কথা উল্লেখ করেন, আরও বলেন সচ্চরিত্রতা, ব্যবসায়িক সাধুতা ইত্যাদি ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। মিসেস লেগেটের ভাবাতিশয্য থেকে দূরে থাকার ক্ষমতা এবং কোনটি যথার্থ বাঞ্ছিত তাকে বেছে নেবার ক্ষমতাও তাঁর প্রশংসা লাভ করে। ৪ জুলাই, ১৯০২ জীবনের অন্তিম দিনে বেলুড়ে একটি বাগান দেখে রিজলি ম্যানরের বিশালায়তন 'লন'-এর কথা মনে পড়ে, যে লনটি আধুনিক মেশিন দিয়ে নিত্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হত।

ম্যাকলাউড লিখছেনঃ 'দেহত্যাগের আগে ফ্রাঙ্ক আরো শান্ত, আরো দরদী এবং ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন।' নিবেদিতাও ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর পর নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বেসিকে পত্র লেখেন। তাতে শ্রীশ্রীমার গভীর দুঃখপ্রকাশের কথা জানান এবং স্বয়ং মন্তব্য করেনঃ 'মিঃ লেগেট স্বামীজীরই জন্ম-জন্মান্তরে।'

মিসেস লেগেটের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। একসময় মিসেস লেগেট নিবেদিতার কাজের জন্য একহাজার ডলার দান করেছেন এই সংবাদ অবগত হবার পর স্বামীজী নিবেদিতাকে বেসির সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে লেখেনঃ "আমি মিসেস লেগেটের একহাজার ডলার দানের সংবাদ পেয়ে বড়ই সুখী হলাম। সবুর কর, তাঁর ভিতর দিয়ে যা কাজ হবার, সেইটা এখন প্রকাশ হচ্ছে। তিনি জানুন আর নাই জানুন, রামকৃষ্ণের কাজে তাঁকে এক মহৎ অংশগ্রহণ করতে হবে।"[১৭] পরবর্তী কালে মিসেস লেগেট নানাভাবে অর্থসাহায্য করেছেন বেলুড় মঠকে। 'নিবেদিতা গিল্ড'-এর প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তিনি। বেলুড়ে স্বামীজীর সমাধিমন্দিরে স্থাপিত মর্মর রিলিফ-মূর্তি মিসেস লেগেটের অর্থে নির্মিত। 'লেগেট ভবন' নামাঙ্কিত বেলুড় মঠের অতিথিশালাটি তাঁর মহৎ দানের স্মৃতি আজও বহন করছে। অনুমান করা যায়, মিসেস লেগেট আরও কত অলিখিত দানে স্বামীজীর ভাবধারা বিস্তারে সহায়ক হয়েছেন।

১৯১২ সালে 'স্বামীজীর ভারতে' আসেন মিসেস লেগেট। সঙ্গী ছিল কন্যা অ্যালবার্টা, জামাতা জর্জ মন্টেগু এবং মিস ক্যাথরিন মার্জেসন। তাঁরা যখন ভারতে আসেন শ্রীশ্রীমা তখন কাশীতে। কলকাতা ত্যাগের মাত্র দুদিন পূর্বে শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে এসে পৌছান। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে তাঁর পবিত্র আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে এসে মিসেস লেগেট অভিভূত হয়েছিলেন। বেসি মিস ম্যাকলাউডকে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় মাতৃদর্শনের কথা লেখেন—শ্রীশ্রীমাও তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা, ডাকাত বাবার কাহিনী, ষোড়শী পূজা ইত্যাদি অনেক ঘটনা শোনান, বোধহয় মাধ্যম ছিলেন সিস্টার কৃস্টিন। শ্রীশ্রীমা তাঁকে চিবুক ধরে চুমা খান, কতভাবেই তাঁর প্রতি অপার্থিব স্নেহ প্রকাশ করেন। মার কাছ থেকে

ফেরার সময় তাঁর অশ্রু বাঁধ মানেনি। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, সেদিন জগজ্জননীর আঁখিও অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। বেসি দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র ভূমি অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন, এমনকি তন্ত্রসাধনার স্থান বিল্ববৃক্ষটি পর্যন্ত। বেলুড়ে আরাত্রিক দর্শন করেছেন, স্তব শুনেছেন। স্বামীজীর ঐশ্বরিক কণ্ঠস্বরের কথা বার বার মনে পড়েছে। সেই দেবদুর্লভ কণ্ঠের অভাবে তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে যদিও বেলুড়ে স্বামীজীর গুরুভাইদের আন্তরিক সমাদর ও অভ্যর্থনায় অতিথিরা মুগ্ধ হন। শ্রীশ্রীমা জো এবং বেসিকে আদর করে জয়া, বিজয়া বলে সম্বোধন করতেন।

জীবনের প্রান্তদেশে যখন বেসি একাকী রিজলিতে থাকতেন, তখন তিনশ ফুটের ওপর উঁচু দেড়শ ফুট বেষ্টনীযুক্ত 'স্বামীজীর পাইন' পরিক্রমা করতেন, যে মন নিয়ে ভারতের মানুষ মন্দির প্রদক্ষিণ করে। তাঁর কাছে স্বামীজীর বৃক্ষটি বিশাল, সুন্দর এবং তাঁর স্মৃতির মতই সারা বৎসর চিরসবুজ।

মিসেস লেগেট স্ট্রাট ফোর্ড অন অ্যাভনে শেক্সপীয়রের মেয়ের বাড়ি হলক্রফট ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে কিনে নিয়ে বিখ্যাত শেক্সপীয়র-বিশেষজ্ঞ স্যার ফ্রাঙ্ক বেনসনকে দিয়ে সেটি সাজিয়েছিলেন। সেখানে আমন্ত্রিত হতেন পৃথিবীর বহু বিখ্যাত ব্যক্তি। এই বাড়িটি কেনার সময় একটি ঘর ছিল, যার নাম 'প্রফেটস্ চেম্বার', যেন প্রফেটের জন্য আগে থেকেই উৎসর্গীকৃত। তাই সেই প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে প্রফেটের পাতলা রিলিফ মূর্তিটি টাঙিয়ে দেন। প্রতিমার পশ্চাতে অবস্থিত বাতায়ন পথে আলোক প্রবেশের ফলে তাকে ঘিরে জ্যোতির উদ্ভাস—স্বামীজীর যে স্মৃতি বেসি ধ্যানালোকে সযত্নে বহন করতেন এ যেন তার অনুরূপ মর্মর প্রতিচ্ছবি। মিসেস লেগেট এই গৃহেই ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অভিজাত লেগেট পরিবারটির স্বামীজীর প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য ছিল অপরিসীম। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ 'স্বামীজীর আমেরিকান ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহায্যকারীদের মধ্যে তাঁদের স্থান খুব উচ্চ।'[১৮] স্বামীজীর দিব্য প্রভাব শুধু লেগেট দম্পতির ওপর নয়, পরের প্রজন্মের ক্ষেত্রেও বিচিত্রভাবে কাজ করেছে।

॥ দশ ॥

লেগেটদের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয়ের যখন সূত্রপাত, তখন পরবর্তী প্রজন্মে তারুণ্যের ছোঁয়া লেগেছে। ফ্রান্সিস লেগেট ও বেসির একমাত্র সন্তান ফ্রান্সেসের জন্ম তারও দুবছর পরে। এই সময় মিসেস লেগেটের প্রথম পক্ষের কন্যা অ্যালবার্টা স্টার্জিস উনিশ-কুড়ি বছরের সুশ্রী তরুণী। তার থেকে দুবছরের ছোট ভাই হলিস্টার স্টার্জিস, 'প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, সদ্য যুবক'। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, স্বামীজীর পবিত্র সান্নিধ্য পাবার পর এই দুইটি ছেলেমেয়ে কিভাবে কাটিয়েছেন, এমন দুর্লভ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে তাদের তারুণ্যদীপ্ত জীবনে কি কোনও পরিবর্তন এসেছিল? আধুনিকতম শিক্ষা তারা পেয়েছিল, সেইসঙ্গে ছিল আভিজাত্যপূর্ণ 'সোসাইটি' জীবনের বাতাবরণ, তবু তাদের চেতনার মূল সুর বাঁধা হয়ে গিয়েছিল এক উচ্চগ্রামে। জীবনের চরম আদর্শের প্রতি সম্ভ্রমবোধ তাদের অজ্ঞাতসারেই

কাজ করেছিল। জন্ম থেকে আশীর্বাদপূত ফ্রান্সেসের বিপরীত জীবনছন্দ এবং বিবেকানন্দময় অস্তিমলগ্ন তারই দৃষ্টান্ত।

পিতা উইলিয়াম স্টার্জিসের মৃত্যুর পর তরুণী অ্যালবার্টা মায়ের সঙ্গে কখনও কখনও স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে যেতেন। স্বামীজীর কথায় তার ব্যথিতহৃদয়ে শান্তির প্রলেপ পড়েছিল। উত্তরজীবনে অ্যালবার্টার মধ্যে যে মনস্বিতা আমাদের মুগ্ধ করে তার অনেকটাই স্বামীজীর স্বর্গীয় সান্নিধ্যে বিকশিত। ভগিনী নিবেদিতা মনে করতেন স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে বিশেষ শিক্ষালাভের সুযোগ অ্যালবার্টার এসেছিল ১৮৯৯-এর 'গ্রেট সামারে' রিজলি ম্যানরে বাসকালে। ওখানেই স্বামীজী একসময় কথাপ্রসঙ্গে বলেনঃ "জীবনের কোনও তথ্যই তোমার কল্পনার সত্যের অবিকল প্রতিরূপ হবে না।" বাস্তবকে মেনে নিতে এই সংক্ষিপ্ত অথচ অসাধারণ মন্তব্য অ্যালবার্টাকে সারাজীবন সাহায্য করেছিল।

মাথায় সোনালি একরাশ চুল, অ্যালবার্টার সুন্দর-সতেজ মুখখানিতে ছিল প্রাণোচ্ছল অভিব্যক্তি এবং 'আলোছায়ার দ্রুত আনাগোনা।' বেসির স্বভাবের সোসাইটি জীবনের প্রতি আকর্ষণ এবং মিস ম্যাকলাউডের পার্থিব জগতের প্রতি ঔদাসীন্য—এ দুইয়ের সমন্বয় ঘটেছিল অ্যালবার্টার মধ্যে। তাই সে অনেক বেশি পরিণত, ব্যক্তিত্বময়ী এবং মনস্বিতায় উজ্জ্বল। বিভিন্ন ভাষাশিক্ষা এবং সঙ্গীতচর্চা ছিল অ্যালবার্টার অবসর বিনোদনের উপায়—বেসির এই কন্যাসন্তানটি আপনস্বভাবগুণে স্বামীজীরও অত্যন্ত স্নেহভাজন হয়ে ওঠে। তাঁকে উৎসাহ দিয়ে স্বামীজী লিখেছেনঃ "আমি নিশ্চিত যে, তুমি এখন সঙ্গীতশিক্ষায় নিমগ্ন। ...পরের বারে দেখা হলে তোমার কাছ থেকে স্বরগ্রাম সম্বন্ধে পাঠগ্রহণ করা আমার খুব আনন্দের বিষয় হবে।"[১৯] স্নেহের কন্যাটিকে নিয়ে কৌতুক করতেও বিরত হননি, আনন্দে লিখেছেন, 'অ্যালবার্টা এখন সঙ্গীত ও ভাষা-অনুশীলনে ব্যস্ত, হাসিতে ভরপুর এবং সারাদিন সে প্রচুর আপেল খাচ্ছে।' ফরাসী ও জার্মান ভাষা অ্যালবার্টার জানা ছিল, তিনি লেখেনঃ 'তুমি অচিরেই একজন পরম বিদুষী হতে চলেছ।' মননশীল এই কন্যার কাছে স্বামীজী নিজের অনেক অভিমতও ব্যক্ত করেছেনঃ "তুমি আলপ্‌স্ পর্বত খুব উপভোগ করছ জেনে আমিও আনন্দিত। আলপ্‌স্ নিশ্চয়ই বিস্ময়কর। এরকম জায়গাতেই মানুষ আত্মার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে। ... অ্যালবার্টা, তোমাদের দেশে বৈদান্তিক চিন্তাধারা প্রথমে অজ্ঞ 'বাতিকগ্রস্ত' ব্যক্তিদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল, সেই প্রবর্তনের ফলে সৃষ্ট নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে কাজের পথ তৈরী করে নিতে হয়। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছ, আমেরিকায় আমার ক্লাসগুলিতে উচ্চশ্রেণীর নরনারী কখনও কখনও যোগ দিয়েছেন, তাও মুষ্টিমেয়, আবার আমেরিকার উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ধনী হবার ফলে তাঁদের সমস্ত সময় ঐশ্বর্য সম্ভোগ করতে ও ইউরোপীয়দের অনুকরণ করতে করতেই কাটে! অপর পক্ষে, ইংলণ্ডে বৈদান্তিক মতবাদ দেশের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে এবং ইংলণ্ডের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বহু লোক আছেন, যাঁরা বিশেষ চিন্তাশীল। তুমি শুনে অবাক হবে, এখানে আমি ক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত পেয়েছিলাম, এবং বিশ্বাস করি যে, আমার কাজ আমেরিকার চেয়ে ইংলণ্ডে বেশি সফল হবে।"[২০]

শুধু স্বামীজী নন, অ্যালবার্টার সংবেদনশীল মন এবং বিদ্যাবত্তা মিঃ লেগেটকেও তার প্রতি স্নেহশীল করে তোলে। সুযোগ পেলেই কাজকর্মের অবকাশে মিঃ লেগেট

ভ্রমণে যেতেন। সেই সময় প্রকৃতিপ্রেমী অ্যালবার্টাকে প্রায়ই সঙ্গী করে নিতেন। বুদ্ধিমতী কন্যাটির সঙ্গে কখনও কখনও ব্যবসাসংক্রান্ত জটিল আলাপ-আলোচনাও হত। অ্যালবার্টার বিচক্ষণতাদর্শনে প্রায়ই আক্ষেপ করে মিঃ লেগেট বলতেন, সে কেন তাঁর পুত্র হল না! একবার মিঃ লেগেট বিশেষ কারণে জনৈক কর্মচারীকে বরখাস্ত করেন। কর্মচারীটির সংসারে তখন বড়ই আকাল—স্ত্রী অসুস্থ, পরিবারে অভাব-অনটন, অথচ রাশভারি মিঃ লেগেটের কাছে তার হয়ে সুপারিশ করার সাহস কারও নেই। কিন্তু অ্যালবার্টার প্রতি স্নেহে তিনি এতই নমনীয় ছিলেন যে তার অনুরোধে ঐ কর্মচারী কাজে পুনর্বহাল হয়।

প্রথমবার স্বামীজী স্বদেশ-প্রত্যাগমনের পথে ২১ ডিসেম্বর রোমে পৌঁছান। অ্যালবার্টা তখন সেখানে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার গৃহে বাস করছিলেন। ঐ সময় তিনি স্বামীজীর সঙ্গে ঐতিহাসিক রোমনগরী দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং স্মৃতিস্তম্ভগুলি সম্বন্ধে স্বামীজীর জ্ঞানের গভীরতা দেখে স্তম্ভিত হন। সেন্ট পিটার্স গীর্জায় রক্ষিত প্রাচীন সাধুসন্তের পবিত্র স্মারকসমূহের প্রতি স্বামীজীর অসীম শ্রদ্ধাদর্শনে বিস্মিত অ্যালবার্টা বলেনঃ "স্বামীজী, আপনি তো সগুণ সবিশেষ ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন, তা হলে এসবকে এত সম্ভ্রমের চোখে দেখেন কি করে?" তিনি উত্তর দেনঃ 'কিন্তু অ্যালবার্টা, যদি তুমি সত্যি সগুণ ভগবানে বিশ্বাস কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ বস্তুকে প্রিয়জনের জন্য অর্পণ করবে।'[২১]

১৯০০ সালে প্যারিসে স্বামীজী অ্যালবার্টা, প্রফেসর গেডেস প্রভৃতির সঙ্গে বিশ্বমেলায় যেতেন। প্রফেসর সেখানে প্রদর্শিতব্য বিষয়গুলির অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিতেন। প্যারিসে তখন সারা পৃথিবীর রাজারাজড়া থেকে শুরু করে স্বনামধন্য মনীষী ও গুণিজনের সমাবেশ। লেগেট ভবনে অতিথিরূপে প্রায়ই তাঁরা মিলিত হতেন। এই সময় কিছুদিনের জন্য বেসিকে অসুস্থতার কারণে জার্মানী যেতে হয়। তরুণী অ্যালবার্টার ওপর ন্যস্ত হয় গৃহকর্ত্রীরূপে অতিথিদের আপ্যায়নের দায়িত্ব। খুবই নৈপুণ্যের সঙ্গে সে নিজের কর্তব্য সম্পন্ন করে। ঐকালে মাকে লেখা তার একটি চিঠিতে পাইঃ "নৈশভোজের আসর সব দিক থেকে জমে উঠেছিল, আমি বসেছিলাম টেবিলের মাথায়। আমার ডানপাশে রাজকুমারী ডোরিয়া, তার পাশে বিবেকানন্দ, টেবিলের এক প্রান্তে লেডী য়্যাঙ্গালসী এবং আমার বাঁ পাশে ডিউক অব নিউক্যাসল। স্বামীজী সর্বক্ষণই উৎসবের মেজাজে ছিলেন।... স্বামীজীর সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে ডিউকের আলোচনা হয়।"[২২] একদিকে যেমন গুণিজনের সমাবেশ থেকে জাগতিক বহু বিষয়ে অ্যালবার্টা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, অপরদিকে স্বামীজী এবং তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের পুণ্যসান্নিধ্যে তাকে মননশীল ও সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন করে তোলে। মিসেস বুলকে এই সময়ে এক পত্রে তিনি লেখেনঃ "এ জগৎ সুখদুঃখ দ্বারা ওতপ্রোত। শুধুমাত্র এর প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। এজন্য আমি সবকিছুকেই ভালবাসতে চেষ্টা করছি—এমনকি আমার অপছন্দের বিষয়গুলিকেও। প্রত্যেক জিনিস আমি যেভাবে দেখব, আমার কাছে সেভাবেই তা প্রতিভাত হবে, তাই না? সুতরাং সহানুভূতির সঙ্গে শীঘ্রই আমাদের ভাল লাগার চশমাটি পরে নিতে হবে।"[২৩] অ্যালবার্টার উদার সুকুমার মনে জগতের সবকিছুর মধ্যে শুভ ও মঙ্গলকে খুঁজে নেবার আগ্রহ—এ শুধু যৌবনের মাধুর্য নয়, সাধুসঙ্গের অনিবার্য ফল। তারই নিদর্শন পাই তার জার্মানী থেকে লিখিত অন্য একটি পত্রেঃ "গত পরশু আমরা একটি বনের মধ্যে মাইলের পর মাইল ভ্রমণ করে স্বর্গীয় আনন্দ

অনুভব করেছি।... নির্জনবাসের জন্য বিশাল ও অপরূপ একটি প্রাচীন ইটালিয়ান গীর্জার সন্ধান পেয়েছি—মধ্যযুগীয় জার্মান স্থাপত্যকীর্তির অপূর্ব নিদর্শন। সেখানে প্রায়ই সকাল-সন্ধ্যায় ঘন্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করি। এটি আমার ধ্যানের স্থান। ক্যাথলিকদের এই উদার আহ্বান এবং নিঃসঙ্গ থাকার এমন সুন্দর সুযোগ (আমাকে) দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ।"[২৪]

প্যারিসে স্বামীজী যখন লেগেটদের সঙ্গে বাস করতেন সে সময় মিসেস বুলের আমন্ত্রণে স্বামীজীকে পেরো-গীরে চলে যেতে হয়। বিবেকানন্দের অবস্থান অ্যালবার্টাকে বিশেষ কিছু দিয়েছিল তাই তাঁর আকস্মিকভাবে স্থানত্যাগে বিমর্ষ অ্যালবার্টা মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন: "কাল রাতে ডিনারের আসর খুব জমেছিল, স্বামীজীও ঝকঝকে মেজাজে ছিলেন। তবে তিনি ভীষণ দুঃখিত যে তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার দরুন প্যারিস ছেড়ে তাঁকে অচিরেই চলে যেতে হবে। প্যারিস তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল। এখানকার পরিবেশে বেশ মানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। ভাষা শেখাতেও বেশ রপ্ত হয়ে গেছেন। এখানকার চিন্তাবিদ্ এবং রদাঁর মতন শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। এখন প্যারিস ছাড়ার অর্থ নিজেকে এসব থেকে বিচ্ছিন্ন করা। স্বামীজী একা হলে হয়তো উনি যেতে রাজি হতেন না।"[২৫]

স্বামীজীও বুঝেছিলেন অ্যালবার্টা তাঁর চলে আসায় মুষড়ে পড়েছে। তাকে উৎফুল্ল করতে জন্মদিনে পেরো-গীরে থেকে একটি সুন্দর কবিতা উপহার দেন—অ্যালবার্টার প্রতি এ ছিল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আশীর্বাদ—

"মায়ের হৃদয়বৃত্তি সংকল্প বীরের
মধুর পরশখানি কোমল ফুলের
বেদীতলে লীলাময় পুণ্য হোমানলে
সৌন্দর্য্যের সাথে শক্তি নিত্য যেথা দোলে,
যে শক্তি চালিত করে, প্রেম বশ হয়,
সুদূর প্রসারী স্বপ্ন—পথ ধৈর্যময়,
আত্মায় বিশ্বাস নিত্য—সকলে তেমন,
ছোটবড় সকলেতে দেবতাদর্শন,
—এইসব, আরো দেখা নাহি যায়,
জগৎ-জননী আজ দিবেন তোমায়।"

স্বামীজী এইসঙ্গে মন্তব্যও করেছেন, 'লেখাটা ভাল হয় নি, কিন্তু আমার সকল ভালবাসা এতে ঢেলে দিয়েছি। তাই আমি নিশ্চিত যে, তোমার এটা ভাল লাগবে।'[২৬]

দেশে ফিরেও স্বামীজী তাঁর এই স্নেহভাজন কন্যাটিকে ভোলেননি—পত্রের মাধ্যমে পরস্পরের যোগাযোগ বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। রিজলি ম্যানরে একত্রে বাসকালে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গেও লেগেট পরিবারের এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রিজলি থেকে নিবেদিতা যখন শিকাগোয় যান তখন সঙ্গী ছিলেন অ্যালবার্টা। নিবেদিতা তার সাহসিকতায়

ও সৌজন্যপূর্ণ মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে মিসেস লেগেটকে লেখেনঃ "অ্যালবার্টার স্বভাব খুবই মহৎ, উদার এবং উৎসাহে পূর্ণ—জো-র সবগুলি সদ্‌গুণ তার বোনঝি তো পেয়েছে তার ওপর যুক্ত হয়েছে অসীম সাহসিকতা।"[২৭] প্রসঙ্গত নিবেদিতা রাশিয়া সম্পর্কে অ্যালবার্টার জ্ঞানের কথাও উল্লেখ করেন। রাজনীতির প্রতি উৎসাহী অ্যালবার্টার সমর্থন ছিল চরমপন্থীদের প্রতি। নিবেদিতা অ্যালবার্টার সঙ্গে ভারতের রাজনীতি প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। অ্যালবার্টার পত্রের উত্তরে স্বামীজী জো-কে লিখছেনঃ "অ্যালবার্টার পণ্ডিত বন্ধুবর রাশিয়া সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা প্রায় আমারই ধারণার মতই, তাঁর চিন্তার একটা জায়গায় শুধু খটকা লাগছে সমগ্র হিন্দুজাতির পক্ষে এককালে রাশিয়ার ভাবে ভাবিত হওয়া কি সম্ভব?" অ্যালবার্টার রাজনীতিপ্রীতির সঙ্গে পরিচিত থাকায় ভগিনী নিবেদিতা পরবর্তী কালে তার কাছ থেকে সময়োচিত সহায়তা পেয়েছিলেন। নিবেদিতা ও অ্যালবার্টার পত্রালাপ যেন পরিণত-বুদ্ধি কোনও বান্ধবীর সঙ্গে সমমানসিকতাজনিত ভাববিনিময়—পত্রগুলি ছিল চিন্তাপূর্ণ ও উচ্চভাবব্যঞ্জক।

১৯০৫ সালে লণ্ডনের বিখ্যাত লর্ড স্যাণ্ডউইচের বংশধর জর্জ মন্টেগুর সঙ্গে অ্যালবার্টার বিবাহ হয়। মিসেস বেসি লেগেটের সঙ্গে রাজবংশজাত বহু অভিজাত পরিবারের যোগাযোগ ছিল কিন্তু অ্যালবার্টার এই বৈবাহিকসূত্রে লেগেট পরিবার ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ অভিজাত পরিবারবর্গের সঙ্গে মিলিত হয়। ঐতিহাসিক হিনচিনব্রুক প্রাসাদে অ্যালবার্টা ও জর্জ মন্টেগু বাস করতেন। জর্জ মন্টেগু পরবর্তী কালে নবম আর্ল-অব-স্যাণ্ডউইচ হন। এঁদের সন্তানের 'গড মাদার' হয়েছিলেন স্বয়ং ইংলণ্ডের রানী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজপরিবারের সঙ্গে যোগসূত্রটি রামকৃষ্ণ মিশনকে এক চরম দুঃসময়ে সাহায্য করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ মহারাজ বড়লাট লর্ড কারমাইকেলের কাছে উক্ত আত্মীয়তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যধারা সম্পর্কে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন। সঠিক তথ্য অবগত হয়ে লর্ড কারমাইকেল রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মন্তব্যের জন্য দুঃখিত হন ও তা প্রত্যাহার করে নেন।

ভগিনী কৃস্টিনের পিতা ছিলেন জার্মান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কৃস্টিন ভারতে ফিরে আসতে চাইলে তাঁকে ইংরেজ গভর্নমেন্ট বাধা দেন। এই ক্ষেত্রেও অ্যালবার্টা জোসেফিন ম্যাকলাউডের পরামর্শে লেডী কারমাইকেলের কাছে ভারতবর্ষে ভগিনী কৃস্টিনের জনকল্যাণমূলক জীবনযাত্রা সম্পর্কে লেখেন, উদ্দেশ্য ছিল— ভারতে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পথ সুগম করা।

একসময় স্বামীজীকে অ্যালবার্টা জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'বিবাহে কি কোন সুখ নেই?' উত্তর এসেছিলঃ "আছে অ্যালবার্টা, যদি সে বিবাহ কঠোর তপস্যায় পরিণত হয় এবং সবকিছু—এমনকি নিজস্ব মতামত পর্যন্ত ত্যাগ করা যায় তবেই তা সুখের হয়।" স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসে অ্যালবার্টা ধর্মজীবনযাপনের স্বপ্ন দেখতেন, 'ক্যাথলিক নান' হওয়ার বাসনাও মনে উঠত, ফাদার পাওয়েলের কাছে তিনি ধর্মদীক্ষাগ্রহণ করেন কিন্তু স্বামীজীই ছিলেন তাঁর চিন্ময়লোকের ধ্রুবজ্যোতি।

মিস ম্যাকলাউডও মনে মনে অ্যালবার্টার জন্য ঐরকম ত্যাগপূত জীবনের

ভবিষ্যৎ-চিত্র এঁকেছিলেন। তাই অ্যালবার্টার বিবাহের সময় তাঁর মানসিক অবস্থা অনুমান করে নিবেদিতা সান্ত্বনা দিয়ে লেখেনঃ "অ্যালবার্টা চিরকাল একই থাকবে। বিবাহিত হলেও সে সন্ন্যাসিনী। শুধু চার্চে গিয়ে যে উপাসনা এতদিন সে করত, এখন থেকে তা সম্পন্ন করবে নিজের গৃহে।"[২৮] নিবেদিতা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরটিতে গিয়েছিলেন অ্যালবার্টার ভাবী জীবনের সূচনায় তার জন্য প্রার্থনা জানাতে। অ্যালবার্টাকে আশ্বাস দিয়ে লেখেনঃ 'দক্ষিণেশ্বরের সেই পবিত্র কক্ষটিতে এখন দিনান্তের স্তিমিত আলোক—ঘরটির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পতিতপাবনী গঙ্গা। মনে হল, সেখান থেকে অনিঃশেষ আশীর্বাদের একটি ধারা যেন বহুদূরে অ্যালবার্টার কাছে প্রবাহিত হয়ে যাবে।' আরও লিখলেনঃ "তোমার প্রত্যেকটি কথা আমি সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি। মনে রেখো, সন্ন্যাসজীবন ও কঠোর তপস্যা—সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় একই লক্ষ্যে নিয়ে যায় যখন আমরা মানুষের সেবায় ব্রতী হই। প্রিয় অ্যালবার্টা, তোমার বিবাহিতজীবন তোমাকে সেই উচ্চ আদর্শেই পৌঁছে দেবে—শুধু একজনকে নয়, বিশ্বের সকলকে তোমাকে সেবা করতে হবে নিজের কথা এতটুকু চিন্তা না করে।...আর আমার বিশ্বাস, তোমরা দুজনে সেই একই উদ্দেশ্যে মিলিত হচ্ছ।"[২৯]

অনেক বছর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শতবর্ষের ঐতিহ্যযুক্ত হিনচিনব্রুক প্রাসাদটি দুশ শয্যাযুক্ত রেডক্রস হাসপাতালে পরিণত হয় এবং অ্যালবার্টারা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরের একটি গৃহে নিজেদের সরিয়ে নেন। ঐসময় অ্যালবার্টা ব্যক্তিগত এক পত্রে লিখেছিলেনঃ 'হিনচিনব্রুক প্রাসাদ যে এক মহৎ কাজে উৎসর্গিত তার জন্য আমরা বাস্তবিকই সুখী এবং গর্বিত।' পরিস্থিতি ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার এই দক্ষতা অ্যালবার্টার জীবনে স্বামীজীর আশীর্বাদের ফলশ্রুতি।

অ্যালবার্টার চেতনায় যে দীপ প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ক্রমে তার উত্তাপ জর্জকেও স্পর্শ করে। মিসেস লেগেট, কন্যা অ্যালবার্টা ও জামাতার সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁদের অন্তরঙ্গতার জন্য সর্বত্র তাঁরা বিশেষ সমাদৃত হন—এই আন্তরিক অভ্যর্থনায় তাঁরা সকলেই অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁরা কাশীধামে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও মাস্টারমশাইকে দর্শন করেন। বেলুড় মঠে যেদিন আসেন, স্বামী প্রেমানন্দ সপ্রেম আলিঙ্গনে লর্ড স্যাণ্ডউইচকে অভ্যর্থনা জানান। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরটিতে গিয়ে জর্জ প্রশ্ন করেছিলেনঃ 'ঠিক কোন্ স্থানটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে নরেন্দ্রনাথের সমাধি হয়।' সেই মহাপবিত্রস্থানে পরম শ্রদ্ধায় তিনি কিছুক্ষণ ধ্যান করেন। শ্রীশ্রীমার পুণ্য দর্শনলাভ শুধু বেসির নয়, অ্যালবার্টার মনেও গভীর রেখাপাত করেছিল। আর অভিভূত জর্জ স্মৃতিকথায় লেখেনঃ "কলকাতায় অবস্থানের পরমতম ঘটনা Holy মাদারের দর্শন। আমরা তাঁর পদধূলি নিলাম। তিনি অল্পই কথা বললেন। কিন্তু সেই মহিমান্বিত মুখের শান্ত, কিছুটা নির্লিপ্ত ভাব আমি চিরকাল স্মরণে রাখব।"[৩০]

অ্যালবার্টার সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমণ্ডলের যোগসূত্রটি প্রধানত রক্ষিত হয়েছিল মিস ম্যাকলাউডের মাধ্যমে। প্রিয় বোনঝিকে জোসেফিন নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতেন—এই পত্রবিনিময়ের প্রধান কারণ ছিল স্বামীজীর প্রতি উভয়ের অনুরাগ এবং তাঁর পুণ্য স্মৃতিচারণ, স্বামীজী যে বিরাট কর্মযজ্ঞের প্রবর্তন করেন তার খুঁটিনাটি বিষয়েও

অ্যালবার্টা জানতে আগ্রহী, ম্যাকলাউড তাঁর কাছে রাজা মহারাজের মহাসমাধির প্রসঙ্গ, স্বামীজীর সন্ন্যাসিসন্তানদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতির কথা সবিস্তারে লিখতেন, কখনও বা এক দিব্যভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে লিখেছেনঃ "বাঁচো বাঁচো প্রিয় ব্রেটা।...স্বামীজীকে কিছুটা জানা বা তাঁর ভাব কিছু পরিমাণে গ্রহণ করাও সামান্য উত্তরাধিকার নয়। আমি এক্ষেত্রে তোমার ওপর কতই না নির্ভর করি।"[৩১] মিস ম্যাকলাউড তাঁর 'হলসক্রফট-এর বাড়িটি ১৯৪৩-এ প্রিয় অ্যালবার্টাকে দান করেন। পরবর্তী কালে অ্যালবার্টার পুত্র ঐ বাড়ি ব্যবহার করতেন। ১৯৫১ সালে অ্যালবার্টার জীবনাবসান হয়।

॥ এগারো ॥

অ্যালবার্টার ভ্রাতা হলিস্টার ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা উইলিয়ম স্টার্জিসের প্রফুল্ল ও আনন্দময় সত্তা তিনি লাভ করেন। তার প্রাণবন্ত স্বভাব সহজেই লোককে আকর্ষণ করত এবং অচিরেই তিনি সকলের প্রিয় হয়ে উঠতেন। কোথাও মান-অভিমানের ঘন মেঘ পরিবেশকে ভারি করে তুললে হলিস্টারের আনন্দময় উপস্থিতি মুহূর্তে ঐ মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যেত। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা এই ছেলেটিকে বিশেষ স্নেহ করতেন স্বামীজী। পরবর্তী কালে ভগিনী নিবেদিতারও প্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। অনর্গল ফরাসী বলা আয়ত্ত করেছিল হলিস্টার আর কিছুটা জার্মান। তার হাতে পিয়ানোর স্বর্গীয় সুরঝঙ্কার ছিল অবিস্মরণীয়।[৩২]

একদিন স্বামীজী যখন ত্যাগময় জীবনের মহিমা এবং সংসার জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও সংগ্রামের কথা বলছিলেন তখন জীবনমুখী হলিস্টার বললেনঃ 'না, স্বামীজী না, আমি সন্ন্যাসী হতে চাই না।' স্বামীজী উত্তর দিলেনঃ 'ঠিক আছে বৎস, তবে মনে রেখো তুমি কঠিনতর পথকেই বেছে নিলে।'

হলিস্টারকে মিঃ লেগেট তাঁর বিশাল ব্যবসায়ে নিযুক্ত করলেও তার মনের গঠন অন্যরকম ছিল এবং কঠোর পরিশ্রম করার মতো স্বাস্থ্য তার ছিল না। হলিস্টার একটি লেদার কোম্পানিতে চাকরি নেন এবং ১৯০৫ সালে অতি সুন্দরী তরুণী জেনীকে বিবাহ করেন। ১৯০৮ সালে শিশুপুত্রকে অ্যালবার্টার তত্ত্বাবধানে রেখে পত্নীকে নিয়ে তিনি ভারত-তীর্থে এসেছিলেন। নিবেদিতার প্রিয় হলিস্টার যখন ভারতে এলেন নিবেদিতা তখন পাশ্চাত্যে। সিস্টার কৃস্টিন তাঁদের বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বর তীর্থ দর্শনার্থে নিয়ে যান। তিনি ম্যাকলাউডকে লিখছেনঃ "আমি যত জনকে দেখেছি তার মধ্যে হলিস্টার ভারি মধুরস্বভাবের।...জেনী কী রূপসী! আমি চোখ ফেরাতে পারি না...হলিস্টারের কী সুগভীর, সুন্দর ভক্তি! স্বামীজীর প্রতি কি ভালবাসা! স্বামীজীর ঘরে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র গুলি দেখবার সময় তার উদ্বেলভাব দেখে আমি অভিভূত!...দিনের শেষে আমরা দক্ষিণেশ্বরে যাই। তীর থেকে যখন আর মাত্র ত্রিশ চল্লিশ গজ দূরে, আমাদের নৌকা একটি পলিমাটির চরে আটকে গেল—তীরে পৌছাতে পারলাম না। পবিত্র কক্ষটি ও পঞ্চবটী দর্শন-স্পর্শন করাতে চেয়েছিলাম ওদের কিন্তু নৌকা থেকে দেখেই তৃপ্ত হতে হল। সত্যিই খুব খারাপ লাগছে! হলিস্টারও বলল: 'কপালে নেই'।"[৩৩] পাশ্চাত্যে ফিরে

গিয়ে হলিস্টার মর্মান্তিক আঘাত পেলেন। অ্যালবার্টার কাছে তাঁর শিশুপুত্রটি হঠাৎ মারা যায়। অ্যালবার্টার জীবনেও এ এক দুর্বিষহ আঘাত।

হলিস্টারের হৃদয়ে স্বামীজী ছিলেন চির অম্লান। পরবর্তী কালে যখন হলিস্টারের আরেক পুত্র তাঁকে জীবন, মৃত্যু, ঈশ্বর ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করে—তিনি উত্তর দেন যে, তাঁর মানসলোকে এই সব গভীর বিষয় ছায়াও ফেলে না। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস কারণ 'স্বামীজী আমাকে বলেছেন, ঈশ্বর আছেন।' মহৎসঙ্গে এই অমোঘ পরিণতিই প্রত্যাশিত। হলিস্টার যে বালক বয়সে দেখেছিল, স্বামীজীর গৃহের দরজা ভেজানো, ঘরের মধ্যে স্বামীজী হেসে কথা বলছেন। স্বামীজীকে পরে হলিস্টার বালসুলভ কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'আপনি কার সঙ্গে অত কথা বলছিলেন?' উত্তর এলঃ 'আমি তো একলা ধ্যান করছিলাম।' হলিস্টার অবাক হয়ে বলেঃ 'তবে অত হাসি কিসের জন্য?' নাছোড়বান্দা হলিস্টারকে স্বামীজী বললেনঃ 'God is so funny!' দিব্য মধুর ঘটনাগুলি হলিস্টারের দুর্লভ অধ্যাত্মসঞ্চয়। বহুবছর পরেও সেগুলির স্মৃতিচারণের মধ্যে তাঁর কাছে স্বামীজী যেন আরও ঘনিষ্ঠতর হয়েছেন।

॥ বারো ॥

জন্মলগ্নে স্বামীজীর আশীর্বাদলাভে ধন্য হয়েছিলেন লেগেট দম্পতির একমাত্র সন্তান ফ্রান্সেস লেগেট। মিঃ লেগেটের শিশুকন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার আনন্দসংবাদ পেয়ে ভারতবর্ষ থেকে স্বামীজী লিখেছিলেনঃ ...'প্রাচ্যদেশের জ্ঞানী পুরুষেরা পাশ্চাত্য শিশুর জন্য প্রীতি উপহার নিয়ে আসছেন'—সেই প্রচলিত প্রথাটি পালন করার জন্য যদি এখন আমি আমেরিকায় যেতে পারতাম! তবে আমার অন্তরাত্মা সকল প্রার্থনা ও আশীর্বাদ নিয়ে সেখানে বিরাজ করছে; দেহের চাইতে মনের শক্তি ঢের বেশি।"[৩৮]

কন্যাটির যখন মাত্র দুবছর বয়স তখন দ্বিতীয়বার আমেরিকা সফরে এসে স্বামীজী রিজলি ম্যানরে বেশ কয়েক সপ্তাহ বাস করেন। একদিন স্বামীজী ও অ্যালবার্টা কোনও আলোচনায় খুবই নিমগ্ন। এমন সময় নিজের থেকেই শিশুটি বাগানের একগুচ্ছ ফুল এনে স্বামীজীর হাতে দিলে স্বামীজী সস্নেহে তা গ্রহণ করেন এবং গভীরভাবে বলেনঃ 'ভারতে আমরা আচার্যদের উদ্দেশ্যে পুষ্প নিবেদন করি।' এরপর কয়েকটি সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করে শিশুকে তিনি আশীর্বাদ করেন। ১৯০২ সালে মহাপ্রয়াণের কয়েকমাস আগে এক চিঠিতে ফ্রান্সের সম্পর্কে স্বামীজী লিখেছিলেনঃ "খুকুর উপর আমার আশীর্বাদ তো জন্মের আগে থেকেই আছে আর চিরকাল থাকবে।" এই আশীর্বাদের অমোঘ শক্তি নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের জীবনকে এক উন্নত লক্ষ্যের অভিমুখী করেছিল—সে এক বিচিত্র ইতিহাস। পরিণত বয়সে 'Late & Soon' বইটিতে ফ্রান্সেস স্বয়ং সে ছবি তুলে ধরেছেন। ধনী পিতামাতার প্রৌঢ় বয়সের একমাত্র সন্তান ফ্রান্সেস আবাল্য যত্ন ও মনোযোগে বর্ধিত হন। মিস ম্যাকলাউডের স্বপ্ন ছিল—স্বামীজীর আশীর্বাদপূত এই লেগেটদুহিতার ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল। মিঃ লেগেটও চাইতেন তাঁর এই কন্যাকে ছেলের মতন মানুষ করতে। তাই কন্যাকে ম্যাথামেটিকস্, ফরাসী ভাষা ইত্যাদি শেখানোর ইচ্ছা ছিল। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর প্রভূত বিষয়সম্পত্তির অধিকারিণী হন ফ্রান্সেস। অতিরিক্ত

প্রাচুর্য এবং আদরে মানুষ হওয়ায় ফ্রান্সেসের অল্পবয়স থেকে সববিষয়ে স্বাধীন মতামত গড়ে ওঠে এবং নিজস্ব বিবেচনানুসারে দৃঢ় ধারণা হয় যে স্বামীজীর প্রভাব তার পিতামাতার পরস্পরের প্রতি মানসদূরত্বের হেতু। এমনকি মিস ম্যাকলাউডের বিবেকানন্দপ্রীতিও তিনি সুনজরে দেখতেন না। ফ্রান্সেসের বিবাহ হয় স্বামীজীর পরিচিত ও অনুরাগী মার্জেসন পরিবারে। বাকিংহামশায়ারের ষষ্ঠ আর্ল লর্ড হোবার্টের কন্যা লেডি ইসাবেল মার্জেসন ছিলেন মিস ম্যাকলাউডের বান্ধবী। তাঁর সেন্ট জর্জেস রোডের বাড়িতে স্বামীজী লণ্ডনে থাকাকালীন ক্লাস নিতেন। জন্মসূত্রে বৃটিশ মিসেস লেগেটের ছিল ইংলিশ কালচারের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। বালিকা ফ্রান্সেসের যাতে সুশিক্ষা হয় সেজন্য বেসি তাঁকে মার্জেসন পরিবারে বাস করে ইংলণ্ডে পড়াশোনার সুযোগ দেন। মার্জেসন নিজেও ছিলেন শিক্ষাবিদ্। ফ্রান্সেস লণ্ডনের এই মার্জেসন পরিবারে আনন্দে থাকতেন—কুড়ি বছর বয়সে লেডি ইসাবেল মার্জেসনের পুত্র ডেভিডের সঙ্গে তাঁর পরিণয় হয়।

বেসি, ডেভিড এবং ফ্রান্সেস স্বয়ং ইংলণ্ডের জীবনযাত্রার তুলনায় রিজলি ম্যানরের শান্ত পবিবেশকে কালচারবিহীন ও অস্বস্তিকর মনে করতেন কিন্তু সেই ফ্রান্সেসই বিবাহিত জীবনের কুড়ি বছর অতিক্রান্ত হবার পর স্বামী ও সংসার থেকে দূরে রিজলির বাতাবরণে ফিরে যেতে চান। এই রিজলি মিঃ লেগেটকে দিত পরম তৃপ্তির আস্বাদ, ক্রমশ ফ্রান্সেসের মধ্যেও তাঁর পিতার সত্তা যেন জেগে উঠতে শুরু করল। নিজেকে বলতেনঃ 'আমি আমেরিকান'। অবশেষে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে ফিরে এলেন স্বামীজীর 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' রিজলি ম্যানরে। নিজের পরিচয় আবার দিলেন পিতার নামানুসারে 'ফ্রান্সেস লেগেট' বলে। ফ্রান্সেসের রিজলিতে প্রত্যাবর্তন শুধু পিতা ও পিতার আনন্দনিকেতন রিজলিতে নয়, তিনি ফিরে এসেছিলেন স্বামীজীর কাছেও। ইলিয়ট মেইনে গ্রীনএকারে স্বামীজী একটি বিরাট পাইনের নীচে ভারতের আচার্যদের মতন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনা করতেন। একসময় সেই বৃক্ষ থেকে তিনটি চারা তুলে আনেন মিস ম্যাকলাউড, যেটি শিশু ফ্রান্সেস রিজলিতে রোপণ করেছিল। সেই গাছটিই একমাত্র বাঁচে এবং তারই নাম হয় 'স্বামীজীর পাইন'। ফ্রান্সেস সেই চিরসবুজ বিশাল বৃক্ষটির পাদদেশে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াতেন—এই পাইন দুটি প্রজন্মের কত মানুষের কত অভিজ্ঞতার সাক্ষী। মিস ম্যাকলাউড ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪০-এ লিখছেনঃ "তিনদিন আগে ফ্রান্সেসের একটি চিঠি পেয়েছি, ... অবশেষে, ৪৪ বছর বয়সে স্বামীজীকে তাঁর আবিষ্কারের কথা।"[৩৫] এ যেন তাঁর পুনরভ্যুত্থান (ressurection). জীবনের প্রবল ঘূর্ণাবর্তে যখন প্রায় চূর্ণ হতে চলেছেন তখনই বিবেকানন্দ-সঞ্জীবনীসুধা তাঁর জীবনকে মথিত করে উত্থিত হল। বিপর্যয়ের মুহূর্তে অনুভব করলেন স্বামীজীর আশীর্বাদের অমোঘ প্রভাব, বুঝলেন এই ক্ষুব্ধ, বিক্ষিপ্ত জীবনই শেষ নয়, আবার প্রশস্ত, প্রশান্ত গ্রাম্য পথে বেরিয়ে পড়তে হবে—আবার সেই মুক্ত আকাশ, পাহাড়ের পাদদেশে সেই বনানীর শীতল ছায়ায় নিরাভরণ জীবনযাত্রা। যেখান থেকে আরম্ভ সেখানেই প্রত্যাবর্তন। কিন্তু জীবনের কাহিনীর আরম্ভ ও সমাপ্তির মধ্যবর্তী ঘটনাগুলির মূল্যও অপরিসীম। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁকে পরিণত বুদ্ধি ও চিন্তার অধিকারিণী করেছিল। তারই পরিচয় স্বরচিত 'Late & Soon'-এ চিরকালের জন্য লিপিবদ্ধ করলেন। আত্মীয় পরিজন এবং বন্ধুস্থানীয়দের কাছ থেকে

আশৈশব তিনি স্বামীজীর বহু প্রসঙ্গ শুনেছিলেন, সেগুলির ছবি তিনি অনন্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন—এভাবেই ধরা আছে রিজলি ম্যানরের সেই মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধার কথা, শিল্পী মড স্টামের স্মৃতিচারণপ্রসঙ্গ। শুধু তাই নয়, বিবেকানন্দকেন্দ্রিত ম্যাকলাউডের জীবনের ঘটনাও ঐ গ্রন্থের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। পরবর্তী কালে স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ যখন তাঁর 'ইওরোপে স্বামী বিবেকানন্দ' গবেষণা গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের জন্য ফ্রান্সেস লেগেটের কাছে যান, তিনি বহু উপাদান ও দুষ্প্রাপ্য ছবি দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

অন্তিম মুহূর্ত যতই আসন্ন হল, স্বামীজীকে যেন ততই বেশি করে ফ্রান্সেস অনুভব করতে লাগলেন। তাঁর কন্যা লেডি চ্যাটারিস লিখেছেনঃ 'মায়ের প্রার্থনার ডেস্কে শেষ পর্যন্ত ছিল স্বামীজীরই ছবি'। শেষ দিনটিতেও তিনি মাকে পাঠ করে শুনিয়েছেন 'মেডিটেশন অ্যাণ্ড ইটস্ মেথডস্—অ্যাকর্ডিং টু স্বামী বিবেকানন্দ' থেকে। বইটি তিনি অতি যত্নে রাখতেন তাঁর প্রার্থনাকক্ষে। ১৯৭৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি স্বামীজীর কথা শুনতে শুনতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তাঁরই আশীর্বাদধন্যা ফ্রান্সেস। তাঁর মৃত্যুর পর আমেরিকানিবাসী রামকৃষ্ণ সংঘের জনৈক সন্ন্যাসী তাঁর পুত্র ভাইকাউন্ট ফ্রাঙ্ক মার্জেসনকে সান্ত্বনা জানিয়ে লেখেনঃ "স্বামীজী তাঁর (কোনও এক) শিষ্যকে একবার বলেছিলেন, আমি যার মাথায় হাত রেখেছি, তার আর পরজন্মের ভাবনা নেই।"[৩৬] ঐশী পুরুষের অমোঘ আশীর্বাদ ফ্রান্সেসের অন্তিম পর্বে একান্ত সার্থক হয়ে উঠেছিল। পত্রের উত্তরে মিঃ ফ্রাঙ্ক মার্জেসন লেখেনঃ "আপনার পাঠানো প্রার্থনামন্ত্র আমার মাকে সেই শক্তি, সেই অবলম্বনই এনে দিয়েছে যার উপর তিনি নির্ভর করতে পারেন। এমনই সুদৃঢ় আশ্রয় এটি—আর তাঁর জীবনে যখন এই জিনিসের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি—তখনই তা এসেছে। এই প্রয়োজন আমার নিজেরও। আমার জন্যও যে তাঁর এই আশ্রয় আছে—তা যেন আমি জানতে পারি।...আমার মা বিভিন্ন সময়ে আমাকে বলেছেন, 'স্বামীজী তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন'। নিজের জীবনের সংকট মুহূর্তেও ভেবেছেন এখনও কি স্বামীজীর ঐ দুটি ত্রাণহস্ত তাঁকে আবৃত করে রাখেনি?...স্বামীজীর আশীর্বাদ যেন স্বর্ণসূত্রের মতো তাঁর সমগ্র জীবনকে বেঁধে রেখেছিল।"

রিজলি ম্যানরের বর্তমান উত্তরাধিকারী ফ্রান্সেস লেগেটের পুত্র মিঃ ফ্রাঙ্ক মার্জেসন। বিগত ১৯৯৩ সালে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান করেছিলেন শ্রীসারদা মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসিনী। আমেরিকার 'মহাতীর্থ' রিজলি ম্যানর দর্শনে এসে তাঁরা পরিচিত হন লেগেট পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে। স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত রিজলির পাইন গাছটি দেখিয়ে মিঃ ফ্রাঙ্ক মার্জেসন মন্তব্য করেনঃ "প্রায় একশ বছর কেটে গেছে—এর মধ্যে কত ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত হয়েছে রিজলি ম্যানরে, কত বড় বড় গাছ ভেঙে পড়েছে কিন্তু স্বামীজীর পাইন আজও অচল, অনড়।" 'মার্জেসন-কন্যা রোডা সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে ক্যাম্প্ পার্সির বনপথে হাঁটতে হাঁটতে বলেন—এই পথটির বর্তমান পরিচয় 'Swamiji's Walk' নামে। স্বামীজী পার্সিতে কোন বাড়িটিতে বাস করতেন সেটিও উল্লেখ করেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়ঃ 'একথা তুমি কার কাছে শুনেছ?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসেঃ 'It is in our family'. প্রফেটের প্রভাব অবিচ্ছিন্নধারায় ঐ পরিবারের তিনটি প্রজন্মে প্রতিটি সদস্যকেই কম-বেশি প্রভাবিত করে চলেছে—হয়তো করবে আগামী দিনেও।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী

মিতা মজুমদার

উপনিষৎ বলছেন, 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।'[১]—তুমিই নারী, তুমিই পুরুষ। আবার বালক বা বালিকা—সেও তুমিই। তাৎপর্য এই—আত্মায় লিঙ্গভেদ নেই। এক আত্মাই সর্বভূতে বিরাজ করছেন।

জগতের প্রতি স্বামীজীর এই ঔপনিষদিক বা পারমার্থিক দৃষ্টি ছিল। আর ছিল বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেনঃ "আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ। সব আত্মা।"[২] কিন্তু স্বয়ং এই অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থেকে খুশি হতে পারেননি—সংসার জ্বালায় জর্জরিত, তাপিত, ক্লিষ্ট মানুষ যাতে এই সনাতন সত্য উপলব্ধি করে মুক্ত হতে পারে, শাশ্বত শান্তির অধিকারী হতে পারে সেজন্য প্রাণপাত করে গেছেন। স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য এই—বেদান্তের চরম সত্য ঘোষণা করেই তিনি ক্ষান্ত নন, জগতের ব্যবহারিক সত্তাকে স্বীকার করে নিয়ে মানুষের অভ্যুদয়ের পথ তিনি নির্দেশ করছেন। কারণ অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে নিঃশ্রেয়স বা ঈশ্বরলাভের পথে অগ্রসর হতে হয়। কিভাবে এই অভ্যুদয় ঘটবে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে যেমন তিনি পুরুষদের কথা ভেবেছেন, তেমনি নারীসমাজ, বিশেষত ভারতীয় নারীসমাজের কথাও ভেবেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জগতে প্রতিটি নারীর প্রতি মাতৃদৃষ্টি ছিল। সব নারীকেই তিনি আদ্যাশক্তির অংশ বলে মনে করতেন। স্বামীজীও বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক নারীই জগন্মাতার অংশ। শৈশব থেকেই এই ভাবনা তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল। তাই খেলার সাথী হরির সঙ্গে বাড়ির চিলেকোঠার দরজা বন্ধ করে সীতার ধ্যানে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন। কথায় বলে 'ছায়া পূর্বগামিনী'। পরবর্তী কালে 'বিলে' যখন 'নরেন্দ্রনাথ' এবং 'নরেন্দ্রনাথ' যখন 'স্বামী বিবেকানন্দ' হলেন তখনও এই সীতাচরিত্র তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

গর্ভধারিণী জননীর মধ্য দিয়েই নারীর ও শিশুর প্রথম পরিচয় হয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানও একথা স্বীকার করে। শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে জননীর প্রভাব সত্যই অপরিসীম। স্বামীজীর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। মাতা ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মায়ের স্মৃতিশক্তি, পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলী স্বামীজীর চরিত্রে খুব সহজেই সঞ্চারিত হয়েছিল। এমনকি তাঁর মহিমাব্যঞ্জক, রাজকীয় চেহারার আদলটিও স্বামীজী পেয়েছিলেন।

মাকে স্বামীজী প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। যখন তিনি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়ে ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখনও হঠাৎ হঠাৎ মায়ের জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। অমনি লোক মারফৎ মায়ের কুশল জেনে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। স্বল্পায়ু জীবনের শেষ দিকে অন্তর্মুখ অবস্থায় যখন বেশির ভাগ সময় বেলুড় মঠেই বাস করতেন, তখনও নিয়মিত মায়ের খোঁজখবর নিয়েছেন। কোনও পারিবারিক ব্যাপারে পরামর্শ নিতে ভুবনেশ্বরী দেবী মঠে এলে স্বামীজীর ঘরের বাইরে থেকে তিনি 'বিলু' বলে একবার ডাক দিতেন। আর সেই ডাক শোনামাত্রই বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ মুহূর্তের মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মায়ের পিছু পিছু অনুগত ছোট শিশুটির মতো সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসতেন। 'মায়ের জন্য কিছুই করতে পারলাম না'—এ দুঃখ তার আজীবন ছিল। মায়ের সঙ্গে এই প্রাণের সম্পর্ক জগতের প্রতি তাঁর মাতৃদৃষ্টি স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেছিল, সন্দেহ নেই।

ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করার সময় তরুণ নরেন্দ্রনাথ শক্তিকে মানতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তিনি ক্রমশ 'মা'কে অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী আদ্যাশক্তিকে মানলেন; সেই থেকে ধ্যানে জ্ঞানে শক্তির জন্য এক অপরিসীম ব্যাকুলতা স্বামীজীকে পেয়ে বসেছিল। শক্তির প্রতি এই ভালবাসার কারণেই তিনি উপনিষৎ এত পছন্দ করতেন। আর বোধহয় সেইজন্যই বলতেন—আমি সারাজীবন যদি কোনকিছু প্রচার করে থাকি তো সে এই শক্তির কথা। বাস্তবিক, সারাটা জীবন তিনি 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—এই মহতী বাণীই প্রচার করেছেন। তমোনিদ্রায় আচ্ছন্ন মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছেন—'ওঠো, জাগো।' তাদের মধ্যে রজোগুণ সঞ্চারের অভিপ্রায়ে বলেছেন, গীতা ছেড়ে ফুটবল খেল। যাতে তমো থেকে রজঃ এবং রজঃ থেকে ধাপে ধাপে তারা সত্ত্বের দিকে এগোতে পারে।

স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন, ভারতে এই 'শক্তি' নিদ্রিত এবং নারীজাতির চূড়ান্ত অবমাননার ফলে এই বিপুল শক্তির অপচয় হচ্ছে। তাই তিনি বললেন—ভারত তথা জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে সম্ভব হবে না, কারণ একটি পাখি কখনও মুক্তির অনন্ত আকাশে এক ডানায় ভর করে উড়তে পারে না।[৩]

ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করেই স্বামীজী এই সত্যটি অনুভব করেছিলেন। অতীতে গৌরবোজ্জ্বল বৈদিক সমাজে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ছিল। উভয়েই ধর্মাচার্য হতে পারতেন। অবিবাহিত পুরুষের যজ্ঞাধিকার ছিল না, কারণ তিনি অপূর্ণ। শুধু ভারতে নয়, প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। অতীতে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে অনেকে ছিলেন নারী। বেদে আমরা 'বাক্' ঋষির কথা পাই। ব্রহ্মজ্ঞ এই ঋষির অনুভব 'দেবীসূক্তে' লিপিবদ্ধ আছে। ঔপনিষদিক যুগেও ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ীরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

কালক্রমে সমাজে একদল স্বার্থান্বেষী পুরোহিতকুলের আবির্ভাব হল। ধীরে ধীরে নারীর অধিকারও খর্ব হতে শুরু করল। ধর্মকার্যে নারীর অধিকার রইল না। সংক্রামক ব্যাধির মতো এই কুপ্রভাব ছড়িয়ে পড়ল পারস্য, গ্রীস এবং রোমেও। বৌদ্ধযুগে নারীর অবস্থার আরও অবনতি হল। বৌদ্ধ ধর্মমতানুসারে, একমাত্র সন্ন্যাসীই নির্বাণের অধিকারী

এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র ব্যক্তিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। অতএব চলতি হিতবচনে কিছু প্রবাদ চালু হল। নরকের দ্বার কে? নারী। অন্ধ কে? যে নারী দ্বারা প্রবঞ্চিত ইত্যাদি। সংঘে ভিক্ষুণীরা থাকলেও তাঁদের স্থান ছিল ভিক্ষুর নীচে। নারীজীবনের উজ্জ্বল অধ্যায় সম্পূর্ণ রাহুগ্রস্ত হল মধ্যযুগে। ঐ অন্ধকার যুগে হাটে-বাজারে পশুর মতো নারী কেনাবেচা হত। শুধু ভারতে নয়, পাশ্চাত্যেও তখন ঐ একই চিত্র। ব্যতিক্রম দু'চারজন ছিলেন, তবে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

স্বামীজী মানসচক্ষে দেখেছিলেন একদা তেজস্বিনী, ব্রহ্মবাদিনী নারী কিভাবে ঘরের চার দেওয়ালে আবদ্ধ হয়ে পুরুষের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হল। কিভাবে সমাজ তার শিক্ষার অধিকার, স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার অধিকার কেড়ে নিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনল। তাই একটি চিঠিতে তিনি লিখছেনঃ "শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা যাহাতে...ভগবতীর প্রতিমারূপা নারীকে সন্তান ধারণ করিবার দাসীস্বরূপা করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে...।"[৪] "...আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।"[৫] "তোমরা মেয়েদের উন্নতি করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।"[৬]

নারীজাতির প্রতি স্বামীজীর ছিল অপরিমেয় শ্রদ্ধা। তিনি বলতেন, এরা মূর্তিমতী শক্তি। বলতেন, "পাঁচশ পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে, কিন্তু পাঁচশ নারীর দ্বারা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা সম্ভব।"[৭] অথচ মজার কথা হল, মেয়েদের প্রতি সম্ভ্রম সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের এবং অধুনা আমাদের যে প্রচলিত ধারণা আছে স্বামীজী সে রাস্তা দিয়েই হাঁটতেন না। সিস্টার কৃস্টিন স্বামীজীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, "আমরা যখন সহস্র দ্বীপোদ্যানে উঁচুনীচু পথ বেয়ে টিলায় উঠতাম বা নামতাম তখন ভুলেও পাশ্চাত্যের রীতি অনুযায়ী তাঁর সাহায্যের হাতটি আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিতেন না। এতে কেউ কেউ ব্যথিত হলে উল্টে বলতেন, 'তোমরা আমারই মতো শক্ত-সমর্থ। তোমাদের সাহায্য করতে যাব কোন দুঃখে? মহিলা বলে? ওটা হল শিভালরি! বোঝো না কেন, ঐ আচরণের মধ্যে নারী পুরুষের জৈবিক সম্পর্কের মনোভাবটাই প্রচ্ছন্ন থাকে'।"[৮]

মেকি সৌজন্যের ধার না ধারলেও নারীজাতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা কাকে বলে তা আমরা স্বামীজীর কাছ থেকেই শিখেছি। দেশের মানুষ সমালোচনা করবে জেনেও খোদ আমেরিকায় বসে তিনি এক মহিলাকে সন্ন্যাস দেন। কারণ তিনি তার মধ্যে লিঙ্গালিঙ্গবর্জিত আত্মা ছাড়া আর কিছুই দেখেননি। আপন দেবত্ববিস্মৃত রূপোপজীবিনীদেরও তিনি ঐ একই দৃষ্টিতে দেখেছেন। বন্ধুদের সঙ্গে কায়রো শহরে বেড়াতে গিয়ে পথ ভুল করে নিষিদ্ধ পল্লীতে ঢুকে পড়েছেন স্বামীজী। সেখানে মহিলাদের অশালীন অঙ্গভঙ্গি দেখে তিনি ব্যথিতকণ্ঠে বলে উঠেছেন "Poor children ! Poor creatures ! তোমরা তোমাদের দেবত্বকে দৈহিক সৌন্দর্যের পায়ে বলি দিয়েছ।"[৯] বলতে বলতে স্বামীজী কাঁদছেন। স্বামীজীর ভাব দেখে সেইসব মেয়েরা তাদের নিজেদের ভুল তো বুঝলই, আরও বুঝল যে এই মানুষটি দেবতা।

খেতড়ির রাজ-প্রাসাদের ঘটনাও অনেকেরই জানা। বাঈজী গান গাইবেন শুনে নবীন সন্ন্যাসী সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু বেদনাবিধুর কণ্ঠে গায়িকা যখন সুরদাসের ভজন ধরলেন—'প্রভু মেরো অবগুণ চিত না ধরো, সমদরশী হ্যায় নাম তিহারো'—তখনই গানের শুদ্ধভাবে আকৃষ্ট হয়ে স্বামীজী ফিরে এলেন এবং গানশেষে প্রাণভরে গায়িকাকে আশীর্বাদ করলেন ; কৃপা করে তাঁর সুপ্ত 'দেবীসত্তা'কে যেন জাগিয়ে দিলেন। কী শুদ্ধদৃষ্টিতে স্বামীজী তাঁকে দেখেছেন সেকথা উপলব্ধি করে সেই মহিলা এরপর সেই হীন জীবিকা ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধ জীবন যাপন করতে লাগলেন। শোনা যায় পরে তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও হয়।

ভারতের মেয়েদের দুঃখকষ্টের অবসান কিভাবে ঘটানো যায়, কিভাবে তাদের নিদ্রিত 'অহল্যা' শক্তিকে জাগানো যায়—এই ছিল স্বামীজীর ধ্যানজ্ঞান। তিনি ভেবে দেখলেন, অশিক্ষাই সব দুঃখেব মূল। পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচার করতে গিয়েও এ ব্যাপারে তাঁর চোখ খুলে যায়। তাই বারবার বলছেন—মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলো। তাদের স্বাধীনতা দাও। তাহলে তাদের ভাগ্য তারা নিজেরাই গড়ে নেবে।

কিরকম শিক্ষা দিতে হবে তাও তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন। শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করলে ভালর থেকে মন্দের আশঙ্কাই বেশি। তাঁর মতে দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই এদেশের মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে, তাদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করে তুলতে হবে। তার সঙ্গে অল্পস্বল্প ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ ইত্যাদি ব্যবহারিক দিকগুলি সম্পর্কেও শিক্ষিত করে তোলা চাই। তাদের স্বনির্ভর করতে হবে। কৃস্টিন লিখেছেনঃ "মেয়েরা অপরের দয়ায় বেঁচে থাকবে এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। স্বামীজী এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব এমন দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করতেন যা আমাদের কাছে টনিকের কাজ করত। দীর্ঘকালের প্রসুপ্ত শক্তি যেন ফণা তুলে দাঁড়াত। আমাদের মধ্যে এই প্রত্যয় জেগে উঠত—আমরাও শক্তিমান, আমরাও মুক্ত।"[১০]

এখন প্রশ্ন হল—এই মহান কাজের ভার কে নেবে? স্বামীজী বলছেন, ভারতের নারীসমাজের উন্নতির জন্য কয়েকজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। যাঁরা তাঁর কাজ করবেন তাঁদের তিনটি গুণ অতি অবশ্যই থাকতে হবে—পবিত্রতা, গুরুর প্রতি জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং ভক্তি। এই মহান কর্মযজ্ঞে ব্রতী হবার জন্য গৌরীমার মতো আধ্যাত্মিকতার দীপ্তিতে দীপ্তিময়ী এক হাজার তেজস্বিনী নারী খুঁজেছেন স্বামীজী। তিনি বলতেনঃ "ভারতের মেয়েদেব শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষিত হলেই চলবে না, তাদের মধ্যে থেকে অন্তত এমন কয়েকজন বেরোক যারা মেধা ও প্রজ্ঞায় অতুলনীয়, যারা বিশ্বের যে কোনও মহিলার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। যে অধ্যাত্মজ্যোতির বন্যায় সমগ্র পৃথিবী এখন ভাসমান সেই জ্যোতির অমোঘ স্পর্শে তাদের হৃদয়ের অধ্যাত্মশিখাটি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠুক। প্রদীপ্ত এই ভারতকন্যাদের জীবনের মূলমন্ত্র হবে ত্যাগ ও সেবা। গুটিকয়েক এইরকম সিংহী বেরোলেই ভারতের মেয়েদের যা কিছু সমস্যা তার সমাধান আপনিই হয়ে যাবে। অতীতে আমাদের দেশের মেয়েরা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে। সেইরকম মেয়ে কি এই পোড়া দেশে আর গুটি কয়েক হয় না যারা বহুজনের সুখের জন্য তাদের দেহ, মন,

প্রাণ সব বলি দিতে পারে? স্বামীজী উদ্দীপ্ত হয়ে বলতেন, 'গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে দাও দেখি যারা পবিত্র এবং স্বার্থশূন্য, আমি দুনিয়া কাঁপিয়ে দেব'।"[১১] তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, মেয়েদের সমস্যা মেয়েরাই সমাধান করবে। এ ব্যাপারে পুরুষদের খবরদারি চলবে না।

বিদেশিনী সিস্টার কৃস্টিন, সিস্টার নিবেদিতার মত প্রতিভাময়ী মেয়েদের তিলে তিলে এ কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন স্বামীজী। ভারতের মেয়েদের উদ্বোধিত করার কাজে জীবন উৎসর্গ করার প্রেরণা দিয়ে তিনি তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতাকে আশীর্বাদ দেনঃ

'মায়ের হৃদয় আর বীরের দৃঢ়তা,
মলয় সমীবে যথা স্নিগ্ধ মধুরতা,
যে পবিত্র—কান্তি, বীর্য, আর্য-বেদীতলে,
নিত্য বাজে, বাধাহীন দীপ্ত শিখানলে;
এ সব তোমাব হোক—আরও হোক শত
অতীত জীবনে যাহা ছিল স্বপ্নাতীত।
ভবিষ্যৎ ভারতেব সন্তানেব তরে
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা তুমি একাধারে।'[১২]

এই আদর্শে মেয়েদের গড়ে তোলবার জন্য তিনি স্ত্রীমঠের পরিকল্পনাও করেন। তাঁব ইচ্ছা ছিল গঙ্গার পূর্বতীরে মেয়েদের মঠ হবে। স্ত্রীমঠ কি করবে? চরিত্র তৈরি করবে। কি রকম চরিত্র? সীতার আদর্শে, শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শে সেই চরিত্র তৈরি হবে। পবিত্রতা, সংযম, আত্মত্যাগ, সেবা ও সহ্যশক্তির আদর্শে সেইসব অগ্নিশুদ্ধা চরিত্র তৈরী হবে। তিনি বলতেনঃ "আমাদের চেষ্টা হবে সীতার আদর্শে মেয়েদের গড়ে তোলা। সীতা—যিনি পবিত্রতার চাইতেও পবিত্র, সতীত্বের ঘনীভূত রূপ। ধৈর্য ও তিতিক্ষার মূর্ত বিগ্রহ।"[১৩] সীতার কথা বলতে বলতে স্বামীজী যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। বলতেন আমরা সব সীতা-মাঈর সন্তান।

সীতাচরিত্র বলতে আমার মনে হয় স্বামীজী পবিত্রতাস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমাকেই বুঝিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মধ্যেই তিনি পৌরাণিক সীতাচরিত্রের সব গুণগুলি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমার প্রতি তাঁর এতটাই শ্রদ্ধা ছিল যে তাঁকে দর্শন করতে যাবার সময় নৌকোয় বসে স্বামীজী মুহুর্মুহু গায়ে মাথায় গঙ্গাজল ছিটোতে ছিটোতে যেতেন যাতে দেহ মন পবিত্র থাকে। একমাত্র শ্রীশ্রীমার কাছেই তিনি মনের কথা সব খুলে বলতেন। শ্রীশ্রীমার অনুমতি ও আশীর্বাদ পেয়ে তবেই তিনি পাশ্চাত্যে গেছেন। যখনই তাঁর দর্শন পেয়েছেন তখনই স্বামীজী তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছেন। কখনও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

শ্রীশ্রীমাকে তিনি শুধুমাত্র 'গুরুপত্নী' বলে দেখেননি। দেখেছেন সাক্ষাৎ জগদম্বারূপে, 'জ্যান্ত দুর্গা' রূপে। বোঝা যায় এ শুধু শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টির ব্যাপার নয়। এ প্রত্যক্ষ অনুভব। তাই খেদ করে গুরুভাইদের লিখছেনঃ "দাদা, রাগ কোরো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি...। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষগুণ বড়।... ঐ

মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া।" আবার লিখছেনঃ "রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে। আমেরিকা, ইউরোপে কি দেখেছি?—শক্তির পূজা।... দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ?' 'কো রামঃ'...রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।"

'আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিনদিন সব বুঝতে পারছি। সেইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে পার কি?'

বলছেনঃ "আমাদের মা আধ্যাত্মিক শক্তির একটি বিশাল আধার।... যে আদর্শসমূহ তিনি তাঁর জীবনচর্যায় রূপায়িত করেছেন...তা শুধু ভারতবর্ষের নারীর বন্ধনমুক্তির প্রচেষ্টাকেই অধ্যাত্মরসে সঞ্জীবিত করবে না, সমগ্র পৃথিবীর নারীজাতিকে তা প্রভাবিত করে তাদের হৃদয় ও মানসলোকে অনুপ্রবিষ্ট হবে।... মাকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।"[১৪]

কি সেই আদর্শ যা সীতারূপিণী সারদার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে? কিই বা নয়? পবিত্রতা, মাতৃত্ব, মাধুর্য, ক্ষমা, ধৈর্য, পতিপরায়ণতা, সেবা, নিঃস্বার্থপরতা, শুদ্ধ প্রেমের পূর্ণ আদর্শ।

ভারতীয় নারীর মধ্যেও তিনি ঐ আদর্শের বিকাশ দেখতে চেয়েছিলেন। এই সমস্ত গুণ ছাড়াও স্বামীজী মেয়েদের মধ্যে দেখতে চাইতেন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের তেজস্বিতা ও দেশপ্রেম। এই কারণেই পাশ্চাত্যের শিষ্যাদের কাছে তিনি রাজপুত রমণী পদ্মিনীর উপাখ্যান খুব বর্ণনা করতেন। প্যানপেনে ভাব তিনি একেবারে পছন্দ করতেন না।

চরিত্রের এইসব বহুমুখী আদর্শ নিয়ে নিপুণ ভাস্করের মত তন্ময় হয়ে স্বামীজী রচনা করেছেন ভারতীয় নারীর কল্যাণময়ী দিব্য ভাবপ্রতিমা। ভগিনী কৃস্টিন, মিচেল অ্যাঞ্জেলোর অনুপম ভাস্কর্যের সঙ্গে স্বামীজীর এই ভাবপ্রতিমা নির্মাণের তুলনা করেছেন।

পবিত্রতা ও সংযমের ওপর জোর দিলেও স্বামীজী কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনকে নিন্দার চোখে দেখেননি। বরং শাস্ত্রের অধিকারী ভেদের কথা মনে রেখে বলেছেন—সকলেই সন্ন্যাসের অধিকারী নয়। কিন্তু পবিত্রতা ও নৈতিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গার্হস্থ্যজীবন গড়ে উঠলে তা সমাজের পক্ষে পরম কল্যাণকর হয়। এই কথা স্মরণ করে নিবেদিতা তাঁর 'The Master as I saw Him'-এ লিখছেন—"This realisation was the crown of his philosophy."[১৫] বিবেকানন্দের দর্শনের এই হল মহত্তম উপলব্ধি।

বাল্যবিবাহ প্রথার বিরোধী হলেও স্বামীজী তখনকার সমাজসংস্কারকদের সুরে সুর মেলাননি। সেই কারণেই কেউ কেউ তাঁর সমালোচনা করেছেন কিন্তু ঐ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। স্বামীজী ধ্বংসের পূজারী ছিলেন না বলেই জোর করে কোনও কিছু ভাঙ্গার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন—প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার এবং অর্থনৈতিক চাপ আসলে সব আপনা থেকেই বদলে যাবে।

নিবেদিতা এই প্রসঙ্গে মুক্তকণ্ঠে বলেছেন—"Swamiji held with unflattering strength, that the freedom to refrain from marriage, if

she wished, ought to be considered as a natural right of woman."[১৬]

পাশ্চাত্যে স্বামীজী বহু নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি খুব সহজভাবে মিশতেন, ভারতীয় প্রথায় তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতেন। সেখানে কেউ তার মা, কেউ বোন, কেউ বন্ধু আবার কেউ বা আদরের মেয়ে। এই মা বোনেরাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন। নিবেদিতা তাই বলছেন ঃ "It must be understood, however, that his dread was not of woman, but of temptation."[১৭] অর্থাৎ নারীদের তিনি ভয় করতেন না, ভয় করতেন বাসনাকে।

সুতরাং একথা বলা চলে—

(১) স্বামীজী তত্ত্বত নারী-পুরুষের ভেদ স্বীকার না করলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি বা উপলব্ধি দিয়ে দেখেছেন প্রতিটি নারীব অন্তরে দেবী রয়েছেন। তাঁরা মূর্তিমতী শক্তি বা ব্রহ্মময়ী।

(২) সমস্ত নারীর প্রতি তাঁর ছিল মাতৃদৃষ্টি।

(৩) নারীসমাজের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা।

(৪) তিনি সীতা অথবা শ্রীশ্রীমার জীবনের উপকরণ নিয়ে এমন একটি অনুপম নারীচিত্র অঙ্কন করেছেন যা পবিত্রতা, মাধুর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সেবা, নিঃস্বার্থপবতা ও অমল প্রেমের দিব্য বিভায়, শক্তিতে, মহিমায চির উজ্জ্বল ও তুলনারহিত। সেই অনন্য চিত্রের মধ্যেই সমগ্র নারীজাতির প্রতি বিবেকানন্দের মনোভাবটি বিধৃত এবং প্রতিবিম্বিত। আমরা যারা বিবেকানন্দের ভাবানুরাগী বলে গর্ব করি সেইসব মেয়েদের ও মায়েদের ঐ চিত্রটিকে সামনে রেখে দেখতে হবে আমাদের জীবন ও চরিত্র তার সঙ্গে মিলছে কিনা। যদি মেলে তো ভাল। আর তা যদি না মেলে তাহলে আমাদের ঐ সমস্ত গুণের দ্বারা নিজেদের প্রসাধিত করতে হবে।

স্বামীজীর চিন্তার আলোকে ধর্মমহাসভার পরবর্তী কালে নারীর স্থান

চিত্রা দেব

শতবর্ষ পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেছিলেন। বিশ্বের চিন্তাশীল মানুষ সেখানে পরিচিত হয়েছিলেন ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে। এই ধর্মসম্মেলনে স্বামীজীর উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং হিন্দু সন্ন্যাসিরূপে প্রদত্ত তাঁর অসামান্য বক্তৃতা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেই চিত্তাকর্ষক ঘটনার ঐতিহাসিক বিবরণ সময়ের আবরণে কিছুমাত্র ম্লান হয়নি। আমেরিকার 'সাইক্লোনিক হিন্দু সন্ন্যাসী' স্বামীজীর বক্তৃতায় সেদিন সবচেয়ে বেশি বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন মার্কিন মহিলারা। ভোগবাদে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত মানুষের মনও যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হতে পারে তাও বোঝা গিয়েছিল তাঁদের আচরণের মধ্যে। স্বামীজীর ভাষণে সেদিন তাঁরা এমন কিছু পেয়েছিলেন, যার সঙ্গে তাঁদের পূর্বপরিচয় ছিল না। ফলে এক মহৎ জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা উদ্বুদ্ধ হন।

বিদেশের এই অসামান্য উন্মাদনা প্রশ্ন জাগায়, স্বামীজীর বিদেশযাত্রা এবং শিকাগো ধর্মমহাসভায় অলৌকিক বিজয়ের সঙ্গে আমাদের দেশের নারীর কোনও যোগ ছিল কি না? একদা সন্ন্যাসীদের আমরা নারীবিদ্বেষী রূপেই দেখেছি। স্বামীজী নিজেও নারীকে দেখেছিলেন অপেক্ষাকৃত দূর থেকে। সমসাময়িককালে তাঁর কোনও কোনও মন্তব্য থেকে এমনও ধারণা করা চলে, নারীসংক্রান্ত সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে তিনি কখনও ছিলেন উদাসীন, কখনও বা রক্ষণপন্থী। সেজন্য শুধু শিকাগোযাত্রা এবং ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দেবার ঘটনাটিকে বড় করে দেখলে চলবে না। তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ ভারতীয়রা সেদিন শোনেননি, শুনলেও সেদিন তার মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারতেন কি না জানা নেই। ভারতীয় অন্তঃপুরিকারা সে সময় অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে সবেমাত্র বাইরে আসার চেষ্টা করছেন। অন্যান্য সংস্কারক ও সমাজহিতৈষীরা নানাভাবে কাজ শুরু করলেও কোনও নিশ্চিত রূপ দিয়ে ভারতীয় নারীকে অগ্রসর হবার মতো পথের সন্ধান দিতে পারেননি। ঠিক এই সময়েই স্বামীজীর আমেরিকা জয়ের সংবাদ এদেশে এসে পৌঁছল। পরাজিত, পদানত, আশাহত ভারতীয়দের জীবনে এমন ঘটনা শুধু অদৃষ্টপূর্ব নয়—অচিন্তনীয়। এই সময়টিকে আমরা অনায়াসেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক পরিবর্তনের চিহ্নরূপে গ্রহণ করতে পারি।

উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম শর্ত ছিল এদেশের লাঞ্ছিত অবমানিত নারীকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করা। স্বামীজী অনুভব করেছিলেন, 'জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুত্থান না হইলে সম্ভাবনা নাই' এবং তিনি সানন্দে লক্ষ্য করেছিলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বয়ং পথিকৃৎরূপে তাঁদের পথ দেখিয়েছেন, 'সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাব সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার।' সুতরাং স্বামীজীকেও এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। ভারতে প্রত্যাবর্তনের আগেই তিনি একটি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল নারী ও জাতপাতের শৃঙ্খলে বাঁধা অসংখ্য ভারতীয়কে শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করা। মূলত এই আন্দোলন ছিল আধ্যাত্মিক এবং মানসমুক্তিই তার লক্ষ্য। অন্যান্য সমাজসংস্কারকদের সঙ্গে এখানেই স্বামীজীর মৌল প্রভেদ। তিনি বাইরের এবং প্রত্যক্ষ বাধাগুলিকে অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক জডতা দূর করতে চেয়েছিলেন।

স্বামীজীর সমসাময়িক এবং তার পূর্ববর্তী একশ বছরে এদেশের নারীদের সামাজিক অবস্থা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। যদিও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বাবেবারেই নাবীব অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে, তবু ভারতীয় আদর্শে নারীকে একটি সম্মানজনক স্থান দেবার চেষ্টা করা হয়েছে বারংবার। সেই ভূমিকাটি গৌরবের এবং উন্নত আদর্শের অথচ বাস্তবে নারীর মর্যাদা অজস্রবার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, নারীর অবস্থা পূর্ববর্তী কোনও সময়েই খুব সম্মানের ছিল না। গৃহের অভ্যন্তরে 'সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী' বলে তাঁদের তুষ্ট করার চেষ্টা করা হলেও তাঁরা জীবন কাটাচ্ছিলেন পশমের আসনের উল্টোদিকের মতো কুশ্রী পরিবেশে। এই কুৎসিত পরিবেশে কুসংস্কার ও অশিক্ষার মধ্যে বাস করতে করতে নারীরা ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছিলেন অপমানের অন্ধকারে। ভারতের অধঃপতনের কারণ খুঁজতে গিয়ে স্বামীজী লক্ষ্য করেন ভারতীয় নারীদেব দুরবস্থা এবং বুঝতে পারেন ঃ 'আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহাহেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।' অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া নারী সমগ্র সমাজকেই পিছন দিকে টানছে।

অন্যান্য সমাজসংস্কারকদের মতো স্বামীজীকে কোনদিনই সংস্কার-আন্দোলনে অংশ নিতে দেখা যায়নি। তিনি জানতেন সামাজিক রীতিনীতি যুগে যুগে বদলায়। মানুষ নিজের প্রয়োজনে সামাজিক নিয়ম সৃষ্টি করে আবার তা ভাঙেও, সুতরাং সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কি হবে বরং যে সামাজিক ত্রুটিবশত এই কুসংস্কারগুলি জমে উঠেছে সেই ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করা উচিত। তৎকালীন সামাজিক অত্যাচার নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুললেও, দু-চারটি বড় সমস্যার সমাধান তখনই হয়—যেমন সতীদাহ, কৌলীন্যপ্রথার অতিরিক্ত কড়াকড়ি এবং কন্যাপণ-সংগ্রহ বন্ধ হয়েছিল, সামাজিক স্বীকৃতি না পেলেও বিধবার পুনর্বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা নারীর জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল, কর্মক্ষেত্রে তাঁদের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয়েছিল, ভরণপোষণের জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যেত তবু অধিকাংশ নারীর জীবন কাটত অবর্ণনীয় দুঃখের মধ্যে। এর কারণ শুধু এই নয় যে তখনও বালবৈধব্য, পণপ্রথা, বৈধব্য, পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকার জন্যই নারীদের দুঃখে জীবন কাটাতে হত, আসলে এঁদের জীবন কাটত পুরুষের উপেক্ষা ও অবহেলা কুড়িয়ে এবং তাদের কামনার ভোগ্যবস্তু হিসাবে। অতিরিক্ত

সন্তানসংখ্যা তাঁদের দেহ-মনে ক্লান্তি ও অসুস্থতা নিয়ে আসত। জাগতিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভের কোনও পথ তাঁদের সামনে না থাকাই ছিল তাঁদের দুঃখের প্রধান কারণ। স্বাবলম্বনের পথে যেমন বাধা ছিল তেমনই নিজের সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারও তাঁরা হারিয়েছিলেন।

ভারতীয় নারীকে এই অবস্থায় দেখেই স্বামীজী স্থির করেছিলেন তাদের উন্নতির জন্য কিছু করা প্রয়োজন কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে আসার আগেই তিনি বিদেশে ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন এবং সেদেশের নারীদের সঙ্গে তাঁর পবিচয় হয়। মার্কিন মেয়েদের দেখেই তিনি বুঝতে পারেনঃ 'কোনও জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি—নারীদের প্রতি তার মনোভাব।' মার্কিন নারীরা সুখী, আমেরিকায়ও তাই বিদ্বান, স্বাধীন ও উদ্যোগী মানুষের বাসস্থান। কারণ জানার পরেই তিনি কাজে হাত দেবার কথা ভাবলেন। স্বামীজীর শিকাগো-ভাষণ প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও তিনি নিজে সাময়িক উচ্ছ্বাস যথাসম্ভব পরিহার করেই নারীকল্যাণের কাজে হাত দিতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য সংস্কারকদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এখানেই। অন্যবা সমাজের দেহ থেকে ব্যাধি দূর কবতে চেয়েছিলেন, স্বামীজী সমাজের মানসিক ব্যাধিমুক্তির জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি শীঘ্রই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন সেটি হলঃ ভারতীয় নারীর সব সমাধান সম্ভব শিক্ষা নামক মন্ত্রটিব সাহায্যে।

মনে হতে পারে, স্বামীজীর পূর্বে কি এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না? তা নয়। গত দু'শ বছর ধরে প্রায় সর্বত্রই নারীশিক্ষার প্রসার বন্ধ থাকলেও স্বামীজীর পূর্বে বহু মনীষী নারীশিক্ষার জন্য ব্যাপকভাবে কাজে নেমেছিলেন এবং স্বামীজী এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আগেই বাঙালী মেয়েরা স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পর্যন্ত আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। সুতরাং স্বামীজী নারীর শিক্ষা নিয়ে কি ভেবেছিলেন জানা প্রয়োজন। গত শতকের সংস্কারকদের নারীসংক্রান্ত চিন্তার প্রধান ত্রুটি ছিল তাঁরা নারীর জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষ্যব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন। প্রথম থেকেই তাঁদের কল্পনায় নারীশিক্ষা ছিল 'ম্যারেজ ওবিয়েন্টেড'। নারী ভাল স্ত্রী হবে, ভাল মা হবে, ভাল গৃহিণী হবে, সুখের সংসার রচনা করে বাঁধা ছকের মধ্যে নিরুপদ্রবে জীবন কাটাবে—এই ছিল আমাদের গড়পড়তা সাধারণ মানুষের উন্নত এবং উদার চিন্তা। স্বামীজী প্রথম থেকেই এই ছকবন্দী জীবনের বিরোধী। ব্যবহারিক জগতে এবং আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমদর্শী অর্থাৎ নারী ও পুরুষের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন, বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন' কিংবা 'আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা।'

নারী ও পুরুষের কর্মশক্তি যে সমান সেকথা স্বামীজী আমেরিকায় গিয়ে প্রত্যক্ষ করেন স্বাধীন স্বচ্ছন্দবিহারিণী নারীদের মধ্যে এবং মুগ্ধ হন। মঠের গুরুভাইদের লেখা পত্রে সেই বিস্ময়ের অনাবিল উচ্ছ্বাসঃ 'এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা।...এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, আমি এদের পুষ্যিপুত্তুর, এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা, বাবা। এদের পূজা করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।' এই সময় থেকেই একটি আকাঙ্ক্ষা তাঁর

মনে বীজপত্রের মতো উদ্গত হয়, 'এইরকম মা জগদম্বা যদি এক হাজার আমাদের দেশে তৈরি করে মরতে পারি, তবে নিশ্চিন্তি হয়ে মরব।' কিন্তু যে দেশে 'স্মৃতি-ফৃতি লিখে, নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ করে, পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিন করে তুলেছে' সেই দেশের নারীদের জন্য স্বামীজী কি নির্দেশ দিলেন ? তিনি বললেন ঃ "নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পাবে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, কবিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতালাভে সমর্থ।"[১] স্বামীজী প্রথমেই কোনও ধারণা গড়ে নিতে যেমন রাজি ছিলেন না তেমনই অনধিকাবচর্চাতেও তাঁর আপত্তি ছিল। নারীর সমস্যা নারী নিজেই দূব করতে পাববে যদি তার সে শিক্ষা ও স্বাধীনতা থাকে। আমাদের শুভানুধ্যায়ীরা সেই ভাবে চিন্তা না কবে নিজেরাই নাবীর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে সমস্ত বিষয়টিকে জটিল কবে তুলছিলেন কেন না কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। স্বামীজী শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন তবে সে শিক্ষা শুধু কতকগুলি শব্দ শেখা নহে ঃ "আমাদেব বৃত্তিগুলিব—শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে। অথবা বলা যাইতে পারে—শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত হয এবং সফল হয।"[২] নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে এইভাবে শিক্ষিত হলে মানুষের জীবন গড়ে দেওয়ার জন্য অভিভাবকের প্রয়োজন হবে না।

ভারতীয় নারী উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে নিজেদের কেমন করে গড়বে তা স্বামীজী স্থির করে না দিলেও তাঁর কল্পনায় সে রূপ কেমন ছিল জানতে ইচ্ছে করে। তাঁর ইচ্ছে ছিল, উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়ার পরে নারী হবে পশ্চিমের মেয়েদের মতো সাহসী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল , স্বাধীন, দৃঢ়চেতা, সাবলীল ও স্বাবলম্বী আবার তার মনটি হবে ভারতীয় নারীর মতো পবিত্র, উন্নত, ধৈর্যশীলা, কোমল, পরহিতব্রতী, আত্মত্যাগে উন্মুখ, সলজ্জ বিনয়াবনত। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন উভয় দেশের নারীদের স্বাভাবিক এই গুণগুলি আসলে পরস্পরবিরোধী নয় বরং পরস্পরের পরিপূরক। নির্ভীকতা ও স্বাবলম্বনের সঙ্গে বিনয় ও পবিত্রতার প্রকৃত কোনও বিরোধ নেই, পশ্চিমের কর্মশক্তির সঙ্গে প্রাচ্যের অধ্যাত্মশক্তির মিলন হতেই পারে—প্রয়োজন শুধু শিক্ষার। ভারতীয় নারীর জন্য আদর্শ নারী ছিলেন তাঁর সামনেই, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, জননী না হয়েও তিনি সকলের মা, লজ্জাপটাবৃতা হয়েও সম্পূর্ণ স্বাধীন। মাকে আদর্শ করে মেয়েরা নিজেদের নতুন করে গড়ে নিতে পারবে, এই ছিল স্বামীজীর বিশ্বাস কিন্তু একেবারে প্রাথমিক স্তরে তাদের পথ দেখাবেন কে ?

স্বামীজী সে সময়ে ভারতীয় নারীদের মধ্যে তাঁর ঈপ্সিত জননেত্রীকে খুঁজে পাননি, শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে সরলাদেবীর তেজস্বিনী মূর্তি ও কর্মদক্ষতা তাঁকে কিছুটা মুগ্ধ করেছিল, সাধিকাদের মধ্যে গৌরীমা প্রমুখ সন্ন্যাসিনীর নেত্রীত্বে স্ত্রীমঠ স্থাপনের কথাও তিনি ভেবেছিলেন কিন্তু ভারতের নারীসমাজের জন্য প্রয়োজন ছিল 'একজন প্রকৃত সিংহী'র। এই আদলে স্বামীজী নিজেই গড়েছিলেন তাঁর মানসকন্যাকে। মার্গারেট নোবলের ভগিনী নিবেদিতায় রূপান্তর সেই অসাধ্য-সাধনার বাস্তব উদাহরণ। বিদুষী, বুদ্ধিমতী, স্বাধীনচেতা, কর্মপরায়ণা নিবেদিতাকে স্বামীজী নিয়ে এলেন ভারতে, ভারতীয় নারীর সেবায়

তাঁকে তিনি উৎসর্গ করলেন। শ্রীমা তাঁর বিদেশিনী কন্যাকে পরম স্নেহে গ্রহণ করলেন, ভক্তিমতী নিবেদিতা জীবনের অর্থ খুঁজে পেলেন তাঁর কাছে শান্তির আশ্রয় পেয়ে। প্রতীচ্যের কর্মশক্তির সঙ্গে মিলন হল প্রাচ্যের অধ্যাত্মশক্তির। এই নিবেদিতার হাতে ভারতীয় নারীর শিক্ষার ভার দিয়ে স্বামীজী তাঁর কর্তব্য শেষ করেন। পুরুষ হয়ে তিনি নারীর সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপ করতে চাননি। নারী তার চিন্তায় কর্মে ভবিষ্যৎ-নিরূপণে সম্পূর্ণ স্বাধীন। নিজের ভাগ্য সে নিজে গড়বে। বিধাতা নারীকে আপন ভাগ্য গড়ার অধিকার দেননি—এ কথা স্বামীজী বিশ্বাস করতেন না; আত্মায় লিঙ্গভেদ নেই একথাই বলতেন তিনি। সন্ন্যাসিনীদের মঠ সন্ন্যাসীদের নির্দেশে চলবে তা তিনি চাননি, আবার নারী-পুরুষে বিভেদও তাঁর কাম্য ছিল নাঃ "আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, নারীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধো, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর।"[৩]

স্বামীজী নারীকে যে মর্যাদা এবং অধিকার দেবার কথা বলেছিলেন সেকথা পৃথিবীর কোনও দেশেই কোনও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে দেওয়া হয়নি। পরিবর্তে দেওয়া হয়েছিল জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভূত উপকরণ। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা নারীর সাধ্যের বাইরেই থেকে গিয়েছিল। স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন আধ্যাত্মিক জাগরণ না হলে কোনও মানুষের পক্ষেই প্রকৃত স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয়, মানুষ কি শুধু বাইরের কয়েকটি নিয়ম-শৃঙ্খলে বন্দী? অন্তরে ষড়রিপু কামনা-বাসনার অজস্র শৃঙ্খল রচনা করছে এবং তার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তি। ভারতে এক সময়ে এর ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এবং নারীর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে হবে পতিব্রতা। শ্রদ্ধার বস্তু সন্দেহ নেই কিন্তু প্রতিটি নারীর জন্য একটিমাত্র পথের সন্ধান দিয়ে সেদিনকার সমাজ ভুল করেছিল। সকলেই যে গৃহিণী হবেন সেকথা কে স্থির করবে? নারীর সন্ন্যাসিনী হবার অধিকারও আছে, নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপনের স্বাধীনতাও আছে। অন্যান্য সংস্কারকেরা ভেবেছিলেন, নিজের জীবনযাপনের পদ্ধতি নির্বাচনের ভার নারীকে দিলে তার পক্ষে বিপথগামিনী হওয়া সম্ভব। স্বামীজী মনে করেছিলেন, শিক্ষা পেলে নারীর পক্ষেই বিপথ এড়িয়ে চলা সম্ভব এবং সে নিজেই নির্বাচন করতে পারবে তার কর্মক্ষেত্র। ধর্মকে কেন্দ্রে রেখে জীবন গঠনের শিক্ষা পেলে যে কোনও নারীর মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ ঘটতে পারে। সবাই নিশ্চয় ব্রহ্মচারিণী বা সন্ন্যাসিনী হবেন না, অনেকেই আপন সংসারে আধ্যাত্মিক পরিবেশ রচনা করবেন, কেউ কেউ কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করবেন। কে কেমন জীবন বেছে নেবেন তা নির্ভর করবে তাঁদের নিজেদের ওপর। নিজের ভাগ্য তাঁরা নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। জীবনের সবক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হওয়া, দৈনন্দিন জীবনে বস্তুর প্রাচুর্য, ঐহিক উন্নতি—শুধু এইটুকুই কি নারীর কাম্য হতে পারে? নারী কেন পুরুষের মতো হতে চাইবে? তার কি নিজের কোনও আদর্শ নেই? নেই কোনও নিজস্ব পরিকল্পনা? নারীকে চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেবার জন্য স্বামীজী চেয়েছিলেন, নারী নিজের কল্পনানুযায়ী দেবমূর্তিরও পরিবর্তন করতে পারবেঃ "কালীমূর্তি যে সর্বদা একই রকম থাকবে তার কোনও প্রয়োজন নেই। তাঁকে বিভিন্ন নূতনভাবে যাতে আঁকা যায়, এবিষয়ে মেয়েদের তোমরা উৎসাহিত কর। সরস্বতীর একশ রকম বিভিন্ন ভাব-কল্পনা

হোক।"[৪] স্বামীজী বিদেশে নারীদের স্বাধীন মন ও কর্মকুশল রূপ দেখে মুগ্ধ হলেও তিনি চাননি, ভারতীয় নারীকে তাদের আদলেই গড়তে বরং বহু নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁদের স্ত্রী ও কন্যাদের পশ্চিমের শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটিয়ে তাদের যখন 'আধুনিকা' করে তুলতে চাইছিলেন, স্বামীজী তার প্রতিবাদ করেছিলেন অসন্তোষ প্রকাশ করে, সেজন্য এমন একটি ধারণা অনেকেই পোষণ করেন যে, স্বামীজী সনাতন ভারতীয় নারীর প্রশংসা করে এবং সাবেকধারায় শিক্ষা দিতে চেয়ে প্রকারান্তরে সংরক্ষণপন্থী মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। এ কথা সত্য নয়। সাময়িকভাবে স্বামীজী নারীদের পাঠ্যবিষয় হিসাবে নাটক-নভেলকে দূরে রাখার কথা বলেছিলেন ঠিকই কিন্তু বারবার বলেছিলেন, তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

মার্কিন নারীরা শিকাগো ধর্মমহাসভায় এই মহৎ আদর্শের সন্ধান পেয়েই অভিভূত হয়েছিলেন, কেন না তাঁরা সে সময়ে বহু অধিকার পেয়েছিলেন এবং জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাবও তাঁদের ছিল না কিন্তু স্বামীজীর কথা শুনে তাঁরাও বুঝতে পারলেন পরানুকরণ নয়, নিজের অন্তরের দীপশিখাটিকে জ্বালিয়ে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানে তৎপর হবার নামই প্রকৃত স্বাধীনতা। পৃথিবীর সব দেশের নারীই তুলনামূলকভাবে বেশি ঈশ্বর-নির্ভর। হয়তো যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক অনুশাসন তার অবচেতনায় স্থায়ী নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেওয়ায় সে কোনও কিছুকে অবলম্বন করে বাঁচতে চায়। সভ্যতার উন্মেষপর্বে স্বামীকে সে প্রভু বা ঈশ্বরের সমতুল্য ভাবতে চেয়েছিল। ভয়ে বা ভালবাসায় এই ধারণাই শিকড়ের মতো বিস্তারলাভ করেছিল তার মনে কিন্তু যখন তার মানসিক উন্নতি হতে থাকে এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে সে বুঝতে পারে তার পূর্ববর্তী ধারণা ঠিক নয়, মার্কিন নারীদের এই মানসিক অনুসন্ধানপর্বে স্বামীজী তাঁদের আধ্যাত্মিকপথের সন্ধান দিয়েছিলেন। মার্কিন নারীরা সেদিন বুঝতে পারলেন, তাঁরা কী পেয়েছেন আর কী পাননি। তাঁরা যখন বুঝলেন তাঁদের নিজস্ব যা আছে তা কোনও অংশেই অপরের চেয়ে কম নয় তখন তাঁরা যেন নিজেদের হৃত শক্তি ফিরে পেলেন। বিশ্বের এই নারীজাগরণের সঙ্গে ভারতের নারীদেরও যোগ নিশ্চয় ছিল। কিন্তু এদেশের সামাজিক অবস্থা নারীকে অনেক দুর্বল করে রেখেছিল। এদেশের পাতিব্রত্যের আদর্শ নতুন কিছু নয়, পূর্ববর্তী ধারণাটিকেই ধর্মের সাহায্যে সুন্দর করে তোলা হয়েছিল এবং তার ফলে ভারতীয় নারীর জীবন ভিন্ন খাতে বয়েছিল। সামাজিকভাবে নিগৃহীত হলেও তাঁরা কয়েকটি উন্নতভাবের অধিকারিণী হয়েছিলেন। তৎকালীন সংস্কারকদের অনেকে উৎসাহের আতিশয্যে ভারতীয় নারীকে বিদেশিনীদের আদলে আধুনিকা করে তুলতে চাওয়ায় স্বামীজীর বিরাগভাজন হন। স্বামীজী আমাদের বৃত্তি এবং শক্তির বিকাশ চেয়েছিলেন, বিনাশ নয়। সুতরাং ভারতীয় নারীর আজন্ম সংস্কার লজ্জা-বিনয়-সতীত্ব বর্জন তাঁর অভিপ্রেত মনে হয়নি। এদেশের মেয়েদের জন্য প্রয়োজন ছিল শিক্ষা, স্বাবলম্বন এবং আধ্যাত্মিকতার। উভয় দেশের নারীদের সামাজিক বৈষম্যই তাদের ভিন্ন প্রকৃতির করেছে, কাজেই কেউ কারো অনুকরণ না করে নিজের নিজের শক্তি অনুযায়ী পথানুসন্ধান করলেই চূড়ান্ত উন্নতি করতে পারবে।

এবার প্রশ্ন ওঠে, একশ বছরে ভারতীয় নারী কতখানি অগ্রসর হতে পেরেছে? সে কি অর্জন করতে পেরেছে স্বামীজীর প্রার্থিত যোগ্যতা? স্বল্প কথায় এপ্রশ্নের উত্তর দেওয়া

সম্ভব নয় কারণ এই বিশাল দেশে সর্বত্র সমান উন্নতি বা অগ্রগতি হয়নি। শুধুমাত্র সাক্ষর নারীর সংখ্যাও সর্বত্র সমান নয়, কেরালায় যখন শিক্ষিতার হার শতকরা সাতাশি, রাজস্থানে তখন সাক্ষর নারীর সংখ্যা মাত্র একুশ। সুতরাং কোনও নারী জাগতিক উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে পারলেও অনেকে শুধুমাত্র অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে হয়তো বা অপমানের অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থা অনেক বদলেছে, আগেকার লোকাচার ও কুসংস্কার কমেছে কিন্তু নতুন সমাজের মেকি চাকচিক্য ও নীতিবোধের অবক্ষয় অনেকক্ষেত্রেই নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছে। অবশ্য প্রত্যেক সমাজেই কিছু না কিছু ত্রুটি থাকে। লক্ষণীয় পরিবর্তন যা হয়েছে তা হল সার্বিক চেতনার উন্মেষ। স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা ছিল উন্নতি হবে সকল শ্রেণীর মানুষের। তাঁর সেই ভাবনার ফসল হল এই সচেতনতা। উনিশ শতকের জাগরণ স্বল্প কয়েকটি শিক্ষিত পরিবারের নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বস্তরের নারীর মধ্যে। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা সকলেই অনেক বেশি সচেতন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার, কখনও বা সংঘবদ্ধ। আজকের এই নারীশক্তির জাগরণ ঘটে বর্তমান শতকের প্রথমদিকে।

স্বামীজী লোকান্তরিত হলেও তাঁর আদর্শ, আত্মত্যাগের প্রেরণা, স্বাজাত্যবোধ, দেশপ্রেম নারীদের মধ্যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। আধ্যাত্মিক জাগরণ একে হয়তো বলা চলে না কারণ প্রথম স্ফুরণ চোখে পড়ে স্বদেশকে কেন্দ্র করে। নিজেদেব পরাধীনতা তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল শৃঙ্খলিত ভারতের যন্ত্রণা দূর করতে। এই সম্মিলিত স্বদেশচেতনাই প্রকৃত মুক্তি এনে দিয়েছিল। আপাতভাবে একে সন্ত্রাসবাদ ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব হিসাবে গণ্য করা হলেও খোঁজ নিলে দেখা যাবে এ সময়েই নারীরা স্বামীজীর আদর্শে অতিমাত্রায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, বস্তুত সমগ্র দেশের যুবশক্তির মনেই স্বামীজীর প্রভাব পড়েছিল। শিক্ষিতা বাঙালী মেয়েরা লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেন স্বামীজীর কর্মযোগ, সঙ্গে রাখতেন স্বামীজীর মনোগ্রাম, ঠাকুরের ছবি। প্রসঙ্গত দুটি একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে হত্যা করে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথম যে বালিকাদুটি সমগ্র দেশকে তোলপাড় করেছিলেন তাঁদের একজন অর্থাৎ শান্তি ঘোষ (দাশ) ছিলেন ধর্মপ্রাণ পিতা-মাতার কন্যা। তাঁর নিজের ভাষায়ঃ "বাবার দেশপ্রীতি ছিল ধর্মের অঙ্গ। আমাদের মধ্যেও সেই ধর্মই যেন অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে এই ছিল তাঁর আন্তরিক কামনা। আর মা? মায়ের কাছ থেকে বাধা আসে না এসব কাজে। ঘরকন্নার কাজ ফেলে তিনি নিজেও ছুটে আসেন কংগ্রেস শিবিরে। স্বেচ্ছায় তুলে নেন ছেলেদের সেবার ভার। সেবাধর্ম ছিল তাঁর রক্তে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাগিনেয়ী হিসাবে এ যেন উত্তরাধিকাসূত্রে পাওয়া।"[৫] কমলা দাশগুপ্তের বাবা স্বামীজীর সেবাদর্শে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, কমলাও অনুপ্রাণিত হন দেশের সেবায়। বীণা দাস (ভৌমিক) তাঁর পিতা-মাতার কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন, একটা আদর্শের জন্য মানুষ কত বড় ত্যাগ স্বীকার নিজের জীবনে করতে পারে। তিনি কনভোকেশান হলে গভর্নরকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বিপ্লবী নারীদের মধ্যে আর একটি উজ্জ্বল নাম। চট্টগ্রামের পাহাড়তলি রেলওয়ে ইনস্টিটিউট আক্রমণের পরিকল্পনা সফলভাবে রূপায়িত করার পর তিনি আত্মঘাতী হন। তাঁর সঙ্গে সব সময় থাকত ঠাকুরের ছবি। স্বামীজীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তাঁর

শেষ রচনায় গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঙ্গে রয়েছে আর একটি কথা ঃ 'দেশের মুক্তিসংগ্রামে নারী ও পুরুষের পার্থক্য আমাকে ব্যথিত করিয়াছিল।'[৬] এ যেন স্বামীজীর কথারই প্রতিধ্বনি। স্বামীজী যে শিক্ষায় নারীকে জীবন গড়তে বলেছিলেন প্রীতিলতা সেভাবেই কি নিজেকে প্রস্তুত করেননি ? তাঁর রচনাতেও দেখি ঃ 'আশৈশব ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং আন্তরিক ভক্তি আমার জীবনের মূল সম্পদ।'[৭]

স্বামীজীর আদর্শ যে শুধু শিক্ষিতা নারীদের মনে প্রেরণা জাগিয়েছিল তা নয়, সেদিন বিপ্লবী নারীদের প্রেরণা জাগিয়েছিল স্বামীজীর রচনা, কথামৃত, রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকলাপ এবং স্বয়ং শ্রীশ্রীমার বাণী। কেননা প্রথম মহিলা রাজবন্দী ননীবালাদেবী যখন অনশন কবেছিলেন তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল· কি করলে তিনি অনশন ত্যাগ করবেন। উত্তরে ননীবালা বলেন ঃ 'আমাকে বাগবাজারে বামকৃষ্ণ পবমহংসদেবের স্ত্রীর কাছে রেখে দিন, তাহলে খাব।'[৮] বাড়িতে পিস্তল লুকিয়ে রাখার অপরাধে দুকড়িবালার সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল, তিনিও বেশি লেখাপড়া শিখতে পারেননি কিন্তু তাঁর ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত গ্রন্থ সংগ্রহে ছিল গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, পাঁচ খণ্ড কথামৃত ও স্বামীজীর রচনাবলী। মাতঙ্গিনী হাজরা শিক্ষার কোনও সুযোগ পাননি কিন্তু এই নিষ্ঠাবতী বিধবার জীবনে তমলুকের রামকৃষ্ণ মিশন এবং সেখানকার সাধুদের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগ দেননি তাঁরাও আপন আপন পুত্র-কন্যার অন্তরে দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধাসঞ্চারে সাহায্য ক'রে স্বামীজীর ধর্মকে কেন্দ্রে রেখে জীবন গড়ার শিক্ষাকে সফল করে তুলেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার স্কুলে পড়তেন নির্ঝরিণী সরকার। তিনি জানিয়েছেন, ভগিনী কিভাবে মেয়েদের পড়াতেন। তাদের জীবন গঠনের জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, তিনি তাদের মনে ভারতীয় নারীর ত্যাগ, নিষ্ঠা, ভক্তি, সেবাপরায়ণতা, আশ্রিতবৎসলতা ও সরলতা বজায় রাখার চেষ্টা করতেন, উৎসাহ দিতেন দেশীয় শিল্প পুনরুদ্ধারে আবার একই সঙ্গে শিক্ষা দিতেন মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসতে এবং স্বাবলম্বনের শক্তি অর্জন করতে। 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় হতেই যে মেয়েদের এই বলবৃদ্ধি ও আত্মচেতনা বিকাশের বীজ বপন প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, তার আর ভুল নাই।'[৯] নির্ঝরিণী এবং তাঁর জননী সরলবালা সরকারের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগ ছিল এবং দুজনেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, নির্ঝরিণী কারাবরণও করেন। আসলে এঁরা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনার শরিক নন, সমগ্র দেশেই তখন শুরু হয়েছিল অভূতপূর্ব জনজাগরণ। ভগিনীর কাজের ভার নিয়েছিলেন সুধীরা বসু। স্বামীজীর পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহতই রইল। সেজন্য এদেশের নারীজাগরণের প্রকৃত ইতিহাসে স্বামীজীর ধর্মমহাসভায় যোগদানকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়।

সামাজিক পরিস্থিতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সমাজ ও নারীমনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে অনেক দিন আসীন ছিলেন একজন নারী। সেই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগাযোগ ছিল বহুদিনের, তিনি নিজেই জানিয়েছেন ঃ "আমার জীবনদর্শন আমাকে শিখিয়েছে যে, মানুষ নিজে কিছু নয়, আসল ব্যাপার হচ্ছে নানা ঘটনা, নানা পরিবেশ, নানা আন্দোলন, যা তাকে তৈরী করে তোলে।

সে যে একটা কিছুর অংশ, এটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমার এই জীবনদর্শনের ওপর বেদান্তের প্রভাব আমি স্বীকার করি। স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে বলি, আমার মা বস্তুত সেখানে দীক্ষাই নিয়েছিলেন, আর আমার ওপরে আমার মায়ের প্রভাব অনেকখানি।"[১০] মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও তিনি বেলুড় মঠে এসে ভরত মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (২৬.৮.১৯৮৪)। হয়তো খুঁজলে আরও বহু সফল নারীর জীবন-ইতিহাসে তাঁদের জীবনের প্রেরণা ও আদর্শের ভিত্তিভূমি হিসাবে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা খুঁজে পাওয়া যাবে।

আধুনিক নারীদের সঙ্গে স্বামীজীর সমসাময়িক সমাজ ও নারীর কোনও মিল নেই। স্বামীজী নারীর অবনতির অন্যতম কারণ হিসাবে দায়ী করেছিলেন 'প্যানপ্যানে শিক্ষাব্যবস্থা'কে। আজকের নারী অনেক বেশি আত্মনির্ভর, সাহসী। যেখানে যেখানে শিক্ষার আলো যথাযথভাবে পৌঁছেছে সেখানেই নারী অসামান্য কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে নারী তুলনামূলকভাবে সৎ, কর্মঠ এবং পরিশ্রমী। ভারতে এখনও তাঁদের প্রতিযোগিতা পুরুষের সঙ্গে অর্থাৎ নারীর জীবনে নিজস্ব আদর্শ ও প্রেরণা থাকলেও সামাজিক পরিস্থিতি যেহেতু পুরুষের অনুকূলে সেজন্য পুরুষের অনুকরণের আগ্রহ অনেক সময় লক্ষিত হয়—সেগুলিকে অবশ্য সাময়িক ফ্যাশান হিসাবেই গ্রহণ করা যায়, যখন দেখি সেই পরানুকরণকারিণীরাই সংসারজীবনে প্রবেশ করে নিজেদের পিতামহী এবং জননীর মতোই সকলের সুখে সুখী হচ্ছেন। আজও আমাদের অস্থির সমাজ প্রমাণ করে, জাগতিক সুখকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য মানুষ কোথাও সুখে নেই। বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, মানুষ মহাকাশের রহস্য উন্মোচন করতে পারছে কিন্তু শুধুমাত্র বহির্মুখী মন আপন সন্তানের মানসিক মানচিত্রের খবর রাখতে পারছে না। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্যও আমাদের খুঁজে নিতে হচ্ছে স্বামীজীর আদর্শ এবং শিক্ষানীতিকে। এ ব্যাপারেও নারীরাই বেশি তৎপর। অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বরনির্ভরতা সবার মধ্যে রয়েছে। আধ্যাত্মিক চিন্তায় তাঁরা কতখানি উন্নতি করতে পেরেছেন সেকথা বলা সম্ভব না হলেও ঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজী তাঁদের আকৃষ্ট করেন নানাভাবে। যতই যুক্তিবাদী ও উগ্র আধুনিকা হোন, মানসিক গঠন অনুযায়ী কোনও নারী ভাবতে চান না, 'আমার কেউ নেই' বরং একটি পরমাশ্রয়ের নিবিড় বিশ্বাস তাঁকে ভেঙে পড়তে দেয় না। সম্ভবত সেজন্যই স্বামীজী ধর্মকে কেন্দ্রে রেখে নারীশিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন অথবা বলা চলে, সামাজিক জীবনযাপন বা কল্পনার ক্ষেত্রে কোনও পূর্বনির্ধারিত নিয়মের কাছে এবং নিজের প্রবণতার কাছেও নারীকে যাতে কোনও নতিস্বীকার করতে না হয় তারই পথ দেখিয়েছিলেন।

আমরা ভারতীয় নারীদের বন্ধন ও অসহায়তার কথাই শুধু মনে রাখি কিন্তু বিশ্বের সর্বত্র নারী নানাভাবে অসুবিধা ভোগ করেন। মার্কিন নারীদের জীবনেও বহু বাধা এবং অপূর্ণতা রয়েছে যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা স্বাধীন এবং মুক্ত বিহঙ্গীর মতো স্বচ্ছন্দ। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যই সব নয়। আমরা জানি জাপানের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল। নারীরা কর্মঠ, ধনী, পুরুষের সঙ্গে সব কাজ সমান অংশীদার হিসাবে ভাগ করে নিয়েছে। দেখে মনেও হয় না তাদের জীবনে কোনও অধিকার সম্বন্ধে দাবি বা প্রয়োজন আছে কিন্তু এই জাপানের নারীশ্রমিকরাই ধর্মঘট করেছিলেন কয়েকটি মৌলিক অধিকার পাবার জন্য, তার

মধ্যে প্রথমটি ছিল 'ভালবাসার অধিকার' পাওয়া। তাঁদের আহার-বাসস্থান-প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক বস্তু সবই ছিল কিন্তু কারখানার উৎপাদনরক্ষার প্রয়োজনে তাঁদের ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত যাতে তাঁরা প্রেম বা বিবাহিত জীবনযাপনের জন্য কোনও সময় বা সুযোগ না পান।[১১] ভারতের শ্রমিক নারীদের অবস্থা কোনও সময়েই ভাল ছিল না। পূর্বে আমরা যাদের কথা কখনও ভাবিনি, স্বামীজী তাদের কথা ভেবেছিলেন। পরে মহাত্মা গান্ধীও অনুন্নত সমাজের কল্যাণ চিন্তায় তৎপর হন। শ্রমিকসমাজে নারী সবসময় পুরুষের সহকারিণী হয়ে কাজ করেছে, লোকবিশ্বাস তৈরি করে তাদের স্বয়ম্ভর হতে বাধা দেওয়া হয়েছে— যেমন, নারীকে লাঙলে হাত দিতে নেই, তাঁতের মাকুতে হাত দিতে নেই, কুমোরের চাকে হাত দিতে নেই ইত্যাদি ইত্যাদি; বাকি সব কাজ করে সে পুরুষের সহায় হতে পারে অর্থাৎ ক্ষেতে রোপনের কাজ, ফসল ঝাড়ার কাজ, সুতো কাটা, তাঁতের আনুষঙ্গিক কাজ, মাটি মাখা প্রভৃতি কাজ। অথচ সব কাজ শিখে গেলে নারী যে নিজেই সমস্ত কাজ করতে পারত তাতে সন্দেহ নেই। প্রতিটি পেশায় এই ধরনের লোকসংস্কার এক এক অঞ্চলে তৈরি করা হত। এদের মধ্যেও এবার সেই পরিবর্তন আসছে। শ্রমিক নারীরা শুধু তাঁত বোনা, ক্ষেত চাষ করা নয় অন্যান্য সব কাজও শিখছেন সামাজিক ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে। তাঁরা যে কতখানি অধিকার সচেতন হয়েছেন সেকথা বোঝা গেল বুদ্ধগয়ায় ভূমির অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনে। ইতিপূর্বে শ্রমিক নারীরা যোগ দিয়েছিলেন তেভাগা আন্দোলনে এবং সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের সাফল্যের অংশীদারও হয়েছিলেন, সেটিও তাঁদের জাগরণের অন্যতম পরিচয়। এবারের আন্দোলনে তাঁরা আরও সচেতন হয়ে দাবি করলেন ভূমির অধিকার। তাঁরা চাষ করেন তবে তাঁদের নামে কেন জমি থাকবে না? বালিযাদেবী শিশুকন্যাকে কোলে নিয়েই শ্লোগান তুললেনঃ 'জমিন কেনকার, জোটে ওনকার' অর্থাৎ জমি কার যে চাষ করে তার এবং এবার তাঁদের বিরোধিতা করলেন তাঁদেরই প্রিয়জনেরা। পুরুষেরা চেয়েছিলেন জমির অধিকার, শ্রমিক নারীরা দিতে সম্মত হননি।[১২] এঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছিল, এঁরা যে সম্পত্তির বা ভূমির অধিকার পেয়েই স্বেচ্ছাচারিণীর জীবনযাপন করার কথা ভেবেছেন তা নয় বরং সংসারের বন্ধন দৃঢ় করার এবং সন্তানদের দু-মুঠো খাদ্য ও একটু শিক্ষা দেবার কথাই চিন্তা করছেন। আসলে সবার জীবনসংগ্রামের সঙ্গেই মিশছে আত্মসম্মানের প্রশ্ন। বহুদিন এঁদের ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহার করেছেন অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ব্যক্তিরা, সেসব প্রলোভনের হাতছানিকে এঁরা অগ্রাহ্য করছেন ধর্মকে আঁকড়ে ধরে। যদিও এই ধর্মবোধ সবসময় গভীর নয়, চিরাচরিত লোকাচারের সঙ্গে জড়িত তবু একে অস্বীকার করা চলে না। উপযুক্ত শিক্ষা স্ফুরণ ঘটাতে পারে এঁদের মধ্যে। স্বামীজী এই সর্বাত্মক জাগরণের স্বপ্নই দেখেছিলেন।

যদিও আজকের নারীর সামনে শিক্ষার সবরকম দ্বার উন্মুক্ত, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা হয় তৎসত্ত্বেও অস্বীকার করা যায় না ভারতের নারীরা তাঁদের যথাযোগ্য শিক্ষালাভের ক্ষেত্রটি এখনও পুরোপুরিভাবে খুঁজে পাননি। উপযুক্ত শিক্ষা আধুনিকা কিশোরী এবং শ্রমের ক্ষেত্রে নিয়োজিতা দরিদ্র কিশোরীর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে। উভয়েই এখন অস্থির, স্বাধীনচেতা, কোনও বড় কাজ করার জন্য সাহসের সঙ্গে পথ খুঁজে চলেছে। সেই পথের সন্ধান সম্ভবত দিতে পারেন শুধু তাঁরাই যাঁরা শ্রীশ্রীমাকে

কেন্দ্র করে স্বামীজীর আদর্শে নিজেদের জীবন গড়েছেন। কারণ আমরা স্বামীজীর মুখে শুনেছি, 'একজন ব্রহ্মজ্ঞ নারীর প্রভাবে হাজার হাজার নারী জেগে উঠতে পারে; অগ্রসর হতে পারে সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতালাভের পথে।'

পরিশিষ্ট □ এক

শিকাগো ধর্মমহাসভায় (১৮৯৩) অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিনিধিদের মূল বক্তৃতার অংশবিশেষ

[Excerpts from the speeches delivered at Chicago in 1893]

President Charles Carroll Bonney *(Inaugural address)*

Worshippers of God and Lovers of Man,

Let us rejoice tht we have lived to see this glorious day, let us give thanks to the eternal God whose mercy endureth forever, that we are permitted to take part in the solemn and majestic event of a World's Congress of Religions The importance of this event, its influence on the future relations of the various races of men, cannot be too highly esteemed

If this Congress shall faithfully execute the duties with which it has been charged, it will become a joy of the whole earth, and stand in human history like a new Mount Zion, crowned with glory and marking the actual beginning of a new epoch of brotherhood and peace.

For when the religious faiths of the world recognize each other as brothers children of one Father, whom all profess to love and serve, then, and not till then, will the nations of the earth yield to the spirit of concord and learn war no more

It is inspiring to think that in every part of the world many of the worthiest of mankind, who would gladly join us here if that were in their power, this day lift their hearts to the Supreme Being in earnest prayer for the harmony and success of this Congress To them our own hearts speak in love and sympathy of this impressive and prophetic scene

In this Congress the word 'Religion' means the love and worship of God and the love and service of man

* * *

As the finite can never fully comprehend the infinite, nor perfectly express its own view of the Divine, it necessarily follows that individual opinions of the Divine nature and attributes will differ But properly understood, these varieties of view are not causes of discord or strife, but rather incentives to deeper interest and examination. Necessarily God reveals Himself differently to a child than to a man , to a philosopher than to one who cannot read Each must see God with the eyes of his own soul Each must behold Him through the coloured glasses of his own nature Each one must receive Him according to his own capacity of reception The fraternal union of the religions of the world will come when each seeks truly to know how God has revealed Himself in the other, and remembers the inexorable law that with what judgment it judges, it shall itself be judged.

The religious faiths of the world have most seriously misunderstood and mis-judged each other from the use of words in meanings radically different from those which they were intended to bear, and from a disregard of the distinctions between appearances and facts ; between signs and symbols and the things signified and represented. Such errors, it is hoped that this Congress will do much to correct and to render hereafter impossible.

* * *

This day the sun of a new era of religious peace and progress rises over the world,

dispelling the dark clouds of sectarian strife.

* * *

Pratap Ch. Majumdar

Mr. President, Representatives of Nations and Religions—

I told you the other day that India is the mother of religion—the land of evolution. I am going, this morning, to give you an example or demonstrate the truth of what I said. The Brahmo Samaj of India, which I have the honor to represent, is that example. Our society is a new society ; our religion is a new religion, but it comes from far, far antiquity, from the very roots of our national life, hundreds of centuries ago.

Sixty-three years ago the whole land of India—the whole country of Bengal was full of a mighty clamour. The great jarring noise of a heterogeneous polytheism rent the stillness of the sky. The cry of widows , nay far more lamentable, the cry of those miserable women, who had to be burned on the funeral pyre of their dead husbands, desecrated the holiness of God's earth.

* * *

Amid the din and clash of this polytheism, amid all the darkness of the times, there arose a man, a Brahman, pure bred and pure born, whose name was Raja Ram Mohan Roy. In his boyhood he had studied the Arabic and Persian ; he had studied Sanskrit...and he had made a journey to Tibet and learned the wisdom of the Llamas.

Before he became a man, he wrote a book proving the falsehood of all polytheism and the truth of the existence of the living God This brought upon his head persecution.

* * *

In 1832 he travelled to England. .and in 1833 he died and his sacred bones are interred in Brisco.

* * *

The Brahmo Samaj founded (this) monotheism—the existence of one true living God—on the principles of the Vedas and the Upanishads.

All societies, all churches, all religious movement have their foundation not without but within the depths of the human soul. Where the basis of a church is outside, the flood shall rise, the rain shall beat, and the storm shall blow, and like a heap of sand it will melt into the sea. Where the basis is within the heart, within the soul, the storm shall rise and the rain shall beat and the flood shall come, but like a rock it neither wavers nor falls. So that movement of the Brahmo Samaj shall never fall. Think for yourselves, my brothers and sisters, upon what foundation your house is laid

In course of time, as the movement grew, the members began to doubt whether the Hindu Scriptures were really infallible. They asked—'Upon what principles shall our religion stand ? Upon what book shall true religion stand ? And in 1861 we published a book in which extracts from all Scriptures were given as the book which was to be read in the course of our devotions.'

Our monotheism, therefore, stands upon all Scriptures.

* * *

The Brahmo Samaj, therefore, next laid its hand upon the reformation of society. In 1851 the first inter-marriage was celebrated. Inter-marriage in India means the marriage of persons belonging to different castes. Caste is a sort of Chinese Wall that surrounds every household, and every little community, and beyond the limits of which no audacious man or woman shall stray. In the Brahmo Samaj we asked, 'Shall this Chinese Wall disgrace the freedom of God's children forever ?' Break it down, down with it and away.

Next my honored leader and friend, Keshub Chunder Sen, so arranged that marriage between different castes should take place. The Brahmins were offended. ... But inter-marriage took place and widow marriage took place.

* * *

After the end of the work of our social reform, we were led into a giet subject—into the subject of personal purity and the holiness of the soul. What about our acceptance before the awful tribunal of the God of infinite justice ? What will make man what he was, the immaculate child of God, as Christ was ? Devotion only, prayer, direct perception of God's spirit, communion with Him, absolute self-abasement before His Majesty , devotional fervour, devotional excitement, spiritual absorption, living and moving in God—that is the secret of personal holiness.

The last principle I have to take up is the progressiveness of Brahmo Samaj

Christianity declares the glory of God , Hinduism speaks about His infinite and eternal excellence Mohammedanism with fire and sword proves the almightiness of His will Buddhism says how joyful and peaceful He is ... But the Brahmo Samaj accepts and harmonizes all these precepts, systems, principles, teachings and disciplines and makes them into one system, and that is his religion

* * *

I come as a disciple, as a follower, as a brother May your labours be blessed with prosperity

The Theology of Judaism

As far back into the twilight of myths, the early dawn of human reason, as the origin of religious knowledge was traced, mankind was in possession of four dogmas

These four dogmas are

(i) There exists—in one or more forms of being—a superior being, living, mightier and higher than any other being known or imagined (Existence of God)

(ii) There is in the nature of this superior being, and in the nature of man, the capacity and desire of mutual sympathy, inter-relation and inter-communication (Revelation and Worship)

(iii) The good and the right, the true and the beautiful, are desirable , the opposites thereof are detestable and repugnant to the Superior Being and to man (Conscience, Ethics and Aesthetics)

(iv) There exists for man a state of felicity or torment beyond this state of mundane life (Immortality, Reward or Punishment).

These four dogmas of the human family are the postulates of all theology of theologies, and they are axiomatic They require no proof for what all men always knew, is self-evident , and no proof can be adduced to them, for they are transcendent All systems of theology are built on these four postulates.

* * *

Judaism is the complex of Israel's religious sentiments ratiocinated to conceptions in harmony with Jehovistic God-cognition

These conceptions made permanent in the consciousness of this people are the religious knowledges which form the sub-stratum to the theology of Judaism. The Thorah maintains that its ' teaching and canon are divine." Man's knowledge of the true and the good comes directly to human reason and conscience from the Supreme and Universal reason, the absolutely true and good , or it comes to him indirectly from the same source by the manifestations of nature, the facts of history and man's power of induction.

* * *

All knowledge of God and His attributes, the true and the good, came to men by successive revelations

These revelations concerning God and His substantial attributes ... are recorded in the Thorah in the seven Holy Names of God to which neither prophet nor philosopher in Israel added even one, and all of which constantly recur in all Hebrew literature. ...

Horin Toki

Bhagavat Setyammie taught three yanas or vehicles for the conveyance of the truth—the preliminary yana, Hinayana or the small vehicle and Mahayana or great vehicle. The grand

intellect and great humanity of Bhagavat enabled him to teach according to the capacity of mankind.

* * *

These yanas are the streams befitting mankind flowing out from the whole Buddhist Sea. .. and as these streams of triyana finally empty again into their great source, the Ocean of Buddhism, the length and depth of them ought not to be discussed.

* * *

The preliminary yana contains 'Deva-sutra' and by it five moral precepts were instructed. They are—"Not to kill, not to steal, not to commit adultery, not to talk in immoral language and not to drink intoxicating liquors."

* * *

The Hinayana is the doctrine contained in 'Agma-sutra' with others.

* * *

Mahayana is taught in 'Saddhama-Pundarika-sutra', 'Suramgam-sutra' ... ... etc... This is the Northern Buddhism which is especially elucidated in Japan.

Mahayana does not exclude Hinayana and together they are called Ekayana.

* * *

We believe that finally these two views will come together without any contest according to the development of the human intellect and the progress of science.

Buddhism claims that there is no beginning and no end in all things ... Now all things are without beginning or end in their reality, therefore, a Creator without beginning or end is superfluous

* * *

Buddhism claims that all beings, both sensible and senseless, have the nature of Buddha ; therefore, man, lower animals, plants etc., are said to have the Buddhistic nature—that is, the essential Spirit in full completeness. But they seem entirely different from each other by their various forms of development on the physical plane, inspite of their having the same spirit

* * *

Buddhism enlightens all beings and makes them Buddha .. to become Buddha means to reach the state of perfect development or the virtue and power of Buddha inherent in ourselves

* * *

The especial characteristics of Buddhism are humanity and patient forbearance, therefore the aim of it is to help all beings to develop the nature of Buddha with the deepest sympathy and tenderest humanity.

* * *

Buddhism teaches the right path of cause and effect. ... . .. No pain and pleasure will come from without, but they are only the effect felt like the sound or shadow of good or bad action produced by the mind of ourselves.

The meditation in Buddhism is to call out the mysterious and tremendous force from the pure and absolute truth in the universe.

* * *

The prayer, the worship and the truth of Buddhism fill the universe , therefore to pray and to worship a symbol is not the idea , but in the case where a symbol is used it is only the means to make clear and pure the minds of those who are not yet fully enlightened. ... In Buddhism it is believed that ... ... the soul transmigrates through three ages, that is, past, present and future. .... Buddhism demonstrates 'Nirvana' ; this is a great source of truth and may be called the pinnacle of the Unknowable.

* * *

Mohammed Webb

I wish I could express to you the gratification I feel at being able to appear before you

today, and that I could impress upon your minds the feelings of millions of Mussalmans in India, Turkey and Egypt, who are looking to this Parliament of Religions with the deepest, the fondest hope.

* * *

I have been requested to make a statement, very briefly, in regard to something that is considered universally as part and parcel of the Islamic system.

Now let us see what the word Islam means. It is the most expressive word in existence for a religion. It means simply and literally resignation to the will of God. It means aspiration to God. The Moslem system is designed to cultivate all that is purest and noblest and grandest in the human character

* * *

With this spirit of resignation to the will of God is inculcated the idea of individual responsibility that every man is responsible not to this man or that man, or the other man, but responsible to God for every thought and act of his life. He must pray for every act that he commits , he is rewarded for every thought he thinks There is no mediator, there is no priesthood, there is no ministry.

The Moslem brotherhood stands upon a perfect equality, recognizing only the fatherhood of God and the brotherhood of man The Emir who leads in prayer, preaches no sermon. He goes to the mosque everyday at noon and reads two chapters from the holy Koran. He descends to the floor upon a perfect level with the hundreds, or, thousands of worshippers, and the prayer goes on, he simply leading it The whole system is calculated to inculcate that idea of perfect brotherhood

* * *

The wisdom of Mohammed was apparent in the single item of prayer. He did not say, "Pray when you feel like it," but, "Pray five times a day at a certain time ".The Mussulman rises in the morning before daylight, because his first prayer must be said before the first streaks of light appear in the east. At just the first trace of dawn he sinks upon his knees and offers his prayer to God. The prayer can be said at no other time That is the time to say it The result is he must get up in the morning to do it It encourages early rising.

* * *

His next prayer is said between twelve and one o'clock, or just as the sun is passing the meridian, at no other time. The third prayer is between four and five o'clock. The fourth prayer is just as the sun has sunk in the west. The light of the day is dying out. The last prayer of the day is repeated just before he steps into bed.

* * *

Now before that man says a prayer he must wash himself—he performs his ablutions. The result is that an intelligent Mussulman is physically clean.

* * *

Caste line are broken entirely. . . . . The idea was taught "Your slave is your brother." Social conditions make him your slave, but he is nonetheless your brother. This idea of close fraternity, this extreme devotion to fraternity, was the cause of the Moslem triumph at arms........... it was only when that bond of fraternity was broken that we find the decadence of the Islamic power.

* * *

In closing I want to say this : that there is no system that has been so wilfully and persistently misrepresented as Islam. ... I feel that Americans, as a rule, are disposed to go to the bottom facts, and to ascertain really what Mohammed really was and what he did and when they have done so I feel that we shall have a universal system which will elevate our social system at least to the position where it belongs. I thank you.

* * *

P. Goro Kaburagi

"Shinto" means "the way of God." The religion was formed in "the land of great peace" (Japan) and teaches one eternal God, too honourable to receive homage or prayer directly. He must be addressed through inferior gods. In his temple is neither picture nor image. The temples are extremely simple, standing generally in some sequestered site. The books comprise 'Kojiki' compiled A.D. 712. Nihongi and Manyoshin, the latter two nearly as old and valuable as the first. The language is ancient Japanese ; hence the common people cannot understand them. Shintoism observes an impressive sacrifice, but its god does not accept dead animals.

There is a ceremony called Yu-Kagura i.e., "making-the-gods-pleasing (?) ceremony of the hot water." This act pleases the gods, and takes away their inequities.

* * *

Formal prayer is not of much importance, but believers observe prayer services. Confession of sin is made, and the wrath of the Highest Being averted The emperor is the representative of the entire nation and must therefore be its model. So our sovereigns have always worshipped the gods in person, and prayed that their people might enjoy sufficiency. In the six and twelfth months the people assemble at the rivers, wash and pray and by general purification purge the nation of offence and pollution. This is the most striking characteristic of Shinto.

* * *

Punishment of evil-doers and reward for the just are strictly observed in Shinto. Yet many superstitions were practised If Shinto has a dogma, it is purity. The very idea is carried out in many ceremonies

* *

Shintoism possesses three divine regalia, the mirror, the sword and the seal.

* * *

Shinto teaches that all men were born of the sun-goddess, acknowledges a heaven, but has no hell. The soul cannot be defiled The flesh can, and God punishes sins in the flesh Death is the highest punishment and through it the soul escapes punishment and pollution. But Shinto has no theology, every Shintoist forming his own. It is dying, not because of its weakness but because a better religion has appeared—the teaching of Jesus. Christianity is the rising sun of Japan.

* *

Selections from 'A Sketch of Zoroastrianism' prepared by the Parsees of Bombay:

(Zoroastrianism has, perhaps, stronger claims on our interest than Islam, Buddhism, Brahmanism or Confucianism.) It flourished originally in Afghanistan, eastern Persia and adjacent districts ; under the Achaemenians it extended to western Persia, and under the Sassanians it influenced Asia Minor and Egypt Its founder was Zarathushtra Spitama, an authentic personage who lived not later than B.C 1200. He was philosopher, poet and prophet. He suffered persecution on account of the reform he promulgated. In opposition to the Daeva-worship, the pre-historic polytheism of the forefathers of Hindus and Iranians, Zoroaster named his religion Mazda-worship, Mazda being the Parsee name of God. Other reformers had previously struggled against Daeva-worship, but it was Zoroaster who succeeded in extirpating it. His religion teaches the worship only of one true God, and every Zoroastrian makes this confession of faith : "I confess myself a worshiper of Mazda, a follower of Zoroaster, an opponent of false gods, and subject to the laws of Lord." Thus Mazda worship in the Avesta is emphatically termed the good religion, and it elevates Zoroaster alone to the worshipful beings. This distinction is conferred only upon divine ones, and never upon another man throughout the Avesta.

The extant scriptures of Zoroastrianism consists of the Zend-Avesta, 'Zend' meaning

'commentary' and 'Avesta , text It is a collection of writings by several authors at different times The present form is a later arrangement for liturgic purpose The text contains two groups of compositions—(1) The Yasna, including the five Gathas or sacred songs of Zoroaster himself , (2) The Visparad, Vendidad and Korden Avesta Only the Gathas originated with Zoroaster , the rest are the compositions of priests after his death, but not later than B C 559 In the Gathas we find Zoroaster in flesh and blood, preaching pure monotheism and lofty morality Nearly every stanza contains one or more names of God either his proper name Ahura-Mazda, or one of his six appellations called holy immortals Later than the Gathas is the book of sacrificial or liturgical prayers called Yasna, to be recited at ceremonies The Visparad consists of invocations to all chiefs of creations, virtues etc It is never recited alone, but with parts of Yasna at higher ceremonies The Vendidad comprises laws against evil and impure beings or things The Khoren-Avesta is a smaller collection of miscellaneous pieces

* * *

TAOISM

(A Prize Essay)

Taoism and Confucianism are the oldest religions of China Taoism originated with the originator of all religions He transmitted it to Laotsze who was born in the Chow dynasty (about B C 604), was contemporary with Confucius and kept the records His Tao Teh King' treats of the origin and philosophy of nature of the mystery behind and above the visible universe in order to educate the ignorant In time Taoism divided into four schools

After ten generations these schools became one again At present Taoism has a northern and southern branch

If Taoists seek Taoism s deep meaning in earnest and put unworthy desires aside they are not far from its original goal But in after generations the marvelous overclouded this Taoists left the right way and boasted wonders of their own from the time Taoism ceased to think purity and peaceableness sufficient to satisfy man it became the genii religion (magic and spiritualism); though still called Taoism

Finally Chang Lu (A D 385-582 ?) used charms in his teaching, and employed fasting prayer, hymns and incantations to obtain blessings and repel calamities

Taoism regards heaven as its Lord and seeks to follow heaven s way those who carry out heaven's will are able to fulfill their duties as men Those who really study religion cultivate their spiritual nature and preserve their souls gather up their spiritual force, and watch their hearts They believe that if the spiritual nature be not nurtured it daily dwindles , if the spiritual force be not exercised it is dissipated daily if the heart be not watched, it is daily lost Taoism though considering purity fundamental adds patience to purity and holds to it with perseverance overcomes the hard with softness, and the firmest with readiness to yield Thus Taoism attains a state not far from man s original one of honesty and truth without becoming conscious of it

Comprehension of the hereafter is one of the mysteries in which no religion can equal Taoism The living force in my body fills space influences everything and is one with creation If we can in reality attain to it, we are able to know spirits in the dark domain Taoism and genii religion have deteriorated Taoists only practise charms read prayers, play on stringed or reed instruments, and select famous mountains to rest in They rejoice in calling themselves Taoists, but few carry out the true learning of the worthies Oh ! that one would arise to restore our religion Would not that be fortunate for our religion ?

Genesis and Development of Confuçianism — by Dr Ernest Faber, Shanghai

Confucianism comprises all the doctrines and practices acknowledged by his best followers

during 2400 years. It has become the characteristic feature in the life of China. It is the key to deeper understanding of China and the Chinese. Confucius professed to be only a transmitter. He received his ideas from ancient records. He published what suited his purpose in the five Sacred Books.

* * *

Confucianism has its roots in antiquity ; it branched from the ancient stream, Taoism representing ancient China in its principal features. The elements of Confucianism go back centuries before Confucius. The religious features of Confucianism were these : Mankind was regarded as subject to a superior power called heaven, the Supreme ruler Shang-Ti or God. Under him many minor deities ruled as ministering spirits over lesser or larger spheres. A multitude of spirits roamed about, evil spirits causing all evil... .. sacrifices were offered to propitiate the higher beings .. ... . Under the Chow dynasty (B.C. 1123 ?) ancestor-worship became the prominent religious service.

* * *

Confucius and his works :

He was of superior moral character. His aim was political

* * *

In his moral teaching man is principally a political being on a basis of social relations.

* * *

The Chinese Empire is visible heaven on earth. Its emperor is the only begotten son of heaven, holding power over earth as his right. Like the laws of nature, his laws are laws of heaven, every transgression causing evil consequences. Return to the right path restores harmony. Religion is subordinated to government

* * *

All his fundamental views (except that of woman) were optimistic. Human nature is the same in every man. Each can become a sage, no excuse being allowed for failure . . ...

Confucius laid down the 'lex talionis' in its fullest extent and the bad effects are evident even in the present. Yet he is the greatest Chinese teacher, the embodiment of all ideals of Chinese character. China worships Confucius as her teacher

Modern Confucianism :

The Confucian constitution of China has changed. In parts of China ruin is everywhere. Splendid temples and monasteries number hundreds of thousand, but the majority of the people living near, are poor and sunk in vice

* * *

But the rail-road and steam ship and electric light would make Confucius say : The spirit of the ancients now appears in western lands, as millenniums ago in China. All who honour my name ! The people of the west are in advance of you, as the ancients were of the rest of the world. Learn what they have good ; correct their evil by what you have better. This is my meaning in the great principle of reciprocity

* * *

Whatever theory or practice is contrary or contradictory to Israel's God-cognition can have no place in the theology of Judaism. It comprises necessarily :

The doctrine concerning Providence, the doctrine concerning atonement (Are sins expiated, forgiven or pardoned, and what are the conditions or means for such expiation of sins ?)

* * *

The doctrine concerning the human will (is it free, conditioned or controlled by human reason, faith or any other agency ?)

* * *

The duty and accountability of man in all his relations to God, man and himself, to his

nation and to his government and to the whole of the human family.

* * *

The doctrines concerning personal immortality, future reward and punishment, the means by which such immortality is attained, the condition on which it depends, what insures reward or punishment.

* * *

The Philosophy and Ethics of the Jains

— by Virchand A. Gandhi

. ... . The Jain canon may be divided into two parts : First, Shrute Dharma, i.e., philosophy ; and second, Chatra, i.e., Ethics.

. . ... The Jain canonical book treats very elaborately of the minute divisions of the living beings, and their prophets have, long before the discovery of the microscope, been able to tell how many organs of sense the minutest animalcule has. ... ... I shall now refer to the four states of existence. They are naraka, tiryarch; manushyra and deva. Naraka is the lowest state of existence, that of being a denizen of hell ; tiryarch is next. .. .. . . The third is manushyra ... ... and the fourth is deva, that of being a denizen of the celestial world. The highest state of existence is the Jain Moksha, the apotheosis in the sense that the mortal being by the destruction of all karman, and the soul being severed from all connection with matter regains its purest state and becomes divine . . . the Jains ... . distinctly re-affirm the view . ... that matter and soul are eternal and cannot be created. ... .

God, in the sense of an extra-cosmic personal Creator, has no place in the Jain philosophy It distinctly denies such Creator as illogical and irrelevant in the general scheme of the universe. But it lays down that there is a subtle essence underlying all substances, conscious as well as unconscious which becomes an eternal cause of all modifications, and is termed God

The doctrine of the transmigration of soul, or the re-incarnation is another grand idea of the Jain philosophy. The companion doctrine of transmigration is the doctrine of Karma . . 'Whatever a man soweth, that shall he also reap.' .. It solves the problem of the inequality and apparent injustice of the world. ...

Persons who by right faith, right knowledge and right conduct destroy all karman and thus fully develop the nature of their soul reach the highest perfection, become divine and are called Jinas. Those Jinas who, in every age, preach the law and establish the order, are called Tirthankaras

I now come to the Jain Ethics which direct conduct to be so adapted as to insure the fullest development of the soul — the highest happiness, that is the goal of human conduct, which is the ultimate end of human action. Jainism teaches to look upon all living beings as upon oneself. What, then, is the mode of attaining the highest happiness ? The sacred books of the Brahmanas prescribe devotion and karma. The Vedanta indicates the path of knowledge as the means to the highest. But Jainism goes a step farther and says that the highest happiness is to be attained by knowledge and religious observances. The five Maharatas or great commandments for Jain ascetics are : Not to kill, i e., to protect all life ; not to lie ; not to take that which is not given, to abstain from sexual intercourse ; to renounce all interest in worldly things, especially to call nothing as one's own

Christianity

E. L. Slater

"The best thought of India is not toward Hinduism, but toward Christ. ... (all that is best in Hindu humanity) ; all who are weary of their sin and are yearning for a something that Hinduism cannot give, will be surely drawn to him as steel to the magnet, as the magnet to the pole."

* * *

Rev. George E. Pentecost

"It is a great privilege to meet face to face in this Parliament the representatives of many

ancient religions and equally ancient philosophies ; to give to them a reason for the faith and hope that is in us, and show them the grounds upon which we base our contention that Christianity is the only possible universal religion."

* * *

Rev. B. Fay Mills

"Christ is the revelation of what God is and what man must become. He revealed the character of God as love suffering for the sins of man. ... he came not to save selected individuals nor any chosen race, but to save the whole world. ... He was a new and complete revelation of God's eternal suffering for the redemption of humanity. ... He was God. He became man. ... He was God and man, not two persons in one existence, but revealing the identity of man and God. ...

The blood of the world was poisoned, and needed an infusion of purity for the correction of its standards and bestowal of desire and power to attain unto its high possibility. ... He showed that the destiny of man was to be one with God.

Archbishop Rev. Dionysios Latas

"The original establishment of the Greek Church is directly referred to Jesus Christ and his apostles

* * *

In the old times there was a country which constituted a part of the then Old World, and which was called Greece. This country was gradually developed in such a manner as to arrive at the highest pitch of glory. ... For this reason the inhabitants of that happy land used rightly and properly to say : "Every one who is not a Greek is a barbarian "

* * *

But while at the time of Plato and Aristotle, Greek philosophy had arrived at the highest pitch, Greece at that very period of the great philosophers began, in every other respect, to decline and fall The old simple manners of the Greek religion, faith and reverence towards their tutelary gods .. began to change and disappear.

After the conquests by the Macedonians, the internal dissensions ... rendered impossible the political recovery of the nation.

In that state of agony they were finding a refuge in philosophy but from philosophy also came despair and dispassionateness of the so-called stoic philosophers, and on the other hand, the low and barbarious social condition which the self-sufficiency and materialism of the Epicurean philosophy ... presented before them. ... the distress and affliction of the people more and more increased and advanced and rendered stronger the desire of man for help from above Ancient gods had not any more the power to satisfy the inner demands of the souls of these man, and the introduction of new religions ... necessarily followed.

Amongst these Christianity was to prevail. Christianity was to undertake the struggle of acquiring sovereignity over the other religions, that it might demolish the partition walls, which separated races from races and nations from nations, and seek the fraternization of the different nations and peoples of all humankind, and the bringing of all men into one spiritual family in the love of one another, and in the belief of one supreme God. ... if the gate through which he (the son of God) passed was Palestine, still the field ... on which the Messiah was to sow the doctrines of his Gospel .. was the Greek nation. . . Though Christ, the Son of God is, as a man, a Jew, Christianity is Greek

* * *

Rev. J. R. Slattery

"In the eyes of the Catholic church the Negro is a man. .. Through Christ there is established a brotherly bond between man and man, people and people.

Our Christian advantages flow from our spiritual birth and adoption into the family of God. It is from truth that comes our dignity, not from colour or birth.

* * *

The bondman is a man, a moral being with a conscience of his own which no master

under any cloak may invade.

* * *

The Negro, then, is of the race of Adam, created by the same God, redeemed by the same Saviour and destined to the same heaven as the white.

['History of the Parliament of Religions', 1893 by Dr. J.H. Barrows]

পরিশিষ্ট □ দুই

উল্লেখপঞ্জী

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণসমূহে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিপ্রসঙ্গ

১। পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দ, মেরী লুইস বার্ক, (নতুন তথ্যাবলী) ভাষান্তর নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৬১

২। তদেব

৩। বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৯

৪। পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দ, মেরী লুইস বার্ক, পৃঃ ৭৮

৫। তদেব, পৃঃ ৭৯

৬। তদেব, পৃঃ ৯৭-৯৮

৭। তদেব, পৃঃ ৯৮

৮। তদেব, পৃঃ ১০১

৯। তদেব, পৃঃ ১১১

১০। Religion is not the Crying Need of India, C. W. vol. I

১১। পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দ, মেরী লুইস বার্ক, পৃঃ ১১২

১২। তদেব, পৃঃ ১১২-১১৩

১৩। তদেব, পৃঃ ১১৩

১৪। তদেব, পৃঃ ১১৪

১৫। তদেব

১৬। তদেব, পৃঃ ১১৬-১১৭

শিকাগো ধর্মমহাসভার পটভূমি*

সহায়ক গ্রন্থ

১। স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য), পত্রাবলী

২। Marie Louise Burke, 'Swami Vivekananda in the West, New Discoveries, vol

৩। নারায়ণ সান্যাল, জাপান থেকে ফিরে (বিশ্বমেলার ইতিহাস প্রসঙ্গে)

৪। তদেব, আজি হতে শতবর্ষ পরে

৫। বিশ্বপরিচয়, দেবসাহিত্য কুটির (বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে)

৬। ছোটদের বিশ্বকোষ, মডার্ন বুক এজেন্সী (সাহিত্য প্রেক্ষাপট)

৭। নিরঞ্জন ধর, বিবেকানন্দ অন্য চোখে

৮। Emile Burns, What is Marxism ?

৯। ধীমান দাশগুপ্ত, বিজ্ঞানের ইতিহাস ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
১০। স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকা, বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষে USIS প্রকাশনা
১১। সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী
১২। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড
১৩। মুক্তির সংগ্রামে ভারত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
১৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, মহেন্দ্রনাথ দত্ত
১৫। Prabuddha Bharata, Nov. 1989
১৬। বাহাউল্লাহ্ বাংলাদেশ জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ
১৭। হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ৩য় বার্ষিক যুব সম্মেলনে শ্রীমতী বাণী সামন্ত ও শ্রীমতী রমিতা চক্রবর্তীর বক্তব্যে এবং ঐ সংস্থার মুখপত্র 'সংগঠন' ১৭শ সংখ্যা
১৮। জুলে ভার্ন রচনাবলী
১৯। নারায়ণ সান্যাল, রোদাঁ

মানবমুক্তির সন্ধানে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ

১। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ৫ম সং ১৯৯১, পৃঃ ২০১
২। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ১২৩০
স্বামী বিবেকানন্দ, প্রমথনাথ বসু, ১ম ভাগ, ৪র্থ সং, ১৯৮৫, পৃঃ ১১৩
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, স্বামী প্রভানন্দ, ২য় খণ্ড, ১ম সং ১৯৮৭, পৃঃ ১৩৮
৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, স্বামী সারদানন্দ, ২য় ভাগ, ১৩৫৮, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩২২-৩২৩
৪। রামকৃষ্ণের জীবন, রোমাঁ রোলাঁ (অনুঃ ঋষি দাস) ৫ম সং, ১৯৮২, পৃঃ ১৯৫
৫। তদেব, পৃঃ ১৯৫-১৯৬
৬। বিবেকানন্দের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ (অনুঃ ঋষি দাস) ৬ষ্ঠ সং, ১৩৯৯, পৃঃ ১১
৭। রামকৃষ্ণের জীবন, পৃঃ ১৮৭
৮। বিবেকানন্দের জীবন, পৃঃ ১০
৯। তদেব, পৃঃ ৯
১০। তদেব, পৃঃ ১৩-১৪
১১। Spiritual Talks by the First Disciples of Sri Ramakrishna, Swami Turiyananda, 7th Imprn. 1991, pp. 245-246
১২। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮
বিবেকানন্দের জীবন, পৃঃ ১২
১৩। বিবেকানন্দচরিত, পৃঃ ৮৪ ; স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১২
যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৯
১৪। বিবেকানন্দের জীবন, পৃঃ ২০
১৫। দ্রঃ বিবেকানন্দচরিত, পৃঃ ৮৫ ; স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, পৃঃ ২২২ ; যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩-২৮৪
১৬। বিবেকানন্দের জীবন, পৃঃ ১৫
১৭। স্বামী তুরীয়ানন্দ, পৃঃ ২৯
১৮। The Complete Works of Sri Aurobindo, vol. 11, 1972, p. 37

হেলপরিবারে স্বামীজী

১। পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ, ভাষান্তর ঃ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ১ম সং, পৃঃ ২৫১
২। What ever happened to Mary Hale ? Swami Vidyatmananda, Prabuddha Bharata, vol. 90, No. 2, p. 62
৩। Swami Vivekananda in the West, Marie Louise Burke, vol. V, 3rd Ed, p. 114
৪। The life of Josephine Macleod, Pravrajika Prabuddhaprana, 1st Ed, p. 29
৫। Swami Vivekananda in the West, Marie Louise Burke, vol V, 3rd Ed, p. 177
৬। Ibid., vol. III, pp. 33-34
৭। Ibid., vol-V, pp. 114-115
৮। Ibid., p. 119.
৯। Letters of Sister Nivedita, Coll. & Ed : Shankari Prasad Basu, vol. I, 1st Ed., p. 239
১০। Ibid., p. 261
১১। Ibid., p. 296
১২। The life of Josephine Macleod, Pravrajika Prabuddhaprana, 1st Ed., p. 22
১৩। Swami Vivekananda in The West, Louise Burke, vol. VI, 3rd Ed ; p. 261
১৪। Letters of Sister Nivedita, Coll. & Ed : Shankari Prasad Basu, vol. I, 1st Ed., p. 479
১৫। Ibid., vol-II, 1st Ed. p-980
১৬। Ibid., p. 923

সারা জে ফার্মারের স্বপ্ন গ্রীনএকারের ধর্মশিবির

সহায়ক গ্রন্থ

১। Samvit (semi-annual journal of Sri Sarada Math), March & September nos, 1994-এ প্রকাশিত প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণার 'Sarah Farmer's Inspired Life'—I & II' নামে গবেষণামূলক প্রবন্ধ থেকে বহু নতুন তথ্য সংগৃহীত।
২। Letters of Swami Vivekananda
৩। Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Marie Louise Burke, Vol. II.

'ধীরামাতা' ও 'জো'

এই নিবন্ধের অধিকাংশ তথ্য শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'নিবেদিতা লোকমাতা' ১ম খণ্ড এবং প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণার Tantine : "The Life of Josephine MacLeod, friend of Swami Vivekananda" থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া সাহায্য নেওয়া হয়েছে স্বামীজীর বিভিন্ন প্রামাণ্য জীবনী, জীবনপঞ্জী, 'বাণী ও রচনা' আর 'নিবোধত' পত্রিকার আষাঢ় ১৩৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্বামীজীর ধীরামাতা' প্রবন্ধটি থেকে। নিবেদিতার পত্রাংশের তারিখ সহ উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'লোকমাতায়' প্রকাশিত অনুবাদের ভাষা গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ লেখকের সম্পাদিত দুই খণ্ডে Letters of Sister Nivedita-ও

আলোচনা করা হয়েছে। স্বামীজীর পত্রাংশগুলির ক্ষেত্রেও তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই ভিত্তিতেই স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' কিংবা পত্রাবলীতে খুঁজে পাওয়া যাবে, কেবল দুটি ক্ষেত্রে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে কারণ সে চিঠিগুলি এখনও অনূদিত হয়ে ঐ গ্রন্থদ্বয়ে স্থান পায়নি।

ডেট্রয়েটে স্বামী বিবেকানন্দ

১। Marie Louise Burke, Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Advaita Ashrama, Mayavati, 1983, Vol. I p. 287 (hereafter, N.D.)
২। Ibid., p. 289
৩। Ibid., p. 288
৪। Ibid., p. 290
৫। Ibid., pp. 298-302
৬। Ibid., pp. 325-26
৭। Ibid., pp. 329-30
৮। Ibid., p. 331
৯। Ibid., p. 331
১০। Reminiscences of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Mayavati, 1983, pp. 148-50 (hereafter, Reminiscences)
১১। N. D., vol. I, p. 308
১২। Ibid., pp. 311-12
১৩। Ibid., p. 313
১৪। Ibid., pp. 316-17
১৫। Reminiscences, p. 152
১৬। N. D. vol. I, p. 319
১৭। Ibid., pp. 321-24
১৮। Ibid., p. 334
১৯। Ibid., pp. 347-48
২০। Ibid., pp. 351-52
২১। Ibid., pp. 354-55
২২। Ibid., p. 364
২৩। Ibid., p. 378
২৪। Ibid., pp. 417-19
২৫। Ibid., p. 442
২৬। N. D. vol. IV, p. 28
২৭। Ibid., p. 14
২৮। Ibid., pp. 17-18
২৯। Ibid., pp. 25-26
৩০। Ibid., p. 44
৩১। N. D., vol. VI, p. 305
৩২। N. D., vol. I, p. 450
৩৩। Ibid., pp. 478-79

ক্রুশবিদ্ধ বিবেকানন্দ*

১। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ১৪৬-১৫০
২। কথামৃত ৩ পরিশিষ্ট—১
৩। লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম, পৃঃ ১৯৯-২১৩
৪। শতরূপে সারদা, পৃঃ ২১
৫। বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৭-১৭৬
৬। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ১৩৯-১৪১
৭। তদেব, ২য় খণ্ড, অপবাদ ও প্রতিকার অধ্যায়।
৮। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৯-২২৫
৯। বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪০৯-১০
১০। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৬-১১৭
১১। তদেব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮-১১৯
১২। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু. ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০২-২০৩
১৩। তদেব, পৃঃ ৩৯৭-৪০০
১৪। তদেব, পৃঃ ২৮৭
১৫। তদেব, পৃঃ ৩০৩
১৬। তদেব, পৃঃ ২১০-২১৩
১৭। তদেব, পৃঃ ৩৮৯-৩৯৩

এত বড় মহাপুরুষ, একাধারে এত গুণ...

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীম কথিত, অখণ্ড সং, (১৩৯৩), উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পৃঃ ১৮২
২। উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী-সংখ্যা, ১৩৭০ পৌষ, পৃঃ ৬
৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, পৃঃ ৬৫৭, ২৮, ১৬১, ১৮৩, ২৯৮, ২২৯, ২৫৪, ৩০৮, ৪২২, ৪৮৩, ৮৭৫, ৮৯২
৪। সৎকথা, স্বামী সিদ্ধানন্দ সংগৃহীত, (১৩৯০), উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১১৭, ১২০
৫। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, রোমাঁ রোলাঁ, অনুবাদকঃ ঋষি দাস (১৩৭৬) ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, পৃঃ ২, ৩
৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড (১৯৭৩) পৃঃ ১১, ১৩, ১৬, ১৮
৭। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত (১৩৭৯), উদ্বোধন কার্যালয়, ১৬শ অধ্যায়, শ্লোক ১—৩
৮। বিবেকচূড়ামণি—স্বামী বেদান্তানন্দ কর্তৃক অনূদিত, (১৩৭২), উদ্বোধন কার্যালয়, শ্লোক ৩
৯। কথামৃত, পৃঃ ১১১৭
১০। Man's Right to Knowledge, An International Symposium presented in Honour of the 200 Anniversary of Columbia University, 1754—1954, Ist series : Tradition and Change, New York 1954 ; The Ancient Asian View of man by Sir Sarvapalli Radhakrishnan, p. 12, 13 (Hereinafter only 'Man's Right').
১১। নবযুগের প্রবর্তনায় স্বামী বিবেকানন্দ, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় (১৯৯২), প্রাইমা পাবলিকেশন,

কলিকাতা, পৃঃ ৬৬
১২। The Phenomenon of Man by Teilhard de chardin. (1965), Ha per Torchbooks, New York, Introduction by Sir Julian Huxley, p. 19
১৩। নিবেদিতা লোকমাতা, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৪র্থ খণ্ড (১৪০১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃঃ ২০২
১৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড (১৩৮০), পৃঃ ১৯০
১৫। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, সম্পাদক : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, (১৩৯৫), রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, পৃঃ ৬২
১৬। জীবন্মুক্তি সুখপ্রাপ্তি (স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি ও কথাসংগ্রহ), ১৯৮৮, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ২৯, ৩০, ১০৭
১৭। স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ (১৯৮৬), উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১৪৬
১৮। স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়ন, স্বামী নিরাময়ানন্দ (১৯৮৩), উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ২৭, ২৮, ৩৯, ৮৯
১৯। স্বামী তুরীয়ানন্দ, পৃঃ ১৯২

বুদ্ধভাবনা ও বিবেকানন্দ

১। The Dialogues of Buddha, Pt – I
২। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পৃঃ ৫৯-৫২
৩। তদেব, পৃঃ ১১৫
৪। তদেব, পৃঃ ১২৯
৫। তদেব, পৃঃ ৫৭-৫৮
৬। মজ্ঝিম নিকায়, II
৭। প্রবুদ্ধ ভারত, ডিসেম্বর, ১৮৯৮

রাজা রামমোহন রায় ও স্বামী বিবেকানন্দ : একটি সমীক্ষা

সহায়ক গ্রন্থ

১। রামমোহন রচনাবলী—হরফ প্রকাশনী
২। Notes on some wandering with the Swami Vivekananda—by Sister Nivedita
৩। বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ
৪। তদেব, ৭ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ
৫। বাংলার নবজাগরণ—এ. পোদ্দার
৬। Thoughts on Vedanta
৭। Life & letters of R. Roy—S. D. Co.
৮। বেদান্ততত্ত্ব
৯। এশিয়াটিক সোসাইটি—বক্তৃতামালা

নবজাগরণে নববেদান্ত*

১। The New Encyclopaedia Britanica, Goetz W. Philip, (ed.) vol. 23, Macropaedia, 15th edition, 'Martin Luther', pp. 364-372.
২। স্বামী বিবেকানন্দ, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নবভারত পাবলিশার্স, ১ম সং, পৃঃ ৪৭
৩। তদেব, পৃঃ ৩৯
৪। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৭-৩৫৪
৫। স্বামী বিবেকানন্দঃ পেট্রিয়ট প্রফেট, ১ম সং, পৃঃ ১০
৬। Vivekananda, the Prophet of Human Emancipation, Santwana Das Gupta, 1st Ed., 1991
৭। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ১ম সং পৃঃ ৭
৮। Social Approaches to Vedic Culture, Benoy Kumar Sarkar, Prabuddha Bharata, vol. 40, Sept. 1935 pp. 430-437
৯। Paper on Hinduism C.W.I, p. 17
১০। The Philosophy of Man-making : a study in social and political ideas of Swami Vivekananda by Santilal Mukherjee, 1st Ed., 1971 pp. 1-45
১১। Ibid., pp. 49-59
১২। The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, Max Webber.
১৩। স্বামী বিবেকানন্দঃ মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ১ম সং, প্রস্তাবনা, পৃঃ ৮
১৪। তদেব, পৃঃ ৫৬
১৫। নিবেদিতা লোকমাতা, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম সং, ২য় খণ্ড।
১৬। Social Background of Indian Nationalism, A.R. Desai, 1st. Ed., pp. 69-75
১৭। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৫ম খণ্ড, বিশ্ববিবেক, পৃঃ ১৪২
১৮। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ভূমিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৭

লাহোর ট্রিবিউন পত্রিকায় বিবেকানন্দ-সংবাদ এবং বিবেকানন্দ ও সম্পাদক নগেন্দ্র গুপ্তের সম্পর্ক-কথা

১। (ক)। প্রকাশ আনন্দ্-রচিত 'এ হিস্টরি অব দি ট্রিবিউন' গ্রন্থে (ট্রিবিউন ট্রাস্ট কর্তৃক ১৯৮৬-তে প্রকাশিত) কিন্তু পত্রিকা সূচনার তারিখ দেওয়া আছে ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১

১। (খ)। Prakash Anand, **A History of the Tribune,** (The Tribune Trust, 1986), M. Chalapathi Rau, **The Press** (National Book Trust, India, 1974). Rangaswami Parthasarathy, **Journalism in India,** (Sterling Publishers, Private Limited, 1991). Prem Narayan, **Press and Politics in India** (Munshiram Monoharlal, 1970).

২। "Upon my mind the writings of Mazzini had created a profound impression. The purity of his patriotism, the loftiness of his ideals, and his all-embracing love for humanity... moved me as I had never before been moved. I discarded his revolutionary teachings as unsuited to the circumstances of India and as fatal to its normal development, along the lines of peaceful and orderly

progress. ...I lectured upon Mazzini, but took care to tell the young men to abjure his revolutionary ideals."

"Between the students and myself there grew up an attachment which I regarded as one of my most valued possessions. Amongst those who regularly attended the meetings in those days were Mr. B. Chakravarti, Swami Vivekananda, Mr. Nanda Kishore Bose, Mr. S. K. Agasti and others."

(Sri Surendranath Banerjea, **A Nation in Making,** Humphrey Milford, 1927, p. 35, 43)

৩। Ibid., pp. 46-47

৪। 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ৫ম খণ্ড, "শিখরা কি হিন্দু?—এই প্রশ্নে বিবেকানন্দ" উপ-অধ্যায়। পৃঃ ৩৭২-৭৫। এই উপ-অধ্যায়ে ট্রিবিউন পত্রিকা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫। প্রকাশ আনন্দ, পৃঃ ৩৭-৩৮

৬। "The quaking, salaaming, fawning Babu, with his broken English, flowing robes, patiently submissive gestures and repeated protestations of loyalty to 'Your Honour' was a perennial source of amusement and therefore a constant recipient of favours." "Now the educated Babu is in existence everywhere, keeps Herbert Spencer in his desk, discusses politics, amuses himself with a course of theology after office hours, lauds regulations and precedents at the heads of European superiors, and sometimes dresses and comports himself as a 'gentleman'."

এসব রচনার মূল ঈর্ষা এবং তা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুই-ই। কলকাতা ভারতের রাজধানী হওয়ায় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রথম গ্রহণ করার জন্য, বাঙালীরা সরকারী দপ্তরে, এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি-জগতে সারা ভারতে একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, সেটা অন্য প্রদেশগুলির স্বার্থে ও আত্মাভিমানে আঘাত করেছিল। আর তা শেষ পর্যন্ত আঘাত করেছিল বৃটিশ স্বার্থেও। প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাঙালীর ইংরেজী শিক্ষার সহায়তা ইংরেজ করেছিল গোড়ার দিকে কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, বাঙালীর শিক্ষাই তাকে রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন বহু ইংরেজের কলমে বাঙালী সম্বন্ধে ঘৃণা উপচে পড়েছিল। বড়ই ভারতপ্রেমিক বলে একদা খ্যাত শ্রমিকনেতা রামজে ম্যাকডোনাল্ড, যিনি পরে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হন, তাঁর রচনা থেকে এক টুকরো 'প্রেমবচন' আমাদের উপহার দিয়েছেন প্রকাশ আনন্দ্ঃ

"The Babu is the devil incarnate. He has a nimble mind, and no conscience ; he is crooked as sin, and in his hands simple-minded Westerners like myself are as clay under the moulding thumb of the potter. He is, in addition, a mean-spirited coward who sneaks through life doing mischief, because he likes it." (p. 40)

এই কথাগুলি ম্যাকডোনাল্ড অ্যাওয়ার্ড নামক জাতিভেদ সৃষ্টিকারী, কূটবুদ্ধি বৃটিশ রাজনৈতিকের কলমের উপযুক্ত সৃষ্টি, সন্দেহ নেই।

৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত', (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা-র ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত জীবনী, পৃঃ ৭২)

৮। তদেব, পৃঃ ৬৭-৭৫, ৭৯-৮০

৯। 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর কথামৃত', প্রকাশক ঃ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া, ১৯৮৩, পৃঃ ৩৯-৪৩

১০। Nagendranath Gupta, **Ramakrishna-Vivekananda,** Ramakrishna Math, Khar,

Bombay, 1933, p. 55

১১। Nagendranath Gupta, Reminiscences of Swami Vivekananda and Sister Nivedita, Modern Review, March, 1930

বিবেকানন্দ ও খ্রীস্টধর্ম : প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া
১৮৯৩-১৯৯৩

১। বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, 'সখার প্রতি' কবিতা দ্রষ্টব্য; পৃঃ ২৬৭-২৬৯

২। The Life of Swami Vivekananda : By His Eastern and Western Disciples, Advaita Ashrama, 1979, p. 7

৩। The Life, p. 48

৪। লীলাপ্রসঙ্গ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৭১-৩৭৩

৫। অর্থাৎ যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণরূপী যীশুখ্রীস্টের দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন, সেইদিন থেকে "Today I have seen the one to whom I have prayed during so many years of wandering, solitary life. In the blessed form of Ramakrishna Paramahamsa, I have directly perceived Lord Jesus of Nazareth." Great Swan by Lex Hixon, 1992, p. 272.

৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম কথিত, সপ্তদশ সং, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২৭৬—২৭৭

৭। History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission by Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama, 1983, pp 34-35
২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭, শ্রীম কথামৃতে লিখছেন—"বরানগর মঠ সবে পাঁচ মাস স্থাপিত হইয়াছে।" কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২৯৫ দ্রষ্টব্য।

৮। কথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৫১

৯। The Life, vol I, p. 196

১০। Ibid., vol I, p. 197

১১। বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫ম সং পৃঃ ১৬—১৭

১২। ভারততীর্থের পথে পথে বইটি ছিল স্বামীজীর নিত্যসঙ্গী—লেখক।

১৩। বোম্বাই থেকে রওনা হলেন ৩১ মে। জাপান হয়ে ভ্যাঙ্কুবার পৌঁছান জুলাই-এর শেষ দিকে।

১৪। The Complete Works of Swami Vivekananda, Mayavati Memorial Edition, vol-7, p.3

১৫। Reminiscences of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, 3rd edition, p. 240

১৬। The Life, vol. II, p. 160

১৭। Ibid

১৮। The Complete Works, vol-I, p. 24

১৯। Ibid

২০। Ibid., vol-IV, p. 31

২১। Ibid., vol-I, p. 105

২২। Ibid., vol-VII, p. 7

২৩। Ibid., vol-VIII, p. 219

২৪। Swami Vivekananda in the West. New Discoveries, pp. 70—71

২৫। The Complete Works, vol-I. p. 4

২৬। Ibid., vol-I, p. 24
২৭। Ibid., vol-VI, pp 390-391
২৮। Ibid., vol-VIII, p. 213
২৯। Ibid., vol-VII, p. 281
৩০। Ibid., vol-V, p. 202
৩১। Ibid., vol-VIII, p. 356
৩০। Ibid., vol.-V, p. 202
৩১। Ibid., vol.-VIII, p. 356
৩২। Ibid., vol.-II, p. 39
৩৩। Ibid., vol.-I, p. 125
৩৪। Ibid., vol.-I, p. 11
৩৫। Ibid., vol.-II, p. 295
৩৬। Ibid., vol.-II, p. 279
৩৭। Ibid., vol. II, p. 40 ; vol. I, pp. 15-16
৩৮। Ibid, vol. IV, p. 239
৩৯। Reminiscences, p. 172
৪০। The Complete Works, vol-VII, pp. 71-72
৪১। New Discoveries, vol-I, by Marie Louise Burke, p. 137
৪২। Swami Vivekananda—A Hundred Years Since Chicago : A Commemorative Volume, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, 1994 ; p 896
৪৩। New Discoveries, vol-I, p. 106
৪৪। Reminiscences, p. 150
৪৫। Ibid., pp. 121-122
৪৬। New Discoveries, vol-I, pp. 117-118
৪৭। The Complete Works, vol-II, p. 194 & vol-VII, p. 420 দ্রষ্টব্য
৪৮। Contemporary Christian Response to the Prophetic Voices of Swami Vivekananda on Christian Faith, a paper read by Dr. K. P. Aleaz, Professor of Religions, at a seminar at Bishop's College, Calcutta
৪৯। Commemorative Volume, pp. 686-703
৫০। 'Can Christianity learn from other Religions ?' Seaburg Press, 1963, p. 6
৫১। Ibid., p. II
৫২। 'Vedanta in America (1893-1993) : The movement towards an universal Religion' by Pravrajika Brahmaprana in Commemorative Volume, p. 492
৫৩। ১·৬·৯৩ তারিখে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে প্রদত্ত ভাষণ।
৫৪। 'Vivekananda for Post-Communist Russia' by R.B. Rybakov in Commemorative Volume, p. 755
৫৫। Ibid.
৫৬। 'Swami Vivekananda and His Work' By Swami Abhedánanda, 5th edition, Ramakrishna Vedanta Math, p. 13
৫৭। Ibid., p. 12
৫৮। Commemorative Volume, p. 658

৫৯। 'Can Christianity learn from other Religions ?' p. 24
৬০। Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, vol. XV, p. 428
৬১। Ibid., p. 392
৬২। Commemorative Volume, p. 491
৬৩। Paper on Contemporary Christian Response to the Prophetic voices of Swami Vivekandanda on Christian Faith, p. 26
৬৪। 'Swami Vivekananda and His Work', by Swami Abhedananda
৬৫। ইংরেজী উদ্ধৃতির ভাবতর্জমা লেখকের।

বিবেকানন্দের ভাষার বৈশিষ্ট্য

১। পত্রাবলী, ৩৪২ নম্বর।
২। তদেব
৩। তদেব
৪। তদেব, ৩৪৭ নম্বর।
৫। তদেব, ৩৪৯ নম্বর।
৬। তদেব
৭। পরিব্রাজক, পৃঃ ৬১-৬২
৮। বঙ্কিম রচনাবলী, বাংলা ভাষা, পৃঃ ৩৭৩
৯। তদেব, বাংলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, পৃঃ ২৭২
১০। ভাববার কথা, বাঙ্গালা ভাষা, পৃঃ ৫
১১। পরিব্রাজক, পৃঃ ৬৩
১২। বর্তমান ভারত, পৃঃ ৩৩

বেদান্ত, বিজ্ঞান ও বিবেকানন্দ

১। ১৩।২।৯৬ তারিখে মিস্টার স্টার্ডিকে লেখা স্বামী বিবেকানন্দের চিঠি দ্রষ্টব্য।
২। The Complete Works of Swami Vivekananda, vol. III, p. 185
৩। Prabuddha Bharata, March 1972
৪। The Complete Works of Swami Vivekananda, Op. cit., vol. III, p. 400
৫। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ১১।১২
৬। লণ্ডনে দেওয়া 'The Real Nature of Man' নামক বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেনঃ "আজকের যুগে যদি কেউ মোজেস্, বুদ্ধ অথবা ক্রাইস্ট-এর বাণী থেকে উদ্ধৃতি দেয়, লোকে তাকে উপহাস করবে। কিন্তু সেই মানুষটিই যদি হাক্স লে, টিনডল বা ডারউইন-এর কথা উদ্ধৃত করে, লোকে তওবা, তওবা বলে নিঃসংশয়ে তা মেনে নেবে। 'ওহ্, হাক্সলে বুঝি এই কথা বলেছেন? তাহলে তো মানতেই হয়'—এই হচ্ছে অনেকের মনোভাব। আহা, কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবার কি অপরূপ নমুনা! আগেরটা ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার, আর এখনকার হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত কুসংস্কার...। এই যা তফাৎ।" — The Complete Works, vol. II, p.74
৭। "আমাদের মধ্যে আরেক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা প্রত্যেক হিন্দু আচার-আচরণের একটা যাহোক গোছের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবেনই দেবেন।...মা, জগদম্বা তাঁদের কল্যাণ করুন।"
—The Complete Works, vol. III, p. 450

এই প্রসঙ্গে 'ভাববার কথা'-য় স্বামীজী কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্যের যে চরিত্রটি এঁকেছেন তাকে আমরা স্মরণ করতে পারি। বিদ্রূপের শাণিত বিদ্যুৎ প্রতিটি শব্দের ভিতর থেকে যেন ঝলসে উঠেছে। "গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য—মহাপণ্ডিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিচর্মসার; বন্ধুরা বলে তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে।... যাইহোক, কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিসটিই নাই, বিশেষ টিকি হতে আরম্ভ করে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বকশক্তির গতাগতিবিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে মাভৈঃ, যে সকল মুস্কিল মনেব মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি, তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাকো। নাকে সবষের তেল দিয়ে ঘুমোও।"—বাণী ও রচনা, ভাববার কথা, ৫ম সং, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৫-৪৬

৮। C. W., vol. II, p 276

৯। Ibid., p. 94

১০। Ibid., vol. III, p 14

১১। Ibid , vol. I, p. 373

১২। Ibid., vol. I, p. 224

১৩। Ibid., vol. III, p. 2

১৪। Holistic দৃষ্টিতে এই মহাবিশ্ব একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক বা unit. মানুষের দেহে যেমন অসংখ্য কোষ, কিন্তু সব মিলিয়ে একটি গোটা মানুষ, তেমনি মহাবিশ্বও সব মিলিয়ে একটি সামগ্রিক সত্তা। Holistic Science-এব সর্বশ্রেষ্ঠ paradigm স্বামীজী-প্রদত্ত ঘূর্ণির উপমা। ১১ নং Ref.-এ দ্রষ্টব্য

১৫। Looking Glass Universe, by John Briggs and F. David Peat, Simon & Schuster, N Y , p. 267

১৬। Ibid., p. 128

১৭। Ibid., p 267

১৮। Ibid., p. 263

১৯। C W. vol. III, p. 401

২০। Ibid.

২১। Ibid.

২২। Looking Glass Universe, p. 265

২৩। Ibid., p. 267

২৪। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৯৪

২৫। Vivekananda, A Biography By Swami Nikhilananda, p. 86

২৬। C W., vol. II, p. 432

২৭। Turbulent Mirror, By John Briggs and F. David Peat, Harper & Row N.Y., pp. 90-112

২৮। C. W., vol. VI, pp. 498-499

২৯। The Presence of the Past, Random House, N. Y.

৩০। C. W., vol. I, p. 81

৩১। Reminiscences of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, p. 410

৩২। Science and the Modern World, By Whitehead, Macmillan, N. Y.

৩৩। C. W., vol. I, p. xiii

৩৪। Ibid., vol. III, p. 185

৩৫। Ibid., p. 432

৩৬। Ibid., p. 401

৩৭। Vide ref. no 16. For more please see, Turbulent Mirror by John Briggs and F. David Peat, The Self Organizing Universe by Enrich Jantsch, Oxford Pergamon Publication.

৩৮। Looking Glass Universe, p. 130

৩৯। C. W., vol. VII, p. 175

৪০। Ibid., vol. II, p. 433

৪১। Ibid.

৪২। Ibid., p. 140

স্বামী বিবেকানন্দঃ প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ

১। অধ্যাপক বিকাশ সান্যালের ঐ স্মারকলিপিটি তাঁর 'The Message of Swami Vivekananda And Its Relevance to UNESCO Today' প্রবন্ধরূপে পরিমার্জিত হয়ে Swami Vivekananda : 'A hundred years since Chicago' স্মারক গ্রন্থে (Ramakrishna Math, Belur, 1994) প্রকাশিত হয়েছে।

২। Inaugural Address by Dr. Federico Mayor, Director General of UNESCO on October 8, 1993 at 6.30 P.M. In Commemoration of the Centenary of Swami Vivekananda's Appearance at the Parliament of Religions, Chicago, 1893.

৩। ডঃ ফ্রেডারিকো মেয়রের ভাষণের বঙ্গানুবাদ 'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন (শারদীয়া) ১৪০১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

৪। "My contention is that Vivekananda rather epitomizes an intermediate ideology called 'Hindu Universalist nationalism...'' C. Jaffrelot

৫। বর্তমান লেখকের 'সমসাময়িক পাশ্চাত্যের দৃষ্টিকোণে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলন ও স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকার তাৎপর্যের মূল্যায়ন' (উদ্বোধন, মে ও জুন, ১৯৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

৬। 'The 1893 World's Parliament of Religions and the New claims for Hinduism'

৭। 'নারীবাদের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দের নারী ভাবনা'—পাপিয়া চক্রবর্তী (নিমাইসাধন বসু সম্পাদিত 'শাশ্বত বিবেকানন্দ', কলকাতা ১৯৯২) পৃঃ ১৩৪-১৪৯

৮। The Influence of Vivekananda on Brahmabandhab Upadhyay (1861-1907) in his effort to indigenise the Christian faith in India in terms of Advaitic thought.

৯। A Meeting of Ends ? Swami Vivekananda and Brahmabandhab Upadhyay in 'Swami Vivekananda : A hundred years since Chicago' (a commemorative volume), Calcutta, 1994

১০। Two Sanatana Dharma Leaders and Swami Vivekananda : A comparison

১১। Narasingha P. Sil, Ramakrishna Paramahansa : A Psychological Profile (Leiden, E.J. Brill, 1991) ; N. P. Sil, Vivekananda's Ramakrishna : An untold story of Mythmaking and Propaganda, Numen, vol-40 (1993) No : 1, pp. 38-57

১২। Vivekananda's Treatment (Brill, Leiden) of Western Ideas and His Incorporation of them into his version of Hinduism.

১৩। Swami Vivekananda and Seva : Taking 'Social Service' Seriously. বেকারলেগ গোলপার্ক থেকে প্রকাশিত শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের স্মারকগ্রন্থে স্বামীজীর সমাজকল্যাণ সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে 'Swami Vivekananda's Response to the immorality of 'Modern Femine' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন।

১৪। Vivekananda and Existentialism (মিশেল ইউলিনের Vivekananda and opening of Vedanta to the World প্রবন্ধেও এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়)

স্বামী বিবেকানন্দ ও পাশ্চাত্য জগৎ ঃ শতবর্ষের পর পুনর্বিচার

১। The Complete Works of Swami Vivekananda, 11th ed. vol. 8 (Calcutta : Advaita Ashrama, 1989), 4 : 361. পরে CW নামে উল্লেখিত)

২। Seager, Richard H.ed. Dawn of Religious Pluralism (La Salle, Ill ; Open Court Pul., 1993), p. 6

৩। Ibid.,

৪। CW., 1:4

৫। Seager, pp. xiv—xv

৬। Ibid.,

৭। Nelson, David, Notes and Reflections on the Parliament of World's Religions, 1993 [unpublished manuscript from the archives of Sarada Convent, Santa Barbara, Vedanta Society of Southern California, USA p. 52]

৮। Ibid., p. 53

৯। Kosmin, Barry A. and Seymour P. Lachman, One Nation Under God : Religion in Contemporary American Society (New York : Harmony Books, 1993) p. 2

১০। Burke, Marie Louise, Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, vol. 4 (Calcutta, Advaita Ashrama, 1986), p. 142

১১। Associated Press, "God is the same in All Religions," Los Angeles Times, Sept. 7, 1991.

১২। Kosmin and Lachman, p. 9

১৩। Solberg, Winton U., "Contemporary Trends in American Religious Life" Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, vol. XLV, No. 5, May, 1994, p. 172

১৪। "Spiritual America," U.S. News and World Report, April 4, 1994, pp. 48-51

১৫। Ibid., p. 50

১৬। CW., 5:48

১৭। Ibid., 7:486

১৮। Ibid., 5:189

১৯। Burke, vol. 6, pp. 20—21 দ্রষ্টব্য।

২০। One Nation Under God, p. 12

২১। CW., 5:68

২২। Eastern and Western Disciples, The Life of Swami Vivekananda, vol. II, 5th ed.

(Calcutta Advaita Ashrama, 1948) p. 590
২৩। CW., 5:414

কোথায় খুঁজি তাঁরে

১। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, ৭ম সং, পৃঃ ১৮৯
২। বাণী ও রচনা, ৪র্থ সং, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৭০
৩। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১১০
৪। তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭০
৫। পত্রাবলী, ৫ম সং, পৃঃ ৭৩
৬। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১১১
৭। তদেব
৮। তদেব, পৃঃ ১৮৭
৯। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম খণ্ড, ২য় সং, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৩০৪
১০। তদেব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১২৫
১১। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৮৫
১২। পত্রাবলী, ৫ম সং, পৃঃ ৩৬-৩৭
১৩। তদেব
১৪। বাণী ও বচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ২৭৩
১৫। বামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ, স্বামী ওঁকারানন্দ, ১ম সং, পৃঃ ৪
১৬। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম সং, পৃঃ ২৬৭
১৭। পত্রাবলী, ৫ম সং, পৃঃ ৪৪
১৮। তদেব, পৃঃ ৪৫-৪৬
১৯। তদেব, পৃঃ ২৫৬
২০। তদেব, পৃঃ ৩৭৭
২১। তদেব, পৃঃ ২৪৭
২১ ক। অতীতেব স্মৃতি, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, ১ম সং, পৃঃ ১০৫
২২। তদেব, পৃঃ ৬১০
২৩। তদেব, পৃঃ ৭৩২
২৪। তদেব, পৃঃ ৬৩৭
২৫। তদেব, পৃঃ ৬৭৪
২৬। তদেব, পৃঃ ৬৭৪-৬৭৫
২৭। তদেব, পৃঃ ৬৭৯-৬৮০
২৮। তদেব, পৃঃ ৪১৬-৪১৭
২৯। বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ১২৪-২৫
৩০। পত্রাবলী, ৫ম সং, পৃঃ ৪০২
৩১। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ৭১
৩২। পত্রাবলী, ৫ম সং, পৃঃ ৭২৩

'মা ঠাকুরানী'র নরেন

সহায়ক গ্রন্থ

১। শ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ
২। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, (অখণ্ড) সংকলন
৩। শতরূপে সারদা, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত
৪। শ্রীরামকৃষ্ণ বিভাসিত মা সারদা, স্বামী বুধানন্দ
৫। প্রকৃতিং পরমাম্ (প্রথম খণ্ড), স্বামী অভজানন্দ
৬। পত্রাবলী (অখণ্ড), স্বামী বিবেকানন্দ
৭। বাণী ও রচনা, স্বামী বিবেকানন্দ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড
৮। উদ্বোধন, স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যা, স্বামী নিরাময়ানন্দ
৯। শ্রীশ্রীচণ্ডী, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত ও সম্পাদিত
১০। উপনিষদ (অখণ্ড), অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ অনূদিত ও সম্পাদিত
১১। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার অঙ্গনে শ্রীমা সারদা, হর্ষ দত্ত, নিবোধত, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

স্বামীজীর অধ্যয়নের জগৎ*

১। Socio-political Views of Vivekananda, Binoy K Roy, pp. 1-2.
২। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৭
৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৫৮
৪। ঘটনাবলী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৩
৫। পূর্বোক্ত, বিনয় রায়।
৬। লীলাপ্রসঙ্গ, স্বামী সারদানন্দ ২য় পৃঃ ১৮৭-৮৮
৭। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, (৫ম) পৃঃ ৬০
৮। New Discoveries, Marie Louise Burke, vol. II. p. 29.
৯। বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, পৃঃ ২৮
১০। পূর্বোক্ত, সারদানন্দ, পৃঃ ৯৮
১১। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (২য়), পৃঃ ৪০
১২। বিবেকানন্দ জীবনীর উপাদান সংগ্রহ, কালিদাস নাগ, উদ্বোধন, ১৩৬৮ মাঘ
১৩। রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ, প্রবোধচন্দ্র সেন, কথাসাহিত্য, ফাল্গুন, ১৩৭০

অগ্রজ নরেন্দ্রনাথ

১। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, পৃঃ ২৫
২। Swami Vivekananda Patriot-Prophet, Bhupendranath Datta, Nababharat Publishers. p. 421
৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৬৪-৬৫
৪। তদেব, বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী লিখিত মুখবন্ধ
৫। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১
৬। কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৩৭
৭। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫

৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, মহেন্দ্রনাথ দত্ত
৯। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১
১০। তদেব, পৃঃ ৬৩
১১। তদেব, পৃঃ ৫৩
১২। তদেব, পৃঃ ৬৩-৬৪
১৩। তদেব, পৃঃ ১৭১
১৪। তদেব
১৫। তদেব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৩
১৬। তদেব, পৃঃ ১৭০
১৭। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০
১৮। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় খণ্ড, 'অপবাদ ও প্রতিকার'
১৯। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬
২০। তদেব, পৃঃ ৯৩
২১। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮২
২২। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১
২৩। তদেব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮
২৪। তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০
২৫। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮১
২৬। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫
২৭। Swami Vivekananda—Patriot Prophet, Bhupendranath Datta, p. 1
২৮। Ibid.
২৯। Ibid.
৩০। Ibid., p. viii
৩১। Ibid., p. ix
৩২। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ইত্যাদি সম্পাদিত [সংকলিত প্রবন্ধঃ স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম—জীবন মুখোপাধ্যায়] পৃঃ ১৩১
৩৩। তদেব [সংকলিত প্রবন্ধঃ নবজাগরণের আলোকে, নচিকেতা ভরদ্বাজ, রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ] পৃঃ ৬১১
৩৪। Swami Vivekananda—Patriot Prophet, Bhupendranath Datta, p. 215
৩৫। Ibid., p. 349
৩৬। Ibid.
৩৭। Ibid., p. 300
৩৮। বাণী ও রচনা, স্বামী বিবেকানন্দ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১৫
৩৯। Swami Vivekananda—Patriot Prophet, Bhupendranath Datta, p. 221
৪০। Ibid., p. 2
৪১। Ibid., p.221
৪২। Ibid., p. 219
৪৩। Ibid., p. viii
৪৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৩২
৪৫। তদেব, পৃঃ ৬৩
৪৬। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২২

[মহেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র 'কনিষ্ঠা ভগ্নী আত্মহত্যা করে' মৃত্যু সম্পর্কে এটুকুই জানিয়েছেন। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, '... violent death of two of his (Narednranath's) younger sisters who suffered terribly in mother-in-laws' houses—' Patriot Prophet, p. 216]
৪৭। কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১২
৪৮। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৮
৪৯। পত্রাবলী, স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৬

স্বামীজী ও তাঁর গুরুভ্রাতাদের সম্পর্ক

১। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, স্বামী প্রভানন্দ, পৃঃ ২৬২
২। স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী অন্নদানন্দ, পৃঃ ৬৩
৩। তদেব, পৃঃ ৭৩
৪। Letters of Sister Nivedita, vol. I, Letter no. 53. Ed. Sankari Prasad Basu.
৫। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩২২
৬। তদেব, পৃঃ ৩২৬
৭। তদেব, পৃঃ ৩২৮
৮। তদেব, পৃঃ ৩২৯
৯। তদেব, পৃঃ ৩৩১
১০। পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ, (মেরী লুইস বার্কের গ্রন্থের অনুবাদ) নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৫
১১। বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৮৩
১২। তদেব, পৃঃ ২০৪-২০৫
১৩। তদেব, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৭-৪৮
১৪। তদেব, পৃঃ ২৫১
১৫। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, শঙ্করীপ্রসাদ বসু
১৬। তদেব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯
১৭। বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৫
১৮। বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৮
১৯। স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী অন্নদানন্দ, পৃঃ ৬৫
২০। তদেব, পৃঃ ১৮৪
২১। স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন, স্বামী নির্লেপানন্দ, পৃঃ ১৮
২২। তদেব, পৃঃ ২২
২৩। স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, পৃঃ ৪৩
২৪। তদেব, পৃঃ ৪৬
২৫। তদেব, পৃঃ ৪৭
২৬। বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৬৭
২৭। গিরিশ রচনাবলী, সংসদ সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৪
২৮। স্মৃতি সঞ্চয়ন, স্বামী নির্লেপানন্দ, পৃঃ ১৬
২৯। তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১৮
৩০। স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন, স্বামী নির্লেপানন্দ, পৃঃ ১২
৩১। ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, পৃঃ ৩১-৩২

শিকাগো ধর্মমহাসভার পরিপ্রেক্ষিত, স্বামীজীর বহুমুখী কর্মোদ্যোগ এবং স্ত্রীমঠের পরিকল্পনা

১। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ১৭
২। তদেব, পৃঃ ৩২
৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ভূমিকা
৪। তদেব, পৃঃ ১০
৫। তদেব
৬। The Complete Works of Swami Vivekananda, vol. I, Seventh Ed., p. 3
৭। Ibid., p. 4
৮। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ১৫
৯। The Complete Works of Swami Vivekananda, op cit., vol. I, Seventh Ed., p. 22
১০। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ২৭২
১১। Swami Vivekananda in the West, New Discoveries, Marie Louise Burke, Part 1, p. 338
১২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৩০
১৩। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩/১৬
১৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮ম সং, পৃঃ ২১০
১৫। তদেব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ১০৬
১৬। তদেব, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৯
১৭। স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, ভগিনী নিবেদিতা, ১ম সং, পৃঃ ২৬৩
১৮। শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম সং, পৃঃ ৬০৫
১৯। তদেব, পৃঃ ৪৩২
২০। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৪৩
২১। তদেব, ৯ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৪৮৩

যারা গড়ে দিল পথ

সহায়ক গ্রন্থ

১। স্বামীজীর পদপ্রান্তে, স্বামী অব্জজানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ১২৬
২। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৯২
৩। অতীতের স্মৃতি, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, ১ম সং, পরিশিষ্ট (গ), পৃঃ ১১৩
৪। স্বামীজীর পদপ্রান্তে, পৃঃ ১১৮
৫। তদেব, পৃঃ ২২০
৬। তদেব, পৃঃ ২২৩
৭। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫
৮। তদেব, পৃঃ ৬
৯। অতীতের স্মৃতি, পৃঃ ৮৭
১০। তদেব, পৃঃ ৮৮
১১। তদেব, পরিশিষ্ট (গ) পত্র, পৃঃ ১১৭
১২। স্বামীজীর পদপ্রান্তে, পৃঃ ৭০

১৩। তদেব, পৃঃ ১২৫
১৪। তদেব, পৃঃ ১২৮
১৫। অতীতেব স্মৃতি, পৃঃ ১১০
১৬। তদেব, পৃঃ ১২৬
১৭। তদেব, পৃঃ ১৭৮
১৮। স্বামীজীব পদপ্রান্তে, পৃঃ ১৯
১৯। তদেব, পৃঃ ৩৫
২০। তদেব, পৃঃ ১৫১
২১। তদেব, পৃঃ ১৬৬
২২। তদেব
২৩। তদেব, পৃঃ ২৩
২৪। তদেব, পৃঃ ৩৪৩
২৪(ক)। কথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৪
২৫। স্বামীজীব পদপ্রান্তে, পৃঃ ২৫৭
২৬। তদেব, পৃঃ ২৮৫
২৭। তদেব, পৃঃ ২৬৪
২৮। তদেব, পৃঃ ২৯৩
২৯। তদেব, পৃঃ ২৯৩
৩০। তদেব, পৃঃ ২৯৯
৩১। অতীতেব স্মৃতি, পৃঃ ২৩৬
৩২। স্বামীজীকে যেরূপ দেখিযাছি, ৯ম সং, পৃঃ ৯০
৩৩। শ্রীমা সাবদাদেবী, পৃঃ ১৬৪

শহীদ গুডউইন

১। Swami Vivekananda in the West Marie Louise Burke vol III p 335
২। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭
৩। Swami Vivekananda in the West New Discoveries vol III, p 338-339
৪। Ibid , vol IV, p 334
৫। Ibid , p 19-20
৬। Ibid , p 21
৭। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২৫
৮। Swami Vivekananda in the West, vol IV, p 69
৯। Ibid , p 70
১০। Ibid , p 130
১১। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৩৮
১২। তদেব, পৃঃ ১৩৯
১৩। তদেব, পৃঃ ৮৩
১৪। তদেব, পৃঃ ৮৪
১৫। স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষিপ্রলিপিকাব জে. জে. গুডউইন, পৃঃ ৩৬
১৬। তদেব, পৃঃ ১৭

১৭। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৬৫
১৮। তদেব, পৃঃ ১৮৮
১৯। স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষিপ্রলিপিকার জে. জে. গুডউইন, পৃঃ ৩৬
২০। Letters of Swami Vivekananda, p. 299.
২১। Tantine, The Life of Josephine Macleod, Pravrajika Prabuddhaprana, p. 23
২২। Swami Vivekananda in the West, vol. IV, p. 351
২৩। Ibid., p. 386
২৪। স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষিপ্রলিপিকাব জে. জে. গুডউইন, পৃঃ ৪০
২৫। তদেব
২৬। স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষিপ্রলিপিকার জে. জে. গুডউইন, পৃঃ ৩৮
২৭। স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, পৃঃ ২৫৪
২৮। Swami Vivekananda—Patriot Prophet, Dr. Bhupendranath Datta, p. 79-80
২৯। Swami Vivekananda in the West, vol. IV, p. 488
৩০। Ibid., p. 489
৩১। Ibid , p. 490
৩২। Ibid., p. 491
৩৩। Ibid., p. 492
৩৪। Ibid., p. 493
৩৫। Ibid., p. 494
৩৬। Ibid., p. 496
৩৭। স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষিপ্রলিপিকার জে. জে. গুডউইন, পৃঃ ৪১
৩৮। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৫
৩৯। অতীতের স্মৃতি, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পৃঃ ২০১

অদ্বৈতের প্রেরণায় সেভিয়ার দম্পতি

সহায়ক গ্রন্থ

১। Life of Swami Vivekananda, (Mayavati edition, 1955), p. 421
২। Ibid.
৩। Ibid., p. 424
৪। Ibid., p. 450
৫। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩২৮
৬। তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৮
৭। তদেব, পৃঃ ১৫৯-১৬০
৮। অতীতের স্মৃতি, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, ১ম সং, পৃঃ ১১৫
৯। Prabuddha Bharata, September 1963, p 467
১০। Letters of Sister Nivedita, ed. Sankari Prasad Bose, vol. II., p. 543
১১। Ibid., p. 545
১২। Tantine : The Life of Josephine MacLeod, Pravrajika Prabuddhaprana, 1st ed., p. 66
১৩। Prabuddha Bharata, January 1913, p. 14
১৪। With the Swamis in America and India, Swami Atulananda, p. 309-10

১৫। পত্রাবলী, ৫ম সং, পৃঃ ৫৮৭
১৬। তথ্য বেলুড় মঠের বিশিষ্ট গবেষক সন্ন্যাসীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।
১৭। Prabuddha Bharata, Jan 1931, p. 6
১৮। মায়াবতীর পথে, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৪৫-৪৬
১৯। With the Swamis in America, op. cit., p. 308-9
২০। Prabuddha Bharata, Jan 1931. p. 7

স্বামীজীর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ বেদান্তপ্রচারব্রতী আমেরিকান নারী*

সহায়ক গ্রন্থ

১। Margarita Wallmann Collection SSM
২। Reminiscences of Swami Vivekananda, (Advaita Ashrama, 1983)
৩। Sara Chapman Bull Papers
৪। Swami Vivekananda in Indian Newspapers 1893-1902, ed., Sankari Prasad Bose & Sunil Behari Ghosh (Cal. 1969)
৫। 'Sister Christine', Boshi Sen, Samvit No. 18, September, 1988
৬। Sister Christine Lecture Notes : Gertrude Emerson Sen Collection, Ramakrishna Sarada Mission, New Delhi
৭। Tantine, the Life of Josephine Macleod, Pravrajika Prabuddhaprana, (Sri Sarada Math, 1990)

ক্যালিফোর্ণিয়ার এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় ও স্বামীজীর সান্নিধ্যে স্বর্ণময় মুহূর্ত

[বেলুড় মঠে ১৯৯৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি, স্বামীজীর জন্মতিথির সভায় প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে লিখিত]

[বিঃ দ্রঃ — এই প্রবন্ধের ঘটনাগুলি 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন দ্য ওয়েস্ট—নিউ ডিসকভারিজ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, (অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা ১৯৮৩-৮৭) গ্রন্থ থেকে, প্রকাশকের অনুমোদন অনুসারে গৃহীত ও অনূদিত]

১। Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Marie Louise Burke, vol. VI, p. 26

প্রতিবন্ধী সেই মেয়েটি

১। Reminiscenses of Swami Vivekananda, Eastern and Western Disciples (Calcutta : Advaita Ashrama, 1964) p. 376
২। Memories of Ida Ansell, Ujjvala, Swami Vidyatmananda, Samvit (March 1989), p. 36
৩। Swami Vivekananda in the West, New Discoveries, A New Gospel, Marie Louise Burke, vol. 5 (Calcutta : Advaita Ashrama, 1987) p. 97

৪। Ibid., p. 150
৫। Ibid., p. 158
৬। Ibid., p. 219
৭। Letter of Swami Turiyananda to Ida Ansell, Nov. 13, 1900 (Archives of Vedanta Society of Southern California)

এমা কালভে—দীপ্ত হোমশিখা

১। বাণী ও রচনা—৮ম সং, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯৩
২। তদেব, পৃঃ ৯৪
৩। তদেব
৪। My life, Translated by Raamond Gilder, p. 2
৫। বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯৪
৫ক। শ্রীমতী লুইস বার্ক এমা কালভের অন্তরঙ্গ বন্ধু মাদাম দ্রিনেত্ ভার্দোর কাছে কালভে সম্বন্ধে নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। গবেষক সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ 'ইওরোপে স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে (পৃঃ ১৮০) সেইকথা উল্লেখ করে বলেছেন: "সাধারণ হেরেডিটি নিয়ম (laws of heredity) অর্থাৎ উত্তরাধিকারক্রমে পৈত্রিক গুণের প্রভাবেই যে প্রতিভার স্ফূরণ হয় তা নয়। এর প্রমাণ এমা কাল্‌ভে। যশস্বিনী এই মেয়েটির প্রতিভা ছিল অভিনব। ...অথচ উত্তরাধিকারসূত্রে এমা কিছুই পায় নি তাঁর দরিদ্র পরিবার থেকে। দক্ষিণ ফ্রান্সের এক খনি মজুর পরিবারে তাঁর জন্ম। ছোট্ট এই খনি শহরের নাম ডেকাভিলে (Decazeville)। শুধু দারিদ্র্য নয়, কাল্‌ভের ছেলেবেলা কেটেছে নির্মম হতাশা আর আনন্দহীন পরিবেশে। অথচ তাঁর কথা শুনে মনে হতো যেন গানে গানে ভরা ছিল তাঁর জীবন। মনে হতো, লোকসঙ্গীতে স্প্যানিশ সুরের প্রভাবে তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে এক রোমান্টিক আবহে। কিন্তু এর সবটাই তাঁর কল্পনা।...'কারমেন' নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করার সময় তিনি প্রায় অজান্তেই 'কারমেন' হয়ে উঠেছিলেন।"
৬। My Life, p. 21
৭। Ibid., p. 66
৮। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ, পৃঃ ৯৩
৯। My Life, p. 199
১০। Ibid., p. 86
১১। Ibid., p. 76
১২। Ibid., p. 77
১৩। Ibid., p. 186
১৪। Ibid.
১৫। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ৬৪
১৬। Ibid., p. 188
১৭। ইওরোপে বিবেকানন্দ—স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ, অনুঃ রবিশেখর সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৮৯-১৯০
১৮। Ibid., p. 192
১৯। স্মৃতিকথা: কালভে ও বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ—কুমুদবন্ধু সেন, 'বিবেকানন্দ শরণে বিদেশিনী'তে উদ্ধৃত অংশ থেকে গৃহীত, পৃঃ ২০৪
২০। Ibid., p. 194

২১। পত্রাবলী, ৪র্থ সং, পৃ: ৬৭৬
২২। Ibid., p. 185

স্বামীজীর অন্তরঙ্গ লেগেট পরিবার

১। বিবেকানন্দ শরণে বিদেশিনী, শঙ্করী প্রসাদ বসু, পৃঃ ২৮
২। বিশ্ববিবেক ১৯৬৩ পৃঃ ৮২
২ক। Late and Soon, Frances Leggett, p. 95
২খ। পত্রাবলী, স্বামী বিবেকানন্দ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩৯৪
৩। তদেব পৃঃ ৩৫৫
৪। তদেব পৃঃ ৩৪৩
৫। তদেব পৃঃ ৩৪৪
৫ক। বিবেকানন্দ শরণে বিদেশিনী, পৃঃ
৬। পত্রাবলী, পৃঃ ৩৫৬
৭। তদেব পৃঃ ৪৬৭
৮। তদেব পৃঃ ৪৬৮
৯। দিব্য সান্নিধ্যে, শ্রীসারদামঠ প্রকাশিত, পৃঃ ২৪
১০। বিবেকানন্দ শরণে বিদেশিনী, পৃঃ ২৬
১০ক। Tantine—the life of Josephine Macleod, Pravrajika Prabuddhaprana, 2nd Edition, 1904
১১। দিব্য সান্নিধ্যে, পৃঃ ২০
১২। পত্রাবলী, পৃঃ ৭০৬
১৩। বিবেকানন্দ শরণে বিদেশিনী, পৃঃ ২৮
১৪। তদেব পৃঃ ২৯
১৫। তদেব পৃঃ ৪৪
১৬। তদেব পৃঃ ৭৬
১৭। পত্রাবলী, পৃঃ ৭০৮
১৮। যুগনায়ক, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৮৯
১৯। পত্রাবলী পৃঃ ৩৫৪
২০। তদেব পৃঃ ৩৯৪
২১। বিশ্ববিবেক পৃঃ ৮৫
২২। ইওরোপে বিবেকানন্দ, স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ, পৃঃ ৩৩
২৩। Swami Vivekananda in the West, New Discoveries, Marie Louise Burke, 3rd Edition., vol. 5. p. 344
২৪। অপ্রকাশিত পত্র, প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণার সৌজন্যে প্রাপ্ত।
২৫। ইওরোপে বিবেকানন্দ, পৃঃ ৩৩
২৬। পত্রাবলী, পৃঃ ৭৫১
২৭। Letters of Sister Nivedita, Ed. Sankari Prasad Basu, vol. I, পৃঃ ২২৮
২৮। Letters of Sister Nivedita vol. II, p. 743
২৯। Ibid., p. 747.

৩০। বিবেকানন্দ শরণে বিদেশিনী, পৃঃ ৪৭
৩১। তদেব, পৃঃ ২২
৩২। তদেব পৃঃ ২৪
৩৩। Letters of Sister Nivedita. vol. II, op. cit., p. 939.
৩৪। পত্রাবলী, পৃঃ ৫১৮
৩৫। বিবেকানন্দ শরণে বিদেশিনী, পৃঃ ৭৮৯
৩৬। তদেব পৃঃ ২৭

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী

১। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, মহেশ্বরস্তুতিঃ, ২
২। বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৯
৩। তদেব, পৃঃ ২৪৪
৪। তদেব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬
৫। তদেব, পৃঃ ৩৮৮
৬। তদেব, পৃঃ ৩৮৯
৭। The Master as I saw Him, p. 250
৮। Reminiscences of Swami Vivekananda, p. 198
৯। Ibid., p. 204
১০। Ibid., p. 196
১১। Ibid., p. 209
১২। ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ১৪৬
১৩। Reminiscences of Swami Vivekananda, op. cit., p. 204
১৪। বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬-৭৭
১৫। The Master as I saw Him, p. 327
১৬। Ibid., p. 274
১৭। Ibid., p. 267

স্বামীজীর চিন্তার আলোকে ধর্মমহাসভার পরবর্তী কালে নারীর স্থান

১। বাণী ও রচনা—ভারতীয় নারী, তাহাদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৯
২। তদেব
৩। তদেব
৪। বাণী ও রচনা, উক্তি সঞ্চয়ন, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০
৫। অরুণ-বহ্নি, শান্তি দাশ
৬। অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পতরু সেনগুপ্ত, শারদীয়া দৈনিক বসুমতী
৭। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৮৫
৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, কমলা দাশগুপ্ত, পৃঃ ৪০
৯। রচনা সংগ্রহ, ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়

১০। আমি ইন্দিরা গান্ধী, নিমাইসাধন বসু, পৃঃ ৬০
১১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪।৭।১৯৫৪
১২। ইনডিয়ান উইমেন্‌স ভয়েসেস ফ্রম মানুষী, ইন সার্চ অফ আনসারস্‌, পৃঃ ১৩৫

[তারকা চিহ্নিত প্রবন্ধগুলি 'নিবোধত' পত্রিকায় প্রকাশিত।]

লেখক-পরিচিতি

স্বামী ভূতেশানন্দ
অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন।
প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা
অধ্যক্ষা, শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন।
তারকনাথ তরফদার
চিকিৎসাজীবী ও লেখক।
সান্ত্বনা দাশগুপ্ত
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, অর্থনীতি বিভাগ, বেথুন কলেজ, কলকাতা।
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক, উদ্বোধন পত্রিকা, কলকাতা।
প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা
সম্পাদিকা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন, দমদম।
প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণা
সন্ন্যাসিনী, শ্রীসারদা মঠ।
গীতা চৌধুরী
প্রাক্তন শিক্ষিকা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল।
সুব্রতা সেন
অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, বেথুন কলেজ।
সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী লেখক।
সুশান ওয়ালটার্স
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।
অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ।
নচিকেতা ভরদ্বাজ
কবি, প্রাবন্ধিক। প্রাক্তন প্রধান, বাংলা বিভাগ, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা।
স্বামী আত্মস্থানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন।
রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
অধ্যাপক। প্রাক্তন মহানির্দেশক, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা।
অমলেশ ত্রিপাঠী
অধ্যাপক, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রাবন্ধিক।
প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা
অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন, দমদম।
পূর্বা সেনগুপ্ত
লেখিকা, গবেষক, ইনস্টিটিউট অব কালচার।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
পবিত্রকুমার ঘোষ
সাংবাদিক ও প্রসিদ্ধ লেখক।
শঙ্করীপ্রসাদ বসু
বিবেকানন্দ-গবেষক, প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
শৈবাল গুপ্ত
প্রসিদ্ধ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও প্রাবন্ধিক।
এম. লক্ষ্মীকুমারী
সম্পাদিকা, বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারী।
স্বরাজ মজুমদার
সহ সম্পাদক ও গবেষক, অমৃতবাজার পত্রিকা।
বার্ণিক রায়
কবি ও প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ।
প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, খোন্‌সা, অরুণাচল।
রঘুনাথ গোস্বামী
প্রখ্যাত শিল্পী ও নন্দনতাত্ত্বিক।
নিমাইসাধন বসু
প্রাক্তন উপাচার্য, বিশ্বভারতী। অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
প্রব্রাজিকা ব্রজপ্রাণা
সন্ন্যাসিনী, সারদা কনভেন্ট, সান্টা বারবারা, ইউ. এস. এ।
প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা
সাধারণ সম্পাদিকা, শ্রীসাবদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন।
হর্ষ দত্ত
কথাসাহিত্যিক, দেশ পত্রিকার অন্যতম সহ সম্পাদক।
নিশীথরঞ্জন রায়
প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও গবেষক।
রবিন পাল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ।
ডাঃ দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত
চিকিৎসক ও লেখক।
নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ।
প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা
প্রয়াত সাধারণ সম্পাদিকা, শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন।
কবিতা সিংহ
কবি ও লেখিকা।
প্রণবেশ চক্রবর্তী
সাংবাদিক ও লেখক।
প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা
সম্পাদিকা, নিবোধত, শ্রীসারদা মঠ।

প্রব্রাজিকা ধ্যানপ্রাণা
সন্ন্যাসিনী, শ্রীসারদা মঠ।
প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণা
সংযুক্ত সম্পাদিকা, নিবোধত, শ্রীসারদা মঠ।
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।
মিতা মজুমদার
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী লেখিকা।
প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা
মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের জীবনীগ্রন্থের রচয়িত্রী, সন্ন্যাসিনী, শ্রীসারদা মঠ।
মেরী লুইস বার্ক
পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ-গবেষণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ।
প্রব্রাজিকা জ্ঞানদাপ্রাণা
সহ সম্পাদিকা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল।
প্রব্রাজিকা বরদাপ্রাণা
প্রবীণ সন্ন্যাসিনী, সারদা কনভেন্ট, সান্টা বারবারা, ইউ. এস. এ।
ঝর্ণা চৌধুরী
প্রাক্তন শিক্ষিকা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল।
প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণা
সন্ন্যাসিনী, শ্রীসারদা মঠ।
চিত্রা দেব
সুলেখিকা, গবেষক।

নির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঋ

এ

খ

গ

ঘ

চ

ছ

ঝ

ট

ঠ

ড

ত

থ

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

য

য়

র

ল

স্বামী বিবেকানন্দের নাম (এবং স্বামীজী, স্বামী, নরেন, নরেন ইত্যাদিও) দেওয়া হল না। কারণ বইটির সামগ্রিক বিষয়বস্তু বিবেকানন্দ স্বয়ং।